CUK-H 06926 - 59 - 254635

পশ্চিম জার্মানী ১৯৬৩ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ১০০,০০০ জোড়া
জুতো কিনেছেন *Bata*

59

সাবিত্রী রায়ের লেখা বই :

পাকা ধানের গান : তিন খণ্ডে ১২'৫০ **ত্রিস্রোতা** ৬'০০ **মালশ্রী** ৩'৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—মেঘনা আর পদ্মাপারের ভাঙ্গাগড়ার পটভূমিতে লিখিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রামের সুবৃহৎ উপন্যাস—

মেঘনা-পদ্মা ১৫'০০

সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে দু'একটি অভিমত—

"কোনও বাংলা উপন্যাসই, এমনকি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ ও উৎকৃষ্টতর শিল্পনৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাসও সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান'-এর মত এমন বিরাট চিত্রপট, রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর এত মহান প্রণিধান, বিষয়বস্তু ও চরিত্রের এত বৈচিত্র্যময় অবতারণার দাবী করতে পারে না। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোও (সৃজন, ত্রিস্রোতা, মালশ্রী প্রভৃতি) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাঁর 'পাকা ধানের গান' মহাকাব্য সৃষ্টির মহৎ প্রচেষ্টা। এটি জনগণের মহাকাব্য —যাতে গণসংগ্রামের এক পর্ব ও পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রার একটি ধারা অত্যন্ত সততার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে।............

সবশেষে এ বললে হয়তো অতিশয়োক্তি ও প্রশস্তির বাহুল্য হবে না যে সত্যের সার্থক মূল্যায়নে ও শিল্পপ্রতিভার চরম পরাকাষ্ঠার বিচারে এই জনগণের উপন্যাসটির প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ অপর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই"

—সরোজ আচার্য : **নিউ-এজ**

*

"বর্তমান বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য সন্ধানী চটুল ঝঙ্কারের ভিতর পাকা ধানের গান ধ্রুপদ মন্দ্রিত, এর বিপুল সঙ্গীত বাংলা দেশের ধানের ক্ষেতের মতোই দূর দূরান্তে দিক্-দিগন্তে বিকীর্ণ হয়ে গেছে"—

—**পরিচয়**

*

"পাকা ধানের গান' একটি সাধারণ কাহিনী নয় ; সেখানে রাজনীতির প্রশ্ন আছে, সমাজ জিজ্ঞাসা আছে।......প্রেম নামে স্নিগ্ধ স্বপ্ন আছে। দেশ নামে প্রবল কর্তব্য আছে। একদিকে ব্যক্তিমানস আর একদিকে বিশাল দেশের বিপুলতর আহ্বান। লেখিকার অপরূপ এক কবি মন আছে। বাংলা দেশের লোকাচার, ব্রতকথা অপূর্ব মমতায় তিনি এই কাহিনীতে অঙ্গীকৃত করেছেন"

*

—**দেশ**

"সাবিত্রী রায়কে ধন্যবাদ, পল্লীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুন্দর সুখপাঠ্য উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই বইয়ে এমন একটি কোমল ও শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, যা খুব সুলভ নয়—"

*

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

জীবনের যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র উপাখ্যান সাবিত্রী রায় সংগ্রহ করেছেন তা যে কোন জীবননিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ঈর্ষাযোগ্য..."

—**যুগান্তর পত্রিক**

মিত্রালয় ॥ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের সন্তানেরা পরস্পরকে ঢের ভালভাবে জানবে বুঝবে...

দেশে যাতে বিস্তৃতভাবে যানবাহন আর যোগাযোগের সুব্যবস্থা হয়, তার জন্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত শত শত কোটি টাকা খরচ করছে। বৈষয়িক সুখসুবিধা হওয়া ছাড়াও এই বিরাট দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বহু মত ও পথের মানুষ এর ফলে পরস্পরের কাছাকাছি আসবে—কেননা বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ের ওপরই এতে জোর পড়বে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে আমরা দূরত্বকে জয় করব, আমাদের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ঢের ভালভাবে জানতে বুঝতে পারবে...

ভারতে প্রথম হাওয়া-ভরা টায়ার আনে ডানলপ—১৮৯৮ সালে। সেই থেকে ডানলপ এদেশে যানবাহনের সুযোগ বিস্তারের কাজে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কলকাতার কাছে ডানলপের যে কারখানা, তার চেয়ে বড় টায়ার কারখানা এশিয়ার আর কোথাও নেই। এই কারখানায় বহু রকমের টায়ার আর যানবাহন ও শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়। যানবাহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যে ১৯৫৯ সাল থেকে আম্বটুরে দ্বিতীয় একটি ডানলপ কারখানায় উৎপাদনের কাজ চলেছে।

১৮৯৮ সাল থেকে ভারতে যানবাহনের সেবায় রত

DC-4448 BEN

কোটি কোটি বছর পার হয়ে আসা আমাদের এই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বা ভূত্বক চিরকাল একরকম থাকে নি, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজকের পৃথিবী রূপ-পরিগ্রহ করেছে। এ পরিবর্তনের পালা আজও শেষ হয়নি·········

লোক-বিজ্ঞানের নতুন বই

বের হলো

পৃথিবীর জঠরে

অনুবাদঃ **অরুণ রায়**

দামঃ ২·৩০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ঃ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি দুর্গাপুর-৪

আপনি
পরিচয়-এর গ্রাহক হয়েছেন?

পরিচয় নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া গ্রাহক হলে আপনি আর্থিক দিক দিয়েও লাভবান হবেন।

পরিচয়-এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা দশ টাকা।

কিন্তু খুচরো বারোটি সংখ্যার দাম (তিনটি বিশেষ সংখ্যা সহ) পনেরো টাকা।

আজই

পরিচয়-এর গ্রাহক হোন
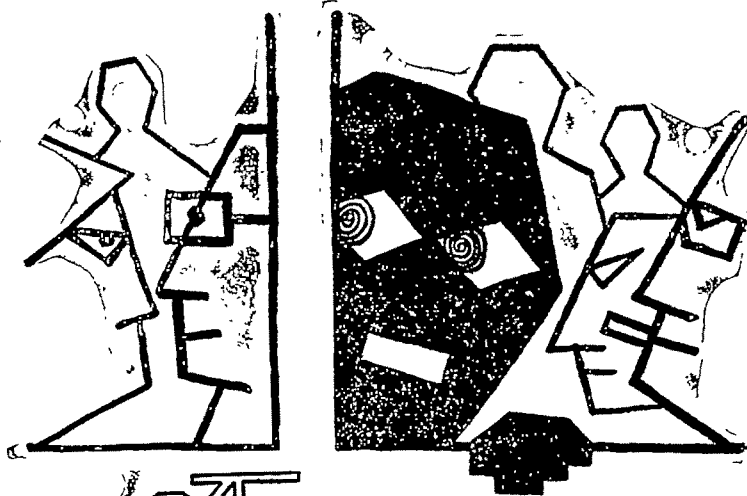
পরিচয়-কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে আমাদের সাহায্য করুন।

লোকটা নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। বিনা-টিকিটের যাত্রী—বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। টিকিট ফাঁকি দিয়ে লোকটা অন্যের জায়গা দখল করেছে, রেলকে ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করছে, ফলে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এদের পাপচক্র জাতীয় জীবনে দুর্নীতির এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করছে। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER/84

সন্ধানী প্রডাকসন্স-এর নিবেদন
রাধা পূর্ণ ও অন্যত্র

যখনই যেখানে বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, জিনিসের ভালমন্দই হয় প্রস্তুতকারকের খ্যাতি বা অখ্যাতির কারণ—কেননা, ক্রেতারা সর্বদাই সে জিনিসের গুণাগুণ পরখ করে থাকেন এবং খুঁত ধরতেও তাঁদের জুড়ি আর নেই। কিন্তু একবার যদি কোনো জিনিস উৎকর্ষের জোরে দাঁড়িয়ে যায় এবং সে উৎকর্ষ যদি ঠায় বজায় থাকে, তাহলে ভারতের মত বাজারেও—ক্রেতারা যেখানে বেশীর ভাগই সস্তা খোঁজেন—সে জিনিসকে হটানো শক্ত।

দশ বছরের ওপর সেন-র‍্যালে (ভারতের সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত এবং নটিংহ্যামের সুবিখ্যাত র‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এই দুয়ের সার্থক সহযোগিতায় গঠিত প্রতিষ্ঠান) সুপরিচিত র‍্যালে, রাজ, হাম্বার আর রবিনহুড সাইকেলের উৎপাদন সমানে বাড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু তবু এইসব সাইকেলের চাহিদা কিছুতেই যেন মিটছে না।

এই সাইকেলগুলি ছাড়াও ভারত আর অন্যান্য আফ্রো-এশিয়ার বাজারের জন্যে সেন-র‍্যালে প্রতিষ্ঠান সাইকেলের জন্যে ইউনিয়ন সাজ-সরঞ্জাম আর উইটকপ সীট তৈরি ক'রে থাকেন।

SRC-84 A BEN

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত ; অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। মূল্য ২'৫০ টাকা।

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটোদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ১'৮০ টাকা।

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও সচিত্র আলোচনা। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষা বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের পড়া উচিত। মূল্য ২'৩০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১'৫০ টাকা।

ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। মূল্য ৩'৩০ টাকা।

বাংলা উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মূল্য ২'০০ টাকা।

প্রাণতত্ত্ব ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিদ্যার মূল তত্ত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। লেখার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের মতোই সরস ও সুপাঠ্য। মূল্য ২'০০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নব্যচিন্তা ও নবনির্মিতির সূচনা ও প্রসার হয়েছিল তার সুগ্রথিত চিত্র। মূল্য ১'৪০ টাকা।

আহার ও আহার্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্যে কী ধরনের আহার আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ১'৫০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র-সংবলিত। মূল্য ২'৫০ টাকা।

হিউএনচাঙ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণকথা। তথ্যবহুল অথচ উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। মূল্য ২'৫০, শোভন সংস্করণ ৩'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

25৮635

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ, ১৩৭১

পরিচয়

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

স্নদক্ষ সেবা ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন	১০০০০০০০০ টাকা
বিলিকৃত ও প্রাপ্ত মূলধন	১৬০০০০০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৪০৫০০০০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যবিধ রিজার্ভ	৪৮০০০০০ টাকা

ভারতে ও বিদেশে বহুসংখ্যক শাখা এবং বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ৫ শতাধিক সংবাদদাতা থাকায় দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড বিদেশী মুদ্রার ব্যবসায় সমেত সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করিতে সক্ষম

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড
(প্রধান কার্যালয়)

৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
(চৌরঙ্গী স্কোয়ার শাখা)

৬৭এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
(ভবানীপুর শাখা)
সেফ ডিপোজিট ভল্ট সহ

৫৯, কটন স্ট্রীট
(বড়বাজার)

৩৬।২ বিবেকানন্দ রোড
(বিবেকানন্দ রোড শাখা
সেফ ডিপোজিট ভল্ট সহ)

১৬৭সি ও ১৬৭সি-১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
(বৌবাজার শাখা)

সি আই টি নিউ রোড ব্রাঞ্চ
প্লট নং ১২, স্কিম নং ৫২

টি ডি কাঁসারা
জেনারেল ম্যানেজার

এস কে চৌধুরী
ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা সমূহ

বীজাণুনাশক

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান—সুনিশ্চিত ফল পাবেন।

বীজাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

এ্যান্টল দিয়ে ধোয়া মোছা করলে দেয়াল আর মেঝে বীজাণুমুক্ত থাকে, সংক্রমণের ভয় থাকে না

হাতের কাছে রাখুন

সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য বীজাণুনাশক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরি

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের নায়ক অনন্ত নদীর বুকে ভাসমান নৌকার বাসিন্দা; অতীতের ভয়াবহ পাপ মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর তীরের সন্ধান যাকে আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশ ও কাল তার কাছে অন্ধ। শক্তিমান লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক মানুষের যে অসহায় আলেখ্য এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রবাহে তা নূতন চিন্তার সূচনা করবে। **সাড়ে তিন টাকা**

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যকলা বিষয়ে প্রথম সুচিন্তিত গবেষণামূলক গ্রন্থ। প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজ্ঞানসমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। **বারো টাকা**

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি অনন্য সাধারণ উপন্যাস। লেখিকার সুদীর্ঘ লণ্ডনবাসের অভিজ্ঞতা বহু আলোচিত এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। **সাত টাকা**

নবপত্র প্রকাশন। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই-১

আপনার লগ্নীকে মুনাফায় পরিণত করুন
সেন্ট্রালের তিন বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন

শতকরা ৪½ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ অর্জন করুন
প্রতি ৮৮'২৫ টাকা জমার জন্ত তিন বছর পরে ১০০ টাকা করে পাবেন

সঞ্চয় করুন এবং ভবিষ্যতের জন্ত নিশ্চিত হোন
সেন্ট্রালে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলুন
শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ অর্জন করুন
চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়

এফ সি কুপার	স্যার হোমি মোদী কে. বি. ই	বি সি সর্বাধিকারী
জেনারেল ম্যানেজার	চেয়ারম্যান	চীফ এজেণ্ট কলিকাতা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

প্রেম
ভালোবাসা
ইত্যাদি

রক্ত-মাংসের মানুষের নির্ভেজাল কাহিনী। দু টাকা॥

আনন্দধারা প্রকাশন। ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত

পুস্তক পুস্তিকা ও সামযিক

পত্রিকার জন্য আমাদের

গ্রন্থালয়ে আসুন

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

756·3
·0178

756·3
·0178

রণজিৎ দাশগুপ্ত
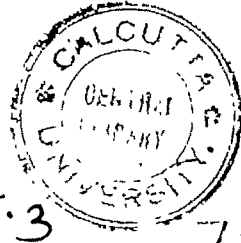
ভারত : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বনাম সাম্রাজ্যবাদ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা করেছে। এই নতুন পর্বের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক রাজের অবসান এবং বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আবির্ভাব।

কিন্তু এই নতুন পর্বেরই অপর প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজত্বের ফেলে-যাওয়া মধ্যযুগীয় ও ঔপনিবেশিক আবর্জনাস্তূপ অপসারণের কাজ আজও অসমাপ্ত। ফলে এই নবীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরোধ বর্তমান।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নতুন সমস্যার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য, বহুবিধ বিরোধিতা ও জটিলতার এমন এক পরস্পরসম্পর্কিত জটের উদ্ভব হচ্ছে ও হয়েছে যার কোনো পূর্ব নজীর নেই। কোনো পূর্বনির্ধারিত প্যাটার্নে ফেলে এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা কিংবা বাঁধা ফর্মুলা অনুসারে কর্তব্য স্থির করার প্রয়াস ব্যর্থ ও হাস্যকর হতে বাধ্য। স্পষ্টতই বর্তমান পরিস্থিতির জটিল গ্রন্থিমোচন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক কর্তব্যের সার্থক সমাধান নির্ভর করছে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, বিশেষত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের নবতর পর্ব সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির উপর।

দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে মৌলিক মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও বিশ্লেষণের অভাব আজও খুবই বেশি। এ-ব্যাপারে ব্যর্থতা ও

India: Ecconomic Freedom versus Imperialism, V. I. Pavlov—People's Publishing House, New Delhi. Rs. 15·00.

দৈন্য আমাদের ভারতীয় মার্কসবাদীদের সকলেরই। আর তারই ফলে এদেশের মার্কসবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আজ অনেক পরিমাণে দিশাহারা। আলোচ্য পুস্তকটি অবশ্য এই অভাব পূরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বলা যেতে পারে, সমসাময়িক ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত সকলের পক্ষেই এই বইটি অবশ্য-পাঠ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলবার নয় যে, এই অবদানের জন্য কৃতিত্বের অধিকারী একজন বিদেশী মার্কসবাদী শ্রীভি. আই. প্যাভলভ।

শ্রীপ্যাভলভের আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও মূলত ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সমস্যা, তিনি আলোচনাকে শুধুমাত্র ভারতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত কারণেই সমগ্র আলোচনাটি করা হয়েছে গত দশ-পনেরো বছরে এশিয়া-আফ্রিকায় নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সাধারণ সমস্যা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের পটভূমিতে। আর এই সব দেশের সমাজবিকাশের ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে অ-ধনতান্ত্রিক পথ ও জাতীয় গণতন্ত্রের নতুন চিন্তা দুটিকে ব্যবহার করেছেন।

শ্রীপ্যাভলভ প্রচুর তথ্য ও তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন খুব সংক্ষেপেও তা এখানে উপস্থিত করা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা শুধুমাত্র তাঁর মূল ও নতুন বক্তব্যগুলির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

এক, বিদেশী শাসনের জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর ভারত সমেত বহু দেশেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবাত্মক প্রয়াস এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই নতুন পর্যায়ের মর্মকথা হল নব অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সংহত ও প্রসারিত করার মৌলিক শর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। এর অর্থ এই সব দেশের শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য-পরিবহন জগতে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক উজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি, কারিগরি কৌশল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপারে প্রাক্তন প্রভুদের উপর চিরাচরিত নির্ভরশীলতার হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবসান।

এইসব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন থেকে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা প্যারিসের প্রতিপত্তি ও আধিপত্যকে উচ্ছেদের মাধ্যম হল প্রধানত দুটি :

(ক) এই দেশগুলিতে দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষত ভারি ও বুনিয়াদি শিল্পের বিকাশ এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সর্বতোমুখী সহযোগিতা।

দুই, একথা মনে করলে সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, অর্থনৈতিক উজ্জীবনের সমস্যাটি নেহাৎই অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন শুধুমাত্র শিল্পায়ন ও উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের যোগফল নয়।

আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাস, রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র, দেশটির সামাজিক ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিন্যাস, জাতীয় জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, সরকারের বৈদেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সমস্ত দেশভক্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সমস্যাদির মতো রাজনৈতিক উপাদানকে এক্ষেত্রে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বাস্তবিকপক্ষে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমস্যা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ধনিক, তাদের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা দেশীয় ধনকুবের, মুৎসুদ্দি ইত্যাদি ও পরগাছা সামন্তশ্রেণীকে পরাস্ত করার সমস্যা। আর এ-ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—এই উভয়বিধ রাজনৈতিক উপাদানই অবশ্য বিবেচ্য।

তিন, এইসব দেশের অনেকগুলিতেই এবং বিশেষত ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়া শাসকশ্রেণীর অর্থাৎ জাতীয় ধনিকশ্রেণীর দ্বৈত প্রকৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই দ্বৈত প্রকৃতি ও মনোভাবের প্রকাশ, একদিকে, জাতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় সামন্ত জমিদারশ্রেণীর বিরোধ, আর অন্যদিকে জাতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী জনসাধারণের ও প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের মধ্যে।

আমাদের দেশের ধনিকশ্রেণীর পক্ষে এই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা (ক) সার্বভৌম বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সংহত করার এবং সাম্রাজ্যবাদী ধনকুবেরদের দ্বারা হস্তগত উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ হ্রাসের প্রধান উপায়, এবং (খ) দেশের ভিতরে নিজেদের শ্রেণী-আধিপত্য বিস্তার ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রাকে প্রসারিত করার চূড়ান্ত মাধ্যম।

অপরদিকে, অর্থনৈতিক উজ্জীবন ও স্বাধীনতা অর্জন শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শ্রমিকশ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি, একত্রীকরণ ও সংহতিসাধন, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের উপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্টি, এবং শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের

বাস্তব ভিত্তি রচনার পক্ষে আধুনিক শিল্পসজ্জা ও সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন বিশেষভাবে সহায়ক।

এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বেশ কিছু ঐক্য বর্তমান; আবার, অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপায় ও পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুতর মতপার্থক্য বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে, এই সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে কোন পথে—ধনতান্ত্রিক পথে, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কোনো পথে, না অ-ধনতান্ত্রিক পথে, সেটাই হল আজকের ভারতের প্রধানতম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্ত ও চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছে দেশের ভিতরে শ্রেণী-সংগ্রামের উপর। আর এই সংগ্রাম বিকশিত হচ্ছে বিদেশী মূলধনের ভূমিকা ও স্থান, কৃষি সমস্যার সমাধান, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থা, সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ ইত্যাদির মতো প্রশ্নসমূহকে কেন্দ্র করে।

চার, ভারতে ও অন্যান্য নব-স্বাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর ভিত্তি জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্র। এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে সমাজতান্ত্রিক বলে গণ্য করার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিক জীবনে ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য ও সম্পত্তির ধনতান্ত্রিক মালিকানা প্রথার ফলস্বরূপ এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের চরিত্রও মূলত ধনতান্ত্রিক।

কিন্তু লেনিনেরই বিশ্লেষণ অনুসারে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের প্রকৃতি ও ভূমিকা দেশ-কাল-ইতিহাসভেদে ভিন্ন। ভারতে এই রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র প্রথমত ও মুখ্যত জাতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হলেও শ্রমজীবী জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের বিশেষ পদ্ধতি, রূপ ও গতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা বা জাপানের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র, যেখানে একচেটিয়া মূলধনের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিশাল ক্ষমতার সম্মিলন ঘটেছে তার সঙ্গে সাধারণভাবে আফ্রিশীয় দেশের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের পার্থক্য প্রায় মূলগত। তদুপরি, থাইল্যাণ্ড বা কুয়োমিণ্টাঙ চীনের সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরূপে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে ভারত, সংযুক্ত

আরব প্রজাতন্ত্র বা বার্মা, আলজিরিয়ার মতো দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের পার্থক্য খুবই ব্যাপক ও গভীর।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের এখন পর্যন্ত যে বিকাশ ঘটেছে তা মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কেননা এই বিকাশ আসলে আধুনিক শিল্প, বিশেষত মূলধনী ও বুনিয়াদি শিল্পবিকাশের প্রধানতম মাধ্যম। উপরন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত কর, ঋণ, অর্থসংস্থান সংক্রান্ত নীতি অনেক সময়েই বৃহৎ ধনিক ও ক্ষুদে মালিকদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করার হাতিয়ার। আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকারী নীতিই এ বিষয়ে নমুনা। আবার, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও চিকিৎসার বিস্তার, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, গ্রামীণ ঋণদানের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাবলী অনেক সময়েই জমিদারি ও মহাজনী শোষণের তীব্রতা হ্রাসের পক্ষে সহায়ক। তাই সংক্ষেপত, সমস্ত বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সংকোচন, দেশীয় ধনিকচূড়ামণিদের সংকীর্ণ স্বার্থের খর্বতাসাধন কিংবা সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের মাত্রা হ্রাসের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র অনেক সময়েই যথেষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

স্পষ্টতই, ভারতের মতো দেশে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অবশ্য এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীলতার মাত্রা নির্ভর করছে, প্রথমত, শ্রমজীবী জনসাধারণ ও জাতীয় বুর্জোয়ার মধ্যে ঐক্যের মাত্রা, এবং দ্বিতীয়ত, সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থকে অতিক্রম করে ধনিকশ্রেণীকে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করার ব্যাপারে দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সামর্থ্যের উপর।

পাঁচ, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র বর্তমানে অনেকগুলি আফ্রিশীয় দেশে যে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছে তা শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ বিকাশের উপর নির্ভর করে সম্ভবপর হত না। রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের এই প্রগতিশীল বিকাশ ও বুর্জোয়া নেতৃত্বে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদ রচনা যে সম্ভবপর হচ্ছে তার মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের মূলগত পরিবর্তনের ফলে নতুন যুগের অভ্যুদয়, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব।

বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনার কথা বুঝতে পূর্বতন শাসকশক্তির দেরি হয় নি। তাই দেখা যায় যে, স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্ভব ও

প্রসারের পক্ষে সহায়ক কোনো ঋণ, যন্ত্রপাতি, কারিগরি সাহায্য ইত্যাদি দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়ে এর বিকাশকে অঙ্কুরেই স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৫ সাল এই সব উন্নয়নকামী সদ্য-স্বাধীন দেশের পক্ষে এক তাৎপর্যপূর্ণ বছর। কেননা প্রধানত ঐ বছরেই এইসব দেশের শিল্পোন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের প্রসার ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের অকৃত্রিম মিত্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ আত্মপ্রকাশ করল। আর এই সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের কল্যাণেই জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারগুলির পক্ষেও সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের ভ্রূকুটি, ভয়ভীতি ও ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে কিংবা সাম্রাজ্যবাদী ব্ল্যাকমেল ও চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পণ না করে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশসাধন সম্ভবপর হয়ে উঠল। আর এটাই হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মৌলিক অবদান।

কিন্তু এ সহযোগিতার আরও দুটি তাৎপর্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ভারতের মতো দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদের এতদিনকার অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিতেও কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল। এই শেষোক্ত অর্থনৈতিক নীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের কোনো মৌলিক পরিবর্তন অবশ্য হল না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক জগতের নিঃস্বার্থ সাহায্যের দৃষ্টান্তের সামনে ও পরিবর্তিত অবস্থার চাপে পড়ে পশ্চিমী নেতারাও বাধ্য হলেন সদ্য স্বাধীন দেশেব সরকাবগুলিকে ব্যাপকভাবে সরকারী ঋণদানের নীতি প্রবর্তনে। এই ঋণদান নীতি অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বর্জিত ছিল না। তথাপি বিদেশী বেসরকারী মূলধন লগ্নীর তুলনায় সরকারী বিদেশী ঋণ অনেক বাঞ্ছনীয় এই কাবণে যে, এই ঋণের ব্যবহার ও নিয়োগ সম্পর্কে অন্তত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিম ইউরোপে ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের অন্যতম উৎস ছিল নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের রক্তাক্ত শোষণ। ধনতন্ত্রের ক্লেদাক্ত, ভয়ঙ্কর চেহারার আজও কোনো পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু পরস্পরবিরোধী দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগে জনসাধারণের সঙ্গে বিরোধের সমাধানের জন্য শুধুমাত্র রক্তাক্ত নির্যাতনের মাধ্যম গ্রহণ এইসব দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বরং বর্তমান বিশ্ব-পবিস্থিভিতে, বিশেষত

বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান সাহায্যের কল্যাণে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে কিছু সুযোগ-সুবিধাদান, কিছু কৌশল অবলম্বন কিংবা এমনকি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেও জনসাধারণের সঙ্গে বিরোধের আংশিক সমাধান সম্ভবপর এবং তা ঘটছেও অনেক ক্ষেত্রে।

ছয়, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের এই সমস্ত প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে একথা অনস্বীকার্য যে, এই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছে মূলত ধনতান্ত্রিক পথে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করে, দেশীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পুষ্টিসাধন করে। বস্তুতপক্ষে এই রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের কথাকে স্মরণে রেখে শ্রীপ্যাভলভ ভারতীয় অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিম্নলিখিত দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন : (১) ধনতান্ত্রিক বিকাশেব একচেটিয়া প্রবণতা ও এদেশে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ; (২) ভারতীয় শিল্পায়নের হাব ও গতিপথ ; (৩) অর্থ ও মূলধন সঞ্চয়ের উৎস ; (৪) বিদেশী বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগের ফলাফল ; (৫) সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সাহায্যের লক্ষ্য, প্রকৃতি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফল ; এবং (৬) সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। এই সবকটি বিষয়েই শ্রীপ্যাভলভের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত মূল্যবান।

সমসাময়িক ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের উপরোক্ত নানা দিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার মূলত যে সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন তা হল : ধনতান্ত্রিক পথে অর্থনৈতিক বিকাশের বহুবিধ গুরুতর সমস্যা, জটিলতা ও বিপদ বর্তমান। তার প্রধান কয়েকটি হল নিম্নরূপ :

(ক) বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী জনসাধারণের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী বিরোধ ও সংকটগুলিকে এড়ানো সম্ভবপর নয়।

(খ) শ্রেণী হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়ার রয়েছে দ্বৈত চরিত্র। এদের ভূমিকার স্থায়িত্ব নেই ; প্রগতিশীল হলেও এদের ঝোঁক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার দিকে।

(গ) ভারতীয় বুর্জোয়ার একচেটিয়া প্রবণতা সদ্য-স্বাধীন অনেক দেশের তুলনায় বেশি পরিণত—কেননা এদেশে শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য জগতের কেন্দ্রিকরণ ও একত্রীকরণের ঝোঁক অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য ভারতের একচেটিয়া পুঁজি এখনও 'ফিনান্স ক্যাপিট্যাল' বলে গণ্য হতে পারে না।

কারণ, প্রথমত, শিল্প-পুঁজি ও ব্যাঙ্ক-পুঁজির আজও সম্পূর্ণ সংযুক্তি ঘটে নি, এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শিল্প বিকাশের ভিত্ আজও যথেষ্ট কাঁচা ও দুর্বল।

কিন্তু বিপদকে লঘু করে দেখলে ভুল হবে। শ্রীপ্যাভলভের বিবেচনায় ভারতে একচেটিয়া পুঁজির ভবিষ্যতে 'ফিনান্স পুঁজি'তে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। উপরন্তু, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিতালি সূত্রে আবদ্ধ একচেটিয়া ধনিককুলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন এবং নিজেদের রাজনৈতিক একনায়কত্ব স্থাপনের বাসনা আজ আর গোপন নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশের বর্তমান ধারা যদি চলতে থাকে তবে একচেটিয়া ধনিকচক্রের বাসনা পূরণ অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র রূপ নেবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের, এবং সেটা হবে বুর্জোয়াদের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির উপায় মাত্র।

সব মিলিয়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, ভারতে যদিও ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষিত হয় নি, অর্থনৈতিক বিকাশের ধনতান্ত্রিক পথ জাতির পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। আর ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রকৃতির অর্থ হল যে, ভারত আজও বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক অসম সভ্য এবং এটাও ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক।

সাত, এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হল ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে ছেদ ঘটানো এবং ঐ পথকে পরিহার করে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ গ্রহণ। শ্রীপ্যাভলভের বিচারে অ-ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের তত্ত্ব শুধু যে-সব দেশে এখনও ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে নি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়; এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সেই সব দেশ যেখানে ইতিমধ্যে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছে, অথচ একচেটিয়া ধনতন্ত্রের স্তরে উপনীত হয় নি, সেইসব দেশের ক্ষেত্রেও বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এই তত্ত্ব প্রযোজ্য।

অবশ্য প্রতিটি দেশে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ হুবহু একই রকমে হবে না। বিশেষ বিশেষ দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর অনুসারে অ-ধনতান্ত্রিক পথের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকমের হবে। এই পথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে-সব দেশে ধনতন্ত্রের এখনও বিশেষ বিকাশ ঘটে নি তাদের পক্ষে ধনতান্ত্রিক পথকে সম্পূর্ণ বর্জন ও পরিহার করা সম্ভবপর হবে। আর ভারতের মতো দেশে এই পথ গ্রহণের বিশেষ

অর্থ ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপযোগী বাস্তব ভিত্তি রচনা।

আট, এই পথ গ্রহণ কোনো দেশের পক্ষেই অবশ্য আপনাআপনি ঘটে উঠবে না। জাতীয় গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও তাতে সাফল্য অর্জনের পরিণতিতেই একমাত্র এই পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

জাতীয় গণতন্ত্র হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সমাধা করা হবে। নির্দিষ্ট যে-সব কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে সেগুলি হল: (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংহতিসাধন, (২) কৃষকের স্বার্থে ব্যাপক ভূমিসংস্কার, (৩) সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলির বিলোপসাধন, (৪) সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আধিপত্য ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদসাধন, (৫) দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির সংকোচন ও নির্মূলীকরণ, (৬) জাতীয় শিল্পসৃষ্টি ও তার বিকাশসাধন, (৭) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, (৮) সামাজিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণ, (৯) স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ এবং (১০) সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য মিত্র দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিকাশ-সাধন। একমাত্র এই কর্মসূচীকে বাস্তবে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতার দূরীকরণ এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর।

জাতীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি হল এ-সব দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলন অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সাধারণ, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক সম্মিলন। সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর নির্বিশেষে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সবকটি দেশের সামনেই পরিপ্রেক্ষিত হল জাতীয় গণতন্ত্র। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাতীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করছে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রীর শক্তি ও স্থায়িত্বের উপর। আর যে-সব দেশে ইতিমধ্যেই ধনতান্ত্রিক কাঠামো আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে, শ্রীপ্যাভলভের মতে সেসব ক্ষেত্রে জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত জাতীয় মোর্চার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব। এই বিচারে ভারত এই রকমেরই একটা দেশ।

আলোচ্য গ্রন্থপাঠ শেষে কয়েকটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। পূর্ব

ইউরোপের জনগণতন্ত্র ও চীনের নয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় গণতন্ত্রের নতুন ধারণা ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রভেদ কোথায়, সাদৃশ্যই বা কোথায়? অ-ধনতান্ত্রিক পথের নির্দিষ্ট বিশেষত্ব ও বিশিষ্ট রূপ কি? ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক— এই দুই পথের সঙ্গে অ-ধনতান্ত্রিক পথের কোথায় পার্থক্য? শ্রীপ্যাভলভের আলোচনার থেকে এ-সব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা জন্মায় না।

উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শুধু আরও আলোচনা নয়, বেশ কিছুটা বিতর্কেরও অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, শ্রীপ্যাভলভের মতে যে-সব দেশে ইতিমধ্যেই ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে, তাদের পক্ষে জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণের অপরিহার্য শর্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব। কিন্তু তাহলে বর্তমানে আলজিরিয়া, ব্রহ্মদেশ ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে যে বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা কি? আসলে জাতীয় গণতন্ত্র কি এমন একটি রাষ্ট্রীয় রূপ নয় যেখানে কখনো কখনো শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের অধিকারী না হলে পরেও কৃষকের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে? জাতীয় গণতন্ত্র কি এমন একটি রাষ্ট্রীয় রূপ নয় যেখানে স্বল্পকালের জন্য হলেও কোনো বিশেষ শ্রেণী নেতৃত্বের অধিকারী নয় অর্থাৎ সমস্ত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক শ্রেণীর মধ্যে একটা ভারসাম্য সাময়িকভাবে বর্তমান?

শ্রীপ্যাভলভের অপর একটি বিতর্কমূলক বক্তব্য হল যে, যে-সব সদ্য-স্বাধীন দেশে ইতিমধ্যেই স্থানীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, তাদের পক্ষে অ-ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এমন বক্তব্য সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, ভারতের ক্ষেত্রে অ-ধনতান্ত্রিক পথের পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান। কিন্তু কেমন করে? ভারতে কি স্থানীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র বিকাশলাভ করে নি? এক্ষেত্রে কি অ-ধনতান্ত্রিক পথ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ অভিন্ন? এ-সব বিষয়ে গ্রন্থকারের আলোচনা সন্তোষজনক নয়।

কিন্তু এরকম কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তনের নানা দিক এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত বিষয়াবলী সম্পর্কে শ্রীপ্যাভলভের আলোচনা বিশেষভাবেই মূল্যবান। এই আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও সমৃদ্ধতর করার দায়িত্ব যে প্রধানত ভারতীয় মার্কসবাদীদের একথাটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

সুব্রতেশ ঘোষ

ভারতের শিল্প-সম্পর্ক

কোনো উন্নয়মান দেশের অর্থনীতিতে industrial relations বা শিল্প-সম্পর্কের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে শুভঙ্কর। অন্যপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সম্পর্ক গড়ে উঠলে সামাজিক শক্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযোগী মানসিক পরিমণ্ডলের পক্ষে তা অশুভ হয়ে ওঠে। অধুনা ভারতের শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মনোযোগ যুক্তিসংগতভাবে বেড়ে গেছে। বিগত এক দশকের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কের উপর একাধিক অনুসন্ধানমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত *Industrial Awards and Industrial Relations in India* * ঐ বইগুলির মধ্যে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, কারণ ভারতের শিল্প-সম্পর্ক প্রসঙ্গে নানা বই প্রকাশিত হলেও, industrial awards বা শিল্পগত রোয়েদাদগুলি কী ভাবে সেই শিল্প-সম্পর্কের গঠন ও বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত করেছে, এ সম্পর্কে আলোচনার সংখ্যা প্রচুর নয়।

চিন্তা করলে ভারতের শিল্প-সম্পর্কের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমত, এ দেশে শিল্প সম্পর্কের বর্তমান কাঠামো গড়ে উঠেছে সরকারী নীতি, আইন ও সরকার-সৃষ্ট ট্রাইবুনালের রোয়েদাদের (awards) উপরে। ইওরোপ ও আমেরিকায় শিল্প-সম্পর্ক গড়ে ওঠার ভিত্তিমূলে আছে সমষ্টিগত দর-কষাকষি বা collective bargaining ; এ দেশের শিল্প সম্পর্কে কিন্তু কালেক্‌টিভ বারগেনিঙের ভূমিকা এখন পর্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রভাবের তুলনায় নগণ্য।

এখানকার শিল্প-সম্পর্কের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে ভারতীয় শিল্প সংগঠনে প্রতিষ্ঠান বা কারখানা স্তরে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ামনের উপযুক্ত ব্যবস্থা

* *Industrial Awards and Industrial Relations in India.* R, N. Bannerjee, New Age Publishers Pvt, Ltd., Calcutta, September, 1963. Rs. 12·00.

এখনও ঠিক ভাবে গড়ে ওঠে নি ; যেটুকু গড়ে উঠেছে, তা-ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারছে না।

এখনও পর্যন্ত এ দেশে প্রতিষ্ঠানগত স্তরে নিয়মিত সম্পর্কের স্থায়ী যন্ত্র হিসেবে প্রধানত works committeeগুলিকেই ধরা চলে। ১৯৪৭-এর Industrial Disputes Act-এর ধারা অনুযায়ী এর উদ্ভব। পরবর্তীকালে অবশ্য যুগ্ম-উৎপাদন সংস্থা (joint production committee) এবং যুগ্ম-পরিচালন সমিতি (joint management council) সরকারী নীতি অনুযায়ী অনেক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু সংখ্যাগত দিক দিয়ে ওয়ার্কস কমিটিগুলিকেই প্রতিষ্ঠান স্তরে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের প্রধান যন্ত্র হিসেবে ধরতে হবে।

অথচ, ১৯৪৭ সালের আইন অনুযায়ী ১০০ জন বা ততোধিক কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই works committee গঠন অবশ্যকৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতপক্ষে এখনও এই নিয়মের আওতাভুক্ত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে এই কমিটি গড়ে ওঠে নি। কেন্দ্রীয় শ্রম-মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র Indian Labour Journal-এ[১] প্রকাশিত এক হিসেব অনুযায়ী ১৯৬২ সালে সারা ভারতে মাত্র ২৯১৮টি ওয়ার্কস কমিটি কর্মরত ছিল ; অথচ, প্রকৃতপক্ষে সে বছরে সারা ভারতে রেজেষ্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৫৯,১৮৬। অতএব, ১০০ জন কর্মীর কম নিয়োগ করা হয় এমন ছোট আকারের প্রতিষ্ঠানগুলি বাদ দিলেও দেখা যাচ্ছে যে আইন অনুযায়ী ওয়ার্কস কমিটি গঠনে বাধ্য এমন বহু প্রতিষ্ঠানেই তা গঠন করা হয় নি। আর যে-সব প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্কস কমিটি চালু হয়েছে, তারও সবগুলিতে অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এহেন অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই ওয়ার্কস কমিটির অস্তিত্ব সত্ত্বেও, নিয়মিত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার লক্ষণ নেই। মালিক পক্ষ ওয়ার্কস কমিটির সামনে বহু দরকারী জিনিসই হাজির করেন না। শ্রমিক পক্ষের উপস্থাপিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও তাদের মনোভাব বহুলাংশেই নেতিবাচক থাকে। ফলত অনেকের মতে, প্রতিষ্ঠানগত স্তরে নিয়মিত শ্রম-সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারণ ও উন্নয়নে ওয়ার্কস কমিটিগুলির ভূমিকা অনেকাংশে মালিক পক্ষের অসহযোগের জন্যই উল্লেখ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানগত স্তরে ওয়ার্কস কমিটিগুলির উপযুক্ত ভূমিকা যে

১. Indian Labour Journal, Delhi, September, 1963, p. 887.

কী, সে সম্বন্ধে প্রচুর সংশয় এখনও সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে লক্ষণীয়। অধ্যাপক কার্লস মায়ার্স উল্লেখ করেছিলেন যে ভারতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্কস কমিটির ভূমিকা বিভিন্ন।[২] কোথাও কোথাও এই কমিটি কেবলমাত্র উৎপাদন-সম্পর্কীয় বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করে। অনেক জায়গাতে আবাব ওয়ার্কস কমিটি শ্রমিক পক্ষের ও মালিক পক্ষের মতভেদের বিষয়গুলি আলোচনাতেই ব্যবহৃত হয়; আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনেকটা joint grievance committee-র মতো, যেখানে প্রধানত শ্রমিক-মালিক পক্ষের পূর্বতন চুক্তি,. দ্বিপাক্ষিক স্বীকৃত নীতি বা কারখানার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার প্রতিপালিত না হওয়ার জন্য উদ্ভূত অভিযোগগুলির ফয়সালা হয়ে থাকে। এরকম বিভিন্ন ভূমিকায় ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় যে ওয়ার্কস কমিটির উপযুক্ত ক্ষেত্র যে কি, সে সম্বন্ধে সংশয় ও মতভেদের এখনও সম্পূর্ণ নিরসন হয় নি।

ওয়ার্কস কমিটিগুলির তুলনায় যুগ্ম-পরিচালন সমিতি বা joint-management councilগুলি শুধু সংখ্যাতেই বহু কম নয়, এদের ব্যর্থতা ও সমস্যার পাল্লাও অনেক ভারি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতিবেদনে প্রধানত শিল্প সংস্থার শ্রমিক পক্ষকে কিছু পরিচালনক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ শিল্পগত গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শের প্রেরণাতেই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল। পরে একটি ত্রিপাক্ষিক আলোচনা-চক্রে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলির এক্তিয়ার ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কতগুলি মৌল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক হয় যে কতগুলি বিষয় যুগ্ম-সমিতির কাছে আলোচনার জন্য পেশ করা যাবে ও সমিতি এগুলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে পারবে; অন্য কতগুলি বিষয়ে (প্রধানত কর্মরত কর্মীদের নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) পরিশাসনের দায়িত্ব যুগ্ম-সমিতির উপরেই ন্যস্ত করা হয় কিন্তু এ যাবৎ এ প্রয়াস আশানুরূপ সফল হয় নি। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ৫৩টি যুগ্ম-সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। যদিও এর মধ্যে কয়েকটিতে কাজ ভালো হয়েছে এবং সব মিলিয়ে আগের তুলনায় অবস্থার উন্নতি ঘটছে বলে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় জানাচ্ছেন, তবুও স্থাপিত যুগ্ম-সমিতিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আশানুরূপ কাজ করছে না। সামান্য

২. C. Myers—Industrial Relations in India (Bombay, 1958), p. 222

বিষয়গুলিতেও পরিশাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরে মালিকপক্ষের অনীহা এর সাফল্যের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগত স্তরে সম্পর্ক-নিয়ামক সংস্থাগুলির সাফল্যের পথে প্রধানত যে প্রতিবন্ধকটি সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে এদেশের শিল্প-সম্পর্কের আর একটি মৌল বৈশিষ্ট্য। সরকারী আইন, শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির চাপ ও অনেকাংশে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার ফলস্বরূপ শিল্প-সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট অবয়ব এদেশে গড়ে উঠতে শুরু করলেও, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার আবহাওয়ার পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ, সংশয় ও অবিশ্বাসের ভূমিকাই এদেশের শিল্প-সম্পর্কে এখনও প্রধান। এর কারণ কিছু পরিমাণে জাতীয় অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থার, আর কিছুটা শিল্প-মালিকশ্রেণীর উৎপত্তি ও চরিত্রের মধ্যে নিহিত। অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় শিল্প সংস্থার আয়তন থাকে ছোট, শিল্পের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ স্বল্প ও শিল্পপণ্যের বাজার থাকে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র। বাজারের প্রসার অপেক্ষাকৃত শ্লথগতিতে হয় বলে এবং শিল্পজ্ঞান ও সংগঠননৈপুণ্যের অভাবে শিল্প সংস্থার আয়তন প্রসারে মালিকপক্ষের আগ্রহ থাকে সীমিত। ক্রমপ্রসারমান সংস্থার মালিক যে পরিমাণে শিল্পসহযোগ ও শ্রমিক পক্ষের সন্তোষবিধানে আগ্রহী থাকে, সংস্থার আয়তন প্রসারে অনাগ্রহী মালিকের তা থাকে না। ভারতের শিল্প-সম্পর্কের উন্নতিসাধনে মালিকপক্ষের আগ্রহহীনতার এ এক বিরাট কারণ। এ ছাড়া সাধারণত শিল্প সংস্থার আয় পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় কম বলেও উন্নত ধরনের মজুরি ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে একজন সাধারণ ভারতীয় শিল্পপতির ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে কম।

এ জাতীয় অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও ভারতীয় শিল্পপতিশ্রেণীর গোষ্ঠী-চরিত্রও ভারতে শ্রমিক-মালিক পক্ষের সাধারণ সম্পর্কের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় শিল্পপতিশ্রেণী কিছুটা জমিদার-সামন্তশ্রেণী আর কিছুটা মহাজন-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সফল অংশের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। মালিক পক্ষের মানসিকতায় তাই এই দুই শ্রেণীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। একদিকে যেমন ভারতীয় শিল্পমালিকদের অনেকের মনেই কর্মচারী সম্বন্ধে সামন্ততান্ত্রিক অহমিকা ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বস্পৃহা (authoritarianism) প্রবল, আবার অন্যপক্ষে অনেক শিল্পপতিই বানিয়াসুলভ স্বল্পকালীন লাভের লোভ ও অর্থগৃধ্নুতায় আচ্ছন্ন—আধুনিক শিল্পপতিসুলভ দূরদৃষ্টি ও দীর্ঘকালীন

প্রত্যাশার পরিমাপে তারা অনেকেই অসমর্থ। এই নিবঙ্কুশ কর্তৃত্বস্পৃহা ও অর্থগৃধ্নুতা উভয়ই সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধক।

ভারতের শিল্প-সম্পর্কের অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদেশের শিল্প-বিরোধ নিরসনের কাঠামো। এই কাঠামো পাশ্চাত্যদেশের মতো শ্রমিক-মালিক পক্ষের সমষ্টিগত দর-কষাকষি, দ্বন্দ্ব ও চুক্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নি। মূলত এ কাঠামো বাইরে থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ এ কাঠামোর অবলম্বন নিতান্তই রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারী ক্ষমতা।

১৯৪৭ সালের Industrial Disputes Act অনুযায়ী শিল্প-বিরোধের প্রথম পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনার এবং বিস্তারিত সরকারী সালিশীর ব্যবস্থা থাকলেও, এর মূল ঝোঁক শিল্প-ট্রাইবুনালের এ্যাডজুডিকেশনের উপর। বিশেষত জনস্বার্থে যে কোনো শিল্পবিরোধ সরকার বাধ্যতামূলকভাবে আরবিট্রেশনে পাঠাতে পারবেন, এ ব্যবস্থার ফলে অবশ্যকৃত্য আরবিট্রেশন-ই ভারতের শিল্প-বিরোধ মীমাংসার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলোচ্য বইটিতে ভারতের শিল্প-সম্পর্কের এ রকম প্রধান প্রধান সব বৈশিষ্ট্যের আলোচনা থাকলে, এর উপযোগ বহুলাংশে বেড়ে যেত। আমরা অবশ্য তা পাই নি; কিন্তু শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিল্প-আদালত ও ট্রাইবুনালের রোয়েদাদগুলি (awards) কি ভাবে ভারতের শিল্প-সম্পর্ক ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে, তার সুষ্ঠু ও বিশদ বিবরণ এ বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

শিল্প রোয়েদাদের স্বরূপ ও কয়েকটি প্রধান প্রধান রোয়েদাদ ও তাদের ফলাফল আলোচনার পর শ্রীব্যানার্জি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে অবশ্যকৃত্য আরবিট্রেশনেব ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে শান্তি স্থাপিত হয় নি। অবশ্যই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোয়েদাদের ফলে শ্রমিক পক্ষ বর্ধিত পারিশ্রমিক, বোনাস এবং কর্মগত কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু এগুলি শিল্পে শান্তির পক্ষে পর্যাপ্ত অবলম্বন নয়। শিল্প-বিরোধজনিত ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য বর্তমানে গত দশকের তুলনায় কমে আসছে—কিন্তু শ্রীব্যানার্জি যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে এর জন্য মূলত দায়ী সমষ্টিগত চুক্তি (collective agreements) ও সমষ্টিগত বোঝাপড়ার প্রতি শ্রমিক-মালিক পক্ষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। ত্রিপাক্ষিক পর্যায়ে গৃহীত শিল্প-শৃঙ্খলাবিধি (Code of Industrial Discipline) এবং সাময়িকভাবে চৈনিক আক্রমণজাত জরুরী অবস্থার ফলেও কিছু পরিমাণে

শিল্প-বিরোধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এর জন্য অবশ্যকৃত্য আরবিট্রেশনের কৃতিত্ব কোনোক্রমেই অধিক নয়। এই যুক্তির সঙ্গে বিচারশীল পাঠক মাত্রেই একমত হবেন।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পে শান্তি স্থাপনে অবশ্যকৃত্য আরবিট্রেশনের ভূমিকা যদি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে ১৯৪৭ সালে Industrial Disputes Act প্রণীত হবার পরে কয়েক বছর যখন এই পদ্ধতি শিল্প-বিরোধ মীমাংসায় ব্যাপকতম ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তখনই শিল্প-বিরোধজনিত ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম হত। কিন্তু তা হয় নি। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই তিন বছরে শিল্প-বিরোধজনিত জন-দিবস হানির (man-days lost) সংখ্যা ছিল যথাক্রমে মোট ২,৭২,৪৪,৪৭২ এবং গড়ে বার্ষিক ৯০,৮১,৪৯১; পক্ষান্তরে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিন বছরে শিল্প-বিরোধের ফলে মোট ১৭৫,৭৫,৮৪৮ এবং গড়ে প্রতি বছর ৫৮,৫৮,৬১৬ জন-দিবস হানি ঘটে। শ্রম-বিরোধের তীব্রতা হ্রাসের এই সংকেত মূলত বাধ্যতামূলক মীমাংসার পরিবর্তে ত্রিপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁকেরই ফলস্বরূপ।

ভারতের শ্রমসংক্রান্ত অর্থনীতির উপরে শিল্প রোয়েদাদের ফল আলোচনা প্রসঙ্গেও শ্রীব্যানার্জি উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাধীন-উত্তর যুগে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের বর্ধিত আর্থিক পারিশ্রমিকের হার বহুলাংশে শিল্প-রোয়েদাদগুলির ফলস্বরূপ। এই মজুরি বৃদ্ধির প্রবণতার অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে যদিও অবাধ মজুরিবৃদ্ধি উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য সম্বন্ধকে বিকৃত করে তুলতে পারে, তবুও দারিদ্র্য ও নীচু জীবনযাত্রার মানেব কুপ্রভাব মনে রেখে মজুরিবৃদ্ধি বন্ধ রাখা সমীচিন হবে না। তাঁর মতে মোটামুটিভাবে ভারতে মজুরিবৃদ্ধির হার মুনাফা-বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য রেখেছে। অনেক মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে পারিশ্রমিকের স্তর বাড়লে তার ফলে শিল্পে লোক নিয়োগ কমে যাবে। আলোচ্য বইটিতে এ যুক্তির সমর্থন মেলে না। শ্রীব্যানার্জি উল্লেখ করেছেন যে সাধারণভাবে বিভিন্ন শিল্পে মজুরি-বৃদ্ধির ফলে লোক নিয়োগের পরিমাণ কোথাও বিশেষ হ্রাস পায় নি। তবে এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়ে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রবণতা দেখা গেছে বলে তিনি মনে করেন।

শিল্প বিরোধের ফলে মজুরি যে-সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেড়েছে, সেখানে কামাইয়ের হার (absenteeism rate) কমেছে; কিন্তু শ্রমিকদের কর্মপরিবর্তনের হারের (turnover rate) উপর এরকম সুপ্রভাব দেখা যায় নি। মজুরিবৃদ্ধিব আর একটা সুফল দেখা যায় শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতার উপরে। লেখকের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রভাব সুফলদায়ী হয়েছে, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিছুদিন পরেই মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎসাহ বৃদ্ধির হারে ভাঁটা পড়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটির কয়েকটি বিশেষ গুণ সত্ত্বেও দু-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। এর একটি দুর্বল অংশ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্প-সম্পর্ক ও এ্যাডজুডিকেশনের আলোচনা। এই উপলক্ষে গ্রন্থকার বিশেষভাবে হ্যারড-ডোমার মডেলের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু হ্যারড-ডোমার মডেল প্রধানত কতগুলি অনুমানের ওপর নির্ভরশীল এক-উপকরণ-নির্ভর তত্ত্ব (one factor model)। উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক সর্তগুলি অবিচল ধরে নিয়ে বিশেষ করে পূর্ণ-নিয়োগ (full employment) অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থনৈতিক প্রগতির দূরকালীন সাম্যাবস্থার সর্ত অনুসন্ধানই এর লক্ষ্য। হ্যারড ও ডোমার উভয়েই তাদের নিজ নিজ মডেল উপস্থাপনে উন্নত অর্থনীতির পটভূমি ধরে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশেষত মূলধন-সৃজনের পরিকল্পনার সহায়ক হিসেবে হ্যারড-ডোমার সূত্রকে অনুন্নত দেশগুলি কাজে লাগালেও বিশেষত শ্রমসংক্রান্ত পরিবর্তনীয় (varible) অথবা প্রতিষ্ঠানিক নিয়ামকের (determinant) সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনায় কেবল এই শ্রেণীর মূলধন-নির্ভর মডেলের উপর নির্ভর করা ভ্রমাত্মক। শিল্প-সম্পর্কের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও পারস্পরিক। শিল্প-সম্পর্কের কাঠামো যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ও প্রকৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও শিল্প-সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সঞ্চয়ের হারের উপর শিল্প-সম্পর্কের প্রভাব এ সকল পরোক্ষ প্রভাবের অন্যতম, কিন্তু অনন্য নয়। অথচ শ্রীব্যানার্জি হ্যারড-ডোমার মডেল অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঞ্চয়ের হারের গুরুত্ব দেখিয়ে, ভারতে সঞ্চয়ের হার কিভাবে শিল্প-রোয়েদাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এবং শ্রম-বিরোধজনিত ক্ষতি নিবারণে শিল্প-রোয়েদাদের অসাফল্য; এই দুই কারণের উপর উন্নয়নের মূলধন-সংক্রান্ত সর্তের উপর রোয়েদাদের অনিষ্টকর

প্রভাব দেখিয়েছেন। কিন্তু সঞ্চয়ের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা—এই দুই মূলধন সংক্রান্ত সর্তের উপর পরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও, শ্রমের সরবরাহ, উৎকর্ষ এবং শ্রমনৈপুণ্যের সৃষ্টি (skill-formation) ইত্যাদি উন্নয়নের শ্রম-সংক্রান্ত নিয়ামকগুলি, যা প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, কি ভাবে শিল্প-রোয়েদাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে তার তথ্যপূর্ণ আলোচনা বিশেষ দরকারী ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয় নি।

হ্যারড ও ডোমারের মডেল উপস্থাপনেও কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হল, যা উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনীতির মনোযোগী পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন। হ্যারডের মূল সূত্রে c অর্থে incremental capital-coefficient বা incremental capital-output ratio কিন্তু শ্রীব্যানার্জি তাকে inverse of capital co-efficient বলে ধরেছেন। কিন্তু ‘c’কে incremental capital-coefficient বা ratio of investment to increment in income (এখানে investment মূলধন বা capital-stock এর বৃদ্ধির সমার্থক) ধরলেই হ্যারডের মূলসূত্র Gc=s প্রমাণ করা যায়; কারণ একমাত্র সে অবস্থাতেই বলা চলে যে,

$$Gc=\frac{\Delta y}{y}.\quad \frac{1}{\Delta y}=\frac{1}{y}=\frac{S}{y}=s$$

or, G=s/c.

(সঙ্কেতের অর্থ: G= উন্নয়নের হার অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার; I=বিনিয়োগ অর্থাৎ মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি; C=incrimental capital coefficient অর্থাৎ বিনিয়োগ বা মূলধন-বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাত; S=সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ; s=সঞ্চয়ের সঙ্গে জাতীয় আয়ের অনুপাত অর্থাৎ সঞ্চয়ের হার)।

হ্যারডের মডেল সম্বন্ধে লেখকের এই ভ্রমের ফলেই তিনি সঞ্চয়ের হারকে capital-output ratio-র বিপরীতের (reciprocal) সমার্থক ধরেছেন (p. 172)—যা সর্বাপেক্ষা ভ্রমাত্মক। এই ভুলের জন্যই কিভাবে শিল্প-সম্পর্ক capital-output ratio-কে প্রভাবিত করে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একবারও না তুলে কেবল সঞ্চয়ের হারের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

ডোমারের মডেল আলোচনাতেও কিছু ভুল দেখা গেল। সে সম্বন্ধে

বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা লেখককে পরবর্তী সংস্করণে বইয়ের এই অংশটি নতুন করে লিখতে অনুরোধ করব।

এ জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি স্বল্পালোচিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হিসেবে *Industrial Awards and Industrial Relations in India* বইটিকে আমরা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাব। তথ্যগত-সমৃদ্ধি এবং বিশেষ করে রোয়েদাদগুলি কিভাবে শ্রম-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য আলোচ্য বইটি শ্রম-আন্দোলন ও শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

নিশীথ কর

মার্কসীয় দর্শন ও নতুন যুগ

জনসাধারণ ও দর্শন—এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে সুদূর। বিদগ্ধজনের বিশুদ্ধ দর্শন-আলোচনা বা ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চা চলে গজদন্তমিনারে—অর্থাৎ জনসাধারণের জীবন-সংগ্রাম থেকে তা বহু দূরে। জনসাধারণের জীবনে দর্শন-চর্চার স্থান নেই। শোষিত শূদ্রের পক্ষে, দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু তাই বলে কি মনে করতে হবে শূদ্রের মন ছিল একেবারে দর্শনশূন্য? চিত্তের পক্ষে কি সে শূন্যতা সম্ভবপর? সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে তাদের মনেও কি কোনো দর্শন গড়ে ওঠে নি? হয়তো তা অলিখিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত, এই পর্যন্ত বলা চলতে পারে, কিন্তু তা ছিল। আসলে কোনো মানুষের মনই দর্শনশূন্য নয়। দেশে দেশে শোষিত মানুষও তাদের নিজের দর্শনের অপ্রতুল পরিচয় দিয়েছে। আমাদের দেশে চর্বাকবাদ, প্রাথমিক বৌদ্ধবাদ, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতিতে—এরূপ দর্শনের পরিচয়। এ সব কোনো কোনো দর্শন ছিল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-বিরোধী যুক্তিবাদী, স্বভাববাদী বা বাস্তববাদী। ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে বিদগ্ধজনের হাতে এ সব দর্শন কোথাও ভাববাদী কোথাও ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কিন্তু সে যাই হোক, এই ভাববাদী বা ঈশ্বরবিশ্বাসী দর্শনকেও আশ্রয় করে তারই মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে শোষিতেরা তার শোষণের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে। তবে শেষোক্ত দ্বন্দ্বাকীর্ণ দর্শনদৃষ্টি তাদের সংগ্রামে সুসংগত ভাবে সম্পূর্ণ সহায়ক হতে পাবে নি বা পারে না। উনিশ শতকের ইউরোপে কার্ল মার্কসই প্রথম তাই শোষিত জনের একটি সুসমঞ্জস সম্পূর্ণ দর্শন দিয়েছিলেন তার শোষণের জগতকে বদলে শোষণহীন জগৎ সৃষ্টি করার জন্য।

Marxist Philosophy—V· Afanasyev. foreign Languages Publishing House, Moscow. Re. 1·75.

আমাদের দেশে কিন্তু শোষিত জনের এই মার্কসীয় দর্শন আজ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত নয়। আমাদের দেশে আজও দেখি শোষিত জনসাধারণ—এমন কি শ্রমিক-কৃষকও—তাদের দেশের সেই পুরাতন ভাববাদী দর্শন, অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র-পুরাণ, কোরান, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বপূর্ণ ভাব-ভাবনাকে ধরে আছে। আবার কিন্তু অন্য দিকে দেখি সেই দর্শনকে আশ্রয় করেই তার শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। এ লড়াই সীমিত, আর নানা দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ। তাই আমাদের দেশে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামে মার্কসীয় দর্শনের প্রচার আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু একশ্রেণীর ইংরাজি-শিক্ষিত প্রগতিশীল বিদগ্ধজনের মধ্যেই আজও এ দর্শনের আলোচনা-চর্চা চলে, সাধারণ্যে সুপরিচিত নয়।

পাঠক-সাধারণের জন্য লিখিত মার্কসীয় দর্শনের নতুন বই তাই স্বভাবতই কৌতূহল সৃষ্টি করে। মস্কো থেকে প্রকাশিত ও ইংরাজিতে অনূদিত ভি. এফানাসিয়েভের 'মার্কসীয় দর্শন' কিন্তু মনে হয় ওই ইংরাজিশিক্ষিত প্রগতিশীল মহলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ইতিপূর্বে মার্কসীয় দর্শনের একটি 'টেক্স্ট বুক' রুশদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু এখন তা পুরাতন হয়ে গেছে। এফানাসিয়েভের নতুন বইটিতে বিশ, একুশ ও বাইশতম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে দুটি অংশে দর্শন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনা করা হয়েছে। ইংরাজিতে এ সবের আলোচনার সঙ্গে আমরা অবশ্য ইতিপূর্বেই পরিচিত এবং ইংরাজি পাঠক সাধারণও মরিস কর্নফোর্থ, জন্ লুইস্, হাওয়ার্ড সেলসাম প্রভৃতির লেখা মার্কসীয় দর্শনের বই-এর সঙ্গেও পরিচিত। সেই সব বই-এর সঙ্গে তুলনা করলে এফানাসিয়েভের রচনার বিশেষ কোনো অভিনবত্ব তাই চোখে পড়ে না—তবুও এ বই-এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রুশ লেখক কর্তৃক ইউরোপীয় দর্শন আলোচনার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের নজির উল্লেখ সত্যই প্রশংসনীয়। এই স্বল্প আলোচনা ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ইউরোপীয় মার্কসবাদীদের যে কৌতূহল বেড়েছে এইটেই আনন্দের কথা।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—রুশ দর্শনের আলোচনা। সাধারণ ইউরোপীয় দর্শন-আলোচনায় সচরাচর রুশ দর্শনের উল্লেখ দেখি না। তা ছাড়া মার্কসীয় দর্শন-আলোচনাতেও ইংরাজি লেখকদের রুশ-দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে রুশ সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রুশ দর্শন সম্বন্ধেও কৌতূহল বেড়েছে। তবে সে কৌতূহলও উনিশ শতকেই সীমাবদ্ধ : বেলিনিস্কি, হেরজন্,

চের্নিসেভস্কি, ডব্রলিউবভ্, পিসারেভ—শুধু এই রকম কয়েকজনের নামই আমাদের কাছে কিছুটা পরিচিত। কিন্তু আঠারো শতকের দার্শনিক সম্বন্ধেও এই বই-এ কিছু আলোচনা আছে।

তবে সাম্প্রতিক রুশ-দর্শন—অর্থাৎ বিপ্লবোত্তর রুশ দর্শনের আলোচনার অনুপস্থিতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। বিশ্বের যে দেশ বিপ্লবের প্রথম আশীর্বাদ লাভ করেছিল—সে দেশের নানামুখী রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রেও কি রূপান্তর ঘটল তা জানবার জন্য মন স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে থাকে। তা ছাড়া, আজকের নতুন যুগে সোভিয়েত জনসাধারণের মনে কোনো নতুন দার্শনিক প্রশ্ন জেগেছে কি না তাও জানবার লোভ সংবরণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার সাম্প্রতিক বুর্জোয়া দর্শনে (যথা, এক্‌জিস্‌ট্যানসিয়ালিজম্, নব্য পজিটিভিজম্, প্র্যাগমাটিজম্ প্রভৃতি দর্শনে) যে-সব তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধেও মার্কসীয় দর্শনের কিছু নতুন বক্তব্য এই বই-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিক থেকে তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিককালে পোলাণ্ডে দর্শনালোচনায় যে একটু-আধটু নতুন দার্শনিক প্রশ্ন তোলার প্রচেষ্টা দেখেছি তা এই বই-এতে তো নেইই—অন্য রুশ দর্শনের বই-এও বিরল। এই প্রসঙ্গে পোলিশদেশীয় দার্শনিক আদাম শাফ-এর ইংরাজি অনুদিত সাম্প্রতিক বই 'মানুষের দর্শন'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পণ্ডিতজনের জন্য লেখা নয়—এ বই পাঠক সাধারণের জন্যই লেখা। কিন্তু এখানে মামুলী ছেঁদো সরকারী কথা দিয়ে সাধারণ মনের সহজ দার্শনিক প্রশ্নের গলা টিপে দেওয়ার প্রয়াস নেই। সাম্প্রতিক দুনিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে সাধারণ (ইউরোপীয়) মানুষের মন—সমাজতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও—যে-সব নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তারই কিছু আলোচনা করার সুন্দর প্রয়াস দেখি আদাম শাফের বই-এ। এ ছাড়াও, পোলাণ্ডের 'পোলিশ পার্সপেক্‌টিভস্' পত্রিকার একাধিক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে যা সচরাচর দেখা যায় না। তবে আদাম শাফের রচনার কথা বাদ দিলে মোটামুটিভাবে সমাজতান্ত্রিক জগতের সর্বত্রই দেখি রচনাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য : সেটি হল পুরাতন উদ্ধৃতির প্রতি এক সুবিরাট আকর্ষণ। আলোচ্য বইটিও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ সব যুগের —এমন কি আজকের নতুন যুগেরও—সব সমস্যার শেষ কথাই যেন মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের উদ্ধৃতির মধ্যেই বর্তমান।

অবশ্য যাঁরা যুগটাকে নতুন বলে মানতে নারাজ তাঁরা পুরাতন উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি করুন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যাঁরা যুগটাকে নতুন বলে অভিহিত করছেন তাঁদের পক্ষে অনর্গল মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের প্রাক্তন উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একদিকে নতুন যুগে 'নতুন সাম্যবাদী ইস্তেহার' ঘোষণা করা হচ্ছে, নতুন নীতি প্রচারে বলা হচ্ছে—যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতা আজ অসংগত, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান আজ অত্যাবশ্যক, নিরস্ত্র বিপ্লব আজ সম্ভবপর; আর অন্যদিকে মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের পুরাতন যুগের পুরাতন উদ্ধৃতির দোহাই পাড়া হচ্ছে। চিন্তার এ দ্বন্দ্ব সর্বৈব পরিহার্য।

অর্থা হয় বলতে হবে এটা নতুন যুগ এবং ক্রুশ্চেভ (নানা দোষান্বিত হওয়া সত্ত্বেও) এই যুগের উপযোগী নতুন নীতি নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য এই নীতি মার্কসীয় ঐতিহ্যবাহী কিন্তু তা মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের পুরাতন যুগের অর্থকে বদলে দিয়েছে। ইতিপূর্বে মার্কসীয় তত্ত্বে অবশ্য ছোটখাট রদবদল করা হয়েছে কিন্তু আজকের নতুন যুগের তাগিদে মার্কসবাদে যে একটা বড় রকমের বদল আনা হল তা মার্কসবাদে কিছু নতুন সংযোজন বা তার সম্প্রসারণ। এই বদলকে মার্কসীয় ভাষার সেই কদর্থক 'সংশোধন' কথাটিকে সদর্থক বৈপ্লবিক অর্থে অভিহিত করতে হবে।

আর নয় তো বলতে হবে এ যুগ পুরাতন এবং মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের যুগের অর্থই প্রযোজ্য এবং তাহলে পূর্বোক্ত শান্তিনীতি সম্পর্কে পুরাতন নীতির সংশোধন চলবে না। এবং সংশোধন করলে তা আর বৈপ্লবিক হবে না। আর যদি আজ দানবীয় এটম বোমা প্রয়োগ করে বিশ্বমানবকে বিধ্বস্ত করেও বিশ্ববিপ্লব করতে হয় তো তাই কিন্তু মার্কসবাদের সাবেকী অর্থে করণীয়।

যতদূর মনে হয়েছে এই হল আজকের দুটি বিবদমান সমাজতান্ত্রিক দেশের অন্তর্দ্বন্দ্বহীন তত্ত্বগত মনোভাব।

কিন্তু তত্ত্বগত দ্বন্দ্বহীনতা বা সুসংগতির কথা যাই হোক, সে কথাও আজ গৌণ হয়ে পড়েছে। তত্ত্বগত অসংগতি—বিশেষ করে আজকের তত্ত্বগত মতপার্থক্য কি নিছকভাবে তত্ত্বোদ্ভূত? না, জাতীয় স্বার্থ ও নেতৃত্ব-স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই তত্ত্বগত মতপার্থক্যের উদ্ভব? এই প্রশ্নই আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, এই ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্ব আজ গোপনতার লজ্জা ত্যাগ করে

এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে মনে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব, আদর্শ, দর্শন প্রভৃতির বড় বড় অনেক নীতিবাগীশী কথাই আচরণে (প্র্যাকটিসে) পদদলিত। অর্থাৎ তত্ত্ব (থিয়রী) ও আচরণের (প্র্যাকটিসের) সেই চিরন্তন ব্যবধানের কথাই আমাদের বিশেষ করে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু তবুও সমাজতান্ত্রিক জগতের এই যে সব নানা অশুভ প্রবণতার কথা আজ প্রকাশ পেয়েছে তাও যে এই নতুন যুগের শুভ শক্তির প্রাদুর্ভাবের ফল, এ কথাও স্বীকার করতে হচ্ছে। আজ অতি সাধারণ সমাজতান্ত্রিক মানুষের তাই কর্তব্য হল এই নতুন যুগের নবজাগ্রত শুভ শক্তিগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করে অশুভ প্রবণতাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ।

এই অশুভ প্রবণতারই এক উদ্যোগ দেখছি—মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত মানবতার মর্মবাণীকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা।

সম্প্রতি চউ ইয়াং এই মতের প্রতিধ্বনি করে চীন দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির এক বক্তৃতায় মানবতা সম্বন্ধে যা বলেন তার সংক্ষিপ্তসার হল এইরূপ: মার্কসবাদ মানবতাবাদ নয় এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে আজকের দিনেও মানবতার কথা তোলা শোধনবাদের সামিল। আসলে শোধনবাদীরা মানবতাবাদ বলতে বুর্জোয়া মানবতাবাদকেই বোঝায়। চোদ্দ-ষোল শতকের রেনেসাঁর সময় থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। তা ছাড়া আজকের দিনেও এমন বুর্জোয়া মানবতাবাদী আছেন যাঁদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করা যেতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রলিটারিয়ান কমিউনিজম থেকে ভিন্ন বস্তু। এমন কি আমরা কমিউনিজমকেও মানবতাবাদ বলে অভিহিত করার বিরোধী। ('দর্শন ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংগ্রামী কাজ' শীর্ষক পুস্তিকা, পৃ ২৬-৩০)।

উপরোক্ত পুস্তিকার বক্তব্য হল মানুষের প্রতি মমতা বা প্রেম মার্কসবাদ-সম্মত মানবতাবাদ নয়। সুতরাং আজকের দানবীয় এটম বোমার যুগেও নতুন নীতি ও কৌশল নির্ধারণে মানব-মমতার কথা মার্কসবাদের সমর্থন লাভ করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল মার্কসবাদ কি মানবপ্রীতি, মানবমমতা প্রভৃতি মানবিক গুণের সমর্থক? এর উত্তরে বলা যেতে পারে: নিশ্চয়ই শোষিত পীড়িত মানবের প্রতি মমত্ববোধই মার্কসবাদের মর্মকথা—শোষিত মানুষের যন্ত্রণা

দূরীভূত করে তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করাই মার্কসবাদ-নিহিত মানবতার মূল কথা। অর্থাৎ যুগে যুগে মানুষের নানা নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবিকতার যে-প্রয়াস হয়ে এসেছে, মার্কসবাদ-নিহিত সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা ধনতান্ত্রিক যুগে তারই উত্তরাধিকারী। তবে পূর্বে নির্বিশেষে পীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ মানবিকতা বলে অভিহিত হয়েছে—সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার মর্মবাণী হল শ্রেণীক্লিষ্ট মেহনতী মানুষের প্রতি মমতা। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে কিন্তু এই মমতার আর একটি দিক হল পীড়ক শোষক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা। অবশ্য নানা ভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বযুগের মানবিকতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, এখানে এ দুই-এর মধ্যে ভাব-সাদৃশ্যের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের জীবন-বেদনা দূর করার জন্য যে মানবতা বুদ্ধ টলস্টয় রলাঁ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে উদ্বেলিত করেছিল সেই মানবতাবোধই কার্ল মার্কসকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে মার্কস তাঁর মানবতাবোধকে ইতিহাস-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়ে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার 'পথ' খুঁজে পেয়েছিলেন—তবে সেই শ্রেণীসংগ্রামের 'পথে'ও মানুষের জীবনের প্রতি মমত্ববোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় নি।

মার্কস অবশ্য অন্য ভাবেও এই মানবিকতার আলোচনা করেছেন। নবীন বয়সে alienation-তত্ত্বের দৃষ্টিতে অর্থাৎ শ্রেণীসমাজে মানুষের আত্মসত্তা-বিলুপ্তি ও পুনঃপ্রাপ্তির আলোচনায় মানবিকতার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, কিছুটা লেনিনের শাসনকালে এবং বিশেষ করে স্তালিনের শাসনকালে মার্কসবাদের আচরণে মানবতাবোধের অভাব যেন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হয়তো সে যুগের তাগিদে এ-ব্যাপার অপরিহার্য হয়েছিল। কিন্তু বিগত যুগের কথা যাই হোক, আজকের নতুন যুগে—থার্মো-নিউক্লিয়ার যুগে—মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-তান্ত্রিক নীতি ও কৌশলের নতুন মূল্যায়ন অপরিহার্য।

সাম্প্রতিক কালে আদাম শাফ তাঁর পূর্বোল্লিখিত বই-এ মার্কসবাদ-নিহিত মানবতাবাদের নব মূল্যায়ন করেছেন বলে সত্যই তিনি প্রশংসার অধিকারী। মানবতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার বিশ্লেষণে 'সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ একটি বিশেষ নতুন পরিস্থিতিতে একটি নতুন জিনিস, আবার সুদূর

অতীতের ঐতিহ্যবাহী একটি সাধারণ ধরনের পুরাতন জিনিসও বটে।... প্রতি যুগেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানবতাবাদ ছিল। যে-কোনো যুগের সমাজ-সংস্কারক ও বিপ্লবী আন্দোলন যা সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, অসমতা ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত, শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা মানবতাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই অর্থে প্রাচীনকালীন মানবতাবাদ, খ্রীস্টধর্মের প্রথম যুগের মানবতাবাদ, রেনের্সাঁ, রিফর্মেশন, এনলাইটেন্‌মেণ্ট ও ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের মানবতাবাদের কথা বলতে পারি।"

পৌষের 'পরিচয়'-এ শ্রীঅশোক রুদ্র আদাম শাফের এই মতকে সর্বৈব ভুল বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সর্বৈব নির্ভুল মতটি কি তাই আমরা বিস্তৃতভাবে জানতে কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। যাই হোক, যতদূর মনে হয়েছে বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত মানুষের প্রতি মানবপ্রেম নিশ্চয়ই মানবতার উৎসমূল। এই কথা আদাম শাফ বলেছেন। এবং ইতিহাসে এই মানবিকতার আন্দোলন কখনো কখনো ধর্মকে আশ্রয় করেও প্রকাশ পেয়েছে (যেমন, দাসতন্ত্রবিরোধী খ্রীস্টধর্মের প্রথম যুগের আন্দোলনে বা সামন্ততন্ত্রবিরোধী রিফর্মেশন আন্দোলনে), আবার কোথাও কোথাও এই আন্দোলন ধর্মের বিরোধিতাও করেছে (যেমন, রেনের্সাঁ, এনলাইটেন্‌মেণ্টের আন্দোলনে)।

এ কথা সত্য যে মানুষের উপরে অলীক ধর্মকে রাখলে মানুষকে অবশ্য খাটো করা হয়। তাই শেষ বিশ্লেষণে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ধর্মের অপসারণ চাই। মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের রচনা তাই ধর্ম-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ধর্মের অপসারণ চাইলেই তো সে ইচ্ছা পূরণ হয় না। তাই আবার মার্কসীয় রচনা ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীদের—আপোষহীন বিরোধিতা সত্ত্বেও—মনোভাব হল ঐতিহাসিক। অর্থাৎ শ্রেণীসমাজের গর্ভে ইতিহাসের বিবর্তনে যে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে নিঃশ্রেণী সমাজে তার সম্পূর্ণ অবসান হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এর মধ্যে ইতিহাসে কোনো সময়ে ধর্মের প্রভাব যদি কমে থাকে তো তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়—কিন্তু তা যদি না হয় তো মানব-প্রগতি রসাতলে যায় না। আসলে বিচার

করে দেখতে হয় বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত শ্রেণী-সংগ্রামের তাৎপর্য কি?

এই শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিতে ধর্মের বিশ্লেষণে গোঁড়া ধর্মবিরোধী লেনিন যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লেনিন বলেছিলেন: "We must not in any circumstances fall into the abstract and idealist error of arguing the religious question from the standpoint of 'reason', apart from the class stuggle, as is not infrequently done by bourgeois radical democrats. (*Socialisms and Religion* pamphlet, Moscow, P. 10)

উল্লিখিত পৌষের 'পরিচয়'-এ ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরুদ্রের মনোভাব তাই যেন লেনিন-উক্ত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতো মনে হয়েছে। তা ছাড়া, ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্লবোত্তর অভিজ্ঞতার কথাও বিবেচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, আজকের সমাজতন্ত্রী রুশীয়াতেও শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মের সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব হয় নি। আর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে—বিশেষ করে পোলাণ্ডে—এই ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সহ-অবস্থানের সমস্যা সম্পর্কে নানা আলোচনা চলছে। 'পোলিশ পার্সপেক্‌টিভস্' পত্রিকায় খ্রীস্টান ধর্মের মানবতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবতার মধ্যে যে ভাব-সাদৃশ্য পাওয়া যায় তার উপরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাম্প্রতিক মার্কসবাদীদের এ-ও এক নতুন মূল্যায়ন বা মনোভাব।

যাই হোক, আদাম শাফের মানবতা সম্পর্কীয় মার্কসীয় ধারণাটি অত্যন্ত সমীচীন বলেই মনে হয়েছে। তবে তাঁর এ-ধারণা ইউরোপীয় ইতিহাস-সঞ্জাত। কিন্তু এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ইতিহাসের উপর আলোকপাত করলেও মনে হয় শ্রীরুদ্রের কাছে ভারতীয় ইতিহাসও বোধহয় আর মানবতা-বর্জিত মরুভূমি বলে মনে হবে না।

•

সুজয় মিত্র

মার্কস ও মার্কসবাদী

The Marxists বিখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রাইট্ মিল্স্-এর শেষ লেখা, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়েছে। *The Power Elite, White Collar* প্রমুখ গ্রন্থের লেখক হিসাবে মিল্স্ পশ্চিমের চিন্তাজগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। মার্কসবাদ সম্বন্ধে এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীর সুচিন্তিত অভিমত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আলোচ্য গ্রন্থে মিল্স্ প্রথমত প্রধান প্রধান মার্কসবাদী লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে মার্কসীয় তত্ত্ব ও আন্দোলনের ক্রমবিকাশের একটি ছবি দেবার চেষ্টা করেছেন। মার্কস এঙ্গেল্স্-এর লেখায় পরিস্ফুট 'ক্লাসিক মার্কসবাদ', সোশ্যাল ডেমোক্রাসি, লেনিন-ট্রট্স্কির বলশেভিকবাদ, স্তালিনযুগ, স্তালিনের সমালোচকবৃন্দ এবং বিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী অধ্যায়—এইভাবে ঐতিহাসিক পর্যায় অনুযায়ী উদ্ধৃতিগুলি সাজানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বাকি অংশে মিল্স্ তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও সমালোচনা দিয়ে গিয়েছেন।

নাতিবৃহৎ সংকলনে মার্কসবাদী সাহিত্যের সম্যক পরিচয় দেওয়া সহজ নয়, অনেক কিছু বাদ পড়ে যাওয়া প্রায় অনিবার্য। অবশ্য মিল্স্ নিজেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গোড়াতে বলে রেখেছেন যে তাঁর বইটি একটি 'প্রাইমার' বা প্রাথমিক পুস্তক, মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁদের যৎসামান্য, প্রধানত তাঁদের জন্যই লেখা। তবু মনে হয় মার্কসবাদ সম্পর্কে যাঁরা মোটামুটি নিজেদের ওয়াকিবহাল বলে মনে করেন মিল্স্-এর সংকলন তাঁদেরও কিছুটা কাজে লাগবে। কারণ এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মার্কসবাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জ্ঞান কিছুটা একপেশে। স্তালিন-আমলে অনেক ভাবধারাকে বিচ্যুতি বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া

The Marxists—C. Wrights Mills. (Pelican 1963)

হয়েছিল—সেগুলির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা পর্যন্ত সব সময় রাখা হয় নি। ফলে একদিকে মূল্যবান তত্ত্ব বা সমালোচনা অগ্রাহ্য করা হয়েছে, আবার ভুলগুলিও ঠিক কোথায় বা কেন ঘটেছে তা আমরা স্বাধীনভাবে বুঝতে শিখিনি বলে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়তো সহজ হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, মিল্‌স্-এর সংকলনে স্বল্প-পরিচিত রচনাগুলির মধ্যে সমাজবিপ্লবের চরিত্র সম্বন্ধে কাউট্‌স্কির ১৯০২-এর লেখা, রুশ বিপ্লবের পর রোজা লুক্‌সেমবুর্গ কর্তৃক বলশেভিকবাদের তীক্ষ্ণ অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা, এবং রুশ ইতিহাসের ধারা ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কৌশল সম্পর্কে ট্রট্‌স্কির মতামত আমার বিশেষ করে মূল্যবান মনে হয়েছে। অন্যদিকে শোধনবাদের আদিগুরু বার্নস্টাইনের লেখায় আমরা পাই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমী বুদ্ধিবাদীর প্রায় সকল 'আধুনিক' তর্কের পূর্বাভাষ; আবার "নিরন্তর বিপ্লব" নিয়ে ট্রট্‌স্কির চোদ্দ-দফা আলোচনায় আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের একীকরণ এবং ঔপনিবেশিক জগতের জাতীয় বুর্জোয়া সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই আজকালকার অনেক চীনা লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিল্‌স্-এর নিজস্ব মতামত পর্যালোচনা করতে গেলে মার্কস সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং মার্কসবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পূর্ণ উপলব্ধি প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। একশ বছরের পুরনো তত্ত্ব বলে আর মার্কসবাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই, অথবা সাম্যবাদী 'টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্' পশ্চিমের উদারনৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ভয়াবহ পদার্থ—মার্কিন দেশে যথেষ্ট প্রচলিত এই ধরনের মতামতের তীব্র সমালোচনা মিল্‌স্ করেছেন। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে মার্কসবাদ ও 'ক্লাসিক্ লিবেরালিজ্‌ম্' উভয়েরই সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক ইয়োরোপের ধর্মনিরপেক্ষ মানববাদের ধারা থেকে এবং : "there is no positive *ideal* held by Marx that is not an altogether worthy contribution to the humanist tradition." (পৃঃ ২৮)। শুধু তাই নয়—আদর্শ, উপায় এবং বাস্তব সমাজ-বিশ্লেষণের যে যথাযথ সমন্বয় প্রকৃত রাজনৈতিক ভাবধারার প্রাণ, সেদিক দিয়ে বিচার করলে মার্কসবাদের তুলনায় মিল্‌স্-এর মতে সাম্প্রতিক উদারনীতির-ই অবস্থা সঙ্গীন। ইতিহাসে উদারনীতির ধারক ও বাহক ছিল শহুরে মধ্যশ্রেণী; পশ্চিমে বহুদিন ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার

ফলে তাদের মধ্যে আজ দু-ধরনের ঝোঁক দেখা গিয়েছে—হয় প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকেই লিবেরাল আদর্শের পরাকাষ্ঠা বলে বরণ করা হচ্ছে, নয়তো মানবমুক্তির বাণী বাস্তববর্জিত ভাবমার্গে নির্বাসিত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমের উদারনীতি আজ এক ধরনের রক্ষণশীলতা, কিংবা নিছক বুদ্ধিবাদীর বিলাস। পৃথিবীর অনগ্রসর অঞ্চলে আবার ঠিক ইউরোপের মতো বুর্জোয়া শ্রেণী খুঁজে পাওয়া কঠিন, তাই সাবেকী উদারনীতি সেখানে অনেকটা অবান্তর (পৃঃ ২৯-৩১)।

অন্যদিকে মার্কসবাদ পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে এই বাণী নিয়ে এসেছে যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নিয়তির বিধান নয়, তার সামাজিক কারণ শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব—সকল তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে এখানেই রয়েছে মার্কসবাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস (পৃঃ ৩০)। দ্বিতীয়ত, মিল্‌স্‌-এর মতে মার্কসবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আদর্শ, উপায়, এবং সমাজ-বিশ্লেষণের মধ্যে নিবিড় যোগ—পূর্বেকার স্বপ্নবিলাসী সমাজবাদের সঙ্গে মার্কসের পার্থক্য এইখানে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে মার্কসের পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করলে মিল্‌স্‌-এর মতে সমাজবিজ্ঞানকেই পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ম্যাক্স ওয়েবার, থরস্টাইন্‌ ভেবলেন, কার্ল ম্যানহাইম্‌ প্রভৃতির কাজ মার্কসকে বাদ দিলে কল্পনাই করা যায় না: "Without question, Marx belongs to the classic tradition in sociological thinking ; in fact, it is difficult to name any other one thinker who within that tradition is as influential and as pivotal as he." (পৃঃ ৩৬)।

সাম্প্রতিক মার্কিন সমাজবিজ্ঞান মার্কসকে অস্বীকার করতে গিয়ে অনেক সময় গোটা ক্লপদী ঐতিহ্যটাকেই ভুলে যাচ্ছে। মিল্‌স্‌ এই ধরনের সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনা করে বলছেন: "It is a social science of the narrow focus, the trivial detail, the abstracted almighty unimportant fact." (পৃঃ ১২)। বিচ্ছিন্ন অবস্থার অনৈতিহাসিক চর্চা এবং সামাজিক স্থিতাবস্থা মেনে নেবার ঝোঁকের বিরুদ্ধে মিল্‌স্‌ নিজেও আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মিল্‌স্‌ অবশ্য মার্কসবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি, আলোচ্য গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বরং তার বহু সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু মার্কস-নিন্দার প্রচলিত রীতি থেকে মিল্‌স্‌-এর পার্থক্যটা লক্ষণীয়। গোড়ায় তিনি সংক্ষেপে মার্কসের মতবাদ নিজের ভাষায় সাজাবার চেষ্টা করেছেন, তারপরে 'Rules for Critics' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সমালোচনার সঠিক ও অন্যায় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তবেই নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি নিজের তৈরি নিয়ম মেনেছেন বলে আমার মনে হয় না, তবু পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই অনুকরণযোগ্য।

অনুসন্ধানের পদ্ধতি (method), সমাজ-বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক কাঠামো (model) এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত বা theory —এই তিন দিক থেকে মিল্‌স্‌ ক্লাসিক্‌ মার্কসবাদের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় দিকটি সম্পর্কে মিল্‌স্‌-এর বক্তব্য বিশেষ অভিনবত্ব দাবি করতে পারে না—উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে তথাকথিত ক্রমবর্ধমান দুর্দশার তত্ত্ব অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে, নতুন মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হচ্ছে, তীব্রতর শ্রেণী সংগ্রামের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে না—ইত্যাদি পুরনো কথাই তিনি বলেছেন। এই বহু-পরিচিত তর্কে প্রবেশ করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়, শুধু মনে হয় মিল্‌স্‌ যখন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেন মূলত মার্কিন দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে (পৃঃ ৪৫০), তখন সমালোচনার রীতি সম্বন্ধে নিজের তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তিনি মানছেন না। মিল্‌স্‌ নিজেই বলেছেন: "Lessons from historical events are not as easy to draw as many critics seem to believe" (পৃঃ ১০১)—সাধারণ ঝোঁক বিচার করতে গেলে কতটা সময় বা কোন অঞ্চল আমরা বেছে নেবো, সেটাই হল সমস্যা। শুধু গত কয়েক দশকে মার্কিন ধনতন্ত্রের আর্থিক সাফল্য দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অনুচিত, এ কথা মিল্‌স্‌ এক জায়গায় স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত মনে হয় এই ধরনের কিছুটা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই হল সমগ্র মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার ভিত্তি।

মার্কসবাদের সমাজতাত্ত্বিক 'মডেল', অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে মিল্‌স্‌ বলেছেন—উনবিংশ শতাব্দীতে এর গুরুত্ব অপরিসীম থাকলেও আধুনিক বিচারে এটি অতি-সরল, কিছুটা যান্ত্রিকতার দোষে দোষী। বরং তার জায়গায় তিনি তাঁর নিজের 'Power Elite' তত্ত্বটি প্রচার করার চেষ্টা করেছেন—শাসক-সম্প্রদায়ের ক্ষমতার মূল ভিত্তি তাঁর মতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা

সামরিক, বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তাই আলোচনার গোড়াতেই আর্থিক কাঠামোকে মৌলিক বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। এখানে কিন্তু আমার মনে হল মিল্‌স্‌-এর মার্কসবাদ ব্যাখ্যার মধ্যেই (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) কিছু গলদ রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন "it is doubtful that either base or superstructure can be used (as Marx does) as units, for both are composed of a mixture of many elements and forces" (পৃঃ ১০৪)—এ বিষয়ে মার্কসের উপলব্ধি যে মোটেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর ঐতিহাসিক লেখা, বিশেষ করে Eighteenth Brumaire, পড়লেই তা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, মিল্‌স্‌-এর মতে মার্কস মূলত একতরফা "economic determinism"-এ বিশ্বাসী। শেষ জীবনে এঙ্গেলস তাঁর চিঠিপত্রে অবশ্য সমাজ-জীবনেব বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের দিকে জোর দিয়েছিলেন কিন্তু এর ফলে শুধু তত্ত্বের কৌলীন্য নষ্ট হয়েছে : 'to dilute the theory in these ways is to transform it from a definite theory, which may or may not be adequate into equirocation, a mere indication of a problem." (পৃঃ ৯২)। মিল্‌স্‌-এর প্রিয় 'Power Elite' তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমরা ঠিক এই অভিযোগটাই করতে পারি না কি? মিল্‌স্‌-এর মার্কস-ব্যাখ্যায় সব ধরনের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ শ্রমিকের বাড়তি উৎপাদন অপহরণের অত্যন্ত মৌলিক মার্কসীয় তত্ত্বটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নি—সেই জন্যই বোধহয় ধনতন্ত্রে বাড়তি মূল্যের আলোচনাকে তিনি "labour metaphysic" বলে কিছুটা হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

মার্কসের পদ্ধতি বা 'মেথড'—সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে দেখবার ক্ষমতা ('encyclopaedic scope'), ইতিহাস-বোধ, এবং (বিশেষ করে অল্প বয়সের রচনায়) ব্যক্তি-মানসের উপর সমাজব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে অভিমত—মিল্‌স্‌-এর মতে অবশ্য আজও মূল্যবান (পৃঃ ৩৭-৪১)। তাঁর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যাকে তিনি বলেছেন "principle of historical specificity"—ইতিহাসে পর্যায় ভাগ রয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্তার কাঠামোর পরিবর্তনও দরকার হয় : "conceptions and categories are not eternal, but are relative to the epoch which they concern" (পৃঃ ৩৯)। তবে মার্কসের পদ্ধতিকে মিল্‌স্‌ তথাকথিত

"ডায়েলেক্‌টিক্‌স্‌-এর নিয়মের" ছকে ফেলতে রাজী নন—তাঁর কাছে ডায়েলেকটিক্‌স্‌ মূলত হেগেল থেকে প্রাপ্ত একটি প্রকাশভঙ্গি মাত্র, যার মাধ্যমে মার্কস অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিকতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কিন্তু যাকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে একটি উচ্চতর লজিক রূপে খাড়া করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি (পৃঃ ১২৮-১২৯)। কথাটা মার্কসবাদীর কাছে অপ্রিয় শোনালেও অন্তত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লাইসেন্‌কো-অভিজ্ঞতার পর একেবারে অস্বীকার করতে সাহস হয় না।

ক্লাসিক মার্কসবাদ আলোচনার পর মিল্‌স্‌ তাঁর সপ্তম পরিচ্ছেদে মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করেছেন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতি স্পষ্টতই তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাতীয়তাবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার ফলে : "the only thing that the social democrats have succeeded in nationalizing is socialism itself" (পৃঃ ১৩৫); রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক অবদান এবং তার পরের চল্লিশ বছরের পরিবর্তনশীল সোভিয়েত সমাজ বুঝবার তাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেন নি : "Social democrats ·· began their criticism of bolshevism in October 1917, and have not yet stopped. For them, in all truth, nothing much has changed" (পৃঃ ১৪৮)। সোভিয়েত মার্কসবাদের অতীতের ও বর্তমানের অনেক কিছু মিল্‌স্‌ও পছন্দ করেন না, তবু তিনি সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন। স্তালিনবাদের পীড়াদায়ক দিকগুলি অনেকটা কঠোর বাস্তব অবস্থারই প্রতিক্রিয়া, পশ্চাদপদ দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নে সে-যুগের অবদানও অস্বীকার করা যায় না (পৃঃ ১৪০-১৪৪)—তাই জন্য সোভিয়েত অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে "terrible and wonderful" (পৃঃ ৪৫৫)। সঙ্গে সঙ্গে বিংশ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মিল্‌স্‌ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন : "Since the death of Stalin, we have been reminded by events that marxism—however monolithic irrational and dogmatic a cread under Stalin—is, after all, an explosive and liberating creed, and that the ends for which Marx hoped and which are built into his thought, *are* liberating ends." (পৃঃ ৪৫৪)। একই সময় কিন্তু মিল্‌স্‌-এর মতে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের সমর্থনপুষ্ট 'লিবেরালিজম্‌' ক্রমেই ঔদার্য হারিয়ে ফেলছে।

মিল্স্-এর মার্কসবাদী রচনার সংকলন ১৯৬১-তে করা হলেও এতে 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক' জাতের চীনা লেখা স্থান পায় নি দেখে একটু অবাক লাগতে পারে। মাও ৎসে তুং-এর একটি রচনা অবশ্য রয়েছে—কিন্তু সেটি হল শত পুষ্পের বিকাশ সম্বন্ধীয় ১৯৫৭-র লেখা। মনে হয় মিল্স্ তাত্ত্বিক দিক থেকে বর্তমান চীনা মার্কসবাদকে বিশেষ মৌলিক গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, স্তালিনযুগের রাশিয়ার মতো পশ্চাদপদ অবস্থার প্রতিফলন রূপেই তিনি একে দেখেছিলেন। স্পষ্টতই পশ্চিমের কিছু বাম-ঘেঁষা বুদ্ধিবাদীদের মতো মিল্স্ চীনের মেকী বিপ্লবীপনায় অভিভূত হয়ে যান নি। বরং তোগলিয়াত্তি, কার্দেলি এবং পোলিশ লেখার মধ্যেই তিনি বর্তমান যুগের উপযোগী মার্কসবাদের বিকাশের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন।

মার্কসবাদের অনেক কিছু সমালোচনা করলেও মার্কসের মানব-মুক্তির আদর্শের প্রতি মিলস্-এর সমর্থন অকৃত্রিম বলেই মনে হয়। সেই আদর্শ বাস্তবে কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সে-বিষয়ে তাঁর আশা মিল্স্ একটি প্রশ্নের আকারে রেখে তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন: "Is it merely wishful thinking to ask whether a society conforming to the ideals of classic marxism might not be approximated, via the tortuous road of stalinism, in the Soviet world of Khrushchev and of those who will follow him? (পৃঃ ৪৫৬)।

প্রদ্যোৎ গুহ

মার্কসবাদ ও ভারতবোধ

'অল্পে সুখ নেই' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সংকলন। নানা সময়ে লেখা মোট বারোটি প্রবন্ধ এই সংকলনে একত্র করা হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে চার ভাগে এই প্রবন্ধগুলিকে ভাগ করা যায়—ইতিহাস, সাহিত্য, ক্রিকেট, ও সাম্প্রতিক রাজনীতি। এর মধ্যে সাহিত্যই প্রাধান্য পেয়েছে। সংকলনে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ছটি—তার মধ্যে তিনটি আবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।

নানা বিষয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করার কৈফিয়ৎ হিসাবে মুখবন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন: "আমার মনে ঐ বিবিধ প্রবন্ধে আপাতপ্রভেদ সত্ত্বেও একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে। যদি পাঠকের মন তাতে সায় দেয় তো সুখী হব।"

ঐক্যসূত্র নেই যে তা বলতে পারি না। একই ব্যক্তি যখন একাধিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন তার সেই সব রচনায় অবশ্যই প্রতিভাত হয়—এবং তাকে নিশ্চয়ই ঐক্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেদিক থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য পাঠক হিসাবে মেনে নিতে পারা যায়, কিন্তু সমালোচকের সমস্যা তাতে মেটে না।

নানা গুণ সন্নিপাতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতো চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এ যুগে বিরল। তিনি একাধারে সুপণ্ডিত, অধ্যাপক ও তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক, সুবক্তা এবং সুলেখক। নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল। সাহিত্য থেকে রাজনীতি, ইতিহাস থেকে চিত্রকলা, দর্শন থেকে ক্রিকেট পর্যন্ত নানা বিষয়ে তার অবাধ আনাগোনা। তাঁর সমস্ত ভালোবাসাগুলিকে তিনি যদি এক মলাটের নিচে একত্র করেন তো তার সঙ্গে তাল রাখা আমাদের মতো ক্ষীণজীবী সমালোচকদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, অভ্যস্ত চিন্তার গণ্ডির বাইরে তিনি এমন নিঃসংকোচে চলাফেরা করেন এবং

অল্পে সুখ নেই। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়। চার টাকা।

নির্দ্বিধায় বিতর্কমূলক প্রতিপাদ্য উপস্থিত করেন যে তার সম্যক আলোচনা একটি ছোট নিবন্ধের পরিসরে প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সে চেষ্টা, অতএব, করা হবে না। যদিও ইতিহাস-বিষয়ক অংশে 'ভারতীয় সংহতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি আজকের পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় অনেক অনুধাবনযোগ্য কথা বলেছেন এবং যদিও 'ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল' একটি উপাদেয় রচনা—আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে মোটামুটি তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে। এই তিনটি প্রবন্ধ হল: 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' এবং 'অল্পে সুখ নেই'। প্রথম দুটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পরিচয়-এই প্রকাশিত হয়েছে এবং শেষোক্ত প্রবন্ধটি সংকলনটির নাম প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধ তিনটিতে মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণ, সোভিয়েত-চীন মতভেদকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসে স্তালিন-ব্যক্তিতন্ত্রের নিন্দাপ্রসূত বুদ্ধিজীবীমহলে দ্বিধা ও সংশয় ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ-সব প্রশ্ন আজকের দিনে অনেক বুদ্ধিজীবীকেই আলোড়িত করছে। সুতরাং, তা অবশ্যই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

দুই

মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি শ্রীমুখোপাধ্যায় খুব জোরালোভাবে উত্থাপন করেন 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' প্রবন্ধটিতে, পরিচয়-এর পৃষ্ঠায়, ১৩৬৮ সনের শারদীয় সংখ্যায়। প্রবন্ধটির উপলক্ষ ছিল শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সংকলনের অন্তর্গত শ্রীসুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' নামক রচনাটি। বিতর্কের বিষয় ছিল, বাঙালী রেনেসাঁসের যা অন্তর্দ্বন্দ্ব, শ্রীসরকারের ভাষায় 'প্রাচ্যাভিমান' ও 'পশ্চিমী দৃষ্টির' দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথে তা কতটা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা।

আজকে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, হীরেনবাবুর প্রবন্ধের বক্তব্য বিশেষ করে তাঁর ভাষার তীব্রতা সেদিন আমাদের অনেককেই বিস্মিত করেছিল। সুশোভনবাবু তাঁর প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তা মোটের উপর মার্কসবাদীমহলে স্বীকৃত ছিল—যদিও 'প্রাচ্যাভিমান' ও 'পশ্চিমী দৃষ্টি'

এই দুটি নতুন পদের (term) ব্যবহারে হয়তো বা কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ ঘটেছিল। কিন্তু পরিচয়-এর পরবর্তী সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৬৮) কি অর্থে তিনি ঐ নতুন পদ দুটি ব্যবহার করেছিলেন সুশোভনবাবু তা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং হীরেনবাবুর অন্য আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, হীরেনবাবু সে ব্যাখ্যা বা সে বক্তব্য গ্রহণ করেন নি, পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি তিনি একটি কমা-সেমিকোলনও না বদলে, আলোচ্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা হীরেনবাবুর পক্ষে অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল, কেননা সুশোভনবাবুর প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে আসলে তিনি মার্কসবাদের ভারতীয়করণ বিষয়ে একটি নতুন তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তাই দেখি পরবর্তীকালে লেখা তাঁর প্রবন্ধসমূহে তিনি বারে বারেই ঘুরে-ফিরে সেই একই বিষয়ে ফিরে এসেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' প্রবন্ধে যে বক্তব্য কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল, 'অল্পে সুখ নেই' এবং তারও পরে লেখা 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' (পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৭০) প্রবন্ধে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে, সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

মার্কসবাদের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং ভারতবর্ষে মার্কসবাদ একটা চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি (decisive force) হিসাবে দেখা দিতে পারবে কি না তা অবশ্যই এই প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করছে। মার্কসীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সমাজবাস্তবতা ইত্যাদির অনুশীলনের অপ্রতুলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা বিষয়ে হীরেনবাবুর তিরস্কারও শিরোধার্য। কিন্তু হীরেনবাবু যখন লেখেন: "মনে পড়ছে রজনী পাম দত্তের কথা যে পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই যখন সমাজবাদের বাস্তব উদ্ভব, তখন ইয়োরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত" (রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ), তখন হীরেনবাবুর ভাষাতেই বলতে হয়: "আর্ষবাক্য বলেও মানতে পারি না তাঁর কথা।" রজনী পাম দত্তের মত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তিনি কোথায় এ-কথা বলেছেন হীরেনবাবু যদি তার হদিশ দিতেন, কি প্রসঙ্গে এবং কি ভাবে তিনি ও-কথা বলেছেন তা আমাদের খতিয়ে দেখার সুযোগ হত।

কিন্তু সে যাই হোক, ইতিহাসের কারবার কি হতে পারত তা নিয়ে

নয়, কি হয়েছে তাই নিয়ে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে মার্কসের জন্ম জর্মানিতে এবং কর্মস্থল ইংলণ্ড। ইংলণ্ড ছিল সে সময়ের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ। এই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মার্কস তাঁর অনেকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বলতে কি, মার্কসবাদ উনিশ শতকের মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য—জর্মান দর্শন, ইংরেজি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও ফরাসী দর্শনের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী। (It is the legitimate successor to the best that was created by mankind in the nineteenth century in the shape of German philosophy, English political economy and French Socialism.—Lenin: The Three Sources and Three Component Parts of Marxism)। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, পশ্চিমেই যার প্রথম বিকাশ হয়েছিল, তারই এক বিশেষ স্তরে মার্কসবাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল; মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে। কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু সত্য তাই তা সর্বজনীন। নিউটনীয় গতি-তত্ত্ব (যার প্রয়োগক্ষেত্র হয়তো সীমাবদ্ধ) ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষে কি আপেল গাছ থেকে মাটিতে না পড়ে শূন্যে উঠে যায়! নানা বিজ্ঞানের যা শ্রেষ্ঠ ফল—আজও পর্যন্ত যা পশ্চিম থেকেই আমদানী হয়ে থাকে—তা ভোগ করতে কেউ তো দ্বিধা করে না। আমাদের বাড়ির অনতিদূরে হিন্দুদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুদের একটি মঠ আছে। একদিন কানে এল সেখানে এক বক্তা উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করছেন। বক্তৃতা কিন্তু হচ্ছিল 'মাইক' সহযোগেই এবং মঠে বিজলী বাতির সমারোহও কিছু কম ছিল না।

কোনো তত্ত্ব, কোনো বিশ্ববীক্ষা—তা যদি সত্য হয় তবু বিদেশ হতে আগত বলেই তা বর্জন করতে হবে—এ-মনোভাব নিশ্চয়ই কূপমণ্ডূকতা। আর এ-কূপমণ্ডূকতাকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

মার্কসবাদ কতকগুলি আপ্তবাক্যের সমষ্টি নয়, মার্কসবাদ একটি বিশ্ববীক্ষা, একটি পদ্ধতি। মার্কসবাদ কর্মের পথপ্রদর্শক। এবং এই হিসাবেই এই দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণ প্রয়োজন এবং সম্ভব।

সমসমাজের কল্পস্বর্গীয় আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করেছে এবং এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে এ-দেশেও নানা

সময়ে নানা ভাবে এই আদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছে। হীরেনবাবু সংগতভাবেই এর উল্লেখ করেছেন। এবং এই হিসাবে মার্কসবাদ আকাশ-থেকে-পড়া অভিনব কিছু বস্তু নয়। কিন্তু আবার এক হিসাবে মার্কসবাদ সম্পূর্ণ নতুন। সেদিনকার সেই সমসমাজের কল্পনা, বা সমানাধিকারের ধারণা আর আজকের সমানাধিকারের ধারণা এক নয়। সব মানুষই ঈশ্বরের অংশ, বা সব মানুষের মধ্যেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ঐক্য আছে—এই দিক দিয়ে বিচার করলে সব মানুষ সমান—এই ছিল সেকালের সাম্যের ধারণা। খৃস্টধর্ম মনে করে সব মানুষই আদি পাপের অংশ নিয়ে জন্মেছে, সেদিক থেকেই তারা সমান। আজকের দিনে সমানাধিকার বলতে আমরা বুঝি মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকার। এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে তা না বললেও চলে। হীরেনবাবুর এ-সব কথা জানা নেই—এমন ইঙ্গিত করার মতো ঔদ্ধত্য আমার নেই। কিন্তু তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে সেই অবহিতির উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি বললেও অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী হব। বরং তিনি যখন "কার্ল মার্কসের প্রিয় উক্তি"—'Man is the measure of everything'-এর সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' পংক্তিটির তুলনা করেন তখন উল্টোটাই মনে হয়। কেননা, চণ্ডীদাসের এই মানুষ আসলে দেহ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলতে চণ্ডীদাস 'সবার উপরে দেহ সত্যই' বুঝিয়েছেন। আজ আমরা পংক্তিটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করি তার মধ্যে অনেক পরিমাণে আমাদের নিজস্ব চিন্তা মেশান থাকে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বেদ-উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যেও তাঁর আপন মনের মাধুরী অনেকখানি মিশে আছে আর সে মন বহুল পরিমাণে "পশ্চিমী দৃষ্টি" প্রভাবিত। কথাটা হীরেনবাবুর সম্পর্কেও প্রযোজ্য কিন্তু তিনি নিজে এ-সম্পর্কে সচেতন না থাকায় গোলযোগ বেধেছে।

ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর অশ্রদ্ধাশীল উক্তিতে হীরেনবাবু সংগতভাবেই রুষ্ট হয়েছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় দিকগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, ভারতীয় বস্তুবাদ বিশেষ করে লোকায়তিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে মনে হয় হীরেনবাবু অন্ত আর এক চরম মতের দিকে ঝুঁকেছেন। নইলে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতি বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য অভিঘাতের ফল—এ-প্রস্তাবে

হীরেনবাবু এত ক্রুদ্ধ হবেন কেন? আর এর মধ্যে "পশ্চিম ইয়োরোপের বদান্যতার" প্রশ্নই বা আসে কী করে? হীরেনবাবু আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে নিজেই তো বলেছেন: "...অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজ এদেশে ইতিহাসের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, তার এদেশ জয় এবং শাসনের ফলে ইতিহাসের চাকা এগিয়ে চলে নতুন যুগের সম্ভাবনাকে কাছে এনে দিয়েছে;..." (পৃঃ ১২) আর মার্কসও তো ব্রিটিশ শাসনকে 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র' (unconscious tool of history) এবং সেই হিসাবে তার 'পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকার' (regenerating role) কথা বলেছেন।

মার্কসবাদের ভারতীয়করণের উপায় হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', 'অল্পে সুখ নেই' ও বিশেষ করে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' প্রবন্ধে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে প্রস্তাব হীরেনবাবু উত্থাপন করেছেন—তা কতটা গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারছি না। পোল্যাণ্ডের মতো ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশে তো বটেই, মোটের উপর যে-কোনো খৃস্টধর্মাবলম্বী দেশে জনজীবন যে-ভাবে ধর্ম ও ধর্মসংস্থার সঙ্গে বাঁধা—ভারতবর্ষে তা নয়। ওদেশে ধর্ম রাজনীতিকে যতটা প্রভাবিত করে—এদেশে তা করে না। রেনেসাঁস-রিফর্মেশন যেভাবে খৃস্টধর্মকে প্রভাবিত করেছে—ভারতবর্ষে তার দৃষ্টান্ত নেই। ওদেশে কৃষক-বিদ্রোহ ও ধর্মসংস্কার-আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে যে-ভাবে একাকার হয়ে গেছে তার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল। এর ফলে ওদেশে ধর্ম-আন্দোলনের অন্য ধরনের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে—যার সঙ্গে আদর্শের (ideal) দিক থেকে সমাজতন্ত্রের অনেকখানি মিল আছে। এবং ও-সব দেশে ধর্মসংস্থা ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা যে-ভাবে দেখা দিয়েছে—আমাদের দেশে তা দেখা দেয় নি, কোনোদিন দেবে কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ এ-ব্যাপারে যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছে—মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের জন্য আমাদেরও সে-পথ ধরে চলতে হবে, এ প্রস্তাব সহসা মেনে নেওয়া কঠিন।

তিন

'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে হীরেনবাবু সোভিয়েত পার্টির বিংশ কংগ্রেসকে 'কম্যুনিস্ট আত্মসমালোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' বলে অভিনন্দন

জানিয়েছেন। বিংশ কংগ্রেসে মুক্তবুদ্ধির যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ-গঠনের সোভিয়েত কর্মকাণ্ডের যে শুভ বিকাশ ঘটেছে, বিশ্বশান্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস যে-ভাবে দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে—তিনি যে তার অকুণ্ঠ সমর্থক—'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' ও 'অল্পে সুখ নেই' এই দুটি প্রবন্ধেই তার পরিচয় মিলবে। কিন্তু দুটি প্রবন্ধই একটু খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, হীরেনবাবু যদিও ব্যক্তিতন্ত্রের সমর্থক নন—সোভিয়েট ইউনিয়নে হালে স্তালিনের ভূমিকার যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তাতে তিনি খুশি নন।

বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রশ্নটি যে-ভাবে আলোচিত হয়েছে তা হয়তো সমালোচনার অতীত নয়। ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও ফল-পরিণাম সম্পর্কে সোভিয়েত বিশ্লেষণ যথেষ্ট দূরপ্রসারী নয়—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো কোনো নেতাব এই ধরনের সমালোচনার মধ্যে হয়তো কিছুটা সারবস্তু আছে। শুধু সমালোচনা যথেষ্ট নয়, প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার (institutional reforms) প্রয়োজন—এ দাবিরও হয়তো যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে।

কিন্তু হীরেনবাবুর সমালোচনাটা, মনে হয়, ঠিক ওদিক দিয়ে যায় নি। স্তালিনের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মুশকিল হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশ্নটা ঠিক ওভাবে ওঠে নি—স্তালিনের প্রতি সুবিচার-অবিচারের অ্যাকাডেমিক প্রশ্নরূপে আদৌ সমস্যাটা সামনে আসে নি। স্তালিনের মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকেই, সোভিয়েত অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি-ব্যবস্থা নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, সংগঠনে নানারূপ গলদ ধরা পড়েছিল, আমলাতন্ত্র জেঁকে বসছিল সর্বব্যাপী হয়ে। স্তালিনের মৃত্যুব পর সোভিয়েত নেতারা জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে এক রিপোর্টে কিছু না রেখে-ঢেকে কৃষি-সংকটের কথা খোলাখুলি জনসাধারণকে জানান হয়। এই রিপোর্টের মূল বক্তব্য, গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা যদিও তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জানত—তবু নেতৃত্বের তরফ থেকে তার সরাসরি স্বীকৃতিতে দেশের মধ্যে

ঘোরতর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অসংখ্য সমস্যা যার সঙ্গে ঘর করা ভবিতব্য বলে মনে করে লোক হাল ছেড়ে বসেছিল তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা সর্বস্তরে শুরু হয়। লোকে প্রশ্ন করতে থাকে এই সব সমস্যা এতকাল জমে থাকল কী করে। এমন সব গুরুতর ভ্রান্তি সম্ভব হল কী করে। যাদের এ-সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কথা ছিল তারা কি করছিলেন। আর শুধু কৃষিই তো নয়, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা গলদ ধরা পড়তে লাগল। সোভিয়েত নেতারা এই সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে একটু একটু করে আবিষ্কার করতে লাগলেন—স্তালিন, যাকে এতকাল অভ্রান্ত বলে ভাবা হয়েছে, তাঁর নীতিতে গুরুতর ভুলভ্রান্তি ছিল। ব্যক্তিতন্ত্রের আবহাওয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সমাজবাদী আইনের শাসনের ক্ষেত্রেও গুরুতর গলদ ধরা পড়তে লাগল। দেখা গেল ১৯৪৮ সালের তথাকথিত 'লেনিনগ্রাদের ঘটনা' যাতে দুজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েত নেতা ভজনেসেনস্কি ও লজোভস্কি দণ্ডিত হন—তা একেবারে সাজানো ঘটনা। এমনিভাবে স্তালিনের নানা অপকর্ম একটু একটু করে ধরা পড়তে থাকে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী যা হয়তো কারো কারো জানা ছিল, তার একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই হল বিংশ কংগ্রেসের পটভূমিকা—স্তালিন-ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প সংগ্রাম শুরু হয় এই পটভূমিকাতেই। ইতালির কমিউনিস্ট দৈনিক 'লুনিতা'-র বৈদেশিক বিভাগের সম্পাদক গিসেপি বোফ্‌ফা, যিনি বিংশ কংগ্রেসের কিছু আগে থেকে একবিংশ কংগ্রেস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা 'ইনসাইড দি ক্রুশ্চেভ এরা' গ্রন্থে এই পটভূমিকার সুন্দর ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠকেরা তা পড়ে দেখতে পারেন।

আমরা, যারা ব্যক্তিতন্ত্রের অনাচার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছি তাদের পক্ষে স্তালিনের প্রতি কতটা সুবিচার করা হয়েছে আর কতটা অবিচার করা হয়েছে তুলাদণ্ড দিয়ে তার পরিমাপ করা যত সহজ আগুনের আঁচ যাদের গায়ে লেগেছে তাদের পক্ষে তা ততটা হয়তো সহজ নয়। তা ছাড়া কালের সান্নিধ্যও বিষয়মুখ মূল্যায়নের অন্তরায় হতে পারে।

স্তালিনের ভূমিকার সাম্প্রতিক মূল্যায়নে কিছু আতিশয্য আছে কিনা সোভিয়েত মহাফেজখানার সাহায্য ব্যতিরেকে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় সোভিয়েত মূল্যায়নে স্তালিনের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলি উপেক্ষিত হয় নি। বিংশ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ১৯৫৭ সালে ক্রুশ্চেভ এক ভাষণে বলেছিলেন: "We see two sides to Comrade Stalin's activities: the positive side, which we support and value highly and the negative side which we criticise, condemn and repudiate···" এই উদ্ধৃতিটি আমি আহরণ করেছি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নবলিখিত ইতিহাসের সংশোধিত সংস্করণ থেকেই। হীরেনবাবু তার ১৯৫৯ সালে লেখা প্রবন্ধ 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব'-তে নিজেই বলেছেন, "সোভিয়েত বিশ্বকোষে সম্প্রতি স্টালিন সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে, তাতেও পূর্বেকার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি তাকে হেয় না করে তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভা ও অবিস্মরণীয় অবদানের বাস্তব বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।" (অল্পে সুখ নেই— পৃঃ ৪৫) আবার দ্বাবিংশ কংগ্রেসেরও পর ১৯৬২-৬৩ সালে সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভায় ক্রুশ্চেভ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও স্তালিন চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলির দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি আছে।

সুতরাং, কি করে মেনে নেওয়া যায় হীরেনবাবুর এই উক্তি "স্টালিন যুগের শেষার্ধ সম্বন্ধে বক্তব্যের মধ্যে মাত্রাজ্ঞান থাকে না?" এবং না জিজ্ঞাসা করেই বা পারা যায় কি করে "অর্ধসত্যের ছড়াছড়ি"-টা হীরেনবাবু কোথায় দেখলেন?

হীরেনবাবু যখন লেখেন, "তথ্যকে অভিপ্রায়ানুযায়ী বিকৃত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যন্ত শুধু উপেক্ষা নয়, অস্বীকার করা হয়েছে" তখনও না বলে পারা যায় না—সত্যের সঙ্গে এই অভিযোগ ঠিক সংগতিপূর্ণ নয়। আর ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে বলতেই হয়—এর সূচনা হয়েছিল স্তালিন আমলেই এবং স্তালিন যুগে তা অব্যাহতভাবে চলেছে। বরং সম্প্রতিকালেই তা সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে। চল্লিশ বছরের অভ্যাস দু-চার বছরে সংশোধন করা দুরূহ—তাই তার জের এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু কি করে ভুলি তা স্তালিন আমলেরই জের?

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতারা স্তালিনের

অপকর্মের কতটা শরিক ছিলেন হীরেনবাবু সংগতভাবেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। 'গিল্ট বাই অ্যাসোসিয়েশন' বা সঙ্গদোষের পাপ তাদের উপর নিশ্চয়ই কিছুটা বর্তায়। এবং সে আমলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা, যেমন, মলোটভ, কাগানোভিচ, মালেনকভ—এবং বেরিয়া তো বটেই—যে এই ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত ছিলেন না তা তো দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ভূরি ভূরি তথ্য সহযোগে প্রমাণও করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ক্রুশ্চেভ-মিকোয়ান প্রমুখ কি দোষমুক্ত ছিলেন? তারা কি কিছু জানতেন না? যদি জানতেন তো স্তালিনের আমলে তাঁরা মুখ খোলেন নি কেন? ১৯৬২-৬৩ সালে ক্রুশ্চেভ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, গ্রেপ্তার ইত্যাদির ঘটনা তারা জানতেন না তা নয়—তবে তারা জানতেন না নির্দোষ লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

ক্রুশ্চেভের এই উক্তি মিথ্যা বলে প্রমাণ করার মতো কোনো দলিল আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

হীরেনবাবু প্রশ্ন তুলেছেন আইন লঙ্ঘনের এই সব ঘটনা নিবার্য ছিল, না, অনিবার্য ছিল। জন্ম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে উৎখাত করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছিল, ভিতর থেকে শিশু সোভিয়েতের পতন ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছিল, কোনো কোনো বীরপুঙ্গব সদম্ভে ঘোষণা করছিল ডিম ফুটবার আগেই বলশেভিক মুরগীর ছানাদের পিষে মারতে হবে এবং হিটলারি পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্বও কোনো কল্প-কাহিনী নয়—আর তা নয় বলেই কিছু কঠোরতা অনিবার্য ছিল। প্রতিবিপ্লব নখদন্তহীন নয় এবং নখদন্ত ব্যবহারে সে কার্পণ্য করে না বলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সংজ্ঞা অনুসারেই শত্রুদের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও মিত্রদের জন্য গণতন্ত্র। স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে-অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য তা তিনি মিত্রদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করেছেন নির্বিচারে। জরুরী অবস্থা বিদ্যমান ছিল বলেই এই অনাচার দীর্ঘদিন ধরে চলতে পেরেছে—কিন্তু তাতে অনাচার কখনও সদাচার হয়ে যায় না। চীনা আক্রমণের ফলে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে গণতন্ত্রের কিছুটা সংকোচন অনিবার্য ছিল কিন্তু সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শাসক সম্প্রদায় যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বিচারে কারারুদ্ধ করেছে তাকে কি আমরা সংগত কাজ বলে মনে করেছি? না কি তা অনিবার্য ছিল?

তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে যে জরুরী অবস্থার কথা হীরেনবাবু বলেছেন

তা কি লেনিনের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়েছে না আগেও বিদ্যমান ছিল? ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধ চলছিল, যখন সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে সশস্ত্র হস্তক্ষেপে প্রবৃত্ত—অবস্থা কি তখন কিছু কম বিপজ্জনক ছিল? কই লেনিন তো তখন রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের কোতল করার প্রয়োজন মনে করেন নি! সমাজবাদী আইন লঙ্ঘনের এই ধরনের দৃষ্টান্ত তো তখনকার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না!

এক সময় ছিল যখন সোভিয়েতের নিষ্কলঙ্ক শুভ্র খ্যাতিতে বিন্দুমাত্র কালির দাগ লাগাতে পারে খবরের কাগজে এমনি ধরনের কোনো খবর বের হলে এক কথায় তাকে বুর্জোয়া প্রোপ্যাগাণ্ডা বলে নাকচ করে দেওয়া হত। এখন আবার উল্টো আর এক ঝোঁক দেখা যায়—খবরের কাগজে যা কিছু বেরোয় তাকেই ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়া। হীরেনবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেও এই শেষোক্ত ঝোঁক দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলাম।

যেমন ধরা যাক "মার্শাল জুকভের কল্যাণে…ক্রুশ্চেভ তাঁর বিরোধী নেতাদের ঘায়েল" করেছিলেন এই ডয়েশচার-প্রচারিত গল্পটি তিনি বিশ্বাস করে অভিযোগ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর "অবিস্মরণীয় অবদানের" কোনো স্বীকৃতি নাকি লালফৌজ সংক্রান্ত পুস্তিকায় নেই। লালফৌজ সংক্রান্ত হীরেনবাবু কথিত পুস্তিকাটি দেখি নি কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সংশোধিত সংস্করণে জুকভের নাম আছে।

কিংবা ধরা যাক, বিংশ কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনে প্রদত্ত তথাকথিত ক্রুশ্চেভ রিপোর্টের কথা। এই রিপোর্টের কোনো সরকারী ভাষ্য প্রচারিত হয় নি। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' প্রচারিত বিবরণটি কতদূর প্রামাণ্য যাচাই করার উপায় নেই। কিন্তু তবু হীরেনবাবু লেখেন "মোটামুটিভাবে ঐ বিবরণকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।" (পৃঃ ৪৫) অথচ পরবর্তীকালে সোভিয়েত থেকে ব্যক্তিতন্ত্র সম্পর্কে যে-সব দলিল প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ক্রুশ্চেভের ভাষণ ইত্যাদির সঙ্গে ঐ বিবরণের বড়ো রকমের অনেক গরমিল ধরা পড়ে।

খবরের কাগজের উপর হীরেনবাবুর এই আস্থা আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে অল্প কিছুকাল আগেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে হীরেনবাবুর বক্তৃতার বিকৃত বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা গণ হিস্টিরিয়া সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল।

কিন্তু হীরেনবাবুর মতামত যতই বিতর্কমূলক হোক, তাঁর বই যে চিন্তার খোরাক জোগায় তাতে সন্দেহ নেই।

গোপাল হালদার

ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য

একই সপ্তাহের দু'টি খবর: পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তামিলনাদের দ্রাবিড় কাজগম দল একমাস (২৭শে মে—২৭শে জুন) হিন্দীর বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রেখেছিলেন, মাসান্তে আবার তাঁরা ভারতীয় সংবিধান-গ্রন্থ পুড়িয়ে সে অভিযান আরম্ভ করলেন। অন্য দিকে: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, সর্বভারতীয় সরকারী চাকরির পরীক্ষায় (ইংরেজির সঙ্গে) হিন্দী ভাষাকে বিকল্প মাধ্যমরূপে শীঘ্রই প্রবর্তিত করবেন; অবশ্য যাতে সকল পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার হয় তাও দেখা হবে।

সমস্যার অভাব নিশ্চয়ই দেশের নেই; তামিলনাদেরও নেই, ভারত-রাষ্ট্রেরও নেই। সম্ভবত তামিলভাষীদেরও নেই, হিন্দীভাষীদেরও নেই। সমস্ত সমস্যা মাথায় নিয়েও যাঁরা হিন্দী ও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটাকেই এখনি, এই সময়ে, আরও ঘুলিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের মহাপুরুষ বলতে হয়। শুভবুদ্ধির তাঁরা পরোয়া রাখেন না; কিন্তু সত্য সত্যই কি তাঁরা ভারতের ভাষা-সমস্যার কথা স্থিরভাবে ভেবে দেখেছেন? না, তা ভাববার জন্য সাধারণভাবে ভারতবর্ষের জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন; ভারতীয় ভাষাগুলোর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা পোষণ করেন, এই ভাষাগুলির ব্যাপ্তি ও শক্তি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান রাখাও প্রয়োজন মনে করেন? দেশে ও বিদেশে সুশিক্ষিত বহু ভারতবাসীর সঙ্গেই ভাষার আলোচনা উঠেছে। বুঝেছি ও-ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী তার্কিক। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলির নামও অনেকে জানেন না, এমন কি, প্রধান সাহিত্যগুলির সম্বন্ধেও উদাসীন। কারও কারও ধারণা মাদ্রাজীরা কথা বলে মাদ্রাজীতে, আর বিহারের ভাষা হিন্দী। কেহ জানেন 'দেবনাগরী' একটা ভাষা, 'উর্দু' ফারসির দেশীয়

Languages and Literatures of Modern India—Suniti Kumar Chatterji. Bengal Publishers, Calcutta. Rs. 18-00.

নাম। অথচ, স্বদেশে না হোক, বিদেশে পা দিলেই বুঝতে পারি—আমরা যেখানকারই অধিবাসী যে হই, আর যে-ভাষাই যে বলি, ভারতবাসী হিসাবে এক, পরস্পরের আপনার; আমাদের প্রায় সকলেরই মুখে কী একটা লেখা আছে যাতে দেখলেই বুঝতে পারি সে ভারতবর্ষের মানুষ—পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের বিভেদও তাতে ধরা পড়ে না।

বৈচিত্র্য যে নেই, তাও নয়। না হলে লেনিনগ্রাদের প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর গানের জলসায় রুশ শ্রোত্রী কোনো গায়িকাকে দেখিয়ে তাঁর পার্শ্বস্থ ভারতবাসীকে কি করে বলেন, "ইনি নিশ্চয়ই বাঙালি?" অ-বাঙালি বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি করে বুঝলেন?" "ভাষা না জানলেও বুঝতে পারি ওঁর শাড়িতে, চোখে-মুখে, আর দাঁড়িয়ে উঠে ওই দু-হাত জুড়ে নমস্কার করার আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে।" বাঙালিকে পাঞ্জাবী নয় ধরাও যেমন সহজ, বাঙালি আর পাঞ্জাবী, তামিল আর গুজরাতী, সকলকে ভারতবাসী বলে অনুভব করাও প্রায় ক্ষেত্রেই তেমনি স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য লেখা আছে আমাদের চোখে-মুখে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-আচরণে; ভাষায়-কথায়। আর এই ঐক্যও তেমনি লেখা আছে আমাদের সেই মুখের ছাপে, সেই মনের ভাবে। দেশে থাকলে বৈচিত্র্যের ভিড়ে সে সত্যটা চোখ এড়িয়ে যায়। বিদেশে পা দিলে বৈষম্যের আঘাতে তা স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে। বিদেশীরও শুধু বৈচিত্র্যই চোখে পড়ে না, মিলও চোখে পড়ে। 'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশের মধ্যে জীবনের একটা গভীর সাদৃশ্য', মানুষের এক ভারতীয় রূপ, 'এক সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তি-স্বারূপ্য—' এ সত্য সেই রিজলি প্রমুখ নাতিভারতবন্ধু বৈজ্ঞানিকদেরও অনুভূতিতে স্বীকৃত।

ভাষার বৈষম্য নিয়ে যখন আমরা এতটা ক্ষিপ্ত তখনো কি ভেবে দেখি—মুখের ভাষায় আমরা ভারতবাসীরা যত বিভিন্ন, মনের ভাষায়ও কি আমরা ততটাই অনাত্মীয়? 'মনের ভাষা' বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছি প্রধানত আমাদের সেই বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য। বিভিন্ন তার বাহন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কি আমাদের পরস্পরের সাহিত্য—মনের প্রকাশের দিক থেকে? ভাবে আর ভঙ্গিতে? আর 'মুখের ভাষা'—সেই ধ্বনি ব্যাকরণ সমন্বিত ভাষা—তাও কি একেবারে পরস্পরের অনাত্মীয়? ভাষার গড়নের মধ্য দিয়েও যে মনের ছাপ সূক্ষ্মভাবে থাকে—অদৃশ্য কিন্তু অক্ষুণ্ণ, তাও তো

মিথ্যা নয়। ভারতবর্ষের এই ভাষার ও সাহিত্যের একটা সাধারণ পরিচয় জানলে বোধ হয় অনেক গোঁড়ামির ও অনেক হতাশার হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। সংবিধান-পোড়াবার উন্মত্ততাও কিছুটা প্রকাশিত হয়, আর হিন্দীকে অন্তদের আপত্তির ও অসুবিধার কারণ করে তোলার মতো অপবুদ্ধিও কিছুটা হ্রাস পায়।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজিতে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারতের ভাষাবলী ও সাহিত্যসমূহ' পড়তে পড়তে এ কথা আরও উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ভারতীয় সাহিত্যেও তাঁর দৃষ্টি অব্যাহত। কিন্তু এই কাজ শুধু বিদ্যার ও পরিশ্রমের কাজ নয়, সাহসেরও কাজ। না-জেনে না-বুঝে এদেশে বিচারে বসবার মতো লোক কম নয়। গত বৎসর সুদূর বিদেশে একজন (? মার্কসিস্ট) হিন্দীভাষী আমাকে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেন: "বলুন তো, যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক সময় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি কেন এখন হিন্দীর বিরোধী?" উত্তর সহজে দেওয়া যেত, "আপনার প্রশ্নের পিছনে যে মনোভাব আছে তা'ই তার যথেষ্ট কারণ।" কিন্তু এ উত্তরে বিদেশেও অনভিপ্রেত বিরোধই পাকিয়ে উঠত। আরও সত্যকারের উত্তর হত, "সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দীকে কী অর্থে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তা বুঝে দেখুন। পরে দেখবেন—এখনো তিনি 'হিন্দীর বিরোধী' নন।" এ উত্তরই সত্য হত; বর্তমান গ্রন্থও তার প্রমাণ। অথচ কলকাতার এক সভায় আমার বাঙালি (মার্কসিস্ট) বন্ধু বললেন, "ইংরাজিকে সরকারী ভাষারূপে রাখতে চান সুনীতিবাবু। এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা, সাম্রাজ্যবাদীদের খয়েরখাঁ-বৃত্তি।" ইংরেজিকে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা করে রাখার আমিও বিরোধী—হিন্দীকে বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাকেও ওরূপ একমাত্র ভাষা করে দিলেও আমার আপত্তি ততখানিই থাকবে। কিন্তু সুনীতিকুমারই কি ইংরেজির একচ্ছত্র আধিপত্য চান? না, তিনি শুধু মনে করেন ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করার মতো ভারতীয় ভাষা একটিও নেই। হিন্দীও নয়। উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাবের আদানপ্রদান ও আলোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রয়োজন তাই অনিবার্য। আলোচ্য বই-এর পৃষ্ঠা ৪।৫-এ তিনি সমস্যাটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উত্থাপন করেছেন—ইংরেজির বিরুদ্ধে আপত্তি বিবৃত করে। ইংরেজির প্রয়োজনীয়তার

কথা এ-গ্রন্থে আলোচনা করেন নি। এখানে তা আলোচ্য নয়, তাঁর আলোচ্য 'ভারতের ভাষাবলী ও সাহিত্যসমূহ'। প্রধানত তাঁর উদ্দেশ্য তথ্য-পরিবেশন। সেই সূত্রেই যতটুকু অনিবার্য ততটুকু ভাষা-সমস্যার ও সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনাও বাদ যায় নি। এরূপ বই-এরই দরকার বেশি। কারণ; আলোচনায় আমরা সকলেই উৎসাহী; কিন্তু তথ্য বিষয়ে আমাদের কারও জ্ঞানই খাঁটি নয়। অথচ তথ্যই হওয়া উচিত আলোচনার ভিত্তি।

ভাষার দিকের হিসাবই প্রথম নেওয়া যাক। সাহিত্যেরও আগে ভাষা, আর সব ভাষায় এখনো সাহিত্যও নেই।

'১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা'—এই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের প্রস্তুত ভারতবর্ষের ভাষার হিসাব। অনেকাংশেই তা নিরর্থক, কতকাংশে অযথার্থ। কারণ, উপভাষা মাত্রেই কোনো-না-কোনো ভাষার অন্তর্গত, তাদের পৃথক করে গণনা করার অর্থ নেই। তা ছাড়া ওই ১৭৯টি 'ভাষার' মধ্যেও প্রায় ১৪০টিই ছোট-ছোট উপজাতির 'ভাষা'—কোনো দিকেই গুরুত্ব তাদের নেই। অন্য কোনো প্রধান আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েই ওসব উপজাতিরা কাজ চালায়। আমাদের সুপরিচিত সাঁওতালীর কথাই ধরা যাক। সাঁওতালী বড় এক উপজাতির ভাষা। সংখ্যায় অনেক লোক বলে। কিন্তু ভাষাটা বিকাশ লাভ করতে পারে নি, তাতে নিজেদের মধ্যে সাঁওতালদের কাজ চলে। বাইরে হয় বাঙলা, নয় ওড়িয়া, নয় বিহারের কোনো উপভাষা বা ভাঙা-হিন্দুস্তানী সাঁওতালদের বলতে হয়। ছোট উপজাতিদের ভাষার তাই কার্যত গুরুত্ব অত্যন্ত সামান্য। এসব কারণেই আমাদের সংবিধান যে ১৩টি সুপ্রচলিত ভাষাকে তালিকাভুক্ত করেছে তা খুব অযৌক্তিক নয়। (সংস্কৃত ধরলে অবশ্য 'তালিকা-স্বীকৃত' ভারতীয় ভাষা ১৪টি, আর ইংরেজি তদতিরিক্ত স্বীকৃত ভাষা)। একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—এই ১৩টি ভাষাই সংবিধান-সংশোধনের পরে জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল লাঙ্গোয়েজিস্ অব্ ইণ্ডিয়া বলে বর্ণিত হয়েছে। 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটি সংবিধানে কোথাও প্রযুক্ত হয় নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে ইউনিয়নের অফিসিয়াল ভাষা বা সরকারী ভাষা, ইংরেজি না ছাড়া পর্যন্ত ইংরেজিও 'সরকারী ভাষা' থাকবে। সংবিধানের ঐ ১৩টি ভাষার প্রত্যেকটিই তাই 'জাতীয় ভাষা'। অবশ্য সংবিধানের তালিকার বাইরে আরও দু-একটি ভাষারও গুরুত্ব আছে। কারণ তাতে সাহিত্য আছে, যেমন সিন্ধী ও নেপালী। তা হলে, সুনীতিকুমারের মতে,

মোটামুটি সাহিত্যবান্ ভাষা দাঁড়াবে ভারতবর্ষে ১৫টি—অসমীয়া, বাঙলা, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধী, মরাঠী, নেপালী, কাশ্মীরী, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়ালাম। অবশ্য রাজস্থানীতেও কিছু কিছু সাহিত্য রচনা চলছে, আর 'মৈথিলে'ও সে রচনা থেমে যায় নি—কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলের স্বীকৃতিও আছে। কিন্তু ওই দুই অঞ্চলের লোকেরা সাধারণভাবে 'হিন্দী'কে তাদের সাহিত্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। তাই 'রাজস্থানী' 'মৈথিল' প্রভৃতির স্বীকৃতি নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। মোটামুটি তা, ১৫টি ভাষাই ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান ভাষা, এবং তার মধ্যে ১৩টি জাতীয় ভাষা, এ কথা বললে অন্যায় হবে না।

কোথা থেকে এল এসব ভাষা, আর কী তাদের রূপ? প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা জুড়ে (৯-৯২ পৃঃ) তার বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থে। তথ্য-ঠাসা সেই বিবরণের এই কথা কয়টি অন্তত স্মরণীয়।

প্রথমত, নৃ-গোষ্ঠী বিচারে দেখা যায় পাঁচটি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষই মোটামুটি এখনো ভারতবাসী। একেবারে প্রথম ছিল নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতি, তারা প্রায় লুপ্ত। তাঁদের দৈহিক চিহ্ন খুঁজে-পেতে এখনো দক্ষিণে আর পূর্বোত্তর-ভারতে (আসামের পার্বত্য অঞ্চলে) পাওয়া যায়। তারপরে এল প্রোটো-অস্টোলয়েড্ বা আদি-পুর্বীয়ারা। কোল মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা তাদের প্রধান বংশধর। তৃতীয় এল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরা (হয়তো সে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা), এখন দক্ষিণ ভারতে তারা প্রধান। কিন্তু এক সময় পুরবীয়ারা ও দ্রাবিড়রাই ছিল সারা ভারতে ছড়িয়ে। চতুর্থ এসেছিল মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী—হিমালয়ের পাদদেশে আর পূর্ব ভারতে (বাঙলা-আসামে) তারা এগিয়ে এসেছিল। পঞ্চম এসেছিল হিন্দ্-ইয়োরোপীয় বা আর্য্যরা (হয়তো সে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে)। তারা এক গোষ্ঠীর মানুষ নয়, ভাষা ও জীবনধারাতেই মাত্র ছিল এক। ইয়োরোপ জুড়ে তারা প্রাধান্য অর্জন করে। ভারতবর্ষেও বহুদিকে তাঁদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। এই আর্য্যদের আগমনের সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক কাল শেষ হয়, আরম্ভ হয় ঐতিহাসিক কাল। বলা বাহুল্য, তারপরেও শক-হুন দল পাঠান-মোগল কত জাতেরই আগমন ঘটেছে ভারতবর্ষে। কিন্তু ততদিনে ভারতবর্ষের মানুষ ওই নিগ্রিটো থেকে হিন্দ্-আর্য্য নৃ-গোষ্ঠীদের মিলিয়ে মিশিয়ে একটা ভারতীয় রূপ লাভ করেছিল। অন্যান্য নৃ-জাতির লোক এসে তাতে মিশে গেছে বা

মেশে নি। কিন্তু মুখ্য রূপটা থেকে গিয়েছে ওই পাঁচ নৃ-জাতির মিশ্রিত রূপে। সত্যই 'পাঁচমিশালী' একটা রূপ। নৃ-তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ এখানে অনাবশ্যক। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী মূলত যে যে নৃ-গোষ্ঠীর দান তাদের নামগুলো জানাই আপাতত যথেষ্ট। তার মধ্যেও নিগ্রোবটুদের ভাষার বা ভাবের কোনো চিহ্নই এখন নেই। ভারতবর্ষের ভাষাগুলি অন্য চার গোষ্ঠীরই ভাষার পরিণতি।

যে ভাষা যে-গোষ্ঠীর তার মোট তালিকাটা এরূপ :

প্রথমত, অস্ট্রিক বা পূরবীয়া মানুষদের এ দেশের ভাষায় (সুনীতিবাবুর অনুসরণে) বলতে পারি 'নিষাদ'। ভারতের বাইরে সে ভাষার অনেক বড় বড় বংশধর আছে, যেমন, ইন্দোনেশীয়-মালয় ভাষা প্রভৃতি। ভারতবর্ষে তাদের ভারতীয় বংশধর হল প্রধানত কোলীয় বা মুণ্ডা ভাষা। আমাদের সাঁওতালী ভাষা তারই এক শাখা। আরেকটি বংশধর খাসী ভাষা। কিন্তু তা কোলীয় ধরনের নয়, বরং ব্রহ্মের-শ্যামের মোন্-খ্মের ভাষারই জ্ঞাতি। সংখ্যায় সাঁওতালীভাষীরা তুচ্ছ করার মতো নয়। যদিও নিষাদ গোষ্ঠীর কোনো ভাষাই সেই ১৫টি ভাষার মধ্যে পড়ে না, তা স্বীকার্য। তাই বলে পরোক্ষে এদের প্রভাব প্রধান ভাষাগুলোর উপরে নেই, তা নয়।

দ্বিতীয়ত, মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর যে-ভাষা ভারতবাসীরা বলে তার নাম টিবেটো-চাইনিজ বা ভোটচীনা। তাকে আমরা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী 'কিরাত' ভাষা বলতে পারি। তারও দুটি বড় শাখা, টিবেটো-বর্মান ও শ্যাম-চীনা। সেসব ভাগ-বিভাগে না গিয়ে বলতে পারি—নেপালের পশ্চিম থেকে ভারতের পূর্ব পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে, আসামে, ব্রহ্ম-সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে যে-সব ভাষা বলা হয় তা হচ্ছে মোটামুটি এই কিরাতগোষ্ঠীর ভাষা। তার মধ্যে পড়ে পুরনো নেপালের 'নেওয়াড়ী' (আধুনিক নেপালের ভাষা 'নেপালী' বা 'গোর্খালি' কিন্তু হিন্দ-আর্য গোষ্ঠীর ভাষা) ; এখনো সেই নেওয়াড়ী অচল হয় নি। আর তারপর কোচ্, মেচ্, বরো, গাড়ো, টিপরা, মেইথেই (মণিপুরী), প্রভৃতি ভাষা। দু'শাখার মধ্যে 'নেওয়াড়ী' আর 'মেইথেই'ব কিছুটা সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু এসব কোনো ভাষাই প্রধান ভাষা নয়। অবশ্য নিকটস্থ প্রধান ভাষার মধ্যে এদের প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকার কথা।

তৃতীয়ত, দ্রাবিড় গোষ্ঠী : চারিটি প্রধান ভাষা এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ; তামিল, তেলুগু (বা অন্ধ্র), কন্নড় ও মালায়ালাম (কেরলী)। তা ছাড়াও

দক্ষিণের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা আছে এ গোষ্ঠীর, আর মধ্যভারতে ও পূর্বভারতে আছে এ গোষ্ঠীর কয়েকটি উপভাষা, যেমন, বাঙলা-বিহারের 'ওরাওঁ', উপভাষা, রাজমহল অঞ্চলের 'মালতো' উপভাষা। আরও একটি জানবার কথা, পাকিস্তানের দূর বালোচিস্তানের 'ব্রাহুই' নামে উপভাষাটিও এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। 'ব্রাহুই' উপভাষা একটি বিচ্ছিন্ন দ্রাবিড় উপভাষা। এসব থেকে নিশ্চিত বোঝা যায়—এক সময়ে এই দ্রাবিড়ভাষীরা ও দ্রাবিড় ভাষা ভারতবর্ষের পশ্চিমে পূর্বে মধ্যে এবং সম্ভবত উত্তরেও অনেকটা ছড়িয়ে ছিল। কেউ কেউ মনে করেন 'হরপ্পা-মোহেন্‌জো-দড়ো'র প্রাচীন সভ্যতাও (খ্রীঃ পূঃ ৩,২৫০—খ্রীঃ পূঃ ২,৭৫০) সম্ভবত সেই প্রাচীন দ্রাবিড়দের কীর্তি। অবশ্য এ কথা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। সেখানকার ভাষা পড়া যায় নি, আর ধ্বংসের মধ্যে নানা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের দেহ নৃ-তাত্ত্বিকরা পেয়েছেন। যাই হোক, দ্রাবিড়রা প্রাচীন জাতি—ভূমধ্য-গোষ্ঠীরই মানুষ। ভাষার দিক থেকে দ্রাবিড় ভাষা 'উরাল-আলতাই' বংশের ভাষা, অর্থাৎ হাঙ্গেরি (ম্যাজর্) ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষার, এবং তুর্কি ভাষার দূর জ্ঞাতি ; অবশ্য একথা কেউ কেউ মানেন না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বে না গিয়েও আমরা বলতে পারি—তামিল ভাষা প্রাচীন লক্ষণ বেশি বজায় রেখেছে। সংখ্যার দিকে তামিলভাষীদের থেকে অন্ধ্র তেলুগু-ভাষীরা বেশি—সংখ্যায় বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে তেলুগু দ্বিতীয় ভাষা। তামিল ভাষার উপরও স্বভাবতই এদেশের হিন্দ-আর্য সংস্কৃতি সভ্যতার মতো হিন্দ্-আর্য সংস্কৃত ভাষারও প্রচুর প্রভাব যুগে যুগে পড়েছে। তবে তেলুগু, মালায়ালাম, কন্নড়ে সে প্রভাব আরও বেশি। তেলুগু ভাষায় তো বাঙলার মতোই সংস্কৃত শব্দের ঘটা। তামিলভাষীরা কেউ কেউ এখন খুব গোঁড়া 'তামিলিয়ান্' হতে মনস্থ করেছেন—অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ বহিষ্কার করবেন, খাঁটি তামিল ছাড়া কিছু রাখবেন না ; এমনকি, নিজেদের নামও তাই বদলে ফেলছেন। এ প্রতিক্রিয়াটা কতকটা হয়তো ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিরুদ্ধে ; কতকটা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধেও, আর বিশেষ করে এখন হিন্দীভাষীদের সর্বাধিপত্য বিস্তারেরও প্রতিরোধে। যাই হোক্, তামিল পুরনো ভাষা ; তবু সব ভাষার মতো তা-ও যুগে যুগে বদলে এসে এখনকার রূপ পেয়েছে। কিন্তু তামিলে সাহিত্য রচিত হয়েছিল দু-হাজার বছর আগে। সেই প্রাচীন তামিলের নাম 'শেন্ তামিল'—এখনকার তামিলদের কাছে তা দুর্বোধ্য। সাহিত্যের কথা পরে আলোচ্য। ভাষার দিক

থেকে আর জানা দরকার, পুরনো তামিল থেকেই মালায়ালামের জন্ম, হাজার-খানেক (নবম শতকে) বৎসর আগে এ দুটি ভাষা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। এদের সঙ্গে কন্নড় ভাষার কিছু মিল আছে, কন্নড়েরও সাহিত্য প্রায় তামিলের মতো পুরনো। কিন্তু কন্নড় লিপি অনেকটা তেলুগু লিপির অনুরূপ। তেলুগুর সাহিত্য কিন্তু তত পুরনো নয়। আরেকটি জানবার মতো কথা এই—তামিল ও মালায়ালাম ভাষীরা সম্পূর্ণ না হোক, চেষ্টা করলে পরস্পরের কথা বুঝতে পারেন। তা ছাড়া একই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর হলেও এই চার ভাষার মানুষের পরস্পরের কথা বুঝতে হলে অন্য কোনো ভাষাব শরণ নিতে হবে—যেমন, ইংরেজি কিংবা হিন্দীর।

চতুর্থ প্রধান গোষ্ঠী হল—'ইন্দো-এরিয়ান্' বা হিন্দ-আর্য্য গোষ্ঠী। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ প্রধান ভাষাই এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত; আর তাই ভাষার দিক থেকে তারা অন্য আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষারও জ্ঞাতি, অর্থাৎ ফারসি, গ্রীক্, লাতিন, রুশ, জার্মান, ইংরেজি প্রভৃতির। একমাত্র কাশ্মীরী ভাষা এই হিন্দ্-আর্য গোষ্ঠীর নয়, তা জ্ঞাতি দার্দিক-আর্য গোষ্ঠীর। তবে কাশ্মীরীর উপর অনেককাল ধবেই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব প্রচুর। পাকিস্তানেরও পশ্‌তু (পাঠানদের ভাষা) ও বালোচি ভাষা দুটিই ঈরানী-আর্য্য গোষ্ঠীর সন্তান। না হলে বাঙলা ও উর্দু দুই প্রধান পাকিস্তানী ভাষাই ভারতবর্ষের দুটি ভাষা, ওই হিন্দ-আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষা। তা হলে বর্তমান ভারতবর্ষের সিন্ধী, মরাঠী, বাঙলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, গুজরাতী ও রাজস্থানী, নেপালী, মৈথিল,—এ সবই এক গোষ্ঠীর ভাষা। এক ভাষা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এক গোষ্ঠীব ভাষা হিসাবে এদের মিল অনেক দিকে। সেই মিলের কথায় যাবার আগে আরও কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। যেমন, বাঙলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, এরা হচ্ছে পরস্পরের নিকটতর, সহোদরাস্থানীয়। মৈথিলের সঙ্গেও তাদের সেই সম্পর্ক। আসলে, বিহারের প্রধান কথ্য ভাষা মৈথিল, মগহী, ভোজপুরিয়া, তিনটি পূর্ব গোষ্ঠীরই সহোদরা। হিন্দী বিহারীদের ঘরের ভাষা নয়, স্কুল-কলেজে পড়ে শেখা ভাষা। উর্দু বরং পাটনা-গয়ার শহরে মুসলমানদের মাতৃভাষা। তবু শতকরা আশীজন বিহারের মানুষ নিরক্ষর ও গ্রাম্য; তাদের কথিত ভাষা হিন্দীও নয়, উর্দুও নয়। অবশ্য তারা শিক্ষিত সাধারণের অনুসরণ করে; তাই হিন্দী বিহারেব রাজ্যভাষা এবং শিক্ষাদীক্ষায় মুখ্য ভাষা। সেরূপ কারণেই হিন্দী রাজস্থানের ও পূর্ব পাঞ্জাবেরও প্রধান ভাষা।

কিন্তু হিন্দী বলতে কাকে বোঝায়, এ-ও খুব বিতর্কের বিষয়। কারণ, আদমসুমারীর হিসাবে উর্দু, শুদ্ধ পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, ভারতে-বাসিন্দা নেপালীভাষী সকলেই হিন্দীর মধ্যে চালান যায়। অথচ সংবিধানের হিসাবে অন্তত উর্দু, পাঞ্জাবী স্বতন্ত্র ভাষা ('নেপালী' স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নেপালের ভাষা বলে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় নি)। ভাষার হিসাবে হিন্দী ও উর্দু সত্যই এক ভাষা, দুয়েব ধ্বনিমালা ও ব্যাকরণ এক, কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে তা দুই। আবার ভাষার হিসাবে অন্য দিকে হিন্দী বলতে যে কোন্ কথিত ভাষা বোঝায় তা অনিশ্চিত। গুজরাতের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে একেবারে বিহার পর্যন্ত—মধ্যপ্রদেশ ধরে—সমস্ত অঞ্চলকে গণ্য করা হয় হিন্দীর এলেকা ; রাজ্যের হিসাবে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, ও মধ্যপ্রদেশ এই চার রাজ্য, আর পাঞ্জাবের বিকল্পে, হিন্দী রাজ্যভাষা। এসব রাজ্যে কথিত ভাষার রূপ এক নয়। এবং অনেকখানেই তা লিখিত ভাষা হিন্দীর থেকে যথেষ্ট পৃথক্। দুটি প্রধান কথিত রূপ আছে (বিহার বাদে) এই হিন্দী মণ্ডলের—একটা পশ্চিমা (পছাঁহী) হিন্দী, আরেকটা পূরবীয়া হিন্দী। হিন্দীর যে লিখিত রূপ এখন প্রচলিত ব্যাকরণের দিক থেকে তা খড়ীবোলী নামে পরিচিত, তাই উর্দুরও ভিত্তি। মূলত পছাঁহী হিন্দী দিল্লী এলেকার ভাষা। সেই পছাঁহী হিন্দীর অন্য কথ্য রূপ হচ্ছে ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী। পছাঁহী হিন্দীর কাছাকাছি কথ্য ভাষা পূর্ব-পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী (মারবাড়ী, জয়পুরী প্রভৃতি); কাছাকাছি হলেও তা পৃথক্। সে তুলনায় আরও দূরের কথ্য ভাষা পূরবীয়া হিন্দী—আওধি, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী। আবার বারাণসী, বালিয়া প্রভৃতি জেলার কথ্য ভাষা তাও নয়, তা ভোজপুরী। তবু বিহারের মতোই এই বিরাট এলেকা যখন হিন্দীকে তাদের ভাষা বলে গ্রাহ্য করে, তখন ভাষাতাত্ত্বিক যা'ই বলুন, তাও হিন্দী মণ্ডলভুক্ত। হিন্দী ঘরের ভাষা অল্পলোকের, কিন্তু গ্রাহ্য ভাষা অনেকের। বলা যায় হিন্দী তাদের 'কুনস্‌ট স্প্রাখে' বা লেখ্য ভাষা। লেখ্য ভাষা হিসাবে অবশ্য উর্দু আবার পৃথক্। উর্দুর ভিন্ন হরফ, ফারসি-আরবী ভাবমণ্ডলেই উর্দুর পুষ্টি। না হলে, এই উর্দুর সহায়তা পেলে হিন্দী আরও মার্জিত রূপ ও গ্রহণশক্তি লাভ করতে পারত। এরও পরে বলা যায়, ব্যাপক নিরক্ষরতার দেশে হিন্দী লেখে-পড়ে কয়জন ? কিন্তু সহজ হিন্দী বা সহজ হিন্দুস্তানী বলে অনেকে। আর বলতে না পারলেও ওরকম সহজ হিন্দী শুনে বুঝতে পারে আরও অনেকে। তার অনেক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। তার জোরে এক ধরনের চালু

হিন্দী দিয়ে (communication speech) উত্তর ভারতে আমরা কাজ চালাতে পারি, দক্ষিণ ভারতেও মোটামুটি তা চালানো যায়। এই কাজ চালানোর মতো হিন্দী জানা থাকলে সহজ হিন্দী শেখাও কষ্টসাধ্য নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সর্বাধিক মানুষ সবচেয়ে কম কষ্টে যে-ভাষা শিখতে পারে তা হচ্ছে ওই সহজ হিন্দী। তা না শিখলে বাজারিয়া হিন্দী বা চালু হিন্দী দিয়ে তারা কাজ চালায়। কিন্তু উচ্চ ধরনের আলোচনা তাতে সম্ভব নয়, আর 'হিন্দীওয়ালাদের' কাছে সেই চালু হিন্দী সভায়-সমিতিতেও উপহসনীয়। কিন্তু তা সর্বভারতে বিস্তার লাভের পক্ষে হিন্দীর বেশ কার্যকর ভিত্তি। এ সুযোগ আর-কোনো ভারতীয় ভাষার নেই—বাঙলারও নেই।

এসব কারণেই হিন্দীকে (নাগরীতে লেখ্য) সংবিধান-সভা (অবশ্য মাত্র একটি ভোটের আধিক্যে) ইংরেজির স্থলে ভারত রাষ্ট্রের কেন্দ্রের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটি ভোটের আধিক্যে তা গ্রাহ্য হলেও তখন তাতে দেশে আপত্তি ওঠে নি—দক্ষিণেও না, পূর্বেও না। সম্ভবত, পাকিস্তান সৃষ্টিতে ও ভেদ-বিভেদের নানা বিভীষিকায় সকলেই সে সময় চেয়েছিল ভারতের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে। পরে যে আপত্তি জমে উঠল তার প্রধান একটা কারণ দেশের ভাষা-বৈচিত্র্যের দিকটা হিন্দীবাদীদের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই নীতি অনুসরণ না করে হিন্দীওয়ালারা এইদিকে চাইলেন 'বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে ঐক্য'।

এই ভাষার প্রসঙ্গটা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বুঝা প্রয়োজন। চার গোষ্ঠীর এই তেরোটি বিভিন্ন ভাষার কথা পরস্পরে আমরা বুঝি না। কিন্তু এদের পরস্পরে কি কোনো মিলই নেই? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৭০-৯২) এসব ভাষা ও উপভাষার বহু নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। তাদের পরস্পরে তুলনা করলে একটা কথা স্পষ্ট হয়—প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভিতরের ভাষাগুলি শব্দসম্পদে ও নানা দিকে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যে যার প্রতিবেশী সে তার তত নিকট। ভিন্ন গোষ্ঠীর দু'ভাষাতে তেমনি পার্থক্য বেশি। কিন্তু তাদেরও মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আত্মীয়বন্ধন আছে। একটা দৃষ্টান্ত নিই: ইংরেজি A man had two sons. সংস্কৃতে এ কথার রূপান্তর হোত "কস্যচিৎ মনুষ্যস্য দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম্", বাঙলায়ও আমরা সংস্কৃতানুযায়ী বলি "একজন (মানুষের) লোকের দুটি ছেলে ছিল," হিন্দীতে "কিসী মানুষকে দো বেটে থে", উর্দুতে "এক শখস্‌কে দো বেটে থে", আর দ্রাবিড় গোষ্ঠীর তামিলে "ওরু মানুষন-উক্কু ইরণ্ডু

কুমারর ইস্নদার-গল।" শব্দগত মিল ও অমিল দুই সহজে চোখে পড়ে। কিন্তু লক্ষ করি কি বাক্যবিন্যাস ও চিন্তাবিন্যাসের ধরন, আর পদের ক্রম? ইংরেজি বাক্যটির বিন্যাস হুবহু বজায় রাখলে বলতে হয় (বাঙলায়) (১) "এক লোক (A man) ছিল (had) দুটি ছেলে", তাতে অর্থ হত না (২) কিংবা "একজন লোক রাখত (possessed) দুটি ছেলে", তাও বাঙলা নয়। (৩) বলতে হয়, "এক লোকের দুটি ছেলে ছিল।" প্রথমত, সম্বন্ধ পদ স্থান নিল কর্তার, আর বিধেয় (ছেলে) হল তখন উদ্দেশ্য। তারপরে পদক্রমে ক্রিয়া ছিল মধ্যে, এল কর্তার পরে, আমাদের স্বাভাবিক ভাবে তা আসে শেষের দিকে। আসলে স্বাভাবিক ভাবে এরূপ স্থলে ক্রিয়া থাকে অন্তত বাঙলায় (হিন্দীতে নয়) উহ্য, যথা (৪) "একজনের দুই ছেলে"। (১) চিন্তাব বিন্যাসের একপ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতর সময় থেকে আরম্ভ করে দ্রাবিড়, হিন্দ-আর্য প্রভৃতি ভাষাগুলোতে একরকম বাক্যবিন্যাস ও পদক্রম অক্ষুণ্ণ রয়েছে, দেখা যায়। মনের রূপের অনেকটা ঐক্য তাতে দেখা যায়। তা ছাড়াও, ভাষা-তাত্ত্বিক বলবেন আরও মিল আছে (পৃ ১২-১৩): (২) ধ্বনি হিসাবে ট-বর্গের ধ্বনি; (৩) ব্যাকরণে বিভক্তি চিহ্নের পরিবর্তে অনুসর্গ শব্দযোগে (যেমন গাছ থেকে, হাত দিয়ে ইত্যাদি) শব্দরূপ করা; (৪) ক্রিয়াপদ গঠনের মিল; (৫) যৌগিক ক্রিয়া (উঠে পড়ে লাগা প্রভৃতি): (৬) অনুকার শব্দের বৈচিত্র্য (টুং টুং, রঙ্-চঙ্, কুচ্‌কুচে, ভাত-ফাৎ ইত্যাদি)।

হিন্দী ও তামিল কোনো ভাষারই ঐক্যের দিকটা তাই ভুলবার নয়। বৈচিত্র্যের দিক তো ভুলবার উপায়ই নেই। হিন্দীভাষীরা আরও যা ভুলে যান—ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত হবার মতো উন্নত ভাষা হিন্দী নয়।

ভাবজগতে উন্নতি লাভ করতে হলে ভাষার পক্ষে দরকার হয় সেই ভাষীদের উন্নত সাংস্কৃতিক মান, সেরূপ বাতাবরণ। ভাগ্যের চক্রান্তে হিন্দী তা বেশি পায় নি—বরং হিন্দীমণ্ডলে উর্দুই তা ঐতিহাসিক সূত্রে, বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছিল। আরও বেশি দরকার—সাহিত্যসম্পদ। দু'রকম সাহিত্যই দরকার—জ্ঞান-প্রধান সাহিত্য (Literature of Information), আর সৃষ্টি-প্রধান সাহিত্য (Literature of Power)। দুদিকেই হিন্দী উর্দুর পরে যাত্রা করেছে, আর উর্দুর থেকে কম সুযোগ পেয়েছে। ভারতের অন্য কোনো কোনো ভাষার তুলনায়

এখানে হিন্দীর স্থান এখন তুচ্ছ নয়; কিন্তু আবার কোনো কোনো ভাষার তুলনায় নিশ্চয়ই উচ্চ নয়। এটা শুধু সুযোগের কথা নয়—সুযোগ তো অন্য ভাষারও ছিল। তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সেখানে অভ্যুদয় হয়েছে? প্রতিভার এই উদ্ভব-মূল এখন পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত। তা ভাষার ও জাতির ভাগ্যই বলতে হবে। তাই এখানে ওঠে ভারতের অন্তত এই পনেরোটি ভাষার সাহিত্যিক-প্রচেষ্টার, সার্থকতার ও প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের কথা।

হিন্দী-উর্দু-বাঙলা প্রভৃতি তেরোটি ভাষার সাহিত্যের বিবরণ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিবেদন করেছেন এ গ্রন্থে প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৯৫-৩০৩), প্রাচীন সিন্ধীও বাদ যায় নি (৩৪১-৩৬০)। বাদ গিয়েছে নেপালী, সম্ভবত পৃথক রাষ্ট্রের ভাষা বলেই। বলা বাহুল্য, একসঙ্গে ভারতের (কার্যত পাকিস্তানেরও) প্রাচীন সাহিত্যসমূহের এমন আলোচনা আর কোনো গ্রন্থে আছে কিনা জানি না। অন্তত এমন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা এই আয়তনের গ্রন্থে দুঃসাধ্য কর্ম। স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে ছাড়া তার আলোচনাও এ পত্রে অসম্ভব। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোই এখানে তাই উল্লেখ করা হল—সাধারণ সমীক্ষায়। তিনি এ সমস্ত সাহিত্যের পটভূমির সন্ধান দিয়েছেন, সাধারণ লক্ষণও উল্লেখ করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভারতীয় সাহিত্যের তিনটি প্রধান বিষয়, প্রত্যেকটি আধুনিক সাহিত্যেরই উপকরণ—(১) প্রাচীন ভারতীয় বস্তুসম্ভার; (২) মধ্যভারতীয় বস্তুসম্ভার বা স্থানীয় বস্তুসম্ভার; (৩) আরবীফারসি ও ইসলামী বস্তুসম্ভার। আর এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইংরেজ আমলে (৪) পাশ্চাত্য বস্তুসম্ভার। অর্থাৎ ভারতের নব-জাগরণের যুগের এই আধুনিক সাহিত্য। নিশ্চয়ই এই বিভিন্ন সাহিত্যে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এই মূল সূত্র মনে রাখলে বুঝতে পারি—ভারতীয় মিলনসূত্র তাতেও কতটা অনুস্যূত থাকতে বাধ্য। তামিলের কথাই ধরা যাক। এক হিসাবে তা-ই সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ; সর্বাধিক প্রাচীন। ৫০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেকার শেন-তামিলের 'সংগম' সাহিত্য, 'পত্তুপপাট্টু' (গাথা দশক) 'এট্টুত্তোকই' (সংগ্রহাষ্টক), 'মণি-মেথলই' প্রভৃতি নিশ্চয়ই এক বিশিষ্ট দ্রাবিড় ভাব-জগতের সংবাদ দেয়। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রেরণাও তার পার্শ্বেই প্রাচীন ভারতীয় উপকরণ দান করেছে। বিশেষভাবে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্য তো তামিলেরই সৃষ্টি।

আর উত্তর ভারতে তাদেরই প্রেরণায় ভক্তির প্লাবন দেখা দেয়। হিন্দ্-আর্য গোষ্ঠীর ভক্তিসাহিত্যে সেই দ্রাবিড়-তামিল প্রেরণারই এক অভিনব প্রকাশ ঘটে। তাই, তা যেমন দক্ষিণের তেমন উত্তরের সম্পদ। মধ্যযুগের বাঙলা বা হিন্দী সাহিত্য থেকে এই ভক্তিসাহিত্য বাদ দিলে কি থাকে? আর, তামিল প্রাচীন সাহিত্য থেকেই কি মহাভারত রামায়ণের প্রভাব বাদ দেওয়া যায়? শৈব নায়নমারদের ও বৈষ্ণব আলওয়ারদের ভক্তিঅর্ঘ্যের মতোই কি কম্পনের রামায়ণ ও পুকঝেন্তির মহাভারত তামিলের অপরিহার্য সম্পদ নয়? মধ্যযুগের তামিল সাহিত্যের (খ্রীঃ ১৩৫০-১৮০০) অত বিচিত্র সৃষ্টিসম্পদ নেই। কিন্তু ভাবসম্পদে তা তখন সম্পূর্ণ ভারতীয়। এর পরে আধুনিক যুগে অন্য সব ভাষার মতোই তামিলেও এসেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংযোগ-সংঘাতে নতুন উপকরণ। একই পাশ্চাত্য উপকরণ ও সাহিত্যাদর্শে তখন থেকে তামিল, হিন্দী, বাঙলা, মরাঠী সকল আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যই মিলিত। কেউ এক পদ এগিয়ে আছে, কেউ এক পদ পিছিয়ে। প্রতিভার আবির্ভাবে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়েই কেউ আধুনিক সৃষ্টিতে বেশি সক্ষম, কেউ প্রতিভার আবির্ভাব-বঞ্চিত হয়ে কম ভাগ্যবান। কিন্তু সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও অনেকটাই সেই ভারতীয় উপকরণ ও ঐতিহ্য যেমন সমাবিষ্ট, সকলের আধুনিক প্রয়াসের মধ্যেও সেই পাশ্চাত্য-সংস্পর্শলব্ধ আধুনিক সাহিত্যাদর্শ তেমনি অনুসৃত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্রও তাই অনবচ্ছিন্ন—বরং ক্রমাগত যুগধর্মে আরও পরিপুষ্ট, আরও সুদৃঢ়।

বৈচিত্র্যকে বিভেদে পরিণত করা অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব নয়; পাকিস্তান তার প্রমাণ। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং জটিলতা বৃদ্ধি পায়; পাকিস্তান তারও প্রমাণ। তাই, সংবিধান পোড়ালে বা নাম পাল্টালেও তামিলদের সেই ভারতীয় বন্ধন ছিন্ন হবে না। কম্পন থেকে সুব্রাহ্মণ্য ভারতী পর্যন্ত তামিল সাহিত্য তাতে নাকচ হবে না, শুধুই বিকৃত হবে। হিন্দীভাষীদের স্বার্থে হিন্দী সাম্রাজ্য স্থাপন চেষ্টাও হবে হিন্দীর পক্ষে মারাত্মক কৌশল। হিন্দী কাজের ভাষা (communication speech)। ব্যবসাগত যোগাযোগে স্বাভাবিক ভাবেই তা বিস্তৃত হচ্ছে—হাটে-বাজারে, সিনেমার মারফতে। আরও তা ব্যাপক হবে শিল্পোন্নয়নে। বহুভাষী জনসমষ্টি যত একত্র হবে (জামশেদপুর, আসানসোল প্রভৃতির মতো শিল্প-শহরে) ততই চালু হবে সেই সমাজে। এই চালু হিন্দীই মার্জিত হয়ে হবে উচ্চ-

আলোচনার হিন্দীর সোপান। হিন্দীও সত্যকার উন্নত ভাবজগৎ আয়ত্ত করতে পারবে সৃষ্টি ও বুদ্ধির দানে যতই হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি ঘটবে। সৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তা ঘটতে পারে না—ঘটবে দুর্ঘটনা, ভারতব্যাপী দুর্যোগ।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এ আলোচনা তাঁর গ্রন্থে তোলেন নি। তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে শুধু সাধারণ-ভাবে বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। ভাষা সাহিত্যের বিবরণ ছাড়াও ভারতীয় ভাষার লিপির ঐক্য ও বৈচিত্র্যের নিদর্শনও পরিশিষ্টে তিনি যোগ করেছেন। আর দিয়েছেন প্রধান লেখকদের আঠাশখানা চিত্র। তাতে বই-এর তথ্য যেমন মূল্যবান হয়েছে তেমনি চিত্তাকর্ষকও হয়েছে। দু-একটা কথা তথাপি বলতে হবে—তথ্যের সমৃদ্ধিতে যে-পাঠক অস্বস্তি বোধ করেন তাঁর পক্ষে এ গ্রন্থ সুখপাঠ্য হবে না। উপায় নেই, ভারতবর্ষের সাহিত্য শুধু সংখ্যাতেই সমৃদ্ধ নয়। দীর্ঘ দিনের তার ঐতিহ্য, শত শত লেখকের তা আধ্যাত্মিক মানসিক বাস্তব ইতিহাস। বহুদিককার তা সাধনার বিবরণ। তাকে টেব্‌লয়েড্‌ করে খাওয়া যায় না। সংক্ষিপ্ত করতে গেলেও তথ্যের ভার কমে না, বরং বাড়ে। তা ছাড়া, কোনো আকারেই সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় কেউ না কেউ বাদ পড়ে যাবেন। আর লেখকের সাহিত্য-মূল্যায়নেও সকলে সব বিষয়ে একমত হবেন, এমন আশা করা দুরাশা। অবশ্য অধ্যাপক মহাশয় সাহিত্যবিচারে এ গ্রন্থে সাবধান হয়েছেন; নির্বিরোধ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতেই আলোচনা করেছেন। সমগ্রভাবে দেখলে মনে হবে—এসব ত্রুটি যদি থাকে তাও অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্যের এমন যুক্তিবদ্ধ, তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ আর রচিত হয় নি। আর কারও পক্ষে তা লেখা সম্ভব কিনা জানি না॥

শিপ্রা সরকার

নিগ্রো বিদ্রোহ

কয়েক বছর আগেও কলকাতায় আমেরিকান প্রচার-সংস্থার প্রেক্ষাগৃহে কোনো নিগ্রো বিক্ষোভ মিছিলের প্রামাণ্য চিত্র দেখা সম্ভব ছিল না। সরকারী নীতির সাবালকত্ব নিগ্রো সংগ্রামের পরিণত চরিত্রেরই প্রমাণ। এই বিষয়ে আমাদের উৎসাহের অভাব না থাকলেও জ্ঞানের অভাব থেকে গেছে। আমেরিকান সমাজের অন্তর্বিরোধের অস্থিরতা ও সাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব তাই সব সময়ে ঠিক বোধগম্য হয় না।

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেবার মতো একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ 'নিগ্রো বিদ্রোহ'।* গ্রন্থকার লুই লোম্যাক্স নিজে ভাগ্যবান নিগ্রোদের একজন, সাংবাদিক ও লেখকের অপেক্ষাকৃত উদার কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম জীবন কিন্তু কেটেছে জর্জিয়ার 'কালো চার্চের' ধর্মযাজক-গৃহে, দক্ষিণের একটি অঙ্গরাজ্যের কৃষ্ণকায় অর্ধ-নাগরিকদের দিনযাপনের গ্লানির মাঝখানে। একাধারে সহযোদ্ধার তীব্র আবেগ ও দর্শকের মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি নিগ্রো-স্বাধিকার সংগ্রামকে দেখেছেন। স্বল্প পরিসরে, অন্তরঙ্গ সহজ ভাষায় কয়েকটি জটিল অথচ অপরিহার্য প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থিত করা হয়েছে।

আমেরিকান বর্ণাশ্রমের ছবিটা এদেশে পরিচিত। বৈষম্যের মানচিত্রে উত্তর দক্ষিণ ভুল করার কারণ নেই। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে সমস্ত 'সাধারণ' সুযোগসুবিধার মাঝখান দিয়ে একটা স্থুল সীমারেখা চলে গেছে; সৃষ্টি হয়েছে সাদা-কালোয় ভাগ করা অদ্ভুত জীবন। উত্তরাঞ্চলে জীবিকা ও বাসস্থানের সমস্যাই প্রধান। দক্ষিণে বেশির ভাগ নিগ্রো ভোট দেয় না, নানা কৌশলে তাদের বঞ্চিত করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ধারাকে

The Negro Revolt—Louis E. Lomax. The New American Library, New York, 1963.

অনেক আগেই সংশোধন করা হয়েছে। উত্তরে পাড়া হিসাবে ভাগ হয়ে থাকার মানে দাঁড়িয়েছে অন্য সব ক্ষেত্রেই আইনত না হলেও কার্যত সেগ্রিগেশন। 'নিগ্রো বিদ্রোহ'-এর পরিশিষ্টে কয়েকটি সরকারী পরিসংখ্যান বৈষম্যের অর্থকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সেগ্রিগেশন হল একটি ঐতিহাসিক সমস্যার এক ধরনের সাময়িক সমাধান। তাকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে গত শতাব্দীর গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত দাক্ষিণাত্যে। কামানের গর্জন থামার পরেও সেখানে সামাজিক শান্তি ফিরে আসে নি। মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড প্রয়াসে রিপাবলিকান পার্টির উগ্র সংস্কারকরা যে 'র‍্যাডিকাল পুনর্গঠন' বা রাতারাতি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তার নিন্দা আমেরিকান ঐতিহাসিকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাডিকাল তাণ্ডবের ফলেই নাকি সেদিনকার অবমানিত 'বুঁর্বো'দের (বাগিচামালিক ও প্রাক্তন প্রভুশ্রেণীর) ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত ড্রাগনের দাঁতের চারার মতো বেড়ে উঠেছিল কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের 'স্বাভাবিক' ক্ষমাহীন আক্রোশে। সাধারণত মনেই থাকে না যে র‍্যাডিকাল সংস্কার ছিল যুদ্ধশেষে ক্ষমতায় পুনরাসীন বুঁর্বো শ্রেণীর নিগ্রো-দমনের প্রত্যুত্তর মাত্র। কু ক্লুকস ক্ল্যানের সন্ত্রাস ছিল রাজনৈতিক 'প্রতি-পুনর্গঠনের' সশস্ত্র উপধারা; যথাক্রমে কার্পেটব্যাগার ও স্ক্যালাওয়াগ উপাধিভূষিত উত্তর থেকে আগত নাগরিকের দল এবং দক্ষিণের গরীব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নিগ্রো সম্প্রদায়ের মৈত্রীর ফলেই দক্ষিণে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রথম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জন হোপ ফ্র্যাঙ্কলিনের *Reconstruction after the Civil War* গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। র‍্যাডিকালদের ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপরাধ অস্বীকার না করেও বলা যায় যে দাসপ্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রোদের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দেবার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তির অভাব ছিল না। সেদিন পুনর্গঠন থেকে পিছিয়ে না এলে আজ ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে যাবার দরকার হত না।

ইতিহাসের সব প্রশ্ন লোম্যাক্সের বিষয়ের পরিধির ভিতরে না এলেও সেগ্রিগেশনের ইতিবৃত্ত তিনি বইয়ের প্রথমাংশে আলোচনা করেছেন। ফেডারাল বাহিনীর অপসারণেরও আগে দক্ষিণে র‍্যাডিকাল সংস্কারের দিন শেষ হয়ে এক নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। সাংবিধানিক মূলনীতির পাশ

কাটিয়ে, একীকরণের বদলে 'পৃথক অথচ সমান' ফর্মুলা প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৯৬ সালের প্লেসি বনাম ফার্গুসনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে। দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে নিগ্রো সর্বদাই আলাদা, কিন্তু কিছুতেই সমান নয়। লোম্যাক্স দেখিয়েছেন, কী ভাবে সন্ত্রাস ও উৎপীড়নের মুখে আত্মরক্ষার জৈব তাগিদে নিগ্রো জীবনদর্শনও এই নতুন নীতির ছাঁচে এসে পড়েছিল। বিত্তশালী নিগ্রো ব্যবসায়ীদের শ্বেতসমাজের ভিতরে থেকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন অর্থনীতি সৃষ্টির চেষ্টা স্বাভাবিক কারণেই ব্যর্থ হয়। তারপরে এল আলাদা শিক্ষার ঝোঁক। অদ্বিতীয় নেতা বুকার টি. ওয়াশিংটনের বিশেষ ধরনের 'নিগ্রো শিক্ষাব্যবস্থা'। ইন্‌টিগ্রেশনের পরাজয় ও সেগ্রিগেশনে তার ঐতিহাসিক গোত্রান্তর এইভাবে সম্পন্ন হয়েছিল খানিকটা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে। আধুনিক নিগ্রো সমাজ এই সম্মতি ফিরিয়ে নিয়েছে।

দুই

দুটি প্রশ্নের আলোচনার ভিতর দিয়ে নিগ্রো বিদ্রোহের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, সংগঠন, পদ্ধতি ও কৌশলের পরিচিত সমস্যা, লোম্যাক্স যাকে বলেছেন সংগ্রামের মেথডোলজি; আর সেই সঙ্গে এই শতকের আমেরিকান নিগ্রোর অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ।

আন্দোলনের পঞ্চপ্রধান হল ১৯০৯ সালে স্থাপিত নিগ্রো সংগ্রামের গ্র্যাণ্ড ওল্ড পার্টি এন. এ. এ. সি. পি.; আর একটি প্রবীণ প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল আর্বান লিগ; মার্টিন লুথার কিঙের দক্ষিণী ক্রিশ্চান নেতৃত্ব সম্মেলন (সংক্ষেপে 'স্লিক'); বর্ণসাম্যে ব্রতী 'কোর'; অহিংস অথচ চরমপন্থী ছাত্র-সংগঠন 'স্নিক'। প্রশস্ত রণাঙ্গনের এক-একটি নির্দিষ্ট অংশে সেনাপতির কাজ করছে এক-একটি দল। স্কুল কলেজে বৈষম্যের অবসান, নিগ্রোদের দায়িত্ববোধ ও আত্মসম্মানবোধ বাড়াবার চেষ্টা, সিট-ইন (রেস্তোরাঁয় অবস্থান) ও ফ্রিডম রাইড (বৈষম্যের নিয়ম ভেঙে আন্তঃরাজ্য ভ্রমণ), যানবাহন ও দোকান-বাজার বয়কটের কর্মসূচীর পূর্ণ পরিচয় লোম্যাক্স দিয়েছেন।

উইলকিন্স, ইয়াং, কিং, ফার্মার, ফোরম্যানের মতো নেতারা তাঁদের বিশিষ্ট রণনীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও মতান্তরের সমস্যা নিয়ে যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ান। বিশেষত, ডক্টর কিঙের নেতৃত্বের টেকনিক বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন (পৃঃ ৯৬-১০৪) কী ভাবে ব্যক্তিত্বের জাদুদণ্ডের স্পর্শে

সংগঠন ও সংগ্রাম পদ্ধতির অনেক দুর্বলতা সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়। কিঙের আদর্শ পুরুষ গান্ধীজির কথা ভারতীয় পাঠকের স্বতঃই মনে আসবে।

গত দশ বছরে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে প্রবীণ-নবীনের সংঘাত বহুবার দেখা গেছে। আমাদের সচরাচর খেয়াল থাকে না যে এন. এ. এ. সি. পি.-র প্রধান কর্মসূচী, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান, নিগ্রো সমস্যার প্রান্তরেখায় এসে থামতে বাধ্য (পৃঃ ১২৪-৫)। কুড়ি বছর আগে সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The American Dilemma* লেখার সময়ে এই সংগঠনকে অনেকেই ভাবত অত্যন্ত উগ্র ; আজ অগণতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামে দ্বিধা তাকে রক্ষণশীল বলে পরিচিত করেছে।

তার উপরে আছে সমন্বয়ের সমস্যা, স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা, বৈষম্যের শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থি কোথায় তাই নিয়ে মতভেদ। টোকেনিস্‌ম্ বা জয়ের প্রতীক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার রীতিও মন্থর গতিতে এগোবার 'গ্রাজুয়ালিস্ট' পদ্ধতি—সংগ্রামী নিগ্রো জনতা বর্জন করেছে বলা যায়। কিন্তু প্রতিশ্রুত রাজ্যের প্রবেশদ্বার কোন দিকে আজও স্থির হয় নি, এবং এই নিয়েই আজকের নেতৃত্বসংকট।

সরকারী সংস্কার প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করা হয়েছে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে। প্রায় নব্বই বছর আগে উচ্চতম আদালতের পর পর কয়েকটি রায়ে নিগ্রোদের অনেক নবলব্ধ অধিকার চলে যায়। গত দশ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্ট যেন তার প্রতিবিধান করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক শাখা যে তুলনায় পিছিয়ে আছে, আইনপ্রণেতারা তারও পিছনে—কেনেডির নাগরিক অধিকার আইনের ইতিহাস তার প্রমাণ।

শতাব্দীর এক প্রান্তে লিঙ্কন, অন্য প্রান্তে কেনেডির মাঝখানে দুই রুজভেল্ট ও ম্যাকিন্‌লি, ট্রুম্যান প্রমুখের নামাঙ্কিত সংস্কারের একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। কিন্তু কেনেডির বিরল 'ক্লাসিকাল' রাজনৈতিক প্রতিভা সম্বন্ধে লোম্যাক্সের সঙ্গে একমত হতে বাধে না, বিশেষত যখন এব্রাহাম লিঙ্কনের পর থেকে রাষ্ট্রপতিদের নামের তালিকা স্মরণ করি। নিগ্রোদের ভোটার তালিকাভুক্ত করার উপর জোর দিয়ে কেনেডি বস্তুত র‍্যাডিকাল সংস্কারবাদের কর্মনীতিতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'সাঁড়াশি কৌশল' লোম্যাক্সের বর্ণনায় উপভোগ্য। আবেগবর্জিত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও

অকৃত্রিম উদারতার মিশ্র ধাতুতে রচিত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির চরিত্রচিত্রণ পাঠককে আকর্ষণ করবে।

তিন

'মেথডোলজি'র বিতর্কের আড়ালে একটি অস্থির জিজ্ঞাসার ফল্গুস্রোত চলেছে। আমেরিকান নিগ্রোর অস্তিত্ব কি নিয়ে, স্থান কোথায়? নিগ্রোমাত্রেই কোনো না কোনো ভাবে কালো চামড়ার 'মাশুল' দিয়ে থাকে (পৃঃ ৫৫-৫৬)। একটি পৃথক 'আফ্রিকান সত্তার' কল্পলোক তাই তাকে টানে। একই অভিজ্ঞতার জ্বালাময় উত্তরাধিকার, প্রায়-সাংকেতিক ভাষা ও ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়ে তিলে তিলে গড়া এই নিগ্রো স্বাতন্ত্র্য কতরকম সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় 'যন্ত্রণা ও প্রগতি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। নিগ্রোকে টেনে নামিয়ে শ্বেত গণতন্ত্র স্বহস্তে নিজের পরাজয়ের ক্ষেত্র রচনা করছে।

অথচ মিরডাল যাকে বলেছিলেন 'আমেরিকান বিশ্বাস', আর লোম্যাক্স বলেন 'আমেরিকান স্বপ্ন', স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের সেই জেফারসনীয় ঐতিহ্য আমেরিকা কোনোদিন সজ্ঞানে পরিত্যাগ করে নি। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে উন্মাদ অভিযানকে সাধারণ-গ্রাহ্য করতে হলেও এই আদর্শেরই একটা বিকৃত ব্যাখার দরকার হয়। আমেরিকান নিগ্রোও একই স্বপ্ন দেখে। তারা কোনো ভিন্ন জাতি নয়। আফ্রিকার মুক্তি তাদের প্রেরণা দিয়েছে, আফ্রিকান নাগরিকত্বের প্রলোভন দেখায় নি।

বিপরীত আকর্ষণে ক্ষতবিক্ষত চিন্তাশীল নিগ্রোর সামনে একমাত্র রাস্তা—"to find identification in the American mainstream" (পৃঃ ২১)। এই হল 'সাংস্কৃতিক শ্বেতবর্ণ', এরই অন্বেষণে আমেরিকান নিগ্রো বহু দিন আগেই বেরিয়েছে। নিগ্রো দ্বিতীয় ভুবন তাই ছায়া-জগতের বেশি কিছু হতে পারে না।

নিগ্রো নেতারা এ কথা মানলেও তাঁদের বিদ্রোহের দিগন্ত মেঘমুক্ত নয়। নিগ্রো মিষ্টিকের চরমতম প্রকাশ কৃষ্ণ মুসলিম আন্দোলনের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। তাদের বর্ণাভিমানের তীব্র বিকার চাবুকের মতো আঘাত করে রক্ষণশীল নেতৃত্বকে জনবিক্ষোভ সম্পর্কে সজাগ রাখতে খানিকটা সাহায্য করেছে। 'নিগ্রো বিদ্রোহ'-এর লেখক তাদের সমর্থন না করলেও তাই খুব বিপজ্জনক মনে করেন নি (পৃঃ ১৯২)। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে

এ ধরনের উন্মাদনা যে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ গত মাসে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এ প্রকাশিত হার্লেমে কয়েক শত সশস্ত্র নিগ্রো যুবকের টহল ও শ্বেতাঙ্গদের উপর নির্বিচার আক্রমণের খবর।

গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দ্বিবর্ণ চেহারা আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু শ্বেত-কৃষ্ণের মিলিত সংগঠনের দরকার আছে কি না, এ প্রশ্ন অনেক নিগ্রো কর্মীর কাছে আজও অমীমাংসিত। অথচ মুক্তিভ্রমণে, ভোটার সংগ্রহ অভিযানে ও পুলিসের নির্যাতনের সামনে শ্বেত সম্প্রদায়ের শত শত প্রতিনিধি আমেরিকান বিপ্লবের দীপ-শিখাটিকে সযত্নে বহন করে চলেছেন। 'স্নিক'-এর তহবিল সমানে পূরণ করেছে উত্তরের প্রধানত শ্বেতাঙ্গ ছাত্র আন্দোলন। এমনকি, সমাজ সচেতন শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ছাত্রীরা ভালো কলেজ ছেড়ে এসে দক্ষিণের নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য আমেরিকার ছাত্রসমাজ যে ধরনের সংগঠিত আন্দোলনে নামতে পেরেছে তার কাছাকাছি কোনো প্রচেষ্টাও আমাদের দেশে আপাতত নেই।

তা সত্ত্বেও নাগরিক অধিকার আন্দোলনে বিতর্ক থামে নি, শ্বেত-কৃষ্ণ সম্পর্কের সমস্যা জট পাকিয়ে রয়েছে। বহু যুগের সঞ্চিত ঘৃণা, এবং উদারমতি সহৃদয় শ্বেতাঙ্গদেরও নানা রকম বোঝার ভুল এর জন্য দায়ী (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নিগ্রো বিদ্রোহকে যে একটি সরল জ্যামিতিক ছকে ফেলা যায় না, সে কথা বোঝাতে পারা লোম্যাক্সের লেখার অন্যতম প্রধান গুণ।

চার

লেখারই গুণে সম্ভবত, বই শেষ করেও রেশ কাটে না। কিছু প্রশ্ন মনে আসে।

লোম্যাক্সের মতে নব পর্যায়ের নিগ্রো বিদ্রোহের কারণগুলি হল: আফ্রিকার মুক্তি, যুদ্ধোত্তর প্রাচুর্যের সমাজে নতুন সুযোগ-সুবিধা, ও সেই সঙ্গে "শ্বেত ক্ষমতার কাঠামো এবং আইনের হাতিয়ার" সম্পর্কে নিগ্রোদের চরম মোহ-মুক্তি। এই সময়ের ভিতরে দক্ষিণে শিল্পের দ্রুত প্রসার, তুলার চাষ কমে যাওয়া, ট্রেড ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রভাব নিগ্রো শ্রমজীবীদের জীবনে কী ভাবে কাজ করেছে তার কিছু আলোচনা এখানে অবান্তর হ'ত না। ১৯৫৫ সালে মণ্টগোমারিতে রোজা পার্ক্‌স্‌-এর ব্যক্তিগত প্রতিবাদ ও পরবর্তী কালের প্রবল আলোড়নের মাঝখানে কার্যকারণের সেতু পাঠকের কাছে আর একটু স্পষ্ট হত। চার্চের চিরাচরিত

প্রভাব ও নেতৃত্বের পাশাপাশি আরও আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজচেতনা কী ভাবে কাজ করছে বোঝা যেত।

শ্বেত আধিপত্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধছে তার কিছু পরিচয় থাকা উচিত ছিল মনে হয়। অঙ্গরাজ্যের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন যে ভবিষ্যতে আরও প্রবল হবে না তার কোনো মানে নেই। দক্ষিণের 'র‍্যাডিকাল রাইট'-পন্থীরা, আর ভদ্র রাজনীতির বাইরে জন বার্চ প্রমুখ প্রতিষ্ঠান দলে ভারি না হলেও তাদের গুরুত্ব যে খুব কম নয়, গোল্ড ওয়াটারের অভিযানই সে কথা প্রমাণ করে। এর ফলে নিগ্রো আন্দোলনেও সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক খানিকটা বাড়তে বাধ্য। ১৯৬২ সালে লেখা 'নিগ্রো বিদ্রোহে' কিন্তু এই উৎকট দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের কথা নেই।

আর একটা কথা। গণতন্ত্র ও সমাজকল্যাণকে শেষ পর্যন্ত আলাদা রাখা যায় না। অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা খর্ব না করে নাগরিক অধিকার আইনের ঠিক-ভাবে প্রয়োগ, কিংবা কোনো সাধারণ জনহিতকর কাজও অত্যন্ত কঠিন হতে বাধ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রে কিছু কাঠামোগত বা স্ট্রাক্‌চারাল পরিবর্তনের কথা বলার সময় কি আসে নি? অবশ্য অনায়াসেই বলা সম্ভব যে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধানের চতুর্দশ-পঞ্চদশ সংশোধনী প্রমুখ ধারাগুলি কাজে লাগাতে পারলে আর কোনো পরিবর্তনের দরকার হবে না। কিন্তু 'পৃথক অথচ সমান' নীতি স্থাপিত হয়েছিল এই সংবিধানেরই উপর ভর করে, এবং ১৮৭৫ সালের নাগরিক অধিকার আইনকে বেআইনী ঘোষণা করার সময়ে (১৮৮৩) পঞ্চদশ সংশোধনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের এখনকার সিদ্ধান্ত-গুলিকে প্রকৃতপক্ষে নতুন আইন বলা চলে। কাজেই নিগ্রো বিদ্রোহের নেতারা সংবিধান প্রসঙ্গে কী ভাবছেন জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

শেষ পরিচ্ছেদে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশ্বব্যাপী সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে আর-একটি মহাযুদ্ধের বিস্ফোরণের আশঙ্কা অতিরঞ্জিত মনে হয়।

সংক্ষিপ্ত রচনার ভিতরে সব প্রশ্নের উত্তর-চাওয়া হয়তো অসংগত। নিগ্রো বিদ্রোহের একটি স্পষ্ট ও খাঁটি চিত্র দেশ-বিদেশের পাঠকের চোখে ফুটিয়ে তোলার দরকার ছিল। লোম্যাক্সের নিপুণ রচনায় সে কাজ সম্ভব হয়েছে। তাঁর শেষের কথাগুলির প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিকের কোনো সন্দেহ থাকবে না যে: "অস্থির, নিঃসঙ্গ, অথচ অনুপ্রাণিত এক কৃষ্ণ জাতি একদিন এই পথে হেঁটেছিল।"

তরুণ সান্যাল

অবাধ্যতার স্বপক্ষে

"Any man's *death* diminishes me, because I am involved in *Mankind*; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for *thee*..." John Donne.

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবনের বিভিন্ন পথচর্চার মানুষ অবশেষে কেবল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তাতেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক জীবনের চাবিকাঠি যেন পেশাদার রাজনীতি-জীবীদের নিকটে হস্তান্তরিত করে সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের কাজকর্ম বিষয়ে নিস্পৃহ পরবাসী ছিল। হিরোসিমা-নাগাসাকীর তেজস্ক্রিয় ধূলিকণায় মৃত্যুদূতকে প্রত্যক্ষ করে, আধুনিক সভ্যতার দস্তুর অনৈতিক রাষ্ট্রভাবনাকে চকিতে বুঝে ফেলে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। পেশাদার রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাদর্পীদের হাতের মুঠো থেকে মানুষের কল্যাণহস্তে জীবনধর্মের রথের রশিটি ফিরিয়ে আনা যায় কিনা ভেবে বিশ্ব জুড়ে নানা মতের মনীষাবাদীদের সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো ব্যক্তির নিকটে, ক্ষমতাশালীদের বিবেকবোধের উজ্জীবনই একমাত্র সমাধান, অন্য দল মনে করেন তাঁদের বিবেকবোধ জাগরণ করার কাজে ভূমিকা নিতে হবে। কেউ মনে করেন বর্তমান সভ্যতায় পশ্চিমী জগতে রাষ্ট্রনেতাদের বিবেক-বোধের সৃজন সমাজতাত্ত্বিক কারণে অসম্ভব; সকল বিচারেই মানুষকে আপন কল্যাণধর্মে সুপ্রতিষ্ঠ ও সনিষ্ঠ করে ফিরে আনবার দায়িত্ব স্বীকার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নেতিবাদীদের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাপ-পারমানবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী রূপ: বিশ্বের বিবদমান শিবিরদ্বয়ের বিপুল তাপ-পারমানবিক অস্ত্রের উপস্থিতি—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ঘড়ির কাঁটার উদ্বর্তন ধরে তাদের সদা-উদ্যত প্রস্তুতি—মানুষকে রাষ্ট্র, এবং রাষ্ট্রের পরেও কয়েকটি রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিকটে আত্ম-অস্তিত্বের জন্য

A Matter of Life: Ed. Clara Urquhart. Jonathan Cape, 21 Shillings.

নির্ভর করতে হচ্ছে। বলা যেতে পারে সর্বশেষ বিচারে মানুষ এবং মানুষ-নির্মিত অস্ত্র পরস্পরের দিকে উদ্যত। মানুষ যে-সভ্যতায় কেবল আয়-ব্যয়, উৎপাদনদক্ষতা, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও লাভের মূল্যে ইলেক্ট্রনিক কমপ্যুটারের বিবেকহীন যন্ত্রদক্ষতায় গুটিকয় সংখ্যামাত্র, সে সভ্যতায় মানব-সংখ্যার অর্জন-বর্জন নীতিহীন আচারের আখ্যান মাত্র। আইখমানের টেবিলের ফাইলে যাট লক্ষ ইহুদি শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী সংখ্যা মাত্র ছিল—তাই আইখমান আত্মসমর্থনে রাষ্ট্রশক্তির অনুগত কর্মচারীর আনুগত্যের সাফাই-ই গেয়েছিল। রাষ্ট্রের আনুগত্য, আইন ও শৃঙ্খলার বশংবদ ভৃত্য বনে থাকা সঠিক কিনা—এক কথায় ভালো নাগরিক ও ভালো মানুষের মধ্যে অ্যারিস্টটলের সময় থেকে আলোচিত দ্বন্দ্ব আজ নতুন করে উপস্থিত হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে তাই প্রশ্ন ওঠে, নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর কিনা, আদর্শ বিশ্বজনীনতার স্বরূপ কী, আপন রাষ্ট্রের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নাগরিকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত—পরিশেষে আধুনিক সভ্যতা সত্যই ব্যক্তিমানুষকে তার মারণযজ্ঞের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সঙ্গী করে ফেলেছে কিনা। যদি সত্যই মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিবাদহীন কব্জামাত্র হয়ে থাকে, তবে তার রূপান্তর সম্ভবসাধ্য কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে।

শ্রীমতী ক্লারা আরক্যুহার্ট পশ্চিমী পৃথিবী এবং এশিয়া আফ্রিকার অকমিউনিস্ট দেশগুলির বিভিন্ন মনীষাবিদের নিকটে উপরের প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজেছেন। তেইশজন সক্রিয় বুদ্ধিবাদী তাঁর জবাবে তাঁদের নানাবিধ মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্লারা আরক্যুহার্টের মতে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতায় মানুষ তার বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না। "Primarily this is so because he leads an entroverted life, and has been unable to achieve the inner progress needed if he is to survive morally in the machine age." এই survival-এর প্রশ্ন অবশ্য মোটা কথায় প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণ হওয়া উচিত। স্যাটারডে রিভিয়ুব সম্পাদক সাংবাদিক নরমান কাজিনের নিকটে অস্ত্র উৎপাদন এবং পরমানবিক অস্ত্ররোধী অস্ত্রের উৎপাদন সমভাবেই বর্জনীয়। কেননা, "one nations detervent becomes the other nation's incentive." ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের অস্ত্র প্রতিযোগিতার কোনো অর্থ নেই। কেননা "Its capacity for waging war has never been so great, nor its ability to protect

itself so puny." সুতরাং সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব কয়েকটি ব্যক্তির উপরে আজ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে—এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব, আর সেই সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে আন্দোলনে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। ডেভিড বেন গুরিএন বা হর্বার্ট রীড বিশ্বের কল্যাণ দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নত রাষ্ট্রগুলির নির্দ্বিধ সহায়তার মধ্যে কামনা করেন। এমনকি পশ্চিমী তাপ-পারমানবিক শক্তির মধ্যমণি রাষ্ট্রটির যদি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাপ-পারমানবিক অস্ত্রসচেতনতা এতই বেশি হয়ে থাকে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক কার্ল ফ্রেডরিশ ফন হ্বেইৎ মাক্কার তার উত্তরে বলেন: "…I believe that communism…has revolutionary opportunity only when the process of industrialization is too slow or where it has failed." পশ্চিমী গণতন্ত্রের শক্তিগুলির তাই কমিউনিজম প্রতিরক্ষার একমাত্র আশ্রয় দরিদ্র দেশগুলির দ্রুত শিল্পায়নের সহায়তার মধ্যেই বাস্তবিক নিহিত। হানসটিরিঙ (ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ও ১৯৫৮ সালের তৃতীয় পাগওয়াশ সম্মেলনের উদ্যোক্তা) অবশ্য পারমানবিক অস্ত্র উৎপাদনের কার্যে সহায়তায় বিজ্ঞানীদের বিরত হতে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন যে আধুনিক রাষ্ট্রনেতাদেব শুভবুদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান না হওয়াই ভালো ("the attitude of the most powerful democratic leaders, and also dictators, towards the problem of war and peace has made a one hundred and eighty degree turn compared to Hitler's and Mussolini's.")। অবশ্য তিনি শিক্ষাবিস্তার, ব্যক্তির ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাক নন। তিনি অস্ত্র-উৎপাদনের কাজে বিজ্ঞানীদের অসহযোগিতার পক্ষপাতী। এই অসহযোগিতা এবং রাষ্ট্রীয় অস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা আধুনিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রসংগঠনে আপনার ভূমিকা পুনরায় মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রীয় আইন, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ কি রাষ্ট্রদ্রোহকর নয়। ফলে, আইনের উত্থাপন এবং প্রয়োগ, আইনের যাথার্থ প্রভৃতি প্রশ্ন ব্যতিরেকেও রাষ্ট্র ও ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে বিবদমান ভূমিকা লক্ষণীয়। বিবদমান এ জন্যই যে রাষ্ট্রের সাবভৌম শক্তির প্রয়োগ যে সরকারী যন্ত্রের মাধ্যমে—সেই সরকারের কার্যক্রম ও পারমানবিক অস্ত্র সম্পর্কে মনোভাব বিবেকবান ব্যক্তির নিকটে গ্রাহ্য বলে বোধ হচ্ছে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি

নিকটে প্রশ্নোত্তরের এই বিশেষ প্রশ্নে ডাঃ আলবার্ট সোহ্বাইটজার ও এরিখ ফ্রম বিশেষ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। ডাঃ সোহ্বাইটজারের মতে আধুনিক সভ্যতা মদোদ্ধত ক্ষমতা-উপাসকের সভ্যতা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় দর্শন ও তার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হেগেলের নিকটে সংস্কৃতিব সম্পূর্ণতাই অম্বিষ্ট ছিল। ব্যক্তির সংস্কৃতি এবং সমাজের প্রকৃতির পরীক্ষা: উভয়ই লক্ষ্য হয়েছিল। দর্শনের লক্ষ্য ছিল মানবিক আদর্শের ভিত্তিতে রচিত নৈতিক সংস্কৃতিকে বাস্তব করে তোলা। মানবসভ্যতায় গভীর ও মহৎ গুণই কাম্য ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃতির স্বরূপ ও গঠন দুটি ভিন্ন ধারায় পথ নিল। কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) "Inplored the means by which human society could be organized in order to make culture a reality in the most natural way." ফলে এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতি, বিশেষভাবে নৈতিক সংস্কৃতি তুচ্ছ প্রতিপন্ন হল। ফ্রিডরিশ নীট্‌সে (১৮৪৪-১৯০০) মানুষের স্বভাবানুযায়ী তাকে কী হতে হবে সেই সমস্যাতেই রত হলেন। একদিকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সমাজের একটি সমবেত নক্সা নিরূপণ করেছে, যে-নক্সা আয়াসসাধ্য ও আয়ত্তসাধ্য। সোহ্বাইটজার মনে করেন এ আদর্শ সংস্কৃতির পূর্ণ অর্থ মেনে নিতে পারে না, কেননা সংস্কৃতি সব সময়েই ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা সমাজগতভাবে পূর্ণ-বিকাশের মধ্যমণিস্বরূপ। ফ্রেডরিশ নীট্‌সে নৈতিক সংস্কৃতির মূল্য অস্বীকার করে 'অতিমানবের' শূন্য তত্ত্ব রেখেছিলেন। সেই নীতিহীন অতিমানবের অনিষ্টকর দর্শনের প্রভাব আজ রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রে সমাসীন। শক্তি ও অস্ত্র এর ফল। পারমানবিক যুগে যুদ্ধকে কিছুটা মানবিক করা অসাধ্য, অবিশ্বাস এত তীব্র যে উভয় শিবির "do not trust each other, how can they continue to confer together." আজ মানুষের তাই, সোহ্বাইটজারের মতে, নৈতিক সংস্কৃতি-ধারণার পুনরুজ্জীবন কাম্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেজন্য সংগ্রাম প্রয়োজন। এরিখ ফ্রম কিন্তু দর্শনগত এই অন্তরধারণাকে মেনে নিচ্ছেন না। তাঁর নিকটে অবাধ্য হওয়াই জীবনের ধর্ম। ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে মানুষের আদিম পাপ থেকেই সভ্যতার উদ্বর্তন—গল্পচ্ছলে বলা যেতে পারে।

মানুষ বিবেক, বিশ্বাস ও মনীষার দাক্ষিণ্যেই সমাজের নিকৃষ্ট রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজকে অগ্রচারী করে। 'মানুষের বিবেক'

কথাটি উচ্চারণের মধ্যেই তাৎপর্যযুক্ত হয় না। সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারনা প্রভৃতি মানুষের মধ্যে নিরবধি প্রবৃষ্ট হচ্ছে। এই বোধগুলি এমন এক নক্সা নিরূপণ করছে, যাকে আমরা 'কর্তৃমূলক বিবেক' বলতে পারি। এ বিবেকের কণ্ঠস্বরে মানুষ ক্ষমতাসীনের ক্ষমতার নিষেধ বা আদেশ শুনতে পায়, "This authoritarian conscience is what most people experience when they obey their conscience." কিন্তু 'মানবিক বিবেক' সমাজের আদেশ-অনুজ্ঞা নিন্দা-প্রশংসার উর্ধে। এ হল সেই বোধ—যার দ্বারা মানুষ মানবিক ও অমানবিকের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে। "It is the voice which calls us back to ourselve ; to our humanity"—এই কণ্ঠস্বরের আহ্বানে মানুষ সামাজিক সংস্কার, রীতি প্রভৃতি ভেঙে 'মানুষ' হয়ে ওঠে। কর্তৃমূলক বিবেক আবার যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। শোষক-শ্রেণী ব্যক্তি শোষিতের ভিতরে যে-আদেশ প্রবৃষ্ট করে দিয়ে বিবেক রচনা করে থাকে, সে ক্ষমতা অযৌক্তিক। কিন্তু শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে যৌক্তিক ক্ষমতা প্রবৃষ্ট করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও অনুভাবকের লক্ষ্য বিপরীত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমলক্ষ্য। ফলে এরিখ ফ্রম রাষ্ট্রশক্তি অমান্য করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন—বাইরের ক্ষমতার নিকটে নতি স্বীকার অযৌক্তিকও হতে পারে। মানুষ যৌক্তিক ক্ষমতারই অধিনস্থ হতে পারে। মানুষকে প্রতি মুহূর্তে রাষ্ট্র, ধর্ম, জনমত প্রভৃতির ছত্রছায়ায় জীবনযাপন করতে হয়। মানুষকে পরিণত হয়ে উঠতে গেলে একা হতে হবে, নইলে সকলের সঙ্গে সমমত হলে মানুষ আত্মতৃপ্ত হয়ে বোধ করে "My obedience makes me a part of the power I worship, and hence I feel strong." এর বিপক্ষে বিদ্রোহে সাহসই সব কিছু নয়, তার আত্ম-উন্নয়ন প্রয়োজন। "Only if a person has emerged from mother's lap and father's commands, only if he has emerged as a fully developed individual and thus has acquired the capacity to think and feel for himself, only then can he have the Courage to say no to power, to disobey." আজ মানুষ সংগঠনের দাসমাত্র। বিশাল উৎপাদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, উৎপাদনের ক্ষমতা ও শৈলি এবং মুনাফা মানুষকে হিসাবের খাতার অঙ্কের সংখ্যা করে তুলেছে মাত্র। এবং নিরবয়ব সংগঠনের শক্তি আজ "organization man" মানুষের মানবিক বিবেককে পর্যুদস্ত করে রেখেছে।

এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? অনেকেই শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন, আবার কেউ—ইতিমধ্যে যারা মানবিক আহ্বান শুনেছেন তাঁদের সংগঠিত করে আন্দোলনে নেমেছেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথম ধাপে পথচারী ব্যক্তি, জন মাধ্যম—যথা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে—কৌতুক বোধ করতে পারে, কিন্তু নতুন করে বুঝে, যেমন মাইকেল স্কট বলেন অবশেষে "allowed themselves to think, what is really happening here." তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন আজ জেগে উঠছে "a kind of fervour and a kind of strength which, if a neuclear war does nor soon end us all,.will make our movement grow until it reaches the point where governments can no longer refuse to let mankind survive."

মতের পথের যত তফাতই হোক, তেইশজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ মানবজীবনের তাপ-পারমানবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলেছেন। জহরলাল নেহরু এ প্রসঙ্গে তাই সবার সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন: "normally one should obey the laws, but when something happens which is objected to on ethical grounds which are valid, then the individual must judge which is better, to obey or to disobey.

অবাধ্যতার স্বপক্ষে বইখানি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সময়োচিত প্রকাশের জন্য সম্পাদিকা শ্রীমতী ক্লারা আবক্র্যহার্ট ধন্যবাদার্হ॥

গৌতম সান্যাল

ব্রাডলির দর্শন : এলিয়টের বিচার

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে দর্শনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার মূল উৎস হেগেলীয় ভাববাদ। এই ভাববাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা এফ. এইচ্. ব্রাড্‌লি। কিন্তু হেগেলীয় প্রভাবে ভাবিত হলেও ব্রাড্‌লির দার্শনিক চিন্তায় চিরকালীন বৃটিশ ইন্দ্রিয়বাদের রেশ লক্ষিত হয়। শুদ্ধ চিৎ-কেই পরম সত্তার স্বরূপ বলে ব্রাড্‌লি মনে করেন—তবুও এই চিৎ শক্তিকে তিনি শুদ্ধ অনুভূতি বলেন। এই চিৎ শক্তি, শুদ্ধ আর অপরোক্ষ। বিষয়-বিষয়ী-সম্পর্ক-সাপেক্ষ ন্যায়াশ্রক চিৎ শক্তিব অতীত এই অপরোক্ষ শুদ্ধ অনুভূতি। ব্রাড্‌লির দর্শনে—কি প্রমা-তত্ত্বের আলোচনায় কি পরম সত্তার স্বরূপ আলোচনায় বিষয়-নিরপেক্ষ এই অপরোক্ষ অনুভূতিই মূল বিষয়। সম্প্রতি প্রকাশিত টি. এস. এলিয়ট লিখিত *Knowledge and Experience in the philosophy of F. H. Bradlay* গ্রন্থটিতে উক্ত মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং বিচার পাওয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি এলিয়টের তরুণ বয়সের রচনা। এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক-ছাত্র রূপে অবস্থানকালে তিনি গবেষণা-প্রসূত নিবন্ধ হিসাবে এটি রচনা করেন। আধুনিক চিন্তাজগতে কবি এবং চিন্তাবিদ্ হিসাবে এলিয়টের নাম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে এই গ্রন্থটি এলিয়টকৃত দর্শনের তত্ত্বগত আলোচনার একমাত্র নিদর্শন। তা ছাড়াও এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু হল ভাববাদী তত্ত্বের একটি মূল বিষয়। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে গ্রন্থটি যথেষ্ট কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা জাগায়। কিন্তু যেহেতু এইটি এলিয়টের একমাত্র তত্ত্বগত দার্শনিক আলোচনা—যে-সমস্ত ক্ষেত্রে চিন্তা কিছুটা অসরল এবং অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে দ্বিধা জাগে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি দর্শনের

Knowledge and Experience in the philosophy of F, H. Bradley—T. S. Eliot. (Faber and Faber)

তাত্ত্বিক আলোচনার প্রথাগত পদ্ধতিকে পরিহার করেছেন। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় এলিয়ট নিজেই বলেছেন,…"As philosophizing it may appear to most modern philosophers to be quaintly antiquated." (পৃঃ—১০)

এই উক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে এই বইটির আলোচনা বিভিন্ন প্রধান বক্তব্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। যে সমস্ত জায়গায় বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি যথেষ্ট বিশদ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আশ্রিত, সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া মূলত বক্তব্য বিষয়েব প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই পাঠকের পক্ষে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা।

২. এলিয়ট অপরোক্ষ অনুভূতিব আলোচনা করেছেন মূলত প্রমা-তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। অপরোক্ষ শুদ্ধ অনুভূতিকে সত্তার স্বরূপ মনে করলেও বাস্তব-ক্ষেত্রে লব্ধ বিভিন্ন জ্ঞানের প্রকার বিশ্লেষণ করলে অপরোক্ষ অনুভূতি জাতীয় কোনো কিছু পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে ব্রাডলি নিশ্চিত নন। এলিয়ট এ প্রসঙ্গে মন্তব্য কবেছেন যে এ জাতীয় অপরোক্ষ অনুভূতি কখনই বাস্তবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এই নির্বিকল্প অনুভূতিতে বিষয়ের স্বতন্ত্র প্রকাশ ঘটে না। কারণ এখানে বিষয় ঐ অনুভূতিতেই লীন থাকে। বিষয়-সাপেক্ষ অন্যান্য আকারের জ্ঞানেই ব্যক্তি-সত্তা, দেশ, কাল, বিষয় ইত্যাদি প্রতীয়মান হয়। কিন্তু পরমসত্তা কেবল নির্বিকল্প অনুভূতি।

যেহেতু এই অপরোক্ষ শুদ্ধ অনুভূতিমাত্রই কেবল সত্তাবান—বিষয়ের বাহ্য অস্তিত্ব-এবং ধারণার ভিতরে যথার্থ কোনো পার্থক্য নেই। ব্রাড্‌লি এ তত্ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু, এলিয়ট যে বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্যে বিষয়ের বাহ্য অস্তিত্ব আর তার ধারণার ভিতরের পার্থক্যটিকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তা ব্রাডলির মতালোচনায় কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। এর ফলে এই প্রসঙ্গে ব্রাডলির মতামত এই আলোচনা থেকে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় না। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে এলিয়টের মতামতের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যও কয়েক জায়গায় ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। বিষয়ের বাহ্য সত্তা এবং ধারণার মধ্যে পার্থক্য যে তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি কবে তার বিভিন্ন সমাধান নির্দেশ করে—সেগুলির পরীক্ষা করেছেন এলিয়ট। কিন্তু এলিয়টের নিজস্ব সমাধানের যে-আলোচনা পাওয়া যায়—সেখানে 'বিষয়' বা 'ধারণা'র স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে কখনও তিনি প্রমা-তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, কখনও বা তাঁর আলোচনা

হয়েছে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে—আবার কখনও তারই মাঝখানে তিনি এমন আলোচনার অবতারণা করেছেন যা প্রমা-তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এলিয়ট এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। অন্তত প্রমা-তত্ত্বের আলোচনাকে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা থেকে সচেতনভাবে পৃথক করার প্রচেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

৩. গ্রন্থের উপসংহারে এলিয়ট যে-সমস্ত তাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেছেন—তাদের অনেকগুলির মধ্যেই পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। অথচ এই সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়েই যখন বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন—তখন তিনি এমন কোনো ইঙ্গিতও দেন নি যার সাহায্যে আমরা উক্ত মতগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হতে পারি। উপসংহারে এলিয়ট বলেছেন: (১) "Out of absolute idealism we retain what I consider its most important doctrines, Degrees of Truth and Reality and the Internality of Relations.……(পৃ: ১৫৩)

(২) Cut off a 'mental' and a 'physical' world, dissect and classify the phenomena of each: the mental resolves into a curious and intricate mechanism, and the physical reveals itself as a mental construct." (পৃ: ১৫৪)

(৩) "Knowledge, that is to say, is not a relation, and cannot be explained by any analysis." (পৃ: ১৫৪)

(৪) …"I think that it is perhaps truer to say that the object is independent." (of the knowner) "For qua known, the object is simply there, and has no relation to the knower whatever, and the knower, qua knower, is not a part of the world which he knows : he does not exist." (পৃ: ১৫৫)

উক্তি (৩)-এ এলিয়ট যে-কথা বলতে চেয়েছেন—যে-কোনো ভাববাদী প্রমা-তত্ত্বের, ব্রাড্‌লির মতের এবং এলিয়ট নিজেই জ্ঞান সম্পর্কে যে-সমস্ত কথা বলেছেন তার বিরোধী। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা যে-সমস্ত আকারে জ্ঞান পাই—তার কোনোটিই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়—বিধেয় এবং বিহিত এই দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক সমস্ত ভাববাদী প্রমা-তত্ত্ব (এবং বিশেষত ব্রাডলির প্রমা-তত্ত্ব) অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এবং এলিয়টও এ কথা স্বীকার

করেন। কেবল বিধেয় এবং বিহিত এই দুয়ের মধ্যকার সম্পর্কটিকে জ্ঞান বলা হয় না। এবং এ কথা বাহুল্য মাত্র। কেবল এই অর্থটি বোঝানোর জন্য এলিয়ট নিশ্চয় কথাটি বলেন নি।

শুধু তাই নয়। এলিয়ট নিজেই "Degrees of Truth and Reality" আর "Internality of Relations" স্বীকার করেছেন। কিন্তু অপরোক্ষ শুদ্ধ অনুভূতিমাত্রর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এ সমস্ত প্রসঙ্গ আসে না। কাজেই অন্যান্য বাস্তব আকারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি "Degrees of Truth and Reality" আর "Internality of Relations" স্বীকার করেন তবেই স্পষ্টতই তাঁর উক্তি (১) এবং উক্তি (৩) পরস্পর-বিরোধী।

উক্তি, (৪)-এ এলিয়ট বলেছেন বিষয় কখনই জ্ঞাতাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু তাহলে স্বীকার করতে হয় বিধেয় এবং বিহিতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ত নয়। কারণ, বিষয় জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ হলে "Degrees of Truth and Reality" সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। যদি কোনো তারতম্য থেকেও থাকে—তাহলেও তা কোনো জ্ঞাতার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। এলিয়টের উক্তি (৩) এবং (৪)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু এই দুটি উক্তিকে একত্রে নিলে উক্তি (১)-এর সঙ্গে কোনোমতেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

উক্তি (২)-এ এলিয়ট 'বাহ্যিক বস্তুগত জগৎ' আর 'অন্তরস্থ ভাবের জগৎ'-এর যে বিশ্লেষণ করেছেন তা খুব স্পষ্টভাবেই স্ব-বিরোধী। যে অর্থে এবং যে দৃষ্টিকোণ থে-আলোচনা করলে 'মন' নামক পদার্থে বাহ্য বস্তুর লক্ষণ পাওয়া যায় 'বাহ্যিক বস্তুগত জগৎ'-এর বিশ্লেষণ সে দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় নি। সেই অর্থে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে 'বাহ্যিক বস্তুগত জগৎ' কোনোক্রমেই 'অন্তরস্থ ভাবের জগৎ'-এর সদৃশ হবে না।

উক্তি (৪)-এর শেষ অংশেও ঠিক এই জাতীয় অসুবিধা দেখা যায়। এ বাক্যের স্ব-বিরোধিতা যেন খুবই স্পষ্ট। বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার যে-সম্পর্ক তা নিশ্চয়ই কোনো ভৌতিক সম্পর্ক নয়। অথচ কেবল কোনো ভৌতিক সম্পর্ক নেই বলেই তিনি জ্ঞাতার সঙ্গে বিষয়ের যে কোনোরকম সম্পর্কই অস্বীকার করছেন। অথচ জ্ঞাত বিষয় যে সব সময়েই ভৌতিক লক্ষণযুক্ত হবে —এমন কোনো কথা বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গে বিষয়ের বিষয়বত্তা নিয়ে এলিয়টের আলোচনা কিছু আলোকপাত করতে পারে। বিষয়ের বিষয়বত্তা ইন্দ্রিয়-সংবেদনেই লীন। ব্রাড্লি এ কথা

মানেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এবং চূড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করলে সমস্ত বিষয়-বস্তুই সেই পরম সত্তারূপ অপরোক্ষ অমিশ্র অনুভূতিস্থ বলে প্রতীত হবে—এমন কথাই তিনি বলবেন। অথচ এলিয়ট বিষয়ের বিষয়বস্তুকে বিচার এবং বিশ্লেষণ করেছেন প্রাথমিকভাবে প্রমা-তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারপরে সেই বিচার এবং বিশ্লেষণকে উপস্থাপিত করেছেন মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে। মনোবিজ্ঞানের যে-ধারণা এলিয়ট প্রকাশ করেছেন তা অনেকাংশেই বস্তুবাদ-সংগত। 'মন' বা 'চিৎ শক্তি'র আধারে তিনি প্রায়শই ভৌতিক ধর্ম আরোপ করেছেন। এ জাতীয় তত্ত্বের স্বপক্ষে যে কিছু বলা যায় না তা নয়। কিন্তু এলিয়ট এই তত্ত্বের অবতারণা যে-প্রসঙ্গে করেছেন সেই প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখি এলিয়টের আলোচনা প্রসঙ্গের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ নয়। ব্রাডলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমা-তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলতে ব্রাডলির যা ধারণা সেখানে 'মন' বা 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি' ব্যাখ্যায় ভৌতিক ধর্ম আরোপের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক এই প্রসঙ্গে ব্রাড্‌লির মতবাদ কতখানি যুক্তিযুক্ত, কোথায় তার ত্রুটি, সেই মতবাদ থেকে এলিয়টের মতপার্থক্য কোথায়—সে সম্পর্কে এলিয়ট সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি'র আলোচনায় ভৌতিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকেছেন এলিয়ট—অথচ রাসেল প্রমুখ তাত্ত্বিকের মতবাদ আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

৪. কোনো এক বিশিষ্ট জ্ঞাতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীত বাহ্য-বিষয় অপর এক বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীত বাহ্য-বিষয় থেকে পৃথক্। অথচ অসংখ্য বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীত বিভিন্ন আকারের বাহ্য-বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় কি করে? এই সমন্বয় ছাড়া এক অখণ্ড বাহ্য জগৎ পাওয়া যায় না। অথচ এই সমন্বয় সাধনের জন্য যথার্থ কোনো নিরপেক্ষ বাহ্য জগতের সত্তা ব্রাড্‌লি স্বীকার করেন না। এই সমস্যার সমাধান ব্রাড্‌লি যেভাবে করেছেন—তা বোঝানোর জন্য এলিয়ট লিবিনিজের একটি বিশেষ তত্ত্বের (Monadology) সঙ্গে ব্রাড্‌লির চিন্তাধারার তুলনা করেছেন এবং উভয় তত্ত্বের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। এলিয়টের মূল নিবন্ধের এই অংশের আলোচনা অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকায় বইটিতে আরও দুটি প্রবন্ধ (Development of Leibniz' Monadism ও Leibniz' Monads and

Bradley's finite Centres) সংযোজিত হয়েছে। অনেক তত্ত্বেরই ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব এবং অনেকাংশেই হয়তো যুক্তিসংগত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এলিয়ট যেভাবে দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন—তাতে এমন কতগুলি অনুসিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিতে হয় যা হয়তো এলিয়ট নিজেও সমর্থন করবেন না। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের উক্তির কিছু কিছু উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে।

এলিয়টের মতে "And it is just the impenetrability of the Leibnizian monads which constitute their originality and which seems to justify our fiinding a likeness between Leibniz and Bradley." (পৃঃ ১৯৯) বিভিন্ন 'Monad'-এর মধ্যকার যে সম্পর্ক লিবনিজ্ নির্দেশ করেছেন ব্রাড্লি-কথিত সসীমবিশিষ্ট জীবের মধ্যে সেই সম্পর্কটি আরোপ করলে—কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ব্রাড্লির সসীমবিশিষ্ট দৃষ্টিকোণগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংবাহনকে অস্বীকার করলে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীত বাহ্য-বিষয়ের স্ববিরোধিতা বা অসম্পূর্ণতা কোনো-মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। অন্যদিকে বিভিন্ন Monad-এ প্রতিফলিত বাহ্য-জগতের রূপে কোনো স্ববিরোধিতা বা অসম্পূর্ণতা নেই—অন্তত কোনো এক বিশেষ Monad সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে না।

এলিয়টের মতে ব্রাড্লি ও লিবনিজের তত্ত্বের সাদৃশ্যের বিভিন্ন সূত্র··· "(1) complete isolation of monads from each other ; (2) sceptical theory of knowledge, relativistic theory of space, time, and relations, a form of anti-intellectualism in both writers ; from which follows (3) the indestructibility of the monads (4) the important doctrine of "expression······The relation of soul and body, the possibility of pan-psychism, the knowledge of soul by soul, are problems which come to closely similar solutions in the two philosophies" (পৃঃ ২০০)

উদ্ধৃত অংশের প্রথম সাদৃশ্যের অসুবিধা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি সাদৃশ্যের বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা না করেও কতগুলি মন্তব্য করা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না। ব্রাড্লির 'Pan-Psychism' লিবনিজের তত্ত্বে আরোপ করলে ব্রাড্লির স্বতন্ত্র ভাববাদী ন্যায়ের গুরুত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। লিবনিজের দার্শনিক চিন্তায় ভাববাদের বহু বীজ উপ্ত

থাকলেও এবং বহু ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে ভাববাদের নির্দেশক হলেও ভাববাদী ন্যায়কে তিনি স্বীকার করবেন বললে তাঁর বক্তব্যের যথাযথ বর্ণনা হয় না। ভাববাদী ন্যায় তাঁর দার্শনিক চিন্তায় অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যাবশ্যক কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তা ছাড়াও বিভিন্ন Monad-এর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং দেহ-আত্মার সম্পর্ক নির্ণয় ঈশ্বরের চমৎকারা শক্তিতে আশ্রয় 'একেশ্বরবাদ'-এর প্রতি তাঁর অটল আস্থা প্রকাশ করে। অন্যদিকে 'একেশ্বরবাদ'কে ব্রাড্‌লির ভাববাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে স্বীকার করলে ব্রাড্‌লির ভাববাদের বৈশিষ্ট্য এবং তার গুরুত্বকে অস্বীকাব করা হয়।

৫. প্রমা-তত্ত্বকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা এবং যদি যায়—তার প্রকৃত সমস্যা কি এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রমা-তত্ত্বের ক্ষেত্র কিরূপে ভিন্ন—সে সম্পর্কে এলিয়ট এক আয়াসসাধ্য আলোচনা উত্থাপন করেছেন।

ব্রাড্‌লির আলোচনায় প্রমা-তত্ত্বের কোন প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ—সে বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন। প্রমা-তত্ত্বের বিষয় নির্দেশ করতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন: "...whether there is any reality for thought to reach and whether thought reaches it—the absolute validity of knowledge is the problem of the theory of knowledge. There are evidently three divisions of the question: the problem of the genesis of knowledge, of the structure of knowledge, and of the possibility of knowledge.". (পৃঃ ৮৪) এবং "It is, I believe, the position of all sound idealism, and I believe the position of Mr. Bradley, that the only real problem is the second." (পৃঃ ৮৪)

ব্রাড্‌লিব দার্শনিক চিন্তায় প্রমা-তত্ত্বের কোন সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে—সে সম্বন্ধে নির্দেশ করলেও এলিয়ট কিন্তু তাঁর আলোচনায় তৃতীয় সমস্যা নিয়েই বেশি আলোচনা করেছেন: "...the present chapter is consider to claims of the third problem." (পৃঃ ৮৫) এই আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ব্রাড্‌লির মতামতের উল্লেখও আছে—কিন্তু অন্যান্য বহু দার্শনিকের মতবাদের বিচার (যেমন Meinong, Russell ইত্যাদি) রয়েছে। কিন্তু ব্রাড্‌লি সমস্যাটিকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন—তার সঙ্গে এই

আলোচনার যোগসূত্রটি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কাজেই এলিয়টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না।

প্রমা-তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জ্ঞানের 'বিষয়' স্বতন্ত্ররূপে আছে কিনা—এলিয়টের আলোচনায় এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এলিয়ট বিষয়ের বিষয়বত্তা পান নি এবং অমিশ্র তাত্ত্বিক আলোচনায় তা লভ্য নয় বলেই বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে—"what constitutes a real object, accordingly, is the practical need or occasion." (পৃষ্ঠা ১০১)

তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন : "We arrive at objects, as I have tried to show, by meaning objects ; sensations organize themselves around a (logical) point of attention and the world of feeling is transmogrified into a world of self and object. We thus have an object which is constituted by the denoting, though what we denote has an existence as an object only because it is also not an object, for qua object it is merely the denoting, the projection of shadow of the intention ; as real object it is not object, but a whole of experiences which cluster round the point of denotation. Now in practice do we use the complen meaning or only the denotation ? I do not see any final answer to this question." (পৃ: ১৩৭)

প্রমা-তত্ত্বের মূল প্রশ্ন বলে এলিয়ট যা মনে করেন তার যথাযথ মীমাংসা সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যয় তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি। বিষয়বত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর দ্ব্যর্থক এবং দ্বিধাগ্রস্ত মতামতের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। প্রমা-তত্ত্বের প্রশ্নের তাত্ত্বিক মীমাংসা সম্ভব নয়—অথচ প্রয়োগক্ষেত্রেও সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। তা হলে অসুবিধা কোথায় ? প্রমা-তত্ত্বের প্রশ্নটিকে এলিয়ট যেভাবে উত্থাপিত করেছেন তার নির্ণয় প্রয়োগ-ক্ষেত্রেও সম্ভব নয়—কারণ প্রয়োগক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করলে প্রমা-তত্ত্বের মূল প্রশ্ন ঠিক ঐভাবে উত্থাপিত করা যায় না।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পের প্রয়োজন

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত শিল্প-বিষয়ক আলোচনা-সাহিত্যে আর্নস্ট ফিশারের *The Necessity of Art* একটি প্রশংসনীয় অবদান। প্রচলিত রীতির বদ্ধ আবহাওয়া থেকে একটা ব্যতিক্রমের তাজা নিশ্বাসের তাপ রয়েছে বলেই, এ বইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ফিশারের গ্রন্থ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় শিল্পের ধর্ম, যে ধর্ম লেখকের মতে দ্বৈত—একদিকে বহির্জগৎকে আলোকিত করে মানুষকে সে-জগৎ পরিবর্তনে সাহায্য করা; অন্যদিকে দ্যোতনার মায়াজাল রচনা করে মানুষের অনুভূতিজাতকে নাড়া দেওয়া।

এই মায়াজাল রচনা বা magic-এর প্রবণতা শুরু হয়েছিল আদিম যুগে প্রকৃতিকে বশীভূত করার প্রয়াস থেকে। এ উদ্দেশ্যে অঙ্কিত গুহাচিত্র থেকে কী করে শিল্পের জন্ম হয়েছে, তার ইতিহাস ফিশার বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

সবচেয়ে আকর্ষক মৌলিকতার আস্বাদ পাওয়া যায় এর পরের অধ্যায়ে যেখানে লেখক ধনতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যে বিভিন্ন প্রবণতার সংবেদনশীল আলোচনা করেছেন। এতকালের মার্কসবাদী আলোচনাক্ষেত্রে, এ সমাজের অধিকাংশ সাহিত্যরীতিকে হয় প্রতিক্রিয়াশীল নয় পলায়নপ্রবণতা নয় ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি শূন্যগর্ভ বিশেষণের দ্বারা নস্যাৎ করার যে-নিয়ম প্রচলিত ছিল, ফিশার তার পরিবর্তে এই ভিন্ন রীতিগুলিকে বৃহত্তর মানবসমাজের শিল্প-ঐশ্বর্যের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনীয় স্তর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোনো মার্কসবাদী লেখকের কাছ থেকে বোদলেয়ার ও কাফ্‌কার সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা এই প্রথম আমার চোখে পড়ল।

চতুর্থ অধ্যায়টি শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বা form ও content-এর উপর

The Necessity of Art: A Marxist Approach—Ernst Fischer, Penguin Books. S. 4/6

রচিত। শেষ অধ্যায়ের নাম The Loss and Discovery of Reality. আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ-ভীতি এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় নতুন শিল্পসৃষ্টির সমস্যা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

স্পষ্টতই ফিশারের গ্রন্থের পটভূমি সুবিস্তীর্ণ। নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বে ঐশ্বর্যমণ্ডিত বলেই কোনো স্বল্পপরিসরব্যাপী সমালোচনা বইটির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। উৎসাহী পাঠকদের পঠনেই ফিশারের রচনার সার্থকতা পূর্ণ হবে। বইটি পড়ে আমার কাছে যে-অংশগুলি নতুন চিন্তায় চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে, এ প্রবন্ধে তার দু-একটি উল্লেখ করব এবং যে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের প্রতি ফিশার হয় উদাসীন নয় স্বল্প গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলি আলোচনা করব।

কারণ *The Necessity of Art*-কে মনে হয়েছে যেন অর্ধপথে এসে থেমে গেছে। মার্কসবাদী শিল্প-সমালোচনার বনেদী কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্ত হয়ে ফিশার শিল্পজগৎকে দেখেছেন। ফলে এতদিনের উপেক্ষিত, শিল্পকলার নন্দনতাত্ত্বিক দিকটিকে সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি ও পরিবর্তনের সঙ্গে শুধু সমাজ নয় ব্যক্তি-মানুষের অনুভূতি ও অনুষঙ্গের যে-যোগাযোগ রয়েছে, তার কোনো সন্তোষজনক আলোচনা চোখে পড়ল না।

দুই

প্রথম অধ্যায়টি বহু তথ্যে সমৃদ্ধ হলেও, মূলত প্লেখানভ ও জর্জ টমসনের বক্তব্যের ধারানুসারী। বরং নতুন চিন্তার প্রকাশ রয়েছে এর পরের অধ্যায়ে। আদিম সমাজে গোষ্ঠীর থেকে ব্যক্তির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে যে-শিল্পধারার উদ্ভব হল, তার চরম পরিণতি ধনতান্ত্রিক সমাজে। ব্যক্তি-শিল্পীর স্ব-সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে ভিন্ন রূপ, তার একটি প্রধান চিত্র পাওয়া যায় বোদলেয়ারের কাব্যে। বোদলেয়ারের কলাকৈবল্যবাদের সমর্থনে ফিশারের যুক্তিটি চিত্তাকর্ষক: "বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মতুষ্ট জগতের বিরুদ্ধে বোদলেয়ার সৌন্দর্যের পবিত্র প্রতিমূর্তি তুলে ধরেছিলেন। ইতর ভণ্ড বা নিস্তেজ কার্তিকদের কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে বাস্তব জগৎ থেকে পালাবার রাস্তা, একটা ধর্মীয় পরিতৃপ্তির চিত্র মাত্র, একটা সস্তা ওষুধ। কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতা থেকে যে-সৌন্দর্য মাথা তুলে দাঁড়ায় সে যেন পাথরের বিশাল প্রতিমা, নির্দয় ও অনমনীয় দেবী নিয়তি। যেন জ্বলন্ত তরবারি হস্তে ক্রুদ্ধ দেবদূতী।

যে জগতে কুৎসিত, পচা অসারতা এবং অমানুষিকতা সাড়ম্বর, সে জগৎকে বিবস্ত্র করে ধিক্কৃত করছে তার তীব্র দৃষ্টি। তার উজ্জ্বল নগ্নতার কিরণে সকল পরিচ্ছদের আড়ালের দারিদ্র্য, প্রচ্ছন্ন ব্যাধি এবং গুপ্ত পাপ আত্ম-প্রকাশিত।" এই জাতীয় মৌলিক অনুধাবনের সঙ্গে কাব্যিক গুণের সমন্বয়ই ফিশারের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য।

Zola সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ন্যাচরলিজমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে ফিশারের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "In this objective portrayal of appalling social conditions and in this refusal to describe them as changeable lie both the strength and the weakness of naturalism. Here is to be found its duality. There comes a moment of decision when naturalism must either break through to socialism or founder in fatalism, symbolism, mysticism, religiosity and reaction."

আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন পাঠকের কাছে সবচেয়ে সমাদর পাবে কাফ্‌কার উপর ফিশারের মন্তব্য। মার্কসের alienation-এর তত্ত্বকে আরও ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করে লেখক দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ মানুষ তার নিজস্ব নির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী ও শাসনপ্রণালী থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কাফ্‌কার উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা একটা অক্ষমতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক জগতে নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের থেকে জনসাধারণের জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার প্রতিও লেখক ইঙ্গিত করেছেন। এ সমস্যাটা জীবন্ত বলেই পাশ্চাত্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে ভীতি, নৈরাশ্য ও অর্থহীনতাবোধের প্রবণতা-গুলিকে ফিশার অনুভূতির সততা বলে মনে করেছেন।

যদিও উভয়ের প্রকাশপদ্ধতি প্রায় সমধর্মী, কাফ্‌কা ও ব্রেখ্‌টের মানসিকতার তফাতটা ফিশার খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন: "কাফ্‌কার মনোভাব ছিল অনিশ্চয়তার। তিনি ছিলেন অপমানিত ও উৎপীড়িতদের স্বপক্ষে এবং ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু যে জনসাধারণকে তিনি সমর্থন করতেন, তারা যে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারবে, সে ক্ষমতায় তাঁর আস্থা ছিল না। প্রতিটি নতুন আশার পিছনে তাঁর মনে নতুন একটা ভয় ছিল, প্রতিটি উত্তরের মুখে নতুন প্রশ্ন। ব্রেখ্‌টের সাহস ছিল এ প্রশ্নের উত্তর

দেবার···তিনিও জানতেন যে প্রত্যেক উত্তর-ই নতুন প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, এ জগতে কিছুই শেষ কথা নয়। কিন্তু এ জ্ঞান তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল, কাফ্‌কার মতো পীড়িত করে নি।"

আর্নস্ট ফিশারের কবিখ্যাতি আছে। তাঁর কাব্যিক সংবেদনশীল মনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ পাই প্রসঙ্গ ও প্রকরণের উপর আলোচনায়, বিশেষ করে ছবি ও সাহিত্যের উপর ছোট ছোট মন্তব্য বা উপযুক্ত উদ্ধৃতিতে। এল্ গ্রেকোর বিখ্যাত চিত্র 'টোলিডোর উপর ঝড়'-এর ছবি অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কজন দর্শকের মনে পড়েছে ব্রেখ্‌টের বিদ্যুৎ-চমকানো কথাগুলি ?—

"Of these cities will remain
Only the wind that swept through them."

কিংবা আরাগঁর একটি কবিতার ব্যাখ্যাও চমকপ্রদ : "যে-কথাটা মুখে মুখে প্রচলিত, হাতে-ঘোরা পয়সার মতো, তাকে কবি ঘৃণা করেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ এ পয়সাটা মাটিতে পড়ে গিয়ে বেজে উঠল। তখন সে কথাটার শব্দঝংকার এমন অনেক ভাবানুষঙ্গকে জাগিয়ে তুলল, যেগুলি অনেককাল, প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষার ধুলোর তলায় আত্মগোপন করেছিল।"

শেষ অধ্যায়ে ফিশারের যে-দুটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, তার একটি বর্তমান যুগে শিল্পীর আঙ্গিক অন্বেষণের সমস্যা এবং জনসাধারণের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া রুচির বিরোধ। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই এ বিরোধের সমাধান সম্ভব, যদিও তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও সমস্যাবহুল।

ফিশারের দ্বিতীয় বক্তব্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক জগতের বর্তমান সাহিত্য ও শিল্পকর্মে যে ভয়াবহ কল্পনা পরিব্যাপ্ত তাকে লেখক ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক ব্যাধি বলে উড়িয়ে দেন নি। যুদ্ধের নিত্যনৈমিত্তিক প্রস্তুতি ও প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে এ মানসিকতার জন্ম। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক শিল্পীরা যদি বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামে ব্রতী হন তাহলে এ মনোভাবের গুরুত্ব যথোপযুক্তভাবে অনুধাবন করতে হবে, কারণ বর্তমান শিল্পকর্মের জগতে ভয়াবহ নৈরাশ্যের এ কল্পনা সমাজতান্ত্রিক শিল্পীগোষ্ঠীর চিন্তার কাছে প্রায় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে ফিশারের শেষ বক্তব্যের যথার্থতা তর্কাতীত : "William Faulkner's tremendous novel 'Sanctuary'—a tragedy

about the impotence of human beings who, when they try to break out of their allotted social situation, are destroyed in the attempt or driven back into the past—has not yet found its socialist counterpart."

The Necessity of Art শেষ হচ্ছে মানুষের জয়যাত্রার উপর প্রচণ্ড আস্থায়: "শিল্পের মৃত্যু নেই যতদিন না মানবসমাজের মৃত্যু ঘটে।"

তিন

শিল্পের প্রয়োজন কি—এ প্রশ্নের আগে আর-একটা প্রশ্ন থেকে যায়—শিল্প কেন মানুষের কাছে সুন্দর লাগে? ফিশার শিল্পের যে দ্বৈত ধর্মের কথা বলেছেন, তার মূল আবেদন কিন্তু দর্শক বা পাঠক বা শ্রোতার সৌন্দর্যবোধের কাছে। সমাজ পরিবর্তনের আহ্বানপূর্ণ বক্তৃতা সবসময়ে শিল্পের মর্যাদা পায় না। আবার আদিম সমাজেও সবরকম ম্যাজিক বা মায়াজাল রচনাই শিল্প ছিল না; কারণ সে যুগে ম্যাজিকের প্রাথমিক আবেদন ছিল মানুষের অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তির ইচ্ছাবোধের কাছে। ম্যাজিক-কে বলা চলতে পারে বাঞ্ছাকল্পতরু। সুতরাং শিল্পের মূল ধর্ম সৌন্দর্য।

এ সৌন্দর্য কি? প্রতি যুগে প্রতি দেশে, এমনকি সমসাময়িকদের মধ্যে প্রতি মানুষেও সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কেন পরিবর্তনশীল? মানুষের মনের কোন অনুভূতির সঙ্গে এ বোধের অনুষঙ্গ? কতখানি সমাজের ও কতখানি ব্যক্তির নিজস্ব ভাবধারার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ জড়িত? এ সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও মেলে নি; এ প্রসঙ্গে শেষ কথা বলার দাবি কেউই করতে পারে না। কিন্তু যে-কোনো শিল্প-বিষয়ক আলোচনায় এ প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রবেশ করা দরকার। ফিশারের গ্রন্থে এর অভাববোধ পাঠকদের ব্যথিত করে।

সৌন্দর্যের স্রষ্টিকারী, অর্থাৎ শিল্পী, এবং শিল্পের রসগ্রাহীর সম্পর্কের মধ্যেও সৌন্দর্যবোধের রূপান্তরটা লক্ষণীয়। যে শিল্পী আদিম যুগের গুহায় কোনো হরিণের ছবি এঁকেছিল, সে-চিত্রের রেখার ছন্দ সম্বন্ধে সে নিজে কতখানি সচেতন ছিল এবং তার আধুনিক দর্শক আজ সে চিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কতখানি সুনিশ্চিত? Great Art is unconscious creation—এই বহু-ব্যবহৃত বাক্যটির মধ্যে হয়তো এখনও কিছু সত্য থেকে থাকবে। তাঁর

চিত্রে কোন রেখার বিশেষ টান বা কোন রঙের ছায়া কোন দর্শককে কিভাবে অভিভূত করবে, তা চিত্রকর নিজেও জানেন না। রসজ্ঞ দর্শকের চোখে অবহেলিত চিত্রের মহত্ত্ব অনেক সময়ই আবিষ্কৃত হয়েছে।

আসলে মানুষের সৌন্দর্যবোধের কাছে শিল্পের যে আবেদন তা মূলত নির্ভর করছে শিল্পের প্রাথমিক উপকরণের সুবিন্যাসে। অর্থাৎ কোনো সংগীতে শব্দের সুরলহরি বা চিত্রে রঙের সামঞ্জস্যবিধান শ্রোতা বা দর্শকের মনে যে-সাড়া জাগায়, সে সাড়ার স্থায়ীত্ব নিছক কাহিনী বর্ণনার রোমাঞ্চ থেকে অনেক দীর্ঘ। এইজন্যই সভ্যতার শৈশবে অঙ্কিত গুহাচিত্রে শিকারের কাহিনীর যে ম্যাজিকের মূল্য ছিল তার শিল্পী এবং তদানীন্তন দর্শকের কাছে, আজকে সে মূল্য ছাপিয়ে আধুনিক দর্শকের কাছে বড় হয়ে উঠেছে ঐ চিত্রের সরল রেখার আশ্চর্য ছন্দ।

মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ অঙ্গ তার abstract করার ক্ষমতা অর্থাৎ কোনো জটিল পদার্থ থেকে তার একটি গুণকে নিষ্কাশন করে বিমূর্তিকরণের শক্তি। ফিশার বর্ণনা করেছেন কিভাবে যন্ত্র নির্মাণ কবতে গিয়ে আদিম মানুষ ভিন্ন যন্ত্রকে ভিন্ন নামকরণের মাধ্যমে প্রথম abstract করতে শেখে। আধুনিক যুগে এই অ্যাবস্ট্রেকশনের ধারা আরও সূক্ষ্ম হতে চলেছে। বিশেষত, শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্পের প্রাথমিক উপাদান—শব্দ, সুর, রং, রেখা ইত্যাদিকে বিমূর্ত করে প্রকাশের প্রবণতা আজ সর্বব্যাপী। নারী-দেহের যে চিরাচরিত অঙ্গসৌষ্ঠব, তাকে ঘিরে যে পরিচিত রেখার ছন্দ, পিকাসোর নারীমূর্তির চিত্রে তা বেপরোয়া ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। তবুও সে চিত্রে রেখার যে নিজস্ব গতি সৃষ্টি হয়েছে, সে অচেনা চলনভঙ্গি অনুসরণ করতে রসগ্রাহীমাত্রেই উৎসুক কেন?

তাই দেখা দরকার, সৌন্দর্যবোধের যে সদাপরিবর্তনশীল সংজ্ঞা, তার মধ্যে কতখানি শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তা, কতটা দর্শক বা শ্রোতার ভাবানুষঙ্গ এবং কি পরিমাণ শিল্পমাধ্যমের নিজস্ব উপকরণের গুণাবলী জড়িত রয়েছে। এ উপকরণের প্রকাশক্ষমতা অবশ্যই নির্ভর করছে শিল্পীর ব্যবহারের মুন্শীয়ানার উপর। প্রতি যুগেই সৌন্দর্যবোধ মানে নানা অনুভূতির মিশ্রণ। আদিম যুগে শিল্পকলার যে-সৌন্দর্য, তার সঙ্গে জড়িত ছিল স্রষ্টা ও রসগ্রাহীর বিভিন্ন চিন্তা—অজ্ঞেয় প্রকৃতিজগতের ভয়, অভিলষিত বস্তুর আকাঙ্খা, দৈনন্দিন জীবনের উপকারিতা বিচার। আর-এক যুগে শিল্প-

সৃষ্টির প্রাথমিক বিচারবোধ ছিল সৌসাদৃশ্য রচনার ক্ষমতা। সমাজ পরিবর্তন করা বা সমাজের প্রতিবিম্ব নির্মাণের উপরও, সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভিন্ন যুগের এই সকল বিভিন্ন চিন্তা বা অনুভূতির সংমিশ্রণে সেসব যুগের সৌন্দর্যবোধ তৈরি হয়েছে। আজও বিমূর্ত চিত্র বা সংগীতের প্রাথমিক আবেদন যদিও দর্শক বা শ্রোতার রঙ-রেখা বা সুর-শব্দের রসবোধের কাছে, সাহিত্যের সৌন্দর্যবিচারের মাপকাঠি কিন্তু পাঠকের বিভিন্ন চিন্তা ও অনুভূতি। এ চিন্তা সমাজ পরিবর্তনের ইচ্ছা হতে পারে, আধুনিক মনের জটিলতাবোধ হতে পারে, বর্তমান সম্বন্ধে নৈরাশ্যও হতে পারে।

কিন্তু অ্যাবস্ট্রেকশনের ক্ষমতার প্রসার যত বাড়বে, হয়তো সাহিত্য-রচনাতেও তার প্রকাশ ঘটবে। এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমান পাঠকদের যে-সৌন্দর্যবোধ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে সাহিত্যিক উপকরণের ছান্দসিক সমাবেশের আবেদন। আধুনিক শিল্পে যে বিমূর্তিকরণের প্রকাশ ঘটছে, তার সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক শিল্প ও সাহিত্য-সমালোচনায় অ্যাবস্ট্রেকশনের প্রয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পের আবেদন বা রসগ্রাহীর সৌন্দর্যবোধের বিচারের সময়; আধুনিক সমালোচকের কর্তব্য শিল্পকর্মের কোন অংশটি পাঠক বা দর্শকের কোন অনুভূতি ও রসবোধের কাছে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, তা বিচ্ছিন্ন করে দেখা। সৌন্দর্যবোধ নামক মিশ্র অনুভূতি থেকে, শিল্প-উপকরণ সম্বন্ধে রসবোধকে বিমূর্ত করে দেখবার দিন এসেছে।

এ প্রসঙ্গে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কথা-আশ্রয়ী সুরের থেকে কথামুক্ত শব্দের সুরময় বিন্যাস শ্রোতার কাছে অনেক দ্যোতনা নিয়ে আসে; তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভাণ্ডারের কোনো প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির সূত্রকে টেনে তোলে। বস্তুজগতের চেনা মানুষের সাদৃশ্য রচনা থেকে মুক্ত রঙ ও রেখার বিমূর্ত সমাবেশ দর্শকের কল্পনাজগৎকে নাড়া দেয়; কোনো রঙের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত ভাবানুষঙ্গকে জাগিয়ে তোলে। এই বিমূর্ত শিল্প একদিক দিয়ে রসগ্রাহীর কল্পনাশক্তির প্রসারের নিমন্ত্রণপত্র, তার সংবেদনশীলতার প্রতি অভিনন্দনস্বরূপ।

ফিশারের গ্রন্থে আর-একটি বিষয়ে আলোচনা কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেছে। সেটা হচ্ছে শিল্পরচনা ও শিল্পের রসগ্রহণে ব্যক্তির ভূমিকা।

ফিশার বলেছেন, গোষ্ঠীসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তি-শিল্পীর নিজস্বতা-প্রাপ্তির কথা। তার শিল্পরচনায় সমাজের প্রভাব-ই বেশি। সভ্যতার আদি যুগে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মানবসমাজের অগ্রগতির অঙ্গ ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের প্রসার। আদিম যুগে মানুষ, যতটা তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও সমাজের দাস, তার সৃষ্টিকর্মে এই পরিপ্রেক্ষিতের ছাপ ততটা স্পষ্ট। পরবর্তী যুগে মানুষের সৃষ্টিকর্মে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আরও বেশি প্রসারলাভ করবে। মহৎ শিল্পীদের রচনায় তাই সমসাময়িক সমাজের ছায়ার গণ্ডী পেরিয়ে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিক্ষমতার বিরাটত্ব পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার শিল্পকর্ম বিচারে এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার। উভয় সমাজব্যবস্থার ছায়া তাদের শিল্প-সাহিত্যে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু না হলে কি খুব ক্ষতি হবে? শিল্পবিচারের মানদণ্ড কি রাষ্ট্রনৈতিক মনস্তত্ত্ব না ব্যক্তি-শিল্পীর সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা?

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারাশংকরের ছোটগল্প

বাঙালি পাঠকদের মধ্যে কুড়ি টাকা দিয়ে একখানা বই কেনার সংগতি অল্প লোকেরই আছে, কিন্তু একসঙ্গে তারাশংকরবাবুর বাছাই-করা পঞ্চাশটি গল্প যে ঐ দামে বাস্তবিক একটি দাঁও, তা অসংকোচে বলা চলে। এ হল এমন জাতের লেখা যা চোখ বুলিয়ে তারপর বইয়ের তাকে তুলে রাখার বস্তু নয়। এ হল এমন ধরনের লেখা যা পাঠকের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে থাকার মতো। একান্ত নশ্বর এবং বহুলাংশে বঞ্চিত হলেও মানুষের জীবনে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিবিধ ব্যঞ্জনার মধ্যে যে অনাবিল ভাতি শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়ে, তারই নমুনায় অল্পাধিক পরিমাণে এই গল্পগুলি পরিপূর্ণ। তারাশংকরের কাছে বাঙালি পাঠকের ঋণের অবধি নেই।

বাংলা সাহিত্যে গল্পকার তারাশংকরের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কারও আছে বলে মনে হয় না। জীবিতদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য; যুগের বিচারে সাহিত্যের অমরাবতীতে তাঁর অবস্থিতি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে—শিল্প-মীমাংসায় সর্বসম্মতি প্রায় অসম্ভব হলেও এ-কথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে।

তারাশংকরের রচনায় আছে এমন এক সততা, যা তাঁর শিল্পমানসিকতায় যে অভাব ও হ্রস্বতা আছে, তাকেও যেন পূরণ করে দিতে পারে। রাঢ় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক জীবনে আপাতরুক্ষতার মধ্যেও যে প্রাচুর্য ও মানবিক গভীরতার সন্ধান স্বাভাবিকভাবেই তিনি পেয়েছিলেন, তারই অমোঘ আকর্ষণে তাঁর শিল্পীসত্তার পত্তন। ঋষিদেরই মতো শিল্পীকেও সত্যদৃষ্টির তুরীয় স্তরে আরোহণ করতে হলে যে অকরুণ নিরাসক্তি আয়ত্ত করতে হয়, তা কখনও তারাশংকর বোধ হয় কামনা পর্যন্ত করেন নি। এতে আমরা দুঃখবোধ করব না, বরঞ্চ আনন্দ পাব। মানুষের প্রতি সহজ মমতা নিয়ে তিনি শুনেছেন, দেখেছেন, ভেবেছেন, সাধ্যানুযায়ী নিদিধ্যাসন

গল্প-পঞ্চাশৎ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুন্দ পাবলিশার্স। ১৩৭০। কুড়ি টাকা।

করেছেন। তারই ফল হল তাঁর বিবিধ কাহিনী, কথঞ্চিৎ পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট হলেও যার গরিমা নিঃসন্দিগ্ধ।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় সুদীর্ঘ ভূমিকায় তারাশংকরের গল্প সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করেছেন। বাংলা ভাষায় ছোটগল্প সম্বন্ধে তিনি এবং অন্যান্য বংসজ্ঞ বিদ্বান্ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করবেন আশা করতে ইচ্ছা যায়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যে এ-বিষয়ে অনুশীলন একটু যেন আয়াসরহিত পদ্ধতিতে চলেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি পূর্বসূরীর কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত। সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনায় বহুকাল পূর্বে 'সাহিত্য' পত্রিকায় যে বিদেশী গল্প বাংলা তর্জমায় প্রকাশিত হত, তার কথা বড় কাউকে বলতে শুনি না—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষকে বড কেউ মনে রাখেন নি। পরিপূর্ণ দরদ নিয়ে পল্লী সমাজের যে-কাহিনী নারায়ণ ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি লিখে গেছেন, শিল্পবিচারে তাকে নস্যাৎ করে নিজেদের উৎকর্ষ নিজেদের কাছে প্রমাণ করে আমরা অনেকে তুষ্ট হতে পারি, কিন্তু সেটা খুব বড়াই করার মতো ব্যাপার নয়। আজকে আমাদের নবীন গল্পকাররা যা লিখেছেন, এবং যেভাবে লিখছেন, তা তারাশংকরের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন, কিন্তু হয়তো বাংলা গল্পের পরম্পরা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারলেই অধুনাতন ধারার সঙ্গে প্রকৃত বোঝাপড়া করা যাবে। এসব কথা অবশ্য রথীন্দ্রবাবুর পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। তিনি এই পঞ্চাশটি গল্পে তারাশংকরের কীর্তির মধ্যে যে মহত্ত্ব ও সৃষ্টিবৈচিত্র্য আছে তারই সুখপাঠ্য বিবরণ দিয়েছেন। গল্পগুলি কবে এবং কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, পরিশিষ্টে তার উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

'রসকলী', 'বেদেনী', 'জলসাঘর', 'তারিণী মাঝি', 'শিলাসন', 'বোবা কান্না', 'ইমারত', 'কামধেনু', 'ডাইনী'—নাম করতে গেলে তো বিপদ, কারণ পঞ্চাশটি গল্পই যে রত্ন, কাকে ফেলে কাকে রাখা যাবে? সুখের বিষয়, পাঠক সব ক'টিকে পাবেন এক মলাটের মধ্যে—এ-সঞ্চয়ন হল এমন এক মধুচক্র, যা থেকে ইচ্ছা হলেই পাঠক সুধাপান করতে পারবেন।

রথীন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করেছেন তারাশংকরের নিজের কথা: "আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন—প্রেমের গল্প আমার বেশি নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।" এ কথা যে ঠিক নয়, তা রথীন্দ্রবাবু বলেছেন—যিনি লিখেছেন

'কবি', প্রেমের গল্প রচনায় তিনি "আড়ষ্ট", মানবে কে ? আর হৃদয় মনের যে-অনুভূতির উপর পৃথিবীর নিত্যবিঘূর্ণন পর্যন্ত নির্ভর করে আছে, তা তারাশংকরের রচনায় স্বল্প স্থান নিয়ে আছে এ কথাই বা মানা যায় কেমন করে ? তবে কয়েকটি ব্যাপার হয়তো না মেনে উপায় নেই। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে মহারথীরাই বুঝেছেন যে ও-বস্তু না লিখে উপায় নেই অথচ লিখতে নানান্ বাধা—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে 'চোখের বালি' পর্যন্ত অনেকেরই চোখে কর্‌কর্ করছে, আর 'নষ্টনীড়' লিখে তো একটু পালাবার পথই তাঁকে বানাতে হয়েছিল। চোখে আর মনে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টায় প্রচুর সাফল্য পেয়েও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রেমের কাহিনীর উপর অনেক আজগুবি লুকোচুরির ছদ্মবেশ পরাতে হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তো প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বাঁধাবাঁধির মধ্যে একটু মায়ার খেলা দেখিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। একাধিক এবং শক্তিশালী আধুনিক লেখক যে সাহসে বুক বেঁধে প্রেমের গল্প লেখেন নি বা লিখছেন না, তা নয়, কিন্তু তাঁরা যে-এলাকায় স্বচ্ছন্দবিহার করতে পারেন কিংবা পারেন বলে কল্পনা করেন, তারাশংকর তাঁর বিশিষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে সেখানে হাজির হতে অপারগ। তাই প্রেমের গল্প—এবং অরণ্যদাহের মতো সম্পূর্ণ ও সার্থক্ অনুভূতির গল্প লিখতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সমাজে যারা অন্তেবাসী তাদের কাছে, সীমিত হলেও জীবনসত্য যাদের কাছে ভীতি, ত্রস্ত, কুণ্ঠায় বিকৃত হয়ে পড়ে নি, তাদের কাছে। বহু অবান্তর আগ্রহ তারাশংকরকে বিচলিত করেছে, অকারণ বাচালতার দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু মূলত তিনি সত্যাশ্রয়ী, এবং এই মহাগুণই তাঁর প্রতিনিধিমূলক এবং শ্রেষ্ঠ রচনাকে ক্ষুদ্রতার স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছে।

তারাশংকরের মুখ্য পরিচয় হল তিনি "গল্পকার"—রথীন্দ্রনাথের এই শব্দচয়নটি অত্যন্ত শোভন হয়েছে। তাঁর উপন্যাসাবলীতে মনোহারিত্বের অভাব নেই, কিন্তু সেগুলি বোধ হয় প্রকৃতই হল উপকথা। বিস্তৃতি ও সংহতির যে সুঠাম সামঞ্জস্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের লক্ষণ, তা আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে অতি কদাচ দেখা গেছে। ঘটনাপরম্পরা ও চরিত্রচিত্রণে যে সূক্ষ্মতা এবং জটিলতা বিনা উপন্যাস তুঙ্গারোহণে অসমর্থ, সেদিকে তারাশংকরের অভিনিবেশ সীমিত এবং কথঞ্চিৎ অধৈর্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের খণ্ডাংশে মানুষের মহিমা গোচর করার মতো দৃষ্টি তাঁর আছে বলে সেই মহিমারই ব্যঞ্জনা

তারাশংকরের শ্রেষ্ঠ গল্পকে সততা ও সৌকর্যের সুরভিতে মণ্ডিত করে রেখেছে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য তারাশংকরের গল্প বিষয়ে সুপাঠ্য ও সুচিন্তিত আলোচনা ব্যপদেশে বলেছিলেন যে তাঁর "জীবনান্বেষণ ক্লান্তিহীন।" এই অন্বেষণে নিয়ত ব্যাপৃত থেকে জীবনবোধ যে সামগ্রিক রূপ নিয়েছে, তারই পরিচয় তাঁর রচনায় সহস্র আলেখ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষকে সদাশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ মনে করার কোনো হেতু যে নেই তা তিনি ভালো করে জানেন বলেই এই অস্থির, অশান্ত, অবাধ্য ও প্রায়শ অবোধ্য জীব এবং তার জীবন-যাত্রার মধ্যে সর্ববিধ গ্লানিকে অতিক্রম করার মতো শক্তি ধরে এমন মহিমার প্রোজ্জ্বল অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কৃতনিশ্চয়। প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে তাই প্রবৃত্তির দংশনী লীলা সম্বন্ধে অপ্রতিভ বোধ করে চোখ বুজে ফেলার মতো অস্বস্তি তাঁর রচনাকে কণ্টকিত করে নি। 'তারিণী মাঝি' গল্পে দেখা যাবে যে জীবনসত্য একান্ত নিষ্ঠুর—প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে জয়ী হল মানুষের জিজীবিষা—এ আবিষ্কারে হয়তো কিছু আর্তি আছে কিন্তু খলতা নেই, ক্ষুদ্রতা নেই। 'জলসাঘর' ও অনুরূপ কাহিনীতে একই সঙ্গে আছে সমাজজীবনে নতুন মূল্যসৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহ এবং প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও প্রাচীন জীবনের অনায়াস আত্মগরিমা সম্বন্ধে ঈষৎ ঈর্ষান্বিত প্রশস্তি—এর কারণ এই যে তারাশংকরের বিশিষ্ট গুণ তাত্ত্বিকতা নয়, মানব-মমতা। এই মমতা তাঁকে লিখিয়েছে 'কামধেনু'-র মতো গল্প, যার নায়ক পটুয়া, ধর্মে মুসলমান, আচরণে হিন্দু, জীবিকায় শিল্পী—ভারতবর্ষের মাটির স্পর্শ যার কায়মনোবাক্যে, যার সকল আবেগে। এরই উদাহরণ হল মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে লেখা 'শেষ কথা'—জীবনে যত পূজা তা সারা হয় নি, কিন্তু পরিণতি এসেছে স্থির, স্নিগ্ধ পদক্ষেপে, প্রাণের ভুবন পূর্ণ হয়েছে।

আধুনিক রচনা এই সহজ ব্যাপ্তিকে বর্জন করতে চাইছে—বিশিষ্ট মুহূর্তকে শিল্পের অষ্টধাতু দিয়ে ভরে তোলা তার লক্ষ্য ; খণ্ড, হ্রস্ব, বিক্ষিপ্ত অস্তিত্বকে মমতার সূত্রে বেঁধে নিতে তার অনীহা। এই অত্যাধুনিকতার বিচারে তারাশংকর উত্তীর্ণ হবেন না। এ-ও সত্য যে অপরাপর বহুজনের বহু প্রত্যাশা তিনি তুষ্ট করতে পারেন নি। পরিশ্রমী শিল্পী হয়েও তিনি চিন্তা ও বাক্যে কথঞ্চিৎ শৈথিল্য দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে অকারণ বাগ্‌বিস্তার, এমনকি বাচনভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতাও তাঁর লেখায়

উপস্থিত হয়ে থাকে। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিপুল ঐশ্বর্য আমাদের সকলকেই সচেতন চিন্তার প্রয়াস থেকে প্রায়ই নিরস্ত করে থাকে—তারাশংকর এর ব্যতিক্রম নন। তাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য লাঘব সাধনে প্রবৃত্ত হয়েও তাঁর প্রতিভা লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি—প্রায়-নিখুঁত গল্প লিখেছেন, উপকথা শুনিয়েছেন, কিন্তু জীবনের যে-নবন্যাস আজকের মহাকাব্য হতে পারত তা নাগালের বাইরে থেকে গেল। কিন্তু খেদের সুরে কথা শেষ করতে চাই না। তারাশংকর তাঁর দেশবাসীকে যা দিয়েছেন, তা হল—ড্রাইডেনের ভাষায়—"God's plenty"। তাঁর বিরামহীন লেখনীতে ফুলচন্দন পড়তে থাকুক।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের স্ব-বিরোধ

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণ সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা ন্যায়সংগত কারণেই কখনো ক্লান্ত হবার নয়। সেই নবজাগরণের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আবার সকল সময়েই এক বিতর্কের কেন্দ্রে স্থাপিত। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজীবন সম্বন্ধে এই অন্তহীন সাম্প্রতিক বিতর্কের বিদ্যমানতার কারণেই বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন এক দুরূহ কর্ম। কিছুদিন আগে প্রকাশিত শ্রীভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' বঙ্কিমচন্দ্রের মনন সাধনার মূল্য-নির্ধারণে এক প্রবল আলোকসম্পাতী গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্যের 'বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা' নামক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন সাধনার মূল্য নিরূপণের আর-এক প্রচেষ্টার সাক্ষাৎ পেলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের কথা স্মরণে রাখলে আমাদের মানতেই হবে যে এ-জাতীয় যে-কোনো প্রচেষ্টাই সর্বদা অভ্যর্থনার যোগ্য।

অসিতবাবু তাঁর গ্রন্থখানিকে যে-কয়টি শিরোনামায় বিভক্ত করেছেন তা হল এই: বাংলার নবযুগ। পটভূমিকা; বঙ্কিমচন্দ্র। রাজনীতি ও সমাজ; বঙ্কিমচন্দ্র ও শাস্ত্র; কমলাকান্ত; সাম্য থেকে। পটভূমিকা; ধর্মতত্ত্ব; পরিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ। এই মোট সাতটি প্রবন্ধে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। সকল ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রকে উনিশের শতকের নবজাগরণের পটভূমিকায় স্থাপন ও বিচারের প্রয়াসে গ্রন্থখানি বিশিষ্ট। লেখক রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্মময় চেতনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন সাধনার তুলনা করেছেন; কেশব সেনের কাজ এবং কথার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে মিলিয়ে দেখেছেন, পার্থক্য নির্ণয় করেছেন; সমকালীন ইতিহাস-স্রোতের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের গতিশীলতার বিচার করেছেন। এই পদ্ধতি-প্রয়োগের ভিতর দিয়েই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র-

---

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা—অসিতকুমার ভট্টাচার্য। গ্রন্থজগৎ। পাঁচ টাকা।

বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তোদ্দীপক।

সমগ্র বইখানির পরিকল্পনার মধ্যেও একটা বিশেষত্ব লক্ষণীয়। লেখক বঙ্কিমকে অংশে অংশে বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের পর্যায়ক্রমকে এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে দেখাটাই হয়ে উঠেছে লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। এর এমন একটা নিজস্ব মূল্য আছে যা বইখানির নানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে যাঁরা ঐকমত্যে পৌছবেন না, তাঁরাও অস্বীকার করতে পারবেন না। এর গুরুত্ব এইখানে যে বঙ্কিমের দার্শনিক পদ্ধতি-প্রয়োগ সম্বন্ধে লেখকের জিজ্ঞাসা ক্রমশই অনিবার্য হয়ে সেটাই তাঁর বক্তব্যের পরিণামী সিদ্ধান্তসমূহের রচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনট্রাডিকশন বা স্ব-বিরোধগুলির দিকে আলোক-সম্পাতের এই হল বিজ্ঞান-সম্মত উপায় এ কথায় কেউ দ্বিমত হবেন না। এই কারণেই বইখানির লেখককে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দুই

কিন্তু এ জাতীয় আলোচনাগুলি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আমরা সকল সময়েই অনুভব করি। প্রশ্নটি হল এই স্ব-বিরোধগুলির ভিতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয়ের কতটুকু আমরা পেতে পারি? নিজ মূল্যে বিচার করলে বঙ্কিমী স্ব-বিরোধগুলির সাহায্যে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাতে গড়ে ওঠা মানবিক ধারার উল্টো দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান। বহুবিবাহ-বিষয়ক বিতর্কের ন্যায় আরো নানা প্রমাণই হয়তো এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা চলে। কিন্তু স্ব-বিরোধগুলির পরিচয় গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তির মূল্য নিরূপণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারো স্ব-বিরোধগুলির বিচারও তার গোটা জীবনের তাৎপর্যকে সামনে রেখেই করণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ কথা আরো সত্য।

আরো সত্য, কেননা রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এক জায়গায় অবিস্মরণীয় পার্থক্য রয়েছে। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর এক কর্মময় চেতনার অধিকারী ছিলেন। প্রধানত তাঁরা দুজনেই কর্ম-নির্ভর মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ কর্ম-নির্ভর নন। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে একটি দুটি তিনটি সামাজিক প্রগতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা হয়ে ওঠে নি। কর্মীর জীবনে যে মহাসত্ত্ব গতিশীলতা

থাকে তাও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে সে রূপ তীব্রতায় অনুভূত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের যা কিছু মূল্য তার প্রধানাংশ শিল্পকীর্তি-নির্ভর। তাঁর মনন সাধনার সঙ্গে তাঁর শিল্পী জীবনের ওঠাপড়ার লয় স্থায়ত মিলে মিশে রয়েছে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে অংশে অংশে বিচার করা অসমীচীন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিধবা-বিবাহ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বহুবিবাহ—এ জাতীয় বিচারে খণ্ড বঙ্কিমকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-কোনো বঙ্কিম-অনুসন্ধানীর কাছে—বাঙ্কমচন্দ্রের চিন্তাজীবন আলোচনা প্রসঙ্গেও—প্রধান আলোচনা-সূত্র হওয়া উচিত বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের মৌল রহস্যের অনুধাবন।

মনীষী বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিমের সম্পর্ক-বন্ধনটির ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বঙ্কিম-কীর্তির কোনো-একটি অংশবিশেষেরও পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমরা কি গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের ভূমিকা সম্বন্ধে দ্বারকানাথের বক্তব্য মারফত দ্বারকানাথকে, কিংবা সোস্যালিস্ট রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে ধর্মীয় বক্তব্যে মতভেদের কারণে রামমোহনকে পশ্চাদ্‌পদ বা প্রগতি-পরিপন্থী বলি? নিশ্চয় বলি না। এবং বলি না এই কারণে যে গোটা জীবনের পুরুষার্থের পটে ছাড়া ব্যক্তিত্বের ভগ্নাংশ-মীমাংসা গোঁজামিলের সামিল হবে বলে। তাই রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমের পার্থক্য আবিষ্কার অপেক্ষা বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনতত্ত্ব-নির্মাণের প্রচেষ্টার তাৎপর্য উপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন অগ্রগামী, এবং বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চাদ্‌পদ, এ কথার চেয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর সময়ে অনেক বেশি জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এটাই অধিকতর সত্য। রামমোহনের গতিশীলতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের স্কন্ধে যে-দায়িত্ব অর্পিত ছিল তা তো গতিশীলতার দায়িত্ব নয়। তা ছিল চতুর্দিকবর্তী নানামুখী টানাপোড়েনের মাঝখানে একটা স্থিরাদর্শ রচনার দায়িত্ব। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে সেই দায়িত্বের প্রেক্ষিতে বিচার করা কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনন সাধনার কালের সঙ্গে রামমোহনের কালের ব্যবধানটুকুও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামমোহনের মৃত্যু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মনন সাধনার প্রকৃত সূত্রপাত-এর মধ্যে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। উনবিংশ শতাব্দীর এই কালখণ্ড, বাংলা দেশের ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এক চাঞ্চল্যে চিহ্নিত এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। নানা পরস্পর-বিপরীত স্রোত

তখন নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে, তীব্রতা পেয়েছে। সমাজে স্থিতি এবং গতির প্রশ্ন, শিক্ষার প্রশ্ন এবং সামাজিক আরো বিবিধ প্রশ্নে তখন অনেক জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে। রামমোহন যে-দ্বিধাহীনতায় নিজ যুগের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করেছেন স্বভাবত সে দ্বিধাহীনতা তখন আশা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধান্বিত ছিলেন এ কথার থেকে প্রয়োজনীয় কথা হল বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধার যুগের মানুষ ছিলেন। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে এই দ্বিধার সঙ্গে সংগ্রামে। যে প্রত্যয়ে রামমোহন শিক্ষার আধুনিকীকরণের জন্য ইংরাজি ভাষাকে শিক্ষা-মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন, বঙ্কিম তাঁর যুগে দাঁড়িয়ে দেখেন সে প্রত্যয়ের অনেকাংশই শিথিল। সে শিক্ষা আবেগান্বিত হবার মতো কোনো ফল প্রসবই করে নি। ইংরাজিশিক্ষিত শুধু নয়, ইংরাজি শিক্ষাও বিদ্রূপ-লাঞ্ছিত হতে লাগল এই সময় থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্রে সেই বিদ্রূপ সূচীমুখের তীব্রতা লাভ করেছিল।

বস্তুত রামমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুগ-ধৃত পার্থক্যের কয়েকটা ইঙ্গিত বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরাগ নিয়ে জীবন শুরু করেছেন, শেষ করেছেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। উক্ত শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর মনন এবং চিন্তাকে রূপায়িত করতে শুরু করেছেন, তার আগেই ঐ বিদেশী শাসন সম্বন্ধে পূর্ব প্রত্যয় শিথিল হতে শুরু করেছে, অন্তত সংশয় জন্মগ্রহণ করেছে। রামমোহনকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামাজিক পরিণতি দেখে যেতে হয় নি। কাজেই ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির কাছে জমিদারদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে, সে যুগে যে-কোনো স্মারকপত্রের ভূমিকা রচিত হতে পারত। দুই পুরুষ যেতে না যেতেই গ্রামাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার স্বরূপে দেখা দিল, রচিত হল গণনাতীত পরাণ মণ্ডলের দুরদৃষ্ট। এই কৃতজ্ঞতার বন্ধনপাশ তখন বঙ্কিমের কাছে অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছে। 'বন্দোবস্ত অগ্রাহ্য কর'—বঙ্কিমচন্দ্র এতদর্থক কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন নি বটেই। কিন্তু তার দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে নির্ণয় করে গেছেন তাতে তাঁকে চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না। সমসাময়িক ভূস্বামীবৃন্দের প্রতিনিধিদেরও যে সে ভুল হয় নি—এ প্রমাণও দুর্লভ নয়। সে সময়ের 'সমাজদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ' নামক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত

করেন তখন তা আমাদের কাছে জমিদারীর বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য বলেই প্রতিভাত হয়।[১]

'ইংরাজ সংকীর্ণমনা' এ উপলব্ধি বঙ্কিমের নিজস্ব অভিজ্ঞতার দান। চাকুরিসূত্রে হয়তো এটা ব্যক্তি-বঙ্কিমের উপলব্ধি; কিন্তু স্বদেশ ও স্ব-সভ্যতার প্রতি ইংরাজের আচরণও যে বঙ্কিমের উক্ত সিদ্ধান্তের জন্মদাতা এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সিদ্ধান্ত থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। যার টাকা আছে সে পয়সা খরচ করলে বিচারশালার তামাসা দেখতে পায় এই উক্তি বঙ্কিমের। হিন্দু সমাজে বহু-বিবাহ নিরোধের জন্য আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার মধ্যে এ জাতীয় আইন প্রণয়নের সীমাবদ্ধতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ও ধর্মকে একত্র করতে নিষেধ করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ আইনরূপে বৈধতা লাভ করলেই তা সমাজে সর্বান্তঃকরণে গৃহীত হয় না—বহু-বিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল অনুরূপ। সমাজের সার্বিক পুনরভ্যুদয় না ঘটলে এ জাতীয় আইন কার্যকর নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের এতদ্‌সম্পর্কিত সমুদয় বক্তব্য এই মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-মুখ্য অনুশীলনাদর্শ তাঁর স্রষ্টা-জীবনের উপসংহারে গড়ে উঠেছিল তার মূলে রয়েছে এই জাতীয় ঘটনা। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তিবাদের দ্বারা সংস্কারের সেবা করেছিলেন এ সিদ্ধান্ত মর্মান্তিক। হিন্দুধর্ম ও লোকহিত এক নয়—তার বাস্তব প্রমাণ কোটি কোটি অস্পৃশ্যের বর্তমানতা—এই যুক্তি গ্রহণ করলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। কোনো আইন, কোনো নতুন চিন্তা বা আদর্শের এই ভাবের সাফল্য বিচার করতে গেলে আমরা দেখব বিধবা-বিবাহও সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে সেকালে সামান্যই মূল্য পেয়েছে। তার জন্যে উক্ত আইনকে আমরা অকার্যকর ঘোষণা করছি না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের বা ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার করেছেন—যে-অংশটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন সেটার ভিতরে কালোপযোগী গ্রাহ্যতার উপাদান আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তারই ভিতর দিয়ে ব্যক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্ব পাবে এই ছিল তাঁর ধারণা।

১। এবং এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্ববোধিনীর ধারাকেই বলিষ্ঠ করে তুলেছেন। বঙ্গদর্শনের আগে উক্ত পত্রিকা যে-ভাবে গ্রামের চাষীদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা স্মরণীয়।

তিন

তখন আর ইংরাজের উদারতার উপরে বঙ্কিমের সর্বৈব কোনো বিশ্বাস নেই। ইউরোপের শিক্ষার অসম্পূর্ণতার বিষয়ে তিনি দৃঢ়-নিশ্চয় হয়েছেন! অথচ আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাকে বাদ দেওয়াও চলে না। কাজেই সামাজিক স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসাসূত্রের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুলতে চাইলেন ব্যক্তির অন্যনিরপেক্ষ আত্মোৎকর্ষ-সাপেক্ষ আদর্শ—যার মূল লক্ষ্য প্রেম বা প্রীতি। এর মধ্যে ইউরোপীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতাদর্শকে খুঁজলে পেতে পারি। কিন্তু কলোনির জীবনে ক্রমবর্ধমান জটিলতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনাময় ব্যাকুল চিন্তার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না—এই কথা মেনে নিলে বঙ্কিমের স্ব-বিরোধগুলির ব্যাখ্যা ইতিহাসসম্মত হয়। একটা চূড়ান্ত অসার্থকতার অনুভূতি নিয়ে বঙ্কিমকে চঞ্চল হতে হয়েছিল। তাঁর অনুসন্ধেয় ছিল মানুষের সার্থকতা। মন্দিরে বা উপাসনাগারে বা ধর্মশাস্ত্রে সে সার্থকতাকে পাওয়া যাবে না। তাকে পেতে হবে ব্যক্তির সুতীব্র জীবনচর্চায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই চর্চার সাফল্যেই সমাজের জড়তা ঘুচে যাবে, তা হবে প্রাণবন্ত।

এটা মনে রাখলে—বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্বের প্রসঙ্গটুকু বাদ দিয়েও—অনুশীলন তত্ত্বের বঙ্কিমপোষিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। এবং সেই সূত্রেই বোঝা যায় কেন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কাছে অনুশীলন ধর্ম ব্রাহ্ম ধর্মের নামান্তর বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অনুশীলন ধর্ম ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম নয়। এ ধর্ম একেবারেই মানব-মুখ্য, মানব-লক্ষ্য। একান্তভাবেই এ ধর্মতত্ত্ব মানুষের ধর্মের তত্ত্ব। ইউরোপীয় হিতবাদের কেবলমাত্র গাণিতিক বাস্তবসিদ্ধির উর্ধ্বে না উঠতে পারলে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ ফলবান হয় না। তাই অনুশীলনাদর্শ প্রচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "হিতবাদকে আমি যেখানে স্থান দিলাম তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলন তত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।" 'পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের ভিতরেই আমাদের লক্ষ্যবস্তু এই' কথা বলে বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্বকে অনেক বাস্তবভিত্তিক করে তুলতে চেয়েছেন। মোক্ষ, অমৃত, পুণ্য প্রভৃতিকে মূল্য-নিয়ামক বলে মনে না করে সমকালের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে তিনি নতুন মূল্য বলে ঘোষণা করেছেন। "যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।" কাজেই ব্যক্তির বিকাশের সাধনাই হল বঙ্কিমের অন্বিষ্ট।

অথচ ব্যক্তির বিকাশ যে "সংকীর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজে"র হাতে, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সম্ভব নয়, এ তত্ত্বও বঙ্কিমের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। এদিকে দিনে দিনে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সংকট, জাতীয়তাবাদের আতিশয্যের চেহারা তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় কল্পিত হয়েছে অনুশীলন ধর্ম।

স্মরণ রাখা দরকার সকল প্রকার ব্যাপক কর্মময়তা থেকে বঞ্চিত তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের বিশাল অকৃতার্থতার কথা। সর্ববিধ শুভ প্রচেষ্টা ও সংকল্প সত্ত্বেও এ্যাভারেজ বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন ছিল মিত-পরিসর, কর্মচাঞ্চল্যহীন। জীবনের অন্দরে ছিল ভূমিজীবী গ্রামীন মধ্যবিত্তের সকল জট, এবং বাইরে আফিসে, আদালতে, কলেজে, স্কুলে অপরের প্রয়োজনের দাসত্ব; ইংলণ্ডের পাবলিক লাইফের বিকল্পে স্কুল মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিকে ঘিরে চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট। জীবনের এই জটিল অকৃতার্থতার মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন একটা ইতিবাচক সার্থকতার বোধ সঞ্চারিত করতে। বুদ্ধিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-সিদ্ধ এক তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। আসলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন ব্যক্তিকে। তাকে কেমন করে, কী ভাবে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য, চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, এটাই ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনার লক্ষ্য। মনে হয় যে-মনোভাবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বৈদেশিক শাসনাধিপত্যের বিকল্পে সমাজলক্ষ্মীর সাধনার কথা ভেবেছিলেন, কতকটা সেই মনোভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনার দর্শনকে সিদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। এ প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতার দিককে আবৃত না করেও প্রচেষ্টার প্রেরণা এবং আন্তরিকতার কথা বলা চলে। সমাজের স্বরাজ-সাধনায় ব্যক্তি ছিল বঙ্কিমের মৌল উপাদান।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি অবশ্যই শিল্পী হিসাবে। নিজ শিল্পী-জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যখন তিনি তাঁর মৃত্যুহীন উপন্যাসগুলি রচনা করছেন তাঁর ব্যক্তি-মানুষসংক্রান্ত সকল জিজ্ঞাসার প্রকৃতপক্ষে তখনই শুরু। তখনই মানুষের চরিতার্থতার প্রশ্নগুলি তাঁর মনের মধ্যে জেগেছে। বিশেষত তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে জীবনের বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্প্রশ্ন মনোভাবে সেগুলি যে তাঁর ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির মতো আবেগের আততি থেকে বঞ্চিত এটা তিনি অনুভব করেছেন। সমকালীন সামাজিক ভদ্রলোকের জীবনের অচরিতার্থতাকে বঙ্কিম

'মনের অবন্ধন' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রজনীর অমরনাথ চরিত্র-কল্পনার সবরকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চরিত্রটির উদ্দেশ্যহীনতাজনিত বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। আবার এই সময় দেশের অগণিত পরাণ মণ্ডলের ব্যর্থতাও তাঁর প্রত্যক্ষ হয়েছে। এই সর্বব্যাপী অসংগতি ও বিড়ম্বনার মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন সংকটাপন্ন দেশীয় সমাজের চেহারা। অনুশীলন ধর্মের মাধ্যমে তিনি দেশপ্রীতিকে ধর্মের ন্যায় আচরণীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে চেয়েছেন-সেই অচরিতার্থ সমাজের সকল গ্লানি দূরীকরণের জন্য।

রামমোহনে যা বিচার ও ব্যাপ্তি, বিদ্যাসাগরে যা লোককল্যাণ ও দৃঢ়তা, অক্ষয়কুমারে যা মনীষা, বঙ্কিমচন্দ্রে তাই জীবনের একটি তত্ত্বে পরিণত হতে চেয়েছে। মানববাদ এই সকল কিছুরই মূলে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই মানববাদকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সারাৎসারের সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই বাসনার সঙ্গে তাঁর সিদ্ধির সামঞ্জস্য ঘটাতে পেরেছিলেন কিনা সেটা পরবর্তী জিজ্ঞাসুদের নিশ্চয় আলোচ্য। কিন্তু সে আলোচনায় বঙ্কিমের প্রচেষ্টার গুরুত্বকেই ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে দুটি কথা স্মরণ রাখলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা নির্ভুল হব। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন বাঙালি জমিদারশ্রেণীর বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশের নেতৃত্ব থেকে বাঙালি জমিদারশ্রেণীকে যে বিচ্যুত কবা প্রয়োজন এ-বিষয়ে বঙ্কিমের মনে একটা স্পষ্ট ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট্ কমিটির কাছে রামমোহনের প্রেরিত প্রশ্নোত্তরিকায় যার সূত্রপাত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যার পরিবর্ধন, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার কোনো হ্রাস হয় নি। দ্বিতীয়, এই পটভূমিকায় রাখলেই দেখা যাবে যে শত শত মুচিরাম গুড়, লক্ষ লক্ষ পরাণ মণ্ডলের প্রবঞ্চনা ও ব্যর্থতার মাঝখানে বাংলার শিক্ষিত সমাজের কর্মপ্রয়াসের তত্ত্বগত ভিত্তির তিনি সন্ধান করেছিলেন। তার মূল কথা মানুষ।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

অবন ঠাকুরের কথা

অবনীন্দ্রনাথের জীবনী আগেও বেরিয়েছে। কিছু অপরের লেখা, কিছু তাঁর নিজের বলা ও লেখা। সেসব বইয়ের আলোচনায় না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে এ বই দুটোর একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে, কারণ এখানে লেখক ও লেখিকা হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথের পুত্র ও কন্যা।

উমা দেবীর বই আগেই বেরিয়েছে এবং অলোকেন্দ্রনাথের বই বেরোল সম্প্রতি। এঁরা অবনীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এত কাছ থেকে, পেয়েছেন এত বেশি এবং এমন এক নিকট সম্পর্কের মধ্যে যে এঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও থাকে অত্যন্ত বেশি। অতি-প্রত্যাশার দরুণই বোধ হয় একটু অতৃপ্তি নিয়ে বই দুটো শেষ করতে হল।

অবশ্য ভেবে দেখলে মনে হয় যে এ অতৃপ্তি বোধহয় একটু থাকবেই। 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'আপন কথা' পড়েছেন যাঁরা, তাঁদের মন অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন একটা সুরে বাঁধা যে তা থেকে নামতে হলেই অতৃপ্তি অপরিহার্য। কিন্তু সে সুর তো বাজছে স্বয়ং অবনীন্দ্রের হাতে, অপরের হাতে সে সুর বাজা দুরূহ।

যাঁরা তথ্যবুভুক্ষু পাঠক, তাঁদেরও খুব একটা বাড়তি খোরাক মিলবে না এখানে। ক্ষতি ছিল না তাতে, যদি অন্তরঙ্গ এক নিকট-অবনীন্দ্রকে তেমন করে পেতাম। ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা- যেমন অবনীন্দ্রের চোখেই দেখেছি অবনীন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কালকে, তেমনি সজীব ও সরস করে যদি আবার তাঁকে দেখতে পেতাম পুত্র-কন্যার চোখে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, তবে দুঃখ থাকত না। অবনীন্দ্র- কথিত ও লিখিত বইয়ের একটা পরিপূরক ভূমিকা ছিল এই বই দুখানির, কিন্তু এই ভূমিকা ততটা প্রতিফলিত হয় নি গ্রন্থদ্বয়ে।

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপা। তিন টাকা।
বাবার কথা। উমা দেবী। মিত্রালয়। তিন টাকা।

তবু উমা দেবীর বই তাঁর বাবার একটা কাছের-চেহারা খানিকটা তুলে ধরতে পেরেছে। লেখার নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতার গুণে পিতা-কন্যার স্নেহ-সম্পর্কের আলোয় অবনীন্দ্রনাথ কিছুটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। নানা ছোটখাটো ঘটনা, স্মরণের এলোমেলো ছড়ানো টুকরো, বিচিত্র আনন্দ-বেদনার নকৃসি-কাটা এক আবেগময় স্মৃতিকথা বয়ন করে গেছেন লেখিকা সহজ ভাষায়। তাঁর পিতাকে তিনি যে ভালোবাসতেন তাব কিছুটা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব নয়, পিতৃ-ব্যক্তিত্বের আলো কিছুটা ছাড়া-ছাড়া ভাবে হলেও ছড়িয়ে আছে সারা বইতে। দেখা যাচ্ছে, অন্তত বাংলা-সাহিত্যে এই জাতীয় স্মৃতিচারণ-গ্রন্থে মহিলারাই যেন বেশি সফল। এ জাতীয় লেখায় যে বিশেষ ভাবময় এক মমত্ব প্রয়োজন, তা বোধহয় মাতৃহৃদয়ে অধিক সুলভ। মৈত্রেয়ী দেবী, রানী মহলানবীশ, রানী চন্দের পথ ধরেই উমা দেবীর আবির্ভাব—যদিও তাঁর কাজ ওঁদের তুলনায় অনেক কাঁচা।

অলোকেন্দ্রনাথের বই আরো দুর্বল। তিনি এ বই লিখেছেন ছোটদের জন্যে। কিন্তু ছোটদের উপযোগী কলম নেই তাঁর হাতে। তিনি যদিও কোনো কোনো জায়গায় কাল্পনিক কিশোর পাঠককে সামনে দাঁড় করিয়ে 'তোমরা পড়েছ', 'তোমরা দেখেছ' ইত্যাদি বলেছেন, কিন্তু তাঁর কলম খুব সাবলীল নয়। উমা দেবীর বই যদিও ছোটদের জন্যে নয়, তবু ছোট-বড়ো নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বই আনন্দের সঙ্গে পড়তে পারবে। 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' বইটা যেন দাঁড়িয়েছে মাঝামাঝি জায়গায়—না পুরো বড়দের, না পুরো ছোটদের। দু-এক ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিগত উষ্মা ও ক্ষোভও প্রকাশ পেয়েছে—যা ছোটদের বইতে না থাকলেই ভালো হত। আবার পুরো বড়দেরও নয় এ বই। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবজাগরণে অগ্রনী নেতার দান আলোচ্য। তেমন পূর্ণাঙ্গ অবনীন্দ্র-জীবনী আমাদের নেই, অলোকেন্দ্রনাথের বইও তা নয়—সে উদ্দেশ্যে লেখাও নয়।

ছোটদের কাছে বেশ গল্পের মতো করে বলবার মালমসলা অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আছে। অলোকেন্দ্রনাথ সেসব মালমসলাকে পুরো কাজে লাগাতে পারেন নি। বইয়ের ভারসাম্যও অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—কোথাও অকারণ ব্যাপ্তি, কোথাও অহেতুক হ্রস্বতার দোষ ঘটেছে বইটিতে। আর অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের কাছে ততটা ছবির মাধ্যমে পরিচিত নন, যতটা পরিচিত তাঁর লেখার

মাধ্যমে। সেই লেখার দিকের কথাও বইতে অবহেলিত। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও ছোটদের উপযোগী একটি অবনীন্দ্র-জীবনী লেখার প্রচেষ্টা হিসেবে বইখানি স্মরণীয়।

প্রকাশক 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' বইখানি খুব সুন্দর করে বার করেছেন। মুদ্রণে, প্রচ্ছদে, কাগজে, গ্রন্থনে অত্যন্ত শোভন গ্রন্থ এটি। শুধু একটাই দুঃখ—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'-এ একটাও অবনীন্দ্র-অঙ্কিত ছবি নেই। প্রকাশক এ-ব্যবস্থা করলে বইটির মূল্য বাড়ত, পাঠকরাও ছবির রাজার ছবির সামান্য পরিচয় পেত। 'রূপা'র মতো সম্পন্ন প্রকাশকের পক্ষে কথাটা বিশেষ করে ভাবা উচিত ছিল।

যাই হোক, এই কথা বলে শেষ করা যাক যে অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার এখনও পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজে উদ্যোগী ব্যক্তিকে দেখতে ইচ্ছে করে।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প ও জীবন

শিল্প ও জীবনের বিভেদ কল্পনা নিশ্চয়ই মারাত্মক। কিন্তু শিল্প ও জীবনের মধ্যে আক্ষরিক অভেদ কল্পনাতেও কি শিল্পের মর্যাদা বাড়ে? বাস্তবিক শিল্প যে জীবনের হুবহু ফোটোগ্রাফি নয়, এ কথা আজ সর্বজনমান্য। সে কারণেই কোনো বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকের কাছে শিল্প expression of the imaginative life. কিংবা সত্যের প্রতি নিরপেক্ষ ভালোবাসা যদিও শিল্পীর উদ্দেশ্য, তথাপি এ কথাও, পিকাসোর কথা মেনে নিয়ে বলা চলে শিল্প প্রচলিত অর্থে সত্য নয়। art is a lie that makes us realize truth, at least the truth that is given us to understand. প্রকৃতিতে যেটা নেই, সেটাই কি শিল্প প্রকাশ করে না? যে-কোনো মহৎ বা সৎ শিল্প-সাহিত্যই এই মিথ্যার ভিতরে সত্যকে উদ্ভাসিত করে। এবং সে কারণেই কোনো আর্টিস্ট ব্যক্তিগত জীবনে, হয়তো প্রকাশ্যেই কী মত পোষণ করেন, তাঁর সৃষ্টির বিচারে, এ তথ্যের মূল্য আমার কাছে অবাস্তব ঠেকে। আমি রজর ফ্রাই-এর মতে বিশ্বাসী, অন্তত তাঁর লেখায়: Hardly any writers or thinkers of first-rate calibre now appear in the reactionary camp. যিনি সিরিয়স আর্টিস্ট, তিনি সর্বদাই প্রগতিশীল, অন্তত তাঁর সৃষ্টিতে।

সেইজন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এ প্রশ্ন যখন ওঠে, মার্কসবাদী হবার পর তাঁর লেখার ধার কমেছে না বেড়েছে কিংবা মার্কসবাদে তাঁর লেখায় সাঙ্গীকরণ ঘটেছে কী না—তখন প্রশ্নটা যে ভুল তোলা হচ্ছে এ কথা আমার বরাবর মনে হয়েছে। কিংবা মানিকবাবুর সাহিত্যজীবনকে পূর্ব-মার্কসবাদী ও মার্কসবাদী পর্যায়ে বিভক্ত করাতেও আমার ঘোরতর

উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। দাম দশ টাকা।

আপত্তি। কারণ, এ কথা আজ মানিকবাবুর লেখার চরম বিরোধীও মানবেন যে, আর্টিস্ট হিসাবে মানিকবাবু সিরিয়স, সৎ—আজকের চতুর্দিকে পরিকীর্ণ স্তূপের মধ্যে আশ্চর্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মানিকবাবুর মতো একজন লেখককে এইভাবে স্পষ্ট দু-ভাগে ভাগ করা বিপজ্জনক—কারণ, গোড়া থেকেই তিনি সমগ্রতাসন্ধানী। এই সমগ্রতার স্বরূপ কী তার সম্পর্কে হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এব ধারণা পাল্টেছে, হয়তো এমফ্যাসিস-এর পরিবর্তন ঘটেছে, হয়তো স্পষ্ট করেই জীবনের চাপে কমিটমেণ্টে এসেছেন—কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবন স্পষ্টত দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগে ফ্রয়েড, আর-এক ভাগে মার্কস—এ কথা আমরা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে বুঝি। কাবণ, প্রথম যুগে তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখেছেন এবং তাঁর তথাকথিত মার্কসবাদী পর্যায়ের লেখার থেকে বক্তব্যের দিক থেকে এটি কি কম প্রগতিশীল? তা তো নয়ই, উপরন্তু শিল্পের দিক থেকেও এটির স্থান উচ্চে। আমার মতে যা মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, শুধু তাই নয়, এমন সচেতন শিল্পকর্ম বাংলা ভাষায় বিরল, সেই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' যে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজকে রূপকে ধরে—তা কি তাঁর উত্তরজীবনের গল্পে লভ্য? এবং তাঁর উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'আজ কাল পরশুর গল্প' তো স্পষ্ট করে পূর্বযুগের মানিকবাবুকে স্মরণ করায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গোড়া থেকেই যে-গুণাবলী লক্ষণীয়—যেমন শিল্পীজনোচিত নিরাসক্তি, যেমন চরিত্রের জটিলতাকে রূপ দেওয়া, যেমন জীবন ও শিল্পের সামঞ্জস্য ঘটানোয় তাঁর ভাষায় "কল্পনার রসে জারিয়ে মজিয়ে দেখা"—তা এই উত্তরকালের গল্পসংগ্রহের কোনো কোনো গল্পে স্পষ্ট উপস্থিত। মাঝে মাঝে আশ্চর্য উপমা, প্রতীকের ব্যবহারও চমকে দেয়। দু-তিনটি চরিত্রের টানাপোড়েনে মানবিক সম্পর্কাবলীর বিশ্লেষণ—যেমন চালক গল্পে—তাও লক্ষণীয়। কিন্তু এই গল্পসংগ্রহ আমার কাছে বিভিন্ন গল্পের সমাহার বলে মনে হয় নি—এ যেন যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর জীবনের নির্মম বাস্তব একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন মানিকবাবু; বিভিন্ন গল্প যেন এখানে একটা বড় উপন্যাসের বিভিন্ন এপিসোড। চতুর্দিকের প্রত্যক্ষ জীবনের চাপে অস্থির ক্রুদ্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁচা জীবনকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন এই গল্পাবলীতে—তাই অধিকাংশ গল্পে

চরিত্র নেই, চিত্র আছে। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, কৃষক-আন্দোলন—সব মিলিয়ে আমাদের নীতিবোধ, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবনকে কী মর্মান্তিক ভয়াবহ করে তুলেছে—সে কথা শিল্পী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে মানিকবাবু এঁকেছেন। এ চিত্র আঁকতে গিয়ে মানিকবাবু আদপে আমলেই আনেন নি তাঁর গল্প শিল্প হচ্ছে কী না—তাই অকস্মাৎ নাটকীয় বক্তৃতা, তাই নানা ঘটনা—যে-ভাবে জীবনে ঘটে, কিন্তু শিল্পে যে-ভাবে আনা চলে না—তাকে মানিকবাবু অক্লেশে স্থান দিয়েছেন—তাঁর মতো সচেতন শিল্পীও। এখানে মানিকবাবুর যে-চেতনা সব থেকে সক্রিয়—সেটি consciousness of purpose. এই সমাজ ও তার মুখোস-পরা মানুষকে, নানা গ্লানিকে, মানিকবাবু তাঁর নির্মম লেখনীতে তীরের মতো বিঁধেছেন। তাই মানিকবাবুর গল্পের নায়করা কেউ অশ্রুপাত করে না, কেউ সহানুভূতি চায় না—কৃষকেরা জ্বলন্ত ঘৃণায় প্রতিশোধ নেয়, স্কুলের শিক্ষক নির্মম ঠাট্টায় রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার-কে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বাস্তব চেহারাটা দেখিয়ে দেয়—আর অবিনাশ তরফদার, ঘনশ্যাম, গৌতম প্রভৃতি এরা ভয় পায়—মানিকবাবুর গল্পের তথা আমাদের জীবনের ভিলেনরা চরম ভীতু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রথম যুগের গল্প প্রসঙ্গে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন যে সেখানে না কি যৌনতার বাড়াবাড়ি—বস্তুত ব্যাপারটা তা নয়। সমগ্রতাসন্ধানী মানিকবাবুর মন সেখানে নিজের ধারণা অনুযায়ী জোর দিয়েছিল একটি দিকে, তেমনি শেষের দিকে তাঁর জোর দেওয়া অন্যদিকে। এই এমফ্যাসিস-এর দরুণই তাঁর প্রথম যুগের বেশ কিছু লেখা শিল্প হিসাবে বরণীয় হয় নি। এবং উত্তরজীবনেও এই একটি বিশেষ দিকের উপর জোর দেওয়ার ফলেই তাঁর অধিকাংশ গল্প শিল্পের বিচারে দাঁড়ায় না। যাঁরা মানিকবাবুর প্রথম যুগের অসামান্য লেখাকটির সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে তাঁর গল্পের নায়কের এই উক্তি—"ভেবে দেখলাম যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার পেতে হলে প্রথম প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।"—আশ্চর্য করবে। যে-জটিলতা, যে জটিল চরিত্র অঙ্কনে মানিকবাবুর বরাবরের আগ্রহ ছিল—তিনি এই সরলীকরণে এলেন কী ভাবে। কিংবা প্রাণাধিক গল্পের "আগে থাকতে একটা লোককে মন্দ ভাবতে বাণীর ভালো লাগে না। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচু স্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু

ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।" এই উক্তি হয়তো বাস্তব-জীবনে সত্য, কিন্তু গোড়াতেই বলেছি, শিল্পেরও দাবি আছে এবং সে দাবি ন্যায্য, কারণ তা জীবনকেই আরও সত্য দান করে। মানিকবাবু তাঁর প্রথম জীবনে এ গল্প লিখলে—"ও জাতটাই বজ্জাত"—বলে ছেড়ে দিতে পারতেন? অথবা গল্প থামিয়ে প্রায় অকারণেই বক্তৃতার ঢঙে কিছুটা লেখা মানিকবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল?

প্রকৃতপক্ষে, মানিকবাবু তাঁর চারিদিকের প্রত্যক্ষ জীবনের চাপকে শিল্প করে তুলতে পারেন নি বা চান নি। তাই তাঁর গল্পগুলোকে নথি-গল্প বলাই শ্রেয়। ভবিষ্যতের কোনো ঐতিহাসিক যদি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কৃষক-আন্দোলনের বাস্তব বিবরণ চান তাহলে উপাদান হিসাবে মানিকবাবুর এই গল্পাবলীকে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন—এখানে অতিরঞ্জন নেই, শিল্পের সেই মহৎ মিথ্যা নেই, নেই ইমাজিনেটিভ লাইফ। প্রত্যক্ষ জীবনকে প্রত্যক্ষভাবেই মানিকবাবু এঁকেছেন। তবে এর কারণ মার্কসবাদ—এই বলে উক্ত দর্শনকে দায়ী করার কোনো কারণ নেই। কারণ উক্ত দর্শনকে জীবনে গ্রহণ করে অনেক শিল্পীই মহৎ শিল্প রচনা করেছেন, আবার করেনও নি। এখানে ব্যাপারটা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে শিল্পীর উপর। মানিকবাবুর উত্তরজীবনের অধিকাংশ গল্প শিল্পের বিচারে মহৎ সৃষ্টি হয় নি—এই কথা বলায় অনেকের তির্যক ইঙ্গিত থাকে মানিকবাবু জীবনের টানে যে দর্শনে স্থিত হন, তার দিকে। কিন্তু আমার মতে মানিকবাবু সমন্বয়ে পৌঁছাতে না পারলেও মার্কসবাদ তাঁকে দুটো জিনিস দিয়েছে, যা তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিক অনেক গল্প-লেখককে দেয় নি, পরবর্তীরা তো একেবারেই রিক্ত সেদিক থেকে। প্রথমত জীবনের টানে এই দর্শনের প্রতি ঝোঁকায় মানিকবাবুই প্রথম গল্প-উপন্যাস লেখক যিনি উপলব্ধি[১] করেছিলেন কোথায় একটা গোলমাল থেকে যাচ্ছে। গল্প-উপন্যাস লেখকরা চারিদিকের বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিফলনের জন্যই বোধহয় কোথায় ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। এই উপলব্ধিই মানিকবাবুকে কি বিষয়ে, কি টেকনিকে নিজের পূর্ববিশ্বাসকে অতিক্রম করার সহায়ক হয়েছিল—তাঁর বরাবরের সমগ্রতাসন্ধানী মন বোঝে,

১। এই উপলব্ধিই মানিকবাবুর ভাষাকেও রক্ষা করেছে—যুদ্ধে, অনাচারে, দুর্ভিক্ষে, বিপর্যস্ত মানুষের মতোই এই ভাষা একটা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে। তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ লেখকের ব্যবহৃত বিশেষ হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

হয়তো ভাঙাচোরা সমাজের চাপে, এখন শিল্প নয়, কাঁচা জীবনেরই নির্মম-নিষ্ঠুর দিকটি আঁকতে হবে। এতে অধিকাংশ গল্প হয়তো দাঁড়ায় না, কিন্তু এই উপলব্ধির অপরিসীম মূল্য—অপরিসীম মূল্য এই উপলব্ধিসঞ্জাত আশ্চর্য গল্প আজ কাল পরশুর গল্প অথবা অমানুষিক গল্পটি। এই গল্পসংগ্রহে একমাত্র গল্প যেখানে মানিকবাবু শিল্পের সেই মহৎ মিথ্যায় জীবনের সত্য, নিষ্ঠুর বেদনাকে উপস্থিত করেছেন—স্পষ্টতরই যে-গল্প মনে পড়ায় পদ্মানদীর মাঝিকে। কিংবা রাসের মেলার মতো জীবনাগ্রহী গল্প অথবা গঠনগত ত্রুটি সত্ত্বেও কোনদিকে গল্পের সমাপ্তিটুকু। মানিকবাবুর এই উপলব্ধির ফল নতুন করে পাওয়া যায় তরুণ মুষ্টিমেয় লেখকদের গল্পে—এইদিক থেকে দেখলে মানিকবাবু বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের নতুন উপলব্ধির জনক, আধুনিক লেখক। এবং এই উপলব্ধিই মানিকবাবুকে হাঁসুলিবাঁকের উপকথাকে নতুন করে লিখতে প্রবৃত্ত করায়—বাগদীপাড়া দিয়ে গল্পতে।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ মানিকবাবুর শিল্পীজনোচিত সততাকে রক্ষা করায় সহায়ক হয়েছে। আশ্চর্য, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এটা হয় না। কিন্তু মানিকবাবুর তথাকথিত পূর্ব-মার্কসবাদ যুগের মূল্যও এই সূত্রেই স্বীকারের প্রয়োজন—গোড়া থেকেই মানিকবাবু বাংলাদেশে, আশ্চর্য বাংলাদেশে, আশ্চর্য সৎ লেখক এবং পরবর্তী সামাজিক বিপর্যয়ে যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে চরম নীতিভ্রষ্টতা দেখা দেয়, এমনকি বড় ঔপন্যাসিককেও চটকদারী ব্যবসাদারীতে মনোনিবেশ করতে দেখি, তখন মানিকবাবু এই নীতিভ্রষ্টতা এড়িয়ে যান তাঁর জীবনদর্শনের প্রতি বিশ্বাসের নৈতিক চাপেই। এবং এ যুগের শিল্পী হয়তো নিজেই রূপকে ধরা দেন তাঁর শিল্পী গল্পে। যে গল্পে, মদনের, "একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি।" বাংলার চরম প্রত্যক্ষ জীবনের বিপর্যয়ে শিল্পীরও তো চেতনায় আড়ষ্ট ব্যথা—কোন পথ তাঁর, তাঁর কর্তব্য কি? এই বিপর্যয়ে শিল্পীর তো অনেক লোভ—এ-অবস্থায় যদি মানুষের বিপর্যস্ত চেতনাকে ভাবালু সহানুভূতি জানানো যায়, বিবশ বুদ্ধিতে যৌনতা কিংবা অন্যরকমের আয়োজনে প্রত্যক্ষ জীবনকে ভুলতে নীতিভ্রষ্ট সাহায্য করা যায়—তাহলে তো নগদবিদায় ভালোই। কিন্তু শিল্পী মদন তাঁতি সস্তা ধুতি-শাড়ি বুনবে না—ভালো কিছু, দামী কিছু সে বুনবে। এদিকে জীবনের দারুণ চাপ—তাই ভুবনের কাছে

তাঁতের সুতো চেয়েই বসে। কিন্তু সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। কি করবে মদন তাঁতি? সেদিন রাত্রে শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে[২], মদনের, শিল্পীর, তাঁত চলল, তার শব্দ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সকলে অবাক—মদন ওঁচা কাপড, ভুবনের সুতোয় বুনছে। সকালবেলায় পাড়ার অর্ধেক মানুষ এসে জড়ো হল। প্রশ্ন, সন্দেহে, বেদনায়: "তাঁত চালাও নি রাতে।" শিল্পীর উত্তর এল, "চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—।" মানিকবাবুও কথার খেলাপ করেন নি, জীবনের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেন নি। পথের অন্বেষণ করতে করতে চারিদিকের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে জীবনের তাঁত চালিয়েছেন—তবু নীতিভ্রষ্ট শিল্পের সুতো সেখানে চাপান নি। এই শিল্পী মানিকবাবু, মহৎ প্রচেষ্টার মানিকবাবুকে—আজকের কোনো আধুনিক সৎ লেখকই এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই বর্তমানের অনেক সৎ তরুণ লেখকের মধ্যেই বারবার তাঁর ছায়াপাত ঘটে।

২। উল্লেখযোগ্য, চাঁদের কথা বারবার এই সংকলনের গল্পাবলীতে ফিরে এসেছে—নিষ্ঠুর মুহূর্তেও জ্যোৎস্নারাত, চাঁদের আলোর উল্লেখ বারবার মানিকবাবু করেছেন।

মৃণালকান্তি ভদ্র

সার্ত্র-সাহিত্য-পরিক্রমা

সার্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজিতে বেশ কয়েকখানা বই রচিত হয়েছে। তবে কোনো বই-ই সার্ত্রের দার্শনিক বক্তব্য ও তার আলোকে তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্যচিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয় না। হয়তো কোনো একখানি বই সার্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফিলিপ টডি তাঁর গ্রন্থের* এই জাতীয় অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন। ভূমিকায় এ-সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে তিনি লিখেছেন: "What I have tried to do, in examining Sartre's novels and plays, is to see how he has attempted to popularise his philosophical opinions and how the language and imagery which he has used can me made to throw light upon the more personal and emotional aspects of his philosophy." সার্ত্রের অস্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণ মনে যে ভুল ধারণা আছে, টডি তা থেকে একেবারে মুক্ত নন, কারণ তাঁর দর্শন-পাঠ অনেকটা অপেশাদারী। ফলস্বরূপ, প্রথম অধ্যায়কে তিনি চিহ্নিত করেছেন সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্যের যোগসূত্র হিসাবে। এবং এখানেই তিনি ভুল করেছেন। এই অধ্যায়ে সার্ত্রের Nausea উপন্যাসের আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে যে দার্শনিক কাঠামোটি টডি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন এবং যা তিনি সার্ত্রের বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থ Being and Nothingness-এর অবলম্বন বলে মনে করেন, তা থেকে এই ধারণা হয় সার্ত্রের অস্তিবাদ মানসিক বিকৃতির দর্শন। তিনি এই অধ্যায়টির নামও দিয়েছেন, Obsessions and Philosophy। এর ফলে যে-সমস্ত পাঠক সার্ত্ররচিত গ্রন্থরাজি না পড়ে টডির হাত ধরে সার্ত্রকে বোঝার চেষ্টা করবে, তাঁরা পথভ্রষ্ট হবেন। আসলে, সার্ত্র Nausea-তে একাকী জীবনের

---

* *Jean-Paul Sartre : A Literary and Political Study* by Philip Thody (Hamish Hamilton, London, 1960)

যন্ত্রণা, গ্লানি ও দুঃসহতাকে নায়কের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্ত করেছে। সে দেখছে, জগতে মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব অস্বীকৃত। হয়তো তথাকথিত মানবতাবাদী কিছু আছে, কিন্তু তারা ব্যক্তির স্বকীয়তা অস্বীকার করে সমগ্র মানুষের কথা বলতে চান। অথচ এতে বিচ্ছিন্নতা-দোষ। তাই এইরকম জগতে অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক এবং মানুষ, বস্তু, গাছপালা সবকিছু অর্থহীন। জগতের নির্মমতা এই চরিত্রকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তুলেছে এবং অস্তিত্বের ক্লেদে তাকে হতাশ করে তুলেছে। কিন্তু এই হতাশা, বেদনাক্লিষ্ট অস্তিত্বই শেষ কথা নয়। ব্যক্তি অস্তিত্বের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে সংগীত ও সুরের জগতে। সাহিত্যের জগতে সে আপন স্বাধীন অস্তিত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বস্তুত, সাহিত্য যে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার উপর স্থাপিত এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা যে অন্যের মনে সঞ্চারিত করা যেতে পারে, আমার ধারণা, সার্ত্রের এই বক্তব্য Nausea-তে একেবারে অস্ফুট নয়। কিন্তু টডির দৃষ্টি এ ইঙ্গিত ধরতে পারে নি, বরং এই বই-এর কি কি চিত্রকল্পের সঙ্গে Being and Nothingness-এর কোনো কোনো বক্তব্যের বহিরঙ্গের মিল আছে, তা খুঁজতেই তিনি যত্নপর হয়েছেন। সার্ত্র সম্বন্ধে প্রথম থেকেই এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করার ফলে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সার্ত্রের ব্যক্তিচেতনা, আশাবাদ ও মানবিক দায়িত্ববোধ যথাযথ রূপায়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তবে টডি কি কি করেন নি, তার ফিরিস্তি দেওয়ার আগে কি কি তিনি করেছেন, সেগুলি বলাই ভালো। তাহলে হয়তো আলোচনার দিক থেকে সুবিধা হবে। তিনি সার্ত্রের সাহিত্যকর্মকে কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে সার্ত্র-লিখিত গ্রন্থটির একটি ত্রুটিহীন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, যাতে পাঠক তাঁর বই পাঠ করে সার্ত্রের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহী হন। স্বভাবতই, এই বর্ণনা প্রসঙ্গে বহু দার্শনিক তত্ত্ব, সার্ত্রের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, এবং তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা এসে পড়েছে। সে সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করবার জন্য গ্রন্থশেষে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছেন। সার্ত্রের বহু লেখা আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। সেগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রয়েছে কিংবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজ্ঞাত অবস্থায় আছে। এই সমস্ত লেখাগুলি

থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলন করে সার্ত্রের রাজনৈতিক আদর্শ কি, তা পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা করে টডি সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বিশেষ করে, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে সার্ত্র তাঁর একক অস্তিবাদ থেকে কতখানি দূরে সরে এসে সামাজিক অস্তিবাদের (এরকম কোনো মতবাদ একেবারে অলীক নয়, সার্ত্রের সহচরদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে এবং সার্ত্র তাঁর Existentialism and Marxism-এ এই নব অস্তিবাদের প্রবর্তন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস) দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তার একটা যথাযথ পরিচয় মেলে। সাহিত্যচিন্তায় সার্ত্র "Committed literature"-এ বিশ্বাসী হলেও তঁর রচিত নাটকগুলিতে সাহিত্য-গুণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে না হলেও টডি স্বীকার করেছেন। মোট কথা, সার্ত্রের সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনকে তিনি আমাদের সামনে সমগ্রভাবে তুলে ধরেছেন।

টডির লেখায় সার্ত্রের সাহিত্য ও রাজনীতি আলোচনার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, একজন জীবন সম্বন্ধে হতাশ দার্শনিক, মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনযন্ত্রণা থেকে শুরু করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে, নিজের স্কন্ধে সমস্ত মানুষের পাপ বহন, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে সামাজিক ঐক্যের দিকে পা বাড়িয়েছেন। অন্তত আমার মনে হয়, সার্ত্রের রচনাগুলি থেকে এই উপাত্ত টডি খাড়া করেছেন, কিন্তু তা থেকে যে-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; তা তিনি গ্রহণ করেন নি। আমি বলতে চাইছি না, সার্ত্র অস্তিবাদ পরিত্যাগ করে রাতারাতি সমাজতন্ত্রী হয়ে গেছেন, কিংবা তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন। কিংবা Being and Nothingness-এ যে-কথা তিনি বলেছেন, যে, 'essence of human relationships is not mitsein, but conflict', তা একেবারে ভুল, কিংবা Les Sequestres d' Altona-এ যে জগতের ছবি ফুটে উঠেছে, তা উজ্জ্বল, আনন্দের। কিন্তু সার্ত্রই তো Existentialism and Humanism-এ বলেছেন, ব্যক্তি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তা সে নিজের হয়ে সমস্ত মানুষের জন্যই নেয়। অর্থাৎ যদি আমি সিদ্ধান্ত করি, যুদ্ধ হওয়া উচিত, তার অর্থ আমি চাইছি, সমস্ত পৃথিবী, সমগ্র মানুষজাতি যুদ্ধে লিপ্ত হোক। আমার সিদ্ধান্ত গোটা মানুষের সিদ্ধান্ত হলে আমি অযথা যুদ্ধ চাইব না।

অনেকে বলেন, এখানে আমার সিদ্ধান্তের উপর জোর দেওয়াতে সমাজকে বাদ দিয়ে এক অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে কিন্তু তারা সার্ত্রের দর্শনের মূল কথাটা ভুলে যাচ্ছেন, তাহলে "Freedom is my nature" এবং "I am condemned to be free." ফলে, আমি সেই কাজই করব, যা আমার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবে না। আমি যুদ্ধ চাইলে আমার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে। তাই আমি যুদ্ধ চাই না। আবার, আমি একাধিপত্যও চাইতে পারি না, কারণ তাহলে, সমস্ত মানুষই একাধিপত্য চাইবে। তাতেও আমার স্বাধীনতা বিপন্ন। সার্ত্রের এই কর্মনীতির বিরুদ্ধে হয়তো রীতি-সর্বস্বতার অভিযোগ উঠতে পারে, যেমনটি কাণ্টের বেলায় উঠেছিল। কিন্তু, সব নীতি রীতি আকারে থাকে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তা কার্যকর হয়ে ওঠে। আশ্চর্যের কথা, টড়ি তাঁর সমস্ত আলোচনায় সার্ত্রের এই বইটি সম্বন্ধে কোনোরকম ব্যাখ্যা করেন নি। অথচ, আমার মনে হয়, সার্ত্রের রাজনৈতিক আলোচনায় এই বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। টড়ি এক জায়গায় বলেছেন, সার্ত্র নিজে এই বইটিকে একটি ভ্রান্ত আলোচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এই বই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। Being and Nothingness-এ স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যে-উক্তি আছে, তার সঙ্গে এই বই-এর যোগসূত্র একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। এই বইতে সার্ত্র প্রায় সার্বজনীন পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে তাব নিবিড় সম্বন্ধ মেনে ফেলেছেন। এই সার্বজনীন পরিবেশ মানাই একক অস্তিবাদ থেকে অতিক্রান্তির বড়ো সেতু।

টড়ির আলোচনায়, সমস্ত বইতে সার্ত্রের স্বাধীনতা-তত্ত্বের উল্লেখ আছে। অথচ সমগ্র বইতে কোথাও সার্ত্র স্বাধীনতা বলতে কী বোঝেন, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তিনি বলতে চান, সার্ত্রের স্বাধীনতা-তত্ত্ব স্পষ্ট নয়। কিন্তু অস্পষ্টতা কোথায় তাও তিনি বলেন নি। মুশকিল হচ্ছে এই যে, সার্ত্রের স্বাধীনতা-তত্ত্ব না বুঝলে তাঁর উপন্যাসের মর্ম উদ্‌ঘাটন করা দুষ্কর। The flies নাটকে ওরেস্টেস যখন নগর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে এবং তার পিছনে ঝাঁক ঝাঁক মাছি তাড়া করছে, সার্ত্রের স্বাধীনতা-তত্ত্ব না জানলে, এর অর্থ বোঝা যায় না। আরও বোঝা যায় না, কেন Lucifer and the Lord-এ সামাজিক বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে, বোঝা যাবে না, কেন ফ্রান্‌ৎস ও তার বাবা দুজনেই আত্মহত্যা করে। সার্ত্রের স্বাধীনতা-তত্ত্ব শুধু ব্যক্তির স্বতন্ত্র

নির্বাচন-ক্ষমতার কথা বলে না, নিজের কাজের জন্ম দায়িত্ববোধ এবং তার সঙ্গে পৃথিবীর কল্যাণ-অকল্যাণের কথা বলে।

Materialism and Revolution প্রবন্ধে সার্ত্র বস্তুবাদের নিন্দা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, বুর্জোয়া তার অধিকারকে সুনির্দিষ্ট ও চিরন্তন বলে মনে করে। তাই জড়বস্তুর মতো অধিকারের সঙ্গে একাত্ম। কিন্তু শ্রমজীবির কোনো অধিকার-চেতনা নেই বলে, তার চেতনা স্বাধীন। সে স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবে এবং সে-ই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনবে। বলা বাহুল্য, কোনো সামাজিক অধিকারকে আঁকড়ে ধরে তারই মানদণ্ডে জীবন নির্বাহ করা, পক্ষান্তরে, স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে কর্মপন্থা নির্বাচন না করার মধ্যে যে জড়ত্ব আছে, তার আলোচনায় টডি যান নি।

অবশ্য টডি কতকগুলি সংবাদ দিয়েছেন, যে, সার্ত্র অস্তিবাদকে মার্কসবাদের বিরোধী বলে মনে করেন না, বরং অত্যন্ত সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠায় যা কেবল নিয়মকেই রক্ষা করতে পারে, অথচ যাতে ব্যক্তির অস্তিত্ব অনাদৃত হতে পারে, তা যাতে না হতে পারে তাই সার্ত্রের লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনের সমৃদ্ধ বিশিষ্টতাকে বজায় রেখে কিভাবে সমাজতন্ত্রের পতাকাতলে সমবেত হওয়া যায়, সার্ত্রের অস্তিবাদ মার্কসবাদকে বন্ধুভাবে তাই দেখাতে চায়। সার্ত্র যে নিজেই বলেছেন, মার্কসবাদ এ যুগের জীবনবেদ এবং তাকে অতিক্রম করে যাওয়া অন্য কোনো দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য দর্শন বেঁচে থাকতে পারে মার্কসবাদ-নির্ভর হয়ে, এ-ও সার্ত্রের কথা। অথচ এসব সত্ত্বেও টডি গ্রন্থের শেষে বলেছেন: "It is the very urgency of the pessimism in the Diary of Antoine Roquentin and Being and Nothingness which both constitutes Sartre's originality as a thinker and creates the quite extraordinary difficulty which he has encountered in looking for positive solutions."

টডি আরও কি আলোচনা করেন নি বা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, তা বলতে গেলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তবু এইটুকু বলা যায়, যা হতে পারত, একক অস্তিবাদ থেকে সামাজিক অস্তিবাদে যাত্রার ভাষ্য, তা ব্যক্তিগত দৃষ্টির মাধ্যমে নিঃসঙ্গ হতাশার বিবরণে পরিণত হয়েছে।

রাম বসু

রূপান্তরের কবিতা

যে কবির রচনার উৎস শুকিয়ে গেছে, যা দেবার ছিল তিনি যখন তা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তখন সেই কবি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত মতামত গড়ে তোলার অবকাশ পাওয়া যায়। কারণ সে তখন সময়ের সম্ভার। কিন্তু যে কবি এখনও জীবন্ত, যার গতিবেগ কোনো আকস্মিকের টানে যে-কোনো সময় খাত বদল করতে পারে, নিজেকে ঢেলে সেজে আবার সত্ত হবার স্পর্ধা যার নাড়িতে, তার কবিতায় অভিষিক্ত হওয়া চলে। তার বেশি নয়। কারণ সময়ের সঙ্গে মোকাবিলার পালা সাঙ্গ হয় নি। মণীন্দ্র রায় সেইরকম কবি। তাঁর সংকলিত কবিতাকে বড় জোর বলা যেতে পারে মাইলস্টোন; পথ তাঁর এখনও দূর-বিসারিত। ১৯৩৯ সালে যে কবির যাত্রারম্ভ হয়েছিল দ্বিধা-দুর্বল ও অনিশ্চিতভাবে, ১৯৬৪ সালে তাঁকে দেখা যাবে আত্মনির্ভর ও নিরুদ্বেগ গতির মত্ততায়। তাই এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস হল একান্তভাবেই কবির আত্ম-আবিষ্কারের ইতিহাস। এবং সার্থক কবিতা যেহেতু সময়ের দর্পণ তাই মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা হল অন্য অর্থে যুগের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

রোম্যান্টিক ও ক্লাসিক ইত্যাদি কূট তর্কজড়িত শব্দের ভিতর না গিয়ে এরিক হেলার প্রবর্তিত সংজ্ঞা মেনে নিয়ে কবিতাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং তাদের বলা যেতে পারে ডিসকারসিভ ও ইনটিউটিভ। অবশ্য এই শব্দ-প্রয়োগেও তর্কের আশঙ্কাসমূহ। তবু কাজ চালানোর পক্ষে এই শব্দ দুটি উপযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে যদি বলা হয় ইনটিউটিভ তবে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাকে বলতে হয় ডিসকারসিভ। রবীন্দ্রনাথের

মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা—মণীন্দ্র রায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ। চার টাকা।

অমোঘ প্রতিভা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে সূচীমুখ তীব্রতায় উদ্ভাসিত করার যে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিল তারই মসৃণ গতিপথে লঘুভার উচ্ছ্বাস ও চিন্তাহীন আবিলতা কবিতার সমগ্র স্রোতকে পঙ্গু করে দিতে পারত। সাগরপারের এলিয়ট তখন কাব্যের মুক্তির সাধনায় ছিলেন অনন্য। আমাদের সৌভাগ্য, বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই মাইকেলের মতো এঁরাও বাংলা কবিতাকে আর-একবার ঘোলা জলে ডুবে মরার বিড়ম্বনা থেকে বাঁচালেন।

আবার একবার নতুন করে শেখা গেল যে চিন্তাই হল কবিতার ভিত্তিভূমি। চিন্তা ভিন্ন কবিতার উদ্ভব অসম্ভব। এবং এলিয়ট আমাদের আর-একবার বুঝবার সুযোগ দিলেন কবিতার বিশেষ প্রকরণ যে শব্দ তা হবে সেই চিন্তারই 'ইমোশ্যানাল ইকুইভ্যালাণ্ট'। পরবর্তী কালে এলিয়ট-বিরোধিতা যত অন্ধই হোক না কেন সিদ্ধির নিরিখে তাদের এই সব বালখিল্য হট্টগোল অবিবেচক ও পঙ্গুর বিদ্রূপ ছাড়া অন্য কোনো গৌরবাত্মক বিশেষণে ভূষিত করতে আমার প্রবল দ্বিধা এখনও বিদ্যমান। বিশুদ্ধ কবিতার পোশাকে বাংলা কবিতায় আবার যারা চিন্তার দেউলিয়ানার সদম্ভ বিজ্ঞাপন হয়ে এসেছেন তাদের সুপ্ত বিবেকের কাছে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা তীব্র আঘাত। একই ভাবনার অংশীদার বলে মণীন্দ্র রায়ের কবিতা দেখা দেবে প্রবল তিরস্কার হিসাবে।

ঠিকই, কোনো অলৌকিক প্রতিভার হাত ধরে মণীন্দ্র রায় আসেন নি। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ধাঁধা লাগাতে তিনি পারেন নি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিলে তিলে পুড়ে পুড়ে সোনা হয়ে উঠতে হয়েছে তাঁকে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুসন্ধানেব দুঃসহ পথে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নিতে হয়েছে সত্য—যা কখনো প্রকাশিত হয়েছে আপন স্বরূপে, কখনো ব্যর্থতা তাকে মুড়ে দিয়েছে। এক কথায় বলা যায় যে মণীন্দ্র রায়ের কবিতা হল মূলত গঠনের কবিতা। তাঁকে প্রতিটি শব্দ নিজের চিন্তা, বিবেক ও আবেগ-সম্মত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নির্মাণ করতে হয়েছে কাব্য-প্রতিমা। এবং এই একক নির্মাণের কাজে তিনি পাঠ নিয়েছেন অগ্রজ কবি বিষ্ণু দের কাছে। মণীন্দ্র রায়ের প্রথম যুগের কবিতায় বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লক্ষণীয় প্রভাবের অন্যতম কারণ হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এঁদের কবির দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটিভাবে পরিপূরক।

মনে হয় এঁরা কবিতা সৃষ্টির মূলে কোনো ঐশী প্রেরণা দেখতে পান না। সব কিছুই তাঁদের গড়ে নিতে হয়। তীব্র আত্মসচেতনতাই তাঁদের প্রাথমিক উপাদান। যদি কোনো মিল থাকে তা হল এখানে। বলা বাহুল্য, এই প্রাথমিক মিল সত্ত্বেও এঁদের পরিণতি ভিন্ন পথে এবং এঁরা নিজস্ব পথে এগিয়ে যান সিদ্ধির দিকে।

এবং এইজন্য নির্মাণই মণীন্দ্র রায়ের কবিতার প্রথম বৈশিষ্ট্য। কবিতার সৌষ্ঠব রচনার এই দক্ষতাকে কারুকৃতি বলে অভিহিত করা ভুল হবে। কারণ যে কবিতার ভিত্তিভূমি বুদ্ধি-নির্ভর শুদ্ধ আবেগ তাকে নির্জন ঈশ্বরের মতো শূন্য থেকেই সৃষ্টি করতে হয় সৌধ। শব্দ চিত্র ও ধ্বনি সংগঠনের ভাস্কর-প্রতিম সাধনা আদপে কাব্যের সামগ্রিক সাধনাই। কারণ রীতি-প্রকরণের এই অনন্যতা কাব্যচিন্তা ও কাব্যবোধের রূপান্তরের সূচনা করে। এইজন্য কবিতার অন্য নাম হল নির্মাণ। এই জন্য কবি হলেন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্মাণের প্রতি এই নিষ্ঠা 'ত্রিশঙ্কু মদন' থেকে 'নতুন কবিতা'র পর্যায় অবধি অব্যাহত। ইতিমধ্যে নির্মাণের ধারা পালটিয়েছে; রীতির বদল হয়েছে, অন্বেষায় এসেছে জটিলতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাবে গঠনের প্রতি ভাস্কর-প্রতিম আগ্রহ, দেখা যাবে শূন্যের দৃশ্যপটে মূর্তি রচনার একলব্য সাধনা।

গণ-বিশ্বাস বা গণ-আবেগের দৃশ্যত ভিত্তিভূমি আঁকড়ে যে-কবিতা বড় হতে চেয়েছে, কোনো অমার্জিত কবির হাতে তা হতে পারত উচ্ছ্বাসপূর্ণ নির্দেশনামা। কিন্তু গঠনের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকার জন্য মণীন্দ্র রায়ের সেই সব কবিতার মধ্যেও দেখা যায় আত্ম-আবিষ্কারের প্রবণতা। বিবৃতির বদলে উপলব্ধিসঞ্জাত বীক্ষা আকৃষ্ট করে পাঠককে।

গঠন-সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা মণীন্দ্র রায়ের কবিতার প্রধান পোষণ-পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় যে তিনি অতি সাবধানী ও গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী। তাঁর সমসাময়িক দু-একজন কবি দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি সে পথে যান নি। বরং অতি ধীরভাবে প্রদত্ত প্যাটার্নকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনে তৎপর হয়েছেন। সম্ভবত ১৮৯৮ সালে ইয়েটস-এর উক্তি (নতুন কবিতা, যার সীমানা ক্রমাগত সীমাবদ্ধ হচ্ছে, পুরাতন কবিতার ছায়ায় বদ্ধ হয়েছে) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে। তার কারণ প্রবহমানতা ও ধারাবাহিকতা তাঁর কবি-চরিত্র। কোনো বিশেষ শব্দ

আমদানি করে শব্দের ভাণ্ডার গড়ে তোলার চেয়ে ব্যবহৃত শব্দকে নতুন তাৎপর্যে ভূষিত করতে আগ্রহ তাঁর অনেক বেশি। অবশ্য তিনি যে নতুন শব্দ আনেন নি এমন নয়; অনেক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন; অনেক দক্ষ ও নিখুঁত চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। কোনো কঠোর সমালোচক তাঁকে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। কিন্তু মণীন্দ্র রায়ের ক্ষেত্রে যা আরও উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে তিনি প্রচলিত ও ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে উদাসীন নন। বরং অভিজ্ঞ কারিগরেব মতো পুরাতনকে নতুনত্বের দীপ্তি দেবার দুর্লভ কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। এবং এত বেশি আয়ত্ত করেছেন যে সমগ্র প্রচেষ্টা ও প্রচেষ্টাজনিত আয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে। পাঠক অনায়াসে পৌঁছে যান সেই লক্ষ্যে যা কবির ঈপ্সিত। তাই চিত্রকল্পগুলির আবেদন শুধুমাত্র চোখেব উপর সীমাবদ্ধ থাকে না। রূপ হয়ে ওঠে সৌন্দর্য; আবেদন চোখ থেকে ছড়িয়ে পড়ে মনে, বোধে ও চেতনায়। একই ধরনের চিত্রকল্প বহু ক্ষেত্রে নানাভাবে আসে এবং তার ফলে সেই ছবি প্রতীকের মহত্ত্ব অর্জন করে।

যেহেতু মণীন্দ্র রায়ের কবিতার উৎসমুখ বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা তাই তাঁর চিত্রকল্প শুধু নিসর্গ-রর্চনা বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না; বরং তারা নতুন ভাবনা ও বোধের সঞ্চাব করে। এই ভাবনা ও বোধ সঞ্চার করার জন্য তিনি সাধারণত ভগ্ন চিত্রকল্প বা ব্রোকেন ইমেজ ব্যবহার করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর চিত্রকল্পগুলি জীবন্ত, ঘন-সংবদ্ধ ও পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। কবিতা নির্মাণের জন্য তাঁর অজস্র চিত্রকল্পের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদে চিত্রকল্প আসেও। কিন্তু তার মধ্যে থাকে একটা মূল চিত্রকল্প যা কালক্রমে হয়ে ওঠে ভাবকল্প। পরস্পরের সহযোগী, আবার কোনো সময় পরস্পর-বিরোধী চিত্রকল্প থেকে সামগ্রিক ভাবকল্পটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সমগ্র কবিতাটি ফোটে পদ্মের মতো। কেন্দ্রমণি কোরক যেন ভাবকল্প এবং তা পাপড়িগুলিকে ধরে রাখে। অন্য দিকে পাপড়িগুলিও কোরককে দেয় সমগ্রতা। এই জীবন্ত দেওয়া-নেওয়ার ভিতর থেকে হয় কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই মণীন্দ্র রায়ের কবিতার চিত্রকল্প যেন স্ফটিক মূর্তি। তার বাস্তব, দৃঢ় ও কঠোর অবয়বের মধ্য থেকে কবিতার অব্যক্ত প্রাণকে জ্বলতে দেখা যায় তন্ময় আবেগে। সম্ভবত এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সনেট বা সনেটজাতীয় দৃঢ়বদ্ধ পয়ার রচনায় মণীন্দ্র রায় ঈর্ষনীয়

সফলতা অর্জন করেছেন এবং তাঁর হাতে এই জাতীয় কবিতা হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতার সম্পদ।

চিত্রকল্প এবং তার আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে আধুনিক কবিতার দান অনস্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি মৌলিকত্বের দাবি সে করতে পারে কবিতাব অন্তর্নিহিত সংগীত রচনায়, যাকে বলা হয় 'ইন্টারলাইজেশন অব মিউজিক' রচনায়। এই সংগীত রচনাতেই কাব্যের মুক্তি। এই মুক্তির একদিকে থাকে অধিকতর আত্ম-সচেতনতা এবং অন্য দিকে থাকে কাব্যবোধ। কবিতার প্রাণবস্তু বা থীম গড়ে ওঠে এইভাবে। কবির বিষয়বস্তুর রদ-বদল হতে পারে। প্রকাশের রীতির হেরফের হতে পারে। কিন্তু প্রাণবস্তু থাকে একই। কারণ প্রাণবস্তু প্রকাশের অতীত। সে হল "নট হোয়াট দি পোয়েম ইজ" বরং "হোয়াট দি পোয়েম উইলস্"। প্রাণবস্তু আদপে সন্ধান। আত্মার সন্ধান।

যেহেতু মণীন্দ্র রায়ের কবিতার আরম্ভ অচেতন ভাবপ্রকাশের মধ্যে নয় বরং তীব্র আত্মানুসন্ধানে, তাই কবি যা চান, তা আমার মনে হয়, আরও কিছু সৎ কবির মতো বিরাট বিশ্বে আপন অবস্থান উপলব্ধি করতে। বস্তু-বিশ্বে আপন সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই সম্পর্কের স্বরূপ সম্পর্কে সদাজাগ্রত চেতনাই প্রথমাবধি বিদ্যমান। সম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে সৃষ্টি। এই হল বিকাশ। এ অনেকটা ফুটে ওঠার মতো। দ্বিধা, শঙ্কা, ভয়, সন্দেহ ও আনন্দের বিচিত্র পথে সে নিজের বৈভব ছড়িয়ে আসে। চারপাশের পরিধি যখন ক্রমাগত ছোট হয়ে এসে কবিকে গুঁড়ো করে দিতে চায় তখন কবির আত্মা সব কিছু অগ্রাহ্য করে সেই রিরক্ত, বিষাক্ত এবং ক্রুদ্ধ বিশ্বে নিজের অবস্থান বেছে নেয়। আমার মনে হয় এই অবস্থান বেছে নেওয়াই হল মণীন্দ্র রায়ের কবিতার প্রাণধর্ম।

যাত্রারম্ভে এই অসহ্য অবরোধ এই ব্যক্তির অন্ধকূপ-হত্যা মণীন্দ্র রায়কে পীড়িত করে। তিনি নিজেকে মনে করেন স্বর্গচ্যুত। সেখানে "অসহ্য শূন্যতা আজ কাঁপে শুধু শ্রাবণের ঝিঁঝিঁর মতন"। 'প্রথামত আত্ম-সচেতন' থেকেও কবি বুঝতে পারলেন যে এই দুর্যোগ থেকে অব্যাহতি নেই। তবু আছে আত্ম-অসংগতি। তাই তিনি "নির্বাত বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে মরি মূর্খ বিভ্রান্ত হরিণ।" সম্পর্ক ও আশ্রয়চ্যুত কবি ব্যক্তিসর্বস্বতার অহমিকা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশীদার হতে

চেয়েছেন। স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা পাবার পর সামাজিক ন্যায়বিচার পাবার মানবিক সংগ্রামে কবি পক্ষভুক্ত হয়েছেন। আকাল, দাঙ্গা ও মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে তিনি তাঁর স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই সব কবিতায় কবি ব্যক্তিহিসাবে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবোধকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। সেই মূল্যবোধগুলির নিরিখে আপন ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও প্রসার উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

তবু যে-কোনো সচেতন পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন যে কবির আত্মোপলব্ধি প্রায় সিদ্ধির স্তরে এসেছে 'অমিল থেকে মিল'-এর পর্যায়ে। মণীন্দ্র রায় এখানে অগ্রজ কবিদের দূরে সরিয়ে রেখে আপন স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। যে বিশ্বকে ব্যাখ্যায় ও তাৎপর্যে আত্মস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন তা নিজস্ব ধারায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকে। যে-বিশ্বাস এতদিন অবধি ছিল পাওয়া, বুদ্ধিনির্ভর, তা এখন উপলব্ধ এবং উপলব্ধ বলেই অনন্য। বিশ্ববিকাশের মূলে আনন্দের অব্যাহত ধারার কথা উপনিষদ থেকে শোনা। রবীন্দ্রনাথ এই ধারা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সার্থক উপলব্ধি হলে একই আনন্দ বিভিন্ন আধারে কত বিচিত্রভাবে ফুটে উঠতে পারে তার প্রমাণ 'আনন্দ, এবং আনন্দ।' যে পিতৃ-প্রতিম সত্তার উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথকে আপ্লুত করে, মণীন্দ্র রায়ের উপলব্ধির পিছনে আনন্দের কারণ হিসাবে নেই সেই সত্তা। আনন্দের কারণ বরং হল 'শিল্পস্নাত চেতনা' যা প্রায় ইয়েটসীয় রীতিতে তাঁর ধর্ম হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই শিল্পচেতনা বিশ্ব ও জীবনবিরোধী নয়। বরং প্রসারিত ব্যক্তিমানস বস্তুবিশ্বকে আপন স্বরূপে বিধৃত করার জন্য বিসারিত। এবং সেই ব্যক্তি-মানসের মধ্যে বিরোধের জন্ম ও বিলয়। "মানুষের পাখা নেই।" মনীন্দ্র রায়ের সামগ্রিক বক্তব্য 'এবার ভ্রূ মধ্যে এস' কবিতায় দার্শনিক প্রজ্ঞায় ভূষিত। হয়তো ভারতীয় চিন্তার আলোয় বর্তমানের জটিল জীবন অন্য এক দীপ্তি এনে দেবে। তাই প্রার্থনার মতো আমাদেরও উচ্চারণ :

> স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, করো প্রাণ অভার বসতি
> কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
> অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এস স্নিগ্ধ জ্যোতি
> এবার ভ্রূমধ্যে এস মমতার তৃতীয় নয়নে।

সুধাংশু ঘোষ

স্যালিঞ্জার : দুঃসহ কৈশোর

জনপ্রিয়তার নাকি কোথাও কিছু গলদ আছে। এ কথা যে এক অর্থে সত্যি আমাদের দেশে অন্তত তার নজির প্রচুর। শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই এমন দৃষ্টান্ত আছে বিশ্বাস করা সংগত। আমেরিকার জেরোম ডেভিড স্যালিঞ্জার অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। অথচ যে-সব লেখক একটির পর একটি আদ্যন্ত অপাঠ্য বিপুলাকার কেতাবের ভার হাজার হাজার উল্লসিত পাঠকের হাতে চাপিয়ে দিয়ে মাল্যভূষিত, যাঁদের গণ্ডদেশ সফলতার উত্তাপে রক্তিমাভ, স্যালিঞ্জার তাঁদের হাজার মাইলের মধ্যে নেই। স্যালিঞ্জারের একমাত্র উপন্যাসের প্রথম দু'টি সংস্করণে তাঁর ছবি ছিল। পরে তিনি প্রকাশকদের অনুরোধ করে ছবিটিকে খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি পত্রিকার মলাটে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল। দেখা গেল তাঁর মুখ শীর্ণ, চোখ ছাড়া আর সব চমকে দেবার মতো অনুজ্জ্বল। বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যখন দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় এত কম লিখে তাঁর মতো জনপ্রিয়তা আর-কোনো লেখক অর্জন করেন নি।

একুশ বছর ধরে লেখাই স্যালিঞ্জারের পেশা। এই একুশ বছরে তিনি একখানি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন—'দি ক্যাচার ইন দি রাই'। গল্প লিখেছেন উনত্রিশটি। অধিকাংশ গল্প পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে। ন'টি গল্প 'নাইন স্টোরিজ' নামের সংকলনের অন্তর্গত। দ্বিতীয় সংকলন 'ফ্র্যানি এ্যাণ্ড জুয়ী'-তে দু'টি গল্প রয়েছে। গত এক দশকে তাঁর চারটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে তিনটি উপন্যাসোপম বড় গল্প। প্রথম প্রকাশের দশ বছর পরেও তাঁর বই আমেরিকায় বছরে আড়াই লক্ষ কপি বিক্রি হয়। তাঁর একমাত্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল্ডেন কল্‌ফিল্ড এখনও আমেরিকায় কৈশোরের প্রতিরূপ। উপন্যাসটি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিণ চরিত্র ও

Salinger : A Critical and Personal Portrait. Introduced and Edited by Henry Anatole Grunwald. Harper & Brothers, N. Y. $ 4·95.

সামাজিক কাঠামো বিষয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রাঙ্গণে একবার চোখ বুলিয়ে আনলেই নকল হল্ডেনের দেখা মিলবে।

আমেরিকার প্রাত্যহিকতার কোলাহল পিছনে রেখে স্যালিঙ্গার নির্জন জীবন যাপন করেন। বলা যায়, সাংবাদিকরা সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী অথবা পোপের মতো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষেও স্যালিঙ্গারের কাছে পৌছনো অসম্ভব। মাঝে মাঝে অবশ্য এক-একটি দুর্লভ মুহূর্তে তাঁকে দেখা যায়; তা না হলে মনে হতে পারত, স্যালিঙ্গার নামে কোনো বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। প্রচারের এই কল-কণ্ঠকালে তাঁর এই একান্ত নির্জন দিনযাপন এক প্রচণ্ড কৌতুক।

কারো কারো বিশ্বাস, নিজেকে এমন রহস্যের কুয়াশায় প্রচ্ছন্ন রাখা স্যালিঙ্গারের একটি কূটকৌশল। এই কূটকৌশল তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম সহজবোধ্য কারণ। একজন সমালোচক পরিহাস করে বলেছেন, স্যালিঙ্গার আমেরিকার সাহিত্যিক মহলের গ্রিটা গার্বো।

অবশ্য স্যালিঙ্গারের এই নির্জনতাপ্রিয়তার খুব সরল ব্যাখ্যা হতে পারে। বলা যেতে পারে, তিনি জানেন তাঁব লেখা স্রোতের মতো এগোয় না; যে গভীর অন্তর্মনের অন্ধকারে তাঁর দৃষ্টি সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলে, আমেরিকার প্রাত্যহিকতার উজ্জ্বল আলোয় আহত হলে, আবার দৃষ্টিনিবদ্ধ করা বড় কঠিন। তাঁর হয়তো ভয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে, পি. এইচ. ডি. প্রার্থীদের উপদেশ দিয়ে, অটোগ্রাফ-শিকারীদের খুশি করে দিন কাটালে লেখক হিসাবে তিনি ফতুর হয়ে যেতে পারেন। তখন অন্য সবাই তাঁকে আগ্রহহীন অস্পষ্ট চোখে দেখবে, কিন্তু নিজের কাছে তাঁর নিজেব মূর্তি হারিয়ে যাবে।

কারণ যাই হোক, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, স্যালিঙ্গারের নির্জনতা-প্রিয়তা বিস্ময়কর। এবং অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর এই আশ্চর্য নির্জন জীবন তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে এক বিচিত্র স্বাদ দিয়েছে। তাঁর বিষয়ে লিখতে গিয়ে কোনো কোনো সমালোচকের বিদ্রূপ অথবা পরিহাসাশ্রয়ী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ নিজের চারপাশে পাঁচিল তুলে স্যালিঙ্গার নিজেই তো উসকানি দিয়েছেন। তিনি আজ পর্যন্ত সমালোচকদেব কোনো মন্তব্যের জবাব দেন নি সত্যি, কিন্তু তিনি যে তাঁর বিষয়ে সব আলোচনা সযত্নে অনুধাবন করেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সব কোলাহলের কপাট বন্ধ করে রাখা এক কঠিন সাধনা। বস্তুত কারো কারো বিশ্বাস, এর থেকে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, কোলাহলে কণ্ঠ মেশানো অনেক সহজ। মানুষের অরণ্যে মিশে গেলে পথ হারিয়ে যায় কি না, নিজের মূর্তি নিজের কাছে হারিয়ে যায় কি না, এ-প্রশ্নও বিতর্কের দাবি রাখে। তা ছাড়া কপাট সত্যি বন্ধ করে রাখা যায় না, শুধু মিথ্যে চেষ্টায় অনেক শক্তি আর সময় হারিয়ে যায়।

বলা হয়, স্যালিঞ্জারের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসের শরীর তৈরি। অথচ কী তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কেউ জানে না। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর নিজের থেকে অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি জীবন্ত। তাঁর নিজের জীবনের বিষয়ে শুধু জানা যায়, গ্লাস পরিবার নিয়ে লেখা গল্পের চরিত্রগুলির মতো তাঁরও নিউ ইয়র্কে জন্ম হয়েছিল, তাঁর বাবা ইহুদী আর মা ক্রিশ্চিয়ান। তাঁর বাবা মাংস আর পনির আমদানীর ব্যবসা করে বিত্তবান। গ্লাস পরিবারের সদস্যদের মতো অভিনয়কলার সঙ্গে তাঁর মা-বাবার কোনোদিন কোনো যোগ ছিল কিনা কেউ জানে না।

জানা যায়, শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল সনী। এই গম্ভীর নম্র শিশু একাকী দীর্ঘ পথ হাঁটতে ভালোবাসতো। তাঁর কোনো ভাই ছিল না, তাঁর একমাত্র বোন ডোরিস তাঁর থেকে আট বছরের বড়। তিনি এক সময় বলেছিলেন, গ্লাস পরিবার নিয়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন গল্পেব বিচিত্র চরিত্র সীমুর এবং তাঁর একমাত্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল্ডেন তাঁর এক মৃত স্কুলের বন্ধুর ছায়ারূপ। সেই মৃত বন্ধুর সন্ধান এখনও মেলে নি। শুধু জানা গেছে, তাঁর স্কুলের দু'জন বন্ধুর শৈশবে মৃত্যু হয়েছিল এবং এই দু'জনের একজন ছিল অসাধারণ। কিন্তু অনুসন্ধানীরা এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন যে, এক নির্জন শিশুর মতো স্যালিঞ্জার কল্পনায় ভাইবোনের মূর্তি গড়েছেন এবং তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা তাঁর কল্পনা থেকেই উৎসারিত।

পনের বছর বয়সে সনীকে ভ্যালী ফোর্জ সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। একে প্রায় নির্বাসন বলা যায়। কিন্তু এই পনের বছরের কিশোরের সঙ্গে হল্ডেন কলফিল্ডের মিল নেই।

১৯৪৪ সালে স্যালিঞ্জার ডেভনশায়ারে চতুর্থ পদাতিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই সময়ের জীবন 'নাইন স্টোরিজ'

সংকলনের অন্তর্গত 'ফর এস্‌মে—উইথ লাভ এ্যাণ্ড স্কোয়ালর' গল্পের যন্ত্রণায় আগুনে পোড়া নায়ক সার্জেন্ট এক্সের জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। বাল্‌জের যুদ্ধের পুরো সময়টা স্যালিঞ্জার নরম্যাণ্ডিতে ছিলেন। একাকী ঘুরে ঘুরে অসামরিক ফরাসী নাগরিক ও বন্দী জার্মানদের জেরা করে গেস্টাপোর চরদের আবিষ্কার করা তাঁর কাজ ছিল। ফ্রান্সে স্টাফ সার্জেন্ট স্যালিঞ্জার যুদ্ধের সংবাদদাতা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একবার দেখা পেয়েছিলেন। তাঁর বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন হেমিংওয়ে। 'এস্‌মে' গল্পটিতে স্যালিঞ্জার এমন একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

তাঁর পরিচিত এক সৈনিকের দেওয়া খবর থেকে জানা যায়, এই সময় স্যালিঞ্জারের জীপে একটা টাইপরাইটার থাকত। তাঁর এলাকা আক্রান্ত হলেও তাঁকে কোনো টেবিলের তলায় কুঁকড়ে বসে টাইপ করে যেতে দেখা গেছে। 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট'-এ প্রকাশিত একটি গল্পে তিনি সার্জেন্ট ভিনসেন্ট কল্‌ফিল্ড নামে একটি চরিত্র আনেন। গল্পটিতে ইঙ্গিত আছে, এই কল্‌ফিল্ডের এক কমবয়েসী ভাই প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে নিহত হয়। গল্পটিতে মৃত ভাইদের ভাবনায় মগ্ন থাকার এবং প্রধান চরিত্রের মৃত্যু নিয়ে কাহিনী শুরু করার প্রবণতা প্রথম স্যালিঞ্জারের সাহিত্যকর্মে দেখা যায়। 'এ পারফেক্ট্‌ ডে ফর বেনানা ফিশ' ১৯৪৮ সালে গ্লাস পরিবার নিয়ে লেখা প্রথম গল্প। গল্পটিতে সীমুরের আত্মহত্যা নিয়ে গ্লাস পরিবারের কাহিনীর শুরু।

স্যালিঞ্জার নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন যুদ্ধবিরতির এক বছর পরে। মা-বাবার সঙ্গে পার্ক এ্যাভিন্যুয়ে থাকেন কিছু দিন, রাতগুলো কাটান গ্রীনউইচ গ্রামে। তখনও বৌদ্ধ দর্শনের বিষয়ের বই আমেরিকার বাজারে তেমন করে ছড়ায় নি। তখন থেকে স্যালিঞ্জার নিজেকে কোলাহল থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। প্রথমে চব্বিশ মাইল দূরে টেরিটাউনের এক কুটিরে যান। তারপর নিউ হ্যামশায়ারের কর্নিশে পাহাড়ের চূড়োয় একটি ছোট একতলা বাড়ি কেনেন। বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে একটা সাড়ে ছ'ফুট উঁচু বেড়া।

ক্লেয়ার ডগলাসের সঙ্গে স্যালিঞ্জারের প্রথম দেখা হয় ১৯৫৩ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে। ইংরেজ পরিবারে ক্লেয়ারের জন্ম। প্রথম সাক্ষাতের দু বছর পরে তাঁদের বিয়ে হয়। এখন তাঁদের এক পুত্র আর এক কন্যা। বিয়ের পর স্যালিঞ্জার দোকান-বাজারে যাওয়ার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পেয়েছেন। সকাল

সাড়ে আটটায় দুপুরের খাবারের প্যাকেট নিয়ে তিনি লেখার ঘরে ঢোকেন এবং সেখানে থাকেন বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তখন তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে হলে টেলিফোন ব্যবহার করতে হয়।"

স্যালিঙ্গারের জীবন সম্বন্ধে এ যাবৎ সংগৃহীত তথ্য খুব সংক্ষিপ্ত। তবে তাঁর বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বিস্ময়কর গল্প প্রচলিত হয়েছে। যেমন, তাঁর একমাত্র উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এক প্রকাশককে দেওয়া হয়েছে, প্রকাশক বইটি ছাপতে রাজি হয়েছেন। চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। বইটি যিনি সম্পাদনা করবেন তাঁর সঙ্গে স্যালিঙ্গারের দেখা হল। সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লেখক তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠালেন পাণ্ডুলিপিটি ফেরত আনতে। কারণ হিসেবে প্রায় চোখের জল ফেলে বললেন, সম্পাদকের ধারণা হয়েছে যে, তাঁর উপন্যাসেব নায়ক হচ্ছেন বিকৃতমস্তিষ্ক। অন্য এক প্রকাশক 'দি ক্যাচার ইন দি রাই' প্রথম প্রকাশ করেন।

নিজের জীবনের বিষয়ে স্যালিঙ্গার আগে আগে দু-এক কথা লিখতেন। প্রায় পনেব বছব আগে তিনি লিখেছিলেন, "যুদ্ধের সময় আমি চতুর্থ ডিভিশনে ছিলাম। যাদের বয়েস খুব কম, প্রায় সব সময় আমি তাদের সম্বন্ধে লিখি।"

অনেক মহলের বিশ্বাস, স্যালিঙ্গারকে নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করা হচ্ছে। কেম্ব্রিজের চার্চিল কলেজের ফেলো এবং 'টলস্টয় অর ডস্টয়ভস্কি' ও 'দি ডেথ অব ট্রাজেডি' গ্রন্থের লেখক জর্জ স্টাইনার কয়েক বছব আগেই মন্তব্য করেছিলেন, স্যালিঙ্গারের অধিকাংশ পাঠক প্রায় 'নিবক্ষর'। 'টাইম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হেনরি গ্রানওএল্ডের ধারণা, স্টাইনাবেব ওই মন্তব্য উন্নাসিকতা থেকে এসেছে। স্যালিঙ্গারকে কোনো শ্রেণীতে ফেলা যায় না অথবা তাঁর বিষয়ে কোনো ছক বেঁধে দেওয়া যায় না। এটাই তাঁর অসাধারণত্ব।

স্যালিঙ্গারের গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জীবন্ত। তাঁর ভক্ত পাঠকদের এক-এক সময় মনে হয়, ওই সব চরিত্রের সঙ্গে নানা জায়গায় তাঁদের দেখা হল। তাঁব বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ এনেও বিদগ্ধ সমালোচকরা চরিত্রায়নের এই নিপুণতা অস্বীকার করতে পারেন না।

শ্রীমতী মেরি ম্যাক্‌কার্থী একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন ; " 'দি ক্যাচার ইন দি রাই' উপন্যাস হিসেবে যতটা প্রশংসার দাবি রাখে তার থেকে অনেক

বেশি প্রশংসা পায় শুধু তার চমকের জন্যে। এই চমক এক হাতে বেহালা বাজানোর মতো।"

এক হাতে বেহালা বাজে না। শ্রীমতী ম্যাক্‌কার্থী হয়তো স্তালিঞ্জারের গল্প-উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলির নিজেদের অন্তর্মনের অন্ধকারে ডুব দেওয়ার অভ্যাসের প্রতি তর্জনী সঙ্কেত করেছেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্যকর্মের এই পদ্ধতিতে সমকালীন লেখক আর সমকালীন পাঠকের মাঝখানের পৃথিবী প্রায় অনাস্বাদিত থেকে যায়। ডিকেন্স এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে ফ্যাগিন অথবা ইউরায়া হীপ রক্তমাংসের শরীর পেত না।

জয়েসের সময় থেকে অন্তর্মনের নির্জন সংলাপ প্রচুর হয়েছে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো লেখকের হাতে এই পদ্ধতি ক্লান্তিকরও। তথাপি স্তালিঞ্জারের ভক্ত পাঠকদের কাছে হল্ডেন কল্‌ফিল্ড অবশ্যই ফ্যাগিন অথবা ইউরায়া হীপের সমান রক্তমাংসের শরীর পেয়েছে। এবং হল্ডেনের চারপাশের পৃথিবীও অনাস্বাদিত থাকে নি।

স্তালিঞ্জারকে বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। এই কারণে তাঁর সব সমালোচক তাঁর বিষয়ে কিছু লিখতে গেলেই তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে পাতার পর পাতা উদ্ধার করে পাঠকদের উপহার দেন। সমালোচনার এই পদ্ধতি সব সময় সার্থক হয় না।

স্তালিঞ্জারকে কোনো ছকে ফেলা অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর সমালোচকদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ খুঁজে পেতে চান। এই সমালোচকদের অনেকেই আশাহত। 'দি আমেরিকান নভেল'-এর লেখক ম্যাক্সওয়েল গেইসমার হল্ডেন কল্‌ফিল্ডের মধ্যে দেখেছেন অলস বিত্তবান শ্রেণীর এক নির্জন কিশোরের আবেগের প্রকট প্রদর্শনী। শ্রীমতী ইসা ক্যাপ সমালোচক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কোনো কুয়াশার অবকাশ না রেখে সরাসরি অভিযোগ করেছেন, স্তালিঞ্জারের সাহিত্যে সমাজের স্বাদ মিলবে না। অপর শ্রেণীর সমালোচকরা স্তালিঞ্জারের মধ্যে ধর্মীয় দর্শন খুঁজে পান। তাঁরা স্তালিঞ্জারকে ডস্টয়ভ্‌স্কির এক শিশু সংস্করণে পরিণত করতে ব্যগ্র।

স্পষ্টতই সমাজজীবনের বর্ণনা দেওয়া স্তালিঞ্জারের লক্ষ্য নয়। তাঁর গল্পের গ্লাস পরিবারের সদস্যরা প্রেম-প্রীতির স্তরে অন্ধকার ও আত্ম-ঘৃণার কথাই বেশি বলে, আমেরিকার একটি সমকালীন শহরে ইহুদী পরিবারের পরিপার্শ্বের কথা বিশেষ বলে না।

ডস্টয়ভস্কি ও মার্ক টোয়েনের সঙ্গে বার বার স্যালিঞ্জারের তুলনা করার প্রবণতা তাঁর অধিকাংশ সমালোচক দেখিয়েছেন। আইভান কারমাজোভ ও হাকলবেরি ফিনের বিদ্রোহের সঙ্গে অনেকবার হল্ডেন কলফিল্ডের বিদ্রোহের তুলনা করা হয়েছে। এমন কিছু চরিত্র আছে যারা ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীর নকশায় অবিচার, অসুন্দর ও যন্ত্রণার অস্তিত্ব সহজে মেনে নিতে নারাজ। আইভান তেমন একটি চরিত্র। এমন যুক্তি প্রচলিত আছে যে, 'সত্য লাভ' করতে হলে অন্য সবার সঙ্গে শিশুদেরও যন্ত্রণা ভোগ করা দরকার। আইভান সত্যের জন্যে তেমন মূল্য দিতে নারাজ। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আইভানের এই বিদ্রোহ হাকের মধ্যেও অন্যরূপে সঞ্চারিত। হাকও বলে, "বেশ, তাহলে আমি নরকেই যাব।" কিন্তু হল্ডেনের যাবার মতো কোনো নরকও নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের পৃথিবীতে যা কিছু অসুন্দর, ভুয়ো আর নকল তা হল্ডেনের ক্ষুব্ধ কৈশোরের কাছে দুঃসহ। কিন্তু কিসের জন্যে তার বিদ্রোহ তা স্পষ্ট নয়। সে কিছু পেতে চায় না, কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। তবে কয়েকজন সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন, হল্ডেনের বিদ্রোহ শুধুই কৈশোরের স্বাভাবিক ক্ষোভ নয় ; সে কিছু চায় এবং যা কিছু সে চায় তার যোগফল ভালোবাসা।

'অন নেটিভ গ্রাউণ্ডস' ও 'এ ওয়াকার ইন দি সিটি'-র লেখক অ্যালফ্রেড কাজিন অবশ্য মনে করেন, হল্ডেনের বিদ্রোহ কৈশোরের সুপরিচিত বিক্ষোভ ছাড়া আর কিছু নয়, যার সঙ্গে গভীরতর কিছু জড়িয়ে স্যালিঞ্জার বিভ্রান্তি এনেছেন।

প্রচলিত নকশা মেনে নিতে অসম্মতি শুধু কৈশোরের লক্ষণ নয়, সন্ন্যাসী এবং মাঝে মাঝে উন্মাদেরও লক্ষণ। কৈশোরের অনুভবের দুঃসহ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সংসারত্যাগী ও উন্মাদের অনুভবের মিল আছে। সন্ন্যাসী তার ধর্মে আশ্রয় খুঁজে পায়, উন্মাদ শুধু পলায়নে। হল্ডেনের মতো তারাও প্রাত্যহিকতার প্রচলিত নকশা মেনে নিতে রাজি নয়।

অ্যালফ্রেড কাজিন এবং 'লাভ অ্যাণ্ড ডেথ ইন দি আমেরিকান নভেল'-এর লেখক লেসলী ফিডলারের অভিযোগ স্যালিঞ্জারের পাত্রপাত্রীদের বয়েস বাড়ে না। তারা স্বেচ্ছায় সযত্নে দীর্ঘকাল কৈশোরকে বাঁচিয়ে রাখে। যৌবনের প্রেম স্যালিঞ্জারের গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য নয়। যৌনতার প্রশ্ন থেকে তিনি পলাতক। অবশ্য এর ফলেই হয়তো যৌনতার অবদমিত রূপ তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত নয়।

জর্জ স্টাইনার এক সময় বলেছিলেন, আমেরিকান সাহিত্য-সমালোচনা একটা বিরাট যন্ত্র। তার জন্যে সব সময় কাঁচামাল চাই। এই যন্ত্রই হয়তো স্যালিঞ্জারকে নিয়ে এত মাতামাতির জন্যে দায়ী। কিন্তু খুব সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, স্যালিঞ্জারের নিন্দে করতেই এই যন্ত্রের বেশি উৎসাহ। অনেক দিন আগে এডমাণ্ড উইলসন বলেছিলেন, কোনো অখ্যাত নতুন লেখকের শক্তি বরং অতিরঞ্জিত করে তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে সমালোচক আত্মপ্রসাদ পান। অথচ সেই লেখকই জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তাঁর দুর্বলতা খুঁটিয়ে দেখাতে না পারা পর্যন্ত সেই সমালোচকের শান্তি নেই। স্যালিঞ্জারের বেলায়ও হয়তো এমনই একটা কিছু ঘটেছে।

বিভিন্ন পত্রিকা থেকে স্যালিঞ্জার বিষয়ে সমালোচকদের অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র করে হেনরি গ্রান্‌ওঅল্‌ড যে সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তার জন্যে তিনি স্যালিঞ্জার-অনুরাগীদের অভিনন্দন পাবেন। বইটি মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। বইটির অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। সেই প্রবন্ধগুলির কয়েকটি বাদ দিয়ে অথবা সেইগুলির বক্তব্য সংক্ষেপ ভূমিকায় উল্লেখ করে অন্য দু-একটি ভালো প্রবন্ধ নির্বাচন করা যেত। যেমন স্যালিঞ্জারের একমাত্র উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে রবার্ট গাট্‌উইলিগের প্রবন্ধটি নির্বাচন করা যেত।

দিলীপ বসু

আধুনিক যুদ্ধ

প্রফেসার ব্ল্যাকেটের নাম আমাদের দেশে অপরিচিত নয়। আমাদের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারিতে তাঁকে ডিরেক্টার নিযুক্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে ভারতের পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণার বহু বিভাগে তিনি বেশ সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সম্প্রতি তিনি শিক্ষা-কমিশনেব সদস্যও নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রথম জীবনে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নৌবাহিনীতে জার্মান ডুবোজাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করার পরে, ১৯২৩ সালে প্রথমে কিংনাস্‌ কলেজের ফেলো, পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কবেক্‌ কলেজে অধ্যাপনা, তারপর কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টার, অধুনা লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রফেসারের পদে তিনি নিযুক্ত। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে পদার্থবিদ্যাতে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে নৌবাহিনীতে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ কমাণ্ডের এবং নেভাল অপারেশনাল রিসার্চের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। আজকের দিনে, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে বৈজ্ঞানিকের বিশিষ্ট জ্ঞান ছাড়া মহাযুদ্ধের পরিকল্পনা করা নিশ্চয়ই অলীক এবং ঠিক সেই কারণেই প্রফেসার ব্ল্যাকেটের মতো একাধারে বড় বৈজ্ঞানিক ও সমর-অভিজ্ঞ বিশিষ্ট চিন্তাবিদের ভবিষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধ অথবা বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে মতামত তাই বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

আলোচ্য পুস্তকের পূর্বে ১৯৪৮ সালে *Military aud Political Consequences of Atomic Energy* এবং ১৯৫৬-তে *Atomic Weapons*

Studies of War—P. M. S. Blackett. Oliver & Boyd. London. 21 sh.

and East-West Relations নামক দুটি বই লিখে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য পুস্তকটির প্রথম অংশে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারার একটা ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়, যেটি আমরা এখানে বিশেষ করে আলোচনা করব। দ্বিতীয় অংশে সামরিকগত স্ট্র্যাটাজিক ও ট্যাকটিক্যাল প্রশ্নে, তথা রাডার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে যে টেকনিক্যাল আলোচনা ও অঙ্কের অবতারণা করা হয়েছে, সেটি আমরা এখানে বাদ দিচ্ছি।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর যথাক্রমে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হবার পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে, চরম ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, এবার থেকে পুরনো কায়দায় স্থল-বাহিনীর দ্বারা কোনো দেশ দখল করা ছাড়াই কেবল আকাশ থেকে পারমাণবিক বোমা ছুঁড়ে যুদ্ধের নিষ্পত্তি করা যেতে পারবে। অতীতেও সব সময়ই নতুন কোনো মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কৃত হলে এরকম কথাই বার বার বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বারুদের সাহায্যে কামানের গোলার ব্যবহারের পরে এবং এরোপ্লেনের সাহায্যে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের সম্ভাবনা দেখা দিলে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে এই প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপিত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতাতে দেখা গেছে যে, ১৯৪৩-৪৫ সালে যখন জার্মানীর উপরে সর্বাধিক বোমা বর্ষণ করা হয়েছে (এই আড়াই বছরে সর্বসাকুল্যে ৬,০০,০০০ টন টি. এন্. টি,[১]) তখনই জার্মানীর সমরোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। অথচ এই পরিমাণের বোমা বর্ষণ করতে দু'পক্ষের বৈমানিকের হতাহতের সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার বোমারু ও লড়াকু বিমান ধ্বংস হয়েছিল যথাক্রমে বিশ হাজার ও আঠার হাজার।

জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর যে ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম বোমা ব্যবহার করা হয়, তার ধ্বংসক্ষমতা ছিল ২০,০০০ টন টি. এন্. টি। হিরোশিমাতে সত্তর হাজার ও নাগাসাকিতে চল্লিশ হাজার হত এবং ততোধিক পরিমাণের জনসংখ্যা আহত হয়। বোমা দুটিকে জমি থেকে প্রায় ১,০০০

১। রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের একটি হিসাব। সাধারণ একটি হাত-বোমার ধ্বংসশক্তি হবে প্রায় এক পাউণ্ড টি. এন. টি।

থেকে ২,০০০ ফিট উঁচে ফাটানো হয় এবং আঘাতের উপকেন্দ্র থেকে দেড় মাইল বৃত্তের অঞ্চলেই হতের সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। আর উপকেন্দ্রের ছয় বর্গ-মাইলের মধ্যে একেবারে অত্যন্ত শক্ত রিইন্‌ফোর্সড্‌ কনক্রীটের বাড়ি ছাড়া (তাও একেবারে উপকেন্দ্রে নয়) আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

এই ধরনের নানা রকমের তথ্য থেকে অতীতের মতোই অনেক মহল থেকে কথা উঠেছিল যে, পারমাণবিক বোমাই চরম পৃথিবী-ধ্বংসকারী ব্রহ্মাস্ত্র, এর পরে আর কথা নেই।

কার্যক্ষেত্রে কি দেখছি আমরা ? প্রফেসর ব্ল্যাকেট বহু হিসাব ও সম্ভাব্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করছেন :

"এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা এটা পরিষ্কার যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক শত পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের দ্বারাই শীঘ্র জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। অবশ্য এই সমস্ত যুক্তি থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের দ্বারা যুদ্ধের চরম নিষ্পত্তি করা সম্ভব কি না; কারণ এই ধরনের দারুণ বিধ্বংসী আক্রমণের দ্বারা দেশের জনসাধারণের উপরে কি ধরনের প্রভাব পড়বে, সে সম্পর্কে আমাদের পূর্বেকার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।" (পৃঃ 11)।

পারমাণবিক কূটনীতি

তৃতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা মনে রেখে যে নতুন কূটনীতির উদ্ভব হয়েছে তাকে এক কথায় পারমাণবিক কূটনীতি (atomic diplomacy) নাম দেওয়া যেতে পারে।

১৯৪৫ সালে জাপানে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে আমেরিকা সদম্ভে জগতের সামনে ঘোষণা করেছিল (বারুক্‌ প্ল্যানের দ্বারা) যে, এই চরম অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করতে হলে পৃথিবীতে যত ইউরেনিয়ামের খনি আছে (ইউরেনিয়াম ধাতু থেকেই পারমাণবিক বোমা তৈরি করা তখন সম্ভব ছিল), তাকে 'অ্যাটমিক ডেভালপমেণ্ট অথরিটি'-র আয়ত্তে আনতে হবে এবং যেহেতু উক্ত 'অথরিটি'-র ভিটো নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ম করা হয়, কার্যত সেটা আমেরিকার কর্তৃত্বে এসে যাবে ; আর অন্য দেশের

ইউরেনিয়াম খনির উপর কর্তৃত্ব করার অজুহাতে নিশ্চয়ই সেই দেশের সার্বভৌমত্বকেও খর্ব করা চলবে।

বলা বাহুল্য, বারুক্ প্ল্যান গ্রহণ করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অপারগ ছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের সদম্ভ হুঙ্কার—"instant and condign punishment" (অবিলম্বে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হবে) কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "যথোচিত শাস্তি" দেবার মতো যথেষ্ট পরিমাণের পারমাণবিক বোমা আমেরিকার হাতে ছিল না।

১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল অবধি (পারমাণবিক কূটনীতির এই দ্বিতীয় পর্বে) পারমাণবিক অস্ত্রের পরিণাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অধিক থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নও তখন আমেরিকাকে ধরে ফেলতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই এই পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধে (তৃতীয় মহাযুদ্ধে) অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হারিয়ে পদানত করবার আশা দুর্বল হয়ে আসছে।

১৯৫২ সালে আমেরিকা, পরে ১৯৫৩-তে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাইড্রোজেন বা তাপ-পারমাণবিক (thermo-nuclear) বোমা বিস্ফোরণ করার পরে পারমাণবিক কূটনীতিক্ষেত্রে 'পারমাণবিক সমতার' (atomic parity) অবস্থার আরম্ভ। অর্থাৎ দুই পক্ষের পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা ধ্বংসসাধন করবার ক্ষমতা প্রায় সমান, উনিশ-বিশ আর কি!

তৃতীয় পর্ব

১৯৫২-৫৩ সালে যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয় তার ধ্বংসক্ষমতা ছিল ৪,০০,০০০ টন টি. এন্. টি, অর্থাৎ নাগাসাকি-হিরোসিমার বোমার অপেক্ষা বিশ গুণ বেশি ধ্বংসক্ষমতা। আর আজকের এক মেগাটন (অর্থাৎ এক কোটি টন টি. এন্. টি) থেকে পঞ্চাশ মেগাটন অবধি শক্তিশালী বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তার অর্থ যুদ্ধমান দু'পক্ষের হাতে ধ্বংসক্ষমতা পরিমাণগত-ভাবে কিছু কম-বেশি থাকলেও দু'পক্ষের হতাহত ও ধ্বংস এত অধিক পরিমাণে হবে যে, যুদ্ধে বিজেতা বা বিজিতর মধ্যে প্রভেদ বিশেষ কিছু থাকবে না। ভবিষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন স্থাপন করতেও লোক পাওয়া যাবে না।

এই অবস্থাতে ক্রমাগত তাপ-পারমাণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখবার যে "Great Deterrent" পলিসি পশ্চিমী মহলে চালু আছে, প্রফেসার ব্ল্যাকেট সে সম্পর্কে মন্তব্য করছেন :

> "It is my view that the efficacy of the Great Deterrent as the main basis of British and American military policy became extremely doubtful as soon as the U. S. S. R. started to acquire a sizeable stockpile of ordinary A-bombs. Now that we have to assume approximate H-bomb equality, I believe the theory and practice of the Great Deterrent is in fair way to becoming the theory and practice of the Great Bluff" (পৃ: ৬৩)।

১৯৫৭-এর পরে

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথমে সোভিয়েত, পরে ১৯৫৮-এর প্রথমার্ধে আমেরিকানরা মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করার পরে পারমাণবিক কূটনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। মহাকাশে রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের সরাসরি কোনো সামরিক উদ্দেশ্য না থাকলেও এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের (I. C. B. M.) সাহায্যে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পারমাণবিক বোমা স্থির লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া সম্ভব। এখন থেকে আর পুরনো ধরনের বোমারু বিমানের সাহায্যে অন্য দেশে বোমা-বর্ষণের এবং তার জন্য আক্রান্ত দেশের যত কাছে সম্ভব সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি কমে যাচ্ছে।

বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে যদি বা সামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হতে পারে, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রকে কোনোরকমেই ঠেকানো সম্ভব নয়। ধরা যাক, এই ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবেগ হল ঘণ্টায় প্রায় ১৫,০০০ মাইল অর্থাৎ স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগের কিছু কম। তাহলে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পৌছতে সময় লাগছে মাত্র বিশ মিনিট। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই তারা বায়ুমণ্ডলের উপর আকাশের প্রান্তভাগ ছুঁয়ে একটি আধা-উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তাকারে যখন আবার পৃথিবীর জমির দিকে নেমে আসছে, তখন বোমা

বিস্ফোরণ করবার শেষ কয়েক মিনিট পূর্বে মাত্র তাদের ছবি রাডার পর্দাতে ধরা পড়বে।

বলা বাহুল্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত মহাদেশটি থেকে প্রতিরোধক কোনো ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়ে আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে উপর-আকাশে আটকে দিয়ে তার দানবীয় ধ্বংসক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আক্রমণকারী আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্টা জবাব হল, প্রতিরোধ নয়, পরস্পরকে ধ্বংস করা। একমাত্র এই ব্যবস্থাই সম্ভব ও প্রয়োগসিদ্ধ। অর্থাৎ পারস্পরিক হানাহানির দ্বারা দু'পক্ষেরই অভূতপূর্ব ধ্বংস ও নিজ নিজ দেশকে শ্মশানে পরিণত করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

সর্বব্যাপী ধ্বংস অথবা নিরস্ত্রীকরণ

প্রফেসার ব্ল্যাকেট আমেরিকার দেশরক্ষা সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকনামারার বক্তৃতা উধৃত করে বলেছেন যে, আমেরিকাব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যমণি তথা তার পারমানবিক অস্ত্রের আঘাত হানবার জন্য রয়েছে ১৭০০ আন্তর্মহাদেশীয় পাল্লার বোমারু বিমান (৬৩০ বি-৫২, ৫৫ বি-৫৮ ও ১,০০০ বি-৪৭) এবং ডজন কয়েক আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র। তা ছাড়া রয়েছে পারমাণবিক শক্তি-চালিত ডুবো জাহাজে ৪০টি পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রায় এক হাজারের অধিক শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী পারমাণবিক অস্ত্রসংবলিত লড়াকু বিমান। সর্বসাকুল্যে আমেরিকার ধ্বংসক্ষমতা হচ্ছে ৩০,০০০ মেগাটন অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার মাথাপিছু ১৫০ টন টি. এন্. টি (পৃঃ ১৪৮)।

সোভিয়েতের পাল্টা হিসাব না পাওয়া গেলেও ১৯৬১ সালের ২০শে নভেম্বর ও ৬ই জানুয়ারী ১৯৬২ সালের নিউ ইয়র্ক টাইমসের হিসাব অনুসারে সোভিয়েতের রয়েছে ৫০টি আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ১০৫টি আন্তর্মহাদেশীয় পাল্লার বোমারু বিমান এবং ৪০০ মাঝারি ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। শেষোক্তগুলির সাহায্যে ইউবোপীয় মহাদেশকে ঘায়েল করতে পারা গেলেও আমেরিকা মহাদেশে পৌছনো যাবে না। ১৯৬২ সালে সোভিয়েত দেশরক্ষা মন্ত্রী ম্যালিনোভস্কি বলেছিলেন যে, দরকার হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ও যে-সমস্ত দেশে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে, সেখানকার শিল্প, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে অচল করে দেবার ক্ষমতা সোভিয়েত ইউনিয়নের আছে। তাঁর হিসাব অনুসারে ১,০০০ মেগাটন

বোমা থাকলেই সোভিয়েতের পক্ষে যথেষ্ট—৫০০ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, বাকি ৫০০ পশ্চিম ইউরোপের জন্য।

তাহলে সোভিয়েতের হাতে মজুদ পারমাণবিক বোমার তুলনায় আমেরিকার রয়েছে তিরিশ গুণ বেশি। নিউ ইয়র্ক টাইম্স্ উপরিলিখিত তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন—সোভিয়েতের শিল্পক্ষমতা অনুসারে তার হাতে মজুদ পারমাণবিক বোমা এত কম কেন? প্রফেসার ব্র্যাকেটের পাল্টা প্রশ্নটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—তিনি বলছেন, "প্রশ্ন করা উচিত আমেরিকার হাতে এত বেশি কেন?" জবাব তিনি নিজেই অবশ্য দিয়েছেন: "সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন চাঁদের অদৃশ্য পিঠের ছবি তুলতে সক্ষম তখন তাদের নিউ ইয়র্ককে ধ্বংস করবার ক্ষমতা যে আছে, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি, এমনকি আমেরিকা রাশিয়াকে মরণ পণ আক্রমণ করার পরেও" (পৃঃ ১৫৫)।

অথচ এই পর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সৈন্যসংখ্যা কমিয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫৮,০০,০০০, ১৯৫৯-তে কমিয়ে করা হল ৩৬,০০,০০০ এবং ১৯৬১-তে আরো কমিয়ে ২৪,০০,০০০ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আমেরিকার গোয়েন্দা বিমানের যাতায়াতের, বিশেষ করে ইউ-২ ঘটনার পরে এবং ১৯৬১ সালে বার্লিন নিয়ে আন্তর্জাতিক অবস্থা খানিকটা অবনতির দিকে যাবার ফলে এই শেষোক্ত সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হয় নি।

ঠিক এই সময়েই ১৯৫৯ সালে আমেরিকার ৪,৩০০ কোটি ডলার সামরিক বাজেটকে আরো ৭০০ কোটি ডলার বাড়াবার প্রস্তাব করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬৫ সালে ৮০০ আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ করা হবে।

সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ৭,০০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যে নির্ভুলভাবে পঞ্চাশ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে, তাদের আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বেশি সংখ্যায় মজুদ না থাকতে পারে, কিন্তু যা আছে তাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের পরিমাণ যাই হোক না কেন, উত্তর আমেরিকাও রেহাই পাবে না।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার হবার প্রথম অবস্থাতেও (আগস্ট, ১৯৪৫) পুরনো দিনের সমর কৌশলকে মূলত বাতিল করবার প্রয়োজন হয় নি।

অর্থাৎ বোমারু বিমানগুলি যেন সর্বাপেক্ষা দূর-পাল্লার কামানের মতো কাজ করে থাকে, যার পিছনে পিছনে (অর্থাৎ দারুণ বোমা-বর্ষণের পরে) ট্যাঙ্ক ও মোটরসাইকেল-আরোহী পদাতিক সৈন্যই (mechanised infantry) যুদ্ধের ফয়সালা করবে।

এটা অবশ্য চিরাচরিত যুদ্ধকৌশল। হ্যানিবলের সময়ে ব্যবস্থা ছিল—হস্তীর সাহায্যে বিপক্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম ধাক্কা ও ভাঙন, তারপর অশ্বারোহীর সাহায্যে শত্রুবাহিনীকে লণ্ডভণ্ড করা, তারপর পদাতিক সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধের চরম ফয়সালা করা। এই কৌশলই আজকের দিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হস্তীর স্থলে বোমারু বিমান, অশ্বারোহীর স্থলে ট্যাঙ্ক এবং সাধারণ পদাতিক সৈন্যের স্থলে মোটরসাইকেল-আরোহী সৈন্যবাহিনী।

আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও তার শিরস্ত্রাণে হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি (atomic warheads) অস্ত্রের উদ্ভাবনা এবং বিজেতা ও বিজিত, উভয় দেশেরই দারুণ ধ্বংস সাধনের নিশ্চিত সম্ভাবনা—হ্যানিবল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি পুরনো সমস্ত ধারণা ও যুদ্ধ কৌশলই বাতিল করেছে।

সর্বাত্মক যুদ্ধ তথা ধ্বংস যেখানে তৃতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেখানে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী বিশ্বশান্তিই মানুষের বাঁচবার একমাত্র পথ। আলোচ্য পুস্তকের একেবারে গোড়াতেই (পৃঃ ৪) প্রফেসার ব্ল্যাকেট মধ্যযুগের কবি এরিওস্টোর যে-উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন (মেকিয়াভেলির সময়ে বারুদের ব্যবহারের পরে), পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কেও সেটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য :

> "O ! curs'd device ! base implement of death !
> Fram'd in the black Tartarean realms beneath !
> By Beelzebub's malicious art designed
> To ruin all the race of human kind···
> That neer again a kight by thee may dare,
> Or dastard cowards, by thy help in war,
> With vantage base, assault a nobler foe,
> Here lie for ever in th' abyss below !"

এরিওস্টোর নায়ক অরল্যাণ্ডো আগ্নেয়াস্ত্রকে সমুদ্রের জলে কবর দিয়েছিল, পারমাণবিক অস্ত্রের দারুণ শক্তিকে আমরা মানুষের কল্যাণে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগাব।

অমল দাশগুপ্ত

বিজ্ঞানের ইতিহাস

বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ইতিহাস যতোটা আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল। অথচ রামেন্দ্রসুন্দরের সময় থেকেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যা এত অধিক যে সাহিত্যের পৃথক একটি শাখা হিসেবে বিজ্ঞান-সাহিত্য নামে তা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। রামেন্দ্রসুন্দর এই সাহিত্যের পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়াস করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন অনবদ্য একটি গ্রন্থ। কিন্তু তারপরেও বিজ্ঞানের ইতিহাস-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থের অভাব থেকেই গিয়েছিল। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন সুবৃহৎ দুটি খণ্ডে বিজ্ঞানের ইতিহাস* রচনা করে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই দীর্ঘকালীন অভাবটি পূরণ করেছেন। পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

এতকাল বিজ্ঞানের ইতিহাস জানবার জন্যে ইংরেজিভাষায় লিখিত গ্রন্থের ওপরে বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছিল বলে সাধারণ্যে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হবার কারণ ঘটেছিল যে ইউরোপখণ্ডই বিজ্ঞানের প্রসূতি-আগার ও লালনকেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধারণা অযথার্থ নয়; কিন্তু বিজ্ঞানের সামগ্রিক ক্ষেত্রটি বিচার্য হলে এই ধারণা অযথার্থ তো বটেই, এমনকি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। কেননা, গ্রীক বিজ্ঞানকে স্বয়ম্ভূ রূপে চিত্রিত করার উৎকট প্রয়াস কোনো কোনো পাশ্চাত্য ইতিহাসকারের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে; এমনকি চার্লস সিঙ্গারের মতো লেখকও সম্ভবত এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেতে পারেন না। বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশেরও যে অবদান আছে (বিশেষ করে ভারতবর্ষের ও চীনের), তা স্বীকার করতে পাশ্চাত্য ইতিহাসকাররা কুণ্ঠিত ছিলেন। "বিজ্ঞানই

বিজ্ঞানের ইতিহাস (দুই খণ্ড)—সমরেন্দ্রনাথ সেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা-৩২। প্রথম খণ্ড—সাড়ে দশ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—বারো টাকা।

মননশীলতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত যা সুরু থেকেই সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক, বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ" (আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা)—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বহু বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর গ্রন্থে সংগত কারণেই প্রাচ্যদেশের বৈজ্ঞানিক অবদানের উপরে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে বেদোত্তর যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানের যে-বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা অধ্যয়ন অনুশীলন ও গবেষণার অনন্য সাক্ষ্য বহন করছে। এই কারণে শুধু আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার জন্যেই নয়, বহু জ্ঞাতব্য ও আয়াসলব্ধ তথ্যের আকর হিসেবেও গ্রন্থটি সমাদর-যোগ্য। এতদ্‌সংক্রান্ত যে-গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে তথ্যসংগ্রহের জন্যে তিনি সম্ভাব্য সকল উৎসেই অনুসন্ধান করেছেন। এই বিপুল পরিশ্রমের জন্যেও তিনি বাঙালি পাঠকেব কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

গ্রন্থের কালানুসরণ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার দুরূহতা অনস্বীকার্য। যিনিই এই কার্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাকে বিজ্ঞানও জানিতে হইবে, ইতিহাসও জানিতে হইবে। তারপর বিজ্ঞানের শুধু এক বিভাগ নহে, সর্ব বিভাগ। তদুপরি প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকাও আবশ্যক। আমার এই সামান্য প্রয়াসে সব দিক বজায় রাখিয়া বিভিন্ন বিদ্যাব মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। আমার মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমগ্রতা যতদূর সম্ভব ফুটাইয়া তোলা। যদি সেই কার্যে অন্তত কিছুটা সফল হইয়া থাকি তবেই সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।"

স্বীকার করতে হবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমগ্রতা ফুটিয়ে তুলতে তিনি অনেকখানিই সফল হয়েছেন। গ্রন্থের সূচীপত্র ও পৃথক পৃথক বিষয়ে ব্যয়িত পৃষ্ঠাসংখ্যার দিকে তাকিয়েও ধারণা করা চলে যে বিজ্ঞানের ইতিহাস মোটামুটি সমগ্রভাবেই এই গ্রন্থে অনুসৃত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভূমিকায় সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে "বাংলায় বিজ্ঞানের এই রকম পূর্ণ ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হোল। এরূপ প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক

তথ্যের একত্র সমাবেশ ও তাদের নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বিরল।” সংগত কারণেই গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে প্রধান আলোচনার বিষয় গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান। ইংরেজিতে এ-বিষয়ে তথ্যের অভাব নেই। শ্রীসেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যকে সুসংবদ্ধ করেছেন। তবে এ-প্রসঙ্গে শ্রীসেনের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রকাশের তারিখ মে ১৯৫৫, দ্বিতীয় সংস্করণের জুলাই ১৯৬২। মধ্যবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (যেমন, ১৯৫৯ সালে চার্লস সিঙ্গারের ‘হিস্ট্রি অফ সায়েন্টিফিক আইডিয়াস টু ১৯০০’)। আমার ধারণা, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়ে তিনি যদি এমনি কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্য নিতেন তাহলে দু-একটি ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয় কিছুটা পরিবর্তন আনা যেত।

বলা বাহুল্য, গ্রীক বিজ্ঞানেরও একটি ভিত্তি আছে; অতীতের ধারা অনুসরণ করেই তার প্রতিষ্ঠা। শ্রীসেন বলেছেন, “গ্রীকদের অন্তত দুই হাজার বৎসর কি তাহারও পূর্বে তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস, নীলনদ ও সিন্ধুনদ-বিধৌত উর্বর উপত্যকায় যে-জাতিরা প্রথম সভ্যতার বুনিয়াদ রচনা করিয়া গিয়াছিল তাহাদের বৈজ্ঞানিক অবদান অবহেলা করিলে ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। যে জাতিদের সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার গুণে বৎসর, মাস, ঋতু, গ্রহ, রাশিচক্র, গ্রহণ ও গ্রহণের কাল-নির্ণয়, ক্রান্তিবিন্দু ও তাহার অয়নচলন প্রভৃতি দুরূহ জ্যোতিষীয় আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহাদের তৎপরতায় প্রথম পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিতের উদ্ভব এবং যে বিদ্যার প্রয়োগ পিরামিডের মধ্য দিয়া আজও প্রতিফলিত, স্বণ, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রৌপ্য, সীসক প্রভৃতি ধাতবদ্রব্য এবং নানাবিধ রং, কাচ, চীনা-মাটি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবহারের দ্বারা যাহারা আশ্চর্য রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিল তাহাদের কালে বিজ্ঞান ছিল না এইরূপ উক্তি এখন একেবারেই ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের উপর যে গ্রীক বিজ্ঞানেব ভিত্তি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত এই সত্য এখন ক্রমশঃই প্রকাশ পাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানের কোনো কোনো বিভাগে, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের জ্ঞান গ্রীকদের অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত ছিল।”

এই প্রাচীন বিজ্ঞানের অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রথম খণ্ডের দুটি অধ্যায়ে বিবৃত। মানুষের আবির্ভাব থেকে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা পর্যন্ত বিবরণের জন্তে লেখক প্রধানত নির্ভর করেছেন গর্ডন চাইল্ড ও স্থুয়ার্ট পিগোটের উপরে। ফলে এই অংশটি প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের নিপুণ বিন্যাসে ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। এই অংশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা : লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার। অল্প পরিসরে প্রাঞ্জল আলোচনা হওয়া সত্বেও দুরূহ বিষয়টি প্রায় পূর্ণাঙ্গ চেহারাতেই উপস্থিত—যে-কোনো লেখকের পক্ষেই এ-কৃতিত্ব অসামান্য।

আর সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা : ভারতবর্ষ—বৈদিক যুগ। এ-আলোচনায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশদভাবে উদ্ধৃত। যুক্তি ও তর্কের জাল বিস্তার করে লেখক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের (বৈদিক সভ্যতার কাল) মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থান ছিল তৎকালীন বিচারে বিজ্ঞানচর্চার এক অতি উন্নত শিখরে। এই সত্যকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে সংখ্যা ও গণনা-পদ্ধতি, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষবিদ্যায় বৈদিক হিন্দুদের অবদান কোনো অংশেই ন্যূন ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে বৈদিক হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি ছিল দশমিক। যজুর্বেদ-সংহিতায় বিভিন্ন সংখ্যার নামকরণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় সমান্তর প্রগতির (arithmetic progression) ও গুণোত্তর প্রগতির (geometric progression) দৃষ্টান্ত। শুল্বসূত্রে ও বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ-সমীকরণ সমাধানের অনেক নজির (বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল 'শুল্ব')। শুল্বশাস্ত্রে বৈদিক হিন্দুদের পারদর্শিতা ও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ শুল্বকারদের নানা উক্তির বিশ্লেষণ, যা থেকে এমন সিদ্ধান্তও করা যেতে পারে যে তথাকথিত পিথাগোরীয় উপপাদ্য হিন্দুদের আবিষ্কার। ব্রাহ্মণসাহিত্যে জ্যোতিষকে বলা হয়েছে 'নক্ষত্রবিদ্যা', এবং জ্যোতির্বিদকে 'নক্ষত্র-দর্শ' বা 'গণক'। মাস ধরা হত ৩০ দিনে, বছর ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে, পরবর্তীকালে একটি মলমাস ধরে নিয়ে ১৩ মাসে। এইভাবে চান্দ্রবৎসরের সঙ্গে সৌরবৎসরের সংগতিবিধান করা হত। শতপথ ও কৌশিতকি ব্রাহ্মণে ক্রান্তিবিন্দু, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে আকাশ-পথে সূর্যের আপাত-গতিকে তুলনা করা হয়েছে বারোটি পাকিযুক্ত চাকার সঙ্গে। টীকাকার সায়নের মতে,

চাকার বারোটি পাকি হচ্ছে রাশিচক্রের বারোটি প্রতীক। এই রাশিচক্র ও তার বারোটি বিভাগের সাহায্যে সূর্যের আপাত-গতিকে অনুসরণ করা হত। সাতাশটি নক্ষত্রের দ্বারা এই রাশিচক্রটি বিভক্ত: অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই সাতাশটি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে আছে সাতটি গ্রহের উল্লেখ। অথর্ববেদে আছে শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ। অথর্ববেদের শারীরবৃত্তকে সম্প্রসারণ করেই আয়ুর্বেদ রচিত। অথর্ববেদে ও আয়ুর্বেদে আছে শল্যতন্ত্রের উল্লেখ ও আলোচনা। রিনোপ্লাষ্টি (rhinoplasty) বা নবনাসিকা-প্রস্তুত-বিদ্যা এবং সেইসঙ্গে প্লাষ্টিক সার্জারি প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত। এমনি আরো নানা তথ্যের উল্লেখ করে শ্রীসেন বৈদিক ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার অতি উন্নত রূপটি উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্যানুসন্ধানে এতখানি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সাম্প্রতিক কালে সহজলভ্য নয়।

প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরে প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনায়। দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু হয়েছে ইউরোপের এই অন্ধকার যুগেই উদ্ভাসিত প্রাচ্যের বিবরণ দিয়ে। শ্রীসেন বলেছেন, "গ্রীক ও রোমকদের পতনের পরে এক হাজার বৎসর যাবৎ ইউরোপখণ্ডে (অবশ্য ঐশ্লামিক স্পেনকে বাদ দিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যখন কোনো বালাই ছিল না, ইউরোপ যখন অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও ঐশ্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে, অর্থাৎ সমগ্র এসিয়ায়, তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুবন্ধু, ঈশ্বরকৃষ্ণ, দিঙনাগ, কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে তৎপর; আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ এই সময়ে ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; নাগার্জুন, বাগ্‌ভট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নের বহু উন্নতিসাধন করিতেছেন। মহাচীনে চিন লোচি, হো চেন তিয়েন, সু

চুংচি, সিয়া-চু উং, চেন-সুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন প্রমুখ চৈনিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ দুরূহ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত; ফা হিয়ান, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান-সে, ইৎ সিং প্রমুখ চৈনিক পর্যটক ও ভৌগোলিকগণ বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিয়া অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী ও ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। সেই দেশের কারিগর ও বিজ্ঞানীরা এই সময় উদ্ভাবন করিয়াছেন মুদ্রণ-প্রণালী ও মুদ্রণ-যন্ত্র, কাগজ, কম্পাস, বারুদ, ভূকম্পন নির্দেশক যন্ত্র ও আরও কত ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মারাঘায় হুলাগু খাঁর সাহায্যে নাসির আল-দিন আত্-তুসি যে বিখ্যাত জ্যোতিষীয় মানমন্দির নির্মাণ করেন তাহার সাজসজ্জা ও নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত টাইকোব্রাহের য়ুরানিবোর্গের যন্ত্রসজ্জা ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা অপেক্ষা যে অনেক উন্নত ছিল, অধ্যাপক সার্টনের মতো বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করিয়াছেন।”

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বেদোত্তর যুগের ভারতীয় বিজ্ঞান ও তারপরের তিনটি অধ্যায়ে আরব্য বিজ্ঞান। প্রাচ্যদেশে বিজ্ঞান-চর্চার এই পর্বটি স্বল্পজ্ঞাত ও স্বল্প-আলোচিত। বিপুল পরিমাণ তথ্য সহযোগে শ্রীসেন এই পর্বটিকে অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন। বিশেষ করে বেদোত্তর যুগের গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চার আলোচনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের পরবর্তী ও প্রাক্-সিদ্ধান্ত যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু আবিষ্কার হচ্ছে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন ও শূন্য। শুধু এই দুটি আবিষ্কারের জন্যেই হিন্দুরা বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক তৎপরতার বিষয়। তাঁদের মধ্যে আছেন আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, মুঞ্জাল, শ্রীপতি, শ্রীধর, শতানন্দ ও ভাস্কর।

দ্বিতীয় খণ্ডের পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম: পণ্ডিতীয় যুগ (১০০০—১৪০০ খ্রীস্টাব্দ) ও শেষ দুটি অধ্যায়ে ইউরোপীয় রেনেশাঁস: আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব (১৪০০—১৬০০)। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বেকন, দেকার্ত ও গ্যালিলিও-র আলোচনায়। গ্যালিলিও থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত। অতএব সংগত কারণেই গ্যালিলিও এই গ্রন্থের উপসংহার।

গ্রন্থের দুটি খণ্ডেই আলোচনাকে সুবোধ্য করে তোলবার জন্যে অজস্র চিত্র ও আর্টপ্লেট সন্নিবেশিত, যা গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধিরও কারণ। তথ্যসমৃদ্ধ ও সৌষ্ঠব-মণ্ডিত এই গ্রন্থটির জন্যে বাঙালি পাঠক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন থেকে জানা যায় যে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সেস অফ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-সাধনার এক প্রামাণিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রাথমিক তথ্য-সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইতিমধ্যে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে এদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। শ্রীসেনের গ্রন্থ এই উৎসাহ এ আগ্রহকে অবশ্যই আরো পরিপুষ্ট করবে। বাংলাভাষায় এই গ্রন্থটি রচনা করে তিনি এক স্মরণীয় কীর্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

পরিশেষে গ্রন্থে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ ও বাক্যের প্রতি শ্রীসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এই শব্দ ও বাক্যগুলোকে তিনি সংশোধন করবেন কিনা বিবেচনা করে দেখবেন।

(১) "স্থানে স্থানে খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু বহু লক্ষগুণ বর্ধিত লোক-সংখ্যার চাপ ধরিত্রী ত সানন্দেই বহন করিয়া যাইতেছে।" (পৃঃ ১) এই বাক্য থেকে পাঠকের ধারণা হতে পারে যে বর্ধিত লোকসংখ্যার দরুণ ধরিত্রীর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কথাটা ঠিক নয়। এই বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হয়েছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০০ কোটি। প্রথম সংস্করণের সময়ে সংখ্যাটা ঠিক ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে নেই।

(২) "মানুষের সব গুণ না পাইলেও পশু হইতে তাহার এখন অনেক ব্যবধান। আর তাহার পশ্চাতে ফিরিবার উপায় নাই: মানুষের বিরাট ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই তাহাকে সম্মুখের দিকে হাতছানি দিতেছে।" (পৃঃ ১৬) এ থেকে মনে হতে পারে, বিরাট ভবিষ্যতের হাতছানি না থাকলে কোনো কোনো জীবের পক্ষে হয়তো পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব!

(৩) "এক একবার পৃথিবীর উত্তাপ হিম-শীতল হইয়া সমগ্র উত্তর গোলার্ধ চাপা পড়িতেছে হাজার হাজার ফুট বরফের তলায়।" (পৃঃ ১৭) হিমযুগের কারণ পৃথিবীর উত্তাপ হিম-শীতল হয়ে যাওয়া নয়, পৃথিবীর উপরিতলের তাপ-মাত্রা কমে যাওয়া।

(৪) "বরফের পাহাড় গলিয়া মেরুর দিকে ফিরিয়া চলিল।" (পৃঃ ১৭)। কথাটার অর্থ কি ?

(৫) "অবশেষে চতুর্থ হিমযুগের অবসান ঘটিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর আবহাওয়া আবার উষ্ণ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা এক সম্পূর্ণ নূতন মনুষ্যজাতির আবির্ভাব লক্ষ করি।" (পৃঃ ১৮)। ক্রমবিবর্তনের ধারায় কোনো জীবই সম্পূর্ণ নূতন নয়, তার উদ্ভব হতে পারে, আবির্ভাব নয়।

(৬) "কঠিন পাষাণ মহাকালকে ফাঁকি দিয়া বিস্মৃত অতীতের কত কথা, কত ইতিবৃত্ত যুগের পর যুগ নিঃশব্দে, সযত্নে বহন করিয়া আনিয়াছে।" (পৃঃ ১৯)। "ফাঁকি" শব্দটি সুপ্রযুক্ত নয়—এ ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ব অস্বীকৃত হচ্ছে।

(৭) "এদিক দিয়া মানব ইতিহাসের ইহা (পুরা প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগ) মহা নিশ্চেষ্টতার যুগ।" (পৃঃ ২১)। মানব-ইতিহাসের কোনো যুগই নির্বিশেষ অর্থে মহা-নিশ্চেষ্টতার নয়।

দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। দুটি খণ্ড জুড়েই এ-ধরনের অসতর্ক শব্দ-ব্যবহার ও বাক্য-প্রয়োগ ঘটেছে।

কয়েকটি বিশ্লেষণগত অসম্পূর্ণতার দিকেও গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গ্রন্থপঞ্জী থেকে জানা যায় যে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় গ্রন্থকার এঙ্গেল্‌স বা ফ্রেজার বা হলডেনের কোনো রচনার সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই কারণে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা, রিচুয়ালের কার্যকারণ ও ভাষার উদ্ভবের ব্যাখ্যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অস্বচ্ছ। ফলে তিনি অনায়াসেই লিখতে পেরেছেন যে গ্রীকরা প্রোমিথিউসের অগ্নি-অপহরণের উপাখ্যান রচনা করেছিল অগ্নির অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করে, পিরামিড ও তাজমহল একই আদিম মনোভাবের প্রকাশ, চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অবসর-বিনোদনের ফল, প্রস্তরযুগের মহানিশ্চেষ্টতার ও অনগ্রসরতার প্রধান কারণ লিপির অনাবিষ্কার ইত্যাদি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতাই 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। শব্দ-ব্যবহারের ও বাক্য-প্রয়োগের অসতর্কতার মূলও এখানে। যেমন, তিনি লিখেছেন, "এই সুযোগে অতিষ্ঠ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীও গ্রীসভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে। আলেক্‌জান্দারের স্থাপিত উদীয়মান নূতন নগর টলেমীর আলেক্‌জান্দ্রিয়া পলাতকা বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে সাদরে আহ্বান করিল।" (পৃঃ ২০১)। শ্রীসেন ভেবে দেখবেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থে এ-ধরনের বাক্যে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবই প্রশ্রয় পায় কিনা।

গ্রন্থে অনেক উদ্‌ধৃতি পাওয়া যাচ্ছে বাংলা অনুবাদে, অনেক উদ্‌ধৃতি ইংরেজিতে। ইংরেজি উদ্‌ধৃতির বাংলা অনুবাদ বা সারার্থ থাকলে ভালো হত।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশংকর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে ষোলটি প্রবন্ধ আছে, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত নতুন প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্নদাশংকরের আগেকার লেখা অনেক নতুন প্রবন্ধ আছে। সেগুলি বইটি থেকে বাদ পড়েছে। তার কৈফিয়ত ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধগুলির কয়েকটি ঠিক প্রবন্ধ নয়। চিঠিপত্র।

কেন লিখলেন প্রবন্ধগুলি তার কারণ দেখাতে গিয়ে অন্নদাশংকর বলেছেন : "নিজেরই ইচ্ছা করল রবীন্দ্রনাথকে এ-বিশ্বের বহমানকালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ও দেখাতে। দেশকেন্দ্রিক আলোচনা তো যথেষ্ট হয়েছে। যুগকেন্দ্রিক কোথায় ?"

'যুগ' কথাটা শুনলেই আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। শব্দটার অর্থের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বিভিন্ন বিদ্যার ও বিভিন্ন ইডিয়লজির ডিসিপ্লিনে কথাটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বহমানকাল' বলতে কি বোঝায় বর্তমান-কাল না পরিবর্তনশীল আবহমানকাল ? এই সব কথার মানেই যখন বুঝিনি তখন অন্নদাশংকর কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'যুগকেন্দ্রিক' আলোচনাকে যে ঠিক ধরতে পেরেছি ও বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারছি কই। আর-একটা মুশকিল এই, বইটার নাম যদিও 'রবীন্দ্রনাথ', তবু অসংখ্য বিষয়ে অন্নদাশংকরের নিজস্ব মতামত ও তাঁর জিজ্ঞাসু ও কিঞ্চিৎ-দিশাহারা চিত্তের অনন্ত প্রশ্ন এত বেশি দেখতে পাই যে, বইটার অনেকখানিই আমার কাছে মনে হয়েছে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। বইটা পড়ে অন্নদাশংকরকে যতটা বুঝেছি রবীন্দ্রনাথকে ততটা নয়। পাঠকের কাছে বইটি অমূল্য রত্নপেটিকা, কিন্তু সমালোচকের কাছে গুরুতর শিরঃপীড়ার কারণ।

একদা চন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মন "ইউরোপীয় ধাঁচে গড়া।"

রবীন্দ্রনাথ। অন্নদাশংকর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯। পৃঃ ২১৩ ॥ মূল্য পাঁচ টাকা।

সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুও ওই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন : রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কাব্য তো ইউরোপেরই জিনিস। বহু ইউরোপীয় কবির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছে। খুঁজলে দেখা যাবে যে, 'সোনার তরী'র উপর বোদলেয়ারের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কাব্যে জাতীয়তার চাপে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয়ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। ছবিতে ইউরোপীয় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রকাশ।

'পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ কি ইউরোপীয়' ও 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' এই তিনটি লেখায় অন্নদাশংকর এই মতের খণ্ডন করেছেন : দেশকেন্দ্রিক আলোচনার ফলেই এই ধরণের ফ্যালাসির উদ্ভব ঘটে। তাই চাই যুগকেন্দ্রিক আলোচনা। যেমন ভারতে তেমনি ইউরোপেও দেখি প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। রবীন্দ্রনাথ তো "ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্য যুগে যাত্রা করেন নি। করেছিলেন ইউরোপের আধুনিক যুগে।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় বলা হচ্ছে কেন? বলা উচিত আধুনিক! ইউরোপীয় কাব্যের ক্লাসিকাল ধারার কোনো প্রভাব তো রবীন্দ্রকাব্যে দেখি না। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাইকেল ও শ্রীঅরবিন্দ বরং অনেক বেশি ইউরোপীয় ছিলেন।

রোমান্টিক কাব্য ইউরোপে উদ্ভূত হয়েছে এ কথা সত্য কিন্তু আধুনিক ইউরোপে। আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিশিষ্টভাবে ইউরোপীয় নয়, তার চরিত্র বিশ্বজনীন, আন্তর্জাতিক। "আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একটি হলো রোমান্টিক পর্যায়। এই পর্যায়ই বা কেন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নিবদ্ধ থাকবে? একেও চারিয়ে যেতে হবে মহাদেশ থেকে মহাদেশে। মানুষেরই মাধ্যমে।"

"আজকের দিনের ইউরোপেও 'ক্লাসিকালে'র পক্ষপাতী ও 'রোমান্টিকে'র বিরোধী অনেক লেখক আছেন। এঁরা কি কম ইউরোপীয়?"

"অনেক সময় আমরা কালের পিণ্ডি দেশের ঘাড়ে চাপাই। 'আধুনিক' একটা কালবাচক শব্দ। 'ইউরোপীয়' একটা দেশবাচক শব্দ।...রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে আঁকা ছবিগুলো modernist art-এর নিদর্শন। ইউবোপীয় আর্টের নয়।"

"শাসন শোষণের কথা বাদ দিলে ইউরোপ যা করেছে তা সর্বমানবের জন্যেই করেছে। তার সাধনা সর্বমানবিক"

"এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের উপর আধুনিক ইউরোপ তার প্রকাণ্ড ছায়া ফেলেছে। কিন্তু এর কতখানি বিশিষ্টভাবে ইউরোপীয় ও কতখানি নির্বিশেষভাবে universal তা বিচারসাপেক্ষ।...সমগ্রভাবে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ কতকটা universal ও বাকীটা oriental...তিনি ভারতীয় ক্লাসিক ঐতিহ্যের পরম্পরাভুক্ত। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির মণিমালার মণি। তিনি বাঙালিরই ঘরের ছেলে...ভাষা শৈলী বিষয় উপাদান সমস্তই প্রাচ্য। কিন্তু ধারাটা পাশ্চাত্য। মেজাজটা রোমান্টিক।"

তাহলে মোটমাট ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ও ভারতীয় আধুনিক কবি। আপাতদৃষ্টিতে খুব একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই নয়। ছোটবেলা থেকেই এই রকম একটা ধারণা মনের মধ্যে আছে। সুতরাং আমার মনের সায় অন্নদাশংকরের দিকেই। তবু তাঁর সব কথা মেনে নিতে পারি নি। 'সোনার তরী'র উপর বোদলেয়ারের প্রভাব হয়তো পড়ে নি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্য কবির প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের উপর কোথায় কিভাবে পড়েছে তার অনুসন্ধান সম্বন্ধে অন্নদাশংকরের এই অ্যালার্জি কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও দেখানো হয় একজনের উপর আরেক জনের প্রভাব। এটা বৈধ অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই এর ব্যতিক্রম হবে কেন? "অন্যের পক্ষে যা পাশ্চাত্য প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক," এটা কোনো যুক্তি নয়। মিল জিনিসটা মূলত 'কোইন্‌সিডেন্‌স্' বা আকস্মিক সাদৃশ্য অথচ আধুনিক কাব্য, সংস্কৃতি, সভ্যতাকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে দেশে দেশে চারিয়ে যেতে হবে মানুষেরই মাধ্যমে, এই দু'টি উক্তি পরস্পরবিরোধী। তারপর অন্নদাশংকর বলেছেন, "তিনি নিজেই তো বলে গেছেন, 'যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী...সেই আমি কবি, কে পারে আমাকে ধরিতে!' তবু তাঁকে ধরতে চেষ্টা করেছেন তান্ত্রিক, পৌত্তলিক, রামকৃষ্ণশিষ্য, বোদলেয়ারভক্ত, রিয়ালিস্ট, বিদ্রোহী, কেরানী, ন্যাশনালিস্ট, কমিউনিস্ট, 'য়োরোপীয়'।' কথাটা বলেছেন খুব সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ধরাছোঁয়ার অতীত। কিন্তু তখনই আবার মনে প্রশ্ন ওঠে। তাহলে? অন্নদাশংকরই বা... ?

"কালের পিণ্ডি দেশের ঘাড়ে" চাপানো, এই কাজটি আরো অনেকের মতো কবিগুরু নিজেও করেছিলেন। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপরও অন্নদাশংকরের বেশ একটু অভিমান। কবি "যখনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের তুলনা করতে গেছেন

…তিনি তুলনাটা করেছেন আধুনিক ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের। অর্থাৎ বৃদ্ধের সঙ্গে বালকের।…এ যেন একটি পুরোনো বোতল থেকে পুরোনো মদ ও আরেকটি পুরোনো বোতল থেকে নতুন মদ নিয়ে একপ্রকার ককটেল বানানো।" "শেষ বয়সে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে ঐ cocktail-এর নাম synthesis নয়।" শেষ বয়সে লিখলেন 'সভ্যতার সংকট', লিখলেন না 'পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট'। "কারণ পূর্ব পশ্চিমের দ্বৈত ততদিনে তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে"। "এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব পশ্চিমের ভেদবুদ্ধি ছিল", "স্বদেশের পরাধীন দশার প্রেরণায়", কিন্তু শেষে থাকে না।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পশ্চিমের বস্তু-পরায়ণতা সম্বন্ধে ইউরোপে ও আমেরিকায় যে-সব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন তার মধ্যে মিথ্যা অ্যান্টিথিসিসের ফ্যালাসি ছিল। মহাপুরুষেরও মহাভ্রান্তি! ভুলটা শুধু "কালের পিণ্ডি দেশের ঘাড়ে" চাপানোই ছিল না। প্রাচীন ভারতও বস্তুপরায়ণতায় বড় কম যেতো না। শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কেন, মহাভারত পড়লেও তা বেশ বোঝা যায়। ইউরোপ গড়েছে শুধু রাষ্ট্র এবং ভারত গড়েছে শুধু সমাজ, কবিগুরুর এ কথা ভারতের কোনো ঐতিহাসিকই মেনে নেবেন না। তাছাড়া কথাটার তো কোনো মানেই হয় না। সমাজ থেকেই রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী উদ্ভব। রাষ্ট্রহীন সমাজ যে ভাবতে ছিল তা রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত নয়, তা অতি, অতি প্রাচীন ভারত বা আদিম ভারত। অনুরূপ একটা আদিম ইউরোপ ও আদিম আমেরিকাও ছিল।

কিন্তু পূর্ব পশ্চিমের দ্বৈত শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল এবং তিনি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্বমানবিক সভ্যতা বলে মেনে নিয়েছিলেন, এটা অন্নদাশংকরের ঈপ্সিত চিন্তা। সত্য নয়। সভ্যতা একটা বৈজ্ঞানিক পদ। অনেক কিছু উপাদান দিয়ে গঠিত হয় একটা সভ্যতা এবং তার মধ্যে অনেক 'অসভ্য' উপাদানও থাকতে পাবে। শাসন শোষণের ও মানবসম্পর্কের কথা বাদ দিয়ে সভ্যতার কথা চিন্তা করলে তা হয়ে পড়ে ব্রহ্মের মতো নিরাকার, নিরবয়ব। রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে অন্নদাশংকরের চেয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ছিলেন। 'সভ্যতার সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপে দুই সভ্যতার অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। একটি 'সভ্য' নামধারী

পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা। প্রবন্ধটি এই সভ্যতার মুক্তিদায়ী ভূমিকা সম্বন্ধে কবিগুরুর পূর্ণ মোহভঙ্গের স্বীকৃতি: "এই মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত কলুষিত করে দিয়েছে।" এটা তো 'নৈবেদ্য'-এর চিন্তাধারারই নূতনতর প্রকাশ। আর-একটি সভ্যতা সোভিয়েত রাশিয়ার সভ্যতা। তার সম্বন্ধে বলেছেন: "এই সভ্যতা জাতি-বিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে।" সরল চিত্তে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তিকে পর্যন্ত কবি সদাচারের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন: "এইরকম গভর্নমেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।" এই দু'টি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার কোন্‌টিকে তিনি সর্বমানবিক বলে গ্রহণ করেছিলেন? সোভিয়েত সমাজবাদী সভ্যতার প্রতি কিঞ্চিৎ, হয়ত অহেতুক, পক্ষপাত সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, কোনোটিকেই নয়।

আবার পূর্ব ও পশ্চিম সম্বন্ধে "ভেদবুদ্ধি"-ও ওই একই প্রবন্ধে আছে: "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে ;···সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসছে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।" ওই "ভেদবুদ্ধি"-টা যতই ভ্রান্ত রূপ নিয়ে থাকুক না কেন, ওটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ও ঔপনিবেশিক এশিয়ার মধ্যে বাস্তব বিরোধের মনোজাগতিক প্রতি-ফলন। ওটাকে নিছক "বিরোধকল্পনা" মনে করা অন্নদাশংকরের ভুল। তবে পশ্চিমের বিজ্ঞান, টেকনলজি, সাহিত্য, আর্ট, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুকে বর্জন করে একেবারে পশ্চিমের সঙ্গে আড়ি করে দেওয়ার যে-প্রস্তাব মুষ্টিমেয় রাজনীতিনিপুণেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে করেছিলেন তাকে রবীন্দ্রনাথ মধ্যজীবন পার হওয়ার পর উত্তরোত্তর অধিকতর কশাঘাত করেছিলেন। তার মানে এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন, "সমকালীন সভ্যতা এক ও অবিভাজ্য।" পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক অথচ বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতার ছবি তার মনে বরাবরই ছিল, আগেও ছিল, পরেও ছিল।

রবীন্দ্রচিন্তার ক্রমভঙ্গ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি আলোচনা করার প্রলোভন অসংবরণীয়। নৈবেদ্য থেকে বঙ্গদর্শন, এই পর্যায়টি রবীন্দ্র-

ভক্তদের মনে ঈষৎ বিষাদের সঞ্চার করে। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ! অন্নদাশংকর প্রথমে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের একটা স্কেচ এঁকেছেন: "এঁদের মতে হিন্দুও যা ভারতীয়ও তাই। যে হিন্দু নয়, সে ভারতীয়ও নয়। সুতরাং মুসলমান খ্রীস্টানদের জন্যে এঁদের সমাজতত্ত্বে বা ভারততত্ত্বে স্থান নেই। এঁদের জাতীয়তাবাদ হিন্দু 'জাতি'মূলক, অতীতভিত্তিক ও বর্ণাশ্রমী। এঁরা সদর্পে অবতারবাদী ও সাকার উপাসক। গুরুকে এঁরা অবতারজ্ঞানে বা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। সব অনাচার এঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করেন।"

তারপর অন্নদাশংকব বলছেন: "রবীন্দ্রনাথও পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। পরে 'গোরা' লিখে তিনি তাঁর সাবেক মনোভাবকেই বিশ্লেষণ করে দেখান ও তার থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন।"

মোহভঙ্গের পর গোরা আনন্দময়ীকে বললে, তুমিই আমার ভারতবর্ষ। অন্নদাশংকর বলছেন: "এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতবর্ষকে পেলেন। যে ভাবতবর্ষের জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই। যে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। এব পরে যে-কবিতা লিখলেন তাতে এটা আরো স্পষ্ট হলো। সবাইকে ডাক দিলেন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।"...

"এই যে ভারতদর্শন এ যেন গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন।"

হ্যাঁ, এটাই কবিগুরুর ভারতচিন্তার বিবর্তনের চালু বিবরণ। তবু মানতে পারলাম না। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীর যে-স্কেচ অন্নদাশংকর এঁকেছেন তার সঙ্গে 'নৈবেদ্য'-এর ও বঙ্গদর্শনের রবীন্দ্রনাথকে মেলাতে গিয়ে দেখলাম কাজটা অসম্ভব। সমীকরণের অঙ্কটা কষতে পারলাম না। অঙ্কটাই ভুল। বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিই:

"বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে-শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে-সভ্যতা মানবজাতিব চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে...

"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, "হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী" রবীন্দ্রনাথই সেই ভারত-প্রতিভার আবিষ্কার করেছিলেন যার কৃতিত্বের পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের ভারতদর্শনের প্রতিটি রেখায়। অন্নদাশংকরের ভাষাতেই বলি, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকেছিলেন তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভারতের অতীতের দিকে তাকালেই এবং সেই অতীত সম্বন্ধে গর্ববোধ করলেই কেউ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী হয়ে যায় এ কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। তাহলে তো বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "মানবসত্যেব শেষ বাণী আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়েছে, আমি আজ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদায় গ্রহণ করি।" ('আরোগ্য')। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রাচীন ভারতকে বুঝেছিলেন তা ঠিক না ভুল, এটা বিচার্য। তাঁর ভারতদর্শনের সবটাই বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য নিশ্চয়ই নয়। কবিগুরুর অপরূপ দিব্যসৃষ্টি আমাদের সামনে একটা মহান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছে, ওইভাবেই ওটাকে দেখি; অমানিশার পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ওটাই হয়ত একমাত্র আলোর ইশারা। সে যাই হোক, ভারতের অতীত সম্বন্ধে গর্ববোধ ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, সকলেরই মনে থাকা উচিত।

'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রথম প্রবন্ধের উনিশ পৃষ্ঠায় অন্নদাশংকর মানবিকবাদের একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। মানবিকবাদের অভ্যুত্থান ঘটে ইউরোপে পাঁচশত বছব আগে। ইউরোপ শুধু জ্ঞানব্রতীই হলো না, মুক্তিব্রতীও হলো। প্রচার করলো, মানুষই সব কিছুর মান, এ জগৎ মানবকেন্দ্রিক। ঈশ্বরের সিংহাসনচ্যুতি ঘটল। যা কিছু অতিপ্রাকৃত সব বাতিল হয়ে গেল। ঘোষিত হলো মানবিক অধিকার, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। স্থিতিশীলতার পঙ্ক থেকে উত্থিত হয়ে গতিশীলতাব পথ ধরল ইউরোপ। মানুষের দেহ সম্বন্ধে 'ট্যাবু' বিলুপ্ত হলো। এলো অবিরাগী জীবনতৃষ্ণা। মানুষের দুর্বলতা, স্খলন, পতন সম্বন্ধে আগেকার রক্তচক্ষুর পরিবর্তে একটা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রহণশীলতার ও সহনশীলতার ভাব দেখা দিল, আধুনিক সাহিত্যে যার

অভিব্যক্তি। ধর্মকেও স্থাণুত্ব পরিত্যাগ করে গতিশীল হতে হলো, প্রতিবাদ-মুখর বিদ্রোহী মানুষের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হলো।

কিন্তু মানবিকবাদও বিশিষ্টভাবে ইউরোপীয় নয়, আধুনিক। তাকেও চারিয়ে যেতে হবে দেশ থেকে দেশে! উৎপত্তিস্থলটা আকস্মিক। বিশ্বজনীন ও সর্বমানবিক চরিত্রটাই আসল জিনিস। ইংরেজের সঙ্গে এলো আধুনিক মানবিকবাদ আমাদের দেশে। ও জিনিসটা যে ভারতে একেবারেই ছিলো না তা নয়। প্রাচীন যুগেও ছিল, মধ্য যুগেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, বাউল, বৈষ্ণব, সহজিয়াদের হাতে তার দীপ টিম টিম করে জ্বলছিল। কিন্তু বর্ণাশ্রমী ধর্ম, কৌলীন্য, অবতারবাদ, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, সন্ন্যাস, বৈরাগ্যসাধন, নারী ও শূদ্রের অধিকারহীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষের মনকে বেঁধেছিল। ধর্মের স্থাণুত্ব হয়ে উঠেছিল একটা জগদ্দল পাথর। তা ছাড়া ভারতীয় মানবিকবাদ কোনো দিন বহিঃপ্রকৃতির দিকে নজর দেয় নি। এইখানে আধুনিক মানবিকবাদের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য।

শেষ ছয় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই। "আধুনিক মানবিকবাদকে রামমোহন অকুণ্ঠিতভাবে বরণ করে নেন।" তাঁর প্রধান ভাবনা ছিল ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদকে কী করে জোড় মেলানো যায়। "রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের উত্তরসাধক।" "তাঁর বিশ্বাস ছিল" মানুষের আত্মশক্তির, বিজ্ঞানশক্তির উপর। "মানবিকবাদী বলে চিনতে তাঁকে কোনো সন্দেহ হয় নি।" "তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কোনোখানে এমন একটি চরিত্র নেই যে মূর্তিমান মন্দ।··· নরদেবতাও তিনি আঁকেন নি। এঁকেছেন মহৎ পুরুষ, মহীয়সী নারী। এঁরাও মানুষ। এঁরাও আছেন।" হ্যাঁ, আছেন ঠিকই, তবে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলতেই হবে।

অন্নদাশংকরের মনেও রবীন্দ্রনাথের মানবিকবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদের জোড় মেলালেন কি করে? বোধ হয় আজীবন চেষ্টা করেও পারেন নি। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের দিকে বেশি করে ঝুঁকেছিলেন। 'ল্যাবরেটরি' গল্প লিখলেন। কবিতায় সেই আগেকার 'তুমি' 'তুমি' ভাবটা অনেকটা কমে এসেছে। একদিন কবিগুরুকে নিভৃতে পেয়ে অন্নদাশংকর জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি আর ভগবানে বিশ্বাস করেন না? "তিনি একটু হাসেন। তারপর পাশ কাটিয়ে যান। বলেন, 'দেখ হে, আমি কবি। আমি এক্‌স্‌প্রেসন দিই।'···মোট কথা তিনি আমাকে ধরা-

ছোঁয়া দিলেন না।" রবীন্দ্রনাথের নিরুত্তরতায় বিস্মিত হই নি, বিস্মিত হলাম অন্নদাশংকর এমন একটা প্রশ্ন করেছিলেন শুনে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরবাদীদের ইনকুইজেশনে চড়ান, এটাকে অন্তত মানবিকবাদ মনে করি না। অন্নদাশংকর তো সে দলে নেই। তাহলে এই অযথা কৌতূহল কেন? তিনি মানবিকবাদের যেসব লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, সবই তো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মিলে যাচ্ছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবতাকে পর্যন্ত মানবিকবাদীদের হাতে সঁপে দিয়েছেন? বলেছেন, "মানুষ মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধকে অবলম্বন করেই তার দেবতায় গিয়ে পৌঁছেচে।" ('মানুষের ধর্ম')। এই মাহাত্ম্যবোধের পিছনে বিজ্ঞান-চর্চা আছে এমনও মনে করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরবিশ্বাসীদের শিবিরেও 'রিভিজ্যানিস্ট ট্রেণ্ড' অর্থাৎ সংশোধনবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথাটা ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করি না। তাই যদি হবে তাহলে যেসব মানুষ মঙ্গলকাব্যের দেবতা সৃষ্টি করেছিল বা সেই দেবতায় পৌঁছেছিল, তাদের রবীন্দ্রনাথ অত নিন্দা করেছিলেন কেন? আর মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে চাঁদে যাওয়া যায়, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যায় আবার থার্মো-নিউক্লীয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে মানবজাতিকে নির্মূল করে দেওয়াও যায়।

অর্থাৎ মানবিকবাদের মধ্যেই সংকট দেখা দিয়েছে। যে-বিজ্ঞানচর্চার ধ্বজা উড়িয়ে সে এসেছিল তার সঙ্গেই মানবিকবাদের বিরোধ বেধেছে। বাধতে পারে না, এ কথা কেবল তাঁরাই বলতে পারেন যাঁরা যুক্তির দ্বারা চোখের সামনের একটা তথ্যকে উড়িয়ে দিতে চান। অন্নদাশংকরকে দেখলাম এ বিষয়ে সচেতন। "বিজ্ঞানের উপর ঠিক সেই পরিমাণ ভক্তি লক্ষিত হচ্ছে যে-পরিমাণ ছিল ধর্মের প্রতি। বহু ক্ষেত্রেই এটা অন্ধ ভক্তি। মানবিকবাদকে বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে, জোড় মেলাতে হবে। এ এক নতুন সমস্যা।"

তার চেয়েও বড় সমস্যা আছে। না হয় শতবার উচ্চারণ করলাম, এটা আধুনিক যুগ, সর্বমানবিক যুগ, নব মানবিকবাদী যুগ। না হয় বললাম এ জগৎ মানবকেন্দ্রিক, শুধু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাই নয়, সমস্ত সূর্যলোক। রবীন্দ্রনাথ তো আরো এগিয়ে বলেছেন: "বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে-জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সে-ও মানবজগৎ।"

অর্থাৎ সূর্যলোক ছাড়িয়ে যে-নক্ষত্রলোক তা-ও মানবজগৎ। তাই না হয় হলো। তবু এই সত্যটা রয়েই গেল যে, এই যুগেই সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষ সবচেয়ে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছে। এক সভ্যতা বলছে, মানুষের স্বাধিকার সেই দিনই প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন উৎপাদনের ও বণ্টনের সমাজীকরণের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু থেকে উৎপাদকের 'এলিয়েনেশন' বা বিচ্ছেদ দূরীভূত হবে। এটাই প্রকৃত মানবিকবাদী সভ্যতা এবং ওই দিকেই ইতিহাসের অমোঘ অঙ্গুলিনির্দেশ। আর-এক সভ্যতা আরো উচ্চৈঃস্বরে বলছে, ঠিক ওই ব্যবস্থাই মানুষের চরম দাসত্ব, অন্ধকারময় যুগে পৃথিবীর পুনঃ-প্রবেশ এবং মানবিকবাদের নামেই দুর্যোধনী দর্পের সঙ্গে বলছে, সূচ্যগ্র মেদিনী ওকে ছেড়ে দিলেই মানুষের চরম সর্বনাশ। মাঝখানে আরো হরেক রকমের সভ্যতা গড়ে উঠছে যারা আজো নামগোত্রহীন। তারাও বলছে আমরা মানবিকবাদী। কোন্‌টা প্রকৃত মানবিকবাদ? মানবিকবাদ নানা বিরোধী কণ্ঠস্বরে নানা বিরোধী বক্তব্য আমাদের শোনাচ্ছে। মানবিকবাদ কি শুধু একটা লক্ষ্যের কথাই আমাদের বলে না একটা পথেরও সন্ধান দেয়? কোন্‌টার উপর তার বেশি জোর? অন্নদাশংকর যে মানবিকবাদের ও রেনেসাঁসের কথা বলেছেন, তা ভারতের কটা লোকের কাছে জীবনসত্য! ভারতের বেশির ভাগ লোক যদি বলে, আমরাও মানবিকবাদ বৃক্ষের ফলভোগ করতে চাই এবং তার জন্য মৃত্যুপণ করে লড়াই করবো, তার জবাব কি?

অন্নদাশংকর অবশ্য আশাবাদী ও আশ্বাসবাদী। তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন ক্রমে ক্রমে সব সমাজের নীচতলার লোকের কাছে মানবিকবাদ জীবনসত্য হয়ে উঠবে, সাম্রাজ্যবাদ আত্মসংবরণ করছে, উন্নত দেশ নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করে অনুন্নত দেশকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে, পুঁজিবাদী দেশেও কমিউনিস্ট আছে এবং কমিউনিস্ট দেশেও ডেমোক্রাট আছে এবং সেইজন্যই তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। সত্য কি এসব কথা? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের গর্জনটাই মানবিকবাদের বিপদের সংকেত। তা বর্ষাতে শুরু করলে আর যাই হোক, মানবিকবাদী প্রহসনটার পুনরভিনয় ঘটে উঠবে না। এই সব সাতপাঁচ ভেবেই বোধ হয় অন্নদাশংকর অবশেষে বলেছেন, মানবিকবাদ যথেষ্ট নয়। কবিগুরুর কথাই শেষ কথা। মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। অগত্যা। কিন্তু মানুষের মনটাই প্রথমে মানবিক হওয়া চাই।

একটা কথা বুঝতে পারলাম না। অন্নদাশংকর রবীন্দ্রনাথকে গীতোক্ত শিক্ষায় বিশ্বাসী বলে মনে করলেন কেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দায়িত্ববোধকে কোনোদিন অস্বীকার করেন নি। 'পারস্যে' গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

"গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

"কাব্য পড়ে যেমন মনে হয়, তোমাদের কবি তেমন নয় গো" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন, এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন অন্নদাশংকর প্রথম প্রবন্ধে। অন্নদাশংকর মহকুমা হাকিম ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পতিসরে গেছেন, শিলাইদায় গেছেন, সেখানকার লোকেদের মুখে শুনেছেন বাবুমশাইকে তারা কেমন ভালোবাসে ও ভক্তি করে। ছিয়াত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন শেষবারের মতো পতিসরে যান তখন টেলিগ্রাম পেয়ে অন্নদাশংকর দেখা করতে যান। দেখেন বহু মুসলমান প্রজা পায়ে হেঁটে রবীন্দ্রনাথের হাউসবোটকে অনুসরণ করে তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন : "ওরা কী বলছে, শুনবে ? বলছে পয়গম্বরকে তো স্বচক্ষে দেখিনি ! আপনাকে দেখেছি।" প্রজাপীড়ক জমিদারকে প্রজারাই বলছে পয়গম্বর ! অন্নদাশংকর আরো অনেক কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভেট নিতেন না, প্রজাদের অল্প সুদে কর্জ দেওয়ার জন্য অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন, কাছারিবাড়িতে হিন্দু প্রজাগণকে উপরে এবং মুসলমান প্রজাগণকে নীচে বসতে দেওয়া হয়েছে দেখলে জ্বলে যেতেন, জমিদার অনুপস্থিত উপস্বত্বভোগী হবে না এবং আমলাদের হাতে প্রজাদের ছেড়ে দেবেন না, এই ছিল তাঁর আদর্শ।

স্কেপটিক বা দলিগমনস্ক ঐতিহাসিক এত সহজে হয়ত ভুলবেন না। প্রজাপীড়ক না হয়েও রবীন্দ্রনাথ কড়া জমিদারই ছিলেন। অপক্ষপাত বিচারে ঠাকুর-বংশকে তথা রবীন্দ্রনাথকে অনুপস্থিত উপস্বত্বভোগীদের পর্যায়েই ফেলতে হয়। অন্নদাশংকরও বলেছেন, "শেষ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রেরই জয় হলো।" আসল কথা,

জমিদারি প্রথাটাই প্রজাপীড়ন প্রথা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষকেও অ্যালিবাই দেওয়ার এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন? শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনে এই অপরাধবোধ জন্মেছিল যে, তিনি জমিদার। বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইতিহাসে এই শোষণব্যবস্থার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই তো মহাপুরুষত্বের লক্ষণ।

অনেক সমালোচনা করলাম। তবু সব প্রবন্ধের আলোচনা সম্ভবপর হয় নি। অনেক ভুল কথা নিশ্চয়ই বলেছি। তবু নতমস্তকে স্বীকার করবো, বইটির সর্বত্র একটি শুচি, শুভ্র, ঋজু, প্রকৃত মানবপ্রেমিক ও জিজ্ঞাসু মনের পরিচয়। হোক না তা ঈষৎ দিশাহারা। সেদিক থেকে তিনি তো আমাদের অনেকেরই নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। বিনম্র চিত্তেই বলছি, মনের অন্তরে তাঁর সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করেছি। সত্যসন্ধানী ও সত্যবাদী অন্নদাশংকর বর্তমানে প্রকৃতই ভারতের সাহিত্যজগতের বিবেক। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর 'ভারতীয় সংহতি' প্রবন্ধটি। নেশান ও ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ ও কিছুটা দুর্জ্ঞেয় মনোভাবের উল্লেখ অন্নদাশংকর অন্যত্রও করেছেন। অথচ ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ নেশান হতে নিষেধ করেছিলেন। এমন কথাও বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে একটি নেশান হওয়া হবে অস্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই উন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ নেশান করে তোলাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি এক বিরাট বাধা। তার উপর রয়েছে সেই পুরাতন প্রশ্ন। ভারত কি একটি মাত্র নেশান না বহু নেশান বা ন্যাশনালিটির সমষ্টি? ভাষাগত উপনেশান চেতনাকে অস্বীকার করে নয়, দমন করে নয়, তাকে মেনে নিয়ে অথচ তার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যাপকতর ভারতচেতনাকে যদি জাগ্রত করতে পারি এবং ধর্মগত ভেদবুদ্ধিকে যদি মন থেকে উৎপাটিত করতে পারি তবেই আমাদের সিদ্ধি। কিন্তু এ বিষয়ে অন্নদাশংকরের কোনো আত্ম-সন্তুষ্টি নেই। মুগ্ধ হলাম দেখে তাঁর নির্ভীক সত্যবাদিতা। গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত হয়েও গুরুদেবকে পর্যন্ত যাচাই করে দেখা, এটাও আমার ভাল লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আজকের মতো ধর্ম নিয়ে বিরোধ বাধলে তিনি কোন্ পক্ষে যেতেন এ সম্বন্ধেও সন্দেহ! কিন্তু অবশেষে বলতে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের পক্ষে, সেকুলারের পক্ষেই রায় দিতেন। "তিনি রেবতী নন। তিনি অবাধ্য সন্তান।" মনে রাখবার মতো কথা।

ডাইমেন্‌শন ইত্যাদির সাহায্যে দর্শক সাধারণের মনকে টেলিভিশনের ছোট পর্দার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বিপুল ব্যয় করে প্রচণ্ড বড় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ছবি তৈরি করে (block busters) আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়া হতে লাগল। অন্যদিকে ছবিতে মৃদুমন্দ রকমের আত্মসমালোচনা (juvenile delinquency, sex trouble) করে তথাকথিত 'প্রব্লেম ফিল্ম' তৈরি করে বাস্তবতার মোড়কে চড়া মেলোড্রামা পরিবেশন করা হতে লাগল চলচ্চিত্রকে সিরিয়স আর্ট করে তোলবার নামে। সমস্যার তাতে বিশেষ কোনো সমাধান হয়নি—তাই এখন ইটালী, ফ্রান্স ও হলিউডের চিরব্যবসায়ীরা কো-প্রডাকশন-এর মাধ্যমে block buster তৈরি করে বিশ্বের বাজার জুড়ে বসবার চেষ্টা করছেন।

এদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত হয়ে একদল তরুণ শিল্পী নিউইয়র্কে কম খরচে নিজেদের মেজাজ অনুযায়ী ছবি তৈরি করা শুরু করেছেন—কাসাভেট্‌সের 'স্যাডো'-এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। এদের ছবিতে (East coast films) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহস, আন্তরিকতা লভ্য—এরাই আমেরিকার নব্য-চলচ্চিত্রকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে বসে এদের ছবি দেখার সম্ভাবনা নিতান্ত কম—একমাত্র ফিল্ম সোসাইটিগুলির মাধ্যমে ছাড়া। অবশ্য পুরনো পরিচালকদের মধ্যেও সৃষ্টিশীলতা একেবারে থেমে যায়নি; এলিয়াকাজান, স্টানলি কুবরিক, বিলি ওয়াইল্ডার এখনও উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি করছেন।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে বিপুল ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ছবি তৈরি করার উদ্দেশ্য বিলেতে 'সিজার এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা' দিয়েই ব্যর্থ হল। ডেভিড লীন হলিউডে পাড়ি দিলেন। 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন'-এর উত্তেজনা চলচ্চিত্রকেও সংক্রামিত করল—পিটার গ্রেনভিলের 'রুম এট দি টপ' এবং টনি রিচার্ডসনের 'লুক ব্যাক্ ইন অ্যাঙ্গার' ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের পোশেকী ভদ্রতার আবরণটাকে টান মারল, সেখানে নতুন করে বাস্তব-সমীক্ষা শুরু হল। নিও-রিয়ালিজমের চর্চা এবং নিজেদের দেশের ডকুমেণ্টারি ছবির ঐতিহ্য এদের প্রেরণা জোগালো। এই নব্য চলচ্চিত্রকারেরা 'সিকোয়েন্স' পত্রিকা মারফৎ প্রচলিত চলচ্চিত্রকর্মের অসারতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন (এরা প্রায় সকলে British Film Institute-এর সঙ্গে যুক্ত), এবার তারা নিজেদের চলচ্চিত্র-চিন্তাকে কাজে লাগাতে পারলেন। শুরু হয়েছিল অবশ্য ডকুমেণ্টরী রীতিতে 'শর্ট ফিল্ম' তৈরি করবার মাধ্যমে (লিণ্ডসে এণ্ডারসনের 'ও ড্রিমল্যাণ্ড',

কাবেল বাইসের 'মোমা ডোণ্ট এলাও', মাজেটির 'টুগেদার') যার উদ্দেশ্য ছিল To observe the everyday life of ordinary people with companion'. ক্রমে ক্রমে দেখা দিল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের আরো কয়েকটি ছবি—টনি রিচার্ডসনের 'এ টেস্ট অফ্ হনি', প্লেসিংগারের 'এ কাইণ্ড অফ্ লাভিং', এবং লিণ্ডসে এণ্ডারসনের 'দিস্ স্পোর্টিং লাইফ'। রোমান্টিক ভাবালুতাকে বর্জন করে অনিরুদ্ধ দৃষ্টিতে বাস্তবকে দেখা এবং দেখানোর কাজে এরা সফলতা অর্জন করে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন বটে—তবে অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এরা উল্লেখযোগ্য কিছু এখনও করতে পারেন নি।

ফ্রান্সেও নব্যতন্ত্র (nouvelle vague) পরিপুষ্ট হয়েছিল নিজস্ব পত্রিকায় (cahiendu cinema) প্রচলিত রীতির তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে। অর্থনৈতিক সমস্যা পঞ্চাশ দশকে চরমে উঠছিল—১৯৫২ সালে ছবির সংখ্যা দাঁড়ালো একশ' পাঁচ থেকে নেমে আশীতে। সরকার পক্ষ আমেরিকার সঙ্গে সহ-প্রযোজনার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। ইতিমধ্যে এই সমস্যাকে দূর করবার জন্য নব্যতন্ত্রীরা নিতান্ত স্বল্প ব্যয়ে ছবি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। নব্যতন্ত্রীদের মধ্যে আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদির এতো গরমিল যে অনেকে ঠাট্টা করে বলেন যে নব্যতন্ত্রীদের মিল শুধু এইখানেই—এই কম খরচায় ছবি করার মধ্যে! Penelope Houston একটা জায়গায় এদের মিল (অন্তত তত্ত্বগতভাবে—প্রকৃতপক্ষে না হলেও) লক্ষ করেছেন—এরা ছবির 'ভাষা' সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক, এদের মতে 'স্টাইল' হল 'সুপ্রীম', বিষয়বস্তুর প্রতি এরা উদাসীন এবং এরা "apathetic to humanists like De Sica and Satyajit Roy." ক্রুফো যে 'পথের পাঁচালী' পছন্দ করেন নি অথচ 'দেবী'র 'সৌন্দর্যে' মুগ্ধ হয়েছেন তার কারণ খানিকটা খুঁজে পাওয়া যায় এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির মধ্যে। Penelope Houston আরো লক্ষ করেছেন অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাবে এদের কাজে কিভাবে 'amorality' স্থান পেয়েছে—এদের ছবিতে যৌনতার আধিক্যকেও তিনি তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে তত্ত্বগতভাবে যাই বলা হোক, ক্রুফোর কাজে 'বিষয়বস্তুর প্রতি উদাসীনতা' নেই, বরঞ্চ তার ছবিতে (Four hundred blows, Jules and Jim) মানবিক সম্পর্কের চিত্রণের মধ্যে অনুকম্পায়ী মনের ছাপ পাওয়া যায়। গডার্ডের ছবিতে কিছুটা তিক্ততা আছে, 'ডিটাচ্মেন্ট'ও আছে। রেণে অপরদিকে প্রুস্তীয় ধরণে 'টাইম' এবং 'মেমরী'

নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত ('হিরোসিমা মন আমুর' এবং 'লস্ট ইয়ার অ্যাট মারিয়েনবাদ')। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এরা দুর্ধর্ষ সাহস ও পরীক্ষামূলকতার পরিচয় দিচ্ছেন—freeze, steel-এর ব্যবহার, সূর্যের দিকে ক্যামেরা ধরা, চতুর editing দিয়ে চিত্রভাষায় এরা বিপ্লব আনছেন।

ফরাসী নব্যতন্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র পাওয়া যাক বা না যাক, এই নব্যতন্ত্রীদের প্রাথমিক কাজগুলি দেশে-বিদেশে ব্যবসায়িক সাফল্য এনেছিল চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে প্রচুর পুরস্কার পাওয়ার পর। সরকারী অর্থসাহায্যও জুটে গেল—Penelope Housten একে ঠাট্টা করে বলেছেন "Investment in youth." কিন্তু স্থায়ীভাবে সংকট ফ্রান্সেও মেটেনি—ক্রফোকে আবার অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ইতালীর অবস্থাও তথৈবচ। আন্তনিয়নি জগৎজোড়া প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়েছেন। পঞ্চাশ দশকে নিও-রিয়ালিজমের বাস্তব-সমীক্ষা যখন প্রাণহীন অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছিল—তখন ফেলিনি-আন্তনিয়নি-ভিস্‌কন্তির প্রচেষ্টায় নব্যতন্ত্রের সূত্রপাত হল। এ নব্যতন্ত্রেও অমিল অনেক। ফেলিনির মনে পশ্চিমের অধঃপতনের জন্য সর্বদা এক খ্রীষ্টিয় পাপবোধ সক্রিয় (দল্‌চে ভিতা), তারই তাড়নায় তাঁর ছবিতে আত্মসমালোচনার যন্ত্রণা লভ্য (সাড়ে আট)। ভিস্‌কন্তি নিও-রিয়ালিজম, (লা টেরা ট্রেমা) ছেড়ে ইতিহাসাশ্রয়ী এপিক রচনায় মন দিয়েছেন (লেপার্ড)। আন্তনিয়নি আধুনিক মানব-মানবীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতরকার "Sharp teeth of long proximity"-কে দৃশ্যমান করে 'বোরডোম'এবং 'লোন্‌লিনেস'-কে পরীক্ষা করছেন (Adventure, La Notte, L'rclipse)। ডি সিকা 'নাটকীয়' ছবি তৈরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। কিন্তু এই সংকটের মধ্যেও ইটালীতে, পাসোলিনী, ওল্‌মি, রোসি-র মতো নতুন শিল্পীরা কাজ করে চলেছেন।

সুইডেনে চরম ব্যক্তিতন্ত্রী শিল্পী ইঙ্‌মার বার্গম্যানের প্রভাব এখনও অপ্রতিহত এবং সেখানে অর্থনৈতিক সংকট প্রবল নয়। ব্যক্তিতন্ত্রী শিল্পীর কাজ হিসাবে হুস্টন স্পেনের বুন্যুয়েলের নতুন ছবিগুলির (নাজারিন, ভিরিডিয়ানার) উল্লেখ করেছেন। ফেলিনির মতো এঁদের ছবিতে খ্রীষ্টিয় পাপবোধ কাজ করেছে এবং Yung-এর মতে এ শতাব্দীর যা চরম অভিশাপ—Loss of Christian myth—তার জন্য দুঃখের দাহ, এবং তার বিকল্পের জন্য আকুলতা এদের ছবিতে লভ্য।

* * *

রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের চলচ্চিত্রে অর্থনৈতিক সংকট বড় কথা নয়—সেখানে অনেক বেশি চিন্তার কথা সরকারী কর্তৃত্বের ভয়। চুখরাই-এর 'ব্যালাড অব্ এ সোল্জার' এবং কালাটোজভের 'ক্রেন্স্ আর ফ্লাইং' ছবি দিয়ে রাশিয়ান চলচ্চিত্রে নব্যতন্ত্রের শুরু হল বটে—তবু তার ভবিষ্যৎ আশানুরূপ উজ্জ্বল হল না। বরঞ্চ হাইফিৎজ-এর 'লেডী উইথ এ ডগ্' এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে রইল। এবং Penelope Hauston-এর মতে এখনও রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সাহিত্যকর্মের চিত্ররূপগুলিই—কোজিনৎসেকের 'হ্যামলেট' হয়তো সে কথাই প্রমাণ করবে।

পোলাণ্ডে ওয়াইদা যৌবনের বিনাশজনিত বিক্ষোভকে প্রকাশ করলেন, মুঙ্ক যুদ্ধের পাশবিকতাকে তীব্র বিদ্রূপ করলেন, তরুণ পরিচালক পোলান্স্কি তার 'নাইফ্ ইন্ দ্য ওয়াটার'-এ নিতান্ত আধুনিক জীবনের ব্যক্তিসংঘর্ষের ট্র্যাজেডিকে অনুচ্চারভাবে চিত্রিত করলেন। হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানীতে যুদ্ধবিরোধী মানবতাবাদী ছবি প্রস্তুত হয়েছে; বর্তমানে ওসব দেশ থেকে সাড়া জাগাবার মতো কোনো ছবির খবর আসছে না। বরঞ্চ বুলগেরিয়াতে কিছু ভালো ছবি তৈরি হচ্ছে 'সান অ্যাণ্ড স্যাডো'।

চলচ্চিত্রশিল্প আর ইয়োরোপে গণ্ডীবদ্ধ নেই। শুধু 'ইন্ডাষ্ট্রি' হিসাবেই নয়—'আর্ট' হিসাবে ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মের দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী চমৎকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের ("Until someone else comes along to change it, Satyajit Ray's Bengal will be the Cinema's 'India') মধ্যে দিয়ে Hauston ভারতবর্ষের পরিচয় করিয়েছেন। জাপান ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে—কুরুসোয়ার 'রশোমন' ছবির আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে। মিসোগুচি ও অজুর শিল্পকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে জাপানের নিজস্ব চলচ্চিত্রকলার বিচার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই স্বল্পাকৃতি পুস্তকে (পৃঃ ১৯৫) Penelope Hauston এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে জাতীয় চরিত্র বজায় রাখা স্বতন্ত্র কথা কিন্তু 'national isolation' এখনকার চলচ্চিত্রশিল্পে সম্ভবই নয়, কেননা—"Isolation, with the present internationalism of the Cinema looks more forced than splendid."

সংস্কৃতি-সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

এই সংখ্যার ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ (২১শে জুলাই) আমাদেব দপ্তরে এসে পৌঁছাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ডঃ শশিভূষণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক ও সমালোচক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। নানা গবেষণামূলক গ্রন্থাদি ছাড়া কয়েকখানি গল্প, উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

আগামী সংখ্যায় যথাযোগ্যভাবে আমরা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে পারব বলে আশা রাখি।

একটি সামাজিক সমস্যা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ দপ্তব রেলওয়ের সম্পত্তি ধ্বংস ও অপহরণ বিষয়ে যে-কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন তা দেশেব শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকটি মানুষকে গভীরভাবে বিচলিত করবে। কেননা, এই ধ্বংসকার্যের পেছনে এমন একটা মনোবৃত্তি কাজ করছে অবিলম্বে যা দূর করতে না পারলে সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে দেশের সমূহ অকল্যাণ ডেকে আনবে।

রেলওয়ের সম্পত্তি বিনাশের যে-হিসাব তাঁরা দিয়েছেন এমনিতেই তা ভয়াবহ। ১৯৬৩ সালেব ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৪ সালের মে—এই ছ' মাসের মধ্যে হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে চুরি ও ধ্বংসকার্যজনিত ক্ষয়ক্ষতিব পরিমাণ যথাক্রমে ২৯৯,৯৮৬ টাকা ও ৪৩৭,৩১৩ টাকা। এক মে মাসেই এই দুই বিভাগে ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে ৬৯,৮১২ টাকা ও ৬৬,৯৯৬ টাকা। শিয়ালদহ বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়েছে ১৯৬৩ সালের ২রা ডিসেম্বর। ইতোমধ্যেই বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুদৃশ্য ও মূল্যবান আসবাবপত্র দুর্বৃত্তদের দুষ্কার্যের শিকাব হয়েছে। এক এপ্রিল মাসেই শিয়ালদহ বিভাগে এর ফলে ক্ষতি হয়েছে ৬০

হাজার টাকার। এই সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক ট্রেনগুলি যে-কোনো রেলওয়ের পক্ষে গর্বের বস্তু। দুর্বৃত্তেরা এগুলিকেও রেহাই দেয় নি। দামী ফোম রবারের আসনগুলি, রেক্সিনের আবরণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি এমনভাবে তছনচ করা হয়েছে যে দেখলে মায়া লাগে।

চোর-ডাকাত সব দেশেই আছে এবং চুরি-ডাকাতি একটা প্রশাসনিক সমস্যা। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, শুধু চোর-ডাকাতেরাই জাতীয় সম্পত্তির এই ধরণের ব্যাপক ধ্বংসকার্যের জন্য দায়ী তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ধ্বংস করা হয়েছে শুধু ধ্বংস করার জন্যই। আর এই মনোভাব শুধু যে রেলওয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়—সর্বত্রই তার অল্প-বিস্তর প্রকাশ আজকাল দেখা যায়। তাই রেলওয়ে প্রচারিত তথ্যগুলি আমাদের যে-সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা শুধু একটা প্রশাসনিক সমস্যা নয়, তা একটি সামাজিক সমস্যা যার মূলে রয়েছে মূল্যবোধের বিকার। কেন এই মূল্যবোধের বিকার ঘটল এই প্রশ্ন হয়তো আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যাবে এবং সে প্রশ্নের মোকাবিলা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এই সামাজিক সমস্যার মৌলিক সমাধানের কথা বলে তরীর তলায় বাঁধন যেখানে আলগা সেখানে হাত লাগাতে অস্বীকার করলে ভরাডুবি অনিবার্য।

শচীন বসু

ভ্রম-সংশোধন

'মার্কসবাদ ও ভারতবোধ' রচনার ৩৯ পৃষ্ঠার ১৭শ লাইনটির শুদ্ধ পাঠ হবে: চণ্ডীদাসের এই মানুষ আসলে দেহতত্ত্বের মানুষ।

পরিচয়

শারদীয়া সংখ্যা

১৩৭১

অন্যান্য বছরের মত এবারও শারদীয় পরিচয় লেখাতে
ও ছবিতে অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে মহালয়ার
পূর্বেই প্রকাশিত হবে। কয়েকটি সুপরিকল্পিত
আলোচনা-চক্র হবে এবারকার শারদীয়
সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গ্রাহকদের এই সংখ্যাটির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

অবিলম্বে পরিচয়-এর গ্রাহক হোন

চাঁদার হার: বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০

কালান্তর

প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাপ্তাহিক

দাম: ২০ ন. প.

২য় বর্ষে পদার্পণ করেছে

চাঁদার হার:

বাৎসরিক ১০৲ টাকা ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা

●

কালান্তর প্রকাশনীর বই

হীন কৌশল ও ভিত্তিহীন অভিযোগ—এস্. এ. ডাঙ্গে মূল্য ২০ পয়সা
কমিউনিস্ট পার্টির মতভেদ কি নিয়ে—ভবানী সেন মূল্য ৪০ পয়সা
জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন— মূল্য ২০ পয়সা

অফিসের ঠিকানা:

৫৯।১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

ভাদ্র
১৩৭১

লোকটা নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। বিনা-টিকিটের যাত্রী—বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। টিকিট ফাঁকি দিয়ে লোকটা অন্যের জায়গা দখল করেছে, রেলকে ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করছে, ফলে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এদের পাপচক্র জাতীয় জীবনে দুর্নীতির এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করছে। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER/86
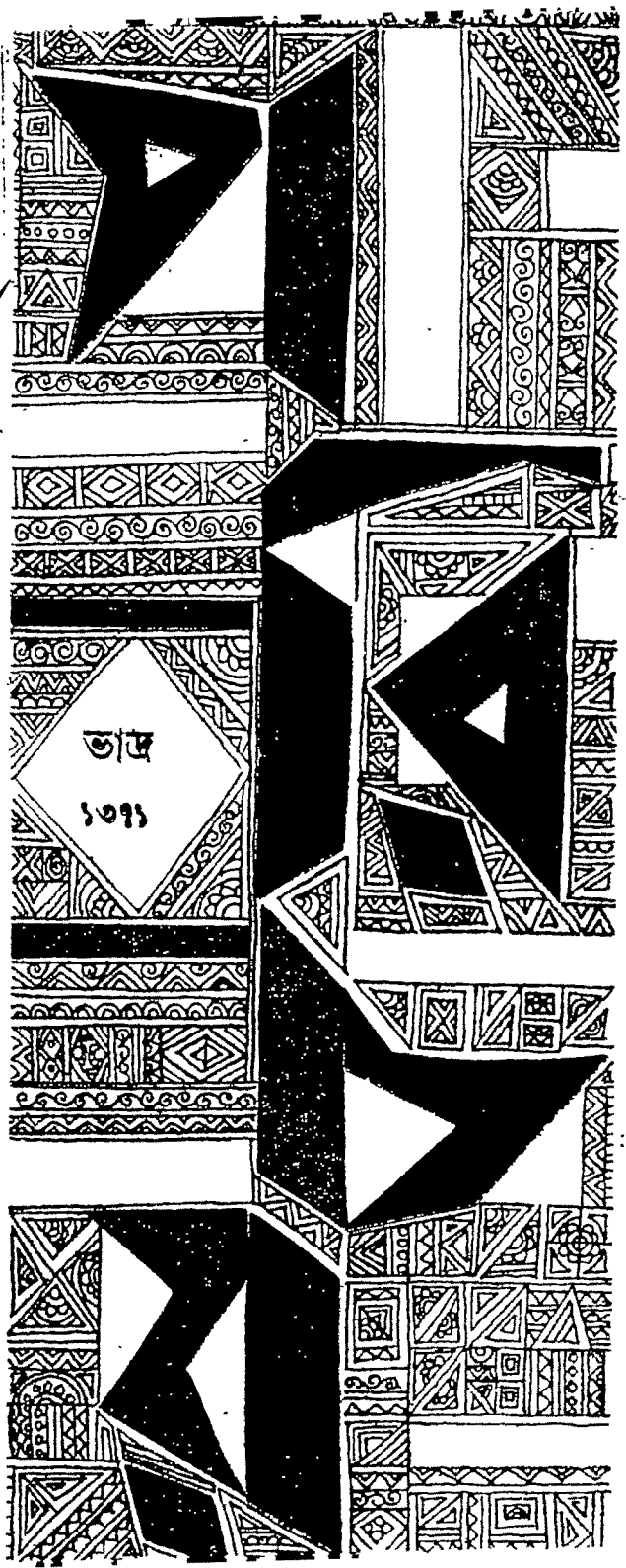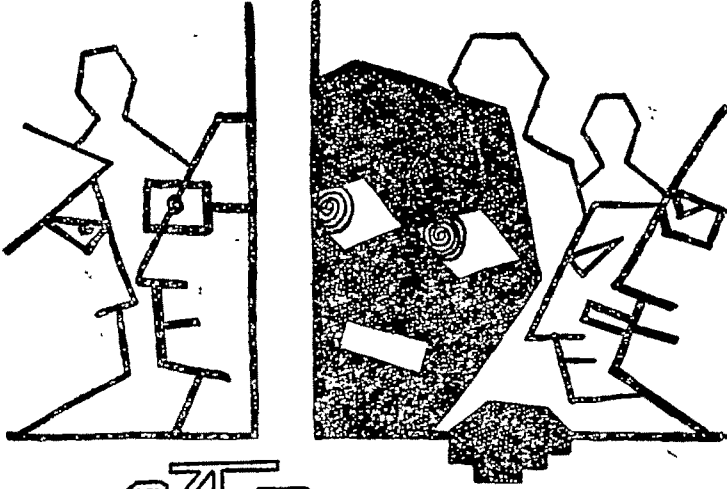
॥ ন্যাশনালের বই ॥

ভি. আই. লেনিন

কী করিতে হইবে	২'০০
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রেসীর দুই কৌশল	১'৫০
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে	৮'০০
জাতীয় কর্মনীতির প্রশ্নাবলী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ	৩'৭৫
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন	১'৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি দুর্গাপুর-৪

আপনি

পরিচয়-এর গ্রাহক হয়েছেন ?

পরিচয় নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া গ্রাহক হলে আপনি আর্থিক দিক দিয়েও লাভবান হবেন।

পরিচয়-এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা দশ টাকা।

কিন্তু খুচরো বারোটি সংখ্যার দাম (তিনটি বিশেষ সংখ্যা সহ) পনেরো টাকা।

আজই

পরিচয়-এর গ্রাহক হোন

পরিচয়-কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে আমাদের সাহায্য করুন।

পাখিরা পিঞ্জরে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের নায়ক অনন্ত নদীর বুকে ভাসমান নৌকার বাসিন্দা ; অতীতের ভয়াবহ পাপ মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর তীরের সন্ধান যাকে আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশ ও কাল তার কাছে অন্ধ। শক্তিমান লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক মানুষের যে অসহায় আলেখ্য এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রবাহে তা নূতন চিন্তার সূচনা করবে। **সাড়ে তিন টাকা**

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যকলা বিষয়ে প্রথম সুচিন্তিত গবেষণামূলক গ্রন্থ। প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজ্ঞানসমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। **বারো টাকা**

কৃষ্ণা দত্ত

লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি অনন্য সাধারণ উপন্যাস। লেখিকার সুদীর্ঘ লণ্ডনবাসের অভিজ্ঞতা বহু আলোচিত এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। **সাত টাকা**

নবপত্র প্রকাশন । ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

॥ মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে ॥

শারদীয়

১৩৭১

কয়েকটি আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের হাসির গানের
অপ্রকাশিত রূপান্তর

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর
অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা

রবীন্দ্রনাথকে লেখা এণ্ড্রুজের
অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ

ইতালীর শিল্পী গুত্তুসোর
আঁকা প্রতিরোধ আন্দোলনের ছবি

একাধিক আলোচনা-চক্র
বাংলার বিশিষ্ট লেখকদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ

(বিস্তারিত বিবরণ পরে বিজ্ঞাপিত হবে)

এজেণ্টরা এখুনি অর্ডার দিন

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ২
ভাদ্র, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

দুটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশন

পাঠকদের উপহার দিতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত

পাওয়া যাচ্ছে

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা-সংগ্রহ

মহামনীষীর জীবন্ত চিন্তাপ্রবাহ

যাঁর জন্মশতবার্ষিকী এ বৎসর

আমরা উদ্‌যাপন করছি

আপনার কপির জন্য এখনই অর্ডার দিন

ভারতকোষ

সর্বাধুনিক পূর্ণাঙ্গ বাংলা মহাকোষ

এখন ছাপা হচ্ছে

পরিচয়
বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ২

দুসান জ্বাভিতেল

লোক-কবিতা ও ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্য

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতবিদ্যার প্রধান ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত ছিল প্রাচীন ভারত ও তার সংস্কৃতিতে। এখন, যখন ভারতবিদ্যার কেন্দ্র খাস ভারতবর্ষেই স্থানান্তরিত হয়েছে তখন পুরাতন অতীত এবং আধুনিক কাল সম্পর্কে ভারতবিদের মনোভঙ্গিতে একটি শুভ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁরা আধুনিক ভারত, তার ইতিহাস, ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে এখন অধিকতর আগ্রহশীল হয়েছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বোধগম্য পরিবর্তন এবং যে-সব ভারতবিদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল নিছক কেতাবি অপেক্ষা কিছু অধিক তাঁরাই একে স্বাগত করবেন।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও তথাকথিত নতুন ভারতীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজও অনেক অগ্রসর হয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চায় অখণ্ড মনোযোগের ফলে এগুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়েছে। অন্য সাহিত্য সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে যে সত্যিই চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। গত দুই দশকে বিভিন্ন কবি, কাব্য-রীতি ও যুগ সম্পর্কে শত শত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থই অবশ্য সংখ্যায় অধিক। এ ছাড়াও বহু সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে এবং হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সমন্বয়ী ইতিহাস রচনারও সার্থক প্রয়াস করা হয়েছে। আধুনিক ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাজ যদি এইরূপ সন্তোষজনক হয় তাহলে এদিক দিয়ে আর-এক ধাপ এগোন সম্ভব হবে, ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণা এবং বিভিন্ন সাহিত্যের নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র লক্ষণ দেখিয়ে তার সমন্বয়সাধন সম্ভব হবে। বাংলা সাহিত্যের এই ধরনের একটি বিশিষ্ট চারিত্র লক্ষণই আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু। এই বৈশিষ্ট্য হল ধ্রুপদী বাংলা কাব্য ও লোকসাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র।

বাংলার আধুনিক সাহিত্য ও গ্রামের মানুষের মধ্যে অনস্বীকার্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এটা দুঃখজনক হলেও বর্তমান অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক এবং আধুনিক সভ্যতারই তা ফলশ্রুতি। এই ব্যবধান সৃষ্টি হবার আর-একটা কারণ এই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ ঐতিহ্যের অনুসারী নয়—সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে আধুনিক ভাবাদর্শ, অনগ্রসর গ্রাম্য সমাজের পক্ষে যা একান্তই বিজাতীয়। উনবিংশ শতকের আগে এ ব্যবধান ছিল না। ধ্রুপদী কবিতার চরিত্র ও বাংলার লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই সিদ্ধান্তের জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

লোকসাহিত্যের ইতঃস্তত ছড়ান নমুনা ও নানাবিধ আভাস থেকে আমরা যতটা অনুমান করতে পারি তাতে মনে হয় সেই অতীতকালে ধ্রুপদী ও লোকসাহিত্য উভয়ই একই বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়েছিল আর সে বীজ প্রোথিত ছিল গ্রাম বাংলার জীবন-পরিবেশের দেশজ ভূমিতে। বহু শতাব্দী জুড়ে বাঙালি সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র ছিল গ্রাম। তখনকার দিনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, রাজা এবং রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটত পলকে পলকে, ক্ষমতার কেন্দ্র বাবংবার একস্থান থেকে অন্যস্থানে অপসৃত হত। এই অবস্থা সত্যিকারের রাজসভার কাব্যের বিকাশের পরিপন্থী ছিল, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে, একটি সংকীর্ণ সুবিধাভোগী শ্রেণীর উপভোগের জন্য কাব্য রচনার ঐতিহ্য সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। সুতরাং ধ্রুপদী কবিতা তখনও অপহৃত হয় নি গ্রামের মানুষের কাছ থেকে—তারাই তখন ছিল কবির মূল শ্রোতা। এই অর্থে ধ্রুপদী কবিতা কখনও তার মৌল লোকায়ত চরিত্র-ভ্রষ্ট হয় নি। আর তাই স্বতঃস্ফূর্ত লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার যোগসূত্রও অপরিদৃশ্য হয় নি।

ধ্রুপদী কবিতা অবশ্যই লোকসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে এর বিপরীতটাই, অর্থাৎ ধ্রুপদী সাহিত্যের উপর লোকসাহিত্যের প্রভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এক্ষেত্রে অনুমান ও কল্পনার অনিশ্চিত ভিত্তির উপরই আমাদের দাঁড়াতে

হচ্ছে, তবু আমার বিশ্বাস এমন অনেক আভাস ও তথ্য ছড়ান আছে যার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভিত্তিক একটি প্রকল্প রচনা সম্ভব। বাংলা লোকসাহিত্য বিষয়ে পূর্বেকার দুটি নিবন্ধে[১] এই সব তথ্য আমি বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছি।

আমার মতে, বাংলা ধ্রুপদী কবিতার আঙ্গিক ও ভাববস্তু উভয় ক্ষেত্রেই লোকসাহিত্যের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। এইসব কবিতার মূল বিষয়বস্তু, প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে কবিদের মনোভাব এবং যেভাবে তাঁরা এইসব কাহিনীকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন তাতেও এই প্রভাব লক্ষ করা যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই প্রভাবকে ধ্রুপদী সাহিত্যে নিছক লৌকিক উপাদান অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আচারের বর্ণনা এবং প্রবাদ ও প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার হিসাবে দেখলেই চলবে না। এই প্রভাব মনে হয় আরও অনেক গভীর ও দূরপ্রসারী। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মূল উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে লোককথায়; রাধা-কৃষ্ণের সর্বভারতীয় কিংবদন্তী বাংলার মাটিতে লোককথায় এবং লোকসংগীতে পরিবর্তিত হয়ে একটি বিশিষ্ট কাব্যধারায় পরিণত হয়েছে। এই লৌকিক ঐতিহ্যেরই একটি ধারা পুরাতন চর্যাপদ, অন্য ধারাটি গ্রামাঞ্চলের বাউল গান। এমন কি বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণকথার সঙ্গেও ঐ কাহিনী নিয়ে রচিত লোককথার অনেক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে, কাব্যের আঙ্গিক ও ভাব প্রকাশের উপায়ের দিক দিয়ে বাংলা কবিতা অনেক দীন ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হবে। এর জন্যও কি লোককাব্যের প্রভাব দায়ী নয়? লোককাব্যের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ এমন কি এই আধুনিক কালেও অপরিবর্তিত আছে, আর, ধ্রুপদী কাব্যের এইসব ছন্দ মূলত একই। বাংলা কাব্যের উভয় শাখায় উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তাও নিঃসন্দেহে আহৃত হয়েছে একই সূত্র থেকে, দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলা যায় তা হল, 'গ্রামের কাব্যভাষা, বাংলার আকাশ বাতাসে যা মিশে আছে।' ধ্রুপদী

১। Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and the Problem of their Authenticity. University of Calcutta, 1963 এবং বিশেষ করে The Development of the Baromasi in the Bengali literature / Archiv Orientalni 29, 1961, pp 582-619 প্রবন্ধটি Folklore III তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, pp 161-75 201-12 এবং 254-68.

কবিতায় যেসব উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে লোক-কাব্যের উপমা ও উৎপ্রেক্ষার তুলনা করলেই এই প্রকল্পের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

বিশদতর বিশ্লেষণের সুযোগ বর্তমান নিবন্ধে নেই। তাই এক কথায় বলব, লোকসাহিত্য হচ্ছে এক অফুরন্ত উৎস ধ্রুপদী সাহিত্য যা থেকে নিরবধি প্রাণশক্তি আহরণ করেছে। বস্তুত পক্ষে লোকসাহিত্যের প্রেক্ষিতে না দেখলে এবং প্রতি পর্বে তাকে পাশাপাশি না রাখলে বাঙালির শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের নিগূঢ় ছন্দ অনুধাবন করাই সম্ভব নয়।

অবশ্য, এমন কি অতি সুদূর অতীত কালেও বাংলার ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ছিল। বাংলা ধ্রুপদী কাব্যের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য হল এক বিশেষ ধরনের ধর্মীয়তা। যে-কোনো কাব্যকে তখন ধর্মীয় আবেগ বা ভাবকে প্রকাশ করতে হত, কিংবা তাকে অবলম্বন করতে হত কোনো ধর্মীয় বিষয়, অন্ততপক্ষে তাকে ধর্মগ্রন্থের বাহ্যিক ছদ্মবেশ ধারণ করতেই হত। মঙ্গলকাব্য-বিষয়ক গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন: "অলৌকিকতার ভেক ধারণ না করলে অতীতকালে উচ্চস্তরের কোনো কাব্যগ্রন্থ সফল হতে পারত এমন কথা বলা যায় না।" পাণ্ডুলিপি পবিত্র এই ধারণা নিঃসন্দেহে এই আবশ্যিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বস্তুত পক্ষে এইজন্যই মহাকাব্যে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকবিতা 'উচ্চতর সাহিত্যে' অপাংক্তেয় ছিল। ধ্রুপদী বাংলা কবিতায় ধর্মের ছদ্মবেশ ছাড়া কোনো প্রকৃতি বর্ণনা বা প্রেম-গীতি আমরা সত্যই পাই না, এমন কি কোনো তত্ত্বমূলক পদ্যে বা প্রবচনেও পাওয়া যায় না যা ধর্মভাবের দ্যোতক নয়। বাংলার লোকসাহিত্যে কিন্তু আমরা এ-সব পাই, যদিও এখানেও অ-ধর্মীয় রচনা সম্পর্কে বৈষম্যমূলক মনোভাবের কিছু নিদর্শন না পাওয়া যায় তা নয়, যেমন, পূর্ববঙ্গের বিয়ের গান ও মেয়েলি গানের বিষয়বস্তু। এই দিক থেকে ধ্রুপদী কবিতা ও লোকসাহিত্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে। এর ফল-পরিণাম কি হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে তা সুবিদিত—কিন্তু এখানে এই নিবন্ধের পরিসরে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার স্থান নেই।

আমি মনে করি অন্য আরও কারণ ব্যতীত বাংলা ধ্রুপদী কবিতার এই ধর্মীয়তাই তাকে আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিভূমি হতে দেয় নি। আধুনিক

সমাজের নতুন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক সাহিত্যকে ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে যে উপায় নেই। আর লোকসাহিত্যের চরিত্র এত বেশি গ্রাম্য ছিল যে যাঁরা নবোদ্ভূত শ্রেণীসমূহের পক্ষ থেকে কথা বলতে চান তাদের কাছে তা ছিল প্রায় মূল্যহীন। এইভাবে ক্লপদী কাব্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হল আর লোকসাহিত্য সীমাবদ্ধ হয়ে রইল গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আর এই পরিবেশ পৃথিবীর সর্বত্রই, আধুনিক সভ্যতার নিরঙ্কুশ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমশই সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হচ্ছে। *

* দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষড়বিংশ প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[প্রাসাদের একটি ঘর। চারধারে ঝালর দেওয়া। ডানদিকের দেওয়ালে বিরাট ভারি দরজা। বাঁদিকে নিচু পাটাতনের উপর সিংহাসন। পেছনের দেওয়ালে পর্দা লাগানো ছোট দরজা এবং একটি বিরাট জানলা। জানলার সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরনে গোলাপি রঙের গাউন। সেণ্টার স্টেজে একটি রাইটিং টেবিল, তাতে স্তূপীকৃত কাগজপত্র। এই টেবিলের পেছনে এলিজাবেথ বসে, পাশে একজন সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে। রানীর পরনে ধূসর ব্রোকেডের পোশাক ; স্বচ্ছ কাপড়ের হাতা, মুক্তোর অলংকার। যত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, ততই শুধু রানীর মুখ এবং হাতদুটি পরিষ্কার দেখা যাবে।]

ফেরীওয়ালী : (দূর থেকে ভেসে আসে) গোলাপ, তাজা গোলাপ।

এলিজাবেথ : (কলম নামিয়ে রেখে) এগুলো সই হয়ে গেছে। বার্লের কাছে নিয়ে যাও। আর ওই আবেদন আমি নামঞ্জুর করলাম।

[লোকটি মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে যায়]

ফেরীওয়ালী : (আরও কাছে) গোলাপ, গোলাপ নেবে গো !

এলিজা : এই শোনো ! কাগজপত্রগুলো ঠিক করে রাখো।

[মেয়েটি জানলার কাছ থেকে এসে টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে থাকে।]

ফেরীওয়ালী : গোলাপজাম ! মিষ্টি গোলাপজাম !

পরিচারিকা : মহারানী, আমি অবাক হয়ে ভাবি আপনি কেমন করে রাস্তার ধারের ঘরে, এত হৈ-চৈ-এর মাঝে বসে থাকেন !

এলিজা : খুকী, তোমার বিয়ে হলে বাচ্চাদের কে সামলাবে ? তুমি, না, তোমার ঝি ?

পরিচারিকা : কেন, আমি !

এলিজা : তাহলে তো তোমাকে রোজ ওই বাচ্চাদের মাঝখানেই থাকতে হবে ! মেরী ফিটন কোথায় ?

পরিচারিকা : পাশের ঘরে ঝিমোচ্ছে। আজ মেরী খুব ভোরে উঠেছে। ভোরবেলায় আমার জানলা থেকে দেখি, মেরী বাগানে—আমায় বললে আপনার নির্দেশমতো শিশিরে ভেজা গোলাপ তুলছে।

এলিজা : আমার নির্দেশমতো ?

পরিচারিকা : হ্যাঁ, তাই তো বলল ও।

ফেরীওয়ালী : (খুব কাছে) গোলাপ, গোলাপ নেবে গো !

এলিজা : জানলাটা খুলে দাও। (মেয়েটি জানলা খুলে দেয়)

ফেরীওয়ালী : গোলাপ ! তাজা গোলাপ !

এলিজা : আমার পার্সটা নিয়ে এস।

[ছোট দরজা দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে যায়। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর এলিজাবেথ একটি ড্রয়ার খুলে পার্স বার করে জানলার কাছে গিয়ে একটি মুদ্রা ছুঁড়ে দেন।]

ফেরীওয়ালী : গোলাপ ! তাজা গোলাপ ! কে ? মহারানীর জয় হোক। (এলিজাবেথ একটি মুদ্রা ছুঁড়ে দেন) ডেপ্টফোর্ড থেকে লণ্ডনে আসার পথে সরাইখানায় একটি লোক খুন হয়েছে। খুনীকে কেউ দেখতে পায় নি। (এলিজাবেথ আরেকটি মুদ্রা ছুঁড়ে দেন)—একটি অল্পবয়স্ক লোক ছিল সেখানে…থিয়েটার কোম্পানির হেন্‌স্‌লো আর আরও একজন লোক—গোলাপ, গোলাপ নেবে !

[মেয়েটি ফিরে আসে। তার আগেই এলিজাবেথ পার্স রেখে দেন।]

পরিচারিকা : (অপ্রস্তুত হয়ে) মহারানী—

এলিজা : এখানেই ছিল পার্সটা। ওই ফেরীওয়ালীটির গলাটা খুব মিষ্টি। ও কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা কর তো !

পরিচারিকা : (জানলার ধারে গিয়ে) এই ফেরীওয়ালী ! কোথায় থাক তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ?

ফেরীওয়ালী : আমি ? মার্লো থেকে আসছি আমি—মার্লোর বাগানের ফুল আমার—গোলাপ ! গোলাপ নেবে ! (কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় ।)

পরিচারিকা : অনেক দূর থেকে আসছে ও । মার্লো থেকে । নদীর ওপারে মার্লো—এখান থেকে অনেক দূরে ।

এলিজা : মার্লো নদীর ওপারে—এখান থেকে অনেক দূর ! কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করলে পাঠিয়ে দাও ।

পরিচারিকা : 'রোজ' থিয়েটারের হেন্‌স্‌লো প্রায় দুপুর থেকে অপেক্ষা করে আছে । সঙ্গে মিঃ শেক্সপীয়রও আছেন ।

এলিজা : কই এখানে তো লেখা নেই ওদের নাম ! কার ডিউটি ?

পরিচারিকা : মেরী ফিটনের ।

এলিজা : হেন্‌স্‌লোকে পাঠিয়ে দাও । আর ঘণ্টা বাজালেই যেন মেরী ফিটন আসে ।

পরিচারিকা : এক্ষুণি বলছি ওকে, মহারানী ।

[মেয়েটি বেরিয়ে যায় । এলিজাবেথ উঠে ধীরে ধীরে সিংহাসনে বসেন । একটু বিরতির পরে একটি বালক বড় দরজাটি খুলে দেয় । হেন্‌স্‌লো ঢোকে ।]

এলিজা : তুমি দুঃসংবাদ বয়ে এনেছ, হেন্‌স্‌লো !

হেন্‌স্‌ : মহারানী, মার্লো মৃত…ডেপ্টফোর্ডে দেখে এলাম—কিন্তু… আপনি কেমন করে জানলেন তা তো বুঝতে পারছি না !

এলিজা : আমি কেন জানব না ? আমি ইংলণ্ডেশ্বরী ! দূর কোনো গ্রামে যখন কেউ মারা যায় তার স্ত্রীর ছোট হৃদয় যখন কেঁপে ওঠে তারই তালে কি আমার হৃদয়ও কাঁপতে থাকে না ? ইংলণ্ডের কোনো কোণে ভূমিকম্প হলে আমার পায়ের তলার মাটিতে কি তার কাঁপন আমি পাই না ? ইংলিশ চ্যানেলে যখন ঝড় ওঠে তখন কি তার আভাস ভেসে আসে না ভিজে বাতাসে ? ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতাসে মাটিতে

কি আমার অনুচর ছড়িয়ে নেই? এর অণুতে অণুতে কি নেই আমি—আমি ইংল্যাণ্ডের মহারানী!·· তোমায় যে কাজের ভার দিয়েছিলাম করেছ? শেক্সপীয়র এসেছে তোমার সঙ্গে?

হেন্‌স্ : হলঘরে অপেক্ষা করছে উইল।

এলিজা : ও-ও তাহলে কাল রাতে ডেপ্টফোর্ডে ছিল?

হেন্‌স্ : কেউ জানে না সে কথা।

এলিজা : ভালোই। কিন্তু ওই কি—হেন্‌স্‌লো, ওই কি—

হেন্‌স্ : না, না, না। আমি শপথ করে বলতে পারি।

এলিজা : কিন্তু ও কি শপথ করে বলতে পারে?

হেন্‌স্ : ও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ও যা খুশি তাই বলতে পারে—আপনি যেমন বলাবেন। কিন্তু···মহারানী! আমাদের কি উইলকেও হারাতে হবে? বৃটিশ স্টেজের এক জ্যোতিষ্ককে আমরা হারিয়েছি···আর-একজনকেও কি হারাতে হবে?

এলিজা : হেন্‌স্‌লো, তুমি অত্যন্ত সৎ। তোমার নাতি হয়তো কোনোদিন রাজার প্রয়োজনে তাঁর ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় ওই করেছে এ কাজ?

হেন্‌স্ : না, যদিও ও তাই বলছে। কারণ ও মার্লোকে ভালোবাসত।

এলিজা : মার্লোকে ভালোবাসত, কিন্তু একটি মেয়েকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসত।

হেন্‌স্ : ওখানে তো কোনো মেয়ে ছিল না!

এলিজা : আমিও তাই শুনেছি; কিন্তু একটি বালক ছিল সেখানে।

হেন্‌স্ : কেউ জানে না সে কে।

এলিজা : তুমি দেখেছিলে তাকে?

হেন্‌স্ : ওর মুখ দেখতে পাই নি আমি, এক মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। চাবুক মারছিল আর বলছিল 'তাড়াতাড়ি'—

এলিজা : আচ্ছা, আমি শেক্সপীয়রের সঙ্গে দেখা করব।

হেন্‌স্ : মহারানী—

এলিজা : আমি স্ত্রীলোক, হেন্‌স্‌লো; তাই নিজের ছুঁচে আমি নিজেই সুতো পরাই। (ঘন্টা বাজান, সঙ্গে সঙ্গে মেরী ফিটন ঢোকে) মিস্টার

শেক্সপীয়রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। (তারপর মেরী দরজার দিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে) মেরী!

মেরী : মহারানী—

এলিজা : ওকে বল 'তাড়াতাড়ি'। (মেরী দরজার দিকে যায়) মেরী!

মেরী : মহারানী?

এলিজা : আমি তোমাকে এখনি কি বললাম?

মেরী : বললেন 'ওকে আসতে বল'। 'তাড়াতাড়ি'।

হেন্‌স্ : (কণ্ঠস্বর চিনতে পারে) 'তাড়াতাড়ি'!

এলিজা : দাঁড়াও। হেন্‌স্‌লো কিছু বুঝলে? মেরী, তুমি এত ধীর কেন? ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে। সারারাত কি ঘুমোও নি? হেন্‌স্‌লো তোমার কাজটা করে দিক। (হেন্‌স্‌লোকে) ওকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলো।

মেরী : আমি যেতে পারব মহারানী।

এলিজা : না, আব 'তাড়াতাড়ি' নয়। (হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়) বলতে পার শেক্সপীয়রকে কেন ডেকেছি আমি?

মেরী : আজ্ঞে না।

এলিজা : উইল এক গল্প শুনিয়েছে সবাইকে। আমিও সেই গল্প শুনতে চাই।

মেরী : গল্প, মহারানী?

এলিজা : তুমি শোকের পোশাক পর নি কেন মেরী?

মেরী : আমি?

এলিজা : মার্লো মারা গেছে।

মেরী : শুনে দুঃখিত হলাম।

এলিজা : কখন শুনলে তুমি?

মেরী : এক্ষুণি। আপনি বললেন।

এলিজা : আমি তাহলে তোমাকে ভুল বলেছি। মার্লো বেঁচে আছে। আর, সব বলে দিয়েছে।

মেরী : বেঁচে আছে? ওরা আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে! কি বলেছে ও? কে বলল আপনাকে?

এলিজা : তুমি, মেরী ফিটন! তোমার চোখের কোণে কালি, ঠোঁট থরথর

করে কাঁপছে ; মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন তুমি নিজের চোখে দেখেছ মার্লোকে খুন হতে···তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেছ 'তাড়াতাড়ি'।

মেরী : মহারানী, আপনার কাজেই গিয়েছিলাম আমি। আপনিই তো বলেছিলেন আমায় শেক্সপীয়রকে উদ্বুদ্ধ করতে! আপনার দায়িত্ব আমি পালন করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও অকারণে মার্লোর প্রতি ঈর্ষায় জ্বলে আমায় চিঠি পাঠায়—

এলিজা : দেখাও সেই চিঠি।

মেরী : আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। চিঠিতে এমন ইঙ্গিত ছিল যে মার্লোর জীবন বিপন্ন হতে পারে—তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে ডেপ্টফোর্ডে ছুটেছিলাম—

এলিজা : ভুল করেছিলে।

মেরী : জানি আমি। কিন্তু সেই মুহূর্তে যা মাথায় এসেছে তাই করেছি। ঘোড়া ছুটিয়ে গেছি মার্লোকে সাবধান করতে। তারপর সেই সরাইখানায় যখন মার্লোর সঙ্গে কথা বলছি শেক্সপীয়র আমায় অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছোয়। আমায় 'নোংরা বেশ্যা' বলে অপমান করে। তখন মার্লোর সঙ্গে লাগে ওর ঝগড়া।

এলিজা : মার্লোকে কি ও খুন করেছিল ?

মেরী : না, ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে মার্লোর নিজের ছুরি নিজের বুকে ঢুকে যায়।

এলিজা : তুমি কি করলে তখন ?

মেরী : আমি ?

এলিজা : হ্যাঁ, তুমি! তুমি কি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলে যেন মজাদার নাটক অভিনয় হচ্ছে ? তোমার এক প্রেমিককে আর এক প্রেমিকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে সাহায্য চাও নি কেন ?

মেরী : আমার প্রেমিক ?

এলিজা : হ্যাঁ লোকে বলে পেমব্রোক, মার্লো, শেক্সপীয়র—

মেরী : মহারানী! এ আমি সহ্য করব না।

এলিজা : তোমার চোখ দুটো খুব কালো, রেগে গেলে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে।

তুমি সহ্য করবে না—না ? তাহলে কি করবে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে মেরী।

মেরী : আমি চিৎকার করে ওদের দুজনকেই থামতে বলেছিলাম।

এলিজা : সাক্ষী নিয়ে এস, যে তোমায় চিৎকার করতে শুনেছে।

মেরী : আমি খেয়াল করি নি কে ছিল সেখানে। ওদের মাঝখানে গিয়ে আমি থামাতে চেষ্টা করেছিলাম—যার ফলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে আমার।

এলিজা : আঘাতের চিহ্ন দেখাও—

মেরী : আমার কাঁধের কাছে—

এলিজা : জামার হাতা ছিঁড়ে দেখাও আমাকে ! তোমার চোখে ভয় কেন ? তুমি কাঁপছ !

মেরী : ভয়ে নয়, রাগে। আপনি যদি দশটা ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরীও হন—

এলিজা : আস্তে, আস্তে মেরী। সারা রাত জেগে তুমি ক্লান্ত। তোমার বড় আঘাত লেগেছে। তোমার শরীর আর মন দুয়েরই বিশ্রাম প্রয়োজন। রাজসভার পরিশ্রম তোমার সইবে না। তাই আয়ার্ল্যাণ্ডের খোলা বাতাসে তোমার দেহ-মন সারাতে যাবে—আমি যতদিন না ডেকে পাঠাই।

মেরী : কোন্ অভিযোগে ?

এলিজা : কোনো অভিযোগে নয়। আমার সময় কম। তোমার মতো অপদার্থের স্থান নেই আমার কাছে। ইংল্যাণ্ডের এক অমূল্য রত্ন তোমার জন্য হারাতে হল। যাও—যাও। ভোঁতা অস্ত্র আমি ব্যবহার করি না, ফেলে দিই। (ঘণ্টা বাজান)

মেরী : মহারানী ! আপনি অবিচার করছেন।

এলিজা : তোমার থেকে আরও ভালো লোকেদের আমি অবিচার করেছি। মেরী ফিটন ! আমি অবিচার কবছি যেমন ঝোড়ো হাওয়া কুঁড়ে ঘরের প্রতি অবিচার করে, সমুদ্রের ঢেউ ছোট্ট ভেলার প্রতি অবিচার করে—তেমনি !

[একটি বালক ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢোকে।]

মিস্টার শেক্সপীয়রকে পাঠিয়ে দাও।

মেরী : এই ইংল্যাণ্ডের মহারানীর বিচার !

এলিজা : এই আমার বিচার।

মেরী : আমি কি আপনার কোনো সেবা কবি নি ?

এলিজা : সবাই আমার সেবা করে। কিন্তু যে যার নিজের পথ বেছে নেয়। আমি শুধু সেই পথেই তাদের ব্যবহার কবি।

মেরী : যেমন আপনি একবার ব্যবহার করেছিলেন—

এলিজা : বোলো না ! বোলো না।

মেরী : বলব না ! আপনার কাজে লাগানোর জন্য আপনি কেমন করে সবাইকে ব্যবহার করেন—

এলিজা : নোংরা কীট ! আমি তোমাকে ব্যবহার করেছিলাম উইলকে দেখাতে নোংরামির রূপ কত ঘৃণ্য হতে পারে ! সে প্রয়োজন আমার মিটেছে, তাই উইলের গা থেকে সেই নোংরা এখন মুছে দিচ্ছি।

[বড় দরজা খুলে যায়। হেন্‌স্‌লো ঢোকে, তার পেছনে শেক্সপীয়র। মহারানী হেন্‌স্‌লোকে কাছে ডাকেন।]

হেন্‌স্‌লো !

হেন্‌স্ : মহারানী ?

[ওরা দুজনে চাপা গলায় কথা বলতে থাকে। একটু পরে হেন্‌স্‌লো ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

মেরী : (শেক্সপীয়রকে) এই যে ! এবার তোমার কি লাগানোর আছে বল মহারানীকে !

শেক্স : কি হয়েছে তোমার ?

মেরী : নির্বাসিত—তোমার জন্য, আমার নাম মেরী সেইজন্যে।

শেক্স : আমার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা কর। এক্ষুনি আসছি আমি। তুমি যেখানে যাবে আমারও সেইখানে জায়গা।

মেরী : স্ত্রীকে নিয়ে এস—নাটকের এ অঙ্কের এখানেই ইতি ! অন্য লোক খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না আমার !

[মেরী বেরিয়ে যায়।]

শেক্স : মেরী ! আমার কথা শুনে যাও ! ফিরে এস, ফিরে এস তুমি !

অ্যানের কণ্ঠস্বর : ফিরে এস !

এলিজা : কোনোদিন নয় ! দরজা বন্ধ করে দাও।

শেক্স : (দরজার উপর আঘাত করতে থাকে) দরজা খোল। দরজা খোল !

এলিজা : আঘাত কর ; আঘাত কর। জোরে, আরও জোরে। দরজা খুলছে না ? মেরী চলে গেছে—তোমার থেকে দূরে। ওই জড় কাঠের দরজা তোমাকে আটকে রেখেছে ? তুমি না কথার যাদুতে সব লোককে যা ইচ্ছে তাই কর ! ঐ মূঢ় কাঠের দরজাকে বশে আনতে পারছ না ? আঘাত কর ! আরও জোরে ! মেরী একেবারে হারিয়ে গেল ? কল্পনার ডানা মেলে তুমি তো সুদূর দিগন্তে চলে যাও অতি সহজে ! কোথায় গেল তোমার সে শক্তি ! ঐ দরজা দুটোকে নাড়াতে পারছ না ?

শেক্স : আমায় আপনি আটকাতে পারবেন না—আমি—

এলিজা : হ্যাঁ, ওই তো খোলা জানলা দিয়ে তুমি লাফিয়ে পড়তে পারো ! তারপর সব শেষ ! জীবনের লড়াইয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ—তোমার বিশ্রাম কেড়ে নেবার কি অধিকার আমার আছে ? কিন্তু…কিন্তু…তার আগে একবার আমার কথা ভাববে না তুমি ? ইংলণ্ডের কথা ?

শেক্স : মহারানী ! আমি গত পাঁচ রাত ঘুমোই নি। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না !

এলিজা : বোঝার দরকারও নেই।

শেক্স : হ্যাঁ, সত্যি কথা বলি : বোঝার প্রয়োজন নেই আমার ! দয়া করুন আমার ওপর ! দরজা খুলে দিন !

এলিজা : তাতে কোনো লাভ হবে না।

শেক্স : জানি। তবু দরজা খুলে দিন।

এলিজা : মেরী তোমার বিশ্বাসের এক কড়া মূল্য দেয় নি।

শেক্স : তাও জানি আমি। আপনি শুধু দরজা খুলে দিন।

এলিজা : এখানে এস। কেন তোমাকে আমি আটকে রেখেছি বলো তো !

শেক্স : আমি মার্লোকে—

এলিজা : আমায় কিছু বোলো না। আমি কিছুই জানতে চাই না। শেক্সপীয়র,

আমার কাজ চাই। আমার নাটক কোথায়? নতুন নাটক? বেশ তো, আমার পাওনা মিটিয়ে দাও···তারপর···যাও।

শেক্স : নাটক? আপনি মহারানী—আমাদের মতো সাধারণ লোকের মনের কথা আপনি বুঝবেন না। তাই সামান্য নাটকের জন্য আমার জীবনের পথ আপনি বন্ধ করে দিচ্ছেন।

এলিজা : তবু ঐ সামান্য নাটক আমার চাই! ঐ কাগজ-কলম রয়েছে। আজ রাতের মধ্যে নতুন নাটকের খসড়া শেষ করে ফেলতে হবে। তারপর একমাস পরেই ইউরোপের সেরা লোকদের সামনে আমার রাজসভায় তোমার নাটক অভিনীত হবে। লণ্ডনের হাসি ইউরোপের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়বে—স্পেনে, ফ্রান্সে, ইটালিতে —তোমার কাছে আমি এই চাই, কারণ তুমিই দিতে পার।

শেক্স : আমি বাঁচতে চাই, লিখতে নয়। আমি হাসির কথা, ভালোবাসার কথা লিখতে চাই না,—আমি নিজে হাসব, ভালোবাসব—আমি বাঁচব।

এলিজা : যখন আমার অল্প বয়স ছিল আমিও এই কথা ভাবতাম। কাজের পর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেতাম না—আমার দম আটকে আসত—আর সময়ের ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে নিরন্তর বেজে চলত ও মনে করিয়ে দিত আমার যৌবন চলে যাচ্ছে। আমি কি অন্য কারো চেয়ে কম মেয়ে? আমি কি জানি না বসন্তের ফোটা ফুলের মেলায় মাঝে হারিয়ে যাওয়ার কি আনন্দ?—আমি কি জানি না যৌবন কত সুন্দর! কিন্তু তোমার কাজ তোমাকেই শেষ করতে হবে—তা যত কষ্টকরই হোক না কেন! এমনি কাজের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠে ক্রাইস্টের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করতাম 'আমায় মুক্তি দাও'—তারপর একদিন ক্রাইস্টের জীবন থেকেই আমার শিক্ষা পেলাম—বুঝলাম কাজের ভার থেকেই আসে বইবার শক্তি। সেই সকল রাজার রাজাকে আমি অনুসরণ করেছি তারপর থেকে।

শেক্স : সে পথ কোন দিকে গেছে?

এলিজা : সে পথের শেষ নেই। উঁচুতে তাকাও—পর্বত শিখর; তারপর আরও উঁচুতে তারায় ভরা আকাশ, আরও উপরে শুধু কালো

অন্ধকার। কোনো উত্তর মিলবে না। সব প্রশ্নের শেষ জড় কাষ্ঠের আবরণে ঢাকা। তুমি আমি সবাই সেইখানে পৌঁছব। তবু! তবু! প্রশ্ন করে যাব শেষ দিন পর্যন্ত। পরাজয় অবধারিত —তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে লড়াই। শেক্সপীয়র! আমি বন্ধ্যা, আমার মৃত্যুর পর মেরীর সন্তান ইংল্যাণ্ডের রাজা হবে। কিন্তু আজ রাতে আমি আমার উত্তরাধিকারীকে বেছে নিচ্ছি। আমি—ইংল্যাণ্ড—তোমাকে অভিষিক্ত করছি।

শেক্স : আমার চেয়ে যোগ্য লোক ছিল—সব গানের রাজা।

এলিজা : সে এখন অন্য জগতের রাজা—যে জগতে এ পৃথিবীর কোলাহল গিয়ে পৌঁছোয় না—যেখানে শুধু পরম শান্তি।

শেক্স : তার যোগ্যতা ছিল। ক্ষুদ্র আমার ক্ষমতা।

এলিজা : ইংল্যাণ্ড যদি তাকেই বেছে নিত তবে জেনে রেখো আজ এখানে সে-ই দাঁড়িয়ে থাকত—তুমি পড়ে থাকতে মৃত ডেপ্টফোর্ডের সেই সরাইখানার অন্ধকার ঘরে। উইল, তুমি রাজা, তোমার রাজত্বের ভার নাও তুমি।

শেক্স : খেলার রাজা—

এলিজা : হ্যাঁ, যেমন আমি খেলার রানী। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আকাশ বাতাস ধুলোবালি মাটি সাক্ষ্য দেবে সেই খেলার রানীর ভূমিকায় আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমি অভিনয় করে চলেছি। সারাদিনের ক্লান্তি অবসানে, রাজ্যের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে আমি কাঁদি আর ভাবি, আমার এই ছোট্ট হৃদ্‌পিণ্ডটির মাঝখানে গোটা ইংল্যাণ্ডের জীবন ধক্‌ধক্ করছে। উইল, আমি তোমায় বন্দী করিনি, তুমি ইংল্যাণ্ডের বন্দী।

শেক্স : কিন্তু আমাকে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের কি হবে? আমি কি কাজে আসব?

এলিজা : আমার জাহাজ সাত সাগব আর তেরো নদী পেরিয়ে এই বিরাট পৃথিবীব দূর দিগন্তে যায়—চোখের সামনে নতুন জগৎ খুলে দেয়। তোমাকেও তেমনি অজানার সাধনায় নামতে হবে। মানুষের মনের অতল গহনে ডুব দিয়ে সেঁচে আনতে হবে হাজার মানিকের সম্ভার!—যা দেখে যুগ-যুগান্তরের মানুষ অবাক হয়ে ভাববে 'জীবন এতো বিচিত্র! এই মানুষ!'

শেক্স　: সামান্ত নাটক ! কি তার মূল্য !

এলিজা : সে বিচার তুমি করবে না। কাজ, শুধু কাজ ! আমার সৈন্ত, নাবিকদের পাঠাই নতুন দেশ জয় করবার জন্ত। তুমিও পাঠাও তোমার কল্পনার দূতদের দূর দিগন্তে। দূর দূরান্তরে শিখরে শিখরে তোমার জয়ের কেতন ওড়াও,—ইংল্যাণ্ডের জন্ত নতুন নতুন জগৎ জিতে এনে দাও। তুমি প্রতিভাবান! সেই প্রতিভার মূল্য দেবে না তুমি ?

শেক্স　: যথেষ্ট মূল্য কি দিই নি আমি ?

এলিজা : এই মূল্য তোমাকে প্রতি মুহূর্তে দিতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অজস্র চিন্তা ভীড় করে আসবে; রাতের অন্ধকারে বিছানায় ছটফট করতে করতে চিৎকার করে উঠবে 'আমায় একটু ঘুমোতে দাও।' রাতের পর দিন আসবে···তারপরে আবার রাত। তুমি লিখে যাবে···শুধু লিখে যাবে। যশের মালা দুলবে তোমার গলায় কিন্তু তারই ভারে তুমি আরও নুয়ে পড়বে। হাজার চোখ ঈর্ষায় জ্বলে তোমাকে তাড়া করবে ক্ষেপা কুকুরের মতো। তবু তুমি লিখবে, শুধু লিখে যাবে! আমি ইংল্যাণ্ডের রানী। আমি জানি জীবনের পথ ক্ষুরধার—এক মুহূর্তের আলস্তে আমার অধিকার নেই। তবু আমি চলি, তোমাকেও চলতে হবে। থামার অধিকার নেই তোমার! সেই পথে এগিয়ে যাবে না তুমি ? মাথা উঁচু করে ? তোমার কাঁধ নুয়ে আসবে তবু দৃষ্টি থাকবে দিগন্তের পারে। পারবে না তুমি এই দায়িত্ব নিতে ?

শেক্স　: আমি জানি, পারতে আমাকে হবেই। কিন্তু এই কাজের পালা যখন শেষ হবে, তারপর ?

এলিজা : আরও কাজ !

শেক্স　: তারপর ?

এলিজা : তারপরেও কাজ !

শেক্স　: সব কাজ যখন ফুরোবে ?

এলিজা : তখন ঘুম—গভীর শান্তির ঘুম।

শেক্স　: এমনি করে সব শেষ হয়ে যায় ?

এলিজা : সব এমনি করে শেষ হয়ে যায় !

শেক্স : আশ্চর্য! একই সঙ্গে জীবন কী সুন্দর আর কী ভয়ানক—কত সহজ অথচ কত বিচিত্র! অজস্র চিন্তা কথার রূপ নিয়ে ভিড় করে আসছে আমার চারধারে। কলম দিন আমায়…(টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়) আর একা থাকতে দিন।

এলিজা : (উচ্চস্বরে) দরজা খোল।

[দরজা খুলে যায়। দীর্ঘ প্যাসেজ দেখা যায়]

শেক্স : কি অদ্ভুত! একটু আগে মেরী এই ঘরেই ছিল, ওই পথ দিয়ে সে চলে গেছে! অথচ কোনো চিহ্ন নেই তার।…আমি এখানে কি করছি?…

[এলিজাবেথ সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। কিছু সময়ের জন্ত শেক্সপীয়রের পাশে দাঁড়ান]

এলিজা : কাজের বোঝা কি বড্ড ভারি?

শেক্স : বড় ভারি এ বোঝা!

এলিজা : এ বোঝা কমবে না। [এলিজাবেথ বেরিয়ে যান]

শেক্স : লিখব আমি! নতুন নাটক লিখব "যা তোমাদের পছন্দ"। তিন জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা, দু'য়েক জন ডিউক; কয়েকজন সভাসদ আর ভাঁড়—এদের নিয়ে আর্ডেনের বনে আমার নাটক তৈরি হবে।…কিন্তু মেরী! তোমায় কেন ভুলতে পারছি না?

অ্যানের কণ্ঠস্বর : ভুলবে কেন? বিস্মৃতি তো ঘৃণার চেয়েও অসহ্য।

শেক্স : কে? কে?

অ্যানের কণ্ঠস্বর : মনে রেখো আমাকে…ফিরে এস…আমি অপেক্ষা করে আছি।

শেক্স : আজ বুঝতে পারছি তোমার ওপর কি অন্যায় আমি করেছি। কিন্তু ফিরতে আমি পারি না—আমি যে কাজের চাকায় বাঁধা!

ভৃত্য : (আলো নিয়ে ঢোকে) সূর্য ডুবে গেছে। মহারানী আপনার জন্ত বাতি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শেক্স : অ্যাঁ! ও, মহারানীকে ধন্যবাদ জানিও আর বোলো কাজ এগোচ্ছে।

[ভৃত্য বেরিয়ে যায়। উইল চেয়ারে বসে]

শেক্স : প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য—অলিভারের বাড়ি। ভালোই হবে

এ নাটক। এর পরে রোম্যান ইতিহাস নিয়ে লিখব—সিজার, অ্যাণ্টনির কথা। ডেনমার্ক নিয়ে তারপর···তারপর হলিনশেড··· রাজা আর তিন কন্তার কাহিনী—তারপর যাব পরীর দেশে গল্প খুঁজতে···তারপর ?—তারপর ?—তারপর ?—মেরী—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : ক্লান্তিতে কারো কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে হলে মনে রেখো—আমি রইলাম—

শেক্স : কে জানে—হয়তো কোনোদিন—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : আমি অপেক্ষা করছি।

পর্দা

এই নাটকের সবকটি গান ভাবানুবাদ করে সহায়তা করেছেন শ্রীপবিত্র সরকার।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

চারটি ট্রাজেডী পড়ে

'হে আভন-জাত কবি, পার যদি আমাদের রক্ষা কর
প্রস্তাবিত সমবেত আত্মহত্যা থেকে…'
—লরেন্স ডুরেল

এক

শুভবুদ্ধি সমাচ্ছন্ন। চারপাশে ধৃষ্ট কুমন্ত্রণা—
একটি রুমাল শুধু, ডেস্‌ডিমোনা হারিয়ে ফেলো না।

ফিরে আসব বলে সেই ভোরবেলা নৌকা ভাসিয়েছি
এখন দুকূল লুপ্ত, অগ্নিময় অমা
তোমার রুমালে শুধু! ডেস্‌ডিমোনা হারিয়ে ফেলো না।

দুই

দক্ষিণে বামে সামনে পেছনে
কংসের চোখে কৃষ্ণের মতো মরেও না মরে ব্যাঙ্কো
রক্ত ঝরছে সারা জীবনের বাসনার কষ বেয়ে
বুনো ঝঞ্ঝায় ঝাপটে মরছে ডানসিনানের বন
ম্যাকবেথ তুমি ঘোড়া সামলাও, ডাইনিরা তিনজন
তোমার সুখের কপাল পুড়িয়ে খেয়ে
ওআল্‌জ্‌ নাচছে; দক্ষিণে বামে সামনে এবং পেছনে
কংসের চোখে কৃষ্ণের মতো মরেও না মরে ব্যাঙ্কো

ম্যাকবেথ তুমি এত নির্বোধ
এত কি অধীর হবে—
করতলে কারো সাম্রাজ্য লেখা থাকে?

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

করাত

ক্ষুধিত শ্বদন্তে চেরো অমলতা, বাতাসের স্বাদ
গভীর আনন্দ-রৌদ্রে বিকশিত দিনগুলি। স্বর
দুপুরের বাতাসের। সকালের সহজ নির্ভর।
সন্ধ্যায় পাখিব ডানা কুয়াশার নীড়ের ভিতর।
ক্রমশ ইস্পাতে কাটো আদিগন্ত বৃষ্টির শরীর
মেঘের অন্তরতল। শ্যামলতা। সবুজ বিস্ময়।
অনেক তারার রাতে জোনাকিরা যত স্বপ্নময়,
যত প্রিয় অন্ধকার বিশাল বিষণ্ণ পৃথিবীর।

সমুদ্র, সমুদ্র শুধু চারিপাশে। হাঙরের দাঁত
শান্তির শরীরে বেঁধে। আক্রোশে ফেনিল নীল জলে
নঙর্থ নির্মম শূন্য, লক্ষ্য নেই অজস্র আঘাত
স্বর্গের সাম্রাজ্যগামী মৃতের মিছিল দলে দলে।
কালের অক্লান্ত বাহু; একটানা অদৃশ্য করাত
অবিরাম অন্ধ বেগ। আয়ুর বলয় কেটে চলে।

দীপংকর চক্রবর্তী

হে আমার বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকাচেতনা

মানুষেরে ভালোবেসে যদি কোনোদিন
হয়ে যাই সমুদ্রের মতো
পৃথিবীকে ভালোবেসে যদি কোনোদিন
হয়ে উঠি সবুজ অন্তত
জেনে যাব তরুলতা, হে আমার বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকাচেতনা
আমি তোমাদেরই মতো।

মানুষের মাঝখানে যখনই দাঁড়াই, দেখি জ্বলিছে আগুন
বেদনাকে বুকে ধরে এ কী তার মেলার বাসনা
বেদনার ভরাপাত্রে নিজেকে দেখিয়া
মহাকাল হয়ে গেছে ক্ষণেক নিশ্চুপ।
অতঃপর সেও বুঝি প্রাণের ধারায়
নিজেকে প্রকাশ করে নিজেরই ব্যথায়।

জেনে যাব তরুলতা, হে আমার বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকাচেতনা
বিস্মৃত অতীত হতে কোন মায়া নক্ষত্রে ধাবিত ?
বেদনার জন্ম কেন আমার স্বরূপে
ভালোবেসে এ হৃদয় হবে নাকি সমুদ্রের মতো ?

মৃণাল বসুচৌধুরী

শৈশবে একটি মুখ

শৈশবে একটি মুখ আমাকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিল,
কেবল একটি মুখ স্থির ছিল অলৌকিক শাশ্বত বিশ্বাসে ;
সমগ্র চেতনা ঘিরে প্রতিষ্ঠিত সেই স্মৃতি নিভৃতে কখন
আমাকে অলক্ষ্যে যেন ডেকে যেত অনিশ্চিত শ্রান্তিহীন পথে।

শৈশবে একটি মুখ, আমাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনেছিল,
সমাহিত জীবনের দূর পথে স্নিগ্ধতার আশ্চর্য প্রত্যয়ে ;
নিরন্তর অন্বেষণে একটি কোমল মুখ আমাকে ক্রমশ,
বক্ষতাপে উষ্ণতার স্পর্শ দিত সুরভিত অপূর্ব আস্বাদে।

শৈশবে একটি মুখ, আহা বড়ো, মায়াচ্ছন্ন করুণা মাখানো,
স্বচ্ছতার অন্ধকারে এলোমেলো, অপসৃত নক্ষত্র-হৃদয়ে ;
সূর্যাস্তের স্থির ম্লান প্রবঞ্চনা চতুর্দিকে বিস্ময়ে বিমূঢ়,
নির্বিকার প্রতিচ্ছবি, অন্তরালে সে আমার পবিত্র প্রতিমা।

অকূল সমুদ্রে আমি, সীমাহীন বিষণ্ণতা জলে কম্পমান,
আমার মায়ের মুখ, আহা বড়ো ভালো ছিল, একা আমি একা ॥

সুশীলকুমার গুপ্ত

জন্মের জিজ্ঞাসা

কেন তুমি জন্ম দিলে এ দারুণ দুঃসময়ে, পিতা ?
যাকে আঁকড়ে ধরতে চাই মুঠি থেকে সাপের আকারে
পিছলে যায়, নদী যেতে চায় উৎসে, সূর্য জ্বালে চিতা
আকাশ-শ্মশানে, ফুল হারায় ফলের ইচ্ছা ; মাঠ
ভোলে প্রার্থনার মন্ত্র—শস্যের, বৃষ্টির ; চারিধারে
ভাঙা সেতু, হাড়সার গাছ, চূর্ণ জলের কপাট ।

পিতা, কেন জন্ম দিলে এ ভীষণ কঠিন সংকটে ?
নীড় আছে, পাখি নেই ; আলোহারা আগুনের দাঁতে
শুধুই তাপের জ্বালা, সুপ্রসিদ্ধ চাঁদের করাতে
কর্তিত আঁধার ঝরে—গুঁড়ো গুঁড়ো ; পাহাড়ের ঘটে
ঝর্ণা নেই, এখানে সেখানে ছায়াভয়ের খোলস
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে, শব্দস্মৃতি নীরক্ত নীরস ।

যখন দিয়েছ জন্ম, আমাদের পালন করার
দায়িত্ব তোমার আছে অবশ্যই । পিতা, বলে দাও
কি ক'রে আনব ধ'রে যে আকাশ নক্ষত্র উধাও,
কোন অভিজ্ঞতা চ'ড়ে হব এই মরুভূমি পার ॥

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

বোধহয় সেকেণ্ড ক্লাশে তখন পড়ি, ক্লাশে পড়াচ্ছেন প্রবীণ মাস্টার ত্রিপুরা গুপ্ত মশায়। আমাদের একটি সহপাঠীকে হেড্‌মাস্টার আপিসে ডাকিয়ে পাঠালেন। সূর্য গুহরায়—নগেন্দ্র গুহরায়ের জ্যেঠতুত ভাই। 'সূর্যদা' আমাদের থেকে বয়সে বেশ বড়ো। কয়েক বৎসর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবাব পড়তে এসেছেন। একটু পাগলাটে, সৎ ঋজু স্বভাব, স্নেহপরায়ণ মানুষ। ফিরে এসে সূর্যদা উত্তেজনায় চাপা কণ্ঠে মাস্টার মশায়কে বললেন, "স্যর, আমাকে অ্যারেস্ট্ করছে, পুলিশ এসেছে।" বলে বিদায় নিলেন। ক্লাশটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মাস্টার মশায়ের বিষণ্ণ দৃষ্টি দুয়ারের বাইরে সুদূরে নিবদ্ধ হয়ে রইল। মিনিট কয় পরে দেখা গেল—নগেন্দ্র গুহ ও সূর্য গুহ দু'জনকে গোয়েন্দা দারোগা ও জনকয় পুলিশে ঘিরে স্কুল থেকে ভারিক্কী চালে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন বাকী সময় স্কুলটা থম্ থম্ করতে লাগল। চাপা উত্তেজনায় পরস্পরে কথা বলছে সবাই—কী ছাত্র কী শিক্ষক। আমরা অবশ্য পূর্বেই জানতাম—পুলিশ তাদের গ্রেফ্‌তার করবে—সেদিনই, স্কুলে। পুলিশের গোপন আয়োজনটা আমাদের কাছে গোপন ছিল না—বিস্ময়েরও নয়, তবে একটু গুপ্ত উত্তেজনার। কিন্তু আজও ভেবে পাই না একজন শিক্ষক ও ছাত্রকে স্কুল থেকে শত পাঁচেক ছাত্রের চোখের উপর দিয়ে ওভাবে গ্রেফ্‌তার করে নেবার কি প্রয়োজন ছিল? স্বচ্ছন্দেই বাড়িতে তাদের ধরা চলত। অবশ্য, তাতে ছাত্র-শিক্ষক সকলের মনে ভীতি-সঞ্চারের সুযোগ ঘটত না। ভয়ই তো 'অথরটির' বল। কিন্তু কি ফল হল? নগেন্দ্র গুহ সূর্য গুহ চার বৎসর অন্তরীণ থেকে ফিরে এলেন সসম্মানে। পাঁচ শত ছেলের মনের মধ্যে এই বোধটাই আরও জাগল—স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতেই হয়। জেলে, অন্তরীণে হাজার চার যুবকের তিন-চার বৎসর সেই ভারতরক্ষা আইনের যে বিভীষিকার পরীক্ষা চলল তাতে

সেই বোধ আরও দাগ কেটে বসল। তার শেষে ছ' বৎসর যেতে না-যেতেই স্বরাজের নামে সহস্র সহস্র মানুষ হল জেলের যাত্রী—ভীতিসঙ্কার সার্থকই হয়েছিল।

স্বদেশী দলে যাঁরা প্রধান স্বদেশীর সেই পর্বে এই চুনোপুঁটি তাদেরকে জানবার কথা নয়। গুপ্ত-সমিতির পক্ষে তাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রে তার পরিচয় সীমাবদ্ধ, না হলেই সর্বনাশ। ৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ৺নরেন্দ্র ঘোষ-চৌধুরীর নাম যে জেনে গিয়েছিলাম তাও অনিয়ম। তাঁরা তখনো সুদূর নীহারিকা। একই চক্রের যারা তারাই জানা হয়ে যায়, একই চক্রে ঘুরতে ঘুরতে চক্রান্তের যারা তারাও জানা হয়ে পড়ে। তবু অজানা থাকে কর্ম ও আয়োজন। যা জেনেছি তাও এখনকার বিচারে মনে হয় বলবার মতো নয়। কালের নিয়মেই আমার বন্ধুগোষ্ঠীতে পরবর্তী পর্বেও স্বদেশী থেকে আরও মিত্রলাভ হয়েছে—কিন্তু অন্য সূত্রেই বন্ধুলাভ হয়েছে বেশি। স্বদেশীতে যোগ না থাকলেও পরস্পরের প্রকৃতি, রুচি ও কর্মের নানা উদ্যোগে আয়োজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে যারা ওঠেন—আমার পরম বন্ধু চারুলাল মুখোপাধ্যায়, ৺উপেন সেন, ৺অতুতোষ সেনগুপ্ত প্রভৃতি, তাঁদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়,—পরবর্তী স্বদেশী পর্বের অসিত ঘোষ প্রভৃতিও যেমন পরেই স্মরণীয়। যারা সেদিনের জানা আজ তারা অনেকেই নেই; অনেকে জীবনের নিয়মে বিচ্ছিন্ন। নাম করলে চিনবে কে? এক ডজনও আর সেদিনের তেমন বন্ধু বেঁচে নেই। কিন্তু বিশ-ত্রিশ বৎসর কেন, চল্লিশ বৎসরের এ-পারেও হঠাৎ যদি দেখা হয় তাদের বার্ধক্য-স্তিমিত চোখে ফোটে আত্মীয়তার রশ্মিরেখা—একদিন আমরা একাত্ম ছিলাম। সে পরিচয়ের সূত্র কাল ছিন্ন করে দিয়েছে, কিন্তু মন তা জুড়ে নিতে পারে কিছুক্ষণের মতো।

উপেন রায়ের নামটা আগেই এসেছে, এখানেই আসুক।

যজ্ঞেশ্বরের মতোই উপেনও আমার স্বদেশীর অগ্রজ। আমাদের বাড়িতে তারা বরাবরই প্রায় বাড়ির ছেলে। বিশেষ করে মা-জ্যেঠাইমাদের কাছে। উপেন ছিল তার দিনে শহরের সেরা ছাত্র বলে গণ্য। ছাত্রজীবনে যতটা ভালো ছাত্র বলে তার নাম ততটা ভালো ফল সে করে নি। দোষটা কতকটা সেই উত্তেজনায়-ভরা বৎসরগুলির। অনেকে তখন 'ভবিষ্যৎ' সম্পূর্ণ খুইয়েছে। নিতান্ত ভালো ছেলে বলেই উপেনকে তা খোওয়াতে

দেওয়া হয় নি। তার চোখে ছিল প্রীতি-সরস কমনীয়তা, মনে কোমলতা। তার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো দিক বোধহয় তার জীবনপ্রীতি। সেই জীবনানন্দে কতকটা সচেতন কতকটা অচেতন ভাবে সে আপনাকে বরাবরই ঢেলে দিতে জানে। পিছনে ফিরে তাকায় না, তাকালে যে বিশেষ বিরাগ বোধ করে তাও নয়। স্বভাবটি কোমল, কিন্তু দুর্বল নয়। আরাম আয়েস ভালোবাসত, বিশেষ করে, আমার দাদার শিক্ষায় একটি সাহেবি ভাবের পোশাকপরিচ্ছদে। কিন্তু পরিশ্রমে সে কুণ্ঠিত ছিল না। বিলাসের প্রতি ছিল লোভ, কিন্তু ব্যসনে তেমনি বিরাগ। সহজ মুক্ত জীবন চেয়েছে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিশৃঙ্খলাও নয়। স্বাচ্ছন্দ্য কেন, সচ্ছলতা না হলেও তার দিন চলে না। মুক্ত হস্তের পরে তাই তাকে রিক্তহস্ত হতেও হয়, কিন্তু তাতে মনের ক্লেশ নেই। আর যত্নে উদ্যোগে স্বাচ্ছল্য সৌভাগ্য আয়ত্ত করতেও জানে। উপেন বরাবর আশাবাদী, হয়তো বা উচ্চাভিলাষীও। স্বদেশীর পর্বটা কাটতেই সেই আকাঙ্ক্ষাটাকে তার আর গৌণ মনে হল না। নিজের ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখত; প্রয়োজন ছিল সুযোগের। তা পেতেই সে এগিয়ে গেল। হাইকোর্টে সে প্রথমেই দাঁড়িয়ে গেছল। আসাম সরকারের ভালো চাকরি পেয়ে চলে না গেলে হয়তো কলকাতার নামকরা বড়ো উকীল হতো। নাম সে আসামেও শুনেছি করেছিল। সরকারী কর্মচারী হলেও উদ্যম উৎসাহ ছিল কাজে, দশজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও মধুর ব্যবহারের জন্যও সুনাম ছিল। সব থেকে বড়ো কথা—যুদ্ধের দিনে আসামে 'সাপ্লাই'র বহুবিধ ভারে থেকেও উপেন তার সাধুতাও খোয়ায় নি, কর্মক্ষমতাও বিনষ্ট হতে দেয় নি। শেষ দিকে উপেন এখানে এসে গেল—চন্দননগরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'চন্দননগরের লাটসাহেব'। সে-ই শেষ 'লাট'। চন্দননগর যখন চুঁচড়োর অন্তর্ভুক্ত হল তখন সেই চুক্তি, লেখাপড়া, ব্যবস্থাপত্র তার উদ্যোগেই হয়। পুরনো দিনের স্বদেশী কর্তাদের সঙ্গে ত্রিশ বৎসর পরে তখন (১৯৫০-এর পরে) আবার দেখাশুনা হল, সকলেই খুশি হন। উপেন খুশি—স্বদেশী দাদারা ক্ষমতা রাখেন। দাদারা খুশি—উপেন কৃতী। সত্য কথা, স্বদেশীর সেই জ্বালা-ধরা আঁচে পুড়ে মরবার মতো মানুষ উপেন নয়। অথচ মরতে গিয়েছিল। মরতেও পারত। তাতে কার লাভ হত? অন্তত তার প্রকৃতির বিরোধিতাই করা হত—যেমন আরও কারও পরে করা

হয়েছে। ভাগ্য ভালো, উপেন নিস্তার পেয়েছে। আর আমরাও একটু আনন্দময়, প্রীতিসরস বন্ধুর বন্ধুত্ব জীবন-ভর উপভোগ করতে পেরেছি।

ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী

চক্রে ও চক্রান্তে এমনি করে মিলে তখন থেকেই জীবনব্যাপী সৌহার্দ্যের সূচনা হয়েছে আরেকজনের সঙ্গে। ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী আমাদের থেকে বয়সে বড়ো, প্রায় দাদাদের বয়সী। দেখতে বেঁটে-খাটো, ফুটবল খেলায় তিনি ছিলেন সুপটু। স্বদেশী দলের ব'লে তাঁকে বুঝতে পারলেও সাক্ষাৎ পরিচয় হবার কারণ প্রথম ছিল না। একদিন হঠাৎ তাঁকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করলে, আর পাঠিয়ে দিলে কলকাতা, না, কৃষ্ণনগর। সেদিনকার সন্ধ্যায় আমাদের উকীলের বৈঠকখানার দু'চারজন মানী মক্কেলের বাক্যালাপটা আমার এখনো মনে আছে। গ্রামের লোকটি জিজ্ঞাসা করছেন : "ভগবান চৌধুরীর ছেলেটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কেন?" উত্তর দিচ্ছিলেন মামলা-অভিজ্ঞ শহর-ঘেঁষা মাতব্বর মানুষটি, "ওটা রাজদ্রোহী।"

প্রশ্নকর্তা : "রাজদ্রোহী! তা করেছে কি?"

উত্তরদাতা : "করতে হবে আবার কি? রাজদ্রোহী তো মহাপাপী। রাজদ্রোহের মতো পাপ আর হয় না।"

উত্তরদাতা অজ্ঞ নন, দৈবজ্ঞও নয়। তাই বছর পনেরো পরে তাঁর নিজের ছেলেও যে এইরূপ মহাপাপী বলে অমনি সন্দেহে গ্রেফ্‌তার হয়ে কয়েক বৎসরের মতো রাজবন্দী থাকবে, তা তাঁর কল্পনায়ও আসে নি। তখনো তাঁর মতো অনেক মানুষের এমনি ছিল ধারণা। সেবার ক্ষিতীশদা মাস দুই পরে মুক্তি পেয়ে এলেন। রাজদ্রোহ মহাপাপ। তবু কৃষ্ণনগর ডাকাতী মামলায় ক্ষিতীশ চৌধুরীকে জড়ানো গেল না। তখন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়। আরেকজনার সঙ্গেই তাঁর আলাপ হচ্ছিল, আমি শ্রোতা। মাস সাত-আট পরে অবশ্য আবার তাঁকে ধরল, আর সেবার তিনি যশোহরে কোথায় দীর্ঘ দিনের মতো অন্তরায়িত হয়ে রইলেন। যুদ্ধশেষে যখন মুক্তি পান তখন আমরা কলেজে পড়ি। তার পরে তিনিও রাখতেন আমার খবর। কিন্তু পরিচয়টা এ যুদ্ধান্তর পর্ব থেকেই ঘনিষ্ঠ—ন্যায়-অন্যায় সুদ্ধ আমাকে যিনি সকল সময়ে, সকল স্থানে আগলে রেখেছেন,—তাঁকে বুদ্ধিমান বা সুবিচারক বলব না; বলব পরমাত্মীয় অগ্রজ। তাঁর কাজের

বিচার-বিশ্লেষণ করাও আমার সাধ্যাতীত। সাক্ষাৎ হলে এবং প্রত্যক্ষেও তাঁকে পরিহাস, ব্যঙ্গ, এমন-কি বিদ্রূপ করা বরং আমার নিয়ম। তাতে করে যা হয়েছে: তা এই মতের মিল আমাদের অনেকটা তর্কে-বিতর্কে গড়ে উঠতে উঠতে আমরা চিনে ফেলেছি দু'জনার মনকেও। আর কারো মন যদি চেনা যায় তাহলে তাকে কেউ পর ভাবতে পারে?

অন্তরীণ থেকে ছাড়া পেয়ে ক্ষিতীশদা কাজকর্মে ও জীবিকার্জনে যখন লাগছেন (১৯১৯-২০) তখন দাদার ও আমাদের টাউন হল ও নদীর পাড়ের গল্প-আড্ডা-আলোচনায় হলেন নিত্য সঙ্গী; আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচকও। শীঘ্রই এসে গেল নন-কো-অপারেশন, আর তিনি নেমে পড়লেন কংগ্রেসের সংগঠনে। সে-ই আমি তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনলাম—বক্তৃতার শক্তি আছে। বক্তৃতা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তথ্যভরা। সেদিনের উত্তেজনার বাজারে তা নতুন। কারণ তথ্য তখন কে চায়? স্বরাজ কথাটাই মানুষকে মাতাল করেছে। তবে বক্তৃতাও তার কাজ নয়—তিনি কর্মী পুরুষ, সংগঠক। তাই উপরতলার নেতাদের নির্দেশ মাথায় নিয়ে ক্ষিতীশ চৌধুরী, মথুর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়জনেই তখন জেলা-কংগ্রেস গড়ে তোলেন। তারপর জেল, আর জেল-ফেরত আবার কংগ্রেস,—উত্তর বঙ্গের বন্যাত্রাণে ক্ষিতীশদা সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী। শেষে কংগ্রেসের ভাঙা হাটে তিনি এ জেলায় প্রায় একা রইলেন কংগ্রেস আগলে। সাপ্তাহিক পত্র 'দেশের বাণী' চালনা, লেখা, ছাপানো, টাকা যোগাড় করা, প্রেস চালানো—সবই তাঁর দায়। কলম চালাতে আমার ডাক পড়ত বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট তাঁর—জেল, জরিমানাও তাঁকে আমার জন্য ভুগ্‌তে হয়। যাই হোক, কর্মী মানুষ, বক্তৃতাও করতেন, কিন্তু হয়ে উঠলেন দৃঢ়ভাষী সম্পাদক। কলমটা খুব সরু নয়, কিন্তু জোর প্রচুর, তথ্যের ও মনুষ্যত্বের। বছরের পর বছর ও-রকম হিন্দু-মুসলমান মনোভঙ্গের দিনেও জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা ও প্রগতিবাদের পক্ষে কলম চালাতে-চালাতে বার বার জেলে গিয়েছেন। ফিরে এসে কাজ তুলে নিয়েছেন; আবার ফিরে জেলে গিয়েছেন। কংগ্রেস বলতেই নোয়াখালিতে ক্ষিতীশ চৌধুরী। আমাদের সাহিত্যশিল্প-হুল্লোরবাজদের সঙ্গে পা মিলাতে মিলাতে, পুরনো রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সইতে, সইতে তিনি এসে পৌছলেন একেবারে নোয়াখালির বিষম দাঙ্গার মধ্যে (১৯৪৬), একমাত্র সেদিন আমি তাঁকে

দেখেছি আজীবনের স্বদেশী আদর্শের ব্যর্থতায় প্রায় দিগ্‌ভ্রান্ত, বিড়ম্বনায় উদ্বেল। দেশ বিভাগের পরে তিনি পাকিস্তানের পাকিস্তানী—স্বাধীন দেশের মানুষ, এই তাঁর সান্ত্বনা।

আজ তো ক্ষিতীশ চৌধুরী আমাদের 'ভারত' রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে। আমিও নোয়াখালি থেকে নির্বাসিত। ক্ষিতীশদার সঙ্গে আমার বারে বারে সাক্ষাৎ এখনো তবু অনিবার্য। পলিটিক্‌স্‌-বর্জিত মানুষ আমরা একজনও নই, তা সুদ্ধই আমরা আরও কিছু। অচ্ছেদ্য, তা বলেছি আগেই। হয়তো আরও বলতাম—স্বদেশীর চক্রে পড়ে অনেকে তাদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ বলি দিয়েছিলেন। ক্ষিতীশ চৌধুরীও তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আরও যা বলি দিয়েছেন, তা নিজেও হয়তো জানেন না।

কুলীন কায়স্থ বংশ তাঁদের—ইদিলপুরের (ফরিদপুর) চৌধুরী। এ শহরেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তালুক আছে, মহাজনী চলে, মামলা-মোকদ্দমায়ও সর্বদাই প্রস্তুত। অতিথিপরায়ণ, গো-ব্রাহ্মণেরও সেবানিষ্ঠ। কিন্তু দুর্ধর্ষ, বৈষয়িক পরিবার। শুপারি-নারিকেলে ঘেরা মস্ত বড়ো বাড়িটায় না আছে এমন ফলের গাছ নেই। ক্ষিতীশদার সে সবের প্রতিও সযত্ন দৃষ্টি ছিল। গো-সেবা তো তাঁর নিজে না করলেই নয়। বিকালে যেখানেই থাকুন সে সময়ে ছুটে যাবেন বাসায়—গোরুদুটোকে খাওয়াতে হবে। বাড়িতে দেখতাম, কখনো কোনো গাছের যত্ন করছেন; মাটি কুবিয়ে কখনো তৈরি করছেন শাক-সব্জির বাগান। পরিশ্রম না করে থাকতে পারেন না। গৃহের কাজকর্ম ও বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁরও তীক্ষ্ণ আকর্ষণ। স্বদেশীর পাল্লায় পড়ে বাড়িঘরেও তবু প্রায়ই থাকতে পান নি; বিয়ে তো করেনই নি। পরিণত বয়সে দেখেছি—ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিয়ে দিয়েছেন, তাদের ছেলেপিলে হয়েছে, কোলে-পিঠে মানুষ করে 'দাদু'র পরম তৃপ্তি। নিজের সকল আরাম তুচ্ছ করে বাড়িঘর, বিষয়-আশয় ভাইপো-বউমাদের জন্য প্রাণপণে রক্ষণ করতে, বৃদ্ধি করতে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। সেদিকে তাঁর যত্ন, দৃঢ়তা, বুদ্ধি-কৌশল দেখলে বুঝতে পারা যায় চৌধুরী বংশের সেই বিষয়বুদ্ধি, সংসারধর্ম ও মায়ামমতার দুর্বার আকর্ষণ এক পাশে সরিয়ে রেখে আযৌবন এ মানুষ স্বদেশীর পথে চলে কেমন করে দেশের কর্মীরূপে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন।

দেশের কর্মী বলতে আমার চোখে যে-মূর্তি সর্বাগ্রে ভেসে ওঠে তা এই মানুষের—নোয়াখালির ক্ষিতীশ চৌধুরীর। তারপরে অমনি অন্য দু'চারজনার।

তাঁরা 'নেতা' নন—নেতা হন নি, নেতা তৈরি করেছেন। নিজেদের কাজ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, আনুগত্য দিয়ে। স্বদেশীর দলেও ক্ষিতীশদা নেতৃত্ব করেন নি—কংগ্রেসের সংগঠনেও না। অথচ, নোয়াখালি জেলায় কংগ্রেস বলতে ক্ষিতীশ চৌধুরী—অন্তত তখন যখন উদ্দীপনায় ভাঁটা লাগত, নেতারা নিজ নিজ কর্মে ফিরে যেতেন। তখনো তিনি রথী নন, সেই ভাঙা চাকার রথটাকে চালিয়ে নিয়ে যান, আবার 'নেতারা' কবে রথস্থ হবেন। যে মানুষের অমন বৈষয়িক বুদ্ধি, বিন্দুমাত্র স্বার্থচিন্তা, আত্মপরায়ণতা তাঁর নেই দেশের কাজে। স্বদেশীর তাড়নায় স্কুলের পড়া তাঁর শেষ হয় নি, কলেজের সীমায়ও যেতে পান নি। কিন্তু স্বদেশের প্রয়োজনেই লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষায়, নানাদিকে এমন ভাবে তিনি আপনাকে গড়ে তুলেছেন যে, তা স্কুল-কলেজের কৃতীদের দুরায়ত্ত। মনে হয়, স্বদেশীর তাড়নাই এই মানুষকে করেছে নিঃস্বার্থ কর্মী ও তথ্যনিষ্ঠ ছাত্র, জনপ্রিয় বক্তা, সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক-সম্পাদক। আর, 'নেতা' নয়, 'কর্মী'। পরিবারগত মহাজনী তালুকদারীর স্বার্থ উড়িয়ে কেমন করে তিনি কৃষকের খাতকের দলের মানুষ হয়ে উঠতে পারলেন, কেমন করে সমাজসংস্কারের সকল কর্মে তিনি এগিয়ে গেলেন, শুধু পলিটিক্সের নয়, মানুষের অধিকারে মানুষকে প্রতিষ্ঠ করাই হয়ে উঠল তাঁর উদ্দেশ্য,—তা অবশ্য পরেকার কথা, কিন্তু তাও কি স্বদেশীরই গুণ নয়, মানুষের অধিকারের এই সাধনা? অথচ সকলের পক্ষে 'স্বদেশী' এই আত্মবিকাশের পথ হয় নি, তা তো জানি; কারও কারও স্বার্থপরতার, আত্মম্ভরিতার, এমন-কি, দুষ্প্রবৃত্তির পথও হয়েছে।

তেমনি একজনার সঙ্গে ক্ষিতীশদা'র একটা সংঘর্ষের কথা বললে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হবে। সাহস ছিল ক্ষিতীশদা'র স্বভাবগত, হয়তো বংশগতও। স্বদেশীতে সে-সাহসের সার্থকতাও হয়েছিল; কিন্তু সে সব অনেক কথা। যাঁরা তাঁর সাহসের তখন প্রযোজনা করেছেন তাঁদের একজনার কথা বলছি। দুর্ধর্ষ বলে তাঁরও ছিল খ্যাতি। কিন্তু পরজীবনে দেখেছিলাম—কোনো দুষ্কর্ম তাঁর অসাধ্য নয়; তা বাদও যায় না। তেমনি একটা অসৎ কর্মে ক্ষিতীশদা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। লোকটা সহকর্মীদের বললে, "ক্ষিতীশকে জুতিয়ে তাড়া।" একবার শহরে সে আসতেই ক্ষিতীশদা তাঁকে চৌমাথায় ধরলেন, "শোন, এ শহরে মানুষের সর্বনাশ করতে তুই আসতে পারবি না।"

ক্ষিতীশ তাকে 'আপনি' না বলে 'তুই' বলে কথা বলতে পারে। সে হঠাৎ একেবারে হতভম্ব, বললে, "কেন, তোমার হুকুম?" নিজের দর্প রাখতে হবে।

ক্ষিতীশদা বললেন, "হ্যাঁ, তুই তো আমাকে জুতিয়ে তাড়াবি, না? আমি বলছি—এখানে আর মুখ দেখাস না। ভালোয় ভালোয় যা।"

তখনো সে বলে, "তুই কে? কি করবি?"

"কী করি—ত্বাখ তবে।" পায়ের চটি খুলে নিয়ে ক্ষিতীশ চৌধুরী সেখানেই তাকে দু-গালে দু-ঘা বসিয়ে বললেন, "কী করলাম, দেখলি? এখন যা।"

শহরের চৌমাথা। লোক জমে গিয়েছে। সকলে হতবাক। ক্ষিতীশ চৌধুরী কাকে করছে এ অপমান! অমন ভয়ানক দুর্দান্ত দুর্বৃত্তকে! লোকটা তখনো চেঁচামেচি করছে—"ক্ষিতীশ আমাকে অপমান করলে, দেখলে তোমরা—বিনা কারণে। এর শোধ পাবে" ইত্যাদি।

ক্ষিতীশ চৌধুরী নিকটেই নিজের কাজে গিয়ে ঘরে বসলেন। আমি তখন ছিলাম না। পরে তো শুনে সন্ত্রস্ত। ও লোকের অসাধ্য তো কিছু নেই। ক্ষিতীশদা' এ কী করলেন। ক্ষিতীশদা' শান্তভাবে বললেন, "ওর সে-মুখ গিয়েছে—স্বদেশী-চরিত্র হারানোর সঙ্গেই। দেখবি—আর আসবে না এখানে।" সত্যই লোকটি আর সে শহরে আসে নি তারপরে। শহরও জুড়োলো। তারই বা সেই সাহস গেল কোথায়। আর ক্ষিতীশ চৌধুরীরই বা সাহস অক্ষুণ্ণ রইল কোন্ জোরে? যে আগুনে একজনকে শুদ্ধ করেছে, তাতেই আর জনের বিবেক পুড়ে শেষ হয়েছে—সাহসও ভস্মীভূত।

কিন্তু সাহসই ক্ষিতীশদা'র একমাত্র স্বদেশী গুণ নয়। আমার মনে হয়—তাঁর স্বদেশীগুণ সহকর্মীদের জন্য দরদ। তাঁদের তো অভাবের অভাব নেই; ক্ষিতীশদা'রও নিজের উপার্জন প্রায় শূন্য। টাকাকড়ির জোরে বেশি এগুনো অসাধ্য, তবু সহকর্মীদের বোঝা যতটা পারেন মাথা পেতে নিয়েছেন। বড়োদের কথা বলা চলবে না। কিন্তু আমাদের মতো অনুজদের কথা বলতে বাধা কি? আমরা তো দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরই কাছে পেয়েছি আশ্রয়, এবং প্রশ্রয়, আতিথেয়তা ও স্নেহমমতা, অন্যায়ের জন্য অগ্রজের তিরস্কারের সঙ্গে তাঁর কল্যাণহস্তের সকল সহায়তা।

'কালীদা'

দেশের কর্মী আরেক জনকেও আমি দেখেছি—একটু বয়ঃকনিষ্ঠ। আমার থেকে বছর খানেকের ছোট বোধ হয় কালী—জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কালীদা' বলেই সর্বত্র সে পরিচিত। হোক আমার ছোট, আমিও না হয় কালীকে এখানে বলি, "কালীদা'।" না হলে কেউ তাকে চিনতেই পারবে না—মানুষটাও ঢাকা পড়ে যাবে। বাদামতলায় রাস্তার ওপারেই কালীদেরও বাসাবাড়ি। বাবা ছিলেন সেদিনের মোক্তার। সদালাপী, মিষ্টভাষী, সদাব্রত মানুষ। বাসাটা বড়ো, প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। প্রায় ফরিদপুর-বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণদের একটা খোলা ধর্মশালা। খাও-দাও, তাস খেলো, তামাক পোড়াও—সম্ভব মতো রোজগারপত্র কর। নিজেরা ক'ভাই কালীরা ছোট বড়ো। একজন খুড়তুতো ভাইও ছিল, ভুবন প্রায় তার বয়সের। বড়ো ভাই বঙ্কিমদা' ছিলেন দাদাদের বন্ধু। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বৈঠকখানায় দুপুরে খবরের কাগজ থেকে তাসের আড্ডায় আমিও তাদের শিক্ষানবিশী করতাম। কালীকে তার বাবা দিয়েছিলেন প্রথমে ন্যাশনাল স্কুলে পড়তে। ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেলে সে এসে ভর্তি হয় আমাদের জুবিলী স্কুলে—আমার দু-ক্লাশ নিচে। এক-আধটা বছর পিছনে পড়ে যায়। তার কাছেই আমি পেয়েছিলাম ন্যাশনাল স্কুলের তাদের পাঠ্য বই-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', আরও পরে 'স্বদেশী সমাজ' ও রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। এমন মানুষের পক্ষে তাই আমাদের স্বদেশী বই-এর ভাণ্ডারী হয়ে ওঠাও অনিবার্য ছিল। মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্রেরও রক্ষাভার চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করতাম না। তাদের ক'ভাই'র সঙ্গেই আমার সমভাবে খেলাধুলা, গল্পগুজব চলে। যজ্ঞেশ্বরেরা কলেজে চলে গেলে বিশেষ করে সেখানেই হয় আমার এ পাড়ার আসর। তারপর আমিও চলে যাই কলেজে। আর বৎসর দুই পরে কালী কলেজ (কুমিল্লাতে) যেতেই এসে গেল নন-কো-অপারেশন। কলেজ ছাড়তে তার দেরী হল না। জেলে যেতেও। ছোট ভাই শ্যাম (অতুল) ছাত্র ভালো। যতদূর মনে পড়ে রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী মহাশয়ের আমন্ত্রণেই সে-ও (? ১৯২২-এ) চলে যায় সেখানে কংগ্রেসের কাজে একদল ভলান্টিয়ার নিয়ে। একটা বৎসর কাটিয়ে এসে সে আবার কলেজে ঢোকে। নিজের ক্ষতি শুধরে পাশ করে, ক্রমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশী ভোলে নি, সমাজ-সংসারও বাদ দেয় নি। কিন্তু কালীর তা হয়ে উঠল না।

বারকয় কলেজেও যোগ দিল—কংগ্রেসে করবার মতো তখন সর্বক্ষণের কাজ নেই। কিন্তু না-করবার মতো কাজ অনেক—স্বদেশী গল্প আলোচনা সব সময়ে আছে। কলেজের একপাল ছেলের সে 'কালীদা'। কেউ মিষ্টি খেতে হলে তাকে ডেকে খাওয়ায়। কেউ তাকেই খাওয়াতে বাধ্য করে। মোট কথা, কেউ তাকে ছাড়ে না। বৎসরের পর বৎসর এ অবস্থা। আবার দশজনের কাজও তো আছে। তারপর, দশজন যখন জানে 'কালীকে পাওয়া যাবে বললেই', তখন সাধ্য কী কালীর পড়াশুনার সময় হয়। ওদিকে ক্ষিতীশদা'র সঙ্গে কংগ্রেস ও সংবাদপত্রের কাজও আছে। আমাদের বাড়িতেই কি তার কাজ কম? প্রতিদিন সকালে কালী আসবে, চা তার জন্য তৈরি রাখবেন মা। কালী কখন আসবে ঠিক নেই। কিন্তু আসতেই হবে কালীরও। চা খাওয়াটাও তো কাজ। মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে গল্প করাও চাই। মিষ্টি খাওয়াও শহরে আর-একটা কাজ বটে। একবার সে আমাদের কলকাতায় লিখলে, "খুব চা খাচ্ছি আর মিষ্টিও। চা-টা একটু কালচারড্, মিষ্টিটা ভাল্গার!" সে কথাটা আমাদের মধ্যে চল্‌তি হয়ে গেল। অতুতোষবাবুই বোধহয় তা স্থির করেন, "কালীদা' (অনেক ছোট সে অতুতোষবাবুর), এসো একটু কালচার করা যাক।" কালী সলজ্জ আনন্দে বলত—"কোথায়?" চা-পান হয়। কালীকে এখনো আমার দাদা দেখা হলেই বলেন, "আয়, বোস্, একটু কালচার করবি।" চা খাওয়া মানেই আমাদের মধ্যে, ওর আবিষ্কৃত পরিভাষায়, কালচার করা। এমনি করে কালীর বছর গিয়েছে। সকলের কাজই করেছে নিজের কাজ ছাড়া। অবশ্য যথানিয়মে কংগ্রেসের কাজ করেছে, বড়দের হুকুম খেটেছে। গ্রামে-গ্রামে ফিরেছে, স্নানাহারের কোনো ঠিক-ঠিকানা রাখে নি। আর জেলেও যথানিয়মে বার বার গিয়েছে। ছোট ভাইদের বিয়ে হল, সংসার হল, কাকা থেকে জ্যেঠামশায় হল কালী। মহা আনন্দ। নিজের অবশ্য সময় হয় নি; সাধ থাকলেও সাধ্য কই? দেশটা স্বাধীন হয় নি যে। দেশ স্বাধীন হতে-হতে অবশ্য কালীও আমার মতো প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছুল। বিপ্লবের গুপ্ত কাজে কালী আর (১৯১৭-২১-এর পরে) জড়িয়ে পড়ে নি। কংগ্রেসের কাজে জড়িয়ে থেকেছে; কখনো অভয়-আশ্রমের পাশে চলেছে; কখনো আবার নিজের খাতে ফিরে এসেছে। বরাবরই সে কংগ্রেসম্যান্। শেষ দিকে সম্ভবত সোশ্যালিস্ট, এখন বোধহয় তাও নয়। আসলে সে

বরাবরই এক জিনিস : 'কালীদা'।—অর্থাৎ কংগ্রেস করে ; দশজনের হুকুম খাটে ; নিজের কাজ কী তা জানে না ; সংসারের, বাড়িঘরের কাজও দশজনের কাজের জন্ত করবার মতো অবকাশ পায় না। নিজের বাড়িতে সে ভাইদেরও আদরের দাদা, তবু অনেক সময়েই বাড়ির বাইরে কাটায় অনুজদের পীড়াপিড়িতে। 'কালীদা, কোথায় যাবেন?—থাকুন আমার কাছে'—বলত হয়তো ক্ষিতিনাথ দালাল। কিংবা, অরুণ রায় ব্যারিস্টার ; আর অরুণের ভাইরা। আমি অবশ্য কোনো দিন বলি না। আমার বাড়ি, তার নিজের ভাইদের বাড়ির মতো, তার কাছে হাতের পাঁচ। সে শুধু আমার জন্য নয়, আমার মায়ের দাবিতে, বাবার দাবিতে। কালী মাকে নিয়ে দরকার মতো তীর্থ করাবে, কুটুম্বগৃহে নিয়ে যাবে, বাবাকেও করবে যত্ন। তাঁরা আজ নেই। কিন্তু আমি জানি দু'জন লোক আমার মা-বাবার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালন করেছেন—আমি নই ;—একজন প্রিন্সিপল্ অনিল বাঁড়ুজ্জের পিতা ৺সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন বহু-জেনারেশন-এর 'কালীদা'। তবে শুধু আমার মা নয়, মাতৃহীন কালী দেশকেও মা-ই বুঝেছে।

ধরাবাঁধা, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল কর্ম সে করে নি। দশজনের কাজে নিজের কাজ যেমন ভুলে যে, তেমনি কংগ্রেসের দায়িত্বও মাঝে মাঝে করে উঠতে পারত না। তিরস্কার সইত, কিন্তু আবার কাজে লাগত—দেশকে ছাড়ে নি ; দেশের যে-অংশটা দশজনকে নিয়ে—শুধু পলিটিক্স্ নিয়ে নয়, কংগ্রেস নিয়েও নয়—তাই তার দেশ। এই দশজনের 'কালীদাদের' না পেলে কি ভারতবর্ষের স্বদেশী ইতিহাস এমন বিচিত্র, এমন সরস, এমন সার্থক হতে পারত? ইতিহাস হত না, জিওম্যাট্রি হত।

কালীই একমাত্র বন্ধু, যাকে আমি স্বদেশী দলে এনেছিলাম।

(ক্রমশ)

অজয় গুপ্ত

কিংবদন্তীর নূপুর

যেন নোংরা বলে, বড়ো রাস্তাটা, এই গলিটাকে তার আলো, সাজানো-গোছানো লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া এইসব থেকে গলাধাক্কা দিয়ে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। মুখোমুখী মানুষ চেনা কষ্ট। ময়লার পাহাড় থাকে। কখনো কুকুর কখনো ভিখারী সেই ময়লা ঘেঁটে গন্ধ ছড়ায়। দুপাশে কালি-পড়া বালি-খসা ঘিঞ্জি বাড়ি। বসে দাঁড়িয়ে তার গায়েই তাপউত্তাপহীন বেহায়া মানুষ পেচ্ছাব করে। এসবের মধ্য দিয়ে লম্বা গলিটা অনেক দূর এগিয়েছে, যেন একটা কুষ্ঠরোগীর হাত।

রুমালে নাক টিপে এবং চোখের জল চেপে প্রায় পুরো গলিটা পেরিয়ে এসে রুমিকে বাড়ি ঢুকতে হয়। পা টিপে খুব সাবধানে হাঁটে ও। একে পথ উঁচু-নিচু। তার উপর কফ বা আরও বিশ্রী ময়লা সব ছড়ানো থাকে। চটির সঙ্গে জড়িয়ে কতদিন পায়ে উঠে পড়েছে। অতিকষ্টে বমি চেপে বাড়ি আসতে হয়েছে। পায়ের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঘষে ঘষে ধুয়ে মুছে পাউডার ছড়িয়েও মনে হয় গন্ধ গেল না। হয়তো কোনো ভিখারীর বা কদাকার অসুখওয়ালা মানুষের কফ ছিল ওটা!

এই পচা, অসভ্য গলিটার জন্যই রুমি আজ পর্যন্ত তার কোনো বন্ধুকে বাড়িতে আনতে পারে নি। তপু, মীনা, রমা ওদের প্রত্যেকের বাড়িতে রুমি গেছে। আলোয় ফর্সা কি সুন্দর তকতকে ওদের বাড়ি যাবার সে-সব রাস্তা।

শুধু রাস্তা কেন, রুমিদের ঘরটাই বা কি! পুরনো। জলো মেঝে। দেওয়াল ফোস্কার মতো জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে। একটু চাপ দিলেই ঝুরঝুর করে চুন-বালি খসে পড়ে। উইয়ে মাটি তোলে। ইঁদুরের গর্ত আছে। কড়িকাঠ থেকে দিনরাত ঘুণের শব্দ। পিন্‌পিনে মশা। সূর্যের আলো তিনতলা পাশের বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে থাকে।

রুমি সরাসরি বাথরুমে ঢুকে গেল। পায়ে হাওয়াই চটি। ঝপ্‌ঝপ্‌ চার মগ জল ঢেলে বেরিয়ে এল।

ফুল-তোলা একটা দামী কাপ-ডিস আছে। মা খুব যত্নে ওটাকে তুলে রেখেছে। অতিথি এলে নামানো হয়। রুমি মনে করে, ওর শরীরটা সেই কাপ-ডিসের মতো। তেমনি যত্নে, ধুয়ে মুছে আদরে তুলে রেখে দেওয়ার মতো জিনিস। যেন ময়লা না পড়ে। যেন ভেঙে না যায়।

ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, চুল কিছু এলোমেলো হয়েছে। আজ উল্টোপাল্টা হাওয়া ছিল। পাফ্‌টা হালকা করে মুখে বুলিয়ে নিল। টিপ ঠিক আছে। আঙুল দিয়ে ভ্রূ ঠিক করল—প্রান্ত তুলির মতো ছুঁচলো। ডান গালের ব্রনটা এখনো গেল না। দিদিকে একটা লোশন আনতে বলে হয়রাণ হয়ে গেছে। 'আপনি সেরে যাবে।' তা হয়তো গেল। কিন্তু দাগ তো থেকে যেতে পারে! বিশ্রী! এসব কেন যে দিদি বোঝে না। অকারণে দাঁত জিব দেখল। ঠোঁটটা একটু শুকনো লাগছে। জিব বুলিয়ে নিল।

এইসব যখন করছিল, রুমির তখন মনে হচ্ছিল একটা নূপুরের শব্দ ঝম্‌ঝম্‌ করে তার মধ্যে নামছে। শব্দটা সে খুব স্পষ্ট শুনতে পায়। চমৎকার সুরেলা—নাচতে ইচ্ছে করে। পা থেকে সারা শরীরে একটা ছোট্ট ঢেউ তুলে দিয়ে সরে আসতে গিয়ে আয়নায় বাবার ছায়া দেখল।

রুমির মনে পড়ে গেল, মা আজ বলেছিল বেড়াতে যাবার সময় বাবাকে নিয়ে যেতে। সে রাজী হয় নি। কেমন করে হবে। বাবা সুইমিং পুলে কিছুতেই যেতে চান না। বলেন, 'ফাঁকা জায়গা, পুকুর, ওখানে হাওয়া বেশি। ঠাণ্ডা লেগে যাবে!' অথচ সুইমিং পুলে না গেলে রথীনদাকে কী করে দেখা যেতে পারে!

জানালার ধারে পা গুটিয়ে কোলে হাত রেখে বাবা বসেছিলেন। এগিয়ে এসে বাবার একটা হাত রুমি নিজের হাতে তুলে নিল।

'তুমি রাগ করেছ বাবা?' হাতের চামড়া কুঁচ্‌কে গেছে—খুব খস্‌খসে।

'না, রাগ করব কেন।'

'তোমার হাতের চামড়া কেমন কুঁচকে গেছে, দেখ বাবা।'

'বুড়ো হয়েছি না—এখনো কি তোর মতো নরম থাকবে নাকি?'

'হাতি!'

'বেড়াবার কথা আমি এমনি বলেছিলাম—তোর মার তাগাদায়।'

'মার তো সব ওইরকম। দেখে একটু হাঁটলে তুমি হাঁপিয়ে পড়—তবু।'

লীলার চিনতে কষ্ট হয় নি। ভয় হচ্ছিল, হয়তো সুশান্ত ওকে চিনতে পারে নি। তাই দ্বিতীয়বারের পর আর তাকাতে পারল না। মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্ করে ফুটে রইল। কিন্তু হেঁটে যাচ্ছিল ঠিক।

'চিনতে পার?' হঠাৎ শুনে লীলা মুখ তুলল। সুশান্তই এগিয়ে এসেছে।

দশটা-পাঁচটার পর চোখ গর্তে, ঠোঁট শুক্‌নো, তবু তার মধ্যে সুতোর মতো সরু একটা হাসি কী ভাবে জড়িয়ে গেল!

জবাব পেয়ে সুশান্ত উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কতদিন পরে দেখা।'

'কবে এলে?' একপাশে সরে এসে বুকের কাপড় অযথা টেনে লীলা বলল।

'এই তো এ মাসেই। বদলী হয়ে এলাম।'

'বদলী!'

'হ্যাঁ, যাদবপুর ব্রাঞ্চে।'

'পাটনা কেমন লাগল?'

'যাচ্ছেতাই।'

'বল কি! রাজলক্ষ্মীর দেশ না।'

'আমার রাজলক্ষ্মীকে যে আমি কলকাতায় ফেলে গেছি।' সুশান্ত হেসে ফেলল। 'তোমার কি তাড়া আছে?'

'টিউশনি যাচ্ছি।'

'ও।' থেমে গিয়ে সুশান্ত একটু সময় ভাবল, 'তাহলে কাল—'

'আচ্ছা।'

'জায়গাটা ভুলে যাও নি তো?'

মাথা নামিয়ে লীলা ঘাড় নাড়ল,—না সে ভোলে নি।

'ওইখানেই থেকো তাহলে।'

আটটা বেজে গেলে পরিশ্রমে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে লীলা ফেরে। ঘরে ঢুকেই মাদুরটা বিছিয়ে, শুয়ে একটু গড়াগড়ি করে উঠে তারপর মুখহাত ধোয়।

কাপড় বদলায়। রান্নাঘরে গিয়ে মার কাছ থেকে এককাপ চা নিয়ে এসে রুমির পাশে বসে। দিদি এলে রুমি বই সরিয়ে রাখে।

'জানো দিদি, আজ না মীনার সঙ্গে সুইমিং পুলে বেড়াতে গেছিলাম।'

'ও।'

'রথীনদা না কি অদ্ভুত সুন্দর ডাইভ দেয়!'

'রথীনদা কে?'

'তুমি চিনবে না। আমার বন্ধু আছে গীতা—তার দাদা। শূন্যে কি সুন্দর ডিগবাজী খায়, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে!'

'তাই নাকি?'

'কী চমৎকার যে দেখায়—খুব ফর্সা তো। আমার খুব ভালো লাগে।'

'ভালোই তো।' লীলা হাসল।

'ধ্যাৎ, তুমি ভারি অসভ্য তো—যাও এখন আমি পড়ব।' রুমি মনে মনে একেবারে ঠিক করে ফেলল, পাশ করে সে রথীনদাদের কলেজেই ভর্তি হবে।

খালি কাপটা ধুয়ে লীলা রান্নাঘরে রেখে এল।

'রুমি, সেই এইডের টাকার জন্য যে-দরখাস্ত দিলাম, তার কি হল রে!'

রুমি চকিতে একবার দিদির মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

'কি রে কোনো নোটিশ বেরোয় নি? কদিন পরেই তো ফী জমা দিতে হবে।'

রুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে লীলাকে জড়িয়ে ধরল।

'একি রে—ছাড়—'

'তোমাকে একটা কথা বলব দিদি—বল, রাগ করবে না।'

'কি?'

'আমি না—সেই দরখাস্তটা জমা দেই নি।'

'জমা দিস নি! সে কি!'

'ভীষণ লজ্জা করল। ক্লাশের সবাই যে তবে জেনে যাবে আমি রেফিউজী।'

'ও।'

'তুমি রাগ করলে না তো দিদি?'

'না। তুই পড়।'

ঘরে স্পিরিট থাকে না। চুনেই ছবি পরিষ্কার হল। তিন বছর আগে বাবা মা রুমি আর লীলা। দিনে দিনে রুমিটা আরো সুন্দর হয়ে উঠছে। ছবিতে লীলার চোখ আর ভুরু সবচেয়ে ভালো এসেছে। এখন লীলার মুখে ওই দীর্ঘ ভুরু, গভীর চোখ মানায় না। ছবিতে লীলার কানে একটা মাকড়ি আছে। এখন ওটা রুমি পরে।...একদিন আকাশ মেঘলা থাকায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আলো এলে সুশান্ত এই ছবি তুলেছিল।

ছবি জায়গামতো ঝুলিয়ে রেখে লীলা রুমিকে বলল, 'ওই দেওয়ালে দেখ উইয়ে কতখানি লম্বা মাটি তুলেছে—ঝেড়ে ফেলে দে। আমার আপিসের বেলা হল।'

'পারি না বাপু।' রুমি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই তো সেদিন পরিষ্কার করলাম। যা একখানা পচা বাড়ি ভাড়া করেছ না তুমি!'

'তিরিশ টাকায় তোকে রাজবাড়ি কে দেবে?'

লীলা তারপর মার কাছ থেকে একটা লবঙ্গ চেয়ে নিয়ে আপিস চলে গেল।

মা বলল, 'দুর্গা দুর্গা!'

বাবা সেই পুরনো অভ্যেসে বললেন, 'দেখে রাস্তা পার হোস।'

'দেরী হল?'

'চটিটা পট করে ছিঁড়ে গেল। মুচি পেলাম না—পা টেনে টেনে কি হাঁটা যায়?'

'কাল না একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে!'

'ভুল?' লীলা বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ, জিগ্যেসই করা হয় নি তুমি কেমন আছ?'

'আমিও তো জিগ্যেস করি নি।'

'ওই তো একটা মুচি যাচ্ছে।'

'একটু ডাক না। বাঁচা গেল।'

সর্বাঙ্গে অপারেশনের দাগভর্তি চটিটা পা থেকে খুলে দিয়ে লীলা সুশান্তর দিকে ফিরল, 'এমন লজ্জা করে না—জুতো খুলে রেখে ছাত্রীর ঘরে ঢুকতে হয়—বড়লোক—কী রকম সব ভালো ভালো জুতো। তার মধ্যে—'

'তোমার হাতে ওটা কি?' লীলার হাতে একটা মোড়ক ছিল, দেখে সুশান্ত বলল।

'দেখ না—।' লীলা মোড়কটা খুলল। সুশান্ত দেখল, শুকনো গাছ। রাস্তায় বিক্রী হয়। জলে রেখে দিলে সবুজ হয়ে যায়। 'বাবা নিয়ে যেতে বলেছিলেন, কি নাকি ওষুধ হবে।'

'ও।' বলে সুশান্ত চুপ করে গেল।

এইখানে গঙ্গার পাড়ের বেঞ্চিতে ওরা আবার বসল। সে যে কতদিন পরে তা স্মৃতি খুঁচিয়ে মনে করতে হয়।

মুচিটা চলে গেলে সুশান্ত লীলার একটা হাত ওর হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

'তোমার আঙুলগুলো কী অসম্ভব শুকিয়ে গেছে।'

লীলাও দেখছিল, সুশান্তর হাতের উপর ওর আঙুলগুলো পাঁচখণ্ড পাটকাঠির মতো। তবু বলল, 'তুমিই বা এমন কী মোটা হয়েছ!'

সে কথায় কান না দিয়ে সুশান্ত বলল, 'তোমার মুখও কত শুকিয়ে গেছে!'

তাও লীলা জানে। এখনকার মুখে তার চোখ, ভুরু, নাক এইসব বেমানান খুব।

'কী চমৎকার রঙ ছিল তোমার। তাকে কি করে ঘষে ঘষে তুলে ফেললে বল তো!' এই কথা বলে সুশান্ত লীলার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইল।

'কী করে থাকবে বল। চাকরি টিউশনি বিশ্রাম পাই না।'

ওদের দুজনের চোখই দুজনের মুখে রাখা ছিল। তারপর লীলা চোখ নামাল। তার একটা ভয় চলে গেল। যা ভেবেছিল তা নয়। সে এখনো খুশি হতে পারে, লজ্জিত হতে পারে। ভেবেছিল, এসব বুঝি তার শরীরের মতোই তার মধ্যে শুকিয়ে গেছে।

'কালকে তুমি আসবে তো?' ওরা উঠতে উঠতে—সুশান্ত বলল এবং লীলা কোনো জবাব দেবার আগেই বলল, 'অবশ্য আপিসফেরত আবার আসা তোমার পক্ষে কষ্টকর!'

'কাল না, পরশু।' লীলা বলল, 'একটু কেনাকাটা আছে কাল।'

'ও, আচ্ছা।'

'তুমি আসবে তো।' লীলা ঝোলানো ব্যাগটা কনুইয়ের কাছে নিয়ে এল।

সুশান্ত জোরে হেসে ফেলল,—এ কথার আর জবাব কি !

'একটা কথা বলব ?' হাঁটতে হাঁটতে লীলা সামান্য ঘাড় নোয়ালো।

'কি ?'

'রুটিন ওয়ার্ক করে এমন হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম এইরকম একটা দিন বোধ হয় খুব বিশ্রী বিস্বাদ লাগবে—অথচ দেখ—'

'খুব ভালো লাগল তো ?' সুশান্ত দেখল লীলার খোঁপা ভেঙে পিঠে গড়িয়ে পড়েছে।

দুই

'দিদি ?'

'কি রে।'

'আমার না লজ্জা করছে।'

'লজ্জা ? কেন ?'

'রাস্তার থেকে এইসব জিনিস কিনতে।'

লীলা রেগে গেল, 'রাস্তার থেকে কিনব না তো কি কমলালয় থেকে কিনব ?'

রুমির চোখ ছলছল করে উঠল, 'ঠিক আছে, আমার লাগবে না।'

'তোকে নিয়ে তো আমার মহা মুস্কিল হল—দেখ দেখি', বলে লীলা চিত্রার দিকে ফিরল। চিত্রাও সঙ্গে ছিল। তারপর দোকানীকে বলল, 'আচ্ছা থাক দেখি।'

কমলালয় না, কিন্তু বেশ বড়ো দোকান থেকেই রুমির বডিস্, তার মোজা, একটা টেপ-সেমিজ কেনা হল। বাবা মা, নিজের জন্যও সামান্য কিছু নিল। চিত্রা একটা স্কিট আর স্প্রেগান কিনল। বাড়ি-ফেরার তাড়া ছিল না। ওরা তারপর বেড়াতে বেড়াতে সুইমিং পুলে এল। ঘুরে দেখল, বেঞ্চিগুলো সব ভর্তি। কিছু বাদাম নিয়ে ঘাসে বসল। রুমিকে লীলা বলল, 'তুই বরং একটু ঘুরে আয়।'

রুমি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। আর একেবারে ওইপাশে, ডাইভিং বোর্ডের দিকে চলে গেল।

'তোর বোনটা ভারি সুন্দর হচ্ছে কিন্তু।'

'বড়ো অবুঝ।' লীলা বলল।

'লাজুক।'

'অদ্ভুত সব ব্যাপারে ওর লজ্জা জানিস—জুতো ছিঁড়ে গেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলাই করাতে ওর লজ্জা করে—আজও তো দেখলি, ওর ক্লাশের বন্ধুরা যদি দেখে ফেলে তাই—'

'বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি কী করে পারি বল। কদিন বাদে ফী দিতে হবে, এডের জন্য দরখাস্ত করে দিলাম, জমাই দেয় নি, ওর লজ্জা করে।'

সন্ধ্যের পর অন্ধকার আর লোক আরো বাড়তে লাগল। তখন রুমি ফিরে এলে ওরা উঠল।

রাত্রে বাবার বুকে তেল-মালিশ করে মা বাবার বহু পুরনো শ্লেষ্মার জট ছাড়াচ্ছিল। বাবা গালে চ্যবনপ্রাশ নাড়াচাড়া করছেন। ঘর অন্ধকার। ধোঁয়া দিয়ে কিছু আগে ঘরের মশা তাড়ানো হয়েছে। জানলার জাল ঝুলে বন্ধ। ঘরে তবু ধোঁয়া নেই। গন্ধ আছে।

'মেয়েটার দিকে আর চাইতে পারি না।'

'আমাকে কী করতে বল।'

'কী আর বলব। অদৃষ্ট, এতদিনে ঘর-সংসার করে—'

বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। মা আঁচলে চোখ চাপে। এই সব দীর্ঘনিঃশ্বাস, দুঃখ ধোঁয়ার মতো সহজে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। ঘরের মধ্যে বেড়াতে থাকে, জমে ওঠে।

কলতলায় লীলা আর রুমি কাজ করছিল।

'দিদি।'

'কি।'

'মীনা বলেছে আমাকে একটা ফুলের টব দেবে।'

'কোথায় রাখবি। রোদ পাবে না, মরে যাবে।'

'ছাদে রেখে দেব। কাল নিয়ে আসব।'

'আনিস তবে।'

'আরও একটা মজা হয়েছে জান দিদি?'

'কি।'

'আমি আর রমা একদিন স্টুডিওতে একটা ছবি তুলেছিলাম, তোমাকে

বলি নি—আমার ছবিটা না ওরা শো-কেসে রেখেছে—ওদের নাকি খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ও।'

পরের দিন আউটরাম ঘাটের কাছে ঘাসে রুমাল বিছিয়ে বসা হল। একটুখানি দিন আছে। অল্প স্রোতে গঙ্গার জল ভেসে যাচ্ছিল।

লীলা বসতে বসতে বলল, 'তোমার জন্য আমি পাঁচমিনিট আগে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি।'

'মোটে! আমি পনের মিনিট।' বলে সুশান্ত বসে পড়ল।

'বলে রেখেছি, আজ আর টিউশনি যাব না।'

'গল্প করবে?'

'না, তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

'কিন্তু আমার একটা কাজ ছিল যে।'

'থাক।—ওই দেখ।' বলে শীর্ণ হাত তুলে লীলা গঙ্গার মধ্যে একটা জায়গা দেখাল। সেখানে একটা কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল। তাতে বেগুনি ফুল ফুটে আছে।

'ও।' সুশান্ত মুচ্‌কি হাসল।

'মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।'

'তখন তো খুব বীরপুরুষের মতো বলেছিলে—এখন পারবে ওটা এনে দিতে?'

'নিশ্চয়ই।' বলে সুশান্ত দাঁড়িয়ে পড়ে।

'থাক।' গোড়ালির কাছে প্যান্টের ক্রীজ ধরে লীলা টানল, 'কাজ নেই। কে কোথায় আছে, দেখে ফেলবে। কাল আপিসে গেলে বলবে, রায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

লীলা হেসে উঠল এবং বসে পড়ে সুশান্তও। ততক্ষণে ফুল নিয়ে কচুরিপানা অনেক দূর ভেসে গিয়েছে।

'যাবে তো?'

'না গেলে ছাড়বে? তোমাকে চিনি না।'

'তুমি তো আবার যা লম্বা। মাথা নিচু করে এস।' বলে লীলা ঘরে ঢুকল।

চেয়ার একটা থাকলে ভালো হত। মাদুরটা বিছোতে গিয়ে দেখল কেমন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। সুতো ঠিক নেই।

'এতেই বসতে হবে কিন্তু।' পেতে দিয়ে লীলা সুশান্তর দিকে চেয়ে অর্ধেক হাসতে পারল।

'খুব লৌকিকতা শিখেছ।' তরল গলায় বলে সুশান্ত বসল, 'বাবা মা কোথায়?'

'মা তো রান্নাঘরে। বাবা কোথায়—তুমি একটু বসো, দেখছি।' বলে লীলা চলে গেল।

ঘরে আলোয় খুব কম জোর। বসে বসে সুশান্ত একটা কোণঠাসা সংসারের পরিচিত গন্ধ পেল। আধপোড়া মানুষের মতো এই ঘরের দেওয়াল। কাঠের একটা র‍্যাকের মধ্যে জিনিসপত্রের স্তূপ। কোথায় সর্‌সর্‌ শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। লক্ষ্মীর আসনের সামনে মৃদু প্রদীপ জ্বলছিল। থালার বাতাসার উপর একটা আরশোলা বসে আছে। কয়েকটা মশা সুশান্তর চারপাশে উড়ছে। কড়িকাঠে কোনো পাখা নেই। গরম।

'আমাদের ঘর দেখছ?' পুরো করে লীলা কিছুতেই হাসি ফোটাতে পারছিল না।

'না,—মানে—।'

'এই নাও।' লীলা একটা হাতপাখা নিয়ে এসেছিল, 'হাওয়া খাও।'

'তুমিই কর না।' বলেই সুশান্ত হাসিমুখে জিব কেটে নকল ভয়ে দরজার দিকে চাইল।

'সেইরকম দুষ্টুই আছ।' একটু দূরে মেঝের উপর লীলা গুছিয়ে বসল।

'তোমার হাসিটাও কিন্তু আগের মতো মিষ্টি আছে।'

'ছাই। হাসতেই পারি না, ইচ্ছেই করে না—' এতক্ষণ পরে লীলার মুখ পুরোপুরি হাসিতে ভরে গেল। ও মুখ নামাল।

সুশান্ত বাঁ হাতে পাখাটা ঘোরাচ্ছিল।

'বাবা ডিস্‌পেনসারিতে গেছেন। মনেই ছিল না।'

'ডিস্‌পেনসারি, কেন?'

'ইন্‌জেক্‌শন্ নিতে। দেখ না, ঘরের কোণে কোণে সব গর্ত, সেদিন রাত্রে বাবাকে একটা কাঁকড়া বিছেয় কামড়েছিল। আজ নিলেই কোর্স শেষ হবে।'

'তোমাদের ঘরটা খুবই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'বাড়িওয়ালাকে কত বলেছি, বলে সারাই করলে ট্যাক্স্ দিতে হবে, আপনারও ভাড়া বেড়ে যাবে।'

'পাজী লোক।'

'এই আস্তে! দোতলায় থাকে। এ ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সিঁড়ি।'

মা ডাকতে লীলা উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এল আবার। পিছনে চা হাতে মা।

'আমাকে চিনতে পারছেন তো?' সুশান্ত উঠে মাকে প্রণাম করল।

'কেন পারব না।'

'আপনার চেহারা তো খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'আর—বয়েস তো হল। তোমরা বসো।' মা চলে গেল।

লীলা উঠে দেওয়াল থেকে ছবিটা নামাল। আঁচলে মুছে সুশান্তর সামনে রাখল, 'দেখ, সেই ছবি—তুমি তুলে দিয়েছিলে।'

'বাব্বা, এখনো আছে?'

'থাকবে না কেন! আমাকে আর এখন চেনা যায়?'

সুশান্ত ছবি দেখছিল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'রুমি কোথায়?'

'বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে বোধ হয়।'

কিছু পরে বাবা এলেন। সুশান্ত প্রণাম করতে বললেন, 'তুমিই তো পাটনা স্টেট ব্যাঙ্কে ছিলে?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় যাদবপুর ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে এলাম।'

'ও। বেশ। বসো।'

তারপর সুশান্ত উঠল।

'ওকে একটু বাসে তুলে দিয়ে আসি মা।'

'আচ্ছা।' মা বলল, 'আবার এসো বাবা।'

ওরা দুজনে গলিতে নামল। ঘরে গরম ছিল।

'তোমাদের বাড়ি বড়ো অস্বাস্থ্যকর।'

'কী করব।'

'তোমার বাবা মার স্বাস্থ্যও খুব ভেঙে গেছে।'

'হুঁ। আমার কথা তো কিছুই বললে না!' গলি অন্ধকার, লীলা করুণ হাসল।

'তোমার কথা আর কী বলব—তুমি কেন আমায় ওই ছবিটা দেখালে!'

'ফ্রমিটা এখন আমার ছবির মতো হয়েছে। এবার শাড়ি পরবে।' অভিমান ভরা গলায় লীলা বলল।

'তুমি মিথ্যে রাগ করছ।' সুশান্ত অসহায় চোখে তাকাল।

'অভ্যেস করে নিয়েছি, টিফিন না করেও থাকতে পারি। ব্যাগে প্রেস্‌ক্রিপসন আছে—দামী টনিক সঙ্গে নিউট্রিশাস্‌ ডায়েট। তবে আমি কি করে আবার ছবির চেহারায় ফিরে যাই? আপেল, ছানা, মেটে দোকানে এসব দেখলে তো আর স্বাস্থ্য ফেরে না!'

'তুমি মিথ্যে রাগ করলে লীলা, আমি তা বলি নি।'

'জানি।'

'তবে এসব বলছ যে?'

'আমি কি তবে পথের লোককে ডেকে এইসব কথা বলব!'

সুশান্ত লীলার চোখের নিচে হাত রেখে দেখল সেখানে জল। ও হাত নামিয়ে নিল। আর-কোনো কথা হল না। অল্প আলোর উঁচু-নিচু গলি পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এল।

'কাল আসছ তো?' সুশান্ত জিগ্যেস করল।

লীলা মাথা নাড়ল, 'দেখ কাল আর বসব না, বেড়াব।'

'বেশ।'

'কালও যদি টিউশনি না যাই!'

'যেও না।'

তারপর পরস্পরের দিকে ওরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। লীলা ওর শুকনো ঠোঁটে জিব রাখল। এইরকম দৃষ্টি অনেকদিন আগের, অব্যবহারে এতদিন মর্চে পড়েছিল। আজ আবার হঠাৎ তা দেখে ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি।

'আর কী।' সুশান্তর সঙ্গে হাসিখুশি লীলা বেরিয়ে গেলে মা এই কথাটা বলেই যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

'তুমি কিসের কথা বলছ ?'

'রুমিটার জন্য একটা চাকরি দেখ।'

'ওকেও কসাইখানায় ঢোকাতে হল !'

'পোড়া পেটের জন্যই সব।'

'সেই পেটে একদলা আফিম দেবার সাহস ভগবান দেন নি।'

'খুকীকেই বলে দেখ, পাশ করার পর রুমিকে যদি ওদের আপিসে ঢুকিয়ে নিতে পারে।'

'বলব।'

'তোমার মালিশের তেলটা গরম করে আনি ?'

'আন।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে রুমির মনে হল সে বুঝি ভুল করে অন্য কারো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। মীনার কাছ থেকে ফুলের টবটা এনেছিল। চমৎকার গোলাপ গাছ। একটা কুঁড়ি ফুটি-ফুটি করছে। টবটা রুমি দরজার বাইরে নামিয়ে রাখল। ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে।

একটু পরে লীলা এল।

'রুমি তুই বাড়ি ছিলি না, সুশান্তদা এসেছিল। ওকে তোর মনে আছে ?'

রুমি কোনো জবাব দিল না।

'তোর কথা জিগ্যেস করছিল।—কি রে এত গম্ভীর কেন তুই ?'

'কোথায় ?'

'দেখতে পাচ্ছি। মীনা বোধ হয় একটা নতুন ফিতে কিনেছে, তোরও চাই—তাই না ?' লীলা হাসল।

রুমি কোনো কথা বলল না।

সবাই ঘুমোল। রুমির ঘুম এল না। দিদির সারা গায়ে ও হাত বোলাচ্ছিল। দিদির হাতদুটো খুব শীর্ণ। বেরিয়ে থাকা শিরাগুলো হাতে লাগছে। গলার দু পাশে দুটো হাড় উঁচু হয়ে গলাকে ঘিরে ধরেছে—যেন টিপে মেরে ফেলবে দিদিকে। গালে একটুও মাংস নেই। চুল উঠে কপাল চওড়া। যেন সুড়ঙ্গের ওপাশে চোখ দুটো। নাক খুব বেমানান উঁচু মনে হয়। এবং বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখল, পাঁজর হাতে লাগছে। রুমি শিউরে উঠল। ওর মনে হল, অনেক দিন আগে বাবা আর মা মিলে দিদিকে

একটা আশ্চর্য কলের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সেই কল দিদির সব কিছু শুষে রেখেছে।

রুমি ছট্‌ফট্‌ করে উঠে বসল। অস্থির অস্থির লাগছে। ঘাড়ে গলায় জল দিয়ে এলে বোধ হয় ভালো লাগবে। রুমি দরজা খুলে বাইরে এল। আলো জেলে বাথরুমে ঢুকল। জলের ঝাপটা দিল চোখে, কপালে, ঘাড়ে।

আবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে নজরে পড়ল মীনার দেওয়া ফুলের টবটা। এখনো দরজার বাইরে পড়ে আছে। টবটা রুমি তুলে নিল। তারপর কয়লাওয়ালা যেখানে কয়লা নামায় সেই ভ্যাপসা গন্ধে, অন্ধকারে সেটাকে নামিয়ে রাখল।

ঘরে ঢুকে দেখল, পথের আলো অল্প এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বাবা ঘুমোচ্ছেন—বুকে শ্লেষ্মা সাঁ সাঁ করছে। ঘুমের ঘোরে মা কী বিড় বিড় করছে। ক্লান্ত দিদিটা ঘুমোচ্ছে মড়ার মতো।

তারপর রুমি ওর দামী ফুলতোলা কাপ-ডিসের মতো শরীরটা সামান্য একটা সস্তা জিনিসের মতো অযত্নে বিছানার উপর ফেলে দিল। রুমি বুঝল ও ভেঙে গেল। চমৎকার কিন্তু এখন ভেঙে গিয়ে বিশ্রী বেসুরো শব্দ তোলা একটা বাদ্যযন্ত্রের মতো ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কয়লার গর্তে সাধের ফুলগাছ ঘিরে পিন্‌পিন্‌ করে মশা ওড়ার কথা ওর আর মনে পড়বে না।

অসীম রায়

নৈতিক ঔচিত্যবোধ ও সৌন্দর্যবোধ

লেখকের বিষয় অন্বেষণের মধ্যে দিয়েই লেখার গুরুত্ব প্রতীয়মান। যদিও তত্ত্বগতভাবে বিষয় আব্রহ্মস্তম্বে এবং ফেলিক্স্ ক্রুল্-এর মতো মজাদার লোক, 'লামিয়েল্' উপন্যাসের সজীব নায়িকা থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশীরও স্বচ্ছন্দ বিচরণ সেখানে তবু কার্যত প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রে বিষয় সীমাবদ্ধ। প্রায় জগৎজোড়া সাহিত্যকর্মের নজির যখন সামনে তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব জগৎ খুঁজে বার করা আপাতদৃষ্টিতে এতই সহজ এবং কার্যত এতই কঠিন যে সে-চেষ্টা তুলনীয় বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যেখানে প্রায় সবকিছু নির্ভর বিষয় নির্ধারণে।

বস্তুত অনেক লেখকদের কাজ দেখলে বোঝা যায় তাঁদের কোনো বিষয় নেই। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন এগুলো বাজারে খাবে ও প্রায় চোখ বুঁজে লিখে গেছেন; আর লেখাগুলোও হৈ হৈ করে কাটার ফলে নানাভাবে তাঁরা সমৃদ্ধও হয়েছেন জীবদ্দশায়। আবার কোনো-কোনো লেখক ভেবেছেন এগুলো তাঁদের লেখা উচিত। সাহিত্য সমালোচকেরা ঐতিহ্যের যে-ছায়াপথ চিহ্নিত করেছেন সেই ছায়াপথে পাঠক হয়ে ঘোরাফেরার পর তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন। পরে কারুর কারুর আত্মপ্রবঞ্চনা ধরা পড়েছে, কারুর পড়ে নি। রুশ লেখক ইলিয়া এরেন্‌বুর্গের উপন্যাসগুলো যেমন একটার পর একটা এই ঔচিত্যবোধে অনুপ্রাণিত। ঘটনার পর ঘটনা, চরিত্রের পর চরিত্র, চমকপ্রদ সংলাপের পর সংলাপ যোজিত এই বোধে যেন এ রাস্তায় হাঁটাই সাহিত্যের ঐতিহ্য। আমাদের দেশেও যেমন শ্রীগোপাল হালদারের সাম্প্রতিক কাল নিয়ে কয়েক খণ্ড উপন্যাস লেখার চেষ্টায় এরেন্‌বুর্গের ঔচিত্যবোধ লক্ষিত। অথচ ঐতিহ্যের ছায়াপথে যাঁদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁদের লেখা এই যান্ত্রিকবোধ থেকে মুক্ত। বহু আলোচিত আনা কারেনিনা সম্পর্কে যে-প্রশ্ন সদাই জাগে তা হল আনা কিংবা ভ্রন্‌স্কি-কে এতখানি শক্তিমান

করার কী দরকার! এঁরা শেষ পর্যন্ত যেন শক্তিবিচ্ছুরণের এক একটি কেন্দ্র। গরীব বড়লোক, আজব অসাধারণ, ভালো মন্দ এই ধরনের কোনো চালু ব্যাখ্যা এখানে অচল। বিজ্ঞানেব কাছে জড় পদার্থের মধ্যে যে অদৃশ্য স্পন্দিত শক্তি নিয়ত ধাবিত, বড়ো লেখকদের কাজও সেই স্পন্দিত শক্তির আর-এক রূপ। আর বিজ্ঞানী যে সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় হাতড়ে হাতড়ে কখনো স্বচ্ছায় কখনো আগের কোনো গবেষণার বিশেষ সমস্যায় আলোড়িত হয়ে প্রায় অজানায় ঝাঁপ দেন লেখকও তেমনি তাঁর আনা কিংবা ভ্রান্তিতে এসে ঝাঁপ দেন অনিশ্চিতির মাঝখানে। আর এই ঝাঁপ দেওয়ার ফলেই চরিত্রের উপরের পর্দা সরে যায় একটার পর একটা। ক্রমাগত অনিশ্চিতির দোলায় দুলতে হয় পাঠককে। কোনো লোক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা কয়েক পরিচ্ছেদ যেতে না যেতেই হোঁচট খায়, আবার সেই ধাক্কা সামলে যখন সেই বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট এক মানসিক কাঠামো খাড়া করা হয়েছে সেই সময় আবার আলোকপাত করেন লেখক তাঁর সৃষ্ট জগতের উপর। পাঠকের ইচ্ছাপূরণের সমস্ত বাসনা ভেসে যায়, বাকি থাকে তদ্গত চিত্তে অনুধাবন।

বাজারের হিড়িক এবং ঔচিত্যবোধ অনেক সময় সাহিত্যকে ঠেলে নিয়ে যায় প্রায় একই জায়গায় এই অপ্রিয় সত্য প্রতীয়মান সাহিত্যকর্ম অনুধাবনে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের সাহিত্যিক কাণ্ড আর ধরা যাক গোপাল হালদাবের মতো সৎ মানুষের প্রচেষ্টা এমন এক পর্যায়ে সাহিত্যকে এনে দেয় যেখানে তার প্রাণদ রূপ অনুপস্থিত। বীরভূমের জীবন পেছনে ফেলে তারাশংকর শহুরে হলেন আর কলকাতার জীবন প্রতিবিম্বিত করার নামে তার আণ্ডার ওয়ার্ল্ড পরিবেশ, নায়কদের মাঝে মাঝে বেখাপ্পা ইংরেজি সংলাপ বা তাদের একটার পর একটা নারী ধরবার অভিযান সাহিত্যকর্মকে ক্রমাগতই হাল্কা করে দেয়। এ মেজাজে তিনি অতি সহজেই গা মেলাতে পারেন চটুল লেখকদের সঙ্গে। এরই পাশাপাশি সমাজ-সচেতন বা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানুষদের নৈতিক ঔচিত্যবোধে লালিত জগৎ এমন অবাস্তব বা প্রায় আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়ায় যে এই দু-ধরনের লেখকই বস্তুত পালিয়ে যান সাহিত্যকর্মের সমস্যা থেকে। পাঠকের চিন্তাশক্তি আলোড়িত করার প্রসঙ্গই ওঠে না।

অবশ্য বাজারের হিড়িক বা নৈতিক ঔচিত্যবোধে আরম্ভ করে শেষ

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

মার্কিন সমাজ কোন পথে

ভারতবর্ষ এখন সুনিশ্চিতভাবে শিল্পায়নমুখীন। আধা সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আগামী দিনের সমাজ ঠিক কী রূপ নেবে তা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত না হলেও যন্ত্রসভ্যতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য যে ভারতীয় সমাজেও প্রতিফলিত হবে তা সুনিশ্চিত। নতুন ভারত গড়ে উঠবে কিছু পরিমাণে আধুনিক জগতের অনিবার্য প্রভাবে, কিন্তু অনেকাংশেই আমাদের সচেতন পরিকল্পিত প্রয়াসের মাধ্যমে। আমাদের ভাবী সমাজ-পরিকল্পনায় তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, রাশিয়া ও চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সমাজব্যবস্থা এবং তার গতিপ্রকৃতির পর্যালোচনা অপরিহার্য। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মার্কিন সমাজ সম্পর্কে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

বিশাল দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। প্রাকৃতিক সম্পদে সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম দেশ; অথচ আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম। আমেরিকার পরিশ্রমী মানুষ প্রকৃতির এবং বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে নিজের দেশকে ধনে-ধান্যে পূর্ণ করে তুলেছে। সম্পদে এবং ঐহিক আরামে আমেরিকার জনসমাজ আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তারা আজ পৃথিবীর ঈর্ষার পাত্র। আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকাকে সত্যই 'স্বর্গরাজ্য' বলে মনে হয়, কিন্তু বর্তমান মার্কিন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কতটা আমাদের গ্রহণীয় তা বিচার করতে গেলে কিছুটা গভীর অনুসন্ধান শ্রেয়।

মার্কিন সমাজকে আজকাল Mass Society বা গণ-সমাজ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। গণ-সমাজ বলতে গণতান্ত্রিক আধুনিক চেতনায় প্রশংসা লক্ষিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন চিন্তানায়কগণ যেভাবে আধুনিক গণ-সমাজের বিচার করেছেন তাতে তীব্র সমালোচনাই স্পষ্ট। Emile Lederer এবং Hannah Arendt প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে বৈচিত্র্যের লোপ এবং সমাজের একাকার-ই গণ-সমাজের বৈশিষ্ট্য। Herbert Blumer জোর দিয়েছেন নেতিমূলক

অখণ্ড জনতা-চরিত্রের উপর। তাঁর মতানুসারে গেলে আধুনিক গণ-সমাজকে জনতা-সমাজ বলা চলে: জনতার সমাজে কোনো সামাজিক সংগঠন নেই, নেই সাংগঠনিক রীতি বা ঐতিহ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম, প্রথা, অনুভূতিসমষ্টি, অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা ভূমিকার ক্ষেত্র; নেই কোনো নেতৃত্ব।[১]

Ortega Y. Gasset-এর বিরূপতা আরও তীব্র। অভিজাত সমাজের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও ঘৃণার হলদে আলোর মশালে তিনি দেখেছেন ক্ষমতা ও বৈভবের জগতে 'মূঢ়' জনতার অনধিকারপ্রবেশ। তাঁর মতে যে-জনতা হাটে-বাটে-শহরে-গাঁয়ে দৃষ্টির আড়ালে ছড়িয়ে ছিল তারাই হঠাৎ ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে সব জায়গা জুড়ে—যেদিকে তাকাও সর্বত্র। Mass বলতে তিনি বুঝেছেন গড়পড়তা সাধারণ লোককে, যারা 'অযোগ্য' (unqualified)। তাঁর মতে সমাজ চিরদিনই দুই শ্রেণীর মানুষের জঙ্গম (dynamic) মিলনে আবদ্ধ—যোগ্য সংখ্যালঘুর দল এবং জনতা। জনতা সেই 'অযোগ্য' লোকের সমষ্টি, যারা বর্তমান সমাজে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দখল করে সমাজকে জনতা-সমাজে পরিণত করে তুলেছে।[২]

অনেকে আবার যান্ত্রিকতাকেই জনতা-সমাজের বা গণ-সমাজের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করেন। এই সমাজে সব কিছুই গাণিতিক হিসেবে মূল্যায়িত, ছকে বাঁধা। সমস্ত সমাজ যন্ত্রে পরিণত। ব্যক্তির অস্তিত্ব মুখোসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

George Simmel, Max Weber, Karl Mannheim প্রভৃতি চিন্তানায়কদের সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য আধুনিক গণ-সমাজের আমলাতান্ত্রিক পরিণতি। তাঁদের মতে সমাজ অতি-সংগঠিত (over-organized) হয়ে গেছে। ব্যাপক উৎপাদন-পদ্ধতি কর্মপটুতা (efficiency)-র উপর এত বেশি নির্ভরশীল যে 'হায়েরার্কি' (hierarchy) অনিবার্য। এই ব্যবস্থায় নিম্ন এবং সাধারণ পর্যায়ের কর্মীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত (অথবা বঞ্চিত)। যাঁরা নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা কর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। ফলে মানবীয় প্রয়োজন বা বিচার গৌণ হয়ে দাঁড়ায়, দক্ষতাই মুখ্য বিবেচনা হয়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীকরণের ফলে হয়তো সংগতি (conformity) আসে, কিন্তু কর্মীদের প্রেরণা এবং ক্রমশ তাদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা লোপ পায়। এই পরিস্থিতিই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিজমের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

জনতা-সমাজ সম্পর্কিত উপরোক্ত সমালোচনা সবই কম-বেশি মার্কিন সমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য। মার্কিন সমাজের রীতিনীতি, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া—মোট জীবনধারাই সমগ্র জনসাধারণের প্রায় এক-ছাঁচে ঢালা। যান্ত্রিকতায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও অনেক পরিমাণে লুপ্ত। অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতায় ও সামাজিক যান্ত্রিক জটিলতার ফলে মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। আধুনিক মার্কিন সমাজের যে-চেহারা Daniel Bell এঁকেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "In a world of lonely crowds seeking individual distinctions where values are constantly translated into economic calculabilities, where in extreme situations shame and conscience can no longer restraint the most dreadful excesses of terror, the theory of mass society seems a forceful realistic description of the contemporary society, an accurate reflection of quality and feeling of modern life."[৩]

আমেরিকার এই জনতা-সমাজকে বুঝতে হলে আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। মাস সোসাইটির মূলে আছে mass production বা ব্যাপক উৎপাদনপ্রথা। ব্যাপক উৎপাদন কুটীরশিল্পে সম্ভবপর নয়। গৃহ ছেড়ে কারখানা; কারখানাতেও ক্রমশ মানুষের জায়গায় যন্ত্র; চূড়ান্তভাবে কর্মের অনুবণ্টন, যার ফলে উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে উৎপাদকের (অর্থাৎ শ্রমিকের) সম্পর্ক-বিচ্যুতি ও মমত্বলোপ; সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যার ফলে কর্মীদের স্বকীয়তার লোপ ও যন্ত্রের সঙ্গে সমীকরণ,—এই হচ্ছে ব্যাপক উৎপাদনপ্রথার সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য (অবশ্য মালিকানা যদি যৌথভাবে শ্রমিকদের হাতে থাকে তবে উপরোক্ত পরিণতি না হবার সম্ভাবনা বেশি)। ব্যাপক উৎপাদনকে চালু রাখতে হলে ব্যাপক হারে ক্রয়-ও অপরিহার্য। ব্যাপক হারে ক্রয়ের ফলে একই ধরনের বস্তু অসংখ্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রুচি ও অভ্যাসের সমতা আনে। স্বভাবতই এজন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করে তুলতে হয় ব্যাপক হারে বিজ্ঞাপন বা 'জনশিক্ষা'র সাহায্যে। যে হারে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তা আমাদের দেশে কল্পনাতীত। বিজ্ঞাপনের জন্য মাত্র এক বছরের

(১৯৫৬ সালে) খরচা এক হাজার কোটি ডলার (বা প্রায় ৪৫০০০০০০০০০ টাকা !) হতে পারে, তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন।[৪] এই বিজ্ঞাপন যে শুধু দ্রব্যের গুণগানে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, ব্যবসায়িক স্বার্থে জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সর্ব ব্যাপাবেই 'শিক্ষিত' করে তোলা হয়।[৫]

মার্কিন অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে। মূলত 'laisses faire' তত্ত্বকে অনুসরণ করে বর্তমানে মার্কিন অর্থনৈতিক জগতের স্বীকৃত পন্থা হল 'অবাধ প্রতিযোগিতা' (free competition) ও 'অবাধ ব্যবসায়িক উত্তম' (free enterprise)। সরকারী বিধি-নিষেধ অবশ্যই আছে; অনেক আইনের বাধায় যথেচ্ছাচার চলে না এবং ব্যবসার একচেটিয়াকরণ আইন-বিরুদ্ধ। তবু ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতায় শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় কেন্দ্রীভূত। অধিকাংশ শিল্প বা বাণিজ্যই মুষ্টিমেয় কয়েকটি অতিকায় সংগঠনের (corporation) দখলে। 'ফ্রি কম্‌পিটিশন' বস্তুত কাগজে কলমেই টিঁকে আছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাফল্যের আশা খুবই কম, কারণ ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যাপক বিক্রয় ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমেরিকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সত্যই দেশে বুঝি কেউ গরীব নেই। কারখানার শ্রমিকেরা এমন-কি বাড়ির দাসীরা পর্যন্ত নিজস্ব মোটরগাড়িতে যাতায়াত করছে এ-দৃশ্য অবশ্যই আমাদের কাছে চমকপ্রদ। কিন্তু আমেরিকার বিশাল অট্টালিকাশ্রেণী যে কত বস্তিকে আড়াল করে আছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই! সহজপ্রাপ্য (সস্তা নয়) মোটরগাড়ি যে কত লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ষাট মাইল স্পীডে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার ধারণা খুব অল্পসংখ্যক লোকই করতে পেরেছেন। অধ্যাপক J. K. Galbraith তাঁর বিখ্যাত *The Affluent Society* বইটিতে দেখিয়েছেন যে কিভাবে কিস্তিতে (অর্থাৎ instalment payment) কেনার সুযোগে আত্মহারা হয়ে সাধারণ লোক নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মাত্র চার বছরে এই ধরনের ঋণের পরিমাণ ২৭৪০০০০০০০০ ডলার থেকে ৪১৭০০০০০০০০ ডলার অর্থাৎ শতকরা তিপ্পান্ন হারে বেড়ে গিয়েছে। যে ব্যাপক উৎপাদনপ্রথার ফলে আজ সম্পদের ছড়াছড়ি সেই ব্যাপক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে আমেরিকার অর্থনীতিতে বিপর্যয়

আসন্ন—এই হচ্ছে গলব্রেথের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁর মতে আমেরিকায় ব্যবসায়িক কায়েমী স্বার্থই (vested interests) এই অতি-উৎপাদনব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোনো অর্থনীতির তুলনামূলক বিচার এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে আজ এ কথা স্পষ্ট যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমেরিকার বৈষয়িক প্রগতি বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে ব্যাহত। তিরিশের মন্দার মতো অত প্রচণ্ড মন্দার পুনরাবৃত্তি হয়তো আর ঘটবে না, কিন্তু কীন্‌সের পথনির্দেশে ধনতন্ত্র মন্দাবোধ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে অনেকের যে ধারণা তা সঠিক নয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিন তিনটি ছোটখাট মন্দা অনেকের চোখে পড়ে নি, পড়লেও তার ক্ষতির পরিমাণ অনেকেই অনুধাবন করতে পারে নি। Woytinsky-দের গবেষণা অনুযায়ী এই তিনটি মন্দার মোট ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১১৩ বিলিয়ন ডলার (বা, ৫০৮০০০০০০০০০০০০ টাকা)! ১৯৫৮ সনের মন্দায় ছয় মাসের মধ্যে শিল্পের উৎপাদন শতকরা বারো নেবে গিয়েছিল এবং সাতাশ লক্ষ লোক বেকার হয়েছিল। অবশ্য এইসব মন্দা নিম্নবিত্ত ও শ্রমিকদের যে-ভাবে পর্যুদস্ত করেছিল, মালিক, ব্যবসায়ী এবং পেশাদার লোকেরা সেই তুলনায় মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। দেখা গেছে ১৯৫৮ সালের মন্দার মুখে মুনাফার অঙ্ক যথেষ্ট বেড়ে গেছে।[৬] অন্য সব বিবেচনা বাদ দিয়েও যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত তাত্ত্বিক কচকচির ঊর্ধ্বে থেকে দিক্‌নির্দেশ করে তার বিচারে আমেরিকার বেকার পরিস্থিতির শোচনীয় অবস্থা আমাদের বিচলিত করতে বাধ্য। সমাজ যখন সমৃদ্ধির শিখরে তখনও যদি বেকারসমস্যা প্রবল থেকে যায় তবে গোটা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা সংগত। ১৯৬৩ সালের ১১ই মার্চ তারিখে মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রদত্ত বক্তৃতা অনুযায়ী বর্তমানে আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ (মোট কর্মক্ষম লোকের শতকরা সাত)।[৭] আমেরিকার বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে-কৃতিত্ব দাবি করা হয় সে দাবিও প্রশ্নাতীত নয়। Richard N. Pear সরাসরি বলেছেন :

> "It was the hard work of Americans, who took little interest in politics ; the abundant resources which were

provided by nature, not by Constitution ; the availability of immigrants who were needed as hired hands not as recepeients of American democratic religion—these are what has made America what it is.[৮]

আমেরিকায় যে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক পরিস্থিতি বর্তমান তা অনিবার্যভাবেই আমেরিকার পরিবারপ্রথা এবং ফলে ব্যক্তির চরিত্রগঠন প্রভাবিত করছে। আমেরিকায় পারিবারিক সংগঠন বিপর্যয়ের মুখে। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতো এদেশেও যৌথ-পরিবার প্রায় বিলুপ্ত। স্বামী-স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দু-তিনটি সন্তানকে নিয়ে এদেশের পরিবার সাধারণত গঠিত। বড়ো হয়ে যাবার পর ভাই, বোন, এমন-কি পিতা-মাতার সঙ্গেও সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল হয়ে যায়। আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়লেও সাধারণত এদেশের লোক ভাই, বোন কি অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দ্বারস্থ হবার চেয়ে বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ কোনো আর্থিক সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করার পক্ষপাতী। পরিবারে উপার্জনকারী কর্তার উপর চাপ পড়ে অত্যধিক, কারণ জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে আয় বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ফলে, কর্তা সংসারেব দিকে একেবারেই মনোযোগ দিতে পারেন না এবং সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মা-র উপর। পিতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্বল্প-পরিচিত মার্কিন ছেলেরা প্রায়ই পরবর্তী জীবনে অপরিচিত থেকে যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা F. R. Kluckhohn একটি প্রবন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন।[৯] আমেরিকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে পারিবারিক পরিবেশও যাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। কিন্তু এই মনোভাব অনেক সময় শিশুদের অত্যধিক স্বাতন্ত্র্য দিয়ে পরবর্তী জীবনে তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুরা একটু বড়ো হলেই তারা যে কোন্ ধরনের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মিশছে তা অনেক সময়ে বড়োদের অগোচরে থাকে। জানা থাকলেও শাসনের অভাবে ক্রমশ তারা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। আমেরিকার তরুণদের মধ্যে যে ব্যাপক অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়েছে তার মূলে যে এই পরিস্থিতির কোনো ভূমিকা নেই তা ভাবা ভুল। পরিবারের শিথিল-সম্পর্ক বা অসুখী পারিবারিক অবস্থাও (যা বর্তমান আমেরিকায় স্থায়ী ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে) অনেক তরুণ-তরুণীকে বিপথে নিয়ে যায়।

বর্তমানে মার্কিন পরিবার কোন্ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তা অধ্যাপিকা Kluckhohn-এর ভাষাতেই উদ্ধৃত করা চলে :

"To state the situation quite bluntly: many if not most American wives are chronically discontented or frustrated; a majority of American men retain in their characters too many adolescent traits of thought and behaviour; very few husband-wife relations are really mature man-woman relationships. Marriage instability and conflict, as well as personal dissatisfactions are the inevitable results. Girls growing up in such a family environment become discontented wives of the future; boys become but another crop of mother-dominated adolescents, who too often doubt, yet feel compelled to prove their masculinity."[১০]

আমেরিকার পারিবারিক জীবনের এই শোচনীয় পরিস্থিতির মূলে কতটা বর্তমান মার্কিন অর্থনৈতিক পরিবেশ তথা সবকিছুই ব্যাপক হারে গড়ে তোলার পন্থা দায়ী তা বিবেচনার যোগ্য। উৎপাদন বাড়াও, বিজ্ঞাপন বাড়াও, কিস্তিতে দাম শোধ করার নেশায় ক্রমাগত ক্রয় বাড়াও, ফলে আয় বাড়াও, পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াও—এই সবকিছু বাড়াও-এর আওয়াজ বর্তমানে সত্যই মাত্রাহীন হয়ে পড়েছে যার প্রতিক্রিয়া মার্কিন সমাজ-জীবনে আজ সর্বব্যাপী। এর শেষ কোথায় তা ভাবার সময় এসেছে।

এবার মার্কিন সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা যাক। মার্কিন সমাজে প্রাচুর্যের পরই যা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হল অপরাধ ও দুর্নীতির ব্যাপকতা। ১৯৫৪ সালে J. Edgar Hoover সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আমেরিকাতে অপরাধের মাত্রা শতকরা আট হারে বেড়ে চলেছে এবং এই হারে বেড়ে চললে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৫৩ সালে ১১ লক্ষ ১০ হাজার লোককে বিভিন্ন অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০ লক্ষ ৭০ হাজারে। সবচেয়ে ভয়াবহ হল অপরাধীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। ১৯৫৮ সালে State Youth Authority-র হিসেব মতে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে

১৭ বছর বয়স্ক প্রতি চারজনের মধ্যে একজন তরুণকে অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরে অপরাধের জন্য ধৃত লোকের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে তরুণবয়স্ক। মনে রাখতে হবে যে অনেকেই ধরা পড়ে না এবং বিশেষত তরুণীদের অনেক সময় ছেড়ে দেওয়া হয়।[১১]

বিখ্যাত মনস্তাত্বিক Frederic Wertham তাঁর *Seduction of the Innocent* গ্রন্থে তরুণ অপরাধীদের সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর মতে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে তরুণদের খেলাধুলার মধ্যে হিংস্রতা এবং অপরাধের উগ্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তরুণদের মধ্যে অপরাধের এই মাত্রাবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই 'কমিক' বই, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে হিংসা ও বর্বরতার অবাধ প্রচার। 'Freedom of Culture'-এর তীর্থক্ষেত্র আমেরিকায় কমিক বই, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে কী যে ভয়াবহ মানসিকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে তা ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়।[১২] ১৯৫৪ সালে এইসব তথাকথিত কমিক বই ছাপা হয়েছে মোট ৯ কোটি কপি! এইভাবেই নাকি তরুণদের শক্তসমর্থ (tough) করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমেরিকার 'হিরো' এখন 'tough boy'। গায়ের জোরের মর্যাদা সবার উপরে। তাই মুষ্টিযুদ্ধের মতো বর্বর ক্রীড়ার এত বন্য জনপ্রিয়তা। একটা হিসেব নিয়ে জানা গেছে ১৯০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৪৫০ জন মুষ্টিযোদ্ধাকে এই 'নির্দোষ' ক্রীড়ায় প্রাণ হারাতে হয়েছে। কিছুকাল আগে এইভাবে Benny Kid Paret-এর মৃত্যু নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছিল। কিন্তু কোনো আন্দোলনই কায়েমী স্বার্থকে বিচলিত করতে পারে নি। আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধ একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসা। এর অল্প কিছুদিন বাদেই Sugar Ramos-এর সঙ্গে লড়াই-এর ফলে Davey Moore-কেও প্রাণ হারাতে হয়েছে (স্টেট্স্‌ম্যান, দিল্লী, ২৬. ৩. ৬৩)। তার আগে Tunney Hunsekar-কেও এইভাবে লড়াই-এর চোটে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার সম্পর্কে পরবর্তী কোনো খবর এদেশে প্রকাশিত হয় নি। এরা বেঁচে গেলেও মাথায় চোট লাগার ফলে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। Ernie Shaff, Kid Paret, Hansekar, Davey Moore প্রভৃতি হতভাগ্যরা বিকট লোভের তথা অসুস্থ সমাজ-মানসিকতার বলি মাত্র।

জুয়া, জুলুমবাজি (racketeering), ঘুষ ও দুর্নীতি আজ মার্কিন সমাজে

প্রায় অবাধ বলা চলে। এই শতাব্দীর সূচনায় (১৯০২) M'clure's Magazine-এর তরফ থেকে অপরাধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে Lincoln Steffens মার্কিন নগর-সমাজের যে ভয়াবহ রূপ আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৪৭ সালে Robert Allen-ও[১৩] সেই রূপের বিশেষ কোনো মৌল পরিবর্তন দেখতে পান নি। দুজনেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন ব্যবসায়ীশ্রেণীব প্রতি।

আজকের মার্কিন মুলুকে যাঁরা সমাজের শীর্ষে সগৌরবে অবস্থান করছেন এমন ব্যবসায়ী বা শিল্প-মালিকদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই ছিন্নমূল কপর্দকহীন রূপে এদেশে এসে 'জোর যার মুলুক তার' নীতির সাহায্যে ছলে বলে কৌশলে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। জীবিত সকল ব্যবসায়ীদেরও অনেকেই প্রথম জীবনে সাধারণ গুণ্ডামাত্র ছিলেন। Lepke, Gurrah, Dutch Schulz, Jack 'Legs' Diamond, Lucky Luciano, Arnold Rothstein, Frank Costello প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গুণ্ডাই পরবর্তী জীবনে গুপ্তপথে অগাধ ধনসঞ্চয় করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যবসায়ে (বিশেষত জুয়ার ব্যবসায়ে) আত্মনিয়োগ করেছে। জুয়া আমেরিকার সর্বত্র বে-আইনি নয়। এই ব্যবসাতে কত টাকা খাটে তা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। ১৯৫০ সালে অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য Senetor Kefauver-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অনুসন্ধান অনুযায়ী জানা যায় যে জুয়ার ব্যবসায়ে আনুমানিক ২০ লক্ষ কোটি ডলার (৯০০০০০০০০০০০০০ টাকা!) খাটছে। জুয়া ব্যবসা আমেরিকার অন্যতম প্রধান ব্যবসা।[১৪] এই গুণ্ডা এবং জুয়ার ব্যাপারীদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এদের অনেকেই আবার ট্রেড-ইউনিয়নের মাতব্বর, যেমন T. V. O'connor, Dick Butler, Paul Kelly বা Joe Ryan. বস্তুত আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়নের ইতিহাস অনেকাংশেই জুলুমবাজদের (racketeers) ক্ষমতা কাড়াকাড়ির ইতিহাস মাত্র। অল্পসংখ্যক শ্রমিক নেতাবই অতীত পরিচ্ছন্ন।[১৫] এদের প্রভাব শুধু ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে নয়, উচ্চতম রাজনৈতিক পর্যায়েও এদের প্রভাব সক্রিয়। রুজভেল্টের মস্ত সহায় ছিল Frank Costello। নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন মেয়র La-Guardia প্রধানত Joe Adonis-এর সহায়তাতেই ১৯৩৩ সনের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। আমেরিকার অনেক আইন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই ঘুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বড়ো বড়ো পদস্থ ব্যক্তিরা যে-ভাবে অবাধে ঘুষ নেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

'মুক্ত' (free) মার্কিন মুলুকের সমাজের এই গুরুতর পরিণতির অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়। স্থৈতিক (static) সমাজে মূল্যবোধ-সমষ্টি সুনির্দিষ্ট এবং সুদৃঢ়। দুর্ভাগ্যক্রমে গত দু-তিন শ' বছরে আমেরিকার সমাজ একান্তই অস্থির। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও জনসমাজে বহু-জাতিকতা মূল্যবোধ সমষ্টির স্থিতিলাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় এবং জনসমাজ পরিচালনার ক্ষমতা যাঁদের কুক্ষীগত তাঁরাও, সন্দেহ হয়, রাজনৈতিক স্বার্থেই নৈতিক অরাজকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আপত্তি ওঠে না তা বলা চলে না। কিন্তু লক্ষ করা যায় যে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে এবং সুকৌশলে নীতিবোধটা অল্প কয়েকটি বিষয়ের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করা হচ্ছে, যার অন্যতম প্রধান হচ্ছে সাম্যবাদ। সাম্যবাদ এখন আমেরিকাতে শুধুমাত্র বিদেশী (ম্লেচ্ছ!) মতবাদই নয়, প্রায় পাপের নামান্তর।[১৬] অন্যথায় যে-কোনো ব্যভিচার প্রশ্রয় পায়।

আদর্শবাদ আমেরিকা থেকে মুছে যাবার যোগাড় হয়েছে। নতুন কোনো আদর্শবাদ সুসংহতভাবে গড়ে উঠুক, এটা বোধহয় ক্ষমতাসীনদের কাম্যও নয়। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এদের বিদ্বেষ স্পষ্টতই স্বার্থসম্ভূত। অধ্যাপক গলব্রেথ এক জায়গায় বলেছেন যে জনসমাজে মর্যাদার প্রতিযোগিতায় বুদ্ধিজীবীরা ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাঁদের বিপুল বিত্ত সত্ত্বেও সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠিতে তাঁরা অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় নিচে স্থান পান।[১৭] সমাজে সর্বোচ্চ মান-প্রতিপত্তির জন্য তাই তাঁদের প্রয়োজন এমন এক মতবাদ যা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে। সেই মতবাদই আজকাল নানাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—ব্যাপকতাবাদ। সবকিছু কর ব্যাপকহারে—উৎপাদন বাড়াও, আয় বাড়াও, ব্যয় বাড়াও, গাড়ির আয়তন বাড়াও, বাড়ির উচ্চতা বাড়াও; যে যত বৃহৎ জিনিস গড়তে পারে, যে যত ব্যাপকহারে উৎপাদন করতে পারে তার তত মর্যাদা। সূক্ষ্মতা, সুকুমার রুচি—এ-সবের বিশেষ মর্যাদা দিলে অসুবিধা; মননশীলতা বিপজ্জনক। ম্যাকার্থির প্রধান শিকার ছিলেন বুদ্ধিজীবিরা, বিশেষত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ।[১৮]

নাগরিক জীবনের জটিলতা, আনুষঙ্গিক উৎকণ্ঠা, নৈরাশ্য ইত্যাদিও মানুষের মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটায়।[১৯] একদিকে যেমন পুরনো মূল্যবোধ-সমষ্টি ভেঙে পড়েছে অন্যদিকে নতুন কোনো মূল্যবোধসমষ্টি গড়ে ওঠে নি

আমেরিকাতে। যে নতুন সমাজ-দর্শনের ভিত্তিতে, যে নতুন ধর্মের ভিত্তিতে মূল্যবোধসমষ্টি গড়ে উঠতে পারে, তার সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা কায়েমী স্বার্থের দ্বারা বার বার বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হচ্ছে।

যা সাধারণত ঘটে থাকে, প্রচলিত ধর্মের বহিরঙ্গে কোনো আঁচড় লাগে নি, এবং গির্জা (Church) কায়েমী স্বার্থের দলভুক্ত হয়েছে। লক্ষ করা যায় যে গত কয়েক বছরে আমেরিকায় 'ধার্মিকতা' বেড়ে গিয়েছে। Michael Argyle বৃটেন ও আমেরিকার ধর্মীয় দিক সম্পর্কে তুলনামূলক অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে বৃটেনে শতকরা ২১.৬ জন এবং আমেরিকায় শতকরা সাতান্ন জন লোক গির্জার সদস্য ; বৃটেনে শতকরা ১৪.৬ জন এবং আমেরিকায় শতকরা তেতাল্লিশ জন সাপ্তাহিক প্রার্থনায় যোগ দেয় ; বৃটেনে শতকরা বাহাত্তর জন এবং আমেরিকায় শতকরা ৯৫.৫ জন ভগবানে বিশ্বাস করে ; এবং বৃটেনে শতকরা সাতচল্লিশ এবং আমেরিকায় শতকরা বাহাত্তর জন পরজন্মে বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কিন সমাজের এই ধার্মিকতা অনেকটা অন্তঃসারশূন্য (hollow)।দেখা গেছে যে ধর্মে বিশ্বাস একান্তই নিষ্ক্রিয় (passive)। জীবনের লক্ষ্য বা উচ্চাকাঙ্খায় ধর্মের কোনো প্রভাব নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা অধিকাংশে কাছেই জীবনের কোনো উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই।[২০]

মার্কিন সমাজের সামগ্রিক চেহারা সমাজমানসের অসুস্থতাকেই প্রকট করে। সেই অসুস্থতাই আবার ব্যক্তিজীবনেও সংক্রামিত। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে যত লোকের মৃত্যু হয় অন্য কোনো রোগের দ্বারা তত মৃত্যু ঘটে না। জানা যায় স্নায়বিক ইত্যাদি মানসিক রোগের জন্য মৃত্যুর হার যেখানে ১৯০০ সালে শতকরা ২১.১% ছিল সেক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৪.৪%। মানসিক রোগই বর্তমানে আমেরিকার সর্বপ্রধান ব্যাধি।

এই অসুস্থতাই মার্কিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত। কী অপরাধের মাত্রাধিক্যে, কী বিবাহ-বিচ্ছেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়, কী সমরায়োজনের উন্মত্ততায়, সর্বক্ষেত্রেই সমাজ-মানসের অসুস্থতার ছাপ। এই অসুস্থতা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সংক্রামিত। 'বীটনিক্‌স্'-দের (Beatniks) শৌখীন উচ্ছৃঙ্খলতা বৃহত্তর সমাজ-মানসের অসুস্থতারই অভিব্যক্তি মাত্র।

মার্কিন সমাজব্যবস্থার এই বিপথগামিতার সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ-রচয়িতাদের সচেতন থাকা আবশ্যক।

(১) *Cf.* Herbert Blumer, 'Collective Behaviour' in 'New Outlines of Principles of Sociology', ed. by A. M. Lee, New York, 1936.

(২) *Cf.* Ortega Y. Gasset, 'Revolt of the Masses' (Mentor Books edition) Now York, 1951, p. 8-9.

(৩) *Cf.* Daniel Bell, 'End of Ideology', p. 22.

(৪) *Cf.* Don Martindale, 'American Society', 1960, p. 40.

(৫) ১৯৫৬ সালে কোনো একটা বিশেষ আইন প্রণয়নের সময় প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে 'জনশিক্ষা'র জন্য Natural Gas and Oil Resources Committee প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করেছিল (Ref. V. O. Key, 'Politics, Parties and Pressure Groups', New York, 1958, p. 145).

(৬) *Cf.* W. S. & E. S. Woytinsky, 'Lessons of the Recessions', Washington 1960, p. 13.

(৭) Statesman (Delhi) 12. 3. 1963.

(৮) *Cf.* Richard H. Pear, 'Democratic institutions in the United States of America' in 'Democratic Institutions in the World to-day' ed. by Werner Burmeister, London, 1958, p. 30.

(৯) *Cf.* F. R. Kluckhohn, 'American family and femine role', in 'Human relations', by Hugh Cabot and others (Harvard University Press), 1956.

(১০) ibid p. 251.

(১১) *Cf.* Daniel Bell, ibid, p. 137-145.

(১২) কমিক বই-এর মলাটে পর্যন্ত যেসব ছবি ছাপা হয় তা আমাদের দেশে কল্পনাতীত। Bell উদাহরণ দিচ্ছেন : "Some front covers : a motor-car drags two persons to their death, while a gloating face above exalts that no one will be able to 'identify the meat' after the faces are 'erazed'. In other pictures a woman is having her eye put out with a needle, a nailed boot smashes in the face of a man, a girl is about to be raped with a red hot poker"—ibid p. 145.

(১৩) *Cf.* Robert S. Allen, 'Our fair city', New York, 1947.

(১৪) *Cf.* Daniel Bell, ibid, p. 119.

(১৫) ibid p. 185.

(১৬) "And a singular fact about the communist problem is that on a scale rare in American political life, an ideological issue was equated with a moral issue and the attacks on communism were made with all the compulsive, moral fervor which was possible because of the equation of communism with sin." (D, Bell, ibid, p. 109)

(১৭) J. K. Galbraith, 'Affluent Society', Asia Publishing House, 1961, p. 152.

(১৮) *Cf.* D. Bell, ibid, p. 101.

(১৯) *Cf.* Karl Mannheim, 'Man and Society in an age of Reconstruction.' London, 1946, p. 60.

(২০) *Cf.* Michael Argyle, 'Relegious Behaviour', London, 1958, p. 35-36.

রমেন মিত্র

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা

মার্কসবাদী চিন্তায় ও কর্মে তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, বিবাদ-বিসম্বাদের ঝড় বহিতেছে। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক—নানা বিষয়ের সহিত ইহা জড়িত। বিশ্ব পরিস্থিতির বর্তমান প্রকৃতি কী, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অবস্থান কোথায়, যুদ্ধ-শান্তির সম্ভাবনা কিরূপ, এশিয়া-আফ্রিকার নতুন অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির প্রকৃতি কী, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী, ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতি কি কি হইতে পারে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কী, এইরূপ বহু প্রশ্নে সাম্যবাদী আন্দোলন এখন আলোড়িত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অবস্থা অনুরূপ। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি কী, মার্কসবাদীর চক্ষে শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির আদর্শ কী, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মার্কসবাদী তাৎপর্যটি কী, এবং আরো বহু প্রশ্ন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর হইতেই এই সকল প্রশ্ন প্লাবনের ন্যায় মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই প্লাবন, স্তালিনের মৃত্যুর দুই দশক পূর্ব হইতে মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মে যে এক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে ভাঙিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিতর্ক, বিচার, বিবাদের আবর্ত হইতে এখনও নতুন ব্যবস্থা বা সিস্টেম গড়িয়া উঠে নাই, যাহা মার্কসবাদী আন্দোলনে সর্বজনগ্রাহ্য।

এখন প্রশ্ন হইল, মার্কসবাদী জগতে যে প্রবল আত্মবিরোধ চলিতেছে তাহার অর্থ কি?

এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। উপরোক্ত আত্মবিরোধ কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নাই। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাহা মার্কসবাদী আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়নেও প্রসারিত। যেহেতু মার্কসবাদী আন্দোলনের বর্তমান ও

ভবিষ্যতের সঠিক মূল্যায়ন এবং দিক্‌নির্ণয় তাহার অতীত ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল।

মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের বর্তমান প্রশ্নটিকে দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যায়। প্রথমটি হইল এই যে সমগ্র প্রশ্নটি হইতেছে মার্কসবাদী তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগের প্রশ্ন। এ কথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মার্কসবাদ হইল কর্মের দিশারী—guide to action। মানুষকে সঠিক প্রগতির পথ প্রদর্শন করাই হইল ইহার কাজ। এই কাজ প্রকৃতি ও মানব সমাজের বাস্তব ও সঠিক জ্ঞানের উপর দণ্ডায়মান এবং এই জ্ঞান এক বিশেষ প্রয়োগ-প্রণালী অনুসরণ করিয়াই মার্কসবাদীগণ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রয়োগ-প্রণালীকে যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে জ্ঞান হইবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যে-কর্ম হইবে, তাহাও হইবে ত্রুটিপূর্ণ এবং এই ত্রুটি সমগ্র আন্দোলনকে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে লইয়া যাইতে বাধ্য।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিগত ১৫।১৬ বৎসরের কর্মসূচী ও কর্মপন্থা নির্ধারণের যে-সমস্যা। ইহার সহিত ভারতের সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিশ্ব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী প্রয়োগ-প্রণালীর সঠিক প্রয়োগের প্রশ্নটি জড়িত আছে। আমরা আজ সকলেই অন্তত এ-বিষয়ে একমত যে ভারতের মার্কসবাদী আন্দোলন সঠিক পথে চলে নাই। চলে নাই কেন? না, মার্কসবাদী তত্ত্বকে এখানে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই।

আমি উপরে যাহা লিখিলাম, তাহাতে ভুল কিছু নাই, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিপদ আছে। তাহা হইল এই যে মার্কসবাদী তত্ত্বকে ইহা এক absolute category রূপে দেখিয়া থাকে। এরূপ অনেক মার্কসবাদী আছে, যাহারা মার্কসীয় তত্ত্বকেও খৃষ্টীয় বা অনুরূপ ধর্মতত্ত্বের ন্যায় দেখিয়া থাকে। তাহাদের নিকট মার্কসবাদী আন্দোলনের সমস্যা হইল কেবল তত্ত্বের সঠিক অনুধাবন ও প্রয়োগের সমস্যা। এই দৃষ্টিকে আমরা একপেশে বলিতেছি। কারণ, খৃষ্টীয় তত্ত্ববাগীশদের মতো ইহারা মার্কসবাদী তত্ত্বকে উহার ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে অক্ষম। এই ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণই হইল যথার্থ মার্কসবাদী।

একটি উদাহরণ। লেনিনের আমলে ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের বাস্তব প্রকৃতি কী, তাহা লইয়া বিতর্ক চলিয়াছিল। ইওরোপীয় ধনতন্ত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই ক্রমে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে ও সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হইতেছিল। বিশ শতকের প্রারম্ভেই এই পরিণতি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মার্কস উনিশ শতকি ধনতন্ত্রের যে-ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, লেনিনের ব্যাখ্যা তাহাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল এবং সেহেতু কমিউনিস্ট কর্মসূচীতেও লেনিন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। আমরা কি বলিব লেনিন এইখানে মার্কসবাদী তত্ত্বকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই বলিব। কিন্তু আমরা আরো বলিব, মার্কসবাদী তত্ত্বের তিনি নতুন বিকাশ সাধনও করিয়াছিলেন। প্রয়োগ ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমার আলোচনার একটি কারণ আছে।

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ হইতে যাহারা মার্কসবাদী তত্ত্বের সমস্যাকে দেখেন, তাহারা জানেন যে, মার্কসবাদী তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ ঘটিলে পরিবর্তনশীল এই মানব-জগতে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ বলিলে বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন, সংশোধনও বুঝায়। কিন্তু যাহারা মার্কসবাদী তত্ত্বের সমস্যাকে কেবল প্রয়োগের সমস্যা রূপে দেখে, তাহাদের ধারণা এই তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ ঘটিলে তত্ত্বটি 'ঠিক' থাকে।

এই ধারণা হইতেই মার্কসবাদীদের একাংশের মধ্যে বার বার করিয়া 'পুঁথি' মিলাইবার বদভ্যাস দেখা দেয়। তত্ত্বটি 'ঠিক' রহিল কি না, ইহাই দেখিয়া তাহারা প্রয়োগের সঠিকতা নিরূপণ করিতে চায়। যদি কেহ বলিল যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব, অমনি কিছু লোক 'পুঁথি' মিলাইতে বসিল। যখনি দেখা গেল লেনিন ভিন্ন কথা বলিয়াছিলেন, অমনি সিদ্ধান্ত হইল উপরোক্ত ব্যক্তি তত্ত্বকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে নাই। করিলে তত্ত্বের এরূপ পরিবর্তন হয় কিরূপে? অতএব, অমুক ব্যক্তি সংশোধনবাদী না হইবে কেন?

এরূপ মার্কসবাদীর সাক্ষাৎ বর্তমানে বিরল নয়।

কেবল প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ হইতে মার্কসবাদী তত্ত্বের সমস্যাকে দেখার অন্য বিপদও আছে। যেমন ধরা যাক, আজিকার মহাবিতর্কের কথা। সোভিয়েতের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত চীনা নেতৃত্ব ও

তাহার অনুগামীদের মধ্যেকার বিরোধ মার্কসবাদী তত্ত্ব ও কর্মের ক্ষেত্রে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

যাহারা প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে অভ্যস্ত তাহারা কমিউনিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। যেহেতু তাহা বহু ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের কথা ও সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নতর হইয়া উঠিতেছে। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বহু ক্ষেত্রে 'পুঁথি-সম্মত' হইতেছে না, সেইহেতু তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অথচ অপরদিকে যে চীনা তত্ত্ব 'পুঁথি' মিলাইয়া কথা বলিতেছে, তাহা বাস্তবে, কর্মের ক্ষেত্রে ক্রমশ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, এইরূপ অনুভূতিও উপরোক্ত ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, কারণ, তাহারা বাস্তব বুদ্ধি-বিবর্জিত নহে। অতএব এই শেষোক্ত ব্যক্তিসকল বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে যে গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলনই বিপথগামী। অর্থাৎ উভয় পক্ষই মার্কসবাদকে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করিয়া মার্কসবাদী আন্দোলনের বর্তমান সংকট সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ হইতে আজিকার মহাবিতর্ককে বিশ্লেষণ করিলে তাহারা দেখিত যে মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিভিন্ন সময়ে মার্কসবাদী আন্দোলনে অন্তর্বিরোধ সৃজন করিয়াছে, যেহেতু বিকাশের পথে মার্কসবাদী তত্ত্বের পুরাতন ধ্যান-ধারণার সাথে তাহার বিকাশশীল চিন্তাধারার সংঘাত ঘটে। ইতিহাসে এই অন্তর্বিরোধের একাধিক অধ্যায় ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছে। এই উপলব্ধি যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের কলম হইতে এরূপ কথা বাহির হওয়া কঠিন যে, "বর্তমান চীন ও সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে মার্কসবাদ তার তত্ত্বের কৌলীন্য হারিয়ে···বিকলাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।" পরিচয়-এর গত আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়িয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে তিনিও মার্কসবাদের সমস্যাগুলিকে কেবল প্রয়োগের সমস্যারূপেই দেখিতেছেন, উপরোক্ত বাক্যটি তাঁহারই প্রবন্ধে আছে।

লেখকের মতে, 'তাঁদের জীবিত কালে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌কে নানা ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লেখনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ভাববাদী দর্শন, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি তদানীন্তন ইওরোপের চিন্তাজগতের ভিন্নধর্মী ও অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে

লিখতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের কোনো কোনো রাজনৈতিক রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশেষ কোনো মত খণ্ডন করার প্রয়োজনে মার্কসীয় তত্ত্বের কোনো বিশেষ দিকের উপরই সম্পূর্ণ জোর গিয়ে পড়েছে, অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়েছে।'

লেখক বলিতেছেন, পরবর্তী কালে তাঁহাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ সাময়িক প্রয়োজনে লেখা তাঁহাদের রচনাবলীকে প্রসঙ্গচ্যুত করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনে স্থবিধা অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। ফলে ইহাদের হস্তে মার্কসবাদ অন্ধের 'দেখা' হস্তির ন্যায় খণ্ডিত। লেখক বলিতেছেন, মার্কস-এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পর হইতে মার্কসবাদী তত্ত্বের ইহাই হইল প্রধান সমস্যা। লেখক তাঁহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন 'মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা'। অতএব তাঁহার মতে ইহাই হইল মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা।

লেখক আরো বলিয়াছেন যে মার্কসবাদী তত্ত্বের এই সমস্যা যে কেবল মার্কস-এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পরেই দেখা দিয়াছে, এমন নহে। তাঁহারাও সাময়িক প্রয়োজনে মানব-সমাজের বিকাশের পর্যালোচনায় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির নির্ধারক ভূমিকার উপর এরূপ জোর দিয়াছেন যে, সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের অপরাপর সক্রিয় উপাদানের উপর প্রয়োজনীয় জোর পড়ে নাই, ফলে তাঁহাদের হস্তেও দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ-প্রণালী বহু ক্ষেত্রে খণ্ডিতাকারে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই লইয়া এঙ্গেল্‌স্ পরে ব্লখকে যাহা লিখিয়াছিলেন, লেখক তাহাও উদ্ধৃত করিতে ভোলেন নাই। তাহা হইলেও, আমাদের সান্ত্বনা এই যে মার্কস-এঙ্গেল্‌সের রচনায় কৌলীন্য রক্ষা পাইয়াছিল, যাহা হইতে পরবর্তী মার্কসবাদীগণ—লেনিনসহ, বঞ্চিত। লেখক ইহা লিখিয়াছেন।

মার্কসবাদের সমস্যাকে কেবল প্রয়োগের সমস্যারূপে দেখিলে এইরূপই হয়। শেষ পর্যন্ত বলিতে হয় মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌ও যথেষ্ট পরিমাণে মার্কসবাদী হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

এইরূপ চিন্তাধারা মার্কসবাদীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। যেহেতু তাহারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সংসারে এরূপ 'মার্কসবাদী' দেখা যায়, যাহারা মার্কসবাদ ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য সকল ব্যাপারে পরিবর্তন, সংশোধন, উন্নতি ও বিকাশে বিশ্বাসী। মার্কস-এঙ্গেল্‌সের রচনা কালানুযায়ী

পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে কোনো-এক পরম মুহূর্তে তাঁহারা মার্কসবাদী তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে কেবল সাময়িক প্রয়োজনে তাহাকে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। আবিষ্কার, প্রয়োগ ও বিকাশ পাশাপাশি চলিয়াছে তাঁহাদের জীবনেব শেষাবধি। এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পরও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহারা জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রয়োগ করিয়াছেন, নতুন জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, পুরাতন আবিষ্কারকে উন্নত, সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন এবং পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন।

মার্কস-এঙ্গেল্‌সের রচনার সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা এ কথার যথার্থতা বিচার করিবেন। অতএব মার্কসবাদী তত্ত্ব মার্কস-এঙ্গেল্‌সের জীবনকালে তাঁহাদের কর্ম-চিন্তা-অভিজ্ঞতার বহু বিচিত্র পথে যুগপৎ ব্যর্থতা ও সার্থকতার দ্বারা চিহ্নিত হইতে হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকেও এই একই পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে। ব্যর্থতা ও সার্থকতার দ্বারা চিহ্নিত ও সমৃদ্ধ হইয়া প্রয়োগ ও বিকাশ, ইহাই মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মের ইতিহাস।

আমরা যদি অপর পক্ষে মার্কসবাদকে এক absolute category রূপে দেখি, তবে শেষ পর্যন্ত মার্কস-এঙ্গেল্‌সকেও আর যথেষ্ট পরিমাণে মার্কসবাদী বলিতে পারি না। যেমন লেখক পারেন নাই।

অতএব মার্কস-এঙ্গেল্‌সের রচনায় কৌলীন্য রক্ষা পাইল, অথচ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

লেখক লিখিয়াছেন মার্কস-এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের হস্তে মার্কসবাদের বিড়ম্বনার প্রধান কারণ হইল, ইহারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনকে যথাযোগ্যভাবে উপলব্ধি ও প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। ইহার উপলব্ধি না হওয়ায় পরবর্তী মার্কসবাদীগণ মার্কসীয় তত্ত্বকে কেবলই বিকৃত করিতেছেন, খণ্ডিত করিতেছেন এবং সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে কেবলই তাহাকে দুমড়াইতেছেন, মুচড়াইতেছেন। সম্ভবত ইহাই তাহাদের কৌলীন্য-হানির কারণ হইয়া থাকিবে।

কিন্তু আমি উপরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে লেখক স্বয়ং এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ লইয়া গর্ব করিতে পারেন না। ফলে, তিনি মার্কস-পরবর্তী মার্কসবাদীদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনদৃষ্টির অভাব লইয়া যে-আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে দরিদ্র বুদ্ধির ছিন্ন বসন দরিদ্র বুদ্ধিকে আবৃত করিতে সক্ষম হয় নাই। লেখক লিখিয়াছেন, মার্কসবাদ "মূলত একটি প্রয়োগ-প্রণালী, যার ভিত্তি বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক রীতি।" লেখক সম্ভবত, ইংরাজিতে যাহাকে methodology বলে, প্রয়োগ-প্রণালী বলিতে তাহাই বুঝিয়াছেন। আমিও সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিব।

মার্কসবাদ একটি সুদৃঢ় প্রয়োগ-প্রণালীর উপর দণ্ডায়মান আছে তাহা সকলেই মানিবেন। এই প্রয়োগ-প্রণালী হইল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রয়োগ-প্রণালী। মার্কসবাদের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যই হইল তাহার উক্ত প্রয়োগ-প্রণালী। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রকৃতিবিজ্ঞানও একটি প্রয়োগ-প্রণালীর উপর দণ্ডায়মান। যদি কহি, পদার্থবিদ্যা একটি সুসংগত প্রয়োগ-প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে সত্য কথাই বলা হইল। কেননা, পদার্থবিদ্যা যেনতেন প্রকারেন অবশ্যই গড়িয়া ও বাড়িয়া ওঠে নাই। কিন্তু যদি বলি, পদার্থবিদ্যা মূলত একটি প্রয়োগ-প্রণালী, তবে তাহা সঠিক হইবে না। কেননা, নিজস্ব প্রয়োগ-প্রণালী ও তাহার মাধ্যমে সম্ভাব্য পদার্থ বিষয়ে আহৃত যে-জ্ঞান তাহাই হইল পদার্থবিদ্যা। অনুরূপ ভাবে মার্কসবাদ মূলত প্রয়োগ-প্রণালী, এইরূপ কহিলে মার্কসবাদী প্রয়োগ-প্রণালীর যত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই থাক না কেন, মার্কসবাদকে খণ্ডিত করিয়া দেখা হয়। লেখক অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন।' আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, প্রয়োগ-প্রণালী ও জীবন-দর্শন কি লেখকের নিকট সমার্থক? সম্ভবত নহে। জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার একটি বিশেষ প্রণালী, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা এবং সেই ধারণা অনুযায়ী জগৎ ও জীবনকে চালনা করিবার কর্মসূচী—ইহাই সংক্ষেপে জীবন-দর্শন বলিতে সম্ভবত বুঝি। মার্কসবাদী জীবন-দর্শন বলিতে কি বুঝি? সংক্ষেপে, জগৎ ও জীবনকে দেখিবার একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী। এই প্রণালী হইল বস্তুবাদী এবং ইহা জাগতিক নিয়ম ও সেই নিয়মের অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক চরিত্রের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতি, সমাজ এবং

সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আহৃত যে-জ্ঞান-সম্ভার এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রকৃতি ও সমাজকে চালনা করিবার যে-কর্মসূচী তাহাও মার্কসবাদের সমান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই সাথে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আহৃত জ্ঞান ও কর্মসূচীর মধ্যস্থলে উহাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করিতেছে একটি নীতি ও মূল্যবোধ যাহা মার্কসবাদী প্রয়োগ-প্রণালী ও আহৃত জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত।

এখন মার্কসবাদ একটি জীবন-দর্শন, ইহাই বৃহত্তর সত্য। কিন্তু মার্কসবাদ মূলত একটি প্রয়োগ প্রণালী এইরূপ কহিলে মার্কসবাদকে খণ্ডিত করিয়া দেখা হয়।

লেখকের ক্ষোভের বিষয় হইল এই যে মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞানের অভাবে পরবর্তী মার্কসবাদীগণ মার্কসবাদকে খণ্ডিতাকারে ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্র মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মের প্রয়োগ ঘটিয়াছে, জোর পড়িয়াছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে অবহেলিত হইয়াছে। পরিণামে মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্ম একপেশে হইয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগ

লেখকের প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে "অতীতের অগণতান্ত্রিক আচরণবিধি" এবং "বর্তমানের বৈকল্য" তাহাকে পীড়িত করিতেছে। বর্তমানের বৈকল্য বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন? সম্ভবত, "স্বদেশে নিঃস্তালিনিকরণের উগ্র তাণ্ডব", "শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীন মত প্রকাশে অশালীন ও উদ্ধত হস্তক্ষেপ", তথাকার মার্কসবাদীগণ কর্তৃক অদ্যাপি মার্কসবাদকে "কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির হাতিয়ার" রূপে দেখার প্রবণতা, সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে "একজাতীয় নির্মননশীল অর্থ-উপার্জন-সর্বস্ব মানসিকতার বিকাশ", "আধুনিক চিন্তাজগতের বিতর্কমূলক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা", অথচ "নিকৃষ্ট হিন্দী চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ" এবং আরো অন্যান্য বিষয়।

লেখক সোভিয়েতের এই অতীতের অগণতান্ত্রিক আচরণবিধি ও বর্তমানের বৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে বিপ্লবের পূর্বে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত অগণতান্ত্রিক সংবিধান এবং

বিপ্লবের পরে মার্কসবাদকে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতিয়ার রূপে দেখার প্রবণতাই ইহার জন্য দায়ী। মার্কসবাদকে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সাময়িক প্রয়োজনে খণ্ডিতাকারে গ্রহণ ও প্রয়োগ করার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। লেনিনের পার্টির সংবিধান মার্কসবাদকে কেবল রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যন্ত্ররূপে দেখার ফল। সুতরাং সেই সংবিধানে গণতন্ত্রের অভাব ছিল, যাহা পার্টি সদস্য ও কর্মীদের ব্যক্তিসত্তাকে লোপ করিয়া তাহাদের সেণ্ট্রাল কমিটির হাতের যন্ত্রে পরিণত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং রোজা লুক্সেমবুর্গ এ বিষয়ে ১৯০৪ সালে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রুশ বিপ্লবের পরে তিনি পুনরায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এবার কেবল পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্পর্কেই নহে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র সম্পর্কেই, যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি তখন দেশের চালক এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ রীতিনীতি সাবা দেশে প্রসারিত। কিন্তু কেহই তাঁহার সতর্কবাণীতে কান দেন নাই। অবশেষে বিংশ কংগ্রেসে আমরা জানিলাম রোজা লুক্সেমবুর্গের উদ্বেগ কত খাঁটি ছিল।

লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন যে লেনিনের ১৯০৪ সালের পার্টি সংবিধান যদি মার্কস-এব প্রথম আন্তর্জাতিকের গণতান্ত্রিক সংবিধানকে অনুসরণ করিত তবে বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যাইত। তবে লেখক লিখিয়াছেন যে তখন নানা কারণেই তাহা অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন হইল, মার্কস-এর প্রথম আন্তর্জাতিকের সংবিধানের চরিত্র কিরূপ ছিল। আমি বলিব, প্রধানত কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রই ছিল তাহার চরিত্র।

তথায় আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, কেন্দ্রিকতার অনুশাসনও সেইরূপ ছিল। বাকুনিন কিন্তু বলিয়াছেন, মার্কস আন্তর্জাতিক হইতে সংখ্যালঘুর গণতান্ত্রিক অধিকাবকে হরণ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ কেন্দ্রিকতার শৃঙ্খলে সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনকে বাঁধিতে প্রয়াসী। তাঁহার মতে মার্কস আন্তর্জাতিকে নিজ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করিতে প্রয়াসী। প্রথম আন্তর্জাতিকে গণতন্ত্রের যথেষ্ট অভাব বোধ করিয়াই বাকুনিন সদলবলে আন্তর্জাতিক পরিত্যাগ করেন।

লেনিনের সংবিধানও ছিল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন, যদি বসি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আসলে কেবল

কেন্দ্রিকতা, গণতান্ত্রিক শব্দটি কেবলমাত্র অলংকার তবে তাহা স্বতন্ত্র তর্ক। কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে-নীতির সহিত আমরা পরিচিত, তাহাতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের নীতির কোথাও ব্যত্যয় হয় না। কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সংকোচ করিয়া যদি কেন্দ্রিকতার আধিপত্য পার্টিতে বাড়িয়া যায়, তবে তাহার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। অন্যথায়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতাকে সমান মূল্য দিয়া থাকে। আমাদিগকে প্রমাণ দিতে হইবে লেনিনের পার্টি-সংবিধানে আইনত গণতন্ত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রিকতাব আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। নতুবা মেনশেভিকদের যুক্তি যে-কারণে অগ্রাহ্য, সেই কাবণে রোজা লুক্সেমবুর্গেব যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

"লেনিনেব নেতৃত্বে যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দল" তৈরি হয়েছিল, সেই বলশেভিক পার্টির ভিতর অনমনীয় অনুশাসন সত্ত্বেও বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সদস্য—কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, অভ্যুত্থানের কর্মসূচী প্রকাশ্যে ফাঁস কবিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে বিতাড়িত ও পরে অনুতপ্ত হইলে পুনরায় তাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমরা এই ঘটনায় বলশেভিক পার্টির অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রেরই সাহায্য পাই।

কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের সংকোচ ও ব্যক্তিতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ইহার কারণ কি? ইহার কাবণ কি এই যে সংবিধানের গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে একটি একটি করিয়া বাতিল করা হইয়াছিল! ফলে, কেন্দ্রিকতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং ক্রমশ একটি মাত্র ব্যক্তি ও তাহার বশংবদদেব হাতে সংহত হয়? ইতিহাস তাহা বলে না। পার্টি-সংবিধানে গণতান্ত্রিক নীতি ও বিধানগুলি অক্ষত ছিল। কিন্তু তাহা ক্রমশ অকেজো হইয়া পড়ে। এবং পার্টিতে নতুন সংস্থা যোজিত হয় অথবা পুরাতন সংস্থা ক্ষমতাবান হইয়া উঠে, যাহা কালে কেন্দ্রিকতার শক্তিকে বাড়াইয়া তোলে। পার্টির অভ্যন্তরে যাহা ঘটিয়াছে, সারা দেশেই তাহা প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই বা সম্ভব হইল কিরূপে?

আমার তো মনে হয় এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যক্তির যথার্থ ভূমিকার মধ্যে নিহিত।

মার্কসবাদ ১৯১৭ সালের পর যে-সকল নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে, ব্যক্তি-নেতৃত্ব বনাম ব্যক্তি-কর্তৃত্বের প্রশ্নটি তাহাদের অন্যতম। সমাজতান্ত্রিক

আন্দোলন একটি সচেতন, সুসংবদ্ধ আন্দোলন। কর্ম ও জ্ঞান সে আন্দোলনের রক্ত-মাংস। শ্রমিক ও শ্রমজীবি শ্রেণীগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। লেনিন বলিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার ফল। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে তবে সার্থক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করা যায়। এই সমন্বয় সাধন ও পরিচালন সচেতন নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দল সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু কেবল দলগত নেতৃত্ব অর্থাৎ সমষ্টি-নেতৃত্ব নহে, ঠিক একই কারণে শক্তিশালী ব্যক্তি-নেতৃত্বেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এইখানে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবে ব্যক্তির ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদকে সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগ করিয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার তাগিদ হইতে এক বা একাধিক পথপ্রদর্শক, নেতা বা শিক্ষকের আবির্ভাব ঐতিহাসিক নিয়মের পথে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। কিন্তু নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গী। মার্কসবাদী জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে যিনি শিক্ষক, মার্কসবাদী কর্মের ক্ষেত্রে তিনি নেতা, পরিচালক। এই পরিচালনা কর্তৃত্ব সৃজনকারী। ফলে যিনি নেতা, তিনি কর্তাও বটেন। কিন্তু এই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব যেমন পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তেমনি সংগ্রামও করিতেছে। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে উপযুক্ত পরিবেশে নেতৃত্ব ক্রমশ তাহার আসন কর্তৃত্বকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। তখন নেতার বদলে কেবল দেখি কর্তাকে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ব্যক্তি-নেতৃত্ব ও ব্যক্তি-কর্তৃত্বের জটিল দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রশ্নটি বড়ো হইয়াছে। কেননা, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর রাষ্ট্রক্ষমতাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবের প্রয়োজনে প্রয়োগ করার সুযোগ ও কর্তব্য—দুই-ই উপস্থিত হয়। তখন আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকাও যেমন বাড়ে, সেই নেতৃত্বের কর্তৃত্বও তেমনি নতুন ও অধিকতর শক্তি লাভ করে। সমষ্টি-নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও যেমন এ কথা প্রযোজ্য, ব্যক্তি-নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ততখানি প্রযোজ্য।

এখন, নেতৃত্ব সমগ্র অর্থে, এবং ব্যক্তি-নেতৃত্ব বিশেষত, যত সঠিক, যত

প্রাজ্ঞ, যত সফল, অনুগামীদিগের মধ্যে তাহার প্রভাব তত বেশি, তাহা অনুগামীদিগের তত প্রিয়। এই প্রভাব ক্রমশ প্রতিপত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, এবং প্রতিপত্তি অবশেষে আধিপত্যে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এই প্রভাব—প্রতিপত্তি—আধিপত্য, ইহাদের মধ্যেকার সীমারেখাগুলি কোথায় টানিব? কার্যক্ষেত্রে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রভাব তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া কখন প্রতিপত্তিতে পরিণত হইতেছে, কার্যক্ষেত্রে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু এই গতির স্রোতপথে তাহা যখন আধিপত্যে পর্যবসিত হয়, তখন সে সম্পর্কে সচেতন হইলেও তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হয়। কেননা, আধিপত্য তখন আপনাকে অটুট রাখিবার জন্য নানাবিধ বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলে।

নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি সম্পর্কে মার্কসবাদীগণ যথোপযুক্ত ভাবে সচেতন থাকিলে এই সমস্যা সম্ভবত সংকটে পরিণত হইবার পূর্বেই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদী চিন্তা কর্মের ক্ষেত্রে সমষ্টির ভূমিকা সম্পর্কে যতখানি সচেতনতার পরিচয় দিয়াছে, ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ততখানি চিন্তা করে নাই। ব্যক্তি যেহেতু ইতিহাসের সৃষ্টি, অতএব তাহাকে ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত ও ইতিহাস-চালিত উপাদানরূপে দেখার প্রবণতা মার্কস-বাদীদের মধ্যে কম-বেশি পরিমাণে ছিল। কিন্তু ব্যক্তি ইতিহাস-সৃষ্ট হইলেও সে যে পরিণামে পুনরায় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, সে-কথা তাহারা সকল সময়ে মনে রাখে নাই। অথচ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ব্যক্তির ভূমিকা নেতারূপে শিক্ষকরূপে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের চাহিদা ব্যক্তি-নেতৃত্বকে সৃজন করিয়াছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি-নেতৃত্ব পুনরায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবের গতিপথকে আপনার ব্যক্তিত্ব, বোধী এবং অসম্পূর্ণতার দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন, প্রভাবিত করিয়াছেন।

এইরূপ হইতে বাধ্য, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লব সামাজিক নিয়মের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের অন্ধ ও যান্ত্রিক পরিণতি নহে। ইহা মানুষের সচেতন প্রয়াসের পরিণতি, যদিও সে প্রয়াস অবশ্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত।

অতএব সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতির উপর বিশেষ ব্যক্তির ভালো বা মন্দ প্রভাবের আলোচনায়

ব্যাপৃত হইলে তাহাদিগকে অ-মার্কসবাদী বলিয়া তিরস্কার করার কারণ নাই। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নানাবিধ অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনায় স্তালিনের ব্যক্তি-নেতৃত্বের ভূমিকার উপর জোর দিলে, কেবল সেই কারণে তাহাদিগকে অকুলীন মার্কসবাদী বলিয়া তিরস্কার করিলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না।

সোভিয়েতের অতীত ভুল ত্রুটির অপরাপর ঐতিহাসিক কারণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু সেই ভুল ত্রুটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকার উপর কেন অত্যধিক জোর দেওয়া হইতেছে, তাহা লইয়া অভিযোগ মার্কসবাদ-সম্মত নহে। আমাদের বক্তব্য মার্কসবাদী আন্দোলনে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং যে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি অর্থাৎ উক্ত আন্দোলনে ব্যক্তি নেতৃত্ব ও ব্যক্তি কর্তৃত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও তাহা হইতে উদ্ভূত যে-সকল সমস্যা, তাহার সঠিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, লেখক সোভিয়েত বিপ্লবের অতীত ভুল ত্রুটির কারণ বিশ্লেষণে স্তালিনের ব্যক্তি-নেতৃত্বের ভূমিকার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় রাগিয়া আছেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত এঙ্গেল্‌সের উক্তিটিকেই আরো একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিব।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, লেখক লেনিনসহ রুশ মার্কসবাদীদের সমালোচনা করিয়াছেন যে তাঁহারা মার্কসবাদকে বিপ্লবের পূর্বে কেবল ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার রূপে ও বিপ্লবের পরে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার উপায় রূপে দেখিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের সংকীর্ণতা ও মার্কসবাদ সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণার পরিচায়ক।

আমি পড়িয়া বিস্মিত হই, ধনতন্ত্র ও শ্রেণীসমাজকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ গঠনই যেখানে মানবতার পূর্ণ বিকাশের প্রথম সর্ত, সেখানে বিপ্লবের পূর্বে রুশ দেশের মার্কসবাদীগণ মার্কসবাদকে প্রধানত রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের হাতিয়ার রূপে দেখিয়া কি দোষ করিলেন! এইখানে লেখক বলিতে পারেন, প্রধানত হইলেও কথা ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র হওয়াতেই যত আপত্তি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, রুশ বিপ্লবের পূর্বে তথাকার মার্কসবাদীগণ কি মার্কসবাদকে কেবল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের যন্ত্ররূপে দেখিয়াছেন? সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তথায় কি মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্মের নজীর নাই? আমি আরো বিস্মিত, যখন পড়ি বিপ্লবের পরে রুশ

মার্কসবাদীগণ মার্কসবাদকে 'কেবলমাত্র' অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার উপায়রূপে দেখিয়া লেখক কর্তৃক নিন্দিত হইতেছেন।

প্রথমত, যদি 'কেবলমাত্র' তাহাই হইত, তবে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয় হইত। মার্কসবাদ বিপ্লবের পর 'কেবলমাত্র' অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার উপায় হইতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ খাটে কি না, তাহা পরে আলোচ্য। কিন্তু যদি কেহ বলেন, কেবলমাত্র না হইলেও প্রধানত বটে। তবে আমরা বলিব তাহা তো সঠিকই হইয়াছে। কেন এই কথা বলিব? সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মের প্রেরণা কি? তাহা হইল এই যে সমাজের সকল দরিদ্র, নির্যাতিত মানুষের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুখ, সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করিতে হইবে। এক কথায় মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ সাধন করিতে হইবে।

মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ প্রণালীর বৈশিষ্ট্যই এই যে মানবতার পূর্ণ বিকাশের প্রথম সর্ত রূপে তাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীসমাজের উচ্ছেদ পূর্বক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তর-করনকেই নির্দেশ করিয়াছেন।

লেখক দেখিলাম একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে, "মার্কস যে সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এই—কর্মদক্ষতাকে নিছক উপায়ের স্তর থেকে উন্নীত করে তাকে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।" মানবতার পূর্ণ বিকাশের ইহাই পন্থা, ইহাই সর্ত। তিনি আরো বলিতেছেন, "ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে শ্রমশক্তি যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যয়িত হয়, সেই সময়কাল সংক্ষেপিত করতে পারলেই এই কর্মশক্তির স্বাধীন প্রসার সম্ভব।" অতি উত্তম কথা। কিন্তু লেখক কি চিন্তা করিয়াছেন, উক্ত 'সময়কাল সংক্ষেপিত' করার প্রচেষ্টা বাস্তবে কি তাৎপর্য বহন করে?

বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি।

কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির কর্মজীবনে অবকাশ সৃষ্টি করিতে হইলে যে বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে তাহা সামান্য নহে। সেই অবকাশ সৃষ্টি করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তরে মার্কসবাদীগণকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বিপুল উৎপাদনের প্রয়োজনের উপর যারপরনাই জোর অবশ্যই দিতে হইবে। নতুবা ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে যে শ্রমশক্তি ও সময়কাল ব্যয়িত

হয়, তাহাকে কেবল তর্ক করিয়া ও গালিগালাজ করিয়া সংক্ষেপিত করা সম্ভব হয় না।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে লেখক আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, অথচ সেই দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ-প্রণালীকে ব্যবহার করিয়াই মার্কসবাদীগণ অর্থনীতির উপর কেন অত্যধিক জোর দিয়া থাকেন, লেখক তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। ইহাকেই আমরা দরিদ্র বুদ্ধির ছিন্ন বসন বলি।

কিন্তু লেখক বলিতে পারেন, প্রধানত জোর না পড়িলে কথা নাই। কিন্তু 'কেবলমাত্র' হওয়াতেই যত আপত্তি।

আমরা প্রশ্ন করিব, বিপ্লবের পর রুশ মার্কসবাদীগণ কি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনাকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন? অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি কি সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো নজর পড়ে নাই?

ইহার উত্তরে আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি পরিচয়-এর আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীসুজয় মিত্রের প্রবন্ধের প্রতি আকর্ষণ করিব। এই প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ তথ্য ও ধারালো যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। আমি কেবল একটি বিষয়ে আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিব। প্রথমেই বলি, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে গুরুতর ত্রুটি আছে, তাহা আমরা মানি। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত কৃতিত্ব সব সময় প্রশংসনীয় হয় নাই। ইহার কারণ যে সাধারণভাবে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এখনও এই দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিলেও তাহা আমাদের নিকট পুরাপুরি সমর্থনীয় হয় নাই। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ইহার আলোচনা পরে করিব।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও আমরা কি বলিব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারে নাই? ইলিয়া এরেনবুর্গের একটি উক্তি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে দেখিলাম। এরেনবুর্গ যে-উদ্দেশ্যেই উক্ত মন্তব্য করিয়া থাকুন, কিন্তু স্পুৎনিক সম্পর্কে লেখকের কলমে যে এক প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এমন কি তাহার নিজ প্রতিবাদ সত্ত্বেও। সোভিয়েত স্পুৎনিক সোভিয়েত বিজ্ঞান সাধনার ফলমাত্র

নয়, সেই সাধনার অগ্রগতি ও গভীরতার প্রতীক ও প্রমাণও বটে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান সাধনায় যে বিপুল ও বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই মানিবেন। আমাদের প্রশ্ন সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত এই বিজ্ঞান সাধনার সম্পর্ক কি? এই সাধনার অগ্রগতি সোভিয়েত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিসের তাৎপর্য বহন করে? একটি জাতির বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস কি সেই জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস হইতে পৃথক?

ইউরোপের রেনেসাঁস ও তৎপরবর্তী সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথাকার বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস হইতে পৃথক নহে। অথচ আমরাই পুনবায় মহাকাশে স্পুৎনিক বিচরণ করিতে থাকিলে তাহাকে যথাসাধ্য তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া 'কিন্তু সোভিয়েত সংস্কৃতির কি হইল' এই বলিয়া চিল্লাচিল্লি করিতে থাকিব। যেন সোভিয়েত স্পুৎনিক সোভিয়েত বিজ্ঞান সাধনার অঙ্গ নহে, এবং সোভিয়েতের বিজ্ঞান সাধনার সাথে সোভিয়েতেব সাংস্কৃতিক কোনো যোগ নাই। মধ্যযুগীয় সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারেব শৃঙ্খল হইতে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার মুক্তি কিরূপে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলিয়াছিলেন, নিছক নাস্তিকতার প্রচার দ্বারা নহে; বিজ্ঞান-চর্চাকে প্রসারিত কর।

অতএব, সোভিয়েত সংস্কৃতির বিকাশের আলোচনায় তথাকার বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানের অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবীরূপেই সোভিয়েত সংস্কৃতির বিকাশের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বচনাতেই মশগুল হয়ে আছে, এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে, এইরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করা হয় না।

লেখক এইখানে বলিতে পারেন, বিজ্ঞানের এইরূপ অগ্রগতি তো ধনতান্ত্রিক দেশেও হইতেছে। আমরা কি তবে বলিব, ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেও মানব-সংস্কৃতির অগ্রগতি হইতেছে? অশিক্ষিত ও গোঁয়ার হইলে বলিব—না। কিন্তু কোনো মার্কসবাদীই এইরূপ বলেন না যে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে কেবল অবনতি ও ক্ষয়ই হইতেছে। তথায় শ্রেণীস্বার্থের হস্তক্ষেপে একদিকে যেমন ক্ষয় ও অবনতি, তেমনি এই শ্রেণীসমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়ম অনুযায়ীই

অপর দিকে প্রগতি পাশাপাশি চলিয়াছে। শ্রেণীসমাজের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের নিয়ম অনুযায়ীই তাহা হইতেছে।

লেখক সোভিয়েত ইউনিয়নে অতীতের অগণতান্ত্রিক আচরণবিধির যেমন উৎস সন্ধান করিয়াছেন, বর্তমানের বৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতেও তেমনি ভোলেন নাই। তাঁহার মতে সোভিয়েতের বর্তমান বৈকল্যের একটি দিক হইল তথায় মার্কসবাদকে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রচনার হাতিয়ার রূপে দেখার প্রবণতা। উপরে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সোভিয়েতের অপরাপর বৈকল্যের হিসাব কি? 'শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীন মত প্রকাশে উদ্ধত ও অশালীন হস্তক্ষেপ', 'আধুনিক চিন্তাজগতের বিতর্কমূলক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা' অথচ 'নিকৃষ্ট হিন্দী চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ' প্রভৃতি।

এ সম্পর্কে শ্রীসুজয় মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে যে যুক্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিব।

আমি কেবল একটি বিষয়ে আলোচনা করিব। তাহা হইল এই যে, লেখক বর্তমানের বৈকল্যের উদাহরণস্বরূপ সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে 'এক জাতীয় নির্মননশীল অর্থ-উপার্জন-সর্বস্ব মানসিতার বিকাশের' উল্লেখ করিয়াছেন। আমার প্রশ্ন আধুনিকতম বিতর্কমূলক সৃষ্টিকর্মের কথা বাদ দিলেও, সোভিয়েত জনসমাজে বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যের যুগ-সঞ্চিত সম্পদ সম্পর্কে যে আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ করা যায় তাহা কি তাহাদের নির্মননতার পরিচয় বহন করে? একটি উদাহরণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি তাহাদের আগ্রহ বিশ্ববিদিত। আমরা বাংলাদেশে বসিয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর গৌরবে বাঙালির মননশীলতা লইয়া গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই রচনাবলী সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশিত হইলে তাহাকে নির্মননশীলতা বলিয়া তিরস্কার করিব কেন? এইরূপ উদাহরণের কি শেষ আছে? আমরা কি তবে বলিব যে সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক উৎসাহ বীটনিক অথবা অ্যাংরি জেনেরেশান-সদৃশ কাব্য-সাহিত্য অথবা বিমূর্ত শিল্পরূপে এই মুহূর্তে মূর্তিমান হইয়া না উঠিলেই সোভিয়েত জনমানসকে নির্মননশীল বলিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে? তবে যে-সকল দেশে ইহা প্রবল, সেই সকল দেশের মননশীলতা কি কেবল এই কারণেই তর্কাতীত?

লেখক আমাকে ইয়েভ্‌তুশেংকোর আত্মজীবনী পড়িতে দিয়াছিলেন।

আমি তথায় দেখিলাম তিনি সোভিয়েত সমাজের অতীত বর্তমানকে নির্দয়রূপে সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই পুনরায় লিখিয়াছেন :

> 'The best of the younger generation may wear stove-pipe trousers, like Jazz music, even dance to rock' n' roll, but this in no way prevent them from believing in the revolution. They read Hemingway, Remarque, Salinger Kerouac and Kingsley Amis, they see foreign films and plays by Tennessee Williams and Miller, they stand in an endless queue for an exhibition of Picasso or Le´ger, but they criticise what is wrong with bourgeois culture and fight for then own socialist culture none the less. All it means is that their tastes have become more varied and their outlook has grown wider.

লেখককে আমি প্রশ্ন করি তিনি কি ইহাকে মিথ্যা ভাষণ বলিয়া মনে করেন ? যদি তাহা না হয় তবে আমরা কি বলিব ইহাকে সোভিয়েত সংস্কৃতির বিকাশশীল ধারা বলা যায় না ? যদি ইহা উক্ত সমাজের বিকাশশীল ধারার ইঙ্গিত বহন করে, তবে ইহা কি নির্মননশীলতার, আধুনিক চিন্তাজগতের বিতর্ক-মূলক সৃষ্টিকর্মের প্রতি উদাসীনতার ও নিকৃষ্ট হিন্দী চলচ্চিত্রের সম্পর্কে উৎসাহের বিকাশ ?

লেখক নিজেই লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েতের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি 'বিশ্বের মানবতাবাদীদের সমাদর লাভ করছে,' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্যাতিত জাতির বন্ধু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।'

আমার ধারণা লেখক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি, মানবতাবাদ, নির্যাতিত জাতি ও সোভিয়েতের প্রতি সেই সকল জাতির বন্ধুত্ব ইত্যাদির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝেন। যদি তাহাই হইবে, তবে আমরা কি বলিব ইহা সম্ভব হইল সোভিয়েত জনমানসে এক জাতীয় অর্থ-উপার্জন-সর্বস্ব মানসিকতার বিকাশের ফলে ?

কার্য-কারণ সম্পর্কে লেখকের ধারণা যদি এইরূপ হয়, তবে তাহা মার্কসবাদীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে না।

লেখক তথাকার 'শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীন মত প্রকাশে উদ্ধত ও অশালীন হস্তক্ষেপে' বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কে করিতেছে? সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি? ক্রুশ্চভ?

শুধু ক্রুশ্চভ হইলে হয়তো বা লেখকের এত দুশ্চিন্তা হইত না। কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক হস্তক্ষেপই শিল্পী সাহিত্যিকের স্বাধীনতায় সত্যকার বাধা হইয়া দাঁড়ায়। লেখক হস্তক্ষেপ বলিতে কি বুঝিয়াছেন? সোভিয়েত ইউনিয়নে কি আইন করিয়া কী লিখিতে হইবে, আঁকিতে হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে? না, তাহা নহে।

তবে আমরা ইহা মানি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবাকারে শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ, রীতি, নীতি, শিল্পী সাহিত্যিকের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করিতেছে, পথ নির্দেশ করিতেছে। অতীতেও তাহা হইয়াছে এবং অধিক পরিমাণে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব পরিস্থিতিতে তাহা আইনত না হইলেও কার্যত শিল্পী সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মকে প্রভাবিত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ব্যক্তিত্বের স্রোতোপথে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হইতেছে না।

আমি প্রশ্ন করিব, এরূপ কোনো সমাজ বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে সম্ভব কি না, যেখানে শিল্পী সাহিত্যিক সৃষ্টিকার্যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন? আমরা শিল্প-সাহিত্যের স্বাধীনতার হাওয়ায় মানুষ। তথাপি কত ভাবে, কত অসংখ্য পথে, কত বিচিত্র রূপে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার উপর অন্যান্য শক্তির প্রভাব, উপদেশ, নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার চাপ পড়িতেছে, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়াছি? সামাজিক মানুষ হিসাবেই শিল্পী সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাহার শিল্পী-ব্যক্তিত্ব তাহার নিজস্ব সৃষ্টি নহে এবং তাহার সৃষ্টিকর্ম কেবল তাহারই ব্যক্তি-মানসের অভিব্যক্তি নহে।

লেখক বলিতে পারেন, এইরূপ প্রভাবে তাহার ক্ষোভ নাই। ক্ষোভের কারণ হইল কমিউনিস্ট পার্টির মত প্রকাশ ও পথ নির্দেশের ধৃষ্টতা। একটি রাজনৈতিক দল দেশের একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতার বলে যদি শিল্প-সাহিত্যের পথ বাত্‌লাইতে থাকে, তবে তাহা দুর্গতি বটে।

কিন্তু লেখককে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে কমিউনিস্ট পার্টি কেবল একটি রাজনৈতিক দলমাত্র নহে। একটি বিরাট জীবন-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সর্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্র। লেখক মার্কসবাদী আন্দোলনকে

কেবল রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন। অথচ, কমিউনিস্ট পার্টি কেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করিবে, পথ নির্দেশ করিবে, তাহা লইয়া তিনি ক্ষুব্ধ। সোভিয়েত মার্কসবাদীগণ কি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বাহিরে বিরাজ করেন, না সেখানকার মার্কসবাদী চিন্তা ও কর্ম পার্টির বাহিরে চলিতেছে ?

যদি কেহ বলেন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নীতি ও প্রস্তাবের সহিত তিনি একমত নন, ওই নীতি ও প্রস্তাব সঠিক নহে এবং শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের অনুকূল নহে, আমরা অনেকাংশে তাহার সহিত এক মত হইব। কিন্তু তিনি যদি শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মত প্রকাশ ও পথ নির্দেশ করিবার অধিকার কমিউনিস্ট পার্টিকে না দিতে চান, তবে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। মার্কসবাদী আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে কমিউনিস্ট পার্টি সব সময়েই এই অধিকার ভোগ করিতে থাকিবে। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে কমিউনিস্ট পার্টির অভিমতেব সহিত শিল্পী-সাহিত্যিকের সঠিক সম্পর্ক নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সম্পর্ক ব্যবহাবিক ক্ষেত্রে মুক্ত ও সঠিক নহে। ফলে বহু ক্ষেত্রে শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের উৎসে আঘাত পড়ে এবং সৃষ্টিকার্য ব্যাহত ও সংকুচিত হয়।

এই কারণেই মার্কসবাদী মহলে শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে-প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক শিল্পী-সাহিত্যিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

আমরাও তাই। কিন্তু আজিকার বিতর্কের বিষয় হইল মার্কসবাদীর চক্ষে এই স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্য কি ? যদি এইরূপ বলা হয় যে শিল্পী-সাহিত্যিক আপনার সৃষ্টিকর্মে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকুক, তবে বলা প্রয়োজন যে এরূপ পূর্ণ স্বরাজ কোনো সমাজের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সুদূর ভবিষ্যতে কী ঘটিবে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরেও, আমরা সকলেই একমত যে সোভিয়েত নাগরিক নাগরিক হিসাবে যা খুশি বলিবার বা করিবার অধিকার ভোগ করিতে পারে না। সে নিশ্চয়ই ইহুদি-বিদ্বেষ, ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র স্বাজাত্যবোধ, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রচার করিতে

পারে না। সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্টি তাহাকে বাধা দিতে ও সংকুচিত করিতে বাধ্য। অর্থাৎ সোভিয়েত নাগরিক সোভিয়েত সমাজের প্রয়োজন, নীতি ও মূল্যবোধের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। এই সীমারেখাকে বিস্তৃত করা যাইতে পারে, পরিবর্তন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কোন স্থানে সীমারেখা টানিতে হইবে, কোথায় টানিব ইহা লইয়া বিতর্ক শেষ হইবার নহে। কেননা কালের গতিতে পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী নীতি, প্রয়োজন ও মূল্যবোধের অবিরাম পরিবর্তন চলিবে এবং এই পরিবর্তনের ফলে বিকাশশীল ও রক্ষণশীল প্রয়োজন, নীতি ও মূল্যবোধে সংগ্রাম-সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে। জ্ঞান ও বোধির সংকীর্ণতার ফলে বহু ক্ষেত্রে বেজায়গায় সীমারেখা টানা হইবে। ফলে শিল্প-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু সংগ্রামও চলিবে। যেমন ঘটিয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়নে অতীতে, চলিতেছে বর্তমানে। বিমূর্ত শিল্প সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মনোভাব কী হইবে, তাহা লইয়া মার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বিষয়টা কাব্যে ইহুদি-বিদ্বেষ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল। ফলে মতপার্থক্য ও বিতর্কও জটিল ও দ্বন্দ্বপূর্ণ; এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-মত প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। নীতি ও মূল্যবোধের সংঘাত দেখা দিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সৃষ্টির স্বার্থে শিল্প-সাহিত্যের বিচারকে মহাকালের হাতে জিম্মা করিয়া দিয়া শিল্পী সাহিত্যিককে পূর্ণ স্বরাজ দিবার কথা কেহ চিন্তা করেন না। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পী-সাহিত্যিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কোনোরূপ সীমা থাকিবে কি না, ইহা প্রশ্ন হইতে পারে না।

সীমারেখা কোথায় টানিব, কতদূর বিস্তৃত করিব—কোন নীতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য, ইহাই প্রশ্ন এবং ঐ প্রশ্ন খুবই যুক্তিসংগত।

এই কারণেই বলিয়াছি, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভিমতের সহিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্ক সঠিক হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে গুরুতর ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি হইল এই যে সোভিয়েত মার্কসবাদীদের এক বিশেষ অংশের এক বিশেষ সময়ের প্রয়োজন, নীতি ও মূল্যবোধকেই সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন ও নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। সৃজনশীল মার্কসবাদের যে-প্রবহমানতা আছে, শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে চিন্তার

পু স্ত ক - প রি চ য়

সুস্থ মনের জবানবন্দি

Faith and Frivolity—by Krishna Kripalani. Malancha, New Delhi.

রামায়ণে অর্থাৎ কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালীর চলিত সংস্করণে, 'রাবণে'র ধাঁধাঁ লাগে 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।' আমাদের স্বাধীন হিন্দুস্থানে —অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়া ঘ্যাট্ ইজ্ ভারত'-এ রাবণের নয়, রামের অর্থাৎ ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়ারও ধাঁধাঁ লাগবার কথা, 'হটাইলে হটে না যে ইংরেজের ভাষা।' যোগ্য লোকের আলোচনা চাইলে তা এখনো ভারতবাসীকে ইংরেজিতেই লিখতে হয়। তদনন্তর কিছুটা জল মিশিয়ে মাতৃভাষায়; বা লাভের দায়ে হিন্দী ভাষায়। কিন্তু যা উপভোগ করবার জন্য লেখা পরভাষায় তা লেখা দুঃসাধ্য। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরেজির মতো পরভাষায়। মাঝখানে যে পারাবার—ভাবের আর মেজাজের—তা তো মিথ্যা নয়! তা পার হতে যাঁরা পারেন তাঁরা কোটিকে গোটিক। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী সেই গোটিকের একজন।

ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রকাশিত) কৃষ্ণ কৃপালনীকে কম পরীক্ষা দিতে হয় নি। ও বই নীরস হলে চলত না, সাহিত্য হতেই হত। তথ্যে আলোচনায় মিলিয়ে প্রধানত তা তবু সৎ সাহিত্য—জীবনী সাহিত্য, পুষ্টিকর আর সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিকর। 'ফেথ অ্যাণ্ড ফ্রিভোলিটি'র অন্তর্ভুক্ত তাঁর এ রচনাগুলো কিন্তু আরেক জাতের লেখা। লেখাগুলো নানা সময়ের, এবং কিছু কিছু সাময়িকও। ফল ধরবার মতো কলমের চারা বাঁধতে জানেন শ্রীযুক্ত কৃপালনী—'ফেথ্'-এর সে মনও তাঁর আছে। কিন্তু ফুল ফুটাবার মতো কেয়ারীতেই তাঁর ঝোঁক—'ট্রিভিয়েলটি'র সেই মেজাজই তার বেশি। ঠিকই বলেছেন শ্রীযুক্ত কৃপালনী, অথবা প্রকাশক,—এই মন ও মেজাজের মিল ঘটিয়ে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করাটাই 'গুড্ লাইফ'—সুস্থ জীবন। কিন্তু মিল ঘটানোটা সহজ বা সহজাত না হলে বড়ো সহজ হয় না। তা শুধু দৃষ্টিভঙ্গিরও কথা নয়, মনোভঙ্গির কথা। আবার তাই বা কেন? হাতের গুণও লাগে। ইংরেজির ও মাল-মশলা সব হাতে ওত্‌রায়

না, আর, না ওত্‌রালে ইংরেজির সে রান্না আমাদের কবিরাজী পাচনের থেকেও দুষ্পাচ্য। শ্রীযুক্ত কৃপালনীর হাত আছে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, নেহরু ও গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন্‌, কিংবা আচার্য কৃপালনী বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ('বিজয়া') প্রভৃতি যে-মন নিয়ে লেখা তাতেও ভক্তির (ফেথ্‌) সঙ্গে আছে সরস মনোভঙ্গিমা। পরিহাস না হোক, মৃদু হাসি। ঐ 'ফেথ'-এব কথায়ও হাসতে তাঁর মানা নেই। অন্তত, কৃপালনীর ফেথ খুশি মনের 'ফেথ্‌'। কিন্তু আরও বেশি খুশি তা ট্রিভিয়েলটিতে, তুচ্ছ কথায়, পরিহাসে—আর শুধু পরিহাসে নয়, উপহাসেও। কারণ, শুধু পরিহাসে যাদের মেজাজ আজ খুশি তারা ভাগ্যবান্‌। সেদিকে শ্রীযুক্ত কৃপালনী কথঞ্চিৎ প্রিবিয়ান্‌—বক্র হাসি না হেসেও পারেন না। এমন কি বিদ্রূপে কঠিনও হয় হাসি। 'শান্তিনিকেতন' থেকে 'নিট উইট নিকেতন' নিশ্চয়ই খুব মেজাজ স্নিগ্ধ করবার মতো বিবর্তন নয়! ভাগ্যক্রমে নয়া দিল্লীর সিটি অব্‌ কালচার-এ দেশের ইতিহাসটাকে যেখানে এনে পৌঁছে দিচ্ছে তাতে সমগ্রভাবেই আমরা আরও বেপরোয়া হাসি হেসে বলতে বাধ্য হই 'হেসে নাও দুদিন বইতো নয়।' শ্রীযুক্ত কৃপালনীর প্রিবিয়ান মেজাজ প্রায় তাতে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।' ও রকম কালচার-কাণ্ড অপেক্ষা লঙ্কাকাণ্ডই বরং ভালো।

শ্রীযুক্ত কৃপালনী অবশ্য 'গুড্‌ লাইফ'-এর নিশানা খুঁজে বলছেন ইংরেজের থেকে একটা গুণ অন্তত আমাদের শেখার আছে—আত্ম-পরিহাসের ক্ষমতা। সে গুণটা কিন্তু আসলে আত্মজ্ঞানেব ফল। আমরাও প্রথমাংশেব আত্ম ও আত্মা নিয়ে এতটা মশগুল যে জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাবার আর প্রয়োজন দেখি না।

ইংরেজ জাত জানে—বাঁচা-হাসা। আমরা অধ্যাত্মজাত, আমরা জানি—বাঁচা-আপন বাঁচা।

কিন্তু এও তো কম জ্বালা নয়—ইংরেজ গিয়েছে, তবু কৃষ্ণ কৃপালনী ইংরেজি লিখবেন, ইংরেজের মতো হাসতে চাইবেন, ইংরেজি গুণের প্রশংসা করবেন। সত্যই এ কি ফেথ্‌ না ফ্রিভোলিটি ? না, গুড্‌ লাইফ্‌-এর জবানবন্দি ?

গোপাল হালদার

প্রথম আধুনিক কবি

মধুসূদন ও উত্তরকাল—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা।—পাঁচ টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই বোধ করি একমাত্র বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রতিভা—অর্থাৎ তাঁর ভাবনা-চিন্তা সর্বক্ষণই শিল্পকে, আরও ঠিক অর্থে সাহিত্যকে, আরও ঠিক অর্থে কবিতা ও নাটককে কেন্দ্র করেই বিস্তারিত হয়েছে। সে যুগের সমাজ-সংস্কার বা রাজনীতি-চেতনা বা সিপাহী বিদ্রোহ কিছুই তাঁর কাব্য-নাটকে বা পত্রাবলীতে ছায়া ফেলে নি। এবং সাময়িক সামাজিক বা অন্য কোনো ঘটনাবলীও তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। অথচ আজ এই ডামাডোলে, আমার তো বারবার মনে হয় মাইকেল-চর্চা অত্যাবশ্যক। কারণ সমাজের প্রত্যক্ষ দায় মধুসূদন স্বীকার না করলেও যাকে আমরা সমাজচেতনা বলি, তার পরিচয় মধুসূদনের রচনায় স্পষ্ট। বোধহয়, মধুসূদনের চিন্তাতে এই চেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয়দের অনেকের থেকেই প্রত্যক্ষ ছিল। তাই তাঁর নাটকের বিচারে যখন তাঁর বন্ধুরা শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যসমালোচনার সূত্র আরোপ করেন, তখন তিনি পরিষ্কার লেখেন "তারা সম্ভবত ভুলে গেছে যে আমি অত্যন্ত ভিন্ন পরিবেশে লিখছি। আমাদের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের প্রকৃতি আলাদা।" শুধু তাই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে-যুগের শুরু, (সে যুগেরই মূল্যবোধ বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে এখনও সক্রিয়) সে যুগের সম্ভাবনা, সার্থকতা ও প্রকট ব্যর্থতা মিলিয়ে যে অষ্টাবক্র ব্যবস্থার জন্ম, তার পটে মধুসূদনের নিঃসঙ্গ কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদ ও পরিণতি প্রতীকী। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের প্রবন্ধে বিষ্ণু দে সেই কথাই সুন্দর লেখেন, নবমধ্যবিত্ত মধুসূদনের ভ্রান্ত ইওরোপ-ভারতবর্ষ তুলনায় "তাঁর জীবন করুণ অপরিচ্ছন্নতায় অকালে শেষ হয়, কিন্তু কীর্তির দিক থেকে তিনি নব্যভারতীয় কবিদের মধ্যে অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ, রূপক হিসাবে মহান্।" "...তিনি আমাদের কাছে এক প্রতিভাময় প্রতীক। তাঁর ট্রাজেডি ইঙ্গভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারে মিথ্যা উপমা অনুধাবনের নাটক।" তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত ও কাব্যিক ট্র্যাজেডি ভারতে ইংলণ্ডের কর্মকাণ্ডের আরেক নামপত্র। শুধু তাই নয়, মধুসূদন বাংলা দেশের আধুনিক কবি। এবং মধুসূদন যে-সময়ের কবি, সে সময় যুগসন্ধিক্ষণ। সিপাহী বিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে, ইংলণ্ডে মার্চেন্ট

ক্যাপিটাল হটে যাচ্ছে, স্থান গ্রহণ করছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল, শিল্পবিপ্লব পরিবর্তন আনছে; তার অনিবার্য প্রভাব ভারতের অর্থনীতিতে—পঙ্গু মধ্যবিত্তের জন্মক্ষণ সে সময়। সে অবস্থায় মধুসূদন যে-অর্থে আধুনিক হতে চেয়েছিলেন—তা সম্ভব ছিল না। নড়বড়ে অর্থনৈতিক অবস্থা, অথচ ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে তার বিবাট বুদ্ধিগত জগৎ যা তৎকালীন বাংলাদেশের বাস্তবজীবনকে পিছনে ফেলে জ্ঞানের, বিদ্যার, চিন্তার জগতে বিস্তৃত (অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবন ও বুদ্ধিগত জীবনের মধ্যে ফারাক ও অসামঞ্জস্য প্রকট) এবং ফলত নৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রতিভাকে করে তুলল সাহসী অভিযানকারীর মতো। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য প্রচেষ্টায় স্থৈর্যের অভাব ও অনিত্যনতুন টেকনিকের রাজ্যে অভিযানের এইটেই কারণ, খানিকটা তুলনা যায় ইয়োরোপের রোমান্টিকদের সঙ্গে। এর ফলে মধুসূদনের ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক হয়ে পড়ল খানিকটা বিরোধী, একাকী। বাস্তবিক কবিবোধে, সাহিত্যিক চিন্তায়, নিষ্ঠায় উনিশ শতকের সাহিত্যিকদের মধ্যে মধুসূদন চূড়ান্তভাবে নিঃসঙ্গ, ব্যতিক্রম—বোধ করি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একমাত্র অনুরাগী পাঠক। ইয়োরোপের প্রবল ও বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের উপমা, মধুসূদন এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আদরের কলোনীতে খুঁজেছিলেন। সমাজের দুরন্ত প্রতিবন্ধকতায় বলেছিলেন "I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

কিন্তু কী ঐতিহাসিক মর্যাদায়, কী সাহিত্যিক উৎকর্ষে মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের প্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিপুরুষ হলেও, তাঁর প্রসঙ্গে সুষ্ঠু আলোচনার অভাব প্রকট। বাস্তবিক, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে একমাত্র পাঠ্য আলোচনা মোহিতলালের 'কবি শ্রীমধুসূদন'। (এই গ্রন্থটি মোহিতলালের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থ। গ্রন্থটির শেষে কাব্য প্রদর্শনী কৌতূহলোদ্দীপক)। তাই মধুসূদন ও উত্তরকাল—এই আলোচনা-সংকলনটি হাতে পেয়ে প্রাথমিক ভাবে উৎসাহিতই হয়েছিলাম। উৎসাহের আরও কারণ, একজন বাদে এ আলোচনার সংকলনের সব লেখকই কবিতা লেখেন। ভাবা গিয়েছিল, আমাদের দেশের তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়-পণ্ডিতম্মন্যতার প্রদর্শনী বুঝি আর এখানে বসবে না, ছাত্রদের পরীক্ষা বৈতরনী পার করানোর সূত্রে তাদের

সাহিত্যিক রুচি ও বোধের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের আয়োজন বুঝি এখানে অনুপস্থিত।[১] কিন্তু বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে চূড়ান্ত ধাক্কা খেয়েছি। গ্রন্থটির অনবদ্য প্রথম প্রবন্ধটি ছাড়া,[২] সবই আশ্চর্য অস্পষ্ট আলোচনা। তথাকথিত অ্যাকাডেমিক আলোচনার ঝকঝকে সংস্করণ।

প্রথমত, আমার কাছে 'মধুসূদন ও উত্তরকাল'—সংকলনটির এই নামকরণ কেন—সেটাই দুর্বোধ্য ঠেকেছে। আধুনিক কালের লেখকরা লিখেছেন বলেই কি এই নামকরণ? সে অর্থে মধুসূদনের উপর সব গ্রন্থই তো মধুসূদন ও উত্তরকাল। উত্তরকালে মধুসূদনের কাব্য-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি কী, আমরা, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের মহত্তম প্রতিভার জন্যই, তাঁর প্রতি অমনোযোগের ফলে কী ক্ষতি স্বীকার করেছি—এ সবের আলোচনা এ গ্রন্থে পরিহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আশা করেছিলাম, যেহেতু অধিকাংশ লেখক পেশাদারী সমালোচনা লেখক নন, সেহেতু কবিতা লেখায় তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন। নিজেরা যে সমস্যাবলীর মুখোমুখি হন, তার আলোকে মধুসূদনের প্রচেষ্টা ও সিদ্ধির আলোচনা করবেন। কিন্তু দেখলাম সে সব এখানে অবান্তর।

তৃতীয়ত, আশ্চর্য ঠেকল, মধুসূদনের কবিতার চিত্র, চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোনো আলোচনাই এ সংকলনে নেই। এবং মধুসূদন যে কোনোদিন নাটক লিখেছেন—সে কথা এই সংকলন পড়ে মনেই হয় না। আসলে, এ সংকলনেরও হয়তো 'মেইন টারগেট' ছাত্রসমাজ ও পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারেও যে গুছিয়ে লেখার দরকার তা-ও অধিকাংশ লেখক পারেন নি। বরঞ্চ সে তুলনায়, বেসামাল গদ্য ও আলোচনার চূড়ান্ত মাঝারিপনা সত্ত্বেও, রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'মধুসূদনের পত্রসাহিত্য' গুছানো লেখা। ছাত্রদের পরীক্ষার কাজে লাগার মতো।

এ সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র গবেষণা—যার অপর নাম 'মেঘনাদবধ: কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা'—লেখক অশ্রুকুমার শিকদার। সংকলনটির এক-পঞ্চমাংশ স্থান নিয়ে এই প্রবন্ধটি লেখা। এবং এর ধরতাই এলিয়ট ও ইয়েটস-

---

১। এই প্রবন্ধে মধুসূদন সম্পর্কে গবেষণার অতি মূল্যবান ইঙ্গিত দেওয়া আছে। প্রবন্ধটিকে একটি সংকলনে গ্রথিত করার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদার্হ।

২। যে-সব গবেষণা প্রসঙ্গে ল্যাম্বের উক্তি মনে পড়ে "that state of learned coma which is called research."

এর কাব্যনাট্য সম্পর্কে নানা উক্তিতে—অর্থাৎ লেখক বোধহয় মধুস্থদনের অলিখিত কাব্যনাট্যের বিচার এলিয়ট-ইয়েটস-এর মানদণ্ডেই করতে চান—(মধুস্থদনের কাছে যার নাম ড্রামাটিক পোয়েম, এলিয়ট যা লিখেছেন তার নাম পোয়েটিক ড্রামা)। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য মধুস্থদনের কবিতাবলীতে নাটকীয়তা অনেক পরিমাণে উপস্থিত ; এ কথাও স্বীকার্য, তিনি নাটকে ব্ল্যাঙ্কভার্স-এর ব্যবহার চেয়েছিলেন, স্থভদ্রা নামে একটি ড্রামাটিক পোয়েমও লিখেছিলেন (যদিও, বলেছিলেন, I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem.") কিন্তু তার অর্থ কি এই যে মধুস্থদন-এর পরবর্তী প্রচেষ্টা হত কাব্যনাটকের ? তিনি রাজনারায়ণ বস্থকে স্পষ্টতঃই লেখেন : "...there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way." আরও একজায়গায় লেখেন : "I shall write poem, a romantic one in the Ottava Rima or Stanzas of eight lines like his. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure." আবার আরেক জায়গায় কবি বলছেন : "Or must I senk into a writer of Occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days ? The idea is intolerable. Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with ocianic and mountain scenary, with sea-voyages battles and love-adventures." স্পষ্টই, কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য কিছু লেখার ইচ্ছাই মধুস্থদন ব্যক্ত করেন নি। আর শুধুমাত্র জনসাধারণের রুচি বা রঙ্গালয়ের অসহযোগিতা মধুস্থদনকে নাট্যকাব্য লেখায় বিরত করেছে এ কথাও মানা যায় না। কারণ এই নিঃসঙ্গ কবি, যিনি সব দিক থেকে কনভেনশন ভেঙেছেন—কোনো বাধাই বাধা বলে মানতেন না। শ্রীযুক্ত অশ্রুকুমার শিকদার মধুস্থদনের কবিপ্রতিভার নাটকীয় প্রবণতা (জানি না, আসলে এটা নাটকীয় প্রবণতা না অস্থির তীব্র আবেগের বহির্প্রকাশ) বিচার করে এসেছেন তার মূল বক্তব্যে—"সেই অলিখিত নাট্যকাব্যের... সমস্ত নাটকীয় সম্ভাবনা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে বিরাজমান। এই গ্রন্থ কাব্যাকারে লিখিত হলেও কাব্যনাট্য হিসেবে তার আলোচনা ও বিচার সম্ভব।" আগেই বলেছি, মধুস্থদন নাট্যকাব্য লেখার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত মেঘনাদবধ সব দিক থেকেই

সচেতনভাবে মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টা। এবং শ্রীযুক্ত শিকদার নানা অথরিটির সাক্ষী মেনে এইটেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মেঘনাদবধ কাব্য কাব্যনাট্যের নানা লক্ষণাক্রান্ত—প্রায় কাব্যনাটকই বলা চলে। কিন্তু এইভাবে বিচারে এ কথাও কি প্রমাণ করা যায় না যে মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে প্রথম মহৎ উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে আছে? পুরোপুরি রূপক উপন্যাস। কেবল গদ্যে লিখলেই হত। বাস্তবিক এই ধরনের আলোচনার শেষ তাৎপর্য কী। আর মহাকাব্য লিখতে গেলে নাটকীয়তা—উঁচুদরের নাট্যপ্রতিভা সবই তো প্রয়োজনীয়। তাছাড়া মেঘনাদবধে এমন অনেক কিছু আছে যা কাব্যনাট্যের পরিধিতে আটকানো যায় না। অনেক জায়গা পুরোপুরি লিরিক। তাছাড়া, "রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিরল কবি-প্রতিভার অধিকারী হয়েও নাট্যরচনায় বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছেন।"—এই ধবনের উক্তির আগে বোধহয় ভাবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যে একজন মহৎ ঔপন্যাসিক সেকথা ইদানীং বুঝেছি, জানি না কবে বুঝব, তিনি মহৎ নাট্যকারও। তেমনি বোধহয় আধুনিকতা বলতে আমরা অনেকে যা বুঝে এসেছি—সে সম্পর্কেও আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। অন্তত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর 'মধুসূদন ও আধুনিক মন' পড়ে তাই মনে হল। "আধুনিকতার প্রথম ও শেষ আশ্রয় ব্যক্তি, অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য"—শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের এই উক্তি অবাক করে। "প্রথম ও শেষ আশ্রয় ব্যক্তি" এবং "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য"—কি সমার্থক? তারপর, এ কথাও কি ঠিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই আধুনিকতার শেষ ও প্রথম লক্ষণ?

যে চারটি প্রবন্ধের এই আলোচনায় উল্লেখ করা হল, তাছাড়া আরও ছ'টি প্রবন্ধ এই সংকলনে আছে। এবং সংকলনটির কলেবব বৃদ্ধিতে তারা সহায়তা করেছে।

এই সংকলনের প্রতি বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও সম্পাদককে আমি অভিনন্দন জানাব তাঁর নতুন ধরনের প্রচেষ্টার জন্য। তবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে সুকবি—তাঁর হাত দিয়ে এই উদ্দেশ্যহীন, বিচিত্র সংকলনটি বার হল কেন? আশা করি তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা যথার্থ তাৎপর্যমণ্ডিত হবে। এবং স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ জাগাতে সাহায্য করবে, যা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ, "পশ্চিম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া করা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের বা স্বাধীন সংস্কৃতির ছদ্মবেশী হাহাকারে।"

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকমানস ও মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা

আইকম বাইকম। শ্রীকমলকুমার মজুমদার সংকলিত ও চিত্রিত। কথাশিল্প প্রকাশ। তিন টাকা।

স্বকীয় আন্তরিকতায় লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে সক্রিয় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একটি প্রকাশ্য সভায় (চৈতন্য লাইব্রেরি—১৬ আশ্বিন, ১৩০১) ছড়াবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে জাতীয় সম্পত্তিস্বরূপ বাংলার ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করার আহ্বান জানান। পরবর্তী কালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর খেদোক্তি থেকে অবশ্য জানা যায় বাংলাদেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সেদিন ছেলেভুলানো ছড়ার সংগ্রহকর্ম অযোগ্য বিবেচনায় বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু সুখের কথা, 'প্রাচীনজনোচিত গাম্ভীর্য'ও 'নীরব বিদ্রূপময় কটাক্ষপাত' সত্ত্বেও ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও অন্বেষায় বাংলা ছড়ার সংগ্রহকর্ম অব্যাহত থেকেছে এবং বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখার অতুলনীয় ঐশ্বর্য ক্রমান্বয়ে মননচর্চার অঙ্গীভূত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীকমলকুমার মজুমদার সংকলিত ও চিত্রিত 'আইকম বাইকম' গ্রন্থটি বাংলা ছড়ার সেই চিরায়ত সংগ্রহশালার এক নবতম সম্পদ।

ছড়া সংকলনের অ্যাকাডেমিক গতানুগতিকতার দূরে বর্তমান সংকলনের প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষত্ব ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ, শিরোনামা দান এবং টীকা ও মন্তব্যে কণ্টকিত করার মাস্টারি রীতি পরিহার করে কমলবাবু যথার্থ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। বিষয়-ঘোষণা ব্যতিরেকে তিনি ছেলেভুলানো, খেলা, প্রবাদ, জাদুমন্ত্র, ইংরাজি শিক্ষা, সাম্প্রতিক সমস্যা, সামাজিক আন্দোলন, লোক-উৎসব, লোকসংগীত, ব্রতপার্বন ইত্যাদি বহু বিচিত্র ছড়াকে গ্রন্থাগত করেছেন।

সামগ্রিক ভাবে বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানালেও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। মৌখিক ধারায় পুষ্ট লোকসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবর্তনশীলতা। লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা বাংলার ছড়াও এ বৈশিষ্ট্যবহির্ভূত নয় তাই একই ছড়ার অঞ্চল ভেদে বহু রূপান্তর লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ছড়া বিশেষের বিশুদ্ধ পাঠ বা মূল পাঠ নির্ণয় করা অসম্ভব তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ছড়ার নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।" কমলবাবু

অবশ্য ছড়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন নি সংকলন করেছেন তাই ভিন্ন পাঠ রক্ষার দায়িত্ব তাঁর বর্তায় না, তথাপি লৌকিক বৈশিষ্ট্যের সূত্রানুধাবনে ছড়ার পূর্ণতার স্বাদ পরিবেশনের দায়িত্ব নিশ্চয় তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। এদিক থেকে বর্তমান সংকলনের বিভিন্ন ছড়ায় ছত্র বিশেষের বা অংশ বিশেষের অনুপস্থিতি পাঠককে পূর্ণতার পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত করে।

ছয় পৃষ্ঠার ছড়াটি 'ইচিং মিচিং', 'ইকির মিকির', 'ইকড়ি মিকড়ি', 'ইকিড় মিকিড়' ইত্যাদি প্রারম্ভিক শব্দে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। কমলবাবু 'ইচিং মিচিং' পাঠের ছড়াটি আনুপর্বিক উদ্ধৃত করেছেন এবং 'ইকড়ি মিকড়ি' পাঠের আংশিক উল্লেখ করে চমৎকাররূপে ছড়াটির পাঠান্তরের আভাস দিয়েছেন। কিন্তু 'ইচিং বিচিং' পাঠের দশম ছত্রে "চাল কাঁড়তে হল বেলা"র পর "ভাত খাওসে জামাই শালা" ছত্রটি উল্লেখ করেন নি। এ কথা ঠিক সাঁওতাল পরগণা ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের সংগ্রহে ঐ ছত্রটি অনুপস্থিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমেত অন্যান্য সমস্ত সংগ্রহে ঐ ছত্রটি—"জামাই শালা"—"জামাই ভায়া"—"দুপুর বেলা" প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত। এগুলির মধ্যে কোনটি মৌলিক পাঠ সে কথা বোঝা না গেলেও বিভিন্ন পাঠ অনুসরণে এ তথ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সংগ্রাহকের ত্রুটিতেই একটি ছত্র মিলহীন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং অপর ছত্রটি অনুল্লেখ থেকে গেছে। এই ছড়াটি সংকলনে সংকলক রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহও যদি ব্যবহার করতেন তাহলে অন্তত ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিলের সংগতি রক্ষিত হত।

পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার 'আগডোম বাগডোম' ছড়াটি খেলার ছড়া। মৌখিক ধারার নিয়ত পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্যে এই ছড়াটির অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়। তবে খেলার নিয়ম অনুসারে প্রায় সর্বত্রই ছড়াটি শেষ হয় 'ফুল' অথবা অনুরূপ শব্দ দিয়ে। কমলবাবু সম্ভবত হুগলী, বর্ধমান, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটির সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত পাঠান্তরটি সংযুক্ত করেছেন। অথচ ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় আঙুল নিয়ে খেলার 'এটা বলে খাব খাব' ছড়ায় খেলার নিয়মানুসারে 'এটা বলে লবডঙ্কা' দিয়ে যথার্থতার সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। খেলার ছড়া খেলার নিয়ম অনুসারে সুপরিচিত পরিসমাপ্তি প্রত্যাশা করে। অন্তবিধ ছড়া আবৃত্তি ছাড়া যার অপর প্রয়োজন গৌণ সেখানে সুনির্দিষ্টতার দাবি সচরাচর উপস্থিত হয় না। তাই একত্রিশ পৃষ্ঠায় বহু প্রচলিত "খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল" ছড়ার শেষ ছত্রে "রসুন

বুনেছি"র স্থলে "মুড়ি ভেজেছি" ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হয় নি কেননা এই ছড়ায় অর্থ থেকে সুর, শব্দ থেকে মোহ এবং প্রয়োজন থেকে প্রতীতিই প্রধান।

গ্রন্থ নামের 'আইকম বাইকম' ছড়াটি (পৃষ্ঠা ৫) "পা পিছলে আলুর দম"-এ শেষ হয় না, সাধারণত শেষ হয় "রাম তুই সাড়ে তিন / অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম" অথবা "ইস্টিশনের মিষ্টিকুল / সখের বাদাম গোলাপ ফুল" দিয়ে। পরিবর্তনের ধারায় শেষ পদের অন্তবিধ রূপ থাকলেও উপরোক্ত রূপদ্বয় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বর্তমান সংকলক স্বকীয় বিবেচনায় যে-কোনো অভিপ্রেত পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু কেন যে তিনি শেষাংশ পুরাপুরি বর্জন করলেন তা বোঝা গেল না।

'আয়রে আয় টিয়ে' ছড়াটি (পৃষ্ঠা ৮) "তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে" শেষ না হয়ে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত শেষ দুই ছত্রে "ওরে ভোঁদড় ফিরে চা / খোকার নাচন দেখে যা"-তে শেষ হওয়া উচিত ছিল। বলা বাহুল্য, আমাদের বিশ্বাস মধ্যপথে ছড়াটি শেষ না হয়ে রবীন্দ্রসংগ্রহে পরিসমাপ্ত হলে রসাস্বাদনে পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যেত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসরণে আমরা বলতে পারি: "টিয়ার নৌকা চড়ে আসা, বোয়াল মাছের খামাকা নৌকা নিয়ে যাওয়া, টিয়া পাখির দুর্গতি এবং তা দেখে ভোঁদড়ের অকস্মাৎ নৃত্যস্পৃহা চমৎকার। কিন্তু সেই আনন্দ নর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যাবেগ সম্বরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখার জন্য ফিরে তাকানোর অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / লোক-সাহিত্য / ১৩৬২ / পৃঃ ২৭)। সে রস পরিবেশনে বর্তমান সংকলকের সংকোচ অপ্রত্যাশিত অবিবেচনাপ্রসূত।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আভাস দিয়েছেন ছড়ার মধ্যে আমরা-যে রসাস্বাদ করি ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। কমলবাবুর ছড়া সংকলনে পংক্তিবিশেষের গ্রহণ-বর্জনে হয়তো তাঁর নিজস্ব ছেলেবেলার স্মৃতি প্রাধান্য লাভ করতে পারে, কিন্তু ছড়া-সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব সংকলন নীতি ও গ্রহণ-বর্জনের কার্যকারণ সূত্র প্রকাশ থাকলে পাঠকসাধারণ বোধের নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে তৃপ্তির উপান্তে উপনীত হতে পারত।

প্রসঙ্গত মনে হয় অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে "গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই"

(পৃষ্ঠা ৭৭) ছড়ার গাজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঠটি না দিয়ে বসুধারা ব্রতর পাঠটি দিলে আগুন-ঝরা গ্রীষ্মে জল প্রার্থনার আর্তি অধিকতর মূলানুগ হত। তা ছাড়া নীলকর-বিষয়ক ছড়াটির (পৃষ্ঠা ৭১) তাৎপর্যপূর্ণ সংকলনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রে উৎসারিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপর কিছু ছড়া সংগৃহীত হওয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়।

তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় বর্তমান সংকলনে এমন কতকগুলি ছড়া সংকলিত হয়েছে যা সচরাচর প্রচলিত সংকলনগুলির মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ করে এই ছড়াগুলি প্রকাশে সংকলকের যে সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তা আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। কমলবাবুর আঁকা ছবিগুলি বইটির অন্যতম আকর্ষণ।

ছড়া সংকলনের ব্যাপারে কোনো অবশ্যমান্য রীতির অনুযাত্রী হবার নির্দেশ অকল্পনীয়। কিন্তু উচ্চারণ ও উপলব্ধির অদ্বৈতে অনিবার্যতার ঘনিষ্ঠ উত্তাপ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেহেতু ছড়া সংগ্রহের বর্তমান সংস্করণের গৌরব লঘু না করেও অনেক দ্বিমত জানিয়েছি। বলা বাহুল্য, লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত প্রতিবেশে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রীকমলকুমার মজুমদার সংকলিত ও চিত্রিত 'আইকম বাইকম' ছড়া সংগ্রহগ্রন্থ বিবেকি নিষ্ঠা সমহিত প্রসাধনবিরূপ যাথার্থ্যে একটি সুমুদ্রিত স্মরণীয় প্রকাশ।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

হাতের কাজ

কাঠের কাজ। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্ লিমিটেড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা-সংবলিত। নতুন পরিবর্তিত সংস্করণ। ১৯৬৪। পৃষ্ঠা ৩৫২। ৬·৭৫ ॥

আমাদের দেশে ভদ্রলোকেরা যাহারা স্কুলে কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন, ডিগ্রি লাভ করেন, তাঁহারা পুরা মানুষ হন না। তাঁহারা চাকুরি করিতে শেখেন, কাজ করিতে শেখেন না। আমাদের যে-শিক্ষাব্যবস্থা তাহাতে 'ভদ্রলোকের চোখ ভাল করিয়া দেখিতে না শিখুক, কান ভাল করিয়া শুনিতে না শিখুক, হাত ভাল করিয়া কাজ করিতে না শিখুক, তাহাতে কোনো অগৌরব নাই, কেবল যেন সে পড়িতে শেখে। আমাদের মতে

পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ ; হাত-পা গুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়।' ইহা রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উনচল্লিশ বৎসর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে 'কাঠের কাজ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নতুন সংস্করণের মুখবন্ধে বিশ্বভারতীর উপাচার্য আশার কথা শুনাইয়াছেন যে, 'সেদিন গত হয়েছে।...হাতের কাজ বর্তমান শিক্ষাক্রমে পাকা আসন লাভ করেছে।' ইহা সত্য হইলে খুবই সুখের কথা। হাতের কাজ শিক্ষাক্রমে পাকা আসন লাভ করিয়া থাকিলে আলোচ্য গ্রন্থের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

সরকারী নথীপত্রে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, আমরা এখনও প্রাচীন বিচার কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা এখনও সাহিত্য বলিতে গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক বুঝি, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি সিভিক্স লজিকের বই পড়া বুঝি। এদেশে এখনও হাতের কাজের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নাই ; হাতের কাজের বিজ্ঞান-জানা লোক নাই, হাতের কাজের কোনো বিজ্ঞান-সম্মত বই নাই। শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে এত বড়ো ব্যবধান থাকিলে কোনো জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশে ছুতার ছুতার রহিয়া গেল, ভদ্রলোক ভদ্রলোক রহিল। তাই ছুতার সেই মান্ধাতার আমলের যন্ত্রকৌশল অতিক্রম করিতে পারিল না, আর ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বছরে বছরে শতকরা যাটজন পরীক্ষায় ফেল করিয়া ও বাকি চল্লিশজন কোনোক্রমে পাশের চৌকাঠ পার হইয়া ভদ্রলোক সাজিবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভদ্র উপার্জনের কোনো সুযোগ মিলিতেছে না। এই বিপর্যয়ের সমাধান হিসাবে আমরা যাহা চেষ্টা করিতেছি তাহা হইল গ্রেস মার্কা দিয়া আরও পাশ করাও, আরও স্কুল কলেজ খুলিয়া দাও এবং আরও বই পড়িবার সুযোগ দাও। কিন্তু এই পথে সমাধান হইবে না। শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে ব্যবধান না ঘুচাইলে আমাদের জীবন বাঁচিবে না। শিক্ষিত লোক কাজে অপটু হইবে আর কাজের লোককে সুশিক্ষিত পদ্ধতি শিখাইব না—ইহাতে জীবনে অভাব ঘুচিবে না, সৌন্দর্য আসিবে না। ছুতার ও ভদ্রলোক উভয়কেই মানুষ করিতে হইবে—তাহার একমাত্র পথ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন, শ্রীনিকেতনে তাহারই পরীক্ষা করিয়াছেন, গান্ধীজী সাতাশ বৎসর পূর্বে

তাহারই কর্মসূচী দেশের সামনে দিয়াছিলেন তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায়। এই শিক্ষাপদ্ধতি কোনো সৌন্দর্যবিলাসী কবির সুখকল্পনা নহে, কোনো কূট রাজনীতিবিদের চতুর কৌশল নহে—ইহা বাস্তববাদী মানুষের একমাত্র স্বীকার্য পথ।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে অনেকে একটি টেকনিক্যাল বিদ্যার টেক্স্‌ট বই মাত্র মনে করিতে পারেন। সেই কারণে ইহার তাত্ত্বিক দিকটা সবিস্তারে বলিতে হইল, যাহাতে ইহার অন্তর্নিহিত যুগান্তরকারী চিন্তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই যুগান্তরকারী চিন্তার উদ্বোধন ব্যতীত শিক্ষার উন্নতির অন্য কোনো পথ নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কেবল এই শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করিয়া তাত্ত্বিক তর্ক করেন নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে হাতের কাজ শিখিয়াছেন, বিদেশে ইহার উন্নত চর্চা করিয়াছেন, গান্ধীজীর আহ্বানে ইহার প্রয়োগ-পরীক্ষা করিয়াছেন, স্বগ্রামেও ইহার সহজ রূপ দিয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাজাত বিদ্যাকে নিপুণভাবে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একজন অভিজ্ঞ শিল্পজ্ঞানী ও শিক্ষক কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থখানি অন্যদেশীয় ভাষায় রচিত এ জাতীয় যে-কোনো গ্রন্থের সমতুল্য। ইহাতে যেভাবে দারুশিল্পের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দেশের ভূগোল, যন্ত্র-পরিচয়, শিক্ষণপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে তাহা পরবর্তী কালে এ জাতীয় গ্রন্থের আদর্শস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার অসংখ্য চিত্র গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ। দারুশিল্পী এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার শিল্পজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন, শিক্ষাবিজ্ঞানী ইহা পাঠ করিলে তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে উন্নত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ পাঠক ইহা পড়িলে এক নতুন জগৎ ও নতুন জীবনের সংবাদ পাইবেন।

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

লোবাসেবস্কী : নব্য জ্যামিতির জনক

প্রখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক, অন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতির স্রষ্টা, নিকলাই ইভানোভিচ্ লোবাসেবস্কী সমান্তরাল সরলরেখার ইউক্লিডিয় ধারণা ভেঙে দিয়ে এক নতুনতর বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর যুগান্তরকারী আবিষ্কার দু'হাজার বছরের প্রচলিত ভাববাদী জ্যামিতি-চিন্তার মূলোৎপাটন করেছিল। ইউক্লিডিয় জ্যামিতিক মৌলগুলিকে (Elements) অক্ষয়, অব্যয়, দৈবী সত্য বলে ভাবা হয়েছিল। লোবাসেবস্কী আর-একবার প্লেটোর ভাববাদের অসারতা প্রমাণ করলেন, দেখালেন দৈবী সত্য বা চরম সত্য বলে কোনো সত্য নেই। সত্য জীবন্ত, তাই নিত্য পরিবর্তনশীল, দ্বান্দ্বিক এবং বাস্তব। লোবাসেবস্কীর আবিষ্কারের দার্শনিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে সুবিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যামিতিবিদ্ W. K. Clifford বলেছেন: "What vesalius was to galen, what Copernicus was to Ptolemy, that was Lobachevsky to Euclid." লোবাসেবস্কীর আবিষ্কার কোপার্নিকাস্-এর আবিষ্কারের মতো আমাদের বিশ্ব-চিন্তার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি সূক্ষ্ম জ্ঞানের এবং জ্ঞানতত্ত্বের দিক্‌দিশারী এই কাজান বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার।

অর্থনীতি যেমন সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি, জ্যামিতিও তেমনি সমস্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি। অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সমাজের সকল স্তর এমনকি শিল্প, শিল্পরীতি এক কথায় সমগ্র সংস্কৃতিই রূপান্তরিত হয় তেমনি জ্যামিতি জ্ঞানের পরিবর্তনের ফলে বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তিমূল পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন বলবিদ্যার মূল ভিত্তি ছিল ইউক্লিডের জ্যামিতি আর নব্য-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি লোবাসেবস্কীর জ্যামিতি বা আরও বিস্তৃততর ক্ষেত্রের জ্যামিতি। প্রত্যেক প্রকার জ্যামিতিতেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই দেশ সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন করে দিয়েছে।

টিলি এবং গেনচি প্রথম লোবাসেবস্কীয় দেশে (space) বলবিদ্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, যে-আবিষ্কার সনাতন ভাববাদী চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে তাকে নৈয়ায়িক অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট বলে প্রমাণ করতে। কিন্তু চিরন্তন নিয়মে প্রতিক্রিয়ার বাধা অতিক্রম করে প্রগতি এগিয়ে গেছে। নব্য জ্যামিতির প্রগতি-যাত্রায় সাহায্য করেছেন বৃটিশ জ্যামিতিবিদ্ Clifford এবং Ball এবং এই দুই মহান বৈজ্ঞানিকের চিন্তার উপর ভিত্তি করে রুশ জ্যামিতিবিদ্ A. P. Kotelnikov দেখালেন যে, "The construction of a Mechanics on a non-Euclidian space would be best achieved by means of the construction of a

special, in a sense doubled theory of Vectors and of a different theory of complex numbers." এইভাবে লোবাসেবস্কীর তত্ত্ব জটিল সংখ্যাতত্ত্ব এবং ভেক্টর তত্ত্বে স্থান পেল।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পদার্থবিদ্যার অতি সূক্ষ্ম মাপজোখ, বিশেষ করে আলো এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকের তাত্ত্বিক গবেষণা (মাইকেলসন-মোরলির গবেষণা) প্রাচীন বলবিদ্যার ভিত্তির অর্থাৎ ইউক্লিডিয় জ্যামিতির চরম সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। এবং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি অপেক্ষাকৃত সীমিত গতিবেগে এবং সীমিত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হয় তাহলে সীমিত ক্ষেত্রেও এই জ্যামিতি প্রযোজ্য হবে না। তাই আইনস্টাইন নতুন এক জ্যামিতি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই জ্যামিতি-ভিত্তিক বলবিদ্যায় দুই দেশের আপেক্ষিক গতিবেগ এবং আলোর গতিবেগের অনুপাতকে সমানুপাতিক ধ্রুবক (Variable Parameter) বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং তার ফলে প্রাচীন বলবিদ্যা, নব্য বলবিদ্যার বিশেষ একটি অবস্থায় পরিণত হল এবং এ কথাও প্রমাণিত হল লোবাসেবস্কীর জ্যামিতি ইউক্লিডিয় জ্যামিতির থেকে একটি বৃহত্তর সত্য। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই পুরাতন সত্যকে সীমিত করে বৃহত্তর সত্যে পৌছবার একনিষ্ঠ প্রয়াস। প্রসঙ্গক্রমে ডুলং-পেটিট্-এর আপেক্ষিক তাপতত্ত্ব থেকে ডিবাই-হেকেল-এর আপেক্ষিক তাপতত্ত্বের বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণযোগ্য।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি ও পরম জ্ঞানের সাহায্যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকেও মাত্র ১১ বৎসরের মধ্যে সীমিত করে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে পৌছলেন। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। নতুন আপেক্ষিকতাবাদ দেশ, কাল, ভর, শক্তি ইত্যাদির সঙ্গে মহাকর্ষণের নিয়মকেও বিধৃত করে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে এবং নিউটনের মহাকর্ষণের তত্ত্বকে সীমায়িত করে এক বৃহত্তর সত্যে উপনীত হল। কিন্তু এখনও বাকি রইল এমন এক জ্যামিতি যা আপেক্ষিকতাবাদে সাধারণ তত্ত্বকেও সীমায়িত করে দিয়ে মহাকর্ষণের ক্ষেত্র, তড়িৎ-চুম্বকের ক্ষেত্র, নব্য কণিকাবাদের ক্ষেত্র সকলের সমন্বয়ে এক একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্ম দেবে। এই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বই বর্তমান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্বিষ্ট। অন্বেষকদের মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বর্তমান আলোচনার ছেদ টানা গেল, আশা রইল কোনো যোগ্যতর ব্যক্তি বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করবেন।

শ্রীতিমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপুস'

'রাজা অয়দিপুস' অভিনয় বহুরূপীর এক অবিস্মরণীয় পরীক্ষা। দর্শকের পক্ষে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

গ্রীক নাটক এদেশেও অভিনীত হয়। ইউরোপীয় কোনো নাট্যদল হয়তো ইংরেজি ভাষায় তার আয়োজন করে। নয়া দিল্লীর এক ভারতীয় নাট্যদলও নাকি ইংরেজি ভাষাতেই (?) বৎসর দু'চার পূর্বে একখানি গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। অভিনন্দনযোগ্য তাঁরাও। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা গ্রীক নাটকের অভিনয় সম্ভবত এই প্রথম। আর সে পরীক্ষাও অন্য কিছু নিয়ে নয়, একেবারে সফোক্লিস-এর রাজা ঈদিপাস নিয়ে—যার ইংরেজি অনুবাদ পাঠেও অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। 'বহুরূপী'র প্রয়াসকে দুঃসাহস বলা যেত; কিন্তু এ তেমনি দুঃসাহস যাতে মানুষের শিল্প-চেতনা নতুন দিগন্তে পৌছয়। আমাদের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তাই 'রাজা অয়দিপুস্'-এর অভিনয় স্মরণীয় পরীক্ষা নয়, সৃষ্টিসার্থকতায় 'বহুরূপী'র উন্নত ও সযত্ন শিল্প-সাধনারও উজ্জ্বল প্রমাণ।

এরূপ নাটক উপভোগের জন্য চাই কিছুটা শিক্ষা ও কিছুটা রুচি। মূল নাটক অবশ্য জনসাধারণের জন্যই রচিত; কিন্তু সে অ্যাথেন্সের জনসাধারণ, ২,৫০০ থেকে ২,৪০০ বৎসর পূর্বে যাঁরা শিল্প-চেতনায় এমন একটা গ্রামে পৌছেছেন যা আজও সভ্যজাতিদের বিস্ময়। আর, তাঁদেরও কাছে নাট্য-বিষয় ছিল সুবিদিত, গ্রীক পুরাণের বিষয়। বিচার্য হত রচনা-কুশলতা, আর কতকাংশে হয়তো অভিনয়-সৌকর্য, সম্ভবত বিশেষ করে তা-ও ছিল কোরাসের সংগীত-নির্ভর। স্টেডিয়ামের মতো মুক্তপ্রাঙ্গণে হাজার সত্তের নরনারীর সম্মুখে যে নাট্য-প্রতিযোগিতা ছিল অ্যাথেন্সের পৌরধর্মের অঙ্গ ও পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠান, এ-কালের নাট্যশালায় অভিনয়ে তার আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা যায় না, সেই দর্শক জনতা নয়, সে-অভিনয় আদর্শও নয়, সে-অভিনয় রীতিও নয়। কালের এপারে একটি জিনিসই এসে পৌছেছে সে হচ্ছে নাট্যকারদের সৃষ্টি—খানকয় অমর ট্রাজিডি ও কমিডি। কী করে আধুনিক দর্শকের কাছে তার রূপ দেওয়া যায়, তাই হল একালের নাট্য-রসিকদের সমস্যা। সম্পূর্ণ অ্যাথেনীয় অভিনয়ের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও কদাচিৎ ইউরোপীয় ক্লাসিক বিদ্যাবিদ্‌রা না করেন তা নয়। কিন্তু নাট্যরসিকরা

চান সেই মূলের রস পরিবেশন—একালের যা রসভঙ্গ করে তা বর্জনীয়, আর সেদিনের অ্যাথেনীয় পরিবেশের যতটুকু না হলে রসভঙ্গ অনিবার্য ততটুকু সযত্নে সংযোজনীয়। বাস্তবের আক্ষরিক অনুকরণ সম্ভব হলেও নিষ্প্রয়োজন। আর যখন তা বাহুল্য তখন তা অগ্রাহ্য; কারণ তা কল্পনাকে ক্লিষ্ট করে, শিল্পকে শৃঙ্খলিত করে। এই নীতি মেনে নিলেও বাঙলায় গ্রীক নাটকের সার্থক পরিবেশন বহু শিক্ষা ও যত্ন সাপেক্ষ।

প্রথমত, নাটকই যখন প্রথম কথা, তখন এক্ষেত্রে এ কথা সুবিদিত এ-নাটক অন্য কিছু নয় সফোক্লিস-এর রাজা ঈদিপাস, যার সুদক্ষ ইংরেজি অনুবাদকেরাও প্রায় একমত 'hard to analyse, impossible to translate'. বাঙলা অনুবাদকের ভরসা এখনো ইংরেজি অনুবাদই—মূল গ্রীক জানলেও যে অনুবাদ সহজতর হত, তা নয়। বাধা দুস্তর রয়েছে—টিরান্নস (?) বলতে গ্রীকে যা বোঝায় 'কিং'ও নাকি তার ঠিক প্রতিশব্দ নয়। এমনি অনেক গ্রীক ধারণাই ইংরেজি বা বাঙলায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত করা যায় না। কিন্তু সম্ভবত যথেষ্ট আভাসিত করা যায়, আর তা-ই অভিনয়স্থলে যথেষ্ট হতে পারে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে মূলের ভাবাভাস সঞ্চারিত করার সুযোগ পেলেই হল। 'রাজা অয়দিপুস'-এর বাঙলা অনুবাদক অবশ্য তার থেকে বেশি যত্ন নিয়েছেন। অন্তত মানুষ ও দেবদেবীর নামের (সম্ভাব্য) গ্রীক উচ্চারণ বাঙলায় তিনি গ্রহণ করেছেন, ইংরেজির অনুসরণ করেন নি। যাই করুন, অনুবাদ সার্থক বলতে হবে এজন্য যে, দর্শকের রসবোধে তা বাধা দেয় নি, বরং সহায়তাই করেছে। গ্রীক না জেনে বলা যদি স্পর্ধা না হয় তাহলে বলা যেতে পারে—অনুবাদ সার্থক, অনুবাদ-গন্ধী নয়।

দ্বিতীয়ত নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত হচ্ছে (অ্যাথেনীয়) দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চবিন্যাস, বেশ-রচনা, এমন কি, চাল-চলন (ডিপোর্টমেণ্ট)। মনে রাখতে হবে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চের পরিসর এমন কিছু বৃহৎ নয় যাতে একটি গ্রীক থিয়েটারের বা তার নাটকীয় দৃশ্যের আশানুরূপ অনুকল্প রচনা করা সেখানে সম্ভব। এদিকে আয়োজন কত দুঃসাধ্য বুঝেই বলতে পারি—আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষিত ভারতীয় দর্শকের পক্ষে রাজা ঈদিপাস-এর দৃশ্যাদি যথেষ্ট সযত্ন রচিত ও উচ্চমানের বলেই প্রতিভাত হয়েছে। বিশেষ বিদগ্ধ দর্শকেরা হয়তো ত্রুটি পাবেন, জানি না। পুরাতাত্ত্বিক

আক্ষরিক যাথার্থ্য নয়, রসানুগ দৃশ্যরচনা, সাজসজ্জা, চালচলনই আমাদের পক্ষে প্রীতিকর। কারণ, প্রধান কথা হল—Play is the thing.

তাতে আমরা পরিতৃপ্ত—অভিনয়ে। শুধু পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের কথাই নয়, যেভাবে কোরাসের দীর্ঘ বক্তৃতাকে বিভিন্ন পৌরবৃদ্ধের মুখে বেঁটে দিয়ে অভিনয়ের অবকাশ অব্যাহত রাখা হয়েছে, কোরাসের সংগীতকে স্বরকরা আবৃত্তিতে স্বচ্ছন্দ করা হয়েছে, তাতে গ্রীক নাটকের প্রত্যেক রসিকেরই পক্ষে কোরাস তৃপ্তিদায়ক ঠেকেছে। এ কৌশল একেবারে উদ্ভাবনা না হোক, সুচিন্তিত ও সুপ্রযুক্ত। ঈদিপাস-এর (শম্ভু মিত্র) স্পর্ধা, ক্রোধ, একগুয়েমি থেকে শেষ আত্মবিলাপ পর্যন্ত অভিনয়-শম্ভু মিত্রের শিল্পি-জীবনের পক্ষে গৌরবজনক কীর্তি। এক-আধ স্থলে তা আমাদের কাছে একটু আধুনিক ফিল্‌ম্‌-গন্ধী বা 'বারুক'-জাতীয় মনে হয় নি, তা নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে রুচিভেদে মতভেদ থাকতে পারে। অন্ধমুনি তেইরেসিয়াস-এরও ক্রোধান্ধ অভিনয় অপেক্ষা আমাদের বিবেচনায় ঘৃণা-অবজ্ঞা মিশ্রিত অভিনয় অধিকতর শোভন হত—মন্দভাগ্য ঈদিপাসের দুর্মতিতে তার মনে ক্রোধ অপেক্ষা অবজ্ঞা, হয়তো বা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞা জাগাই বেশি স্বাভাবিক। এরূপ দু-একটি বিকল্প মত পোষণের অবকাশ আছে। ছোটখাটো এরূপ এক-আধটি কথা হয়তো দোষানুসন্ধানী বলতে পারবেন। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করবেন অভিনয়ের সামূহিক সুসংগতি, প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পীর নিজ নিজ ভূমিকায় সযত্ন সফলতা, প্রযোজনার সৌকর্য, আর সর্বব্যাপী শিল্পীদের দায়িত্ববোধ।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়—যে-কণ্ঠস্বর, যে দু-একটা কৌশল, দু-একটি বিশেষ বাচনভঙ্গি শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের প্রায় মুদ্রাদোষ হয়ে উঠেছিল, এ অভিনয়ে শম্ভু মিত্র তা থেকে মুক্ত, আপনার শক্তিকে তিনি এ অভিনয়ে আরও স্বচ্ছন্দ করে তুলেছেন। উজ্জ্বলতর রচনার তা প্রতিশ্রুতি।

বহুরূপীর শিল্প-সাধনা উজ্জ্বলতর হবে, এই প্রতিশ্রুতিও 'রাজা অয়দিপুস'-এর দর্শক লাভ করেছে।

গোপাল হালদার

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

গত ৩রা আগস্ট, ১৯৬৪তে মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বারাণসীতে স্বগৃহে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করেছেন, এ সংবাদ পরিচয়-এর পক্ষে গভীর বেদনাদায়ক। 'পরিচয়'-এর পাঠক-সমাজের কাছে তিনি অপরিচিত নন, পনের-ষোল বৎসর পূর্বে লেখা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত সখ্য ও সহায়তা আমরা প্রচুর লাভ করেছি। শেষ অবধিও সেই শুভেচ্ছা সঞ্চিত ছিল—পরিচয়-এর বহুবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা তা হারাই নি। তাই 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে আমরা আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই সুহৃদকে; তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বাঙলা সাহিত্যে অন্তত গত চল্লিশ বৎসর ধরে কাশীর মহেন্দ্রচন্দ্র রায় সুপরিচিত নাম। পাঠকেরা জানেন বাঙলার স্বল্পসংখ্যক চিন্তাশীল লেখকের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। বাঙালি সাহিত্যরসিক ও বুদ্ধিজীবিরা কাশীতে পদার্পণ করলে প্রায় সকলেই মহেন্দ্রচন্দ্রের সম্পর্কে আসতেন; বুঝতেন সদ্‌বুদ্ধি সজ্জনের মধ্যেও তিনি আপন ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান উপকরণ যেমন চিত্তের শান্ত সংযমের সঙ্গে গভীর স্পর্শকাতরতা, তেমনি আত্মসচেতনতাব সঙ্গে তাঁর মর্যাদাময় আত্মপ্রচারবিমুখতা। গত দশ বৎসর তিনি প্রায় লেখনীকেও প্রকাশ-ধর্ম থেকে বিরতি দিয়েছিলেন। কলকাতা-আবদ্ধ বাঙলা সাহিত্য তাই বঞ্চিত হয়েছে, বাঙালি পাঠকও তাঁর এ সময়ে দর্শন লাভ করেন নি। আর এখন কাশীতে গেলেও সে সম্ভাবনা রইল না।

কাশীই মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের স্বগৃহ। তিনি অবশ্য জন্মেছিলেন শ্রীহট্টে, হবিগঞ্জে, ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু কৈশোরেই কাশীতে আসেন (১৯১০ সালে); সেখানেই অভাবের সঙ্গে যুঝে শিক্ষালাভ করেন; ১৯১৭ সালে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশের সঙ্গে স্নাতক হয়ে তা সমাপ্ত হয়। মহেন্দ্রচন্দ্র জীবনে গ্রহণ করেন অধ্যাপক-বৃত্তি (১৯২০), আর তা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন ১৯৫৮-য়। এই শতকের বিশের কোঠায় কাশী বাঙলা সাহিত্যের একটি কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল; 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সেই অতুলনীয় অভিভাষণ সমস্ত বাঙালির স্মরণীয়—কাশীর সেদিনের স্মৃতি বহন করে এখনো 'উত্তরা'। মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন তখনকার উদীয়মান সাহিত্য-সাধক যুবকদের মধ্যে

অন্যতম। তার পূর্বেই তিনি লেখায় হাত দিয়েছেন—সম্ভবত কাশীর 'প্রবাস জ্যোতিঃ' পত্রিকায় (বাং ১৩২৭) তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ; তারপর থেকে তিনি প্রবাসী, উত্তরা, বিচিত্রা, কল্লোল, কালিকলম, নবশক্তি প্রভৃতি সে যুগের পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরিণত বয়সে—খ্রীষ্টীয় ১৯৪৭-৪৮-এর দিকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কিশলয়'। অন্য বই-এর মধ্যে জোয়ান বোয়ারের উপন্যাসের অনুবাদ ও কিশোর সাহিত্য ছাড়া উল্লেখযোগ্য দান 'জীবন ও সাহিত্য' (প্রবন্ধ) ও ম্যাক্সিম গর্কী (জীবনী)। উত্তরায় প্রকাশিত লেনিনের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি, আর হিন্দীতে লেখা 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য'ও বাঙলায় প্রকাশিত হয় নি। অপ্রকাশিত রয়েছে নানা বিষয়ে আরও প্রবন্ধ।

সব প্রকাশিত হলে মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের সাহিত্যকর্ম সম্ভবত পরিমাণেও সামান্য হবে না। গুণগতভাবে তা চিরদিনই বিশিষ্ট এবং স্মরণীয়। সেই বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাবনার ও ভাষার সংহতিতে ও সুসংগতিতে। তিনি সে যুগের লেখক যে-যুগে মানুষ ভাবনা ছাড়া যে রচনা হয় তা ভাবতে পারতেন না। আর ভাবনা ও ভাষার সুসংগতি ছাড়াও লিখতে চাইতেন না। তখনো বাঙলা রম্যরচনা জন্মায় নি, চমক লাগানোর জন্য কথা সাজানো বাড়ে নি। ভাষার প্রাঞ্জল প্রবাহ ছিল লেখকের লক্ষ্য, প্রসাদগুণ কাম্য। মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ভাবনা ও ভাষার সুসংগতির সঙ্গে জুগিয়েছিলেন সংহতি। এই সংহতি তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। জীবনে ও লেখায়, আচরণে ও জীবনদৃষ্টিতে যে-সুসংহতি সুদুর্লভ বস্তু, মহেন্দ্রবাবুর মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেছিল। যুক্তিনিষ্ঠ মনে সংযত শান্ত বিচার যেমন ছিল তাঁর স্বভাবগত, মার্জিত চিত্তে সাহিত্য ও সংগীতের সূক্ষ্ম শান্ত রসোপলব্ধিও ছিল তেমনি তাঁর আপন ধর্ম। একই সঙ্গে আপন সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি বৃহত্তর জনসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ-আয়োজনে ছিলেন শ্রদ্ধাবান ও সক্রিয়—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষতিতেও শান্ত সুস্থির, সংকল্পে সুদৃঢ়, অথচ স্বভাবধর্মেও অবিচল।

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের সঙ্গে এমনি একটি প্রেমপ্রীতিবান সংহত-স্বভাব ব্যক্তিই বিদায় নিলেন॥

গোপাল হালদার

'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রসঙ্গ

গত আষাঢ় (১৩৭১) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দুসান জ্‌বাভিতেলের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র সমালোচনাটির জন্ম ধন্যবাদ। শ্রীযুক্ত জ্‌বাভিতেলের আলোচনা-সমূহ যা পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল বা আকাশবাণীতে আলোচিত হয়েছিল তা থেকেই এই বিদেশী পণ্ডিত আমাদের শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে, গীতিকানুরাগী হিসেবে—সর্বশেষে ময়মনসিংহবাসী হিসেবে গীতিকাগুলির সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য এই সুযোগে উপস্থিত করতে চাই, আশা করি তা যথাস্থানে পৌছে দেবেন বা প্রকাশিত হবার সুযোগ দেবেন।

বর্তমানে ময়মনসিংহে এইসব গীতিকার কোনো নিদর্শন পাওয়া না যাওয়ার একমাত্র কারণ গীতিকা সংগ্রহে চন্দ্রকুমার দে যে-কৃচ্ছ্রতা দেখিয়েছিলেন তা বর্তমানে বিরল। তাছাড়া গীতিকা-সংগ্রহকালীন স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ('মৈমনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকায়) মন্তব্যসমূহ আজকেও স্মর্তব্য: 'আমি মৈমনসিংহের অনেক লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই তথাকার পল্লীগাথার আর কোনো সংবাদ দিতে পারিলেন না।' এই যে অজ্ঞতা বা, 'কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন' এই উপেক্ষা আজও সমানভাবে সমাজে বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া—'ছোট লোকেরা, বিশেষত মুসলমানেরা—' এই ভদ্র এবং ভদ্রেতর ভীতি উভয়ত। এমন কি 'প্রথমত চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন' এবং 'সেগুলি (গীতিকাগুলি) সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষেও ম্লান বোধ হইত, এজন্য সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিষগুলিকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে সভ্যগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন।' স্বর্গত দীনেশ সেন মহাশয়ের চোখের উপরেই চন্দ্রকুমার দে'র মনোভাবই এমনি বিকল, অন্যে কা কথা। কিশোরগঞ্জের জাস্টিস্ দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী মহাশয় বংশীদাসের 'মনসামঙ্গলে'র প্রকাশক ছিলেন। কিন্তু বংশীদাসের যে এক কন্যা ছিল (কবি চন্দ্রাবতী) সে সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। স্বর্গত দীনেশচন্দ্রের মতে: 'দ্বারিকাবাবু একটু চেষ্টা করিলেই তা

জানিতে পারিতেন' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ২৮১)। চেষ্টা একটু হয়তো করা চলিত, কিন্তু না জানাই যেখানে ভদ্রযুক্ত সেখানে জানিতে কে চায় ?

আমাদের এক আত্মীয়া (বর্তমানে কলকাতায় আছেন) তাঁর পিত্রালয় (নান্দাইল থানা) হতে এই নিষিদ্ধ ফল আমাদের উপহার দেন নিজেরই অজ্ঞাতে। অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের ঐ গান আজও আমাদের বাল্যে ফিরাইয়া নেয়। তারপর আসে শহুরে বিড়ির ক্যানভাসারগণ, 'নস্থার চাঁন' প্রভৃতির সং সেজে তাঁরা শহরময় 'বিড়ি' এবং এই গীতিকাগুলির নির্বাচিত অংশ ফিরি করতেন। এবং একমাত্র গীতিকা অংশের জন্যই তাঁদের প্রতিদিন অত্যধিক ভীড়ের নানাবিধ উপদ্রব সহ্য করতে হত। তারপর আসে বাইচ-খেলার দিনগুলি, ধানকাটার দিনগুলি—কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত—গানের সুরে ভুবন ভরিয়ে দেবার মতো দিনগুলি। ছাত্রাবস্থায় (১৯৪৭-৪৮ খৃঃ) আমাদের এইসব অবৈধ প্রেমের গানগুলি বা প্রেমমূলক গীতিকাগুলি সিঁধেল চোরের মতো শুনতে হত। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে শুয়ে পড়ার ভাণ করে জানালা দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারে আমরা হালুয়াঘাট থানার ঘর ছেড়ে গানের আসরে উপস্থিত হতাম। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ঢপ, যাত্রা প্রভৃতিতে এ নিয়মের ব্যত্যয় হত, কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ শেষদিকেও এমনি এক পূর্ণাঙ্গ গানের (বাজিতপুর থানার) আসরে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এমনি গানের আসর ফুলপুর থানায় বসেছে বলে আমি জানি। এ বিষয়ে আরও প্রামাণ্য তথ্য, আশা করি, পল্লী কবি নিবারণ পণ্ডিতের কাছে পাবেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত 'পরিচয়'-এর অত্যন্ত পরিচিত।

'গীতিকার ভাষা' সম্পর্কে বলা চলে প্রতি দশ মাইল অন্তর ভাষার পার্থক্য ধরা পড়ে। পূর্ব ময়মনসিংহ ও পূর্বোত্তর ময়মনসিংহের ভাষাতেও পার্থক্য বিদ্যমান। আর গীতিকাগুলি এত বিস্তৃততর অঞ্চলে গীত যে বিশেষ কোনো উপভাষায় তা পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় অবশ্য কথঞ্চিৎ কথ্য রূপও বিদ্যমান—তবু উপভাষার কখনো ছাপার ভাষায় রূপান্তর নির্ভুল হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। স্বরলিপি করে কিছুটা বা ট্যাপ করে তা পুরো ধরা পড়ে। ময়মনসিংহের উপভাষায় যারা কথা বলেন তাদের লেখ্যরূপ কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলাই, একমাত্র 'ও'-কার 'উ'-কার হওয়া ভিন্ন সহজ পার্থক্য নেই সমকালীন বাংলার পত্রাবলীর

সঙ্গে তুলনা করলেই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। 'বাংলার লোকসাহিত্যে' শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যে-উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গীতিকার অংশবিশেষের সঙ্গে তুলনা করলেই 'কথ্য' ভাষার 'লেখ্য'রূপের ত্রুটি সহজেই ধরা পড়বে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য ময়মনসিংহের কথ্য ভাষার উচ্চারনগ্রাহ্য 'বানানের' সাহায্য নিয়েছেন (১৯৫৮ সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৩), আর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছেন 'লেখ্য' ভাষার সহজবোধ্য রূপটি। অবশ্য স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কোনো 'ত্রুটি'র উল্লেখ করা আমার লক্ষ্য নয়, তিনি তাঁর অক্ষয় কীর্তির জন্য ময়মনসিংহবাসীর শুধু নয়, সমগ্র বঙ্গবাসীর পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁহার প্রকাশনায় কোনো ত্রুটির অবকাশ ছিল না— তিনি নিজে ময়মনসিংহবাসী নন বটে কিন্তু 'শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর—বি.এ.' প্রেস অধ্যক্ষ, 'শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক' প্রমুখ ময়মনসিংহবাসীদের সাহায্য নিয়েছেন। যাঁরা দীনেশচন্দ্রকে 'ময়মনসিংহবাসী' নন বলে গীতিকায় ত্রুটি খুঁজেন তাঁদের শ্রীযুক্ত ডুসানের বইটি পড়তে অনুরোধ করি।

এতদ্ভিন্ন, শুদ্ধ পাঠ যেখানে যাত্রাগানের পালা হিসেবে অর্থকরী সেখানে 'বারমাসীর গান' (পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত) বা 'কবি চন্দ্রাবতী' চলচ্চিত্রের মতো উপভাষায় প্রদর্শিত অবশ্য মৃত্যুর পথে কে যাত্রা করতে চায়?

কথ্যভাষা এবং লেখ্যভাষার রূপান্তর ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার হস্তক্ষেপই গীতিকাগুলির ভিতরে হয়নি। যদি হত তবে—মহুয়া, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি পালায় অনেক ছত্র নাই, যশোপ্রার্থীর হস্তাবলেপ থেকে সেগুলি অপূর্ণ থাকত না, বা 'কাজল রেখা'র কাহিনীটিতেও স্থানে স্থানে 'গদ্য' আসন পাতত না; যথারীতি অন্যান্য পালাগানের মতো পদ্যানুগ হত। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাসী কাশীদাসী রামপ্রসাদ সমস্যা যেখানে বিরল নয়।

পরিশিষ্টে ধর্ম।

ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রাম-বাংলার এক অত্যুজ্জ্বল সম্পদ। বিজিত ও বিজেতা সম্পর্ক হিন্দু-মুসলমানরা বাংলার মাটির গুণে এক পুরুষেই শেষ করে দিত বা নিত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালেই দেখা যায় সেই লৌকিক হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে এক সহজ বুঝাপড়া হয়ে গেছে। যার ফলে মুসলমান কাজীও শ্রীচৈতন্যদেবকে বলেছিলেন :

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় মোর নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥　(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আর 'নবদ্বীপচন্দ্র'-এর পরবর্তীকালীন 'নস্তার চানে'র সময় ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব কেন যে সন্দেহের কারণ হয় বুঝা দুষ্কর।

তাছাড়া সংগীতপ্রিয় কিস্সাপ্রিয় জনসাধারণের নিকট ধর্মটা মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে বাংলা ভাষাঞ্চল বহুধাবিভক্ত, কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছেলেরা প্রাণ দিয়েই ইতিহাসে তাঁদের ভাষাপ্রীতির রক্তের স্বাক্ষর রেখে গেল। কাছাড়ের ভাষা-আন্দোলনেও ধর্ম তো কই প্রতিবন্ধক হয়নি মাতৃভাষার! ময়মনসিংহের সেই অগণিত চাষাভূষোরাও তাদের নামাজ গানে গানে সেরে খোদাতালার কাছে সুরের ছালাম পাঠিয়েছে আবহমান কাল। আজও তাদের সাধনায় ছেদ পড়েনি।

বিধু চক্রবর্তী

অধ্যাপকের স্ত্রী : লেখকের বক্তব্য

"চিন্তার জীর্ণতা ও শৈল্পিক ব্যর্থতা" জাতীয় ঢালাও রায় সমালোচকের কলমে আশা করা যেতে পারে বৈকি, কারণ শিল্পের বিচার ও মূল্যায়নই তো সমালোচকের কাজ। কিন্তু সমালোচক শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর রায়ের পক্ষে ইতিহাসকেও সাক্ষী মানেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আমার ক্ষুদ্র নাট্য প্রচেষ্টার সমালোচনা শুরু করেন তিনি এই বলে, "ইতিহাসকে উপেক্ষা করে সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করলেও পরে ইতিহাসের কাছে উপেক্ষিত হয়।" অন্যত্র তিনি শ্রীশম্ভু মিত্র প্রসঙ্গে লেখেন Ibsen-এর প্রতি আনুগত্য শ্রীমিত্রকে Archer-এর মতো সাফল্য এনে দিয়েছে, যে Archer, সমালোচকের মতে অমরত্বের অধিকারী। এবং আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করে নিজেকে ইতিহাসের বিরাগভাজন করেছেন"।

পাঠকসাধারণ যেহেতু আমার নাটকের সঙ্গে পরিচিত নন বলে ধরে নিতে পারি তাঁদের অবগতির জন্য জানাই আমার নাটক 'অধ্যাপকের স্ত্রী' প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বৎসর কাল হল। এই এক বৎসর কালেই কি ইতিহাসের বিচার প্রকাশ পেয়ে গেল? এই যদি ইতিহাসের পরিমাপ হয় তো সাময়িক ও ঐতিহাসিকের ভেদটা সমালোচক করেন কিসের ভিত্তিতে? তাছাড়া আমার নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্যেও যে তা

সাফল্য (জনপ্রিয়তা অর্থে !) অর্জন করেছে এমন কোনো খবর তো আমি পাইনি। সুতরাং প্রথমে তা সাময়িক সাফল্য অর্জন করে পরে ঐতিহাসিক ব্যর্থতা দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন ? শ্রীশম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা'র সাফল্যও যে সাময়িকতা অতিক্রম করেছে এ খবর কি ইতিহাস শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের কানে কানে বলে রেখেছেন নাকি ? কারণ আমরা তো জানি শ্রীশম্ভু মিত্র 'পুতুল খেলা' মঞ্চস্থ করছেন মাত্র গত কয়েক বছর যাবৎ। এই স্বল্প সময়ে নাটকটি যে নিঃসন্দেহ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাকেই যদি ইতিহাসের প্রমাণ হিসেবে মেনে নিতে হয় তো শ্রীতৃপ্তি মিত্র অভিনীত 'সেতু', যা অনেক বেশি কাল ধরে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাকেও কেন ঐতিহাসিক সাফল্যমণ্ডিত বলে মনে করা হবে না ?

অবশ্য এ কথা ঠিক যে 'সেতু'র দর্শক আর 'পুতুল খেলা'র দর্শক এক শ্রেণীর বাঙালি নন। দ্বিতীয়োত্তরা হলেন বাংলাদেশের আধুনিকেরা। এই আধুনিক বঙ্গ সন্তান, যাঁরা পরিচয়ের মতো কাগজে গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখেন এবং শ্রীশম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' দেখে নিজেদের আধুনিকতা সম্পর্কে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন তাঁদের আধুনিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার নায়ক, যিনি অধ্যাপনা করেন এবং পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখেন, আমার নায়িকা নিরু যে নিজেকে 'স্বাধীন জেনানা' মনে করেন, এরা দুজনেই আধুনিক তরুণ বাঙালি, এদের মতো আধুনিকদের মধ্যেই শ্রীশম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' অত্যন্ত সমাদৃত। কিন্তু মঞ্চে নায়িকাকে নিছক আত্মমর্যাদার তাগিদে মাঝরাতে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে সন্তান ফেলে রেখে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করতে দেখে যাঁরা নিজেদের আধুনিকতার জন্য তৃপ্তি বোধ করেন তাঁরা নিজেদের জীবনে বৈবাহিক সংকট দেখা দিলে কিরকম আচরণ করেন তাই দেখানো ছিল আমার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়েছে, আমার বক্তব্যটা সমালোচকদের বোধ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। সবিনয়ে মেনে নেওয়া যাক এই ব্যর্থতা আমার শিল্পেরই ব্যর্থতা। কিন্তু এই বক্তব্যটাকে নাটকের উপর "চাপিয়ে" দিয়েছি, একটি thesis-এর প্রচারে "দৃঢ় প্রতিজ্ঞ" হয়ে "প্রচারকের স্থান নাট্যকারের উর্দ্ধে" স্থাপন করেছি, এই সমালোচনাও কি খাটবে ? আমার বিরুদ্ধে অনাধুনিকত্বের "অভিযোগ"ও কি বজায় থাকবে ?

বস্তুত পাঠক বা সমালোচক আমার বক্তব্য ভুল বুঝতে পারেন এমন

আশঙ্কা আমার ছিল এবং তার প্রতিবিধানের জন্য নাটকটিকে একটি 'মিলনান্তক ট্র্যাজেডি' বলে আমি নিজেই চিহ্নিত করেছি। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা? সমালোচক অভিযোগ করেন পরিণতিটি (যাকে আমি ট্র্যাজিক মনে করেছি) জীবনে লক্ষ্য এই বাণী প্রচারই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি নাটক রচনাতে মনোযোগের অভাব প্রদর্শন করেছি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি কতটা মনোযোগের সঙ্গে আমার নাটক পড়ে সমালোচনা করতে বসেছেন? বাংলাদেশের দর্শক সাধারণ শ্রীশম্ভু মিত্রের পরিণতি পছন্দ করবে না এই ভয়ে, তাদের মন জোগানোর জন্য, আমি আমার পরিণতিটিকে বেছে নিয়েছি, এতদূর কল্পনায় আশ্রয় নেওয়ার আগে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার উপর আরও একটু যত্ন সহকারে চোখ বুলোলে কি ভালো হত না?

সমালোচক যেহেতু শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, অভিযোগ এনেছেন, সেহেতু খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হল। কিন্তু পাঠককে লক্ষ করে দেখতে অনুরোধ করি, নাটকের শৈল্পিক সার্থকতার পক্ষে কোনো কথাই বলিনি। তা বলা নিতান্তই মূর্খতার পরিচায়ক হত। শিল্প হিসেবে সার্থক হল কী ব্যর্থ হল সে বিষয়ে কথা বলা সমালোচকেরই সাজে, শিল্পীর নিজের হয়ে নিজের ওকালতি করার দৃশ্য অতি করুণ ও অশোভন।

অশোক রুদ্র

প রি চ য়

রমেশচন্দ্র দত্তের যুগান্তকারী অনুবাদ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা ॥ দাম চল্লিশ টাকা

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ॥ ১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত ঋগ্বেদ-প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। ৩। যামিনী রায় অঙ্কিত ছয়-বর্ণের প্রচ্ছদ। ৪। প্রবোধরাম চক্রবর্তী রচিত রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর পূর্ণ বিবরণ। ৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত বৈদিক সাহিত্যের সহজপাঠ্য পরিচিতি। ৬। চারবর্ণে মুদ্রিত বৈদিক ভারতের মানচিত্র।

একটি মূল্যবান অভিমত

"………৬৩৩ পৃষ্ঠার এই অমূল্য গ্রন্থখানি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তীর উদ্যোগে পুনর্মুদ্রিত হইয়া উপন্যাস ও লঘুসাহিত্যের বন্যায় প্রপীড়িত বাংলা সাহিত্যের শিরে মুকুটমণির উজ্জ্বলতায় চিরদিন দীপ্যমান থাকিবে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা দাবি করিব—এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাঙালীর ঘরে ঘরে আদৃত, পূজিত ও পঠিত হইবে। যামিনী রায়ের পরিকল্পিত আলংকারিক প্রচ্ছদপটে ঐরাবতের পৃষ্ঠে ইন্দ্রদেবতার মূর্তি যথাযোগ্য ও আকর্ষণীয় হইয়াছে। 'জ্ঞানভারতী' বইখানি প্রকাশ করিয়া প্রশংসনীয় সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সকলের অভিনন্দন অর্জন করিয়াছে।"

—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞানভারতী প্রাইভেট লিঃ

১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

JESM/G/460

আপনার পণ্যের প্রচার যতটা নির্ভর করে পণ্যের গুণাগুণের ওপর ঠিক ততটাই নির্ভর করে তার সুদৃশ্য মনোহারী বহিরঙ্গের ওপর—

আপনার পণ্যের প্রচার সম্পর্কিত যাবতীয় পরামর্শ ও বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

প্যানোর‍্যামা

অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেন্স,
৮৪এ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট,
কলিকাতা-২০ ॥ ফোন : ৩৭-৪২৫৫

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? তুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

পশ্চিমবঙ্গের শহরে ও গ্রামে কোথায় কী ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠছে সে-সব খবর জানতে হ'লে নিয়মিত পড়ুন সচিত্র সাপ্তাহিক

কথাবার্তা

এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক : তিন টাকা   ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা

গ্রাহক হবার জন্ম নিচের ঠিকানায় পত্রালাপ করুন

বিজনেস ম্যানেজার
প্রচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

আগে ছিল কলকাতায় পুজোর অন্ত কেতা। পুজোর দিন ঘনিয়ে এলেই ঢুলী আর বাজনদারদের ভিড়। লোকে লোকারণ্য রাস্তা। দুদিকে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্বিপত্র আর কুচো ফুল। বনেদী বাবু বসেছেন দালানে; সামনে সোনার আলবোলা, ডাইনে পান্নাবসানো ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরেবসানো টোপদার গুড়গুড়ি। দোকানে শোভা পাচ্ছে চিনির মিঠাই, খুরিভরা গুড় আর মধুপর্ক। বারকোশে দুর্গামণ্ডা আর আগাতোলা সন্দেশ।

এখন কেতা অন্ত। এখন বাবুর বাড়ির পুজো নয়—বারোয়ারি পুজো। সেই সঙ্গে রুচিও আলাদা। এখন পুজোয় চাই খাঁটি ছানার রসগোল্লা আর সন্দেশ।

দেবভোগ্য মিষ্টান্নে দুর্গোৎসবের আনন্দ হোক মধুময়।

কে, সি, দাস প্রাইভেট লিমিটেড

রসোমালাই-এর স্রষ্টা

কলিকাতা

JWTKCD 1219AR

রয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। ফোন: ৩৫-৫৫৮০

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ—এ এম আই ই (ইণ্ডিয়া), বি ও এ টি, টার্ণার, ফিটার, মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ড্রাফটস্‌ম্যান, ইলেকট্রিসিয়ান, রেডিও প্রভৃতি কোর্সসমূহে নূতন সেসনে ভর্তি চলিতেছে। স্কুল ফাইনাল পাশ না করা প্রার্থীগণকেও বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করা হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ডাকযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কমার্স বিভাগ—টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড ১, ৩, ৬ মাসে গ্যারান্টি দিয়া ফুল কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। বুক-কিপিং ও একাউন্ট্যান্সী মাত্র ছয় মাসের গ্যারান্টিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজী বলা লেখা বিদেশিনী মহিলাদের দ্বারা শিখুন।

টিউটোরিয়াল বিভাগ—এস এফ, হাঃ সেঃ, প্রি-ইউ ও ডিগ্রী কোর্সে বিশেষ অভিজ্ঞ প্রফেসারদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। এস এফ পরীক্ষায় "পাশ না করিলে গ্যারান্টি ফি ফেরৎ" স্কীমে ভর্তি নেওয়া হইতেছে। জার্মান ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে।

শাখা—শ্যামবাজার, ধর্মতলা, বেহালা, খিদিরপুর, কলেজ স্ট্রীট, দমদম, হাবড়া ও বর্ধমান এবং নূতন দিল্লী ও বম্বে।

১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হবে

কবি জয়দেবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাব্যের
বিজয়চন্দ্র মজুমদার-কৃত অসামান্য অনুবাদ

গীতগোবিন্দ

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের এই অসামান্য অনুবাদ-কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। দীর্ঘকাল ছাপা না থাকায় এই দুর্লভ বইটি বাঙালী পাঠকদের কাছে বিস্মৃতপ্রায়। পঞ্চান্ন বছর বাদে বইটি কবি-কন্যা সুনীতি দেবীর সহযোগিতায় মূল সংস্কৃত পাঠ ও অবন্তীকুমার সান্যালের সারগর্ভ ভূমিকা সহ পুনর্মুদ্রিত হবে। বইটির অন্যতম আকর্ষণ: কাংড়া চিত্রাবলী থেকে সংগৃহীত গীতগোবিন্দের রঙিন আর্টপ্লেট। প্রতিটি সাধারণ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সঞ্চয় করে রাখার মতো বই।

দাম: চার টাকা

নতুন সাহিত্য ভবন

৮৪এ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LLC-6 BEN
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা
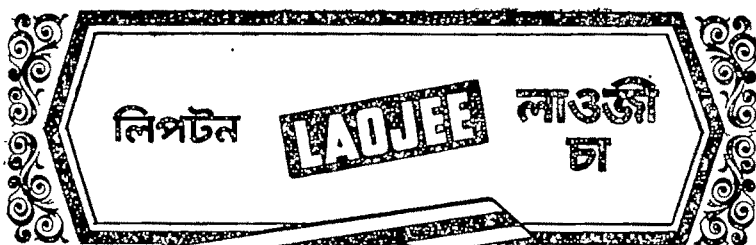
বিনয় ঘোষ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড

নবযুগের বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অনন্ত আকরগ্রন্থমালার তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড 'সংবাদ প্রভাকর', দ্বিতীয় খণ্ড 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', তৃতীয় খণ্ড 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 'সম্বাদ ভাস্কর' 'বিদ্যাদর্শন' ও 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র রচনাসংগ্রহ। চতুর্থ খণ্ড 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সংকলন এবং শেষ পঞ্চম খণ্ড সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ একসঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

প্রত্যেক খণ্ড বড় রয়াল সাইজে ৬০০ থেকে ৮০০-১০০০ পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড ১২'৫০ প। দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'৫০ প। তৃতীয় খণ্ড ১৪'৫০ প

অপ্রত্যাশিত স্থলভ মূল্য শিক্ষাবিভাগের আর্থিক আনুকূল্যের জন্য সম্ভব হয়েছে

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ

প্রথম খণ্ড। ৬'৮০ প

নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর-বক্তৃতা ছাড়াও আরও অনেক নতুন বিষয় পাঠকদের অনুরোধে সংযোজিত হয়েছে। যেমন—(১) বিদ্যাসাগরের ৬৪ খানি চিঠি, বহু অপ্রকাশিত (২) বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবনী (৩) অবিকল উইলের কপি (৪) সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী (৫) অন্তরঙ্গদের স্মৃতিকথা (৬) উনিশ শতকের বিস্তারিত ঘটনাক্রম।

জীবনীভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড ৭ টাকা। তৃতীয় খণ্ড ১২ টাকা

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে এবং 'প্রকাশভবন' ও 'মনীষা' গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়

বীক্ষণ

১২।১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

নিগ্রো কবিতা নিগ্রো কবিতা

ভারতীয় ভাষায় এই সর্বপ্রথম

আফ্রিকা এবং আমেরিকার নিগ্রো কবিতার

সুনির্বাচিত অনুবাদ সংকলন

সূর্যের প্রতিবেশী

অনুবাদ করেছেন ঃ—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অতীন্দ্র মজুমদার, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, আনন্দ বাগচী, আশিস সান্যাল, কবিতা সিংহ, কেতকী কুশারী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দুর্গাদাস সরকার, ধনঞ্জয় দাশ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র গুপ্ত, বরুণ মজুমদার, বঙ্কিম গুহ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মনুজেশ মিত্র, মানস রায়চৌধুরী, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, রাম বসু, শঙ্কর চট্টোঃ, সুশীল রায়, সুনীল বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সরোজকুমার দত্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, সমরেশ মজুমদার, স্বদেশ দত্ত, সুখেন্দু পুরকাইত, সমীরণ মুখোপাধ্যায়, সুশীল গুপ্ত।

বিস্তৃত ভূমিকা এবং কবিপরিচিতি সহ দাম ঃ চার টাকা

সম্পাদনা ঃ আশিস সান্যাল

সেকাল-একাল

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন !

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

উৎসব ঋতুতে

ভাল বই

বাংলা, ইংরেজী, গল্প

কবিতার সুনির্বাচিত সংগ্রহ

আর বাছাইকরা

শারদীয় সংখ্যার জন্য

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৩
আশ্বিন, ১৩৭১

সূচীপত্র

সাহিত্য অকাদেমীর অনুবাদ গ্রন্থ

অ্যারিওপ্যাগিটিকা

জন মিল্টনের প্রবন্ধ। অনুবাদক: ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ওয়েজউড-লিখিত মুখবন্ধ ও অনুবাদকের ভূমিকা সম্বলিত। ৩'০০

আন্তিগোনে

সোফোক্লেসের গ্রীক নাটক। অনুবাদক: শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কিটো-লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত। ২'৫০

তার্তুফ

মলিয়েরের-কৃত ফরাসী নাটক। অনুবাদক: শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য। স্তানিসলাস অস্ত্রোরগ-লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত। ৪'৫০

ওয়ালডেন

হেনরি ডেভিড থোরোর 'ওয়ালডেন পণ্ডে' থাকাকালীন অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অনুবাদক: শ্রীকিরণকুমার রায়। ৭'৫০

তাও-তে-চিং

লাও-ৎস কথিত জীবনবাদ। পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন দর্শনগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ। শ্রীওয়াং-ওয়েই-ছং-এর ভূমিকাসহ মূল চীনা ভাষা হইতে ডঃ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত। ২'০০

লুন-য়্যু বা কনফুসিয়াসের কথোপকথন

জীবনদর্শন সম্বন্ধে শিষ্যদের সহিত কনফুসিয়াসের আলোচনা। মূল চীনা ভাষা হইতে ডঃ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত। ৪'০০

সাহিত্য অকাদেমী

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নিউ দিল্লী-১

রবীন্দ্র সরোবর স্পোর্টস স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

নাটক

কবিতা

ছবি ও স্কেচ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রেনেতো গুত্তুসো দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সোমনাথ হোড় সজল রায়চৌধুরী উমা সিদ্ধান্ত শম্ভু রায়

প্রচ্ছদপট : প্যানোর‍্যামা

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

শারদীয় কালান্তর

১৩৭১

মহালয়ার আগেই বের হবে

- **প্রবন্ধ :** অধ্যাপক নির্মল বসু, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কপিল ভট্টাচার্য, ভবানী সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রকাশ গুপ্ত, সুকুমার মিত্র, গোপাল হালদার, ডঃ সুনীল সেন, রবীন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।
- অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া।
- **কবিতা :** বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, সেবাব্রত প্রমুখ।
- **গল্প :** শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সেন, দেবেশ রায়, বীরেন নিয়োগী, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, পবিত্র রায় প্রমুখ।

* বিশেষ আকর্ষণ *

পূর্বদিগন্ত : পূর্ববাংলার লোকসাহিত্য, গল্প, কবিতা

এবং

রাজনৈতিক পটভূমি

দাম : ছ' টাকা। এজেন্টদের কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা।

পাওয়া যাবে :

'কালান্তর' কার্যালয়, ৫৯।১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মনীষা গ্রন্থালয়, ৪।৩বি বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এবং

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিক্রেতাদের নিকট

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত-মনের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রকাশ। অর্থনীতি ইতিহাস শিক্ষা সাহিত্য সমাজ দর্শন ধর্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২৯ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৫০ পয়সা। প্রকাশিত বইয়ের কতকগুলি এই—

বি জ্ঞা ন

অভিব্যক্তি ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাণ্টিবায়োটিক ॥ শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নবযুগের ধাতুচতুষ্টয় ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
নক্ষোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা ॥ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
বিশ্বের উপাদান ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
রঞ্জন-দ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
রসায়ন ও সভ্যতা ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার
রাশিবিজ্ঞানের কথা ॥ ডক্টর পূর্ণেন্দুকুমার বসু
শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাস

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

"সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন,"

(রবীন্দ্রনাথ)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা-২৬

সাবিত্রী রায়ের লেখা বই :

পাকা ধানের গান : তিন খণ্ডে ১২'৫০ **ত্রিস্রোতা** ৬'০০ **মালশ্রী** ৩'৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—মেঘনা আর পদ্মাপারের ভাঙ্গাগড়ার পটভূমিতে লিখিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রামের সুবৃহৎ উপন্যাস—

মেঘনা-পদ্মা ১৫'০০

সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে দু'একটি অভিমত—

"কোনও বাংলা উপন্যাসই, এমনকি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ ও উৎকৃষ্টতর শিল্পনৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাসও সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান'-এর মত এমন বিরাট চিত্রপট, রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর এত মহান প্রণিধান, বিষয়বস্তু ও চরিত্রের এত বৈচিত্র্যময় অবতারণার দাবী করতে পারে না। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোও (সৃজন, ত্রিস্রোতা, মালশ্রী প্রভৃতি) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাঁর 'পাকা ধানের গান' মহাকাব্য সৃষ্টির মহৎ প্রচেষ্টা। এটি জনগণের মহাকাব্য —যাতে গণসংগ্রামের এক পর্ব ও পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রার একটি ধারা অত্যন্ত সততার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে।... ....
সবশেষে এ বললে হয়তো অতিশয়োক্তি ও প্রশস্তির বাহুল্য হবে না যে সত্যের সার্থক মূল্যায়নে ও শিল্পপ্রতিভার চরম পরাকাষ্ঠার বিচারে এই জনগণের উপন্যাসটির প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ অপর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই"

* —সরোজ আচার্য : **নিউ-এজ**

"বর্তমান বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য সন্ধানী চটুল ঝঙ্কারের ভিতর পাকা ধানের গান ধ্রুপদ মন্দ্রিত, এর বিপুল সঙ্গীত বাংলা দেশের ধানের ক্ষেতের মতোই দূর দূরান্তে দিক্-দিগন্তে বিকীর্ণ হয়ে গেছে"— **—পরিচয়**

*

"পাকা ধানের গান' একটি সাধারণ কাহিনী নয় ; সেখানে রাজনীতির প্রশ্ন আছে, সমাজ জিজ্ঞাসা আছে।......প্রেম নামে স্নিগ্ধ স্বপ্ন আছে। দেশ নামে প্রবল কর্তব্য আছে। একদিকে ব্যক্তিমানস আর একদিকে বিশাল দেশের বিপুলতর আহ্বান। লেখিকার অপরূপ এক কবি মন আছে। বাংলা দেশের লোকাচার, ব্রতকথা অপূর্ব মমতায় তিনি এই কাহিনীতে অঙ্গীকৃত করেছেন"

* **—দেশ**

"সাবিত্রী রায়কে ধন্যবাদ, পল্লীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুন্দর সুখপাঠ্য উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই বইয়ে এমন একটি কোমল ও শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, যা খুব সুলভ নয়—"

* **—আনন্দবাজার পত্রিকা**

"জীবনের যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র উপাখ্যান সাবিত্রী রায় সংগ্রহ করেছেন তা যে কোন জীবননিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ঈর্ষাযোগ্য..."

—যুগান্তর পত্রিকা

মিত্রালয় ॥ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আর·ডি·বি'র
পরবর্তী চিত্র সম্ভার
গীত ফিল্মস প্রাঃ লিঃ-এর
পরিচালনা· অজিত সেন
আর·ডি·বনশল প্রযোজিত
কাপুরুষ ও মহাপুরুষ
পরিচালনা· সত্যজিৎ রায়
আর·ডি·বনশল প্রযোজিত
কাঁচ কাটা হীরে
পরিচালনা· অজয় কর
পূর্বাচল ফিল্ম প্রোডিউসার্স-এর
আকাশ কুসুম
পরিচালনা· মৃণাল সেন
চিত্রাঞ্জলি'র
অনামিকা
পরিচালনা· হেমেন গুপ্ত
বিশ্ব পরিবেশনা· আর·ডি·বি এণ্ড কোং

কলিঙ্গ
টিউব্‌স
জল, গ্যাস ও
বাষ্পের জন্য
কলিঙ্গ টিউব্‌স লিমিটেড্‌
৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২
কারখানা : চৌদ্বার, উড়িষ্যা।
KALPANA.

চীনে জাত্যাভিমানের বিকাশ কিভাবে ঘটল
তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

ফাইভ ইয়ার্স ইন মাওজ চায়না	২·৫০
বাংলা অনুবাদ (যন্ত্রস্থ)	২·২৫
নেহেরু অন সোশ্যালিজম	৪·০০
ইউ, এস, সেভেন্থ ফ্লিট	০·৩০

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে হলে

মেইনস্ট্রিম

সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক হোন

বিঃ দ্রঃ—২রা অক্টোবর (গান্ধীজয়ন্তী) থেকে ১৪ই নভেম্বরের (নেহেরুর জন্মদিন) মধ্যে গ্রাহক হলে 'নেহেরু অন সোশ্যালিজম' বইটী কনশেসন মূল্যে পাবেন।

পারস্পেকটিভ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ
১৪বি, হনুমান লেন, নয়াদিল্লি-১

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মারোয়াড় রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু…!' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না!" চিতায় আরোহণ করে দয়িতের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস … লেলিহান হ'ল চিতার আগুন …

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক — স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-583A BEN

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই-১

আপনার লগ্নীকে মুনাফায় পরিণত করুন

সেণ্ট্রালের তিন বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন

শতকরা ৪¼ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ অর্জন করুন

প্রতি ৮৮'২৫ টাকা জমার জন্য তিন বছর পরে ১০০ টাকা করে পাবেন

সঞ্চয় করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত হোন

সেণ্ট্রালে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলুন

শতকবা ৩ টাকা হারে সুদ অর্জন ককন

চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়

এফ সি কুপার — জেনারেল ম্যানেজার

স্যার হোমি মোদী কে, বি, ই — চেয়ারম্যান

বি সি সর্বাধিকারী — চীফ এজেণ্ট কলিকাতা

ন্যাশনালের দুইটি সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস

কৃষকজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ● জীবননিষ্ঠ একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত

কমরেড

সৌরি ঘটক

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও উত্তম বাঁধাই : দাম ৪'০০

●

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো

(Virgin Soil Upturned)

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও উত্তম বাঁধাই : দাম ৮'০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর

শ্রাবণের কান্নার শেষে আশ্বিনের আশ্বাস এল,
থৈ-থৈ বর্ষার সমুদ্র পেরিয়েই তো
শরতের আলো - ঝলমল দ্বীপ!
দুঃখ থেকে সুখে, নিরাশা থেকে আশায়
এবং ব্যর্থতা থেকে সফলতায় উত্তরণের স্বপ্ন
সকলের জীবনে সার্থক হোক।
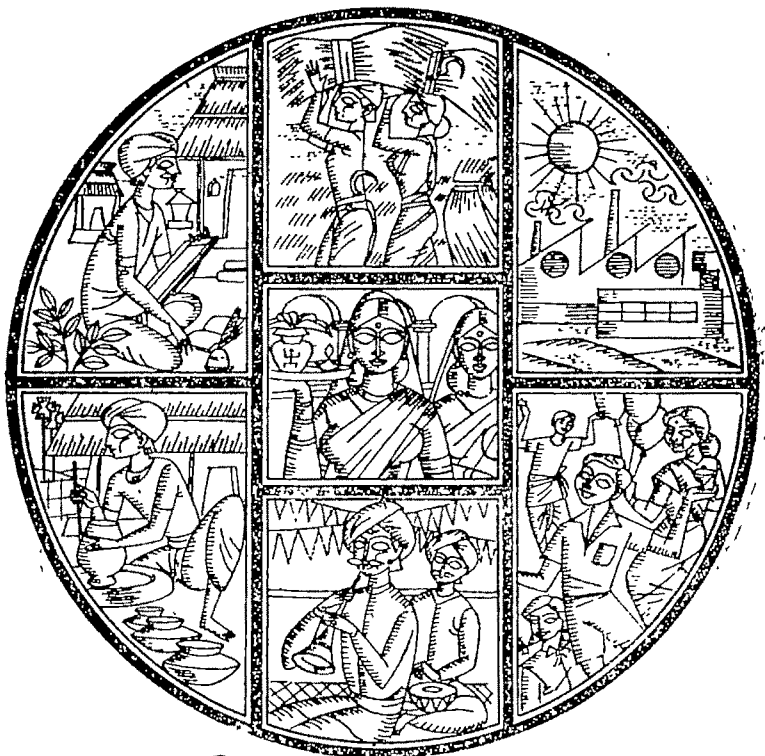
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে]

হাসির গান: অপ্রকাশিত রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা না গান গাওয়ার দল রে
না গান সাধার—
মোদের ভৈরোঁতে সূর্য মুখ করে আঁধার।
অমাবস্যার রাতে বেহাগ ধরে
কোকিলগুলোকে দেই নিঝুম করে
পূর্ণিমা রাতে—দক্ষিণের ছাতে
যেম্‌নি কানাড়া ধরি অমনি ভয়ে মরি
পাড়ার গোঁয়ারগুলোর কোমর বাধার।
আমরা মল্লার ধরিলে হয় অনাবৃষ্টি
ছাতির দোকানে লাগে শনির দৃষ্টি
বসন্তবাহারে টান দিলে আহা রে
শূলের বেদনা ধরে মথুরদাদার।

১৩৪২, ৩০ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল-উৎসবের কয়েকদিন পরে (৭ ভাদ্র) আশ্রমের অধ্যাপক ও কর্মীমণ্ডলী দামোদর-বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যদানের জন্য 'ভরসা-মঙ্গল' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একান্তসচিব শ্রীঅনিলকুমার চন্দ। রবীন্দ্রনাথ 'হৈ হৈ সংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উপযোগী কয়েকটি গান রচনা করেন। তার মধ্যে একটি গান: 'না গান গাওয়ার দল রে, আমরা'। উল্লিখিত পাঠটি তারই রূপান্তর। 'হৈ হৈ সংঘের' অন্যতম সদস্য ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর অনুজ্ঞাক্রমে এই পাঠ লিপিবদ্ধ করেন।

শ্রীসুভাষ চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কেষ্টনগরের লোক বলে আমার শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে বহুকাল থেকে পরিচিত। তার বহু পরে অবশ্য ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বড়ো মেয়ে সুরবালার সঙ্গে আমার শ্বশুর-বাড়ীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়, কারণ তাঁর মেজ মেয়ে রাধারাণী দেবীর সঙ্গে পরে আমার সেজ ভাশুর কুমুদনাথ চৌধুরীর বিবাহ হয়। সেজ দিদিরা অবশ্য দ্বিজুবাবুর অনেক গান জানতেন ও গাইতেন। তাই শুনে শুনে আমরাও অল্পবিস্তর শিখেছিলাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দ্বিজুবাবুর কাছ থেকে তাঁর নিজের গানগুলি কবে ও কোথায় লিখি খুব পরিষ্কার মনে না থাকলেও সে গানগুলি আমাব খাতায় এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে এবং তার থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে একমাত্র হাসির গানের জন্যই তিনি বিখ্যাত নন; যথা—"আর কেন মা ডাকছ আমায়", "হেসে নাও দুদিন বইত নয়", "আমার আমার বলে ডাকি" ইত্যাদি।

১৯০৪ সালে যখন কোনো কারণে দার্জিলিঙে বসবাস করতে যাই সেই সময়েই তাঁর মুখ থেকে স্বরচিত গান লেখার সৌভাগ্য আমার হয়। বিশেষ করে মনে আছে, তাঁর বিখ্যাত গান "বঙ্গ আমার, জননী আমার" দার্জিলিঙের কোনো নিমন্ত্রণ-সভায় গেয়ে খুব প্রশংসা লাভ করি কারণ সে গানটি তখনও খুব পরিচিত হয় নি।

ইন্দিরাদেবী-কথিত এই স্মৃতিচর্যাটি শ্রীসুভাষ চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত।

সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ এমন একজনের সঙ্গলাভ করেছিলেন, যিনি পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর তাঁর সুহৃত্তমরূপে গণ্য হয়েছিলেন।

১৯১২, ৩০ জুন শিল্পী রদেনস্টাইনের হাম্পস্টেডের বাড়িতে এক সুধী-সমাগমে কবি ইয়েট্‌স্ 'গীতাঞ্জলি'র কোনো কোনো কবিতা পাঠ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন কেমব্রিজ ব্রাদারহুডের মিশনারী চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই অ্যাণ্ড্রুজের প্রথম সাক্ষাৎ। সুচিরকাল-ব্যাপী সৌহৃত্তর প্রথম পরিচয়ের এই সন্ধ্যাটি অ্যাণ্ড্রুজের ভাষায় স্মরণীয়। কবিতা-পাঠের পর :

> I walked back along the side of Hampstead Heath, with H. W. Nevinson but spoke very little...when I had left Nevinson I went accross the Heath. The night was cloudless and there was something of the purple of the Indian atmosphere about the sky. There all alone I could think of the wonder of it :
> 'On the seashore of endless world children meet
> On the seashore of endless world is the great meeting of children.'
>
> It was the haunting, haunting melody of the English, so simple, like all beautiful sounds of my childhood that carried me completely away. I remained out under the sky far into the night, almost till dawn was breaking.[১]

১. Rathindranath Tagore : *On the Edges of Time.*

বহুকাল পরে অ্যাণ্ড্রুজের মৃত্যুদিনের উপাসনায় (১৯৪০, এপ্রিল ৫) রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর পূর্বের সেই সন্ধ্যার কথা স্মরণ করেছেন :

> তখন আমি লণ্ডনে ছিলাম। কলাবিশারদ রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। অ্যাণ্ড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন।...ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে।[২]

এর কিছুকাল পরে অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন ; ক্রমশ সমগ্র ভারতের দীন-দরিদ্র মানুষেব সেবায়, কী স্বদেশে কী বিদেশে, তিনি আত্ম-নিবেদন করেন। কর্ম ও মতের ক্ষেত্রে কখনো দূরত্ব এলেও রবীন্দ্রনাথ ও অ্যাণ্ড্রুজের বন্ধুত্ব কভু ম্লান হয় নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (১৯৩৬, মার্চ ২০) অ্যাণ্ড্রুজ সেই ধ্রুব, অচঞ্চল বন্ধুত্বের মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেন :

> পঁচিশ বছর পূর্বে আমার সমগ্র হৃদয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব প্রতি নিবেদিত হয়েছে, আজও তাঁর প্রতি আমার হৃদয় সমর্পিত।...পঁচিশ বৎসর পরে পিছনে তাকিয়ে আজ দেখছি, বর্ষে বর্ষে এই বন্ধুত্ব দৃঢ়তর, নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। এই সৌহৃদ্যই আমার জীবনে পরম সম্পদ, ইহসংসারে আমার প্রাপ্ত ঈশ্বরের সর্বোত্তম আশীর্বাদ।[৩]

১৯৪০, ৫ এপ্রিল কলকাতার নার্সিং হোমে অ্যাণ্ড্রুজের মৃত্যু হয়। অন্তিম মুহূর্তে কঠিন যন্ত্রণায়ও তাঁর বন্ধুর প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ প্রীতি বারেবারে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় রয়েছে শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবীশ লিখিত 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' পুস্তকে, আর, ১৯৪০, ৬ এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে :

> অপারেশনের পূর্বাহ্ণে তিনি বারংবার বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত, কোনো সংশয়, কোনো দ্বিধা নেই আমার মনে। হঠাৎ আশ্চর্য শক্তি এসেছিল তাঁর মধ্যে—...সেই শক্তির শান্ত ক্ষণে বারেবারে তিনি

২. প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

৩. *Visvabharali Quarterly.* May-June, 1936.

আপনার নাম করেছেন এবং বলেছেন এই দান আপনার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ভারতবর্ষে, যা পেয়ে প্রথমে তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল। [৪]

৫ এপ্রিল শান্তিনিকেতনে মন্দিরের উপাসনায় আচার্য রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বন্ধুত্বকে অ্যাণ্ড্রুজ বলেছেন 'the greatest gift God has given me', বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করলেন :

> অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দুর্লভ সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো।···একদিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হতে এই খ্রীস্টান সাধুর ভগবদ্ভক্তির নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ, না ছিল খ্যাতির দুরাশা, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন।···
>
> এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। [৫]

এরই এক বৎসর পরে অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শেষ জন্মদিবসের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড্রুজের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানালেন :

> আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।···দৃষ্টান্তস্থলে অ্যাণ্ড্রুজের নাম করতে পারি। তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রীস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল; আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। [৬]

অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর কিয়দংশ 'Letters to a Friend' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে; এতাবৎকাল অপ্রকাশিত অ্যাণ্ড্রুজের পত্রাবলী কিছু সংখ্যায় এখানে মুদ্রিত হল।

প. ব.

---

৪. প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

৫.　　ঐ

৬. সভ্যতার সংকট

এক ভাবানের কাছে, ১লা জানুয়ারি, ১৯১৪

গত বছর বাংলা নববর্ষে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লেখেন, আপনার জীবনে একটি নূতন অধ্যায় শুরু হল—তা আপনি অনুভব করছেন। সে জীবন হল একটি পথিকের, এক তীর্থযাত্রীর জীবন। আজ পশ্চিমের নববর্ষের দিনে এই ঝড়ের সমুদ্র পার হয়ে এসে তার ওপারে আপনার দিকে যখন তাকিয়ে দেখছি, তখন আমারও মনে জেগেছে সেই একই অনুভূতি। মনে হচ্ছে আমার জীবনের পুরোনো নোঙর পিছনে ফেলে এই এতদিনে বিপুল সমুদ্রে পাড়ি জমালাম। এর মধ্যে একটা মুক্তির স্বাদ রয়েছে। তবু, বিশেষ করে শরীর অসুস্থ থাকলে, এমন একটা একাকিত্বের বোধ জাগে! জীবনটা ভারি নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ মনে হয়। গত তিন সপ্তাহ ধরে ঝড়ের সমুদ্রে ভ্রমণেরই ফল এটি। গত বছর গ্রীষ্মকালে দু' দুবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর একেবারেই দুর্বল হয়েছিল, তার উপর দিনের পর দিন সমুদ্রপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছি।

কিন্তু পিছন ফিরে যখন তাকিয়ে দেখি, কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যায়। ঈশ্বরের অসীম দয়ার কথা ভেবে আজ আমার মন তাঁর প্রতি প্রেমে উদ্বেল হচ্ছে। যা অতিক্রম করে আমাকে আসতে হয়েছে, তা আমার পক্ষে প্রয়োজনই ছিল। অন্য কোনোভাবে আমি তো তাঁর এত কাছে আসতে পারতাম না! আমার সমগ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে যদি বিচার করতে চাই, যদি তার উদ্দেশ্য ও প্রবণতার দিকটি উপলব্ধি করে নিতে হয়—তবে তার জন্য সহজ স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কঠোর বাস্তবের সংস্পর্শে আসা দিনগুলিই বেশি প্রশস্ত। সেভাবে জীবনটা দেখার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। গত বছর আপনার অসুখ ও অস্ত্রোপচারের সময় আপনিও এই রকম বোধ করতেন নিশ্চয়, কারণ আপনি বলেছিলেন, সে সময়টা আপনার জন্য কী আশীর্বাদই না বয়ে এনেছিল!

'অসতো মা সদ্‌গময়' এই মন্ত্রটি দিয়ে আপনি আমার মনে কত আশ্বাস আর কত সান্ত্বনা যে ভরে দিয়েছেন, তা আর কী বলব! অনেক সময় মাথা যখন দুর্বল লাগে তখন চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করলে মনে এমন একটা জোর পাই, যা কখনও পাওয়া সম্ভব বলে আগে মনে করিনি। বারেবারে তাদের পুনরাবৃত্তি মনে ভারি আরাম আর মুক্তির ভাব নিয়ে আসে।

এই যে অপূর্ব অভিজ্ঞতার কাল চলেছে, এর মধ্যে আমার আসার আগের দিন রাতে যে আধ্যাত্মিক বাণী আপনি আমাকে দিলেন, তখন ঈশ্বরের যে অপরূপ মহিমা আমি তাতে প্রত্যক্ষ করলাম, সেই স্মৃতিটিই এখন আমার মনে বড়ো হয়ে রয়েছে। মহর্ষির ঘরে নিয়ে যখন আমাকে বসালেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনি যেন সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন। যে-বাণীর আমার একান্ত প্রয়োজন ছিল, নিজের অগোচরে সেটিই যেন আপনি আপনার নিজ জীবনের গোপন শক্তির আধার বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে দান করলেন।

এই সময়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই আমার মনে হয়েছে, দিল্লীতে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ আমার সমগ্র জীবন সেই নোঙরটি বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছে। অনেক বছর থেকে কেবল তার শিকলে জড়িয়ে ছিলাম। তবে আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়াবার আগে এ-সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, সেখান থেকে সরে না এসে আমার আর উপায় ছিল না। আমার চিত্তের একমাত্র ক্রন্দনই হবে, 'অসতো মা সদ্‌গময়।' এখন আর পিছন ফেরা চলবে না। আমার প্রিয়তম বন্ধু আপনি—সর্বদা আমার কাছে কাছেই থাকবেন, তাতেই ক্রমে ক্রমে এমন হবে যে, আমি চোখ মেলে সত্যকে দেখতে পাব—আর সত্যই আমাকে মুক্তি দেবে।

অসুখের সময় কদিন আমাকে বাধ্য হয়ে বাংলা পড়া ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে হল। এখন আবার পড়া শুরু করেছি এমন-কি উইলির [১] সাহায্যে দু' তিনটে কবিতা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। মনে করবেন না, আমি পিছিয়ে পড়ব। ভারতবর্ষে পৌছবার আগে পর্যন্ত এ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাব আর ফিরে গিয়ে আপনাকে অবাক করে দেব। এর মধ্যে আপনি কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলবেন না।

দুই

প্রিটোরিয়া, ১৪ই জানুয়ারি, ১৯১৪

অনেকদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয় নি অবশ্য, কিন্তু এত ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও আপনার কথা আমি ভুলিনি। আপনার প্রশান্ত প্রকৃতির স্পর্শ আমাকে কত যে শক্তি দেয় কী বলব! সেটিই এখন আমার

১। উইলিয়ম পিয়ার্সন

পক্ষে সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। তাছাড়া এখানে আসার সময় আমাকে সতর্ক করে দিয়ে আপনি বলেছিলেন সব কাজের মধ্যে মন শান্ত রাখতে হবে—সে-কথাও আমি ভুলিনি। দেখছি খুব ভোরে আর সন্ধ্যার দিকেই কেবল শান্ত হয়ে বসবার পূর্ণ অবসর আমি পাই। সাড়ে চারটেয় এখানে সূর্য ওঠে, আমি অনায়াসে তার একঘণ্টা আগে জেগে যাই। এখানকার লোকেরা ছ-টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। তাই সকালবেলাটা চতুর্দিক খুব নিরালা থাকে। সন্ধ্যায় সময় পাওয়া একটু মুশকিল, তাই সে সময়টা খুব নিয়মিত বসতে পারি নি। কিন্তু একটু চেষ্টা করে আমাকে সেদিকে সময় করে নিতে হবে, কারণ তার প্রয়োজন আমি অন্তরে অনুভব করছি।

গত চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছিলাম, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু হলে সম্ভবত আমাকে কারাবরণ করতে হবে। কিন্তু মিঃ গান্ধী একেবারেই তার বিরুদ্ধে। অবশ্য যে-সব বিশেষ কারণে আমার জেলে যাওয়ায় তাঁর এতটা অমত, তা আমি বুঝতে পারছি। যাই হোক, মায়ের অসুখের সময় তাঁর কাছে যে-প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তা আমি ভাঙতে পারি না। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে তাঁর কাছে যাতে যেতে পারি—সেভাবে আগেই টিকিট করে ফেলব। সব ভালমত চলছে দেখলে ঠিক দু'মাস পরে ২১শে এপ্রিল আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসব। ছেলেদের ছুটিতে বাড়ি যাবার আগে আশ্রমে পৌঁছে আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ করা আর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ। আশা করছি, তার আগে স্কুলের ছুটি শুরু হবে না। আপনি যদি স্কুলের কাজের বিশেষ ব্যাঘাত না করে সে রকম একটা ব্যবস্থা করেন তো বড়ো ভাল হয়। আমার ধারণা এর কাছাকাছি সময়েই ছুটি আরম্ভ হয়। তিনটি কি চারটি দিন সময় পেলে, আমি সেভাবে ফেরার দিন স্থির করব। ভাবছি P & O-তে এলে ১৭ই এপ্রিল বম্বে পৌঁছব, ১৯শে আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারব।

আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে ২৬শে যদি পৌঁছই, তবে কি খুব বেশি দেরি হবে? এত আগে সব প্ল্যান করা দেখে আপনার কৌতুক বোধ হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ফেরার জন্য আমার মন যে কত কাতর তা যদি জানতেন তবে বুঝতে পারতেন। এখানকার প্রতিটি দিন আমার সেই আর্তিকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। মনে পড়ে, ইংলণ্ড থেকে আপনি আমাকে লিখেছিলেন, আপনি যেন একটি অবরুদ্ধ দুর্গে বাস করছেন, আর

আমার চিঠিগুলো অন্নপানের মতো আপনার কাছে গিয়ে পড়ছে। এখানকার এই ষড়যন্ত্র এবং বিদ্বেষের জগতে ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই আমারও হচ্ছে। তাই আশ্রমের শান্ত পরিবেশের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকে যদি আমার জীবনের স্বপ্ন বলে, প্রাণের আশ্রয়স্থল বলে মনে করি, আপনি কি তাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবেন? সেই ছবি দিনের পর দিন আমার মনের চোখে ভাসে, আমার চিত্তে সান্ত্বনা এনে দেয়।

বেশির ভাগ সময় এখন মিঃ গান্ধীর সঙ্গেই থাকি। তাঁকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতেও পেরেছি। ভারতবর্ষে আমরা তাঁকে যা বলে ভেবেছি, তিনি ঠিক তাই, বরং তার চেয়েও বেশি। বীর সন্ন্যাসী তিনি, চিন্তা নয় কর্মেরই সাধক তিনি। তাঁর অন্তরপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অথচ পশ্চিমের কর্মযোগে তাঁর দীক্ষা। প্রতিদিন তাঁর সুমহান বীরত্ব, চিত্তের মৌলিকতা ও স্বভাবের কোমলতা আমার কাছে কত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ ইংলণ্ডে আপনাকে দেখা মাত্র যেভাবে সহজ প্রবৃত্তিবশে তৎক্ষণাৎ ভালোবেসে ফেলেছিলাম—অতি স্বচ্ছ এঁর চরিত্র—তবু আমার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি এখনও তাঁকে ঠিক সেই ভাবে ভালোবাসতে পারি নি। অবশ্য ভালোবাসার সেরূপ তীব্রতা আমি অন্য কোথাও বোধ করব এমন আশা করিনে। তবু ভারতবর্ষের প্রতি আমার অন্তরে যে প্রবল ভালোবাসা, তারই জোরে আমার আশা আছে, আমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার আদান-প্রদান সহজ ও অসংকোচ হবে।

আপনারা বাংলাদেশের লোকেরা আমাকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন। আপনারা আমাকে এত সহজে খোলাখুলিভাবে গ্রহণ করেছেন যে, আমার নিজের প্রকৃতিও তাতে অনায়াসে সাড়া দিয়েছে। এখানকার গুজরাটি ভারতীয়দের কাছ থেকে সহৃদয়তা এবং সৌজন্য প্রচুর লাভ করেছি—কিন্তু অনাবিল ভালোবাসা সময় মতো পাব বলে তবেই আশা করতে পারি, যদি আমি নিজেকেও সেভাবে দিতে পারি আর ধৈর্যভরে প্রতীক্ষা করে থাকি।

সূর্যাস্তের সময় আপনার সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে, নয়তো চাঁদের আলোয় কাছে বসে চুপ করে থেকে আপনার শান্তির অংশটুকু কেবল উপভোগ করতে আমার মনে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হয়। তখন আমার অন্তরের প্রেম শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

আপনার সংস্পর্শে এসে আমার নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি এক নূতন দৃষ্টি লাভ করেছি। আমেরিকা থেকে আপনি আমাকে লিখেছিলেন,

জাতিভেদ ও বর্ণভেদের অসাম্যই হল আমাদের যুগের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। তখন এই সমস্যার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের সম্বন্ধটি আমি অনুধাবন করে দেখলাম, আপনি অন্তরের দিক থেকে বাইরের দিকে এগিয়েছেন। আমি এতকাল ধরে এর বিপরীতটিই করেছি। সোজাসুজি এই প্রশ্ন নিয়ে যদিও আলোচনা করেন নি, তবু আপনার লেখা বইগুলিতে আপনার অন্তরের অকৃত্রিম মৈত্রী ভাবনা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য জনচিত্তে তার এমন প্রভাব পড়েছে যে দেখেছি তাতেই শত বাধা অপসারিত হয়ে গেছে। আমার দেখে অবাক লেগেছে যে, আপনার সম্বন্ধে যত সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছি—সবই প্রায় অস্ট্রেলিয়া আর ক্যানাডার এমন সব অঞ্চল থেকে যেখানে আপনার সশরীরে প্রবেশে বিরোধিতাই পেয়েছেন।

মনে পড়ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার সময় আপনি আমাকে বলেছিলেন —'যদি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম!' কিন্তু এসে দেখি আমি আসার বহু পূর্বেই আপনি এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। দেখে আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল। আপনাকে আগেই জানিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের টেবিলে প্রথম যে-বইখানা দেখলাম—তা হল 'গীতাঞ্জলি'। সে হল ডারবানে। এখানে প্রিটোরিয়ায়ও তাই দেখছি। এখানকার দুটি গির্জাতেই আমার উপর প্রার্থনান্তিক উপদেশ দেবার ভার ছিল। তখন আপনার কবিতা উদ্‌ধৃত করে দেখলাম আপনার লেখার সঙ্গে এঁরা পূর্ব থেকেই পরিচিত। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন—আপনার বইখানা পড়ে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা একেবারেই বদলে গেছে। এখন অবশ্য আমি বুঝতে পারছি, এটা সম্ভব হয়েছে কেবল আপনার প্রতিভার জোরে। কিন্তু তবু একটা কথা বলার আছে। সেই প্রতিভা তো আপনি অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। বিতর্কমূলক লেখায় বা সক্রিয় আক্রমণে তা প্রকাশ পেতে পারত। কিন্তু তা তো আপনি করেন নি। প্রেমের মধ্যেই আপনি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কত সংগ্রামের মধ্যেও আপনি চিত্তের শান্তি ও সমতা রক্ষা করেছেন।

অতীতে আমি তর্কবিতর্কের আস্ফালনে অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট করেছি। তাতে আমার জীবনে বিক্ষোভ এসেছে, আমি শান্তি হারিয়েছি। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হলে তবেই পুরোনো বিদ্বেষ সরে যাবে। সেই শ্রেয়োবুদ্ধির উন্মোচন

অবশ্যম্ভাবী। তবে কোনো জাতি বা দল বা মতবাদের সাহায্যে তা আসবে না। যে প্রাচীন রীতিগত খ্রীস্টধর্ম আমি আগে মেনে এসেছি, তাতেও আসবে না। ভগবৎপ্রেমে পূর্ণতর এবং গভীরতর কিছু, যা আমার আগেকার কর্মক্ষেত্রের চেয়ে ব্যাপক ও প্রশস্ত—তার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হবে।

আমরা সম্প্রতি সামরিক আইনের অধীনে আছি। বুয়র সেনানায়কগণ সব এখন শশব্যস্ত। এখানে শুধু অর্থ ও জাত্যাভিমান—এই দুটি দেবতার রাজত্ব চলেছে। তাই যে-ক্ষেত্রে এদের আরাধনা চলছে, সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে নিপীড়িত ভারতীয় সমাজের ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে দারিদ্র্য, একতা ও প্রেমের আবহাওয়ায় বসতে পেলে অনেক আরাম পাই।

তিন

ডারবান, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯১৪

জীবনে হঠাৎ দুঃখ আসুক কী আনন্দ আসুক আমি সর্বপ্রথমেই আজকাল আপনার কাছে ছুটে যাই। এই সময় আকস্মিকভাবে আমার জীবনে যে-দুঃখ এল, তা আনন্দেরই রূপান্তর। এতক্ষণে আপনি আমার তার পেয়ে জেনেছেন যে, আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী মহাশান্তিতে পূর্ণতর জীবনে প্রবেশলাভ করেছেন। ইংলণ্ডে ফিরে গেলে তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানি আর আমাকে আদরে কাছে টানবে না। তাঁকে একবার দেখতে যাব বলে যে কথা দিয়ে এসেছিলাম তাও আর রাখা হল না।

আগে যে-কথাটি আপনাকে জানাই নি, তা এখন জানাব। গত বছর গ্রীষ্মকালে মাকে প্রায় কথা দিয়েছিলাম যে অল্পদিনের জন্য হলেও একবার তাঁর কাছে ফিরে যাব। যাবার সুযোগও এসেছিল। কিন্তু যখন তাঁকে জানালাম যে বোলপুরে আমাকে আপনার প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে তিনি সম্মতি দিলেন। দুজনের একজনও তখন ভাবিনি যে আর আমাদের দেখা হবে না। কিন্তু তা যদি মা জানতেনও তবু তিনি বাধা দিতেন না, বরং আমাকে বোলপুর যেতেই বলতেন। কারণ অত্যন্ত নিঃস্বার্থ ছিল তাঁর মন। গত গ্রীষ্মে আশ্রম থেকে নিয়মিত তাঁকে চিঠি দিয়েছি। তাতে সে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছিল। আগস্ট মাসে আবার যখন আমার দেশে যাবার কথা উঠল, তখন মা লিখলেন, আপনার কাজে যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি তবে যেন আমি সেখানে থেকেই যাই। কারণ আপনার কাজের প্রতি তখন মা আর আমি দুজনে সমান অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আপনি তো জানেন তার পরে আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম। নভেম্বরের গোড়াব দিকে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম—মার্চমাসের কোন দিন গিয়ে তাঁর কাছে পৌছব। এ চিঠি পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা ছিল না। বাবার চিঠিতে জেনেছি, সে আনন্দের সংবাদ দুর্বল শরীরে তাঁকে বড়ো বিচলিত করে তুলেছিল।

মা আমার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন বলে আমি নাটালের কাজ বন্ধ করে ইংলণ্ডে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। এখন আর তার প্রয়োজন রইল না। কিন্তু আমি জানি যে তিনি এই ভেবে শান্তিতে গেছেন যে, ভারতীয়রা বিশ্বাস করে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন আর ঠিক সেই সময়ে আমি ভারতবর্ষেব কাজই করছিলাম।

শেষের দিকের চিঠিগুলোতে আমি আশ্রমের কথা তাঁদের কাছে লিখতাম। মা আর বাবাও তার উত্তর দিতেন। আপনার কবিতা মাকে পড়ে শোনানো হলে তিনি রোগে সান্ত্বনা পেতেন। গীতাঞ্জলির 'শিশু' কবিতা-দুটি তাঁকে ভারি আনন্দ দিয়েছিল। তাই আমি ভেবেছিলাম, তাঁকে একখণ্ড Crescent Moon পাঠাবার কথা আপনাকে জানাব। সেও তো আর হল না।

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমি নিজে যা লিখেছি সব মাকে পাঠাতাম। তালগাছের উপর যে-কবিতাগুলো লিখেছি, সেগুলো পড়তে তিনি কত যে ভালোবাসতেন—সে কথা ভাবতেই আমার মন খুশিতে ভরে যায়। কবিতাগুলোর শেষ দিকটাই তাঁর সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছিল। তিনি বলতেন, সে কবিতাগুলোর মধ্যে আশ্রমের শান্ত পরিবেশ তিনি অনুভব করতে পারছেন। তাঁর মনে হত, আমার সঙ্গে তিনিও সেখানে রয়েছেন। মাকে জানিয়েছিলাম—এবার আশ্রমে ফিরে গিয়ে সেখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না। আমার ধারণা, তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে আমার মন সর্বদা সেখানেই পড়ে থাকে।

আমাদের একটা বড়ো দুঃখের কারণ হল, আপনি যখন ইংলণ্ডে, মা তখন এত দুর্বল যে ডাক্তার তাঁকে আপনার কাছে গিয়ে দেখা করার অনুমতি দেন নি। তখনও আপনি যে আমার কতখানি প্রিয় তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বাড়িতে নিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করার তাঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল।

আশ্রমের সঙ্গে আমার মায়ের স্মৃতি যে যে সূত্রে জড়িত সে সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আপনাকে জানাচ্ছি—কারণ এই দুঃখের মধ্যে কিভাবে আমি সান্ত্বনা

পাচ্ছি, তা আপনি বুঝবেন। আমার বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে যে একটি ঐক্য এবং সংগতি রয়েছে তা এর আগে আমার কাছে এতখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অনেক সময় আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, ভারতের প্রতি এই গভীর প্রেম আমার মনে কোথা থেকে এল? আপনাকে আগেই বলেছি, উইলির মধ্যে তা যত সহজে এসেছে, আমার মধ্যে তেমন নয়। আমার মনে ছিল গর্ব ও সংস্কারের প্রবল বাধা। সেই বাঁধ প্রথম ভাঙল সুশীলের[১] বন্ধুত্বের সংস্পর্শে। কিন্তু তখনও তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে নি। আজ এই শান্ত মধুর ক্ষণে আমার আরাধ্যতমা মায়ের সুন্দর জীবনটির স্মৃতি সম্মুখে রেখে বুঝতে পারছি ভারতের প্রতি আমার প্রেমের মূলে রয়েছে তাঁর ভক্তিপ্লুত চিত্তের গভীর অনুরাগ।

ভারতীয় নারীর মাতৃত্বের কথা যত পড়েছি, যত শুনেছি ও যত দেখেছি, ততই নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়েছে। কারণ তাঁকে তো আমি ভালোভাবেই জানতাম। এইদিকে সাধারণ ইংরেজ মায়ের চেয়ে তাঁর বিশেষত্ব ছিল। তাঁর মনে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্জনের ভাব ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন তাদের মধ্যেই নিবিষ্ট ছিল এবং প্রতিদিনের সেবায় প্রেমে তা এমন নিঃস্বার্থরূপে প্রকাশ পেত যা সত্যিই বিস্ময়কর। উপাসনায় যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও বাড়ি ছেড়ে যান নি। খ্রীস্ট-জন্মোৎসবের প্রার্থনায় যোগ দেবার ইচ্ছায় এবার যে বাড়ি থেকে বেরোলেন—তাঁর শেষ অসুখের কারণই হল তাই। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এই মজার অথচ স্নেহকরুণ গল্পটি চলে: মায়ের বোন থাকতেন আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। একবারই মাত্র বাবা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে দেখতে যেতে মাকে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির জন্য আর ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর এত মন খারাপ হতে লাগল যে মা কিছুতেই তিন চারদিনের বেশি সেখানে টিঁকতে পারলেন না।

আমার মায়ের স্নেহের কথা আমার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে আঁকা রয়েছে, কারণ সন্তানদের মধ্যে আমি তাঁর সবচেয়ে আদরেব ছিলাম। শিশুকাল থেকে আমি অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল ছিলাম, মাঝে মাঝে মরণাপন্ন হয়ে পড়তাম। তাতেই আমার প্রতি তাঁর মন সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহে আকৃষ্ট ছিল। তাছাড়া সব সময় আমি নানারকম গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তাম, তখন সবাই আমাকে ভুল বুঝত। কেবল আমার মা আমাকে ঠিক বুঝতে

১. সুশীলকুমার রুদ্র

পারতেন আর বোধহয় খানিকটা প্রশ্রয়ও দিতেন। তাতেই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছিল। নিজ জীবনের সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতির মধ্যে একটি হল—ছোট ফ্রক পরে একটি ছেলে (চার বছর বয়সের আমি) মায়ের শোবার ঘরের বাইরে সিঁড়ির এক ধাপ উপরে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে, কারণ মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তখন ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন। আজও আমি সেই দিনটির ব্যাকুল বেদনার স্মৃতি মনে আনতে পারি।

আমি আপনাকে যা বলতে চেয়েছি তা হল এই—আমার মন থেকে গর্বের বাধা সরে যাবার পর আমি ভারতীয় চিত্তের অনুরাগের প্রতি অনায়াসেই সচেতন হলাম কেবল এই কারণে যে তা ঠিক আমার প্রাণের স্নেহেরই অনুরূপ। এ কথা অবশ্য ঠিক যে পৃথিবীর সর্বত্রই মায়েরা সন্তানদের স্নেহ করেন এবং গৃহের প্রতি তাঁদের টানও স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মায়ের ক্ষেত্রে এর একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আর একটি নিজস্ব দীপ্তি ছিল। সেই দীপ্তি, সেই শ্রী আমি বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে ক্রমশ খুঁজে পেয়েছি। আমার মায়ের মৃত্যুতে এখন ভারতবর্ষই আমার নিজের বাসভূমি হয়ে উঠবে, ভারতের ঘরে ঘরেই এখন আমি তাঁকে পাব।

আমার মনের এই গভীর শান্তির মধ্যে আমি উপলব্ধি করছি, এবার যখন ভারতে ফিরে আসব তখন ভারতবাসীর দৃষ্টিতে আমার মায়ের চোখের দৃষ্টি আর ভারতের মাতৃমুখে আমার মায়ের মুখখানি দেখতে পাব। এখানে ডারবানে প্রথম আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলেন ভারতীয় মায়েরা। তাঁদের সস্নেহ দৃষ্টি আর অস্ফুট সান্ত্বনাবাক্য অতি সুন্দর সহানুভূতিতে গভীর। তাঁদের নম্রমধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলাম। তাতে আমার মন আশ্বাসে শক্তিতে ভরে উঠল।

শিশুকাল থেকে মায়ের প্রভাবে বেড়ে উঠেছি বলে আমার মনেও মাতৃভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। মায়ের স্নেহ যেভাবে আমার উপর বর্ষিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে যখন আমি আমার ভালোবাসাও অন্যদের দেবার সুযোগ পাই, তখনই কেবল আমার মন একটি সুন্দর ফুলের মত ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, লোকে হয়ত আমাকে ভুল বুঝবে। ভয় হয়, যাদের ভালোবাসি তাদের হয়ত আমি বিব্রতই করি। কিন্তু ভারতে এসে সে ভয় আমার কমে গেছে। এখানে ভালোবাসা দিয়ে তার প্রতিদানে আমি এত পেয়েছি যে সে কথা মনে করলে আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

শান্তিনিকেতন আশ্রমও এখন আমার কাছে স্মৃতিতীর্থ হয়ে উঠেছে। গত বছরের গরমের সময় মা আর আমি মিলে যখন ঠিক করলাম যে আমাদের মধ্যে শিগগির দেখাসাক্ষাৎ হবে না, তখন থেকে আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ শুরু হয়। আশ্রম থেকে তাঁকে আমি খুব বড়ো বড়ো চিঠি দিতাম। এতে আমরা দুজনে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে উঠলাম। মা আশ্রমের আদর্শ ঠিক বুঝতে পারতেন আর সেখানকার শান্তিও তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। আপনার স্নেহ ও আরো নানা সুখের স্মৃতি নিয়ে এবার যখন আশ্রমে ফিরব, তখন সেখানে আমি আমার মাকেও দেখতে পাব। তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন, তাঁর মুখের হাসি দেখে আমি তৃপ্ত হব। এখন থেকে আশ্রমই আমার নিজের গৃহ হবে এবং আমার মাকে আমি সেখানেই খুঁজে পাব।

চার

বোলপুর, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

আরাধ্যতম গুরুদেব,

আমাদের পাশ্চাত্ত্য হিসেবে আজ আমার বয়স পঞ্চাশ বছর হল, আর আরো সঠিক প্রাচ্যগণনাতে হল একান্ন। আজ সারা সকাল আপনার কথা এত মনে হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর এই-যে কটা বছর কেটে গেল, এর মধ্যে আমার জীবনটা এতই বদলে গেছে যে তাকে আর চেনাই যায় না। সেজন্য আপনার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী ও অশেষরূপে কৃতজ্ঞ। বছরগুলো কেমন যেন উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে বটে, কিন্তু সে বাইরের, তাতে বরং আমি আপনার আরো ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি। সর্বদা কাছাকাছি থাকলে ততটা হওয়া সম্ভব হত না। এই সময়টুকুর মধ্যে অনেক ঘটনা, অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু জীবনের কেন্দ্রে সর্বক্ষণ অন্তরের গভীর শান্তি বিরাজ করেছে। তাই আপনাকে প্রথম দেখার সময় আমার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংশয়ের ও প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা এখন স্তব্ধ হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেণ্টে যে একটি মুক্তির গান (Psalm of Deliverance) আছে, তাতে একটি কথার ধুয়ো বারে বারে গাওয়া হয়—'প্রভুর দয়ার জন্য মানুষ যেন চিরকাল তাঁর মহিমা কীর্তন করে।' সেই গানখানি আজ সকাল বেলাটিতে আমার মনে অনবরত বাজছে। তার মধ্যে এক জায়গায় আছে—

তাঁর আদেশে ঝড়ের হাওয়া বয়ে যায়,
শক্তির দম্ভে যারা উর্ধ্ব আকাশে উড়ে যায়, সমুদ্রের
গভীর তলে প্রবেশ করে,
বিপর্যয়ে তাদের চিত্ত দ্রব হয়।
তখন তারা কাতর হয়ে প্রভুর শরণ নেয়, প্রভু তাদের
দুঃখ থেকে মুক্ত করেন।
তিনি ঝড়কে শান্ত করেন।
তারাও তখন বিরাম লাভ করে আনন্দ পায়,
এমনি করে তিনি তাদের নিজ আশ্রয়স্থলে ফিরিয়ে আনেন।
তাই, মানুষ যেন চিরকাল করুণাঘন প্রভুর যশোগান করে।

শান্তিনিকেতনে আমি আমার আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছি, আর পেয়েছি ঝড়ের পরের শান্তি। তাই আজ সকালে আমার প্রভুর দয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আপনার কথাও আমার মনে পড়ছিল। আপনিই আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, গত কয়েক বছর ধরে কত আশ্চর্য আশীর্বাদই না আমাকে করেছেন! তাছাড়া যে-ভারতবর্ষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, পাশ্চাত্ত্যের মতো উপকরণবাহুল্যের ঔদ্ধত্যে এখনও কলুষিত হয় নি, সেই ভারতের মতো দেশে এই যে আমার নূতন জন্ম, সেও কি কম সৌভাগ্যের কথা? সে কথা আজ আমি আবার একান্তভাবে অনুভব করলাম। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমেব আরাধনায় মাথা নত করে আজ সারা সকাল এসব কথাই ভেবেছি।

আর এই শিশুরা যারা সারা সকাল আমার ঘরে থাকে, আমার বারান্দায় খেলা করে, তাদের বন্ধুত্বও আমাকে ভুলিয়ে রাখে যে বছরে বছরে আমার বয়স বাড়ছে। তাছাড়া ফাল্গুনী নাটকের বসন্তের 'ফিরে ফিরে নতুন হওয়া'র মতো আমাদের এই আশ্রমটিও কখনও জীর্ণ হয় না, কোনো দিন ম্লান হয় না। এমন-কি আমার ঘরের বাইরেকার বেণুকুঞ্জের বাঁশগাছগুলি পর্যন্ত নূতন সাজে সেজেছে। এদিকে শালগাছগুলিও তাড়াতাড়ি খসিয়ে ফেলছে তাদের লাল সোনালি পাতার চকমকে আভরণ—নবীন কিশলয় যে ফুটে বেরোল বলে। আবার এই একই সপ্তাহে জাদুকর, সাপুড়ে আর সার্কাসের দল—ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে কেউ লাফাচ্ছে, কেউ নাচছে, কেউ গাইছে—সারা রাস্তা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি করে আশ্রমে ফিরে এসেই এক ছুটে আমার ঘরে গিয়ে আমাকে বলছে, সাদা ঘোড়াটা কেমন করে আগুনের গোলার ভিতর দিয়ে ছুটছে আর লাফাচ্ছে, তবু তারই পিঠের উপর ঘোড়সওয়ার সোজা দাঁড়িয়ে রইল! তার পরে আবার ঘোড়াটা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুখানি দিয়ে কিভাবে সার্কাস ম্যানেজারের গলা জড়িয়ে ধরল—এরকম আরো হাজারো ঘটনা। একান্ন বছরের জন্মদিনে যার জীবনে এতগুলো ঘটনা ঘটে তার দেহ থেকে শীতবুড়োর সাদা আলখাল্লাটার মতোই জরা কখন আপনি খসে পড়ে যায় আর দেখা যায় ঋতুরাজ বসন্তেরই মতো, চিরনবীনের দূত সে।

অনুবাদ: মলিনা রায়

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ও তলস্তয়

আঠারো শ' আটাশ খৃষ্টাব্দের বিশে অগস্ট কলকাতা শহরে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন—আর আঠারো শ' আটাশ খৃষ্টাব্দের আটাশে অগস্ট রাশিয়ার য়াস্‌না-পোলিয়ানাতে জন্মগ্রহণ করেন তলস্তয়। ··কোথায় কলকাতা তার মধ্যযুগীয়তার খোলস ছেড়ে—আধুনিকতার নূতন প্রতীকসমূহের দিকে আগ্রহ-দৃষ্টি নিবদ্ধ—আর কোথায় রাশিয়ার এক পল্লীগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের ঘরে এক শিশুর জন্ম! এই দুই-এর মধ্যে কী সম্বন্ধ থাকতে পারে? রামমোহন যখন ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে মারা গেলেন (১৮৩৩ সেপ্টেম্বর ২৭), তখন তলস্তয় পাঁচ বৎসরের শিশু। সুতরাং স্থান ও কালের এত ব্যবধানে এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে তুলনা হতে পারে কি করে—এ প্রশ্ন স্বতঃই পাঠকদের মনে উদিত হতে পারে।

দেশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমস্যা নিয়ে এই দুই মহাপুরুষ যথেষ্ট ভেবেছিলেন—সেই দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশ—তথা ভারতের প্রথম বিপ্লবী সংস্কারক রামমোহন;—রাশিয়ার ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মধ্যযুগীয়তার প্রতিবাদের প্রতীক তলস্তয়—তাঁকে রাশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের পথিক বলা যেতে পারে। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতের ও মনের মিলের একটামাত্র উদাহরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেটি ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্নে।

তলস্তয় সম্বন্ধে রামমোহনের মিলের কথা কেন মনে উদিত হলো, তা বলতে গেলে সামান্য ব্যক্তিগত কথা এসে পড়বে—তার জন্য প্রথমেই পাঠকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

১৯৬২ সালের শরৎকালে সোভিয়েত সফরে যাই; সে ভ্রমণকাহিনী বিস্তারিয়া বলা অপ্রাসঙ্গিক। একদিন মস্কো থেকে তলস্তয়ের জন্মস্থান য়াস্‌না-পোলিয়ানাতে গিয়েছিলাম। সেখানে বার্চ বনের মধ্যে তলস্তয়ের নশ্বর দেহের সমাধিস্থলটি দেখলাম। ঘন বনের পথের ধারে ছোট কবর মাটি দিয়ে

ঢাকা—তার উপরে ঘাসের চাপড়া—চারদিকে বনফুল। কবর দেখেছি—তাজমহল, ইতমদ্দৌলা এবং আরও কত; শ্মশান দেখেছি রাজঘাটে! সর্বত্র রাজ-রা রাষ্ট্র-ঐশ্বর্যের বুদ্‌বুদ গড়া সমারোহ—সে-দৃশ্য মানুষকে অভিভূত করে, কিন্তু তার মনের গহনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেয় না। তলস্তয় জানতেন তিনি ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লবী মত পোষণ ও প্রচার করেছেন; তার জন্য খৃষ্টান-পাদরী ও রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিভাবকরা তাঁকে মৃত্যুর পরও ক্ষমা করবে না, তাই তিনি নিজের নশ্বর দেহের সদ্‌গতির জন্য এই বার্চ-বন বেছে রেখে গিয়েছিলেন।

রামমোহন ও তলস্তয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তবে প্রশ্ন—ঈশ্বরের সংজ্ঞা কি? ঈশ্বরের সংজ্ঞা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতিরও বিবর্তন হয়ে চলেছে। আদিম মানবের ঈশ্বর-বোধ ও আধুনিক মানুষের অজ্ঞাত-শক্তি-উৎস সম্বন্ধে চেতনার মধ্যে গুণগত ভেদ আছে।

ঈশ্বরকে নিয়েই ধর্ম বা রিলিজনের সৃষ্টি। তবে ঈশ্বরহীন ধর্মও পৃথিবীতে হয়েছে—আদিকালে বৌদ্ধ ধর্ম, আধুনিক যুগে কমিউনিজম্। বুদ্ধের অন্তিমকালে তাঁকে নাকি প্রশ্ন করা হয়, তাঁর সদ্-ধর্ম কে রক্ষা করবে। তিনি বলেছিলেন 'সংঘ'। কিন্তু কালে দেখা গেল বুদ্ধের পূজা শুরু হলো, পৃথিবীতে বুদ্ধের যত কোটি মূর্তি পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই হয়ে পূজা পেয়েছে, কোনো এক দেবতার ভাগ্যে সেটি ঘটে নি!

সকল ধর্মই ঈশ্বরকে গড়েছেন ধর্মগ্রন্থ বা 'শাস্ত্র' মারফত। ধর্মের উৎস 'ধর্ম'ই হবে এটাই স্বাভাবিক যুক্তি। কিন্তু মানুষ ধর্মের গায়ে 'বিশেষণে'র প্রলেপ দিয়ে গড়ে তুললো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টানী, ইসলাম নামে ধর্ম। ধর্ম বলতে একটাই শব্দ, একটাই তার অর্থ—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন The Religion of Man, মানুষের ধর্ম; রামমোহন সৃষ্টি করেছিলেন The Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বধর্ম, যে ধর্ম সর্বমানবের জন্য। 'বিশেষণ' যুক্ত ধর্মগুলির জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হলো একের পর এক—স্তূপীকৃত হলো জঞ্জাল—উদ্যান পরিণত হলো জঙ্গলে। সাধকের অনুভূতি ও বাণী পণ্ডিতের, পুরোহিতের ও পাদরীর বাক্যজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ধর্মের উৎস কোথায় তার সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন বিশ্বপথিক রামমোহন ও তলস্তয়। একজন সদ্ হিন্দুরূপে, একজন সদ্ খৃষ্টানরূপে।

এই দুই মহাপুরুষের 'বিশেষণ'যুক্ত ধর্মকে বিশ্বধর্ম করার প্রয়াস ব্যাহত করেন ঐ সমাজের স্তম্ভ বা ধর্মধ্বজীরা। কারণ দুর্বোধ ভাষার মধ্যে ধর্মগ্রন্থকে আগলে রাখতে পারলে, ধর্মরক্ষীদের ব্যবসায় কায়েম হয়ে থাকবে; ধর্মের ব্যবসায়ের মতো এমন লাভজনক ব্যবসা দুনিয়ায় আর নেই।

রামমোহন হিন্দুদের 'প্রস্থানত্রয়'কে আধ্যাত্মিক ধর্মের চরম উৎস বলে বিবেচনা করে জনতার ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় তার ভাষ্য বিবরণ প্রকাশ করে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, 'ধর্ম' বিশেষণহীন শব্দ। তাই হিন্দুর পক্ষে যেমন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অবশ্য বরণীয়, তেমনই যীশুর ভবিবাদ ও নীতিধর্মও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়; যুগপৎ ইসলামের কঠোর যুক্তি-আশ্রয়ী সমাজ ও ধর্মের আদেশ বিচারণীয়। রামমোহনের তুহাফত-উল্-মুহাদ্দীন গ্রন্থে যে যুক্তি-আশ্রয়ী ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার বুনিয়াদ ছিল ইসলামের ধর্ম ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যুক্তিবাদ রামমোহনকে চালিত করেছিল জীবন ভর। তলস্তয় সাহিত্যিক ছিলেন, emotional যথেষ্ঠ ছিলেন জীবনে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতিকে কঠোর যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতেন।

রামমোহন বাংলায় ব্রহ্মসূত্র ও পাঁচখানি উপনিষদ অনুবাদ করেন শঙ্করাচার্যর পথ ধরে। কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে *Precepts of Jesus* নামে গ্রন্থ সংকলন। ইংরেজি বাইবেল থেকে এই সংগ্রহ গ্রন্থ প্রস্তুত করে ভেবেছিলেন সংস্কৃত ও বাংলায় এর অনুবাদ প্রকাশ করে বিতরণ করবেন। নানা কারণে তাঁর সে-ইচ্ছা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। রামমোহন বাইবেল খুব ভালো করেই পড়েছিলেন—তার প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টান সাধারণের নিকট তাঁর নিবেদন (Appeal) নামে যে তিনটি পুস্তিকা লিখেছিলেন তার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। কিন্তু Precepts সংগ্রহ করলেন মাত্র চারিটি গস্‌পেল বা সুসমাচার গ্রন্থ থেকে—যেমন হিন্দু শাস্ত্রের সার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকায়—যার সংস্কৃত উধৃতির ভূমিকার নাম দিয়েছিলেন The Universal Religion. Religious instructions founded on sacred authorities. বারোটি প্রশ্ন-উত্তরে সর্বধর্মের সারকথা লিখিত হয়—যার মূল শাস্ত্রগ্রন্থের উধৃতি। ঠিক তেমনি ভাবেই তিনি চারখানি গস্‌পেল থেকে যীশুর উপদেশ সংগ্রহ করেছিলেন—বিরাট বাইবেল ও বিশাল খৃষ্টানী সাহিত্যকে একেবারেই বাদ দিলেন। বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন অংশ বহু গ্রন্থের সমষ্টি—যেমন হিন্দুদের

প্রস্থানত্রয়—ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র, দশ-উপনিষদ এবং গীতা কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। কোরানই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা একই ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও একই মহাপুরুষের বাণীপূর্ণ। কোরানই একমাত্র complete ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু সেই গ্রন্থ কেবল মুসলমানদেরই বিশেষ ধর্মগ্রন্থ হয়ে আছে; রামমোহনের ইচ্ছা সর্বধর্মের নামের সঙ্গে যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এই 'বিশেষণ'গুলি যুক্ত আছে—সেইগুলিকে বাদ দিলেই 'বিশুদ্ধ ধর্ম' আপনি উদ্‌ঘাটিত হবে। রামমোহন বাইবেল থেকে Precepts সংগ্রহ করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বমানবের পক্ষে যাহা গ্রহণীয়, সেই উপদেশ ও নীতিকথাই বিশ্বধর্মের বুনিয়াদ গড়বে—তুহাফত-উল-মুহাদ্দীন, বেদান্ত ও যীশুর উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখন প্রশ্ন—রামমোহন চারখানি গস্‌পেল মাত্রকে কেন গ্রহণ করলেন। বাইবেলের এক অংশ হীব্রু ভাষায়, অপর অংশ গ্রীক ভাষায়—এ যেন সংস্কৃতে ভাগবত পুরাণ ও বাংলায় চৈতন্ত চরিতামৃত। ওল্ড টেস্টামেণ্ট আমাদের দেশের পুরাণ জাতীয় গ্রন্থ—বহুযুগের বহু স্তরের ইতিহাস, কিংবদন্তী, প্রবাদবচন, উপাখ্যান, প্রেমকাহিনী—এক কথায় ইহুদীজাতির খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসরের সঞ্চিত কথার সংগ্রহ। নিউ টেস্টামেণ্টে ছাব্বিশটি বই একত্র গাঁথা। এই গ্রন্থ সংগ্রহ থেকে রামমোহন মাত্র চারখানি গস্‌পেল বেছে নিয়েছিলেন—অ্যাক্টস্, সাধু পলের পত্রাবলী প্রভৃতি কোনোটিই ব্যবহার করেন নি। ঠিক এইটিই করেছিলেন তলস্তয়, তিনিও খৃষ্টের বাণীর মূল উৎস বলে এই চারখানি গস্‌পেলকে স্বীকার করেছিলেন।

যাঁরা গস্‌পেলগুলির সহিত সামান্যও পরিচিত, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, ভারি গস্‌পেলের মধ্যে যথেষ্ট অমিল। যীশুর জীবনকথা বিষয়ে অনেক অসঙ্গতি, অনেক অপ্রাকৃত ঘটনারাজির সমাবেশ এই বই কয়খানির মধ্যে। এসব পড়েশুনে স্বতই সন্দেহ হয় লোকটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই। গত দুই শত বৎসর ধরে য়ুরোপে নানা দেশে যীশুর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে। গবেষক ঐতিহাসিকদের জাদুকরী লেখনীর স্পর্শে অসংখ্য যীশুব উদয় হয়েছে, আসল যীশুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই জটিল তর্কজালের মধ্যে প্রবেশ-প্রচেষ্টা এ প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত। শোয়াইট্‌জার (Schweetzer)-এর নাম ও রচনার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত; তিনি *In Search of Historic Jesus* নামে এক বই লেখেন। সাড়ে চারিশতাধিক

পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে শোয়াইট্‌জার যীশু সম্বন্ধে সকল পূর্বসূরির গবেষণা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এত প্রয়াসের পর তিনি বলছেন ঐতিহাসিক যীশুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কি যীশু myth, মায়া? তার উত্তরে বলেছেন—না, তিনি মানুষের চেতনার মধ্যে জীবিত। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় নারদ বাল্মীকিকে বলেছিলেন—'কবি, তুমি যা রচনা করবে, তাই সত্য হবে।' তাই আজ যীশুর অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে হাজার রকমের মতভেদ হলেও তিনি জীবিত আছেন as an idea।

Precepts of Jesus সংকলন করে রামমোহন বলেন যে, লোকবিশ্বাস এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা ম্যাথু, মার্ক, লিউক, জন্। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; তাই তিনি গ্রন্থকার স্থলে লিখলেন ascribed to the four evangelists। ১৮২০ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কলকাতায়; তারপর গত প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে কত গবেষণা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু গোঁড়া পাদরী ও অতি-ধার্মিক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের বিশ্বাস যে, গস্‌পেলের ও বাইবেলের সবটাই সত্য। কিন্তু তর্কের বা বিচারের সময় বিরুদ্ধ তথ্য বা তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে পারে না। এ কথা বাইবেল সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, অন্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তেমনি—তা না হলে এক সূত্রের এত ভাষ্য হবে কেন—সবাই নিজের অনুকূলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ভারতে রামমোহনের ন্যায় তলস্তয় রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবী যিনি tradition বা পারম্পর্যকে নিছক অতীত কালের সামগ্রী বলে মানতে রাজি হলেন না। তলস্তয় সমকালীন রাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষাবিধি, অর্থনীতি কিছুকেই চরম বলে মানতে পারেন নি—তাই জীবনের শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে সংগ্রাম করতে করতে বে-ঘরে মারা পড়েন। রামমোহন বিদেশে অনাত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

ধর্ম সম্বন্ধে তলস্তয় যে গ্রন্থ লেখেন, তা খুব সুপরিচিত নয়। তিনি বাইবেলের মধ্য থেকে রামমোহনের ন্যায় গস্‌পেল চতুষ্টয় অধ্যয়ন করে, তাঁর বিচার ও বুদ্ধিমতো অনুবাদ করেন। তলস্তয় ১৮৮০-৮২ অব্দে রুশী ভাষায় লেখেন *Four Gospels Harmonized and translated* তার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে।

ষাট বৎসর পরে এই বই আমাকে ভালো করে পড়তে হয়, রামমোহন চর্চা

করছি বলে ; দুইজনের মধ্যে গস্‌পেলের প্রতি মনোভাবের আশ্চর্য মিল পেলাম। তলস্তয় রুশী ভাষায় বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন ; এই দুইখণ্ড is an abstract from a large work which is lying in manuscript and cannot be printed in Russia. অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম ও তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামতগুলি রুশীয় জারের রাজত্বকালে সেদেশে মুদ্রণ করা সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বলি তলস্তয়ের *What is Art* গ্রন্থও রাশিয়ায় প্রথম মুদ্রিত হয় নি—কারণ আর্ট সম্বন্ধে প্রচলিত মত বা রাজ-রাজন্য, রাজশিল্পী, রাজনর্তকীদের মতের সঙ্গে তলস্তয়ের মত মেলেনি !

মস্কোতে যে তলস্তয় ম্যুজিয়াম আছে, তাতে বহু সহস্র পৃষ্ঠার খসড়া পুঁথি এখনো রয়েছে জানি না গস্‌পেল সম্বন্ধে সেই পুঁথি নিয়ে কেউ কাজ করছেন কিনা।

যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলে রামমোহন Precepts ছাপিয়েছিলেন ও বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই তলস্তয় চারি গস্‌পেলের উপর এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক ভাষায় লিখিত—মুষ্টিমেয় পাদরী সে ভাষা জানতেন, তাঁদের কাছে বাইবেল ধর্মপুস্তক—পবিত্র গ্রন্থ—revealed। তলস্তয় বললেন "the reader must not forget that the customary conception that all four Gospels with all their verses and letters, are sacred books, is on the one hand, a very gross error, and on the other a gross deception." এই deception বা ধর্ম বিষয়ে প্রতারণা কি ভাবে চলে আসছে তার আলোচনা করতে আমরা সাহস পাইনে। উপরন্তু 'সংস্কৃতি' বলে একটা ওমনিবাস শব্দ সৃষ্টি করে তার চুপড়ির মধ্যে সকল প্রকার আবর্জনা-স্তূপ বাজারে ফিরি করছি ও রেডিও মারফত বিলি করছি। Old order এবং status quo দুই-ই বজায় রাখবার জন্য 'সংস্কৃতি'র সদ্ব্যবহার করছি আমরা ! ধর্মগ্রন্থের সবটাই সত্য নয়—অনেকখানি deception। তলস্তয় রামমোহনের ন্যায় বিশ্বাস করতেন না যে গসপেল যে ভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তার সবটাই ম্যাথু-প্রমুখদের লেখনীপ্রসূত। আর তিনি বললেন "Certain books cannot become sacred from the first to the last line for the very reason that man say that they are sacred." লোকে বললেই কোনো গ্রন্থ 'শাস্ত্র' হয় না।' কিন্তু আমাদের দেশে দেবভাষায়

অনুষ্টুপ ত্রিষ্টুপ একটা ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক গেঁথে যে-কিছু মতকে 'শাস্ত্র' বলে চালানো যায়। তলস্তয় বললেন গস্‌পেলগুলি ম্যাথ্ প্রমুখদের রচনা এ কথা গাল-গল্প (is a fable)। বহুকাল ধরে the Gospels were selected complemented and expounded। রামমোহনের 'পারম্পর্য' সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করলে ভালো হতো, কিন্তু প্রবন্ধ বড় হয়ে যাবে। তলস্তয় একেশ্বরবাদী তাই বললেন গস্‌পেল "by no means productions of the Holy Ghost, who spoke to the evangelists." তলস্তয়ের মতে যীশুর ধর্ম অতি মহান, কিন্তু false interpretations বা মিথ্যা ব্যাখ্যা দোষের জন্ত দায়ী সাধু পল্। "who did not properly understand Christ's teaching." কী দুঃসাহসিক উক্তি! তিনি বললেন ওল্‌ড টেস্টামেন্টের পরিপূরকরূপে "New Testament was introduced into Christianity by Paul." এত বড সত্য কথা কোনো খৃষ্টভক্ত বলতে পারতেন না। রামমোহন বলেছিলেন গ্রীকো-রোমান বহুদেববাদীদের হাতে পড়ে যীশুর ধর্মের রূপান্তর হয়। তলস্তয় বললেন ধর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনতা প্রকট হয়েছিল সেদিন, যেদিন খৃষ্টানরা হীব্রুতে লিখিত ইহুদী পুরাণগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বা Holy Bible বলে স্বীকার করে নিলেন। ঐ সব ইহুদী পুরাণ, স্মৃতি মানতে গেলে খ্রীষ্টের ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হয় না। ওল্‌ড টেস্টামেন্টের সব কিছুকে 'ধর্মগ্রন্থ' বলে মানা অসম্ভব—যেমন বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ পুরাণের সব কিছুকে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বলে মানা কোনো আধুনিক বুদ্ধিমানের পক্ষে সম্ভব নয়। বাইবেলের একটা উদাহরণ দিই Solomon's Songs—সলোমনের গীত। ইহুদী শাস্ত্রীরা এই প্রেমের সুন্দর কাব্য (idyl)-খানিকে কত কসরত করে ধর্মশাস্ত্রভুক্ত করেছেন। তাদের দেখাদেখি খৃষ্টানরা তাকে ধর্মগ্রন্থে স্থান দিলেন!

তলস্তয় বললেন এই মিথ্যাবাদীরা যীশুকে দেবতা বানিয়েছে These false interpreters call Jesus a God। রামমোহন সেই অপরাধই করেছিলেন Precepts প্রকাশ করে—তিনি যীশুকে ভক্ত মহাপুরুষ বলে বর্ণনা করেন। শ্রীরামপুরের পাদরীদের অসহ্য সে উক্তি—ঈশ্বরের সন্তানকে মানুষ বলা। এমন উক্তি heathen এই করতে পারে। রামমোহনকে পাদরীরা হীদন্ বললেন। এর পর রামমোহন পাদরীদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তা এখনো পড়বার মতো। তিনি খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ নিয়ে সমালোচনা করলেন। তলস্তয় ত্রিত্ববাদের ঘোর প্রতিবাদী…"the

proclamation that…a given dogma is divine, of the Holy Spirit, is the highest degree of pride and stupidity,…nothing more stupid can be said than…the assertion of a man that God is speaking through his mouth." তোলস্তয় বললেন যীশুকে জানতে ও বুঝতে হলে তাঁর উপদেশাবলী অধ্যয়ন করতে হবে—We must study only Christ's teaching as it has reached us, that is, the words and actions, which are *ascribed* to Jesus and which have a dialectian significance." রামমোহন *Precepts of Jesus* এই উদ্দেশ্যেই সংকলন করেন। তিনি ঐ গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছিলেন, "I feel persuaded that by separating from the other matters contained in the New Testament, the moral precepts found in that book, these will be more likely to produce the desirable effect of improving the hearts and minds of men of different persuasions and degrees of understanding."

তলস্তয়ের উক্তি :

> I look on christianity not as an exclusive divine revelation nor as on a historical phenomenon, but as on a teaching which gives us the *meaning of life*.

তলস্তয় জানতেন তাঁর দেশবাসী খৃষ্ট সম্বন্ধে তাঁর মত গ্রহণ করবেন না। তিনি বললেন, লোকে যদি এই মিথ্যাকে ত্যাগ না করে, তবে তাদের সম্মুখে একটা পথ উন্মুক্ত আছে "persecute me, for which, I, finishing this writing, am prepared with joy and fear for my weakness. সত্যই তৎকালীন রাজ তথা চার্চশক্তি তাঁকে ক্ষমা করে নি ; তিনি সেটি জানতেন বলেই নিজের সমাধির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ; য়াস্‌না-পোলিয়ানাতে বার্চ বনের মধ্যে সেই নিরাভরণ পরম সাত্ত্বিক কবরটি দেখে মন শ্রদ্ধায় নত হয়েছিল।

মস্কোতে তলস্তয়ের ম্যুজিয়াম স্থাপিত হয়েছে : আর য়াসনা-পোলিয়ানায় ১৯১০ সালে যেভাবে বাড়িটি ছিল সেইভাবে প্রায় রাখা হয়েছে ; মস্কোতে যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়িটি দেখেছিলাম—সেটিকেও যেমনটি ছিল, তেমনটি করে রাখা আছে। রামমোহনের বাড়ি ? কী ভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে ?

রামমোহনের নামে লাইব্রেরীগৃহ যে-কোনো সভার জন্য 'ভাড়াটে বাড়ি'র মতো ব্যবহৃত হয়—রামমোহনের চর্চার কোনো পরিবেশ সেখানে রচিত হয় নি ; এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও রামমোহনের গবেষণার জন্য কোনো আয়োজন হয় নি। মস্কোর তলস্তয়ের আবাসগৃহ এখন গবর্নমেণ্ট সম্পত্তি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন ; তলস্তয় ম্যুজিয়াম তলস্তয় সম্বন্ধে গবেষণার কেন্দ্র। জানি না বাঙালির মনের মুক্তির জন্য রামমোহন সম্বন্ধে গবেষণাগার কখনো স্থাপিত হবে কি না। প্রসঙ্গত বলে রাখি গবেষণার বিচিত্র ক্ষেত্র আছে রামমোহনকে কেন্দ্র করে। তলস্তয় যেমন পাদরীদের দ্বারা persecuted হয়েছিলেন, রামমোহনের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল—তার বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এ-প্রবন্ধ নয় ; কেবল রামমোহনের ইংরেজ মহিলা জীবনীকারের থেকে কয়েক পংক্তি উধৃত করে; আমার প্রবন্ধ শেষ করছি : মিস্ কোলেট লিখছেন :

> 'It was the abolition of Suttee which let loose the floods of reactionary fury. Avarice and bigotry···had been hard hit, and they demanded a victim. Rammohan was marked as the guilty party. He was the traitor within the gates, who had sold the key to the infidel oppression. Therefore he must die."

অন্নদাশংকর রায়

স্বাধীনতা দিবসে

শান্তিনিকেতন,
১৫ই অগাস্ট ১৯৬৪

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ স্বাধীনতা দিবসে আপনার আরো একখানি পত্র পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।

সতেরো বছর আগে এই দিনটিতে আপনি পশ্চিমবঙ্গের ভার গ্রহণ করেন। আমিও সেদিন কলকাতায় আমার নূতন পদে যোগ দিই। আপনাদের সহকর্মীরূপে যে কয় মাস কলকাতায় ছিলুম সে কয় মাসের সরকারী কাজকে আমি দেশের কাজ বলেই মনে করেছি। একবারও মনে হয়নি যে আমি চাকুরে। আপনার অকালবিদায়ের পরে আমি মুর্শিদাবাদে বদলি হয়ে যাই। তখনো আমার মনে অনুরণন চলছিল যে আমি চাকরি করছিনে, দেশের কাজ করছি। কিন্তু আরো কয়েক মাস পরে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি সে জোয়ার চলে গেছে, সে উদ্দীপনা আর নেই। আমি পুনর্মূষিক। আমি সরকারী চাকুরে। আমি কারো সহকর্মী নই। আমি এক বছরকাল একটা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। জীবনের সেই এক বছর ভোলবার নয়।

তার পরে আমি স্থির করি আর চাকরি করব না। পুনর্মূষিক হব না। সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজে পরিণত করতে বছর কয়েক লাগল। সেটা আমার পায়চারি। আসলে আমার চাকরির বন্ধন খুলে যায় যেদিন ভারত স্বাধীন হয়। আগে থেকে সংকল্প ছিল যে দেশের যদি দরকার থাকে দেশকে আমি ছ'মাস কি এক বছর দেব। আপনাদের সহকর্মীরূপে। তার পরে আমি আমার সাহিত্যসৃষ্টিতে মনপ্রাণ সমর্পণ করব। দেশের কাজে প্রাণ দেবার প্রশ্ন

একবার আমার সামনে হাজির হয়েছিল। আমার উত্তর হলো, প্রাণ যদি দিতে হয় তবে আমি দেব সাহিত্যের জন্যে বা প্রেমের জন্যে। আর-কিছুর জন্যে নয়। যার যেটা স্বধর্ম।

আমি যখন মুর্শিদাবাদে তখন মহাত্মা গান্ধী স্বধর্মে নিধন বরণ করেন। আমার সে সময় মনে হয় যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ আর-পাঁচজনের মতো আমাকেও তুলে নিতে হবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ তো পর্বতপ্রমাণ আর শতবিধ। আমার সাধ্য কী যে সব রকম কাজে হাত দিই! সেইজন্যে আমি একটিই বেছে নিই। সেটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য। এ বিষয়ে আমি দিনরাত ভেবেছি, যতবার পেরেছি ততবার লিখেছি। প্রধানত গান্ধীজীর শিক্ষাই অনুসরণ করেছি। এর জন্যে আমাকে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এতে আমি বিরত হইনি। গান্ধীজীর প্রিয় কাজ করে যাচ্ছি বলে একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করেছি।

যাঁরা চরকা খাদি বুনিয়াদী তালিম ইত্যাদি নিয়ে আছেন তাঁরা ঠিক পথেই আছেন। কিন্তু কতক লোককে নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মার্গেও চলতে হবে। এ ব্রত হয়তো একদিন শত্রুকেও বন্ধু করবে, কিন্তু এই সতেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোয় দেখছি বন্ধুকেও শত্রু করেছে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সতেরো বছর আগে যাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল তাঁরাও এখন বলতে আরম্ভ করেছেন যে ও-জিনিস হবার নয়। কিংবা তাঁরা এখন পাকিস্তানের সুমতির উপর বরাত দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। যেন পাকিস্তানই গান্ধীজীর উত্তরসাধক।

আজ কেবল স্বাধীনতা দিবস নয়। আজ পার্টিশন দিবস। এই দিনটিতেই দেশ ও প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। আনন্দের সঙ্গে বিষাদও আজকের অনুভূতি। এই বিষাদের সঙ্গে আমি তিক্ততা মেশাতে চাইনে। ভারতের স্বাধীনতা যদি গান্ধীজীর সিদ্ধি হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা জিন্না সাহেবের সিদ্ধি। পাকিস্তানী যাদের বলা হয় তারাও ভারতমাতার সন্তান। সেই দশ কোটি লোকের আনন্দ কি আমার নিরানন্দ? আমি যদি তাদের সুখে সুখী হতে না পারি তবে এই বিচ্ছেদ কোনো কালেই দূর হবে না। আমি জানি যে পার্টিশন বিনা দ্বন্দ্বে হয়নি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু রক্ত, বহু অশ্রু। বিষাদই এর স্বাভাবিক উপলব্ধি। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে নিজের উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিতে পারাটাই মহত্ত্ব।

আমরা যেন আমাদের স্বাভাবিক বিষাদকে অতিক্রম করতে পারি ও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি।

ইংরেজীতে বলে, ভুল করাটাই মানুষের স্বভাব। মানুষ স্বভাবতই ভুল করে। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মানতে হবে যে মানুষ ভুল করতে করতে ঠিক করতে শেখে। পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে একদিন তার সংশোধন হবে। কবে, তা আমি বলতে পারব না। কেমন করে, তাও পারব না বলতে। এইটুকুই শুধু বলব যে পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে কালে তার সংশোধন হবে। আর তাই যদি হয় তবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এর বিপরীতটা অসিদ্ধ। আমরা ঠিক থাকব।

এই শুভদিনে আপনাকে আমি নমস্কার করি। ইতি। বিনীত

অন্নদাশংকর রায়

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে

এ তো আর স্বদেশী করে জেল-খাটা নয় যে ছেলে-বুড়ো মাগী-মদ্দ মালাটালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কেউ আসবে গগন আশা করেনি। চায়ওনি।

চায়নি কারণ—আদালতে খুব রোখ্ দেখালেও, 'ফাইন দেব না' বলে বুক ফুলিয়ে জেলের দিকে পা বাড়ালেও, দিনকয়েক যেতে না-যেতেই রোখ্ যায় উবে, বুক যায় দমে : চিরটা কাল জেলে কাটানো যাবে না!

পাড়াপড়শী তার রোখের কথা নিশ্চয় শুনেছে। বুক ফুলিয়ে জেলের দিকে পা-বাড়ানোর কথাও। ফিরে গেলে কী চোখে তারা তাকাবে? কী বলবে?

'শরীরগতিক ভালো তো গগনকাকা?' 'খাওয়াপরা কেমন বলো দেখি হে?' 'রোগা হয়ে গেছ গগনদা।' 'বলতে নেই শরীরটা তোমার ভালোই হয়েছে বাপু।'—এই সব? মামুলী এইসব কথার ফাঁকে আড়ে আড়ে চাইবে? আগেকার গগন আর জেল-ফেরতা গগনের ফারাকটা আগাপাশতলা খোঁজাখুঁজি করবে?

কী অস্বস্তিকর বিতিকিচ্ছি ব্যাপার!

কিংবা এখন হয়তো কেউ কিছু বলবে না। চাই-কি, গগন যা করেছে বেশ করেছে ভাব দেখাবে। বাহাদুরি দেবে। কিন্তু পরে?

পরে যদি কখনো কারো সাথে কথা-কাটাকাটি হয়?

নিবারণের পিশিটা বেরিয়ে গেছে কোন্-না দশ-বারো বছর। কিন্তু কদিন আগেই না নন্দ বোস সেই পিশির খোঁটা দিয়ে সকলের সামনে নিবারণকে বেইজ্জতের একশেষ করে ছাড়ল!

পাওনা টাকার জন্যে জীবনেও নিবারণ আর নন্দ বোসকে তাগাদা দিতে পারবে?

তাকেও যদি কেউ কখনো জেলের খোঁটা দেয়? পাওনা টাকা মারার যম নন্দ বোস, ওই ব্যাটাই যদি কখনো—

ভবিষ্যৎ ভেবে গগন বড়ই ভাবিত হয়ে পড়েছিল। খালাসের দিন যত ঘনিয়ে এসেছে ভাবনাটা পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধরে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।

ভাবনার কুলকিনারা পায়নি।

জেলে দিনের পর দিন ভেবে, রাতের পর রাত ভেবে পায়নি—স্বাধীন গগন এখন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বেয়াড়া ভাবনাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দেয়: পাড়ার ভয়ে ফেব জেলে গিয়ে ঢোকা যায় না। ঘর-সংসার ফেলে দেশ ছেড়ে পালানো যায় না।

কারো খায় না পরে যে পাড়ার লোকের পরোয়া করবে? নন্দ বোস তো নন্দ বোস—চামচিকের ছানা চামচিকে—খোদ শশী খাঁয়েরই পরোয়া আর করবে না। চাল বেচা যখন ছেড়েই দিচ্ছে, কিসের পরোয়া।

যদি কেউ ঢিল মারে পাটকেল ছুঁড়বে। এক কথা শোনালে সাত কাহন শুনিয়ে দেবে। খোঁচা দিলে গোঁত্তা।

চায়ের তলানি অব্দি চুমুক মেরে গগন উঠে দাঁড়ায়। টান্ টান্ হয়ে দাঁড়ায়।

'কত?'

'ছয়ানা।'

ভাঁটসে বিড়ি ধরিয়ে সিকি বের করে দেয়।

দোকানী ফেরত দেয় বারো নয়া পয়সা।

'যাব্ বাবা!'

সাতসকাল ডাহা লোকসান! একটা নয়া হলেও লোকসান তো!

বিড়ি কেনার সময় সিকিটা যদি ভাঙিয়ে নিত! এক আনার বিড়ি কেনার সময়!

আপসোসে, নিজেরই আহাম্মুকির জন্যে আপসোসে বুক চড়চড় করে: জেলে উনত্রিশ, তার আগে দুই—একুনে একত্রিশ। আজ কি আর দোকান খোলা হবে? দাঁড়াল গিয়ে বত্রিশ। বত্রিশ দিন রোজগারপাতি অষ্টরম্ভা, অথচ—

এমনই মাত্রা ছাড়ানো আপসোস জাগে যে বেমক্কা চটে গিয়ে সবে-ধরানো বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে।

ডবল আপসোস। অ্যাদ্দিন পরে প্রকাশ্যে পয়সা দিয়ে কিনে মৌজ করে বিড়ি-টানা শুরুতেই শেষ!

আরেকটা বিড়ি বের করেও পকেটে রেখে দেয়। নবাবী! বত্রিশ দিনে আধখানা বিড়ির দামও রোজগার হয়নি বিড়ি ফেলে বিড়ি ধরানো!

আপসোসের চাপে পাড়ার লোককে পরোয়া না-করার রোখ্‌টা উবে যায়, বুকটা দমে যায়: নটাও বাজেনি, এখনি যাওয়া ঠিক হবে? পৌঁছনো মাত্র দল বেঁধে সবাই তত্ত্বতাল্লাসে হামলে আসবে। অফিস-আদালতে লেট হয়ে গেলেও না এসে ছাড়বে না। গলির মোড় থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে যাবে।

তার ওপর বাড়িতে যদি কেউ না থাকে? তেমন বুঝলে আমতায় খবর দিতে বলে এসেছিল। খবর দিয়ে থাকে যদি? খবর পেয়ে মা যদি ওদের লোক পাঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে?

গগন দোটানায় পড়ে। ডবল দোটানায়। পাড়া এখন গিজ্‌গিজ করছে বলে দোটানায়, বাড়িতে কেউ না-থাকতে পারে ভেবে দোটানায়।

দোটানায় খাবি খেতে খেতে মনে পড়ে যায় মেনকার কথা।

মায়ের পেটের বোন। বড় আদরের ছোট বোন।

বোনাই অবিশ্যি পাত্তা দেয় না, বোনও বড়-একটা খোঁজখবর নেয় না—কিন্তু দাদা হিসেবে গগনের তো একটা দায়িত্ব আছে? অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, মনটা তো কেমন-কেমন করে উঠতে পারে?

করা উচিত তো?

দেখা মাত্র অবাক অনিমেষ 'আসুন দাদা আসুন দাদা' বলে, 'ওগো স্যাখসে কে এসেছে, স্যাখসে' বলে দস্তুরমত সোরগোল দেখে দেয়।

'ওমা, কী ভাগ্যি! সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠেছি!' দাদাকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে যায় মেনকাও।

অবাক গগনও বড় কম হয় না: সাড়ে এগারোটা বাজে, বাড়িতে? লুঙি পড়ে বিছানায় উবু হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে?

'আপিশে যাওনি?'

'আপিশ?' প্রশ্নটা যাচাই করে নিয়ে অনিমেষ বলে, 'নাঃ। কদ্দিন ধরে পেটের এমন ট্রাবল'—

কদিন ধরে আপিশ কামাই ? তবে কেন হাওড়া স্টেশনে ডজন খানেক বাস ছেড়ে দিয়ে, শ্যামবাজারে বাস থেকে নেমে বাজারে ঢুকে আনাজপতির দরদাম করে, মাছের লাইনের লোক গুণে, পাঁঠার মাংস কোপানো দেখে ঘণ্টা আড়াই দেরি করে এল ?

মেনকা শুধায়, 'ভালো আছ দাদা ? বৌদি ভালো আছে ? চাঁদু-হাঁদু ভালো আছে ? মা—'

'আমতার চিঠি পাসনি ?'

'চিঠি! কত খবর তোমরা রাখ! বেঁচে আছি কি মরে গেছি'—অভিমানে মুখ মেনকার থমথমিয়ে ওঠে।

যাক, জানে না তবে কিচ্ছু! গগন হাঁফ ছাড়ে। ভাগ্যিশ লেনদেন নেই খবরের!

বলে, 'রোজই ভাবি আসব-আসব, কিন্তু—'

'ত্যাখ!' কথা কেড়ে নিয়ে অনিমেষ বলে, 'তুমিও কদিন ধরে দাদা-দাদা করছ! একেই বলে প্রাণের টান!'

অমায়িক হেসে গগন বলে, 'বড়বাজারে গস্ত করতে এসেছিলুম। মালিক কাল রাতে মরেছে, দোকান বন্ধ। তাই ভাবলুম—'

'বেশ করেছেন দাদা। আমার তো সময় হচ্ছে না—দাদার সাথে চলে যাও। শিবপুর-শিবপুর করছিলে—কদিন থেকে এসো। নাকি বলেন দাদা ?'

প্রস্তাবটা গগনের মনে ধরে: স্নান সেরে দমভর খেয়ে ঘুম। বিকেলে জলখাবার। তারপর রওনা। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে যাবে।

বোনসমেত রিকশা থেকে নামলে জেল-ফেরতা জেল-ফেরতা ভাবটা আর থাকবে না। বরং জেলে ছিল, না মাসখানেক কুটুমবাড়ি কাটিয়ে এল ভেবে সবাই হকচকিয়ে গেলেও যেতে পারে।

বোনটা বেশ শাঁসেজলে হয়েছে দেখেও গগন বলে, 'তোর শরীরটা যে গেছেরে মেনী! কী হয়েছে ?'

'কী আর হবে!'

'উঁহু।' অনিমেষ বলে, 'দাদার চোখ এড়াবে! ঠিকই ধরেছেন, দাদা। তেল।'

'তেল ?'

'তেল কি আর। নামেই তেল। সেন্ট পারসেন্ট ভেজাল। ওই তেল খেয়ে বাড়িশুদ্ধ—'

তেলে ভেজাল? শেষের দিকে কথাটা শুনেছিল বটে। শালকের রাখহরি এসে বলেছিল।

বাজার থেকে তেল উধাও। যার যা-খুশি ভেজাল দিচ্ছে। গরমেণ্ট দাম বেঁধে দেওয়ায় কলওলারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিনা ভেজালে বাঁধা দরে তেল তারা দেবে না।

গরমেণ্ট তাতে অবিশ্যি রা কাড়েনি, কিন্তু খাঁটি তেল বেশি দামে বেচায় রাখহরিকে পাকড়ে হাকিম মারফত জেলে পুড়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে যোয়ান মানুষটার সে কী ভেউ ভেউ কান্না!

তাকে প্রবোধ দিতে দিতে গগন হিসেব কষা শুরু করে দেয়: তার দোকানে মজুত ষোল কিলোর তিনটে, চার কিলোর দুটো, দু কিলোর দুটো, এক কিলোর, না, এক বা আধ কিলো টিন সে রাখে না, তবে ষোল কিলোর একটা ভাঙা টিন আছে, তাতে না-না করে কিলো দশেক হবে। বউ ওতে হাত দেবে না, ওতে কেন দোকানের কোনো মালেই হাত দেবে না, সারা মাসের মালপত্র আলাদা করে দিয়ে এসেছে; তাহলে তোমার মোট দাঁড়াল গিয়ে তিন ষোলং আটচল্লিশ, চার-দুগুণে আট, আটচল্লিশ আর আটে ছাপ্পান্ন, দু-দুগুণে চার, ছাপ্পান্ন আর চারে ষাট, ভাঙা টিনে দশ, কম করে নব্বই ধরো—তাহলে তোমার মোট হল গিয়ে—

অনিমেষ বলে, 'আপনারা কিন্তু দিব্যি আছেন দাদা! চাল-ডাল-মশলা-পাতির জন্যে বাড়তি দাম নেই, নির্ভেজাল তেল!'

চাকরে বাবু আজ মুদী সম্বন্ধীকে হিংসে করছে! হেনস্থার বদলে হিংসে! গগন মিটিমিটি হেসে হিংসেটা চাখে।

'আমাদের হয়েছে প্রাণান্ত। একেই দামের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, তায় ভেজালে ভেজালে ছয়লাপ। মশলায় ঘোড়ার ইয়ে, সরষের তেলে তিসির তেল, হোয়াইট অয়েল—ভাবতে পারেন?'

চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে সবেগে মাথা নেড়ে গগন জানায়, পারে না। বেশি দামে বেচার তবু মানে বোঝা যায়। বেশি দামে কিনলে বেশি দামে না বেচে উপায়? তাই বলে মশলায় ঘোড়ার গু? সরষের তেলে—কী সব্বনেশে ব্যাপার!

অনিমেষ বলে, 'কই, দাদাকে চা-টা দাও।'

মেনকা বলে, 'এত বেলায় আর চা—'

'চায়ের আবার বেলা-অবেলা। দাও না! দাদার হলে আমারও আরেকটু—'

সস্নেহ ধমক দিয়ে গগন বলে, 'তোমার না পেট খারাপ? চা তোমার একেবারেই—'

'তা বটে!' অনিমেষ চুপসে যায়।

গনগনিয়ে খিদে চাগিয়েছে। এখন চা খেয়ে খিদে মারতে গগনও নারাজ। বলে, 'আমিও চা খাব না রে। জানিস তো চা আমি বেশি খাইও না।'

'তুমি ছুটি ডাল-ভাত—'

'তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুই বরং এক গেলাস—'

'যাই মা।' শাশুড়ীর ডাকে সাড়া দিয়ে মেনকা বলে, 'ভালো হয়ে বসো না দাদা, উঠে বসো। আমি আসছি।'

'এক গেলাস জল—'

'আনছি।' মেনকা বেরিয়ে যায়।

খাটে গ্যাঁট হয়ে বসে গগন শুধায়, 'মাইমা কেমন আছেন? মাইমার সাথে—'

'রান্না করছে, আসবেখন।'

'তোমার ভাইয়ের খবর কি? দেখছি না।'

'নাটুর খবর খুব ভালো দাদা। পাশ করেছে।'

'আচ্ছা! বেশ বেশ।'

'অঙ্কের পরীক্ষাটা দিতে পারেনি, শেষ রাতে ধুম জ্বর—তবু বিয়াল্লিশ পেয়েছে।'

'অ্যাঁ!'

'ভগবানের হাত দাদা। পরীক্ষায় পাশ-ফেল—' অনিমেষ হেঁ হেঁ করে হাসে।

পরীক্ষা না দিয়েও বিয়াল্লিশ পাওয়া—ভগবানেরই হাতের গুণ। এরপর মানুষের আর বলার কিছু থাকে না। তাজ্জব হওয়া ছাড়া।

গগন অতএব তাজ্জব হয়ে থাকে।

'আসলে বুঝলেন দাদা, ভগবান সহায় না হলে, ভাগ্যে না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। দেখছি তো! গতবার নাটু ভালো পরীক্ষা দিয়েও—'

তাই। ভগবান আর ভাগ্য। ভগবান ফাঁসিয়েছে বলেই গগন ফেঁসে

গেছে। ভগবান বাঁচিয়েছে বলেই শশী খাঁ বেঁচে গেছে। গগনের ভাগ্যে ছিল ফাঁসা, শশী খাঁর ভাগ্যে ছিল বাঁচা।

একেই বলে ভগবানের বিচিত্র লীলা। ভাগ্যের খেল।

অনিমেষ বলে, 'নাটুকে কলেজে ভরতি করে দিলাম। এখন আপনাদের আশীর্বাদে এক চান্সে যদি—'

'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদের গ্যারান্টি দিলেও গগন বেশ বোঝে যে সে শাপশাপান্ত করলেও হবে কচুপোড়া। ভগবান যদি সহায় হন। ভাগ্য যদি সদয় হয়।

শশী খাঁর আড়ত থেকে এক টাকা পাঁচ নয়া দরে চাল কিনেছিল। দশ নয়ায় বেচেছিল। কিন্তু ভগবান আর ভাগ্য শশী খাঁর তরফে ছিল বলেই না গগনকে যেতে হল জেলে?

শশী খাঁকে শাপশাপান্ত, শশী খাঁয়ের বাপান্ত কে না করে—কিন্তু একটি লোমও কি শশী খাঁর খসাতে কেউ পেরেছে?

ভেতর থেকে মেনকা ডাকে, 'শুনছ।'

'যাই।' অনিমেষ উঠে দাঁড়ায়। লুঙির কষি আঁটতে আঁটতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে।

লজ্জা-লজ্জা মুখে লাজুক গলায় বলে, 'একটা কথা দাদা—ওর ইয়ে হবে—এই প্রথম বার—'

'তাই নাকি!' তাই অমন শাঁসেজলে দেখাচ্ছিল। 'ক মাস?'

'আট।'

আট! অথচ বারকয়েক বাপ-হওয়া গগন দেখেও টের পায়নি। কী কাণ্ড! 'খুব ভালো খবর! খুব ভালো খবর!' মামা হবার নোটিস পেয়ে গগন গলে পড়ে।

'এ-সময় আপনাদের কাছেই থাকা ভালো—প্রথম বার—বুঝলেন না!'

'বটেই তো। বটেই তো!'

'ও যদি যেতে নাও চায় আপনি একটু—'

'নিশ্চয়।' গগন অঢেল ভরসা দেয়। 'বলে-কয়ে আমি নিয়ে যাবই।'

লেখাপড়া জানা আজকালকার ছেলেদের এই একটা মস্ত গুণ। বাপের কথায় ধাঁ করে বিয়ে করে বসে না। বিয়ের বছর না ঘুরতে বাপ বনে বসে না।

তোফা কয়েকটা বছর হাত-পা ছড়িয়ে হেসে-খেলে কাটিয়ে বাপ হওয়ার পথে পা বাড়ায়। সময়মত সুবিধেমত পা বাড়ায়।

বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পরে অনিমেষ বাপ হতে চলেছে। নির্ঘাত মাইনে-টাইনে বেড়েছে। উপরিটুপরি জবর হচ্ছে।

আর গগন ?

বিয়ের পাঁচ বছরে চারটি।

ভাগ্যিশ সেই তিনের দুটির একটি আঁতুরে ঠাণ্ডা লেগে আর একটি বছরখানেক বয়েসে মায়ের দয়ায় স্বগ্যে চলে গেছে!

হাঁতুকে বিয়োতে গিয়ে বউটা মরার দাখিল হওয়ায় হাসপাতালে অস্ত্র করে ভাগ্যিশ তার মা-হওয়া জন্মের মত বাতিল করে দিয়েছে!

দুটি ছেলেমেয়ে মরে যাওয়া খুবই দুঃখের। সময়মত সে দুঃখ গগন পেয়েওছে। চুকেবুকে গেছে।

জন্মেও আর মা হতে পারবে না ভাবা খুবই দুঃখের। সে-দুঃখ বউটা পায়ও। যদি ভাবে। যখন ভাবে।

কিন্তু চারটেই যদি বেঁচেবর্তে থাকত ? তারপরেও যদি বছর বছর হত ? আজকালকার বাজারে—গগন শিউরে ওঠে।

ছেলেপিলে মরার দুঃখ মনের দুঃখ। ছেলেপিলে না হওয়ার দুঃখ মনের দুঃখ। মনে করলে আছে নইলে নেই। কিন্তু গরীবের সংসারে ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে না দিতে পারার দুঃখ জলজ্যান্ত জীবন্ত। তোমার মনের তোয়াক্কা না করে সে-দুঃখ তোমায় উস্তনখুস্তন করে মারবে। ধোপার পাটে ফেলে তোমায় আছড়াবে। মাথা খারাপ করে দেবে। মরীয়া করে দেবে।

নইলে ছেলেকে মা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে! ছেলেকে বাবা গলা টিপে শেষ করে! সেদিনও খবরের কাগজে—

অনিমেষের মা ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গগন ঢিপ করে প্রণাম করে। 'ভালো আছেন মাইমা ?'

'আর ভালো বাবা! যে কদ্দিন আছি—'

'নাটু পাশ করেছে শুনলাম। খুউব খুশী হয়েছি। এবার—'

'নাটু তো পাশ করেছে, আর এদিকে খোকা যে ছাঁটাই হয়ে—'

'ছাঁটাই ? কে ? অনিমেষ ?'

'তোমায় বলে নি ?'

'কই !'

'তাহলে আমিও বলি নি বাবা। আমিও—' ছেলে-ছেলেবউয়ের সাড়া পেয়ে বুড়ী থেমে যায়। ওরা ঘরে ঢোকা মাত্র টুক করে বেরিয়ে যায়।

চাকরি নেই অনিমেষের? পেটের গোলমালে আপিসে না-যাওয়া ধাপ্পা?

বোনাই ধাপ্পা দিয়েছে, বোন তাতে সায় দিয়েছে?

অনিমেষ আলনা থেকে শার্টটা টেনে নেয়।

গগন বলে, 'বেরোচ্ছ নাকি? চলো, আমিও যাব—'

মেনকা বলে, 'সে কি দাদা!'

অনিমেষ বলে, 'না না আপনি এত বেলায়—'

বোন-বোনাই এক সাথে হাঁ হাঁ করে ওঠে। গগনও পাল্লা দিয়ে মাথা নাড়ে।

'তাড়াতাড়ি আছে রে। আজ আসি অনিমেষ। গস্ত না করলে—'

'কে মারা গেছে বললেন যে—'

'বড়বাজারে কি দোকান একটা ভাই!'

'তাই বলে এত বেলায়—না খেয়ে—'

'তোর বৌদি না খাইয়ে ছাড়ে?'

'দুটো মিষ্টি অন্তত!'

'হবে হবে!'

'জল চেয়েছিলে যে দাদা।'

গগন ততক্ষণে রাস্তায়, শুনতে পায় না।

হারামজাদা!

ছাঁটাই হয়েছি বলতে মান যায়!

পোয়াতী বউটার দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতলব!

শ্বশুরবাড়ি যেতে আমতা দৌড়োয়। হাওড়া ময়দান দিয়েই যায়, শিবপুরের দিকে ভুলেও কখনও পা বাড়ায় না।

সম্বন্ধী যে মুদী! দোকানের লাগোয়া ঘর! টিনের চালা! তার আপিশের চেনা কে একজন শিবপুরেই নাকি থাকে!

পাকাবাড়ির বাসিন্দে বি. এ পাশ চাকরেবাবু! সাতভাড়াটের বাড়িতে

মা ভাই বউ সমেত একখানা ঘরে রাত কাটিয়েও পাকা বাড়ি বাসিন্দের গুমোর! চাকরি নট হয়ে গেলেও গুমোরটি ষোল আনা!

বোনটাও কম!

বছর কয়েক ইশকুলে যাতায়াত করেই লেখাপড়াজানা সোয়ামীর তরে হেদিয়ে মরে। গাঁয়ের এর-তার সাথে ফষ্টিনষ্টি করলেও বউ হয়ে গাঁয়ে না-থাকার গোঁ ধরে।

সাধুচরণের ভাইপোটা বিয়ের তরে ক্ষেপে উঠেছিল। সাধুচরণ যেচে এসে কথা পেড়েছিল। ভালো গেরস্থ, জমিজিরেত আছে, আমতা বাজারে মনিহারী দোকান। মোটা ভাত-কাপড়ে আরামে থাকত।

হারামজাদী বেঁকে বসে। কান্নাকাটি করে বাড়ি মাথায় করে। মাকে দলে ভেড়ায়।

অর্ধেক জমি বেচে বউয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে বোনাই কিনতে হয়। আনাদশেক সোনা, তাও স্যাকরার দোষে, কম পড়েছিল—কাঁদুনি গেয়ে গেয়ে ছুঁড়ি আদায় করে ছাড়ে। ষষ্টি বা পুজোর তত্ত্বে উনিশ-বিশ হলেই নালিশ। শাশুড়ীর খোঁটার জন্যেই নাকি নালিশ।

শাশুড়ী! বুড়ীটাকে যে তুই বাঁদীর বেহদ্দ বানিয়ে রেখেছিস, জানতে গগনের বড় বাকি আছে!

আসলে যতটা পারে দাদার কাছ থেকে শুষে নেয় আর-কি! বোনাই উস্কে দেয়। সম্বন্ধীর বাড়ি যেতে মানে লাগলেও সম্বন্ধীর দেওয়া জিনিসপত্র—

হারামজাদা! হারামজাদী!

কেমন চালাকি খেলে তার ঘাড়ে চাপার যো করেছিল!

বড্ড ভুল হয়ে গেছে! জলখাবারটা যদি খেয়ে আসত! টাকাটাক, অন্তত আনা দশ-বারো যদি খসিয়ে দিয়ে আসত! এই দুর্দিনে তাই বা কম কি?

বোন-বোনাই এতদিন দুয়েছে, মওকা পেয়ে আজ যদি খানিকটা শোধ নিত!

এক গেলাস জল অব্দি খরচ করাল না!

খিদেয় পেট কুঁই কুঁই করে, তেষ্টায় গলা বুজে আসে, আপসোসে বুক জ্বলেপুড়ে যায়।

শালার দিনটাই আজ শুরু হয়েছে লোকসান দিয়ে। একটার পর একটা লোকসান।

চায়ের দোকানে এক নম্বা, সবে-ধরানো বিড়ি একটা, শ্যামবাজারে যাতায়াতের ভাড়া, যাচা মিষ্টি, জল এক গেলাস !

শরীরের ধকল তো আছেই !

ভগবান !

হাওড়া স্টেশনে এগারো নম্বর থেকে নেমেই গগন পঞ্চাম্নয় উঠে পড়ে। প্রচণ্ড ভিড়, হোক। পেছনে সার-সার খালি বাস, থাকুক। আর দেরি নয়। বাড়িই যাবে।

পাড়ার লোকের কথা ভেবে ঝুটমুট অর্ধেকটা দিন ফ্যা ফ্যা করে কাটাল। কিসের পরোয়া পাড়ার লোকের !

ভদ্দরলোক ! লেখাপড়াজানা ভদ্দরলোক !

ওদের সাধাসাধিতে, ওদেরই মুখ চেয়ে ব্ল্যাকে চাল কিনে আনে, অথচ দোকান যখন সার্চ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই মজা দেখে। দ্বিজেন মুখুজ্জে, রাখাল সরকার সার্চের সাক্ষী অব্দি হয়।

কে জানে, ওদেরই কেউ পুলিশকে গিয়ে খবরটা দিয়ে এসেছিল কিনা ! তার চালের ভাত খেয়ে শরীরে তাগদ করে খবর দিতে দৌড়েছিল কিনা কে জানে।

আদালতে একজনও গগনের হয়ে কথা বলে নি। ব্ল্যাকের দাম নিয়ে রসিদে কণ্ট্রোলের দাম লেখার প্রমাণ ? নিমাই দাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ ? শশী খাঁয়ের পেয়ারের কর্মচারী যে নিমাই দাস। বয়েসকালে যার মাগের সাথে শুয়েছে শশী খাঁ।

'সবই বুঝি বাবা !'…'গগনদা, কী আর বলব !'…'বোঝোই তো গগন কাকা !'…'গগন !'—দরদের কিন্তু কমতি ছিল না।

বেইমানের দল !

এমনিতে বড় বড় বাত। গণ্ডার মারে ভাণ্ডার লোটে ! মুরোদ নেই কানাকড়ির।

বিভূতি মজুমদারের ছেলেটা খবরের কাগজে কাজ করে। গল্পটল্পও লেখে। যখন-তখন দেশের হালচাল শোনায়। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গরীবগুর্বো মানুষের দুঃখে গলা কাঁপায়। লেখাপড়াজানা বাবুদের পিণ্ডি চটকায়। 'বলব কি গগনবাবু, আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। বাইরে যা কিছু চেকনাই, কিন্তু ভেতরটা পচে গলে—'

বাঞ্চোৎ! অতই যদি টন্‌টনে জ্ঞান, গগনের হয়ে সাক্ষীটা তুই দিতে প্‌ারতিস না? গরমেণ্টের বাঘা বাঘা গোপন খবর ফাঁস করে দিতে পারিস, আর শশী খাঁ যে শয়ে শয়ে চাল মজুত করে রেখেছে—বেজন্মা কাঁহাকা!

শিবপুর ট্রাম ডিপোয় বাস থেকে নেমে গগন গটমটিয়ে হাঁটে: পাড়ার বেইমান-বাঞ্চোৎ-বেজন্মাদের জন্তে সে ভেবে মরছিল! পালিয়ে বেড়াচ্ছিল! হোক না এখন কারো সাথে দেখা! হোক না! তেরছা চোখে তার দিকে কেউ তাকাক না! তাকাক না একবার! খোঁচা দিয়ে কিছু বলুক না! বলেই দেখুক না!

ভরদুপুরে রাস্তা ফাঁকা।

দোকান বন্ধ। পাশের গলি দিয়ে ঢুকে গগন দরজা ধাক্কায়।

দরজা খুলে দিয়ে ছবি বলে, 'এত দেরি করলে! আমি কখন থেকে—'

'মানে? তুমি জানতে?'

'জানতুম না!'

একদিন আগে গগন খালাস পেয়ে যাবে, অমন রগচটা গোঁয়ার মানুষটা জেলে ভালো ছেলেটি হয়ে থেকে একদিন সাজা মকুব করিয়ে নেবে—জানত? 'তুমি কী করে—'

'মুখুজ্জে মশায় কাল বলে গেছেন।'

'ব্রিজু মুখুজ্জে?'

'না, কেষ্ট মুখুজ্জে।'

গগনের খেয়াল হয় কেষ্ট মুখুজ্জের ব্যাটা সুরেশ জেল আপিশে কাজ করে। জেলে যদিও সুরেশ তাকে চিনত না, কাকা বলে ডাকতে হবে বলে চিনত না—কিন্তু বাপ মারফত তার খালাসের খবরটা বাড়িতে পৌছে দিয়েছে। ভালোমানষেমি!

'তুমি আজ সকালে—'

'হুম!' গগন গুম হয়ে যায়। দেরি করে আসার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? বউটাকে?

গুম হয়ে বউকে দেখে। দরজা দিচ্ছে। মস্ত পাছা। এক পিঠ তেল-চকচকে চুল। পাটভাঙা শাড়ি। ফর্সা ব্লাউজ। তলায় আবার ছোট জামা।

স্বামী বিহনে কোথায় ভাবনা-চিন্তায় আধখানা হয়ে ছেঁড়া তেনা পরে

আছে ভেবেছিল, তা নয় দিব্যি সেজেগুজে বিবিটি! সে কি বায়স্কোপের টিকিট কিনতে গিয়েছিল ?

বাতাস করার জন্যে ছবি পাখা নিয়ে আসতে খপ করে সেটা কেড়ে নিয়ে প্রাণপণে নিজেকে গগন হাওয়া খাওয়ানো শুরু করে দেয়।

'আমায় দাও না।'

'থাক।' সরে বসে।

'কী হয়েছে বলো তো ?' মেজাজটা যেন—'

'—!'

'ধেৎ!' ধমক দিয়েও ছবি মুচকে হাসে।

গা জলে যায় গগনের। খিস্তিকে রসিকতা ভাবছে ?

'চাঁহু-হাঁহু কোথায় ?'

'বোসেদের বাড়ি।'

'কেন ? বোসেদের বাড়ি মরতে গেছে কেন ? ওই শালা নন্দ বোস—'

'কী যা তা বলছ! ভালো হয়ে বসো। দেখি, জামাটা খোল—'

ছবিকে হটিয়ে দিয়ে চড়া গলায় গগন শুধোয়, 'বোসেদের বাড়ি কেন গেছে তার জবাব দাও।'

'নন্দবাবুর নাতির মুখে ভাত—'

'তাতে আমাদের কি ? ও শালা নাতির মুখে ভাত দিক বা ইয়ে পুরে দিক—'

'কী সব বুলি শিখে এসেছ, অ্যাঁ!' ছবি মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। 'নন্দবাবু বাড়ি এসে নেমন্তন্ন করে গেল, ওর বউও এসেছিল, আজ সকালে নিতুকে পাঠিয়ে ওদের নিয়ে গেল—যেতে দেব না ?'

গগন এবার যায় ঘাবড়ে। পাড়ায় বিয়েসাদীতে মশলাপাতি তার দোকান থেকে কিনলেও নেমন্তন্ন কেউ কখনো করে না। অথচ নাতির মুখে ভাতে নন্দ বোস—

গগনের জবর খটকা লাগে। 'মাল নিয়েছে নাকি ?'

'দোকান বন্ধ। কে মাল দেবে ?'

'তবে ?'

'মাল নেয়নি, বরং বকেয়া টাকা দিয়ে গেছে। উনিশ টাকা।'

গগন হাঁ হয়ে যায়।

'শুধু নন্দবাবু না—সাত দিনে দুশো একাশি টাকা আদায় হয়েছে। বাড়ি বয়ে সবাই দিয়ে গেছে। নন্দবাবু উনিশ, দ্বিজু মুখুজ্জে বাইশ, কেষ্ট মুখুজ্জে এগারো, নগেনবাবু ছত্রিশ, অমিয়বাবু সাতাশ—'

'থাম থাম। তুমি বলছ ওরা—'

'সব আমি লিখে রেখেছি। দেখবে? আনব?' দুই চোখ ছবির চকচক করে।

ট্যারা হওয়ার দাখিল হয় গগনের: বেইমানী করে তাকে জেলে পাঠিয়ে অনুতাপ জাগে? নিজেদের অন্যায় বুঝে অনুতাপ? তাই আর কিছু না পারুক, বকেয়া ধার-দেনা যতটা পারে শুধেছে? নাতির মুখে ভাতে ছেলেদুটিকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে নন্দ বোস হেন লোক গগনকে খাতির দেখিয়েছে?

পাড়ায় পাওনা অবিশ্যি দুশো একাশির তিন গুণ, কিন্তু বিনা তাগাদায় দুশো একাশিই বা কম কি!

ছবি জামা খুলতে শুরু করে। বাধা দেওয়া দূরে থাক গা এলিয়ে দেয় গগন।

'সরকাররা আজ পঁচিশ দেবে বলেছে। কাল সরকার-গিন্নি এসেছিল।'

'এখানে? বলো কি!'

জেলে যাওয়ায় এমন মান বেড়ে যাবে কে জানত! স্বদেশী নয়, চোরাকারবার করে জেলে যাওয়ায়!

কে জানত পাড়ার লোকেরা এত ভালো! ভেতরে ভেতরে এত ভালো! আসলে এত ভালো!

আর গগন কিনা এদের সম্বন্ধে যাতা ভেবেছে! ছি ছি ছি! ওরা খদ্দের না? খদ্দের মানে লক্ষ্মী না? ছি ছি ছি!

'জোরে হাওয়া করো না। আরও জোরে।'

'ফতুয়াটা খুলবে তো!'

'খোল না!' দু পাশে দু হাত ছড়িয়ে ফতুয়া খোলার জন্য বুক বাড়িয়ে দেয়, ছবি নাগালে আসা মাত্র দুহাত জোড়া লাগিয়ে ফেলে।

ভাগ্যিশ পাড়ার লোকেরা ভালো! ভালো বলে ছেলে দুটোকে নিয়ে গিয়ে ঘর ফাঁকা করে রেখেছে! ভালো বলে জেলে তাকে না চিনলেও তার

খালাসের খবরটা বাড়িতে জানিয়ে দিয়ে বউকে সেজেগুজে থাকার সুযোগ দিয়েছে ! অ্যাদ্দিন পরে বউটাকে—

'মাগো !'

'আমি বড্ড পাপ করেছি গো !'

'কী করেছ ?' জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি শুধায়।

সে কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। খদ্দের মানে লক্ষ্মী। আর লক্ষ্মীদের বেইমান বলা, বাঞ্চোৎ বলা, বেজম্মা বলা ! সামনাসামনি অবিশ্যি বলে নি, কিন্তু মনে মনে মহড়া তো দিয়েছিল ? দরকার হলে বলবে বলেই মহড়া দিয়েছিল তো ? হায় ভগবান !

'কী পাপ করেছ, বললে না ?'

'সে বলা যায় না গো বলা যায় না।' গভীর খেদে গগন বলে।

'ভালে বলে কাজ নেই। এখন যাও দেখি, জল তোলা আছে, চটপট চান সেরে নাও। আমি জনতা ধরিয়ে পোস্তর বড়াগুলো ভেজেনি।'

'আগে এক গেলাস জল দাও।'

'শরবৎ করে দেব ?'

'শুধু জল।'

জল খেয়ে বউকে আরও কয়েক খামচা আদর করে গগন কলতলায় গেছে, দরজায় 'গগন আছ নাকি হে ?' হাঁক শোনা যায়।

দরজা খুলে দিয়ে গগন বলে, 'আপনি ! আসুন, ভেতরে আসুন।'

'না বাবা, এখন আর বসব না।'

'আমি এই মাত্তর—'

'জানি। বৌমা জানালায় ছিলেন, দেখেছেন। ঘুমোচ্ছিলাম, ডেকে দিলেন।'

গগন যেন তীর্থ সেরে ফিরেছে। খবর পাওয়া মাত্র দুপুরের কাঁচা ঘুম ভেঙে বুড়ো মানুষটা ছুটে এসেছে। কুশল জানতে রেওয়াজমাফিক ছুটে এসেছে।

যদু মিস্তিরকে কী ভাবে খাতির করবে গগন ভেবে পায় না। চোখেমুখে ভীষণ বর্তে-যাওয়ার ভাব ফুটিয়ে কৃতার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ভালোয় ভালোয় ভগবানের দয়ায় তুমি—'

'আপনার সেই বাতের ব্যথাটা—'

'আর বাবা! শরীর থাকলেই ব্যাধি—শাস্ত্রেই বলেছে। তার ওপর তোমার গিয়ে—' যদু মিস্তির গলা খাঁকারি দেয়। 'যাক, তুমি এসে গেছ, বড় আনন্দ পেলাম। এখন আসি, কেমন? স্নান করতে যাচ্ছিলে? অ। স্নান করো, খাওয়াদাওয়া করো, জিরিয়ে নাও। বিকেলে আসবখন, অ্যাঁ?'

দুপা গিয়েই পেছন ফেরে। 'বৌমার কাছে সতেরোটা টাকা দিয়ে গেছি—শুনেছ বোধ হয়। আরও সাত টাকা ন আনা পাবে। পারি তো আজ বিকেলেই—'

'সে আপনার যখন সুবিধে হয়—'

'শুধু কি নিজের সুবিধে দেখলে হয় বাবা। তুমি আমারটা দেখবে, আমি তোমারটা দেখব—তবেই না—'

অতি উত্তম কথা। গগন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়।

'এক পাড়া মানে এক পরিবার—ঠিক কিনা বলো?'

গগন সায় দেয়।

'আচ্ছা, তবে এখন—বিকেলে দোকান খুলছ তো?'

'দেখি।'

'দেখ। যদি ভালো বোঝ খুলবে, নইলে না। তুমি তো পরের চাকর নও হে। চলি।' যদু মিস্তিব হাঁটা শুরু করে।

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত গগন দরজার পাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষটা একেবারে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দরজা দিতে বাধ-বাধ ঠেকে।

ক পা গিয়েই যদু মিস্তির ঘুরে দাঁড়ায়। 'ভালো কথা মনে পড়ে গেল।' গুট গুট করে এগিয়ে আসে। গলা নামিয়ে বলে, 'তোমার কাছে অনেকেই আসবে। তেল—'

'তেল?'

'হ্যাঁ তেল। তা দেবে বইকি, আছে যখন সকলকেই কিছু কিছু দেবে। তাই বলে যে যা চাইবে—'

হঠাৎ মাথায় চিড়িক পাড়ে। কপালের রগগুলো দপদপিয়ে ওঠে। দু হাতে দরজার দুই পাট থাবলে ধরে গগন শুধায়, 'আমার কাছে তেল আছে বুঝলেন কী করে?'

'বাবা! এক পাড়ার লোক। বলতে গেলে এক পরিবার। নিজেদের খবরাখবর—'

'তেলের দাম তো বেড়ে গেছে।'

'বেড়েছে। তুমিও বাড়তি দামই নেবে। তবুও তো খাঁটি জিনিসটা—নাকি বলো?'

'হুম!'

'আড়াই শোর বেশি কিন্তু কাউকে দেবে না। কেউই দিচ্ছে না। তুমি জানো না বলেই জানিয়ে রাখলাম। তবে আমার বাবা একটু বেশি চাই—স্পেশাল আর কি—এখন কিলো দুই দাও—এরপর মাস দুই দিও না—এক গ্রামও না—জামাই আসছে, ডাক্তার মানুষ—বুঝলে না? তা আমি তোমায় চার—চারই দেব। বাবা গগন!'

কঠিন গলায় গগন বলে, 'না মিস্তির মশায়, চোরাকারবার আর আমি করব না। খুব আক্কেল হয়ে গেছে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো খুবই ভালো। কন্ট্রোল দামে যদি দাও—নিজের পাড়ার লোককে দেবে—দেওয়া উচিতও—তাই যদি দাও বাবা—'

'দেখা যাবে!'

যদু মিস্তিরের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গগন ফোঁসে: ওরে হাবামজাদা ঘাটের মরা! তেলের তরে গগনের আসাপথ চেয়ে তোর বি এ পাশ বৌমার জানালায় বসে-থাকা! তেলের তরে তোর কাঁচা ঘুম ভেঙে দৌড়ে-আসা!

ছবি শুধোয়, 'তেলের কথা বললেন বুঝি? ওরাও বলে গেছে?'

'ওরা?'

'নন্দবাবু, দ্বিজু মুখুজ্জে, কেষ্ট মুখুজ্জে—সব্বাই। বলেছে দাম যদি বেশিও দিতে হয়—'

'দেবে?'

'দেবে। সরকার গিন্নির বাড়িসুদ্ধ আমাশা—বলল—'

এই ব্যাপার! বাড়ি বয়ে এসে দেনা শোধ করার দরদ দেখানোর কারণ তবে এই! খাঁটি তেলের তরে দারুন এই দরদ!

বেশি দামেও এখন কিনতে রাজী? হাতেপায়ে ধরে বেশি দামে কিনবে, তারপর পুলিশে গিয়ে খবর দেবে? তারপর—

এবার আর ফাইন নয়। ফাইন না দিলে জেল নয়। ধরেই গলায় ফাঁস

লাগিয়ে দিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবে। তারপর লাস নামিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটবে। টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। কুকুর দিয়ে খাইয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাবে।

চোরাকারবারের বিরুদ্ধে মন্ত্রীরা কী রকম শাসানি হাঁকাচ্ছে, জেলে বসেও শুনেছে তো! বলা যায় না, ল্যাম্পপোস্টের বদলে মন্ত্রীরাই ঝপাঝপ হাতে মাথা কেটে নিতে পারে। তারপর আইন মোতাবেক সাজা তো আছেই!

'চান করতে যাও!'

'হুঁম।'

অকথ্য আক্রোশে মাথাটা গগনের চৌচির হতে চায়। ইচ্ছে করে, হাতের নাগালে খুব দামী এমন একটা কিছু জুটে যাক যেটাকে সে দু হাতে ফালা ফালা করে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, দু পা দিয়ে মাড়ায়, তার ওপর থক থক করে থুতু ফেলে, পেচ্ছাব করে। হেগে দেয়।

পেচ্ছাব করতে জ্বালা জ্বালা করে। শরীর কসে গেছে।

কিন্তু কয়েক ফোঁটা পড়তে, পেচ্ছাবের রঙ দেখেই চিড়িক খেলে যায় মাথায়। দুর্দান্ত একটা মতলবের চিড়িক।

'চললে কোথা? এই—এই—চান না করে—'

গগন কলতলায় যায়।

পেচ্ছাব বন্ধ করে গগন তাড়াতাড়ি শিকল খুলে দোকানঘরে ঢুকে পড়ে। লাইট জ্বালিয়ে ভেতর থেকে দরজায় হুড়কো তুলে দেয়।

বাইরে ছবি হাঁকডাক শুরু করেছে, দরজা ধাক্কাচ্ছে, ভ্রুক্ষেপও করে না।

বাজার থেকে তেল উধাও। যার যা খুশি ভেজাল দিচ্ছে। গরমেণ্ট দাম বেঁধে দেওয়ায় কলওলারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিনা ভেজালে বাঁধা দরে তেল তারা দেবে না।

গরমেণ্ট তাতে অবিশ্যি রা কাড়েনি, কিন্তু খাঁটি তেল বেশি দামে বেচায় রামহরিকে পাড়ার হাকিম মারফত জেলে পুরে দিয়েছে।

মনে পড়ে। ধোয়ান মানুষটার সেকী ভেউ ভেউ কান্না! বুকে তখন মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

এখন জমাট বাঁধে দুই চোয়াল: ভেজাল দিলে দোষ নেই। কেননা

তেলের কারবারেও শশী যাঁরা আছে। তারা জানিয়ে দিয়েছে ভেজাল দেবে। দিচ্ছেও। তিসির তেল, হোয়াইট অয়েল। যার যা খুশি।

যা খুশি! খুশিতে গগন দাঁতে দাঁত ঘষে।

ষোল কিলো ভাঙা টিনটার ওপর থেকে চটের থলেটা সরায়। ঢাকনাটা বেঁকিয়ে ফাঁক করে আঙুল ডুবিয়ে নিয়ে আলোয় তুলে ছাখে: এক। প্রায় এক রঙ!

দু হাতে কাপড় সরিয়ে তেলের টিনে হুমড়ি খেয়ে পড়েই গগন থমকে যায়: তেলে-জলে মিশে খায় কি? সরষের তেলে তিসির তেল চলে, হোয়াইট অয়েল চলে, কিন্তু—

ধাঁধায় পড়ে যায়।

এমনিতে তেলে-জলে মিশ খায় না বটে, কিন্তু এক পুকুর তেলে পাঁচ কুইন্টল জল দিলে? চার কুইন্টল দিলে? তিন কুইন্টল দিলে? দুই কুইন্টল দিলে? কিলো দশেক দিলে?

এই কিলো দশেক তেল, না, দশ নয়, কম করে নয়ই ধরো—এই নয় কিলো তেলে,—নয় কেন, আরো আছে—ষোল কিলোর তিনটে, চার কিলোর দুটো, দু কিলোর দুটো, এক কিলোর—না, এক বা আধ কিলোর টিন সে রাখে না—তাহলে তোমার মোট হল গিয়ে উনসত্তর।

উনসত্তর কিলোয় কতটা জল মেশানো যায়? এই জল? প্রায় তেলের রঙের জল? যে-জল সরাসরি পড়শীদের মুখে ছাড়া সম্ভব নয়, অথচ যে-জল তাদের গেলাবার জন্যে প্রাণটা গগনের আঁকুপাকু করছে।

পাঁচকিলো? চার কিলো? তিন কিলো? দুই কিলো? এক কিলো? উনসত্তর কিলোয় এক কিলো?

ন শো গ্রাম? আটশো গ্রাম? সাতশো গ্রাম? ছশো গ্রাম? উনসত্তর কিলোয় ছশো গ্রাম?

পাঁচ শো গ্রাম? চারশো গ্রাম? তিনশো গ্রাম? উনসত্তর কিলোয় তিনশো গ্রাম?

দুশো গ্রাম? একশো গ্রাম?

পঞ্চাশ গ্রাম?

পঁচিশ ফোঁটা?

কয়েক ফোঁটা?

একটা ফোঁটা? একটা ফোঁটা অন্তত! উনসত্তর কিলোয় একটা ফোঁটা অন্তত—

ভগবান! হিসেবে দিশে না পেয়ে আক্রোশে জ্বালায় দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে ঘৃণায় হতাশায় অন্ধ অসহায় গগনের সারা শরীর অকথ্য উত্তেজনায় থর থর করে, দুই চোখ ফেটে জলে চারদিক ঝাপসা হয়ে আসে।

ভগবান! কুলুঙ্গির গণেশের দিকে তাকিয়ে গগন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে: সাহস দাও সাহস দাও সাহস দাও! এক ফোঁটা অন্তত মেশাবার সাহস দাও ভগবান!

প্রতিরোধ ॥ রেনেতো গুত্তুসো

রেনেতো গুত্তুসো হলেন ইতালীর প্রগতিশীল চিত্রশিল্পীদের অগ্রগণ্য। ফাশিস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইতালীতে যে জন-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাঁর শক্তিশালী তুলির টানে গুত্তুসো তা অমর করে রেখেছেন। গুত্তুসোর সেই আশ্চর্য প্রাণবন্ত চিত্রাবলী থেকে নির্বাচিত ছবি বাংলা দেশের শিল্পরসিকদের উপহার দিতে পেরে আমরা গর্বিত।

সম্পাদক **পরিচয়**

বিনয় ঘোষ

শিবচন্দ্র দেব : ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ

ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনকে অভিন্ন করে দেখেছেন, এবং ব্যষ্টি-সমষ্টির ব্যবধানকে মনের অবচেতন কোণ থেকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে সমষ্টি-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন, এরকম দৃষ্টান্ত শুধু আমাদের সমাজে নয়, সমস্ত মানবসমাজে বিরল। বাংলাদেশে উনিশ শতকের নবজাগরণকালে এরকম বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে কোন্নগরবাসী শিবচন্দ্র দেবের জীবন অন্যতম। তাঁর জীবনের দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হল এই যে কর্মমুখর জীবনের সঙ্গে সারাজীবন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখেও, তিনি কখনও প্রচারের কোলাহল কাম্য বলে মনে করেন নি। উনিশ শতকের প্রথম প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৮০ বছর তাঁর জীবন বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ জীবনের প্রস্তুতির প্রথম বছর কুড়ি বাদ দিয়ে বাকি ৬০ বছর শিবচন্দ্র নিরলস কর্ম-সাধনা করেছেন। এই সাধনার জন্য একটি 'আদর্শ' তিনি জীবনের সামনে স্থাপন করেছিলেন, যে-আদর্শ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুসরণ করা দুরূহ। উনিশ শতকের দুটি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল সামাজিক আদর্শ তাঁর জীবনে মিলিত হয়েছিল—একটি রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ, আর একটি ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শ। দুটি আদর্শের যা-কিছু ভালো তা তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিলেন, এবং যা কিছু মন্দ তা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বর্জন করে চলেছিলেন।

আমার মতে শিবচন্দ্রকে সর্বপ্রথম বলা উচিত 'ডিরোজীয়ান', অর্থাৎ ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্যদের গোষ্ঠীভুক্ত, যে-গোষ্ঠী একদা 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে ১৮২৫ সালে শিবচন্দ্র কোন্নগরের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তার এক বছরের মধ্যে ১৮২৬ সালের মাঝামাঝি ডিরোজিও শিক্ষকরূপে হিন্দুকলেজে যোগদান করেন। হিন্দু কলেজের জীবনে তারপর এক নতুন পর্বের শুরু হয়, যে-পর্ব অতি সংক্ষিপ্ত হলেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে

নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। প্রায় সাড়ে ছ' বছর শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ডিরোজিওর শিক্ষকতাকাল সম্পূর্ণ তাঁর ছাত্রজীবনের মধ্যে পড়ে। নিজের জীবনের দিক থেকেও এই সময়টা ছিল তাঁর বয়ঃসন্ধিকাল, কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণকাল। জীবনের প্রাথমিক বৃত্ত পারিবারিক প্রভাবকেন্দ্র ছেড়ে এই সময় আমরা সামাজিক জীবনের বৃহত্তর বৃত্তে প্রবেশ করি। সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে, সুস্থিরচিত্তে প্রবেশ করি না, কারণ সুস্থিরতা যৌবনের ধর্ম নয়। পরিবারের পিতামাতার প্রভাব থেকে তখন আমরা বেশ খানিকটা দূরে চলে যাই এবং তখন স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও সমবয়সী ছাত্রবন্ধুদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। শিবচন্দ্রের জীবনে এই সময় হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর তারুণ্যোজ্জ্বল নির্মল বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব যেমন বাংলার আরও অনেক প্রতিভাবান তরুণকে সেদিন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল, তেমনি করেছিল তাঁর প্রিয় ছাত্র শিবচন্দ্র দেবকেও। তাছাড়া, ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা, যাঁরা ইয়ংবেঙ্গল নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন শিবচন্দ্রের সহপাঠী বন্ধু। তাঁদের প্রভাবও তাঁর যৌবনচিন্তায় যে বেশ খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়াতে হিন্দুসমাজে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল তার ঝাপ্‌টা যে দলভুক্ত শিবচন্দ্রকে একেবারে সহ্য করতে হয়নি তা নয়। কলেজের তরুণ হিন্দু ছাত্রদের স্বধর্ম-বিদ্বেষী হতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে—এই অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওর বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা কুৎসা রটনা করেন এবং তার ফলে ডিরোজিও শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এমন কি, কৃষ্ণমোহন রসিককৃষ্ণ দক্ষিণারঞ্জনের মতো তাঁর ছাত্রদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তখন চারিদিক থেকে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। ঘটনার বিচিত্র চক্রান্তে যৌবনের প্রারম্ভেই প্রায় তাঁদের জীবন বিপর্যস্ত ও কেন্দ্রচ্যুত হবার উপক্রম হয়। এই ঝড় ও সংকট, এই নীতিবিরোধ ও আদর্শবিরোধ, শিবচন্দ্র স্বচক্ষে ঘটনাবর্তের ভিতরে থেকে প্রত্যক্ষ করেন। এই সামাজিক সংকটের সন্ধিক্ষণে তাঁর ছাত্রজীবন, অর্থাৎ হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পালা শেষ হয় এবং 'সকল অনিষ্টের মূল' ডিরোজিওরও অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, মাত্র ২২ বছর বয়সে। শিবচন্দ্রের বয়স তখন কুড়ি। শিক্ষক ও ছাত্রের বয়সের ব্যবধান নগণ্য বলা চলে। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গেও ডিরোজিওর বয়সের ব্যবধান এই রকম সামান্যই ছিল।

ডিরোজিওর যখন মৃত্যু হয় শিবচন্দ্রের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। এই সময় তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনও শেষ হয়। ছাত্রজীবনে তিনি নবযুগের জন্মকালের সামাজিক আলোড়নের প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করেন এবং এই সময় নিশ্চয় তাঁর মানসতাও একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের যাঁরা অত্যন্ত মুখর মুখপাত্র ছিলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক—তাঁদের মতো ইয়ংবেঙ্গল দলের একজন 'firebrand' হিসেবে তিনি তখন, অথবা তার পরেও কখনও, আবর্তের মুখোমুখী এসে দাঁড়ান নি। তাঁর প্রকৃতিতেই মুখর হয়ে ওঠার প্রবণতা কোনোদিন ছিল না বলে মনে হয়। রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য ডিরোজিয়ানদের মতো শিবচন্দ্র শান্ত ও নীরব ছিলেন। শান্ত চিত্তে তিনি তাঁর অশান্ত তরুণ বন্ধুদের সমাজ-সংগ্রাম লক্ষ্য করেছেন, হঠাৎ বিচলিত বা উত্তেজিত হননি। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে যৌবনে তাঁর সান্নিধ্য ছিল ঘনিষ্ঠতম এবং এই সান্নিধ্যের প্রভাব-বশতঃই তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের মৌল রূপায়ণ হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁকে "ডিরোজিও বৃক্ষের অতি মধুর ফল" বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি লিখেছেন: "সত্য সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল।" কিন্তু প্রশ্ন হল— ডিরোজিওবৃক্ষের এই মধুর ফলটি কেন প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্যে, অথবা বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে, সেদিন ইয়ংবেঙ্গলের সংগ্রামের পথ নিজের জীবনের চলার পথ বলে বেছে নেন নি। অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইয়ংবেঙ্গলের গুরু, এবং তাঁর নিজের গুরু ও শিক্ষক ডিরোজিওর কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, অবকাশ পেলে তাঁর সম্বন্ধে নানারকমের গল্প সকলের কাছে করতেন। তাঁর আদর্শ, তাঁর চরিত্র, তাঁর নিষ্ঠা, শিবচন্দ্রের মানসচক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল তারার মতো দীপ্তিমান ছিল। কাজেই ডিরোজিওর নৈতিক প্রভাব তাঁর যুবচরিত্রে গভীর ও ব্যাপক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন তিনি ডিরোজীয়ানদের সমাজসংস্কারের পথ নিজে বেছে নেন নি? কেন তিনি তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের সামাজিক আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে ভেসে চলে যান নি? ইয়ংবেঙ্গলের নীতি ও পথ সম্বন্ধে কি কোনো দ্বিধা-সংশয় তাঁর মনে জেগেছিল? যদি জেগে থাকে, তাহলে কি কারণে জেগেছিল, সমাজের আর কোথায় তখন সেই জাগরণের প্রেরণা ছিল? পরস্পর-জড়িত প্রশ্ন, এবং এই

প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে শিবচন্দ্রের ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের বিকাশের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিবচন্দ্রের ছাত্রজীবনে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের উৎক্ষিপ্ত সামাজিক আবর্তের পাশাপাশি আরও একটি বৃহৎ আবর্ত রচিত হয়েছিল বাংলাদেশে। এই আবর্ত রচনা করেছিলেন রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী অনুগামীরা। রামমোহনের অনুগামীদের সংখ্যা তখন নিতান্তই মুষ্টিমেয় ও সমাজের বিশিষ্ট উচ্চস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবু তার সংঘাত যে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে পৌঁছেছিল তার কারণ রামমোহন এক ভয়ঙ্কর ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছিলেন। জেনে শুনে, সুদূরপ্রসারী সামাজিক ফলাফলের কথা চিন্তা করেই এই ঢিল তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন, যুগে যুগে—দেশে দেশে—সামাজিক প্রগতির সমস্ত দিগ্‌দর্শকদের যেমন করতে হয়েছে। শুধু মানবোচিত সাহস থাকলেই সামাজিক সংকটকালে জনসমাজের পথপ্রদর্শক হওয়া যায় না—কিছুটা অতিমানবোচিত দুঃসাহসও থাকা চাই, আর চাই পরিষ্কার ঝকঝকে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি। এই দুঃসাহস, এই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি বাংলাদেশে উনিশ শতকে দু'জন যুগপুরুষের মধ্যে দেখা গিয়েছিল—প্রথম পর্বে রামমোহনের মধ্যে, দ্বিতীয় বা মধ্যপর্বে বিদ্যাসাগরের মধ্যে। শিবচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন ১৮২৮ সালে তিনি রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা দেখেছেন, সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য করেছেন, ১৮২৯ সালে দেখেছেন সতীদাহপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিপুল প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করেছেন কূপমণ্ডুক হিন্দু সমাজে। ধর্মধ্বজী হিন্দুরা প্রচণ্ড আক্রোশে 'ধর্মসভা' স্থাপন করলেন ১৮৩০ সালে, এবং তাঁদের হুঙ্কারের আড়ম্বর দেখে 'ইয়ংবেঙ্গল' দল 'ধর্মসভা'র নাম দিলেন 'গুড়ুম সভা'। যত রকমের কুশ্রী কুৎসা একজন মানুষের বিরুদ্ধে রটনা করা সম্ভব, রামমোহনের বিরুদ্ধে ধর্মসভাপন্থীরা তা রটনা করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। রামমোহন খ্রীষ্টান, রামমোহন ইসলামপন্থী, রামমোহন ব্যভিচারী ও ভোগবিলাসী—এসব তো বলা হলই, উপরন্তু তাঁকে শাসানো হল যে পথেঘাটে তাঁকে অপদস্থ করা হবে, প্রহার করা হবে, হত্যাও করা হতে পারে। কোনো শাসানিতেই রামমোহন অবশ্য বিচলিত হননি, নিয়মিত তিনি একাই অধিকাংশ দিন এই সময় মানিকতলায় তাঁর বাড়ি থেকে চিৎপুরে ব্রাহ্মসমাজের

প্রার্থনাসভায় যাতায়াত করতেন। কিন্তু রামমোহন কিছুদিনের মধ্যেই বিলাতযাত্রা করেন এবং সেখানে ১৮৩৩ সালে, ডিরোজিওর মৃত্যুর দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, তাঁর মৃত্যু হয়।

অকস্মাৎ রামমোহন ও ডিরোজিও উভয়ের মৃত্যুর ফলে প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকদের শিবিরে ভাঙন ও সংকট দেখা দিল। শিবচন্দ্র তাঁর ছাত্রজীবনে রামমোহন ও ডিরোজিও—উভয়কেই কেন্দ্র করে গোঁড়া হিন্দুসমাজে যে ঝড় উঠেছিল, তার গতি ও বেগ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, ঝড়ের কেন্দ্রস্বরূপ দু'জন ব্যক্তি পৃথক হলেও, ঝড় পৃথক নয়। অর্থাৎ ঝড় যাঁরা তুলেছেন, প্রচণ্ড সামাজিক সোরগোল সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ রামমোহন আর ইউরেসিয়ান ডিরোজিও অভিন্নসত্তা। ডিরোজীয়ানরা যা, রামমোহনপন্থীরাও তাই, অন্তত ধর্মসভাপন্থীদের কাছে। ডিরোজীয়ান শিবচন্দ্র দেবের কাছেও তখন রামমোহন-ডিরোজিওর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিছু চোখে পড়েনি। তিনি যেমন ডিরোজিওর গৃহের বৈঠকখানায় ও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় যাতায়াত করতেন, তেমনি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসভাতেও মধ্যে মধ্যে যোগদান করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস'-গ্রন্থে শিবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন : "As a student he occasionally attended the meetings of the Brahmo Sabha, established by Raja Rammohan Roy in 1828, and his admiration for the Raja taught him to sympathise with the principles of the Brahmo Samaj even from that early date." অর্থাৎ রামমোহনের কলকাতায় অবস্থানকালে 'ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিবচন্দ্র দেব তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর যে শিক্ষক-ছাত্র ও গুরু-শিষ্যের প্রত্যক্ষ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক গড়ে তোলার সৌভাগ্য ও সুযোগ রামমোহনের সঙ্গে ছাত্রজীবনে হয় নি। পরে যখন হবার কথা, তার আগেই রামমোহন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তবু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাঁর মনে তখন থেকেই প্রোথিত হয়ে ছিল। পাশাপাশি ডিরোজিওর শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তবু কেন তিনি তাঁর যৌবনের বন্ধু ডিরোজীয়ানদের অনুগামী হলেন না ?

শিষ্যরা দেখা যায় চিরদিনই গুরু-মারা বিদ্যায় দক্ষ ও অভ্যস্ত। ডিরোজিওর শিষ্যরা, ডিরোজিওর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে

অনেক দূরে সরে গেলেন। অবশ্য তাঁরা খেয়ালের বশে যাননি, যেতে অনেকটা ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক নিউটনের Law বস্তুজগতে যেমন সত্য, সমাজ-জীবনেও তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম সত্য নয়। Action ও তার Re-action সব সময় equal ও opposite হতে বাধ্য। প্রতিভাবান তরুণ ইয়ংবেঙ্গল দলকে অনেকটা কেন্দ্রচ্যুত ও উন্মার্গ করেছিলেন 'ধর্মসভা'র পাণ্ডারা। তাঁদের বিজাতীয় আক্রোশ ও সদম্ভ আস্ফালনের সামনে ইয়ং বেঙ্গল দল ধৈর্য রাখতে পারেন নি। তরুণদের ভাবাতিশয্য বা extremism হয়তো বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু কখনও তা ক্ষমার অযোগ্য নয়। তারুণ্যের স্বভাবধর্মই হল ভাবাতিশয্য। কিন্তু সমাজের পক্ককেশ প্রবীণের দল, সেদিন যাঁরা তরুণদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিষোদ্‌গীরণের কদর্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এমন কি নিজেদের মুখপত্রে পর্যন্ত কুৎসা-গালিগালাজের ভাষার শ্লীলতা পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি, স্বয়ং ঈশ্বরও বোধ হয় তাঁদের ক্ষমা করতে নারাজ হবেন। এইজন্য তরুণ ইয়ংবেঙ্গলের উন্মার্গতা ইতিহাসের বিচারে মার্জনীয়। বন্ধুদের ক্রুশবিদ্ধ হবার মতো অবস্থা দেখে শিবচন্দ্র দেবের মনোভাব সেদিন কি হয়েছিল, আজ তা জানবার উপায় নেই। নিশ্চয় তিনি মর্মান্তিক বেদনা বোধ করেছিলেন। একথাও বুঝেছিলেন যে ধর্মসভাপন্থীদের প্ররোচনায় হিন্দুধর্মের প্রতি 'বিদ্বেষ' পোষণ করা অর্থহীন। তা ছাড়া উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই তিনি বাংলার সমাজ-জীবনে আরও একটি কৃষ্ণছায়ার সঞ্চরণ লক্ষ্য করেছিলেন—সেটি খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ছায়া। মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর এই সময় খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে বিপুল উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় এবং ইয়ংবেঙ্গল দল ধর্মসভাপন্থীদের বিষোদ্‌গারে জর্জরিত হয়ে মিশনারীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চক্রান্তে সহায় হন। নিজেরাও তাঁরা কেউ কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্রের কাছে এ পথ সমর্থনযোগ্য মনে হল না। গৃহসংস্কারের পথ গৃহবিচ্ছেদ নয়, গৃহের ভিত পর্যন্ত উপড়ে ফেলা নয়, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেন।

উনিশ শতকের তিরিশে সমাজের অবস্থা যখন এইরকম উভয়সংকটের কৃষ্ণছায়াচ্ছন্ন, তখন রামমোহনের অবর্তমানে তাঁর ব্রাহ্মসমাজের দীপশিখাটিও নিভ-নিভ প্রায়। কোনপ্রকারে কিছু তৈল সংযোগ করে তাকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো দু-একজন রামমোহনের একান্ত

অনুরাগী বন্ধু। তখন ব্রাহ্মসমাজেও কিছু করবার সুযোগ ছিল না, বিশেষ করে শিবচন্দ্রের মতো একজন সহায়হীন যুবকের পক্ষে। কাজেই ছাত্রজীবন শেষ করে শিবচন্দ্র চাকরিজীবনে প্রবেশ করলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলের চাকরি করার প্রয়োজনও ছিল। প্রথমে সার্ভে অফিসে কম্‌পিউটারের কাজে তিনি যোগ দেন, তারপর ডেপুটি-কলেক্টর হয়ে, তখনকার আরও অন্যান্য ইংরেজিশিক্ষিত যুবকের মতো, শিবচন্দ্র প্রথমে যান বালেশ্বরে, তারপর মেদিনীপুরে এবং শেষে ২৪পরগণায় বদলি হয়ে কলকাতায় আলিপুরে আসেন। ৫২ বছর বয়সে, ১৮৬৩ সালে তিনি চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকরিজীবনে প্রবেশ করে শিবচন্দ্র typical মধ্যবিত্ত চাকুরেতে পরিণত হন নি। স্বচ্ছন্দে হতে পারতেন, কারণ নিজের পরিবারে তাঁর মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, তার উপর ডেপুটি-কলেক্টরের পদ তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ বলে গণ্য হত। শিবচন্দ্র নিছক চাকরিজীবী হতে পারেন নি, কারণ রামমোহন বা ডিরোজিও কারও আদর্শ তিনি ভুলতে পারেন নি, এবং সেই আদর্শের আলোতে সমাজকল্যাণ ও সমাজসংস্কারের চিন্তায় সর্বদাই তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন।

এমন সময় উনিশ শতকের তিরিশের শেষ দিক এবং চল্লিশের গোড়া থেকে সংকটের কৃষ্ণছায়ার মধ্যে নতুন আলোর রশ্মি দেখা গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আলোকের দূত হয়ে এলেন, ব্রাহ্মসমাজের ভগ্ন মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন নতুন আশার বাণী নিয়ে। এদিকে দশ বছরের মধ্যে ইয়ং-বেঙ্গলের তারুণ্যের আবেগ-উচ্ছ্বাস অনেকটা সংযত ও স্থির হয়ে এল। 'এনকয়ারার' 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর পর্ব অতিক্রম করে তাঁরা 'Bengal Spectator'-এর স্থিরধীর সংযত, অথচ বলিষ্ঠ সংগ্রামপর্বে উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হল, ১৮৪৩ সালে ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং পৌষ মাসে দেবেন্দ্রনাথ আরও ২০ জন কর্মীসহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?" বাস্তবিকই তাই। মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজে নবজীবনের স্পন্দন সঞ্চারিত হল।

এই সময় শিবচন্দ্র দেব বালেশ্বর থেকে ডেপুটি কলেক্টরের কাজে মেদিনীপুরে

বদলি হয়ে এলেন—১৮৪৪ সালে। উৎসাহে ও আনন্দে তিনিও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র একজন উৎসাহী সভ্য হলেন তিনি, এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। মনে রাখা দরকার, ইয়ংবেঙ্গল বা ডিরোজীয়ানদের মধ্যে অনেকেই এই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার প্রশ্ন তখনও তাঁর মনে জাগেনি, কিন্তু তার আদর্শপ্রচারে আত্মোৎসর্গ করা যেতে পারে, এ সিদ্ধান্ত তখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সে সম্বন্ধে তখন তাঁর পরিণত মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার অনেক আগেই তিনি তার আদর্শপ্রচারে ব্রতী হন। মেদিনীপুরে এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করতে উদ্‌যোগী হন। কলকাতা শহরেই যখন ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজেব নাম শুনলে সাধারণ হিন্দুসমাজে হৃদ্‌কম্প হত, এবং ধর্মধ্বজীরা মারমুখী হয়ে উঠতেন, তখন মেদিনীপুরের মত গ্রাম্য পরিবেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সংকল্প করা যে কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া তা আজ কল্পনাও করা যায় না। এই দুঃসাহস তাঁর ছিল। রাজনারায়ণ বসু—যিনি শিবচন্দ্রের পরে মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করেন—তিনি শিবচন্দ্রেব এই দুঃসাহসিক কীর্তি সম্বন্ধে লিখেছেন: "এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন জন্য শিবচন্দ্রবাবুর উপর কত কটুকাটব্য বর্ষিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন।" এই দুঃসাহস, এই অপরাজেয় নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা. এই একান্ত দুর্লভ কর্তব্যপরায়ণতা—এইগুলি হল ডিরোজীয়ানদের চরিত্রের মূল উপাদান। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ, মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ডিরোজীয়ানদের চরিত্রের এই মূল উপাদানগুলি—শত বাধা-বিপত্তি প্রলোভন-প্ররোচনার মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে ছিল। শিবচন্দ্রের চরিত্রেও এর এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি।

১৮৫০ সালে আলিপুরে ডেপুটি-কলেক্টর হয়ে আসার পর কিছুদিনের মধ্যে শিবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং পরে স্ত্রীপুত্র ও পরিবারের সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। তারপর বাকি একটানা প্রায় ৪০ বছর তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করেন। সমাজসংস্কার ও সমাজ-কল্যাণের কাজ এই আদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, কাজেই এই দুটি কাজই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য কাজ, বাকি কাজ ছিল গৌণ। 'সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার প্রথম সম্পাদক হন এবং তারপর ১৮৮০ সাল থেকে একটানা প্রায় ৭।৮ বছর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির কাজ করেন। স্বগ্রাম কোন্নগরের জন্য তিনি করেন নি এমন কোনো সমাজ-কল্যাণকর কাজ আছে কিনা সন্দেহ। আধুনিক যুগ ও জীবনের উপযোগী যা কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কোন্নগরে আছে—ইংরেজী স্কুল, বাংলা স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ, পোস্ট আফিস, রেল স্টেশন পর্যন্ত—সবই তাঁর কীর্তিচিহ্ন।

শিবচন্দ্র দেবের ব্রাহ্ম জীবনধারা সম্বন্ধে একটি কথা বলে আজকের মতো আমার বক্তব্য শেষ করব। ইতিহাসে দেখা যায়, সমস্ত সমাজ-সংস্থায় ক্রমে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ঘটতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজেও ঘটেছে। আদর্শের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথমে মহর্ষি ও তরুণ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের মধ্যে মতভেদ হয়েছে—তারপর কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ ও কার্যকলাপ নিয়ে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁরও মতবিরোধ ঘটেছে। এই বিরোধ ও সংঘর্ষ স্বাভাবিক—অনেকটা প্রবীণ ও নবীনের বিরোধ বলে একে অভিহিত করা যায়। শিবচন্দ্রের জীবনে দেখা যায়—যখনই ব্রাহ্মসমাজে এরকম প্রবীণ-নবীন, স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে, তখনই তিনি নবীনদের পক্ষে যোগদান করেছেন। রামমোহনের পর তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিবচন্দ্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী—ব্রাহ্মসমাজের প্রথম মতভেদ ও বিচ্ছেদের সময় তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের সমর্থক—তারপর কেশবচন্দ্র যখন কন্যার বিবাহে, অবতারবাদ ইত্যাদির প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ থেকে দূরে সরে যেতে থাকলেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তাঁর মতো সদাচারী ধীরস্থির শান্তপ্রকৃতির মানুষ দেখা যেত না। বয়সেও তখন তিনি বেশ প্রবীণ ছিলেন বলা চলে। কিন্তু তাঁর মনের নবীনতা অতি প্রবীণ বয়সেও নষ্ট হয় নি। কেবল নবীন নয়, মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী—এবং সেই বিদ্রোহীর মনোভাব সারাজীবন ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বিদ্রোহ তাঁর স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে, দলগত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাবের বিরুদ্ধে, সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহই হল প্রকৃত ডিরোজীয়ানের বিদ্রোহ, এবং এই চরিত্রই প্রকৃত ইয়ংবেঙ্গলের চরিত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী শিবচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন: "Indeed he was a living embodiment of an ideal Brahmo life." এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এর সঙ্গে শুধু এইটুকু যোগ করা যেতে পারে যে—'he was also the living embodiment of an ideal Derozian.' *

---

* কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজগৃহে শিবচন্দ্র দেবের জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানে (১৯৬৩) প্রদত্ত ভাষণ।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ ও মানবিকতা

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনা মনে আসছে। আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন এক বন্ধু বিদেশে বসে অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগ সংবাদ পেয়েছেন জেনে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গিয়ে তাঁকে দেখলাম মূহ্যমান অবস্থায়। তিনি তখনই ছিলেন বহু বৎসর ধরে প্রবাসী। স্বদেশের শিক্ষিত সমাজে মানসিকতার দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা, এবং জীবনযাত্রার প্রণালীতে বহু কণ্টকের অভিজ্ঞতা তাঁর দেশাভিমানী চিত্তে এমন আঘাত এনেছিল যে বিদেশের পরিচিত হলেও অনাত্মীয় ও কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিম পরিবেশে বাস করার অসুখী সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন; আজও তিনি বার বার মনেপ্রাণে ফিরতে চেয়েও দেশে ফিরতে পারেন নি। অনপনেয় অস্বস্তি তাঁর জীবনের সঙ্গী হয়ে থেকেছে, যা নিয়ে হয়তো উপন্যাস লেখা চলে, কিন্তু তা হল ভিন্ন ব্যাপার। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক অটুট বলে সদ্য মাতৃহীন অবস্থায় বিলাপ করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম একটি কথা যা এখনও এতদিন পরেও ভুলতে পারি নি। পরদিনই তাঁকে দেখলাম বাহ্যত সুস্থ, সংযত, স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন মনের রাশ তিনি ধরে রাখতে পারেন নি, আর বলেছিলেন: আমাদের সত্তার শিকড় যে-মাটিকে ছুঁয়ে আছে সেটা ইয়োরাপ নয়, সেখানে আমরা বহিরাগত অতিথি ছাড়া কিছু নই। স্বদেশের প্রতি অভিমান এবং জীবনের সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সুশোভন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মায়া মিলে যাঁকে প্রায় চল্লিশ বৎসর প্রবাসী জীবনের অকাট্য একাকিত্বের অভিশাপকে অভ্যর্থনা করিয়ে রেখেছে, তাঁর মুখে শুনেছিলাম আমাদের সত্তার শিকড় যে-মাটিকে ছুঁয়ে আছে সেটা ইয়োরোপ নয়, কখনও হতে পারে না।

কোনো কথাই সম্ভবত শেষ কথা নয়—যে-কথা উদ্ধৃত করলাম তা তো নিশ্চয়ই শেষ কথা নয়, হয়তো বা নির্ভুলও নয়, হঠাৎ ধাক্কা-খাওয়া মনের পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। ব্যঞ্জনা তার গভীর হতে পারে কিন্তু চরম

মূল্য তার নেই। তবু এই কথাটি নিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করার উদ্দেশ্য একটা রয়েছে। প্রায়ই দেখি আমাদের নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে আমরা এদেশে যথোপযুক্ত ভাবে সচেতন থাকি না, এবং প্রধানত ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অর্ধ-পরিচয়ের ফলে পশ্চিম মহাদেশের দেদীপ্যমান সভ্যতার আলো মাঝে মাঝে আমাদের চোখ শুধু যে ঝলসে দিয়েছে তা নয়, এক অদ্ভুত (এবং কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক) মোহাঞ্জনে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন পর্যন্ত করে রেখেছে। তাই যাঁদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে থাকি তাঁদের মতো অসুখী বোধ হয় কোথাও কেউ নেই। মানসিকতার প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে মূলত পরবশ হওয়ার চেয়ে দুঃখ তো থাকতে পারে না। আত্মবশ হওয়ার মধ্যে যে সুখ তা আমাদের অধিকাংশ চিন্তাজ্বরস্পৃষ্ট শিক্ষিতের অনায়ত্ত। নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে একপ্রকার শঙ্কিত এবং হয়তো বা উপেক্ষা যেন প্রায় আমাদের মনের অগোচরে বিরাজ করছে বলে সে-বিষয়ে চিন্তার দ্বার আমরা বন্ধ করে রেখেছি। যে-সত্তার অস্তিত্ব আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অকাট্য তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে তাই সংকোচ বোধ করে থাকি। একটু ত্রস্ত পর্যন্ত হয়ে পড়ি হয়তো বা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করার মতো অভিজ্ঞতার আশংকায়, আর নিজের কাছে জবানদিহি না করেই যা হল কর্তব্যকর্ম তা থেকে নিবৃত্তির সহজ আশ্রয় খুঁজি।

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে যুগে যুগে আমাদের মধ্যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা এসেছেন কোনো গুহ্য শক্তির অবতাররূপে নয়, শুধু এসেছেন এমন মানবমহিমা নিয়ে যে তাঁদেরই সম্বন্ধে কবি বলেছেন : "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে··· ।" এই দেবদীপবাহী মানুষ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে :

"···আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' ; আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাইতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন

নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

আমাদের এই সার্বভৌম কবির ছিল সর্বভূমিতে বিচরণ, সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, সর্বদেশে অধিষ্ঠান, সর্বমানবীয় আস্বাদে ও আকুলতায় তাঁর শিল্পীসত্তার পুষ্টি, সর্বজনের অন্তরে তাঁর আধিপত্য। অথচ তাঁর মনের, তাঁর হৃদয়ের, তাঁর আত্মার ভিত্তি প্রোথিত ছিল ভারতভূমিতে, এদেশের মাটি আর জল আর বায়ু মাতৃস্নেহসিঞ্চনে তাঁর প্রাণশক্তির উদ্রেক ও উদ্দীপনা ঘটিয়েছে। এজন্যই ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতা এবং তারই বিচিত্র অনুষঙ্গ রূপে শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীনৃত্যমান ছন্দের মধুরিমা তাঁকে মুগ্ধ করলেও কখনও অভিভূতি বলে কক্ষচ্যুত করতে পারে নি। এজন্যই তাঁর মধ্যে দেখেছি অধুনাতন যুগের ভারতবর্ষীয় মানবিকতার প্রোজ্জ্বলতম ব্যঞ্জনা; রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণে যে পরম্পরার প্রতীক, তাকেই বহুধা বিচ্ছুরিত প্রতিভার ভাস্বর ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে আমাদের সকল প্রতীক্ষা পরিতুষ্ট হয় নি, হবারও কোনো হেতু ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের মানবিকতা তাঁর এবং মহাত্মা গান্ধীর যুগ্মজীবনে প্রকাশ পেয়েছে—এই যুগল বিভূতির ভাতি নিয়ে অহংকারে কোনো প্রত্যবায় ঘটে না।

হয়তো অপ্রসন্ন প্রতিবাদ শুনব: এই দুই ব্যক্তির মানবিকতার মধ্যে বিপুল প্রভেদ রয়েছে—অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী বিভিন্ন হলেও গঙ্গাযমুনা কি সহোদরা নয়? হয়তো বা বৈদগ্ধ্যের উচ্চভূমি থেকে ইতরজনের স্পর্ধিত অজ্ঞতা সম্বন্ধে ঈষৎ-পুলকিত ঔদাসীন্যের কণ্ঠে মন্তব্য শোনা যাবে: সংসারবিমুখিতা যে দেশের চিন্তায় প্রকট, আধ্যাত্মিকতার বিচিত্র নাগপাশে যে দেশের হৃদয়মন বাঁধা, জাতিধর্মভেদাভেদের বিড়ম্বনায় যে দেশের ইতিহাস অভিশপ্ত ও প্রগতি স্তিমিত, সনাতন অনুশাসনে যে দেশ বিশ্বাসী, প্রাচীনপন্থা যেখানে জীবনের সর্বস্তরে মজ্জাগতপ্রায়, "আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহীসুত বিশ্ববিধাতৃর," এই ধ্বনি যে দেশে অসুস্থ, অবাস্তব, মনোবিকার বলে ধিক্কৃত, সে দেশে বাক্যের যদি কোনও তাৎপর্য থাকে, গুরুত্ব থাকে, তো মানবিকতা শব্দটির উল্লেখ না করাই সমীচীন। এই সম্ভ্রান্ত অথচ সুতীব্র সমালোচনাকে উপেক্ষা করা বাতুলতারই পরিচায়ক হবে; এই বক্তব্যের মধ্যে বহু যথার্থ তথ্য যে নিহিত রয়েছে, তাও অনস্বীকার্য।

বিদগ্ধজনের মানসিকতার পাণ্ডিত্যের কঠোর বিচারে অনুত্তীর্ণদের সম্বন্ধে যে অনীহা হয়তো অজ্ঞাতসারে প্রায়শ প্রকাশ পেয়ে থাকে তাতে ক্ষুব্ধ না হয়েই বলা উচিত যে ইতিহাসেরই অমোঘ বিধানে ইয়োরোপের মানবিকতা যে বস্তু (তার সংজ্ঞা অবশ্যই একান্ত দুরূহ), তার সঙ্গে ভারতবর্ষে মানবিকতা বলে বর্ণনীয় যদি কোনো ধারা থাকে তো তা তুল্যমূল্য না হতে পারে, সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে থাকলেও সাযুজ্যে সম্ভবত বহু প্রভেদ থাকতে পারে, উভয় ভূভাগে চিন্তা ও কর্ম যে-পরিচ্ছদে দেখা দিয়েছে তাতে গরমিলও ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো বলা ভুল হবে না যে মূলগত দিক থেকে বিচার করলে এদেশেও দেখা দিয়েছে মানবিকতা। প্রতীচ্যের মানবিকতা থেকে কোনো কোনো বিচারে বিভিন্ন হলেও যার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে ভারত-প্রতিভা প্রভাবিত হয়ে এসেছে এবং বিশ্বজনীন নবযুগসাধনায় যার বিশিষ্ট অবদান আছে। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্" বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পত্তন করেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে, জায়মান জগতের সঙ্গে আমাদের এই বয়োভারানত মহাদেশের আত্মীয়সম্পর্ক অসংকোচে এবং ঈষৎ দর্পভরেই ঘোষণা করেছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় 'মানবতা'র পরিবর্তে 'মানবিকতা' শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনাব্যপদেশে বহু মূল্যবান প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শান্তি বসু, শ্রীযুক্ত বার্নিক রায়, শ্রীযুক্ত অশোক রুদ্র প্রমুখ অনেকে এ-বিষয়ে পর্যালোচনায় নেমেছেন, স্বকীয় চিন্তাকে অকুণ্ঠে প্রকাশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকের কৃতজ্ঞতাই অর্জন করেছেন। এ-বিষয়ে সুযোগ ও সময় পেলে বারান্তরে কিছু বলার চেষ্টা করব। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও কর্মধারায় যে-গুণকে মানবিকতা আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয় তারই সমুজ্জ্বল অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াস করে ক্ষান্ত হব।

বিলম্বিত হলেও ভূমিকা হিসাবে অল্প কয়েকটি কথা এখানে বলে নিতে চাইছি। বিতর্কে আর বিতণ্ডায় নামতে আপাতত চাইছি না, কিন্তু আমার চিন্তার কয়েকটি সূত্র এখানে ধরে রাখতে চাই। প্রথম কথা এই যে উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের আনুষঙ্গিক প্রভাব রূপে এ দেশের জীবনে যে ওলটপালট এবং চিন্তারাজ্যে তার প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল এবং যার ফলে কথঞ্চিৎ বিকৃত ও পঙ্গু হলেও যে নবজাগরণ লক্ষিত হয়েছিল, তাকে 'পুনর্জন্ম'

(Renaissance) বলতে আমি অস্বীকৃত ; বহু মৌলিক মতভেদ সত্ত্বেও যে চিন্তাশীল বিদ্বান্‌কে আমি অগ্রজ বলে কাছে থেকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম সেই স্বর্গত কোবিদ্ কে. এম্. পাণিক্করকে অনুসরণ করে তাকে আমি ভারতবর্ষের 'আত্মসংবরণ' (Recovery) আখ্যা দিতে চাই। যদুনাথ সরকারের মতো ভক্তিভাজন ইতিহাসাচার্য উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে জাগরণ ঘটেছিল তাকে ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকের অতুলন 'নবজন্ম'-এর চেয়ে দীপ্তিমান্ যখন বলেছিলেন তখন অত্যন্ত সবিনয়ে হলেও তাঁরই জীবদ্দশায় প্রখর প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করি নি ; এই দুঃসাহসের জন্য নিন্দিত হয়েছি, কিন্তু লজ্জিত নই। দ্বিতীয় কথা এই যে গণতন্ত্র, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, শিল্পবিপ্লব, তত্ত্ব ও কর্মে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসিদ্ধ বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগপ্রচেষ্টার যে-ধারা আজ সর্বমানবের সম্পদ, তাকে একান্তভাবে প্রতীচ্যের অবদান এবং ভারতজীবনে অপরিচয়ের জড়তায় অস্থিরমতি এবং প্রায় অনাকাংখিত আগন্তুক মনে করার যে প্রবণতা কোনও কোনও চিন্তাশীল বিদ্বানের বক্তব্যে লক্ষ্য করি, তাতে আমার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান বুদ্ধি (এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আমার মনের ঝোঁক) সায় দেয় না। দেশাভিমান আমার আছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই, কিন্তু তার ভিত্তিতে নয়, আমার বিবেক ও বোধশক্তি অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহের ভিত্তিতেই আমি মনে করি যে আধুনিক সমাজ-জীবনকে বিপ্লবী রূপায়ণ দেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি আমাদেরই স্বকীয় ঐতিহ্যের মধ্যে উপস্থিত আছে। আরও মনে করি যে স্বদেশীয় পরম্পরার সাহায্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও কর্মধারার স্বপক্ষে সর্ববিধ কর্তব্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আজ একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতচেতনা আমাদের মানসিকতাকে যে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রেখে সুফলপ্রসূ করতে পারে, এ-বিষয়ে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

পূর্বেই বলেছি যে অল্প কয়েকটি তথ্য ভারতকথা থেকে আহরণ করছি, কিন্তু সময় সংক্ষেপ সত্ত্বেও সেই তথ্যসঞ্চয়ন অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে, এত বেশি কথা থেকে বাছাই করতে হচ্ছে যে অবসর প্রচুর না হলে প্রকৃত বাছাইয়ের কাজ যে সম্ভব নয় তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। পাঠকদের কাছে তাই এখনই ক্ষমা চেয়ে রাখছি, আর জানি যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনের ভাণ্ডার থেকে আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্যকে পরিপূরণ করে নিতে পারবেন।

আধ্যাত্মিকতা হল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, এই অহংকার আমরা বহুদিন পুষে রেখেছি—বাস্তব জীবনে বার বার মারাত্মক আঘাত খেয়ে সংসারকে অসার মনে করার প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতপক্ষে অসত্য জেনেও অনেক সময় সান্ত্বনার মতো আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। বিদেশী পণ্ডিতেরাও মাঝে মাঝে মনের এই প্রবণতাকে উৎসাহ দিয়েছেন—ইতিহাসকে উপেক্ষা করেই Edwin Arnold-এর মতো ভারতানুরাগী প্রাচীন ভারতে গ্রীক আক্রমণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

The East bowed low before the blast
In patient, deep disdain ;
She let the legions' thunder pass
And plunged in thought again.

কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি সর্ জন্ উড্রফ্ ভারতবন্ধু ছিলেন ; তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসীদেরই তথ্যগত অজ্ঞতা দূর করতে নেমে তিনি তন্ত্রের গূঢ়ার্থবাদিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, *Is India Civilized?* শীর্ষক গ্রন্থে এবং অন্যত্র Arthur Avalon নাম দিয়ে অধ্যাত্মচিন্তার প্রতি তাঁর আকর্ষণকে প্রকাশ করে ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু একপ্রকার একদেশদর্শিতাকেই পুষ্ট করেছিলেন। আমাদের মনের এই একপেশে ঝোঁককে ঠাট্টা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গান লেখেন—"জীবনটা কিছু নাঃ!" রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবীর'-কে বিদ্রূপ করেন :

মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক ?
আমরাই তাই করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে, ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দিই পৈতে ছুঁয়ে।

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বড়াই মনের দিক থেকে এমনই সহজ ভুয়ো বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কাজের ক্ষেত্রে তার ফল যখন ছিল বিষময়, তখন এ-ধরনের কশাঘাত খুবই প্রয়োজন ছিল আর প্রয়োজন ছিল বলেই দেখা গেল স্বামী বিবেকানন্দের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, সন্ন্যাস গ্রহণ করেও যিনি সংসারকে অস্পৃশ্য বলে পরিহার করে থাকতে পারেন নি, বজ্রনির্ঘোষে শুধু ভারতমহিমা প্রচার করেন নি, মানুষের জয়গান করেছিলেন, জগৎজুড়ে নিপীড়িত শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানের তূর্যধ্বনি শুনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, সবাইকে

ডাক দিয়ে বলেছিলেন: "সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।" বিবেকানন্দের মধ্যে দেখা দিল যেন প্রাচীনকালের ঋষি আবার ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়ে বলছেন "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম, রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেই বিশ্বের সর্বগৌরব পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তিনি যেন পূর্বতন ঋষিদের প্রতিধ্বনি করে বললেন, দেবতার প্রসাদ মানুষকে বড় হতে সহায়তা করতে পারে কিন্তু দেবপ্রসাদের চেয়ে মূল্যবান হল 'তপঃপ্রভাব', মানুষের নিজের চেষ্টা, নিজের সাধনা ও সিদ্ধি। রামায়ণের মহাকাব্য যেন আবার আমরা শুনলাম তাঁর মুখে—

ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ (মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই)—

আর যেন রামচন্দ্রের মতোই তিনি বললেন: "কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্"—এই কর্মভূমি পেয়েছি, এখানে শুভ কর্ম করাই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো শোনা যাবে যে ধর্মের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, মানবিকতার বৃত্তান্তে তাঁরা মহৎ হলেও স্থান পাবেন না। আর কেউ কেউ শাসাবেন যে পরোপচিকীর্ষা মানবিকতার সঙ্গে সমার্থক নয়, পরদুঃখে বিগলিতহৃদয় মহানুভবতার সঙ্গে মানবিকতায় প্রভূত প্রভেদ আছে। সংজ্ঞার বিচার করতে গেলে অবশ্যই সে প্রভেদ আছে, কিন্তু দুর্গতের আর্তি দূর করার কামনার সঙ্গে মানবিকতা সম্পর্কশূন্য নয়। কাকতালীয় ন্যায়ের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু মানবিকতা ও মানব দুঃখে বিচলিতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকলেও নিকট সম্পর্ক আছে। আর ইয়োরোপেও দেখা যাবে মানবিকতা আন্দোলনের পুরোভাগে এমন বহু ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন একান্ত ধর্মনিষ্ঠ, 'ইউটোপিয়া' রচয়িতা টমাস মূর-এর মতো যিনি ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হন নি, কিংবা এরাস্‌মুস্-এর মতো বিদ্বান্ যিনি তদানীন্তন ধর্মসংস্কার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিলেন। তাছাড়া ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপালন একটা বিশিষ্ট আকার নিয়েছিল যা ভারতবর্ষে কখনও ঘটে নি। ইয়োরোপে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আপামর সাধারণের মনে এই বিশ্বাস ধর্মযাজকেরা বপন করেছিলেন যে পরিচিত পৃথিবীর অবসান আসন্নপ্রায়, খ্রীষ্ট জন্মের এক হাজার বৎসরের মধ্যে আবার যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করবেন এবং এই দ্বিতীয় আবির্ভাবের ('Second Advent') সঙ্গে সঙ্গে 'আদিম পাপ'-দূষিত পৃথিবী বিলোপ পাবে, যারা ধার্মিক, ধর্মাচরণ যারা মনে কোনো প্রশ্ন না

রেখে করে এসেছে, ঈশ্বরের বিচারে তারা স্বর্গবাসরূপ পুণ্যফল লাভ করবে, আর যারা অবিশ্বাসী, ধর্ম কর্মে যারা অবজ্ঞা বা অবহেলা করেছে, 'ক্যাথলিক চার্চের' সকল নির্দেশ মান্ত না করে যারা তর্কে নেমেছে, তারা সবাই যাবে নরকে, সেখানে অনন্তকাল ধরে তপ্ত কটাহে তারা দগ্ধ হবে। অনিত্য জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্‌টে দিয়ে দৃশ্যমান জগতের মনোহারিত্ব যখন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রভাতকিরণোজ্জ্বল চোখ দিয়ে ইয়োরোপ দেখতে শিখল তখন তার মনে, তার দেহে, তার সত্তার নিবিড়ে নতুন এক আলোড়ন এসেছিল, যার অনুরূপ কোনো ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে নি। ইয়োরোপের 'রেনেসাঁস' আন্দোলনে ধর্মাবেগকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে দেখা গেল, মানবিকতার প্রকৃতি এবং খ্রীষ্টধর্মনিষ্ঠার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল, যাকে বলা হয় 'pagan' ধারা তার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটল। আমাদের দেশে ধর্ম কখনও ইয়োরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরূপ চেহারা নেয় নি। তাই এখানে মানবিকতা দেখা দিল ধর্মচিন্তার সঙ্গে প্রকাশ্য বৈরিতা না করে, তাই এদেশের মধ্যযুগ যখন বলা যায় তখনই দেখা গেল মহাত্মা কবিরের মতো ব্যক্তি, যিনি প্রচার করলেন ভারতপন্থ, ধর্মধ্বজীদের যিনি উপহাস করেন কিন্তু ধর্মকে মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী মনে করেন না, ধর্মাচরণ নিয়ে নিষ্ঠার আতিশয্য ও সংকীর্ণতাকে ঘৃণা করেন কিন্তু ধর্মের মূল সূত্র থেকে এমন বস্তু আহরণ করতে পারলেন যাকে মানবিকতার সমগোত্রীয় বলতে দ্বিধা করা উচিত হবে না।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্‌ভাইৎসের (Schweitzer ভারতীয় চিন্তায় সংসার বিমুখিতার কথা বলেছেন। সংসার ও জীবন সম্বন্ধে এদেশের চিন্তায় ইতিবাচক ভঙ্গির চেয়ে নেতিবাচক ধারণাকেই তিনি প্রধান বলে দেখেছেন। এ-বিষয়ে ভারতচিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আচার্য রাধাকৃষ্ণণ-প্রণীত *Eastern Religion and Western Ethics* গ্রন্থে আলোচনা আছে; অনেকেরই তা চোখে পড়বার কথা। অবশ্য একথা সত্য যে নিরাসক্তি যখন আসক্তিকে খণ্ডন করছে, তখন নিরাসক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা তা কিছু পরিমাণে মানবিকতার পরিপন্থী হতে বাধ্য। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আসক্তি বিনা মানবিকতার কল্পনাই সম্ভব নয়, একথা অকাট্য। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের চুলচেরা বিচার যাই বলুক না কেন, অদ্বৈত বেদান্ত যে-নিরাসক্তির প্রবক্তা, ভারতমানসে তার পরম আকর্ষণ থাকলেও ভারতচিন্তায় ভাব ও বস্তুবাদী বৈচিত্র্য আছে অপরিসীম, এবং নিরাসক্তির তুরীয় স্তরে

অধিষ্ঠানকে প্রণম্য হলেও অমানুষিকতার প্রতীক মনে করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় মহাপুরুষ সাধারণ জীবনের কেন্দ্রস্থলে নেমে থাকাই কর্তব্য মনে করেছিলেন, বহুদূরস্থিত গিরিশৃঙ্গে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে তিনি অস্বীকৃত হয়েছিলেন, পুতিগন্ধময় সংসার প্রপঞ্চের মধ্যেই জগৎশক্তির লীলাকে প্রকট দেখে তুষ্ট হয়েছিলেন। সংসারকে নস্যাৎ করার অল্লার্থ প্রবৃত্তি হয়তো সহজে এসেছে কোনো সদ্যগৃহত্যাগগর্বী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে, কিন্তু ভারতের গৈরিক পতাকায় অনাসক্তি বন্দিত হলেও কখনও জগৎ ও জীবন অবজ্ঞাত হয় নি।

বৈদিক যুগে দেখা যায় যে কবি বা বিপ্র হয়তো তুরীয় রাজ্যে বিচরণ করতে চাইছেন, কিন্তু সকলেরই কামনা ছিল ধন, মান, সন্ততি, স্বাস্থ্য, যুদ্ধজয়, শতবর্ষব্যাপী আয়ু। যজুর্বেদে প্রার্থনা রয়েছে: আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, দেহের অটুট শক্তি নিয়ে শতবার শরৎ ঋতুকে দেখি, শুনি, তার কথা বলি, কারও উপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকি, শত বর্ষের চেয়েও বেশি আয়ু যেন আমাদের হয়! রবীন্দ্রনাথ এক বক্তৃতায় ঋগ্বেদের আশ্চর্য বচন উদ্ধৃত করেছিলেন: "প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখ্‌ব, আমাকে স্বস্তি দিও।" যে উপনিষদ্‌গুলিতে উচ্চ কোটির চিন্তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে, সেখানেই বৃথা ভূমিকায় বাক্যব্যয় না করে সোজাসুজি এই পৃথিবীতেই মানুষের আয়ু যাতে বাড়ে তার জন্য মন্ত্র রয়েছে, তুকৃতাকের ব্যবস্থা রয়েছে, জাদুবিদ্যার শরণ নেওয়া হচ্ছে—পরবর্তী যুগে পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর শিকল থেকে মুক্তি চাওয়া ছিল রীতি, অথচ বৈদিক যুগে বর্তমান জীবনকেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার কামনা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের ইতিহাস হল সুদীর্ঘ; তার কোনো কোনো পর্যায়ে বৈদান্তিক ধারা কিম্বা অহিংসা নীতি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ঋষিকে একবার যখন প্রশ্ন করা হয় যে মাংসভোজন নীতিসিদ্ধ কিনা, তখন তিনি বলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই, তবে কি না মাংসটা কচি হওয়া চাই।'

রাজর্ষি জনক গৃহস্থ ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য পরিব্রাজক ছিলেন কিন্তু একাধিক দারপরিগ্রহ করেছিলেন, গৃহত্যাগের পূর্বে দুই পত্নীর মধ্যে সম্পত্তি বিতরণের কথা বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ীর কালজয়ী প্রশ্ন শুনেছিলেন: "যেনাহম্‌ নামৃতা স্যাম্‌, কিমহম্‌ তেন কুর্যাম্‌" (যাতে আমি অমৃতত্ব পাব না, তা নিয়ে আমি কী করব?)। উপনিষদ্‌ যুগের মর্মবাণী ছিল বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা; এরই সন্ধানে

গিয়ে সত্যদ্রষ্টাকে বারংবার বলতে হয়েছে "নেতি, নেতি" (এ নয়, এ নয়), মানুষের ক্ষুদ্র কল্পনা এই পরিপূর্ণতাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না বলে। আবার নিছক চিন্তার ক্ষেত্রে নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বাক্য ও মনের অগোচরত্ব ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মননের নিম্নস্তরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যাতে মানুষ সেখানে আশ্রয় নিতে পারে, ভক্তিমার্গের পথ খুলে যায়, জীবনের ব্যঞ্জনা বহুবিধ হয়ে ওঠে। তবে জ্ঞানমার্গকেই মনে করা হত সব চেয়ে প্রকৃষ্ট। কঠোপনিষদে রয়েছে: "বিজ্ঞান যার রথের সারথি, নিজের মনের রাশ যে টেনে রাখতে পারে, সে-ই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, এগিয়ে চলার লক্ষ্যস্থলে পৌছায়।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে অবিস্মরণীয় বাণী :

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানং।

সত্যই শুধু জয়লাভ করে, যা মিথ্যা তা জয়ী হয় না। দেবতাদের পথ সত্য দ্বারা আস্তৃত, এবং সেই পথ অতিক্রম করে তবেই ঋষিদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, পরম সত্যের যেখানে অধিষ্ঠান সেখানে তাঁরা উপনীত হতে পারেন।"

ধ্যানরাজ্যেও সর্বত্র সেই প্রাচীন যুগে মানুষের স্বকীয় মহিমার মূল্য আরোপ করা যে হয়েছে তার অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যকে যে উপদেশের বর্ণনা আছে তা আজকের মুক্ত মানুষও শিরোধার্য করে নিতে ইতস্তত বোধ করবে না :

"সত্য বলবে; ধর্ম আচরণ করবে; অধ্যয়নে অবহেলা কোরো না; আচার্যের জন্য প্রিয় ধন আহরণ করে দেওয়ার পর নিজের সন্তানসন্ততি প্রজননে অবহেলা কোরো না; সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না; ধর্ম থেকে ভুল পথে যাবে না; মঙ্গলকর্ম থেকে, সম্পদ অর্জন থেকে, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে বিচ্যুত হবে না।

"দেবতা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য থেকে স্খলন যেন না ঘটে; তোমার মাতা তোমার কাছে দেবী স্বরূপা; পিতা, আচার্য, অতিথিকে দেবতার মতো মনে কোরো; যে কর্ম অনবদ্য তাই কোরো, অন্য কর্ম নয়; যাতে আমাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটে, তাকেই বড় মনে কোরো, অন্য কিছু করণীয় নয়।"

ঐতরেয় উপনিষদ বলছে: "আবিরাবীর্ম এধি", (যা আবৃত হয়ে রয়েছে তা যেন আমার কাছে আবির্ভূত হয়), আর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ছদ্মবেশী ইন্দ্র রাজপুত্র রোহিতকে বারবার উৎসাহ দিচ্ছেন: "চরৈবেতি, চরৈবেতি"

(এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো)—"যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে চলেন ; যে চলতে চায় না সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে ; অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো…" (ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অনুবাদ)। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাহিনী রয়েছে। এক ঋষির দুই পত্নী ছিলেন, একজন শূদ্রা অন্যজন ব্রাহ্মণী। যজ্ঞস্থলে শিক্ষালাভের জন্য মায়েরা একদিন ছেলেদের বাপের কাছে পাঠালেন। ঋষি ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে আদর করে কোলে বসালেন। অথচ যজ্ঞস্থলেই সর্বসমক্ষে শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে অবজ্ঞা দেখালেন। আহত শিশু মায়ের কাছে কেঁদে পড়ায় অভিমানী মা বললেন, "আমি শূদ্রকন্যা, স্বয়ং পৃথিবী আমাব মা, তাঁকে ডেকে দেখি বিহিত ব্যবস্থা তিনিই করবেন।" মাটির সঙ্গে শূদ্রের যোগাযোগ সব চেয়ে বেশি, তাই শূদ্রই যেন বিশেষভাবে পৃথিবীর সন্তান। তাই বসুন্ধরা সেই ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ করে মায়ের কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। শৈশবের অপমানের প্রতিশোধ তুলল সেই ছেলে ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ব্রাহ্মণ' রচনা করে। শূদ্রার, অর্থাৎ ইতরার পুত্র তিনি, তাই তাঁর নাম হল 'ঐতরেয়', মহীদাস নামেও তাঁর পরিচয় কারণ মহীরই তিনি শিষ্য ছিলেন। যত বড় পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ গর্বে গর্বিত ব্যক্তিই হোন্ না কেন, ঋগ্বেদে প্রবেশ করতে হলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ না পড়ে উপায় নেই !

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে উদাত্ত আহ্বান, যেন উত্থিত হচ্ছে মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে—"অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও।" আর আছে বজ্রদুন্দুভির ধ্বনি—"দ,. দ, দ", "দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্"—নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথ্বীর বহু বাধা অতিক্রম করে যা টি. এস্. এলিয়টের মতো মহাকবির মনে বিংশ শতকের প্রথম পাদে প্রতিধ্বনি তুলেছে ; "সংযত হও, অপরকে দান করো, সর্বজনের প্রতি সহৃদয়তা তোমার কর্তব্য।" এই 'দয়ধ্বম্' শব্দেরই নবরূপ দেখা গেল গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখ-

নিঃসৃত শিক্ষায়, যাকে আমরা জানি 'করুণা' বলে, যার পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, অথচ যে অনুভূতি সম্বন্ধে বলা যায় যে মানবিকতা ধারণ ও বহন করতে যদি কোনো শক্তি পারে তো তা হল করুণা, তা হল দুঃখনিবৃত্তির সন্ধানে গৌতমের অভিযান, অষ্টমার্গের পরিকল্পনা, 'মজ্ঝিম পন্থের' (মধ্যম পন্থা) প্রস্তাবনা, প্রধান শিষ্য আনন্দকে বুদ্ধের নির্দেশ : "নিজেই নিজের কাছে প্রদীপের মতো হবে" পরমুখাপেক্ষী হবে না জীবনের সর্ববিধ প্রশ্নোত্তরের জন্য, সত্যকে আঁকড়ে থেকো, নিজেই নিজেকে আশ্রয় দিতে পেরো। যারা ধর্মশিক্ষার নামে তত্ত্বকে রহস্যাবৃত করে রাখে, সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময় উদ্রেক করার কৌশল অভ্যাস করে, আমি তাদের ঘৃণা করছি, তাদের সম্বন্ধে আমি লজ্জা বোধ করি—একথাই বুদ্ধ বলেছেন। তাই বুদ্ধদেবের কথা বলতে গিয়ে মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি লিখেছেন : "মানুষ যেন স্বর্গের দেবতাদের রাহুগ্রস্ত করে দিল, যে মানুষের পদচিহ্ন পড়ল মাটিতে আর সর্বজনের অন্তরে"।

ঋগ্বেদে আছে "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি"—যে মানুষ শুধু নিজের জন্য রান্না করে খায় সে পাপী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে : "মমেতি মূলং দুঃখস্য, ন মমেতি চ নির্বৃতি"—যত দুঃখের মূল হল এটা আমার, ওটা আমার, এই নিয়ে—আমার কিছু নয়, তা হলেই দুঃখের নিবৃত্তি। বরাহপুরাণ পূর্তধর্মের প্রশংসা করে বলছে যে ইষ্টকর্মাদি করে স্বর্গে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য 'পূর্ত' প্রয়োজন, বহুজনের যাতে মঙ্গল হয় এমন কর্ম করা চাই। ভাগবত পুরাণ বলছে : "যাবদ্ প্রিয়েৎ জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং"—জঠরপূরণের জন্য প্রয়োজন অন্নে মানুষের স্বত্ব আছে, তার বেশি যে অধিকার করে সে হল দণ্ডার্হ। অনুরূপ অসংখ্য উদ্ধৃতি স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে মেলে। অবশ্য এতে মানবিকতা আমাদের চিন্তা ও কর্মধারায় উপস্থিত ছিল বলা আতিশয্য হবে। কিন্তু সংসারবিমুখিতা বাস্তবিকই কখনও ভারতবর্ষের জীবনকে চিহ্নিত করে নি।

ভারতবর্ষের শিল্প ও সাহিত্য যে কয়েক সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে, তাতে জীবনকে পরিহার করার চেয়ে আছে জীবনকে জয় করার কথা—যদি পরিহার করতে হয় তো তাও হল জীবনকে জয় করারই লক্ষ্য নিয়ে। মৌর্যযুগের পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যগর্বিত রোমনগরীর চতুর্গুণ ; পাটলিপুত্রের নগরপালিকার বহু কর্তব্যের মধ্যে একটি ছিল ২৩০০ বছর আগে শহরে জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা। মহাভারত রামায়ণে অপ্রতিভতা বর্জন করে

মনুষ্য চরিত্রের যে সুস্পষ্ট অথচ গভীর চিত্রণ রয়েছে, তার তাৎপর্য ভুলে যাওয়া অনুচিত। প্রয়োগবিদ্যায় এদেশের অগ্রগতি তদানীন্তন কালের হিসাবে চমকপ্রদ সন্দেহ নেই; লোহার বিরাট থাম গড়া আর সমুদ্রযাত্রী জাহাজ নির্মাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল পারদর্শী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে কঠোর বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে দ্বিধাহীন বিশ্লেষণ আছে তা সুবিদিত। বৃহস্পতি, চার্বাক প্রভৃতি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে কেন্দ্র করে লোকায়ত চিন্তাধারাকে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজপতিরা দমন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের বস্তুনিষ্ঠা ও সহজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে আমাদের ইতিহাসে অখ্যাত হলেও বিরাট এক সত্য রূপে আজ ক্রমশ স্বীকৃত হতে চলেছে।

যে দেশে কামশাস্ত্রের মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যে দেশে নাগরকের পক্ষে চৌষট্টি কলায় ব্যুৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে ঘোষিত হয়েছে, সেখানে আমরা মানুষ এবং তার অস্থির, অশান্ত জীবনের গোচর এবং অগোচর অগণিত ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অনীহাগ্রস্ত থেকেছি মনে করা হল বিভ্রান্তি। এদেশের স্থাপত্যে ও চিত্রাঙ্কনে প্রেমের দহন একেবারে অপরিহার্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। নারীদেহ নিয়ে ব্রীড়াহীন আনন্দ যেন আমাদের শিল্প থেকে এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জীবনের চরম মূল্য ও তাৎপর্য ও লক্ষ্য যে মানুষের প্রেমাবেগের মধ্যে বিধৃত, এ-কথাই যেন সেই শিল্প ক্রমাগত বলছে। অজন্তা গুহায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হয়তো চিত্রাঙ্কন করেছিলেন; সেখানে পরস্পরসংলগ্ন বহু চিত্রের বিষয় হল নারীদেহের অপার সৌন্দর্য; সেগুলো দেখে মনে হবে না যে প্রেমের দহনজ্বালাকে ধিক্কার দেওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ রয়েছে, বরঞ্চ মনে হবে যে প্রেম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখার দুঃখকেই মাঝে মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর সংস্কৃত সাহিত্যের তো কথাই নেই—সমাজের নিগড় যতই কঠোর হতে থাকুক, নরনারীর প্রেম হল তার মুখ্য উপজীব্য। জীবন ও সংসার বিষয়ে ঔদাসীন্য আমাদের চিন্তায় মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কিংবা মহৎ আকারে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটাই আমাদের পঞ্চ সহস্রব্যাপী ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। যদি তা হত তো এত যুগ ধরে আমরা বেঁচে থাকতাম না, প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনের সঙ্গ নিয়ে ইতিহাসের জাদুঘরে জায়গা নিয়ে থাকতাম।

উত্থানপতন আমাদের ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। মনীষী অল্‌বেরুনি

একাদশ শতাব্দীতে লিখেছেন গুপ্ত যুগের হিন্দু সভ্যতার প্রশংসা করে এবং সমসাময়িক হিন্দুদের অবনতির উল্লেখ করে। এ দেশে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ের পরে কিছুকাল জীবন ও সংস্কৃতির দিক থেকে মন্দা চলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরে মুসলিম ও হিন্দু সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন ধারা দেখা দিল। এই জায়মান নবজীবনে মানুষের স্থান অনন্ত ; যেমন সুফি চিন্তায়, তেমনি হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে এ দেশের সাধুসন্তদের জীবনে, কাজে ও কথায় মানুষকে বসানো হয়েছে সংসারের কেন্দ্রে—ঈশ্বরকেও মানুষ তার আপন করে নিতে চেয়েছে, একাত্ম হতে চেয়েছে, বাঙালি বাউল সহজ সুরে গেয়ে উঠেছে—

একে একে মিলিয়ে গেল, আমার হাতে কিছুই রইল না।
গুরু, তোমার পাঠশালাতে অংক শেখা হইল না।

বিশেষ করে মনে পড়ছে ভারতবর্ষের সাধুসন্তদের সম্বন্ধে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অনলস গবেষণার কথা। দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব সাধুর দল, তিরুভল্লুভর-এর মতো বিরাট পুরুষকে যাঁদের মধ্যে গণ্য করা যায়। জ্ঞানেশ্বর থেকে তুকারাম পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় সন্তদের কথা, গুর্জরে, রাজস্থানে, উত্তর ভারতে, উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামে বহুমুখী ও ব্যাপক ভক্তি আন্দোলন —যাতে হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, চণ্ডাল আছেন— যাঁদের মধ্যে রামানন্দ, কবির, দাদু, নানক, চৈতন্য, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি বহু ক্ষণজন্মার নাম সকলের পরিচিত, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মৈনুদ্দীন চিস্তি, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া প্রমুখ মুসলিম সাধক—যাঁদের বক্তব্য তুলসী, চণ্ডীদাস ও সুরদাসের মতো কবি কিংবা ভারতপন্থের স্থাপয়িতা কবিরের মতো মহাত্মার কাছ থেকে শুনে ভারতবর্ষ কৃতকৃতার্থ, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা বাড়ুক, নচেৎ এ দেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করার মতো ভাগ্য আমাদের হবে না। চার্বাকের সূত্রে, বৌদ্ধ দোহায়, "বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যুক্ত বেণীতে", ভারতে "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায়" যে সত্য কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও উদ্ভাসিত হয়েছে, তারই প্রকাশ চণ্ডীদাসের অতি পরিচিত পংক্তিতে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" একে শুধু দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের একটি কাব্যিক বিন্যাস বলে উড়িয়ে দিলে কয়েক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাকেই অগ্রাহ্য করা হবে।

"উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতিকর্মসু"—এ হল ভারতবর্ষের প্রাচীন

কথা, ওঠো, জাগো, সর্বজনের হিত সাধনে যোগ দাও। ভারতবর্ষের সনাতন প্রার্থনা হল, "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু", সর্বজন সুখী হোক। মানুষকে ভাগ্যের হাতে পুতুল বলে ভারতবর্ষ মনে করে নি—"নক্ষত্রবিদ্যা" প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে; যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, এক চক্রে যেমন রথ চলে না, তেমনই দৈব ঘটনাকে টানতে পারে না, পুরুষকারের ভূমিকা সর্বদা রয়েছে। "হিন্দুকো হিন্দ্‌বাই দেখি, তুর্কন্‌ কী তুর্কাই" বলে কবির হিন্দু-মুসলমানের সংকীর্ণতাকে ভর্ৎসনা করেছেন, মানবতার আদর্শ তুলে ধরেছেন। গত মহাযুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার আগে ইংরেজ তরুণ কবি অ্যালন্‌ লুইস্‌ দেখেছিলেন, "বিশ্বজনীন যে ক্ষেত্র এদেশে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে তো অহংকারকে লুপ্ত না করে উপায় নেই।" সকল অহংকার ও ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে অবস্থিত নর-দেবতাকে ভারতবর্ষে ও অন্যত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এদেশের ইতিবৃত্তে, ধর্মে, কর্মে মানবতার জয়গান বহু বিচিত্র সুরে হলেও সর্বথা ধ্বনিত হয়েছে। মানবতা ও মানবিকতার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর তো নয়ই বরঞ্চ অতি স্বল্প। ইয়োরোপের বিশিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিতে মানবিকতা নিয়ে যে আলোড়ন ঘটেছিল, ভারতবর্ষে ঠিক তা না ঘটলেও মানবিকতা ভারতমানসে অপরিচিতির অস্বস্তি আনবে না।

অশোক মিত্র

জাতীয় পরিকল্পনা, পণ্ডিত নেহরু এবং আমরা

চাল-গম পাওয়া যাচ্ছে না, বাজার থেকে চিনি-তেল-মাছও উধাও, সব-মিলিয়ে মজুতদার-মুনাফাখোরদের মসৃণ পৌষমাস। বিগত তিনবছরে খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন দেশে সামান্যতমও বাড়ে নি; শিল্পের ক্ষেত্রেও যে-উচ্ছলিত প্রগতির হার কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সোচ্চার গর্বে আমরা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেছি, তা ঢিমে হয়ে এসেছে। ঋণজর্জর ভারতবর্ষ, পরমুখাপেক্ষী হয়ে খিদের খাবার থেকে কাঁচামাল-যন্ত্রপাতি-অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত-কিছু সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যদি হঠাৎ বিদেশীদের দাক্ষিণ্য বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ও সোনাদানা ঢেলে বড় জোর দু-মাসের আমদানীর জোগান দিতে পারব, তারপর ঘোর অন্ধকার।

কবিতার মতো শোনাবে, এবং এই অবস্থায় কবিতার প্রসঙ্গ সত্যিই কর্কশ, নইলে বলা চলত ঝাঁকবাঁধা অন্ধকার আমাদের আকাশ ছেয়ে আসছে। আমাদের সংবিধানে সাম্যের অঙ্গীকার, আমাদের প্রতিনিধিসভায় একাধিকবার সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা বিঘোষিত হয়েছে, পর-পর প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিব্যবস্থা আমূল সংসাধনের সংকল্প বহু বিভঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে; সেই সঙ্গে ধনবণ্টনের সৌষাম্যসাধনার্থ নানা নির্দেশের ইঙ্গিত ইতস্তত ছড়ানো। অথচ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে অধ্যবসায়ী হিসেব নিলে দেখা যাবে, পুঁজিপতিদের প্রাধান্য উৎকীর্ণতর হয়েছে, বণ্টনব্যবস্থার ঈষদসাম্য অব্যাহত, গ্রামাঞ্চলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ কৃষিজীবির এখনো চাষের জমি নেই, আরো এক-চতুর্থাংশের আবাদের জমির আয়তন গড়ে পাঁচ বিঘে কি তারো কম; অন্য পক্ষে একেবারে মগডালে-বসা উচ্চবিত্ত ভূম্যধিকারীরা আগের মতোই গ্রামে-গ্রামে অর্ধেকেরও বেশি চাষের জমি দখল করে বসে আছেন। যে-চাষীদের জমি নেই, দিনমজুরি করে কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, একটা হিসেবে ধরা পড়েছে,

যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই গত দশ-বারো বছরে তাদের মজুরির হার হ্রাস পেয়েছে।

সমাজতন্ত্র প্রসারের একটি সূত্র, যা আমরা সবাই মেনে নিয়ে থাকি, ঋতু-অঋতুনির্বিশেষে মন্ত্রোচ্চারণের মতো আউড়ে থাকি, তা শিল্পব্যবস্থার উত্তরোত্তর অধিকতর জাতীয়করণ। বিশেষ করে ভারি শিল্পের প্রসঙ্গে, সংবিধানে এ-বিষয়ে নির্ভুল নির্দেশ দেওয়া আছে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি 'প্রামাণ্য' বিবৃতিতে সেই নির্দেশের পুনর্ঘোষণা ছিল, কংগ্রেসের আবাদী কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি না-হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ঘোষণা এবং ঘটনার মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ভারি শিল্পে রাষ্ট্রের আপাতপ্রভাব বেড়েছে সন্দেহ নেই, ইস্পাত-কয়লা-বিদ্যুৎ-যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উৎপাদনে সরকার অনেকদূর এগিয়েছেন, কিন্তু এই প্রগতিতে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার সাক্ষর সামান্যই। রাষ্ট্রের প্রসাদাশ্রয়ে বিদ্যুৎ-পরিবহন, সেচের জল, লোহা, কয়লার প্রচুর প্রসার ঘটেছে—ক্রমেই আরো ঘটবে, কিন্তু তাতে শিল্পপতিদের লাভ বই ক্ষতি হয় নি। সমাজতন্ত্র কোনো কাঠামো গড়ার ব্যাপার নয়, আদর্শের ওঙ্কার ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব। বিষয়ীকে বাদ দিয়ে বিষয়ান্বেষণ তেমন যুক্তিসহ নয়। আসলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির হাল ধরে আছেন যে-রাজপুরুষরা, সমাজতন্ত্রে তাঁদের আস্থা প্রায় শূন্য। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়। আমাদের প্রধান রাজপুরুষরা সমাজের যে-স্তরের মানুষ, সমাজতন্ত্র সেখানে হয় মন্ত্রিমশাইর খেয়াল, নয় জুজুবুড়ি। মনের দিক দিয়ে এঁরা অনেকেই সামন্ততান্ত্রিক, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা অতএব তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিস্তারের সুযোগস্তম্ভ, সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব অবশ্যতই অতএব উহ্য। যেহেতু শিল্পপতিদের সঙ্গে এই শ্রেণীর রাজপুরুষদের অন্তরঙ্গ হৃদ্যসম্পর্ক, শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী-পুঁজিপতির অসুবিধা তো হয়ই নি, বরঞ্চ রাজ-কর্মচারীপ্রসাদে পুষ্ট হয়ে তাঁরা আরো ঘন বিন্যাসে জাঁকিয়ে বসছেন। এ যেন প্লেটোর আদর্শে এক রিপাবলিক গঠন করছি আমরা। কোটি-কোটি সাধারণ লোকে প্রতি বছর রাষ্ট্রের কাছে রাজস্ব অর্পণ করে, সেই রাজস্বের সাহায্যে যে-বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি হয়, যে-সেচের জলের ব্যবস্থা হয়, যে-পরিবহনের ব্যবস্থা হয়, যে-সারের উৎপাদন হয়, নামমাত্র মাশুলের বিনিময়ে সে-সমস্ত কিছুই স্বল্পসংখ্যক ভূম্যধিকারী শিল্পপতির কাজে লাগছে, মুনাফার পরিমাণ

বাড়াতে সাহায্য করছে। বিদেশী পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে সরকার শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের অপরিমেয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্যপক্ষে, প্রধানত ধনবণ্টনে অতিবিকৃতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে-নিয়ম করা হয়েছিল যে নতুন শিল্প চালু, আরো পুরনো শিল্প সম্প্রসারণ, উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন, তা-ও দণ্ডাধিকারদের শ্রেণীগত পক্ষপাতের ফলে বিপরীত উদ্দেশ্যই সাধন করে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রাবিতরণের কাঠামো মারফৎ আরো এক-দফা সমাজতন্ত্রের কণ্ডুয়ন ঘটছে।

উপরের সালতামামি অনেকের কাছে কাতর প্রলাপোক্তির মতো শোনাতে পারে। কিন্তু মনে হয়, এই বছর বিশেষ করে, আর্থিক পরিকল্পনার ফলাফলের হিসেব করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুতে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। আপাতত কিছুটা সময় এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা স্থিত থাকব। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দীর্ঘ সতেরো বছর আমাদের মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। রাজভক্ত, গুরুভক্ত জাতি আমরা: শুনতে ভালো না-শোনালেও বলতেই হয়, যেখানে শতকরা পঁচাত্তরজন লোক এখনো নিরক্ষর, শ্রেণীচেতনা-শ্রেণীস্বার্থ-শ্রেণীদ্বন্দ্ব ইত্যাদির প্রভাব সেখানে তেমন কিছু নিবিড় হতে পারে না। শ্রেণীচেতনা ছাপিয়ে ভারতবর্ষে তাই গুরুভক্তির উল্লাস, দৈনন্দিন গ্লানিকে পাশে ফেলে—সেই গ্লানিকে ভোলবার জন্যই হয়তো—রূপকথা শোনার জন্য অতি-অধীর আগ্রহ। শাদামাটা ভাষায় যাঁকে 'রাজামানুষ' হিসেবে অভিহিত করা চলে, পণ্ডিত নেহরু দেশের অধিকাংশ লোকের কাছে ঠিক তাই ছিলেন এবং সতেরো বছরের এই অন্তর্লীন সময়ে, ঔজ্জ্বল্যে-বৈভবে-জ্যোতিতে-জাদুতে তাঁর কাছাকাছি আসতে পারেন, এমন আর একজনও কেউ ছিলেন না। সুতরাং আমাদের অনেকেরই পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর দুই অভিব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায় সব-সময়েই রূপকথার ধারক, সেইজন্য ঔদার্যের বাহক, জাতীয় সংকটত্রাতা জবাহরলালের অভিভাব আমাদের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করে থাকে, যে-জবাহরলাল সতেরো বছর ধরে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, আর্থিক পরিকল্পনার সাফল্য-অসাফল্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের আকাশকুসুম বাস্তবে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর প্রসঙ্গে কদাচিৎ পৌঁছই।

কিন্তু ঘটনাপরম্পরার ধারা বুঝতে হলে বিগত সতেরো বছরের ইতিবৃত্তকে পাশ কাটানো মূঢ়তা হবে: পণ্ডিত নেহরু কী ভেবেছিলেন—কী করতে চেয়েছিলেন—কী করতে পারেন নি—কতটুকু করেছেন—যা করতে পারেন নি কেন করতে পারেন নি তা সবচেয়ে আগে বিচার করা দরকার। কিছুটা পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, কিছুটা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিহেতু চঞ্চলতার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইদানীং অনেক ধনী শিল্পপতি এবং তাঁদের আজ্ঞাবাহী কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য পরিকল্পনার কার্যসূচী এবং সেই সঙ্গে বিশেষ করে রাষ্ট্রের খাতে বিনিয়োগের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য চিৎকার শুরু করেছেন, কয়েকজন রাজপুরুষও তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় শিক্ষা-বিদ্যুৎ-পরিবহন-পোতনির্মাণ-সেচের জলের ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ যে-যে ক্ষেত্রে লাভের বহর স্বল্পমাত্র, রাষ্ট্রশক্তির প্রসারে পুঁজিপতিদের আদৌ আপত্তি নেই, কিন্তু যে-মুহূর্তে ভিত্তিমূলক বিনিয়োগ ছাড়িয়ে সরকার লাভপ্রতুল কোনো উৎপাদনশিল্পে প্রবেশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরিকল্পনার বিপক্ষে ব্যবসায়ী-শ্রেণীর নানা যুক্তিতর্ক তখনই একটু বেশি উচ্চনাদ হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে নানা ধরনের বিনিয়োগের উদ্যোগ করা হয়েছে, তাতে দেশের ভিত্তিক ব্যবস্থা মোটামুটি একটা দার্ঢ্যে পৌঁছেছে, যদিও ভবিষ্যতেও প্রতিটি পরিকল্পনায় পরিবর্ধন-সংরক্ষণ-পরিবর্তনহেতু পর্যাপ্ত ভিত্তিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, তাহলেও মনে হয় রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগের বিন্যাস এখন থেকে একটু নতুন করে সাজানো সম্ভব: ইস্পাতে, সিমেন্টে, কলকব্জা তৈরিতে, সারোৎপাদনে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগের আনুপাতিক মাত্রা বাড়িয়ে গেলে এমনকি উৎপাদনগত লাভের একটি মহদংশও বছরের-পর-বছর পুনর্বার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। রাষ্ট্রের কর্মসূচী সম্প্রসারণে লাভের পরিমাপ এবার থেকে কমে যাবার আশঙ্কা, এই প্রজ্ঞাপারমিতা থেকেই যে হঠাৎ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-ধনী জমিদার প্রভৃতিদের পরিকল্পনার ব্যয়সংকুচন ঘটাবার এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কমানোর আগ্রহ, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ব্যয়বৃদ্ধিহেতু মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, গরিবরা না-খেয়ে মারা যাচ্ছে, অতএব বিনিয়োগ কমাও: এমন উদারচরিত্রজনিত ব্যাকুলতায় এই শ্রেণীর লোকেরা অবশ্যই ভুগছেন না।

পুঁজিপতিরা অতীতে চেঁচামেচি করেছেন, এখন করছেন, ভবিষ্যতেও

করবেন, সুতরাং, নিজেদের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে আমরা যদি কৃতনিশ্চয় থাকি, তাদের বক্তব্য নিয়ে তেমন মাথা না-ঘামালেও চলে। কিন্তু বিপদের সূত্রপাত ঘরের শত্রু বিভীষণদের কাছ থেকে। পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ পরিণতি এই মূল্যবৃদ্ধিতে, সুতরাং হঠকারিতা আর নয়, ভারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এবার বন্ধ করতে হবে, পরিকল্পনাকে ছোটো করে আনতে হবে, পণ্ডিত নেহরুর আরব্ধ আকাশকুসুমচয়নে এবার যতি পড়ুক: এরকম উক্তি করতে শোনা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের, সমাজতন্ত্র গঠনের প্রকবণ-প্রকল্পের জন্য যাঁদের উপর আমরা নির্ভরশীল। সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এমন কোনো-কোনো রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে পর্যন্ত এই আতঙ্কধর্মে দীক্ষা নিতে দেখা যাচ্ছে আজকাল।

সতেরো বছরের প্রয়াসে কোথায় পৌঁছুলাম আমরা তাহলে? স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, মাত্র দু-তিন বছরের তদ্গত চেষ্টার ফলে খাদ্যসমস্যা দূর হবে, আমরা খাদ্যশস্য রপ্তানী করতে শুরু করব। অথচ আড়াইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরও আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি, মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪৭ সালের তুলনায় আদৌ বাড়ে নি। অবশ্য বলা চলে সোভিয়েত ইউনিয়নেও বিপ্লবের পরবর্তী পনেরো বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে গিয়েছিল, সুতরাং আমাদের খুব-একটা উতলা হওয়ার হয়তো এখনো কারণ ঘটে নি। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সোভিয়েত দেশে অন্তত আর্থিক-প্রগতিতে যাদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না সেই কুলককুলকে কৃষিভূমি থেকে অপসারিত করা সম্ভব হয়েছিল এবং শিল্পক্ষেত্রে শুধু যে কয়লা-ইস্পাত-বিদ্যুৎ ভারি শিল্পের বিশ-পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি ঘটেছিল তা-ই নয়, সমাজতন্ত্রের চিন্তা-আদর্শ-অনুভাবনার সঙ্গে চেতনার ওতপ্রোত সংমিশ্রণমণ্ডিত শত-সহস্র এক রাজকর্মচারী বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল: পরের দুই দশকে এই রাজ-পুরুষরাই যুগপৎ আর্থিক প্রগতিকে দ্রুততর, এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে।

পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বহু জায়গায় বহু বিভঙ্গে নিজের স্বপ্ন-ইচ্ছা-বাসনা ব্যক্ত করেছেন, এবং অন্তত আদর্শের দিক থেকে সাম্যবাদী সমাজ তাঁর বিচারে সর্বোচ্চে স্থান পেত তা জোর দিয়েই বলা চলে। নিজে শৌখিন বড়ো ঘরের মানুষ, এবং কংগ্রেসের ভিতরে সাম্যবাদী দল

গড়ার সক্রিয় ভূমিকা তিনি কোনোদিনই নেন নি, কিন্তু তাহলেও অগণিত সাম্যবাদে আস্থাশীল রাজনৈতিক কর্মী তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, উৎসাহ পেয়েছেন, কখনো-কখনো অর্থসাহায্য পর্যন্ত পেয়েছেন। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ নেই, কিন্তু বিকল্পভাষণে যে-সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রতিজ্ঞা সংবিধানে ঘোষিত, তা সমাজতন্ত্রের নিকট প্রতিচ্ছায়া। কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পনেরো বছরে রাষ্ট্রচালনার বিভিন্ন ব্যাপারে কখনো-কখনো একটু-আধটু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ছোঁয়া লেগেছে ; এরকম আকস্মিকতা কিয়দংশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বপ্রসূত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান ওজস জুগিয়েছেন পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং। সর্দার বল্লভভাই পটেলের সমচিন্তাধর্মী কেউ গোড়া থেকে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পুরুষ হলে আজ যে-অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি, তা হয়তো আরো দশ বছর আগে উপস্থিত হত।

এ সমস্ত কথাই বিনম্র চিত্তে মেনে নেওয়া ভালো, কিন্তু তাহলেও শেষ পর্যন্ত এটাও মানতে হয় পণ্ডিত নেহরুর সমাজতন্ত্রপ্রীতি আখেরে ভারতীয় জনসাধারণকে কোনো বৈষম্যবিদূরিত পারিজাতভূমিতে উত্তীর্ণ করতে পারেনি, ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আপাতত তমিস্রাচ্ছন্ন, এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই এ ধরনের পরিণতির আশঙ্কা স্পষ্ট হচ্ছিল। অন্তত ১৯৬০ সাল পর্যন্ত, পণ্ডিত নেহরুর সার্বভৌম সম্রাটপ্রতিম ক্ষমতা ছিল, অথচ এই ক্ষমতার অত্যন্ত সামান্যই সমাজতন্ত্রপ্রসারে নিয়োজিত হয়েছে। সন্দেহ না হয়েই পারে না, জবাহরলালজীর কাছে সমাজতন্ত্র বরাবর সন্তর্পণে-তুলে-রাখা আদর্শের মতো হয়েছিল, জাতীয় জীবনে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করার প্রাকরণিক দিক সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা কোনোদিন ঘোচে নি। অথবা একটু সংশোধন করে এটাও বলা চলে হয়তো প্রকরণগুলির বিষয়ে তিনি জানতেন, কিন্তু লক্ষ্য, যা দূরের জিনিস, আপাতত আমাকে-আপনাকে কুম্ভিপাকে জড়াচ্ছে না, তাতে আস্থা থাকলেও, লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য নিয়োজিতব্য প্রকরণে তাঁর বিন্দুমাত্র সায় ছিল না।

এখানে শ্রেণীবিভাজনের প্রসঙ্গে বাধ্য হয়ে আসতে হয়। আমার একটু আগের উক্তিতে ফিরছি, জবাহরলাল শৌখিন বড়ো ঘরের মানুষ। একসঙ্গে অনেকগুলি গুণে তাঁর আজন্ম বিহার : চারিত্রিক ঔদার্য, সহচরবাৎসল্যবোধ, বিনয়সৌজন্যমমতা, নোংরামি-নীচুতা—ইত্যাদি—ঘোর অপছন্দ করা ; অন্যপক্ষে

আবার তেমনি আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস, কোনো সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অনীহা, যে-কোনো সংঘাতে অদ্বান্দ্বিক সমাধান অন্বেষণ। মুস্কিল হল সমাজতন্ত্র শুধু শৌখিন প্রকল্প নয়, শ্রেণী সমস্যাকে উহ্য রেখে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন সম্ভব নয়। আমি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু স্থির করলাম ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র হবে, অতএব আমি ঢালাও হুকুম দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে আমার যারা রাজপুরুষ তারা সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার নিল, চোখের পলকে দেশে সাম্যের বন্যা বইল, এমনধারা হবার নয়। দেশে শ্রেণীগত সাম্যসংগঠন তিতিক্ষার ব্যাপার, অনেক অধ্যবসায়, অনেক নির্দয় সংস্কার, অনেক সুচিন্তিত স্থাপত্য পেরিয়ে তবে সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব। মনে হয় পণ্ডিত নেহরুর সেই হৃদয়হীনতা ছিল না, সেই সহিষ্ণুতা ছিল না, সে রকম কোনো চিন্তার প্রব্রজ্যা তাঁকে পীড়িত করে নি। সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভপ্রতিজ্ঞা হিসেবে বহুবার বহু কথা বলেছেন, কিন্তু এক উক্তি থেকে আরেক উক্তির মধ্যে কোনো কীর্তির সেতু থাকে নি। সমস্তই ভাসা-ভাসা কবিতা থেকে গেছে, তাই রূপুলি রূপকথার বেশি কোথাও এগোয় নি। সমাজতন্ত্র আনতে হলে ধনী-স্বার্থে টান পড়বে, তারা বাধা দেবে, জোট বাঁধবে, একটা হামলা হবে, প্রতিনিয়ত এ রকম হামলা হতে থাকবে, কিন্তু তাতে পিছু পা হলে চলবে না, আত্মসমর্পণ মানে সমাজ-তন্ত্রের জলাঞ্জলি : মনে হয় না জবাহরলাল এ সব বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তাকর্ম-পরম্পরা সূত্রবদ্ধ প্রকরণ প্রয়োগের কথা ভেবেছেন। এবং সেজন্যই, কার্যক্ষেত্রে যখনই সামান্য বাধা পেয়েছেন, প্রতিহত হয়ে ফিরেছেন, হয়তো তাঁর ভদ্রতায় বেধেছে, হয়তো তাঁর মনে হয়েছে সংঘাত অশালীন। ভূমিসংস্কারের নামে দেশ জুড়ে যে বিরাট ভাঁওতা বছরের পর বছর ধরে চলে এসেছে, কৃষির অগ্রগতিকে যা রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাস করা শক্ত যে পণ্ডিত নেহরু তার স্বরূপ চিনতে পারেন নি। অথচ তদ্‌সত্ত্বেও এই ভাঁওতাকেই তিনি স্বীকার করে গেছেন, কারণ অন্যথা দলগত অশান্তি, হামলা, মামলা, এ প্রদেশে ওপ্রদেশে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিসংবাদে নবকল্লোলসংযোজন, অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা। মনে-মনে হয়তো হিসেব কষেছেন, তার চেয়ে নিশ্চলতা ভালো, স্থবিরতা ভালো।

নিজে সমাজের যে-স্তর থেকে এসেছেন, তাঁর পাশে অবস্থিত রাজ-কর্মচারীরাও সেই স্তরেরই মানুষ। তাঁদের উপর অতএব প্রচুর আস্থা অর্পণ করে গেছেন, ভেবে নিয়েছেন যে তাঁর নিজের সমাজবোধ ও জীবনদর্শন এই

রাজপুরুষদেরও উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু আসলে তা হয় নি, হতে পারে না বলেই হয় নি। সব-কিছু ছাপিয়ে শ্রেণী স্বার্থ, পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল সৌধ গড়ার দায়িত্বভার যাঁদের দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন, তাঁরা তাঁর ছায়াশ্রয়ে সমাজতন্ত্রের অছিলায় চমৎকার চমৎকার নিভৃত স্ববেদারি স্থাপন করে গেছেন, অথচ পণ্ডিত নেহরু নির্বাক থেকেছেন। ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশেই রাষ্ট্রক্ষমতা কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত কুড়ি বছরে হু-হু বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সমাজতন্ত্র তাতে পরাহত, কারণ রাষ্ট্র নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ব্যাপার, রাষ্ট্রকে উপলক্ষ করে যে-তর্পণ, তা নিখুঁত বিভঙ্গে প্রতিনিয়ত কয়েকটি জঙ্গী ভদ্রলোক লুটে-পুটে খান। দেখে-শুনে মনে হয়, আমাদের সে অবস্থায় পৌছুতে খুব বেশি বাকি নেই: সংবিধানে যা-ই লেখা থাক, রাজপুরুষদের শ্রেণীস্বার্থপ্রসাধিত প্রসাদে শিল্পপতিব্যবসায়ীকুল নিজেদের সুখসম্পদঐশ্বর্য গত দেড় শতকে বহুগুণ বাড়াতে পেরেছেন। প্রধান রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রধান শিল্পপতিদের নিবিড় হয়ে-আসা সখ্যের কথা পণ্ডিতজীর অজানা ছিল না, এ-বিষয়ে অনেক ফিরিশতি, অনেক তথ্য থেকে-থেকে পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে তাঁর হয়তো নম্রতায় বেধেছে, বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও হয়তো জন্মগত সৌজন্যবোধ তাঁকে নীরব করে দিয়েছে।

আর্থিক প্রগতির প্রাকরণিক দিক নিয়েও পণ্ডিত নেহরু ঠিক অনুরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতবর্ষ শিল্পান্বিত হবে, শস্যশ্যামলা হবে, দেশের অগণিত জনসাধারণ বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-প্রতিভার দীপ্তিতে পৃথিবীর অন্য-সবাইকে অতিক্রম করবে, বিজ্ঞানের জাদু আমাদের জীবনধারাকে সোনায় মুড়ে দেবে: তাঁর এবংবিধ স্বপ্নকামনায় সামান্যতম ফাঁক ছিল না—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের স্বপ্ন বোন্‌বার মুহূর্তে অনেক সময়ই তাঁর ভাষণ সংগীতমূর্ছিত কবিতার রূপ নিয়েছে। কিন্তু, অকরুণ শোনালেও বলতেই হয়, আর্থিক প্রগতি সংসাধনে তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞান তার বেশি বিশেষ এগোয় নি। আমৃত্যু জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদের সভাপতি থেকেও প্রায়ই তিনি পরিষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তির্যক ব্যঙ্গ করতেন যেন তাঁর নিজের কোনো দায়িত্ব নেই, যেন তাঁর নিছক মুক্তপক্ষ উদাসীন পাখির ভূমিকা। এই উন্মার্গযাত্রার ফলাফল আপাতত ভোগ করছি আমরা দেশবাসীরা। অধ্যাপক মহলানবিশ এবং অন্যান্য কয়েকজন বহু বছর ধরে চেষ্টা করেছেন প্রগতির প্রাকরণিক দিক নিয়ে চিন্তায় আলোচনায়

জবাহরলালজীকে আকৃষ্ট করাবার জন্য, কিন্তু পাখি ধরা পড়ে নি। সন্দেহ না হয়েই পারে না যে পণ্ডিত নেহরু আর্থিক প্রগতির দুই মূল্যবান সূত্রের একটি শিখেছিলেন, অন্যটি শেষ পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধির বাইরে ছিল। ইস্পাত—ভারি শিল্প—কলকব্জা তৈরি বাদ দিয়ে আমাদের মতো দরিদ্র, রপ্তানীরহিত দেশের দ্রুত প্রগতি সম্ভব নয় এটা তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন, এবং বিনিয়োগের বৃহদংশ যে ওরকম কয়েকটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন তা মেনে নিতে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়নি। কিন্তু বিনিয়োগের বিন্যাসে ভারি শিল্পাদির যতটা প্রাধান্য ঘটলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্দেশ দেবে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়ার, অন্যথা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে একদিকে যেমন অসাম্যের সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে তেমনি বিনিয়োগানুগ সঞ্চয়ের অভাব ঘটবে, সব মিলিয়ে জাতীয় প্রগতির হার ব্যাহত হবে। এই দ্বিতীয় সূত্রটি হয় পণ্ডিত নেহরু আদৌ বুঝতে পারেন নি, কিংবা পারলেও অবহেলাভরে পাশে সরিয়ে রেখেছেন।

কারণ স্পষ্ট। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানো মানেই তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রসাধনা, ভোগবিলাসের মাত্রা কমিয়ে সারল্যে ফেরা, নিরাভরণতায় পুনশ্চারণ। কে করবে এই কৃচ্ছ্রসাধনা? দেশের চাষী, মজুর, নিম্নবিত্তদেব জীবনযাত্রার মান নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া নিরর্থক, কারণ তারা অধিকাংশই অনাহারের উপান্তে, তাছাড়া সমাজের উপরের ধাপ থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন না করলে সে-রকম নির্দেশদান অক্ষমার্হ ধৃষ্টতা। সুতরাং জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে হলে অনুরোধ জানাতে হয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের কাছে, ধনী জমিদারদের কাছে, অন্যান্য নানা উচ্চবিত্তদের কাছে। কিন্তু এখানে হয়তো শ্রেণীচেতনার ছায়া পড়েছে, পণ্ডিত নেহরুর মন সরেনি; নয়তো, অভিজাত পুরুষ জবাহরলাল, পূর্ব ইওরোপে সমাজতন্ত্র গঠনের অন্তর্লীন সময়ে, এবং চীন দেশে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি হেতু যে ক্লিন্নতা মলিনতা দেখেছেন, ভারতবর্ষে উপস্থিত মুহূর্তে তার প্রতিচ্ছায়া দেখতে চান নি, সুতরাং বিরত হয়েছেন।

কিন্তু যেহেতু ধনবিজ্ঞানের সূত্র মিথ্যে হবার নয়, জাতীয় সঞ্চয়ের ঢিমে-তালে এগোনোর প্রতিফলে অভিজ্ঞ হতে হচ্ছে সর্বস্তরের ভারতবাসীদের। বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সঞ্চয়ের হার স্থাণু থেকেছে, এবং মধ্যবর্তী শূন্যতা পূরণ করার জন্য বিদেশী কুমিরকে খাল কেটে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। পরিণামে সম্প্রতি আমাদের আত্মচলৎশক্তি প্রায় বিলুপ্ত;

বিদেশী প্রসাদে যাদের জীবননির্বাহ তাদের বিবেক বিসর্জন দিতেই হয়, আজ না হোক আগামী কাল। পণ্ডিত নেহরুর কৃচ্ছ্রসাধনায় বীতরাগ, স্বীকার করে নেওয়া ভালো, আমাদের দুর্বিষহতর অপর এক গ্লানতায় পৌছিয়েছে।

পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকমাস গত হয়েছে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এমন আমরা অনেকেই তাঁর কাছ থেকে প্রেরণার উৎস পেয়েছি, দিগ্‌নির্দেশ পেয়েছি। সুতরাং কারো কারো কাছে উপরের বিশ্লেষণ একটু একপেশে এবং রুচিহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু জাতির এবং সমাজতন্ত্রের উদ্যতখড়্গ সংকটমুহূর্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মোহমুক্তির। পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি অনেক জেনেছি, কিন্তু যদি বাঁচতে চাই, এগোতে চাই, সাম্যসমৃদ্ধিঘেরা উজ্জ্বলকজ্জ্বল কোনো সমাজ ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের মাটিতে সংস্থাপিত করতে চাই, তাহলে এই উপলব্ধি থেকে আমাদের শুরু করতে হবে যে, আজ আমরা প্রতিক্রিয়াজর্জর যে-নৈরাশ্যে কোণঠাসা, তার জন্য ইতিহাসের বিচার অনেকাংশেই তাঁকে দায়ী করবে। দীর্ঘ সতেরো বছরের পরিসরে শুভ সুযোগ নষ্ট হয়েছে অনেক, কিন্তু, তার চেয়েও যা বড় কথা, প্রগতিপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার সুবিধা নিয়ে রাহুর দল নিজেদের পথ পরিষ্কার করেছে। পণ্ডিত নেহরু, সখেদেই বলছি, রাহুদের বাধা দিতে চান নি, বা পারেন নি।

জবাহরলাল গত হয়েছেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অবশ্যই শ্রদ্ধা নিবেদন করব, তা আমাদের কর্তব্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এই আপ্তবাক্যগুলি মনে রাখাও আমাদের কর্তব্য ; এগুলি ভুললে সর্বনাশ। কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়া আর্থিক প্রগতি অসম্ভব, দর্শন-আদর্শরহিত আমলাবাহিনীর উপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্রে পৌছনোর প্রস্তাব বাতুলের প্রলাপ, এবং সবশেষে, ব্যক্তি যতই মহৎ হোন না কেন, শ্রেণীস্বার্থ অতিক্রম করে যেতে কোথাও না কোথাও তাঁর অক্ষমতা প্রকট হবেই, কারণ জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

দেবেশ রায়

তিনপুরুষের উপাখ্যান

প্রথমে শিবদাসের সমস্ত মূল্যই ছিল তার বাবার ছেলে হিসেবে, তার প্রথম ছেলে ও প্রথম সন্তান,—সুতরাং সেই অনুপাতে তার বাবা শিবদাসের জীবনটিকে ধীরে ধীরে মূল্যবান করে তুলেছিলেন। শিবদাসের পর তার একটির পর একটি বোন জন্মাতে লাগল, এবং এক-একজনের জন্য বিয়ে-শিক্ষা-লালনপালনের খরচ বাবদ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আনুমানিক ব্যয়ের ঘরে যত জমতে থাকে, ততটাই শিবদাসের জীবনের মূল্য হিসেবে যোগ হয়। শিবদাসের বাবা নিজে চোখে দেখেছেন যে তাঁর মামাকে কী অসম্ভব কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে। মাত্র একপুরুষের মধ্যেই সে আদি ব্যবসায়ীর স্মৃতি ও অভ্যাস এত পুরনো হয়ে যায় নি যে মেয়েদের বাবদ সব খরচ যে আসলে ছেলের হাত দিয়েই ফিরে আসবে—তা তিনি হিসেব করেন না। এ-ক্ষেত্রে তাঁর হিসেবটা এ-রকম ছিল না যে ছেলের বিয়েতে প্রচুর টাকা পণ নেবেন, সোনা নেবেন, সম্পত্তি নেবেন, আর তাতেই সব উসুল হয়ে যাবে। ছেলের বিয়েতে তাঁকে পণের টাকা, সোনা ইত্যাদি নাও নিতে হতে পারে,—যদি কুলীন কায়স্থ ঘরের মেয়েব জন্য ওটুকু মূল্য দিতে হয়, দিতে হবে। আসলে যত মেয়ে হচ্ছে, এই এত বড় সম্পত্তি, এত টাকা-পয়সা, এত ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা-শোনা রক্ষার ভার তত বেশি করে শিবদাসের উপরই বর্তাচ্ছে আর তত বেশি করেই শিবদাসের জীবনের মূল্য তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। শিবদাসের বাবা মামার সম্পত্তি পেয়ে লক্ষপতি, সেটাকে বাড়িয়ে এখন কোটিপতি কি না তা স্থির করার জন্য নানারকম হিসেব-নিকেশের দরকার—সুতরাং শিবদাসের জীবনের ক্রমবর্ধমান মূল্য তিনি মনে মনে পুষে রাখেন নি। প্রতিটি মেয়ে হয়েছে, প্রতিটি মেয়ের জন্য এক-একটা বীমা করেছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শিবদাসের জীবনের উপর সমপরিমাণের আরো একটা বীমা করে দুদিক থেকে সাবধান হয়েছেন।

তাদের সেই সেকেলে জমিদারদের মতো বিরাট বাড়িতে শিবদাস যখন পড়ে-পড়ে হাঁটা শিখছে তখন-ই সে বাড়ির আর সবার কাছে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ বলে পরিচিত, কিন্তু সত্যি সত্যিই তখন বিভিন্ন বীমা কোম্পানির অফিসের খাতাপত্রে শিবদাসের জীবনের উপর বহু টাকার বাজি ফেলে রাখা হয়েছে। প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান প্রিমিয়াম দিয়ে-দিয়ে শিবদাসের বাবার মন বেশ ক্রমবর্ধমান পুত্রস্নেহে পূর্ণ হয়েছে: সৎ-বিনিয়োগে খাঁটি ব্যবসায়ীর যে-আনন্দ। ফলে শিবদাসের যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তার বাবার সম্পত্তি-র পরিমাণ করার সময় তাকেও সংরক্ষিত মূলধন হিসেবে ধরতে হত, কারণ শিবদাসের জীবনের মূল্য তখন কাগজে-কলমে আশি হাজারে পৌঁচেছে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী মুদ্রাহার-অনুযায়ী) এবং তখন অতি সুলভ মৃত্যুর মধ্যে শিবদাস একটি অতি মূল্যবান বিনিয়োগ হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে তার বাবার আনন্দ বর্ধন করেছে: সেদিক থেকে শিবদাস সত্যিই নন্দন। পুত্রের যৌবনলাভ ও এত দামি ও দীর্ঘমেয়াদী একটি পুঁজি শেষ পর্যন্ত সুদে-আসলে ফুলে-ফেঁপে প্রায় বর্ষাকালের কলাগাছ হয়ে-ওঠা,—এতে শিবদাসের পিতার যথেষ্ট আহ্লাদ হয়েছিল, প্রায় যুবক রামকে দেখে দশরথের মতো। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত ঐতিহাসিক অর্থ,—যেমন কিছু কৃষকের কাছে উড়োজাহাজের ঘাঁটি তৈরি করার জন্য তার চাষের জমি ক্রোক হয়ে যাওয়া—তেমনি শিবদাসের বাবার কাছে—সামগ্রিকভাবে জীবনের উপর আক্রমণ ঘটিয়ে তাঁর পুত্রের জীবনের উপর ধরা বাজির মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া।

সুতরাং, সাবালক হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও ব্যবসায়ে প্রবেশ করার মুহূর্তে শিবদাসের মূল্য—তার বাবার পুত্র হিসেবে যেমন, তেমনি নিজে একটি ধুকপুক-করা হৃৎপিণ্ডের অধিকারী হিসেবে, বেশ উচ্চ।

সবার হৃৎপিণ্ড-ই ধুকপুক করে, শিবদাসেরটার ধুকপুকুনির দাম এত বেশি কেন। সাড়ে তিন বা চার বিঘে জমির উপর শিবদাসদের যে-বসতবাটী তার নিচের তলার হলঘরের চার দেয়ালে অনেকগুলো বড়-বড় সাইজের তৈলচিত্র যদিও প্রাচীন জমিদার বংশের একটা আমেজ আনার চেষ্টা করে, তবু, শিবদাসের হৃৎপিণ্ডগুলোর দাম বেড়েছে মাত্র দু-পুরুষ হল,—শিবদাসের পিতামহের জীবনের মূল্য এত বেশি ছিল না।

শিবদাসের বাবার নাম হরদাস ও পিতামহের নাম রমাদাস। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষদিকে রংপুর জিলার অন্তঃপাতী ডোমার গ্রামের পশুপতির জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বড়শুভইড্যা গ্রামের রমাদাসের বিবাহ হয়। উভয় পরিবারই বংশানুক্রমিকভাবে সূত্রধরের কাজ করে। রমাদাসের গ্রামে বেশ বড় দোকান ছিল, কেননা বড়শুভইড্যা গ্রামে বেশ বড় জমিদার ও ধনী গন্ধবণিকশ্রেণীর বাস ছিল এবং যে-সকল গৃহে অন্নপ্রাশন-বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আর বিরতি ছিল না, এবং সেসব অনুষ্ঠানে সদাসর্বদাই নানাপ্রকার আসবাবপত্রের বরাদ্দ রমাদাসের উপর পড়ে। অপরদিকে ডোমার নেহাতই একটি গণ্ডগ্রাম, সে কারণে পশুপতির অবস্থা তাদৃশ সমৃদ্ধ ছিল না। পশুপতিব দুই ছেলে, বড়টির নাম শ্রীপতি, ছোটটির নাম রণপতি। রণপতি ডোমার ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ে, ইতিমধ্যে শ্রীপতির বিবাহ হয় ও পিতার সঙ্গে শ্রীপতি দোকানে কাজকর্ম শুরু করে। দোকানের উপার্জন যা, তাতে দুই ভাইয়ের পরিবারের—যদিও রণপতি অবিবাহিত—সঙ্কুলান হয় না। এমতাবস্থায় একদিন রণপতি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গ্রাম ত্যাগপূর্বক হাঁটাপথে পার্বতীপুর অভিমুখে রওনা হয়, পার্বতীপুরে তখন নতুন রেললাইন পাতা উপলক্ষে প্রচুর লোকজনের প্রয়োজন ছিল। পশুপতি যদিও রণপতির গৃহত্যাগে আন্তরিক দুঃখিত ছিল, তবু গ্রামে অন্নসংস্থানের কোনো উপায় নাই বিবেচনাপূর্বক, সে বাধা দেয় না।

এর পর রণপতির কার্যবিধি সম্পর্কে কোনো কথা জানা যায় না। তখন, এখনকার মতো চিঠিপত্র লেখা বা যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। ফলে রণপতির সঙ্গে তার বাড়ির খুব যোগাযোগ ছিল না। আর, পরবর্তীকালে, যখন সমৃদ্ধিলাভ ঘটেছে, রণপতি নিজের এই সময়ের জীবনযাপন সম্পর্কে কোনো কথা বলে না। তবে যতটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে রণপতি পার্বতীপুরের রেলওয়েতে কোনো কাজকর্মের সংস্থানে অক্ষম হয়। সে সময় সে লোকমুখে শোনে যে, লালমনিরহাটের পথে যদি ডুয়ার্সে যাওয়া যায়, তবে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চা-বাগানগুলিতে প্রচুর কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রণপতির কোনো পিছুটান ছিল না, সে সেই পথে অগ্রসর হয়।

কালক্রমে বহু কষ্ট ও অনুসন্ধানের পর রণপতি এক চা-বাগানে পৌঁছায়। সেকালে ডুয়ার্স অঞ্চল ম্যালেরিয়া-ব্ল্যাকওয়াটার ইত্যাদি অসুখের জন্য খুবই

কুখ্যাত ছিল। চা-বাগানে কাজ করার জন্য কোনোপ্রকার কুলি-মজুর অতি দুর্লভ ছিল ও মাত্র দু-একজন কর্মচারি এই সুদূর চা-বাগানগুলিতে কর্মব্যপদেশে ব্যাপৃত ছিল। এই সময়, এইহেন স্থানে, এইরূপ একটি যুবক সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে এবং বড়বাবু যুবকটিকে সাহেবের কাছে উপস্থিত করেন। সাহেব যুবকটির সাহস ও উৎসাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্বক কোনো কর্মে নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। রণপতির হাতে যেন চাঁদ ধরা দিল। রণপতির ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত শিক্ষা আছে, সুতরাং সাহেবের ইচ্ছা সে বাগানের কাজ করে। রণপতিরও তদ্রূপই বাসনা। কিন্তু বড়বাবু সাহেবকে বোঝান যে, রণপতির মতো সাহসী ও উৎসাহী যুবককে বাগানে আটক রাখা ঠিক নয়, বরঞ্চ, প্রতি মাসের প্রথমে রণপতি কিছু অর্থসহ বাগান ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি লালমনিপুরহাট-পার্বতীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ক্রয় করুক ও বাগানে আনুক, এই কারণে কিছু বেতনের সঙ্গে জিনিসপত্রেব ক্রয়মূল্যের উপর কিছু সামান্য লাভ-ও তাকে দেওয়া হোক। তখন রণপতির এমন অবস্থা যে যে-কোনোপ্রকার কর্মের জন্যই সে প্রস্তুত, তবু-ও সারা মাসব্যাপী ঘোরাঘুরি হাঁটাহাঁটির এই প্রস্তাব অপেক্ষা সাহেবের প্রস্তাব তার নিকট লোভনীয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয় এই বড়বাবু তার অসীম উপকার সাধন করেন।

রণপতি যে সাহসী ও শ্রমশীল বোধহয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। যে-যুবক তেইশ বৎসর বয়সেও বিবাহ না করে, ও বাপ-পিতামহর বংশগত পেশাতে-ই সন্তুষ্ট না থেকে নতুন জীবনের কথা ভাবে, তার জীবন, সংকটের ও বিপদের মধ্য দিয়ে হলেও, সাফল্যের শিখরে পৌছাবেই। একটি চা-বাগানে মাসিক জিনিসপত্র সরবরাহের দায়িত্ব রণপতির উপর ন্যস্ত হওয়ায়, অসাধারণ পরিশ্রম ও বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে নানা জায়গায় নানা জিনিসের সন্ধান, একই জিনিসের নানা দামের সন্ধান, নির্দিষ্ট মহাজনের সঙ্গে ব্যবসায়ের মধ্যে কতটা নিশ্চিতি ও লাভের সন্ধান এবং সাধারণভাবে নগদ টাকার যে-কোনো ব্যবসায়ীর কাছেই জিনিস ক্রয়ের স্বাধীনতায় কতটা নিশ্চিতি ও লাভের সন্ধান,—ইত্যাদি-র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলনামূলক বিচার বিবেচনান্তে এক-এক জায়গায় এক-একরকম আচরণ ও পদ্ধতি গ্রহণপূর্বক সে যে মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই বাগানের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহকারীর পদ থেকে নিজেকে বাগানের নিকট বিভিন্ন জিনিসপত্রের একমাত্র বিক্রেতার

পদে উন্নীত করে তাতে কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কর্মযোগী জামসেদজী টাটা ও কর্মসাধক আলামোহন দাসের ঐতিহাসিক তিতিক্ষা, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের কথা মনে পড়ে। অবশ্য ঐতিহাসিক বিচারে রণপতি ঐ কর্মবীরগণের পর্বেরই অন্তর্গত। বিশেষত এই কথা যখন মনে পড়ে যে নিজের বুদ্ধি ও শক্তি ব্যতীত রণপতিব কোনো মূলধন ছিল না ও বাগানেব কর্মচারিগণের অর্ডারি জিনিস সববরাহেব জন্য প্রাপ্ত আগাম থেকেই, তার নিজস্ব ব্যবসায়ের জিনিস ক্রয়ের টাকা তুলতে হত।

এই সময় মাঝেমধ্যে রণপতি বাড়িতে দু-একদিনের জন্য কিছু টাকা-পয়সা দিতে আসত। পশুপতি টাকাটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণের পর দুঃখ করত যে, তার পুত্র বংশ-ব্যবসা করে না বলে তাদের জাতির কেউ বিবাহের জন্য প্রস্তাব-ও করে না।

এই সময় একবার রণপতি বাগানের যাবতীয় কাঁচি-ছুরি, কোদাল ও ঝুড়ি সরববাহ করার অর্ডার পায়। কিন্তু এইজন্য কোনোপ্রকার টাকা আগাম দেওয়া হয় না। রণপতির এই গভীর ভবিষ্যৎ-বোধ ছিল যে সে বোঝে এই সরবরাহের উপর তার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অর্ডারটি গ্রহণান্তে টাকা ও জিনিসপত্রেব চিন্তায় নিশ্চয়ই রণপতির মতো ধীরস্থির ব্যক্তিকেও রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করতে হয়। এবং সেই সূত্রেই রণপতির হঠাৎ ভগ্নীপতি রমাদাসের কথা মনে পড়ে ও সে তৎক্ষণাৎ গুভইড্যার দিকে যাত্রা করে।

এই সূত্রেই এত দীর্ঘদিন পর রমাদাসের সঙ্গে রণপতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরবর্তী কালে রমাদাসেব পুত্রগণ তাদের মামা রণপতির সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। পরবর্তী কালে যদিও রমাদাসের পুত্রগণের প্রচারের ফলে এ-কথা প্রচারিত যে রণপতি ও রমাদাস যুক্তভাবে ব্যবসায় করে, তবু এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না যে, রণপতির সঙ্গে কিছু কর্মকারের পরিচয়সাধন করানো ছাড়া তার সঙ্গে রমাদাসের ব্যবসায়গত কোনো সম্পর্ক ছিল কি না। কারণ যদিও এর পর থেকেই রণপতি প্রায়শই গুভাইড্যাতে যাতায়াত কবত, তবু, কোনোদিন রমাদাসকে গ্রামত্যাগপূর্বক অন্যত্র যেতে দেখা যায় নি এবং তার জীবনযাত্রারও কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল না।

যাহোক প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ছয়শত একর আয়তন-

বিশিষ্ট ও বৎসরে দেড় হাজার মণ চা উৎপাদন হয়—এইরূপ একটি চা-বাগানের মালিক শ্রীরণপতি রায়ের (চা-বাগানটি স্থাপন করার সময়, রণপতি নিজের পদবী পরিবর্তন করে) মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনপক্ষ থেকে তাঁর সম্পত্তির উপর দাবি আসে। প্রথম পক্ষ: রণপতির পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা গীষ্পতিব বিধবা ও পুত্রকন্যাগণ। দ্বিতীয় পক্ষ: রণপতির ভাগিনেয় শ্যামাদাস, কালিদাস, হরিদাস ও হবদাস। তৃতীয় পক্ষ: রণপতির সঙ্গে স্ত্রীর মতো বসবাসকারিণী এক উরাঁও রমণীর গর্ভজাত পুত্রকন্যাগণ। এই তিন পক্ষের মধ্যে একমাত্র শ্যামাদাস-কালিদাস-হরিদাস ও হরদাসেরই কিছু বিদ্যা ছিল গ্রামের ইস্কুলের উচ্চতর শ্রেণীগুলি পর্যন্ত ও কিছু অর্থ ছিল। সুতবাং বাকি দুই পক্ষকে পরাস্ত করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। পরন্তু সেই দুই পক্ষের যখন সম্পত্তি অপেক্ষা নগদ টাকার দিকেই বেশি লোভ ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই জেলা শহরে সাড়ে তিন বিঘে জমির উপর এই বিশাল বাড়িটি গড়ে ওঠে, দেখলে জমিদার-বাড়ির অনুষঙ্গ আনে। এই বাড়িটির নিচেব তলার হলঘরে কয়েকটি তৈলচিত্র টাঙানো হয়, শ্যামাদাস-কালিদাস-হরিদাস ও হরদাসের পিতা রমাদাসের ও রণপতির, ও রমাদাসের স্ত্রীর ও আরো একজন মহিলার—কেউ বলে রণপতির মা, কেউ বলে রমাদাসের মা। ঘরটিতে বড় ফরাস ও তাকিয়ার ব্যবস্থা ছিল। ঘরের সামনে বিরাট বড় বারান্দার লম্বা-লম্বা স্তম্ভ একটা গাম্ভীর্যের সঞ্চার করে। বাড়িটি রান্নাঘর ও গোয়ালসমেত দেড় বিঘের উপর, সামনে কাঠা দশ-বাবোর মতো জায়গা, পেছনে দেড় বিঘের মতো জায়গা। মামার সম্পত্তি অধিকার করার সময়ই ভাগ্নেরা নিজেদের পদবী পরিবর্তন করে রায় উপাধি ধারণ করে। এবং শহরে এই বাড়ি রায়বাড়ি বলে বিখ্যাত হয়।

উনিশ শ কুড়ি-একুশ সাল থেকে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত চার ভাই একই সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষা ও সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করেন। সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনা করতেন জ্যেষ্ঠ শ্যামাদাস। বাকি তিন ভাইয়ের একজনের উপর দায়িত্ব ছিল চা-বাগান দেখার, একজনের উপর দায়িত্ব ছিল জোত দেখার ও একজনের উপর দায়িত্ব ছিল শেয়ার মার্কেটের ব্যবসায় দেখার। লাউগাছ যেমন একটি খুঁটিকে আশ্রয় করে মাচার উপর উঠে

চারদিকে বিস্তৃত হয়ে যায়, এই তিন ভাই সে-রকম জ্যেষ্ঠ শ্যামাদাসকে আশ্রয় করে চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল।

উনিশ-কুড়ি থেকে পঞ্চাশ-তিরিশ বৎসরে এই পরিবার এই শহরে নিম্নলিখিত সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলো করেছে—একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা, একটি সংগীত প্রতিযোগিতা (তিনটি স্বর্ণপদকদানের ব্যবস্থা থাকায় সেই প্রতিযোগিতার মূল্য যথেষ্ট), একটি বালিকাবিদ্যালয় ও একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (দুর্ভাগ্যবশত আর-একটি পরিবার থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে যায়), পাবলিক লাইব্রেরীতে দশটি আলমারি বইসহ দান। এবং এইরূপ আরো অজস্র ছোটখাটো দানধ্যানে পরিবারটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এবং আজ শুভইড্যা গ্রামের রমাদাস সূত্রধব, শ্রীরমাদাস রায় হয়ে শহরের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তৈলচিত্রিত।

এই তিরিশ বৎসরে বর্ধিত এই পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় বোধহয় হিসাব পরীক্ষার একটি সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়; বাইরের থেকে দেখা যায়, দুটি চা-বাগানের একচেটিয়া মালিকানা, সেই দুটি চা-বাগান-কে আশ্রয় করা নানারকম অর্ডার সাপ্লাই, কন্ট্রাকটের ব্যবসায়, একটি ছোট ইনসিওরেন্স কোম্পানি, বিরাট জোত-জমি ও আরো নানাপ্রকারের ব্যবসায়-বাণিজ্য।

ক্রমাগত বড় হতে হতে ফেটে যাওয়াই যেমন স্বভাবের নিয়ম, তিরিশ বৎসর ধরে সঞ্চিত অর্থ, বিস্তৃত ব্যবসায় ও পুঞ্জিত অর্থ বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত ফেটে গেছে।

শ্যামাদাসের বড় মেয়ে অকালে বিধবা হওয়ার পর তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিন বিঘের বসতবাটী তিন টুকরো হয়ে যায় কালিদাস, হরিদাস ও হরদাসের মধ্যে। মাঝের মূল বাড়িটা পড়ে হরদাসের ভাগে। এই বাড়িতেই শিশু শিবদাস প্রায় লাখ টাকা মূল্যের জীবনটাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আধো-আধো কথা বলে, ব্যাগ ঝুলিয়ে ইস্কুলে গিয়ে আর একটার পর একটা বোনের বিয়ে উপলক্ষে নিজেকে দুর্মূল্য থেকে দুর্মূল্যতর করে প্রায় লাখ টাকা মূল্যের একটা হৃৎপিণ্ড নিয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ হল, ও, জমিদাররা যে ভাবে ঢোলক বাজিয়ে কোনো প্রজার জমির উপর নিজের মালিকানা ঘোষণা করত, শিবদাসের হৃৎপিণ্ড-ও সে রকম ডুগডুগি বাজিয়ে হরদাস রায়ের বিপুল সম্পত্তির উপর শিবদাসের প্রায় একচেটিয়া মালিকানা ঘোষণা করল।

শিবদাস বিনীত ভাবেই তার অর্থনৈতিক জীবন শুরু করল। প্রথমে সে শহরের উপকণ্ঠে কিছু জমি নিয়ে একটা ইটভাঁটি পত্তন করে। ইটের প্রধান ক্রেতা ছিল চা-বাগানগুলো। কারণ চা-বাগানের মালিকদের মধ্যে আর কারো ইটের ব্যবসা ছিল না। ইটের ভাঁটির উৎপাদন ও বিক্রয়ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা অর্জন করার পর শিবদাস একটা বিশেষ চা-বাগানের ডিরেকটর-বোর্ডে ঢোকার পরিকল্পনা করল। কিন্তু প্রথম বিবাদ বাধল এইখানে যে, নাজদংপুর টি-কোম্পানির শেয়ার যার হাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছিল, সে শিবদাসকে নিতে অস্বীকার করল। এখন অবিশ্যি সত্য নির্ণয় করা কঠিন যে, সেই অস্বীকৃতির ফলেই শিবদাসের জেদ চেপে গিয়েছিল, নাকি, সেই অস্বীকৃতির সংবাদ অত্যন্ত বেশি ছড়িয়ে পড়াতেই শিবদাস রণক্ষেত্রে নামতে বাধ্য হয়েছিল। শিবদাসের মতো একজন তরুণ ব্যবসায়ীর পক্ষে অত বড় একটা কোম্পানির অতগুলো শেয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা খানিকটা দুঃসাহসিকতা বটে—এবং সেদিক থেকে রায় পরিবারের অন্য সভ্যদের সমর্থনও প্রয়োজন ছিল। কারণ ও পদ্ধতি যাই হোক, শিবদাস সরাসরি নাজদংপুরের শেয়ার কেনার ব্যাপারে নেমে গেল। শিবদাসের জ্যাঠামশাই হরিদাস রায় এতদিন শেয়ার মার্কেটেই কাটিয়েছেন, সুতরাং, যেখানে যত শেয়ার জানা ছিল, রায়-বাড়ির পৈতৃক চা-কোম্পানির—পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে যার নাম রামদাসপুর রাখা হয়েছিল—নামে সেই সব শেয়ার কেনা হতে লাগল। শেয়ার কেনার প্রতিযোগিতায় নাজদংপুরের যে শেয়ারের দাম ছিল দুইশত টাকা, সাতদিনের মধ্যে তা দু হাজার টাকায় বিক্রি হতে লাগল। প্রধানত হরিদাস রায়ের কৃতিত্বেই নাজদংপুরের একান্নভাগ শেয়ার এসে জমা হল রামদাসপুর টি-কোম্পানির নামে। এবং নাজদংপুরের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল শিবদাস।

নাজদংপুরের শেয়ারের ব্যাপারে শিবদাসই যদিও প্রত্যক্ষ জড়িত, তবু, আসলে অতগুলো শেয়ার যদি নগদ টাকায় কিনতে হত তা হলে শিবদাসকে গিয়ে আর তাদের ডিরেকটর্স মিটিঙে চেয়ারে বসতে হত না। যে-পরিবার ভেঙে গিয়ে তিন ভিটেতে তিনটি বাড়ি তুলেছিল, তারাই এবার একজোট হয়ে, আর একটা বাগানেব ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল।

কিন্তু শিবদাস আসলে নিজের মূল্য বাড়িয়ে ফেলল এর পরের ব্যাপারে। হরিদাস রায় এবং রামদাসপুর চা-কোম্পানির মালিকরা শিবদাসকে মালিক

করার জন্য কোম্পানির নামে নাজদংপুরের শেয়ার কেনে নি। এটা তারাও জানত ও শিবদাসও জানত। সুতরাং শিবদাস প্রস্তাব করল, এতদিন পর্যন্ত তাদের দুটো চা-বাগান চালাবার জন্য যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তার পরিবর্তে এখন থেকে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক। এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী রায় বংশের চা-কোম্পানিগুলোর দুটো মুখ তৈরি হল, একটা ম্যানেজিং এজেন্সির মুখ, আর একটি ডিরেকটর্স বোর্ডের মুখ।

তিন তিনটি চা-কোম্পানিকে ছ-ছটা মুখে যে শিবদাস কামড়ে ধরল সে নিজের দক্ষতায় আশ্চর্য হয়ে তড়িঘড়ি পঁচিশ হাজার টাকার একটা বীমা করে রাখল। এতদিন তাব বাবা যে মূলধনটাকে জমিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলেছে, সেটা গড়িয়ে-গড়িয়ে নিজের গায়ে আরো টাকা লাগাতে লাগল।

হরদাস ও শিবদাস—বাপ-ব্যাটা দুজনই স্থির করল—এবার তার একটা বিয়ে হওয়া উচিত। হরদাস যে ক্ষেত্রে কুলীনকায়স্থের মেয়েকে বংশমর্যাদার মূলধন হিসেবে বিচার করে কনে খুঁজতে লেগে গেলেন, শিবদাস সেক্ষেত্রে কনভেন্ট-গান-টাকার সমাহারে গঠিত মহিলার সন্ধানে ব্যস্ত হল। হরদাস কিছুতেই নিজের সূত্রধর পদবীটা ভুলতে পারেন না। শিবদাস কিছুতেই সে-কথা মনে আনতে চায় না। ফলে দু বৎসর এ রকম করেই কাটল, হরদাস পছন্দ করেন শিবদাস বাতিল করে, শিবদাস পছন্দ করে, হরদাস বাতিল করেন। দু বছর পর যে মেয়েটি শিবদাসেব স্ত্রী হয়ে এল তার কনভেন্ট-ও নেই, গানও নেই, অথচ বংশগত একটি কুলীন পদবী আছে, পৈতৃক কিছু টাকা আছে ও নিজস্ব কিছু রূপ আছে। টাকা এবং রূপ এ দুটো শিবদাসকে খুশি করেছে। বংশ ও টাকা হরদাসকে। সেদিক থেকে দু বৎসর অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে।

বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে তরুণ ব্যবসায়ীর মনে কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। এতোদিন অপ্রাণী বস্তু ও টাকা হাতাহাতিতে যে দক্ষতা অর্জন করেছে একটি প্রাণীকে নাড়াচাড়া করতে ততটা নিপুণতা সে দেখাতে পারবে কি না—এটাই প্রধান ভাবনা ছিল। আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার পত্নী অতিশয় মনোলোভা অতিশয় শরীর সুন্দরী ও অতিশয় প্রখর হবে, অথচ এত পুঁজি খাটিয়ে যে লোকটি এত-এত ব্যবসা ফেঁদেছে সে জানত মনোলোভনীয়তা শরীর-সৌন্দর্য ও প্রখরতা পত্নীটির নিজেরই মূলধন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিবাহিত জীবনে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল যাতে স্ত্রী তার সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণপনাকে

মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে—একমাত্র শ্রীশিবদাস রায়কেই মুনাফা হিসেবে পাওয়ার জন্য। সেজন্য শিবদাস যে পদ্ধতি বেছে নিল তা একদিকে তার দূরদর্শিতা অপরদিকে তার অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের—প্রায় রণপতি সূত্রধরের স্মৃতিবহ—পরিচায়ক। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে সে মেয়েটিকে শরীরের স্বাদ দিল, যে স্বাদ, সে জানত, মেয়েটির রক্তকে ঘন করে সেখানে দাহন আনবে। দাহনটি যাতে মেয়েটিকে দগ্ধ করে সেইহেতু রণপতি দ্বিরাগমনের সময় মেয়েটিকে একলা বাপের বাড়ি পাঠাল, নিজে কাজের ছুতোয় গেল না। মেয়েটি যাতে তাকে খানিকটা ভয় করে, সেইহেতু মেয়েটি যাওয়ার পর একটি চিঠিও লিখল না। মেয়েটি যাতে তার মেজাজের আকস্মিকতায় সদাসর্বদা অপ্রস্তুত বোধ করে তাই মাসখানেক পরে হঠাৎ সকালের ট্রেনে কলকাতায় গিয়ে বিকেলের ট্রেনে মেয়েটিকে নিয়ে এল। মেয়েটি যাতে তার সম্পর্কে সর্বদাই একটা উত্তেজনায় থাকে তাই এক মাস পরের সেই রাত বাড়িতে কাটাল না, তারপর নিজের হিসেব অনুযায়ী ও মেয়েটিকে লক্ষ্য করে যখন নিশ্চিতরূপে বুঝল যে মেয়েটি বিয়ের ঠিক পরের সাতদিন ও এই একমাসের আচরণকে মেলাতে না পেরে একেবারে বিপর্যস্ত সেই সময়, মেয়েটিকে আবার শিবদাস লুফে নিল। আর বৎসরের মধ্যেই শিবদাস মেয়েটির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে পারল যে—মেয়েটি-কে সদাসর্বদা নিজেকে তৈরি রাখতে হবে স্বামীটিকে পাবার জন্য, আর যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে তৈরি রেখেও না-পাওয়ার যন্ত্রণায় মেয়েটি অস্থির হয়ে না পড়বে ততক্ষণ স্বামীকে সে পাবে না।

এ-ক্ষেত্রেও শিবদাস তার পূর্বপুরুষ রণপতির মতো দক্ষতা দেখিয়েছে—যে নিজের সম্পত্তির মালিকানায় তার নিজেরই পুত্রকে অধিকার দেবার কথা না ভেবেও একজনের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিল, স্ত্রীকে বশীভূত করে, বা, স্ত্রীর অবশীভূত হবার সম্ভাবনা লুপ্ত করার জন্য যে প্রক্রিয়া সে অবলম্বন করেছিল, তার পরিণামে দাঁড়িয়ে গেল এই রকম একটা ব্যাপার যে স্ত্রীর অত্যাচারিত মুখ না দেখে, সে তার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেই পারত না। শিবদাস রায় এত চতুর ব্যবসায়ী যে, যে-মুনাফায় হিসেব কষে সে বাণিজ্যে নামে তার দু গুণ লাভ করে কর ফাঁকি, বেনামা বিক্রি-বাট্টার পথে। একই সঙ্গে কৌলীন্য রূপ ও লোভনীয়তা সমন্বিত স্ত্রীর ওপর শিবদাস নিজের ইচ্ছার প্রভূত্ব-ই প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই নয়, তারই ইচ্ছার দাসত্ব স্ত্রী-টির চোখেমুখে

দেহে না দেখে সে তাকে স্ত্রী ও নিজেকে স্বামী হিসাবে ভাবতেই পারে না। স্ত্রীর শরীর ও আত্মাকে এইরূপে জয় করে নিজের জীবনের মূল্য সে আরো তিরিশ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিল।

একটি শরীর ও আত্মা জয় করার অভিজ্ঞতালব্ধ এই কৃতবিদ্যতা থেকে শিবদাস তার নতুন বিনিয়োগের পথে অগ্রসর হল।

যে পদ্ধতিতে শিবদাস নাজদৎপুরের শেয়ার কিনে নিয়েছিল, সেই পদ্ধতিতেই শিবদাস ধান চাউল কিনতে নামল। তাদের নিজেদেরই বিরাট জোত আছে। সেই জমির ধান সমানভাবে সব অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হয়ে যে বিপুল পরিমাণ বাঁচে, সেটি এস্টেট থেকে রমাদাসপুর টি এস্টেটে বিক্রয় করা হয়। এবং সেই টাকা এস্টেট অ্যাকাউন্টে জমা হয়। সুতরাং শিবদাস চাউল কেনার টাকা সংগ্রহ করল ব্যাঙ্ক থেকে। স্থানীয় এজেন্ট শিবদাসের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বন্ধুর সহযোগিতাতেই নতুন ব্যবসায়ী হয়েও উচ্চ ধার পাওয়ার অসুবিধে শিবদাসের হল না। ইতিপূর্বে যারা এ-অঞ্চলের চাউল ব্যবসায়ী শিবদাসের আবির্ভাবে তারা প্রমাদ গণল। হঠাৎ এ-অঞ্চলের ধানের দাম যে অকস্মাৎ বেড়ে গেল তার সঙ্গে কয়েক বছর আগে নাজদৎপুরের শেয়ারের দাম বাড়ার যথেষ্ট মিল আছে। শিবদাসের টাকা বেশি, লোকসংখ্যা বেশি, কিন্তু প্রভাব কম। সে কলকাতার কয়েকটা চালকলের পারচেজ অফিসারের কাছ থেকে চাউল কেনার অর্ডার নিয়ে এসে ঘরে বসে থাকল—আর সারা জেলা চুঁড়ে তার লোক ব্যাঙ্কের গুদামে ধান তুলতে লাগল।

শিবদাস আসল ব্যবসায় দেখাল এর পরে। পাইকারী ব্যবসার লাইসেন্স যোগাড় করে, ধানবিক্রি করে ব্যাঙ্কেব যে ঋণ সে শোধ করেছিল, চাউল কেনার জন্য সেই ঋণ আবার নিয়ে—ব্যাঙ্কের গুদাম ভরতে লাগল। নিশ্চিন্ত শিবদাস তারপর পরম নিশ্চিন্তিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মাঘ গেল—ফাল্গুন গেল—চৈত্রের প্রথমে বাজারে চালের দাম চড়তে চড়তে শেষে একেবারে উধাও হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের গুদামে শ্রীশিবদাস রায়ের চাউল ততদিনে পুরনো চাউলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ এল—শিবদাস গাড়িতে করে সকাল-বিকাল বিভিন্ন জায়গায় চাউলের জন্য লাইন দেখে নিজের লাভের দৈর্ঘ মাপতে লাগল। আষাঢ় এল—শিবদাসকে স্থানীয় শাসক অনুরোধ করল—বাজারে চাল আনতে। শিবদাস স্পষ্ট বলল—

আনতে সে পারে, কিন্তু বাঁধা দামে বেচবে না। শ্রাবণ এল—শিবদাস শতকরা একশ টাকা লাভের হিসেব কষল:।

এবং সেই হিসেবের ওপর নির্ভর করে—অর্থাৎ মানুষের চাহিদার অত্যধিক চাপের ওপর ভিত্তি করে শিবদাসের চাউল যে মুনাফা আনবেই আনবে বলে শিবদাস নিশ্চিন্ত হল—তার আনুপাতিক হারে সে সেই মুহূর্তেই নিজের জীবনের মূল্য বাড়িয়ে নেবার তাগিদ বোধ করল। শিবদাস এক লক্ষ টাকার জীবনবীমার জন্য আবেদন করল।

শিবদাসের জীবনের মূল্য যে এই অতি আকস্মিক হারে বেড়ে গেল—তা প্রকৃতপক্ষে চাউল আটক থাকার ফলে দুই ঠ্যাঙ্ আকাশের দিকে তুলে যারা খিদেয় পেট চিতিয়ে আকাশকে গেলার জন্য বিকট হাঁ করে ছিল—তাদের জীবনের যে বাকি বছরগুলো তারা বাঁচল না, তার যোগফলের মুদ্রাগত মূল্য। মৃত্যুর হার যত আকস্মিক যত দ্রুত বেড়েছে, শিবদাসের জীবনের মূল্যও তত দ্রুত হারে বেড়েছে।

আরো নতুন লক্ষ টাকায় মূল্যবান হবার সম্ভাবনায় শিবদাস যখন ভাবছে চাউলটা বাজারে ছাড়বে কি না সেই সময়ই বীমা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় অফিসের চিঠি এল যে তার কার্ডিওগ্রাফিতে হৃদযন্ত্রের গোলমাল ধরা পড়েছে সুতরাং কর্পোরেশন শিবদাস রায়ের জীবনের মূল্য এক লক্ষ টাকা স্বীকার করে না ও তার জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না—ধন্যবাদসহ জীবন প্রত্যাখ্যাত।

শিবদাস ভগবদ্দর্শনের তুল্য ক্ষিপ্রতায় দেখল, তার চাইতেও বড় কোন্ ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীরা—আবাল্য অন্যের প্রাণের বিনিময়ে চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত তার এই দুর্মূল্য জীবনটাকেই, রমাদাস সূত্রধরের বংশধর আর রণপতি সূত্রধরের উত্তরাধিকারী এই শিবদাস রায়ের অতি-সংরক্ষিত মূলধনের মতো জীবনটাকেই—ব্যবসায় খাটিয়ে, মুনাফায় পিটিয়ে, প্রত্যাখ্যান করে ছেড়ে দিয়েছে। কারণ শিবদাসের লক্ষ-লক্ষ টাকা মূল্যের হৃদ্‌যন্ত্র বাতিল।

শিবদাস তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করল। দেখল বাতিল সিলমোহর বুকে নিয়ে,—বাতিল করা হাজার বা লক্ষ টাকার নোটের মতো—তার স্ত্রী হাওয়ায় ফরফরাচ্চে।

বিষ্ণু দে

শৌখীন শিকারী

স্তব্ধ নিথর পাহাড়ে লাফায় খরগোশ,
চোখের চুনিতে কাণের বিষাণ-যন্ত্রে
সামান্ততম শব্দেই হৃৎকম্প।
অথচ মানুষ, বন্যই নও, লম্ফ
যতই করো না, কোনোই প্রাকৃতমন্ত্রে
কপালের ঘাম বিনা জুটবে না খোরপোশ।

স্তব্ধ গোপন বনের ছায়ায় হৃদয়ের
প্রহর জানায় বানপ্রস্থে মুরগি।
তুমি শোনো ঘুমে, তাঁবু ঘিরে জ্বালা অভয়ের
দীপ্তিতে খোঁজো বুলবুলিদের আরাধ্য
আরতির ধ্বনি, ভাঙুক ঘণ্টা বর্গী।
বনের খাজনা বুনো পাখি খাসা খাদ্য।

তার চেয়ে দেখ কুকুরের পাল, বন্য,
জীপ্ থেকে দেখো, নেকড়ের দল পলাতক,
নেকড়েরই জ্ঞাতি, নেকড়ে-শিকারী, হিংস্র,
দুরন্তগতি। কিন্তু তোমার অন্য
জাতক, শিকারী জন্তুই নও, হে ঘাতক,
জীপটা ছোটাও, ছোটে শতাব্দী বিংশ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আজব ছড়া

কাক উড়ছে চিল উড়ছে পুড়ছে মড়া শ্মশানে
মুক্তি খুঁজে জীবনটাকে হাড়কাঠে দেয় মশানে,
কারা ?
কামিয়ে ভুরু অহির কেনা নেশায় চাটে যারা ॥

মগজ যাদের কেবল ভাবে, 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'
অন্যে বাক্য কইবে নাকো ওঁরাই হবেন বাক্যধর,
কারা ?
আফিঙ পোড়া ধোঁয়ায় যাদের বেকুব সর্বহারা ॥

তত্ত্বকথার ব্যাঙ ডাকছে, মজাবুদ্ধির পুকুরে
পরস্পরের মুখ দেখছে ঘষাকাচের মুকুরে,
কারা ?
যাদের চোখের আয়না থেকে পড়ছে খসে পারা ॥

দুই

কুমির শেষে ল্যাজ গুটুলো বুজলো কাটা খাল।
ন্যাবায় বুঝি হলদে হ'ল জল গিগুনো লাল ॥
গোড়ায় গলদ থাকলে পরে পথ হয়ে যায় ভুল।
ঘুণ ধরে যেই ফোঁপরা গাছের উপড়ে পড়ে মূল ॥
কালের হাওয়া ভীষণ হাওয়া দিন বদলের গান।
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে প্রাণের অভিযান ॥
হাতের অস্ত্র হাতেই থাকে শুকোয় ক্ষ্যাপার বুক।
যেই দেখে সে জগত জুড়ে শান্তিকামীর মুখ ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রুটি

ভাই, মানুষ, প্রেম সকলই
অভিধানের পাতায় ;
পাতা খুললেই দেখতে পাবি
অবাক সব দৃশ্য !
আমার বিশ্ব বদলে গেছে অনেক দিন, অনেক দিন, অনেক দিন ॥

এখন শুধু একটিমাত্র সত্য কথাই জগৎ জুড়ে
বলছি ক্রীতদাস :
সকাল বিকেল একটি ক'রে আস্ত রুটি চাই !
যত রকম কবিতা চাস লিখে দেব,
যত রকম কবিতা চাস, যত রকম কবিতা চাস ॥

রাম বসু

কাঁচপোকা

সমস্ত হারিয়ে যায় শূন্যে মহা জগতের পারে ?
অথবা সে ফিরে আসে ? দ্বিগুণ আবেগে ভেঙে পড়ে
পৃথিবীতে ? তাই এই শূন্যের উজ্জ্বল কাঁচপোকা
অন্ধ মাদকতা নিয়ে বরবর্ণী,—কবি তার মৃগয়া অন্বেষী।

আজ আমি চূড়ায় দাঁড়িয়ে অন্তর্দাহ-সাম্রাজ্যের
মাঝখানে, শিকড়ের জন্মের স্বদেশে, অস্থিরতা
আমাকে ছোঁবে না। অস্তিত্ব বিপন্ন করে বেড়ে ওঠা
নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়ে দেবতার তনুর মতন বিশালতা

এখন পেয়েছি। মুহূর্তের গলা টিপে বেঁচে তার
তীব্র আঁধার তাৎপর্য নৈঃশব্দ্যের দলে মেলে দিলে
বিদ্যুৎ-নিকুঞ্জ বুক, নগ্ন নটী নক্ষত্র মঞ্জরী
অঙ্গারের শয্যা পাতে, স্তোক নম্র বেলাভূমি পল্লবে উদার।

পুরাণের শেষ হলে কবিতার মর্মর মন্দির
আমি আছি, আমি আছি—এই আত্ম সৃজনের গান
সম্পর্ক সংগতি গড়ে, চকিতের অঙ্কুর আলোয়
ফলন্ত গাছের রঙ ঢের গাঢ় মৃত মহাজগতের চেয়ে।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শ্রোতা

গাও, তুমি গান গাও
শুধু আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে;
যখন আকাশ আর্ত, অনাত্মীয় রুক্ষ প্রাত্যহিক—
একটি রাগিণী মত্ত ময়ূরী-কলাপ মেলে ধরুক হৃদয়ে
কদম্বের গন্ধবহ রোমাঞ্চিত রাস-পূর্ণিমায়।

যখন আকাশ আর্ত, অনাত্মীয় রুক্ষ পটভূমি;
জীবন ধারণ ব্যর্থ কি-না—তার সদুত্তর মেলেনা কোথাও,
সান্ত্বনা যখন খুঁজে আকাশের শান্ত নীলে পাবেনাক তুমি
বাচালতা দেখে ভাবি, বাক্‌রোধ করা শ্রেয় আরো—
সুরের শুশ্রূষা ছাড়া তখন আর কী দিতে পারো
ক্ষত-বিক্ষত এই পৃথিবীকে?
আর কী শোনাতে পারো? তাল-বেতালের
ভাঁড়ামিতে মঞ্চ ভরে, রঙ্গ তবু জমে না ওদিকে:
তম্বুরাকে তুলে নিয়ে কলকণ্ঠে তুমি আজ গাও।

নতুন জন্মের ঋতু হাওয়ার আঙুলে
যেমন একেকটি করে পাপড়ির গুণ্ঠন দেয় খুলে
তেমনি ফোটাও তুমি রাগিণীর শুভ্র শতদল,
তানালঙ্কারে, মীড়ে, কোমল শ্রুতির সূক্ষ্ম সল্‌মার সাজে
অলঙ্কৃত করো তুমি রাগিণীর আরাধ্য প্রতিমা ;
স্বরের বিস্তারে নম্র, ধীরোদাত্ত কণ্ঠের গুঞ্জনে
সংগীতের আত্মা উন্মীলিত হোক, যেমন উজ্জ্বল
উন্মীলন ঘটে প্রেমে বাহুবদ্ধ মিথুনের আতপ্ত চুম্বনে।

এ ছাড়া কোনোই শুভ প্রেরণা নেইক পৃথিবীতে
অসার অস্তিত্ব নিয়ে সংকুচিত বৃত্তে ও বৃত্তিতে
বিদ্বেষের বিষে নীল ভ্রূকুটিল মানুষের মুখ
চকিতে সংঘর্ষে মাতে অন্ধকার হলে গাঢ়তর।
তম্বুরাকে বুকে নিয়ে পবিত্র প্রতীক তুলে ধরো
লীলায়িত বাম হাতে সুঠাম মুদ্রায়—
বিমূর্ত হলেও সে-যে প্রকাশের আগ্রহে উন্মুখ,
বিক্ষিপ্ত মনের শান্তি, জর্জরিত স্নায়ুর আরাম
সঙ্গীতেই একমাত্র খুঁজি সঙ্ঘারাম।

এসো, তবে স্নাত হই সুরের নির্ঝরে।
শ্রাবণের পদাবলী রিম ঝিম শব্দের বর্ষণে
শোনাক, অলকনন্দা ঝরো ঝরো সুরলোক হতে।
করো ধৌত, কলুষের গ্লানিমুক্ত করো, ঝর্ণাতলার নির্জনে
এই জনমেই ধন্য হই শুদ্ধতর জন্মান্তরে ॥

রবের্ট রজদেস্ত্ভেন্স্কি

ঘড়ি মেরামত

কটা বাজে ?
জানি না।
ঘড়িটার হল কি ?
বুঝছি না।
কখনো কাঁটা ছুটো ছোটে
নিজেদের গতিসীমা ছাড়িয়ে,
কখনো হোঁচট খায়
থেমে যায়—
আমি কেবল মোটামুটি, কাছাকাছি,
সময়ের আন্দাজ করতে পারি ॥
আজ যাবো এক ইহুদির কাছে
(ওই চত্বরের ধারে যেখানে কেবিনের সারি)
"ঘড়িমিস্ত্রি মশাই, আমার সময় মেরামত করে দিন,
ঘড়িটার যেন কি হয়েছে,
গোলমেলে কিছু।"
খবরের কাগজটা নামিয়ে
মনোযোগ দিয়ে সে ঘড়িটা দেখবে।
মাথা নাড়াবে।
আবার উল্টে পাল্টে দেখে বলবে
ছি-ছি,
এঃ হে-হে
এ-রকমও করতে হয় !
কমরেড, যন্তরটার কী হাল করেছো !
হয়তো ইচ্ছে করে করনি,
হয়তো হঠাৎ,
কিন্তু এর পক্ষে,
এই যন্তরটার পক্ষে,
একেবারে একই কথা ॥

নিজের সময়ের,
নিজের ঘড়ির,
একেবারেই যত্ন নাও না।
কতোকাল তেল দাওনি ?
আর শুধু কি তাই……।
তারপর ঘড়িটা খুলবে সে
ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করবে।
আর মেরামত শেষ করে
একটা নিঃশ্বাস ফেলে
তিন-কোণা কাগজে ছাপ মারবে
'ঘড়ি মেরামতকারী, মস্কো।'
"বয়েস তো যথেষ্ট হল।
নিজের ব্যক্তিগত সময়ের দায়িত্ব নেবার সময় এসেছে।"
আমি বলব, "ধন্যবাদ।"
দেব পঞ্চাশ কোপেক……
চেনা আঙিনা পর্যন্ত
এক হাজার সাতশো কদম।

আর রাস্তায় দেখা হওয়া গাড়িগুলো
ফেনার ফুলকি ছিটিয়ে ছুটে যাবে
যেন মোটর গাড়ি নয়
ওরা ময়ূরপঙ্খি নৌকো।
ঝরাপাতা পায়ে পায়ে জড়াবে।
নিয়ন আলোয় কাঁপা কাঁপা রাস্তা……।
আর হাতে বাঁধা ঘড়িটা টিকটিক করবে
আস্তে টিকটিক করবে
আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময় গুণে যাবে॥

মূল রুশ থেকে অনুবাদ : অভিজিৎ আচার্য

---

* কবিতাটি রুশ সাহিত্য পত্রিকা 'ইউনস্ত' থেকে অনূদিত। রবার্ট রজদেস্ত্ভেন্স্কির বয়স ২৭।২৮ বৎসর। তিনি একজন হালের জনপ্রিয় তরুণ রুশ কবি। এ বৎসর ইয়েভতুশেঙ্কোর চেয়েও তিনি জনপ্রিয়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার রূপ ও সমালোচনার ভাষা

গদ্যের বিপরীত শব্দ পদ্য। কবিতাকে গদ্যের বিপরীত শব্দ বললে ভুল হয়। পদ্য একটি আঙ্গিক-রীতি সম্বন্ধীয় পরিভাষা। কবিতাকে কখনই তা বলা চলে না। পদ্য লেখা—এবং পড়া দুইই শেখা যায়, শেখানো যায়। কবিতার সাধনা করা যায়—কিন্তু তা পদ্যের মতো শেখা-শেখানো যায় না। কবিতাকে কোনো কিছুর বিপরীত শব্দ বলে আখ্যাত করা চলে না। একমাত্র তার আত্মা বা প্রকৃতির সাক্ষ্য ছাড়া তাকে আমরা আর কিছুর সাহায্যেই চিনে নিতে পারি না। কবিতা-সংক্রান্ত আলোচনা এই কারণেই কঠিন এবং দুরূহ। আত্মা বা প্রকৃতি এমনিতে নিরবয়ব, নির্বস্তুক। কবিতার বাণীতে আত্মার প্রকাশ, প্রকৃতির প্রতিফলন। অথচ কবিতার বিচারে তার আত্মা এবং বাণী উভয়ের আলোচনাই প্রাসঙ্গিক। জীবনের প্যাটার্নের পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে কবিতা আমাদের জীবনচেতনার সমৃদ্ধি সাধন করে। এই কার্যে কবিতার আত্মা এবং বাণীর ভূমিকা কাব্য-রসিকের অনুধ্যেয় বিষয়। এই অনুধ্যানের আকর্ষণেই কখনো মনে হয়েছে ওয়াল্টার পেটারের মতো ফর্ম্-ই হল অন্তর্গত তাগিদ, অভিজ্ঞতার কাঁচা উপাদান হল বাইরের বিষয়, কখনো বা ফর্ম্ ও কনটেন্টের প্রভেদকে এই বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে একটা হল বাইরের রূপ, অপরটি হল ভিতরের রূপ (inner form এবং outer form), অথবা বলা হয়েছে যে জীবন সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট কৌতূহলকে, ফর্ম-ই একটা বস্তু-বিগ্রহে রূপায়িত করে।

সুতরাং ফর্মের প্রকৃত বিচার কবির জীবন সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব। আমরা জানি যে বাইরে থেকে কবিতাকে চেনা যায় না। কবিতার আত্মার অভিজ্ঞানই দীপ্ত হয়ে ওঠে তার Semantic Structure-এ তথা ফর্মে। তাই কবিতায় ফর্মের নিরীক্ষা যত হয়েছে, সে সবই জীবন-বোধের নব নব চাপ, তাগিদ ও টানের ফল। এবং টেকনিকের ইতিহাসের

সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষেরই নিজের ইতিহাস। এবং এ কথা শুধু কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—সাহিত্যের শিল্পের সকল বিভাগেই এই সত্যের প্রতিচ্ছবি। এখানে দাঁড়ালেই বোঝা যায় যে ফর্মের সমস্যা আসলে কন্‌টেন্টের সমস্যা। গদ্যে বাক্যের কাঠামো এবং কবিতায় শব্দের প্রয়োগ কী ভাবে তাৎপর্য সঞ্চার করে, কী ভাবে একের আবেদন আমাদের বিচারশীলতার কাছে কার্যকরী হয়—অপরের আবেদন আমাদের সমগ্রতার অনুভূতির কাছে সঞ্চারিত হয়—এই সমস্ত আলোচনার কালে ফর্ম এবং কন্‌টেন্টকে এক প্রসঙ্গের অন্তর্গত ভাবাই সমীচীন। এবং সে-প্রসঙ্গ জীবনের উপস্থাপনার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনের প্রসঙ্গই যে কবিতার সর্বাংশের নিয়ামক এবং নিয়ন্তা তার প্রমাণ হিসাবে জানি যে উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ক্রিয়াকে আমরা অনুভব করি, পরে সে অনুভবের স্মৃতি কবিতার স্মৃতির সহচরী। উক্ত মানস-ক্রিয়ার ফল বিস্ময় আনন্দ প্রশান্তি প্রভৃতি। কবিতা জন্মের পূর্বে কবির মনের মধ্যে বেড়েছে, জন্মের পরে সে বাড়তে থাকে পাঠকের মনে। যতদিন যায় ধীরে ধীরে সে নিজেকে রসিকের কাছে উন্মোচিত করতে থাকে—বিকশিত হতে থাকে। তার অশেষত্বই তার অমরত্বের হেতু। কোলরিজ থেকে রিচার্ডস্ পর্যন্ত সকল রসবেত্তাই কাব্যের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যত কথা বলেছেন তাদের সার নির্ণয়ে জীবনে কাব্যের ভূমিকা কী এই জিজ্ঞাসারই উত্তর মেলে। অস্থিরতার মাঝখান থেকে ভারসাম্যের স্থির বিন্দুতে ফিরে যাওয়া বাস্তবে সহজ কথা নয়—কবিতার কাজ হল চতুর্দিকের নানা বৈপরীত্যের মাঝখানে এক চিদ্‌গত স্থির বিন্দুতে পাঠককে প্রত্যর্পণ করা। কোনো Prufrock অথবা কোনো নাইটিঙ্গেল, বা কোনো অন্ধকার হ্রদ, কিম্বা এরোড্রোমের কাছের ল্যাণ্ডস্কেপ, অথবা রাজ্যহারা লিয়র—জটিল অথবা সরল, উত্তেজনাপূর্ণ অথবা নিরুদ্বেজিত যে কোনো কাব্য ধারণাই হোক তা নিঃসন্দেহে জীবনের অন্তঃকরণকেই প্রকাশিত করে।

জীবনের এই আন্তর-পরিচয় সকল কবিতায় সমানভাবে মূর্ত হয় না। আবেগের ঋজুরেখ একমুখিতা কোনো কোনো কবিতার প্রধান অবলম্বন। সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, বিরহ, আশা-নিরাশা—প্রভৃতি সহজেই চেনা যায়, ইমোশনের এমনই একটা অনায়াস-গ্রাহ্য নির্দিষ্ট প্রকৃতি সেই সব কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরা ভাল কবিতা হতে পারে—কিন্তু উত্তম কবিতা নয়। মানসীর 'বর্ষার দিন' (এমন দিনে তারে বলা যায়) অথবা সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের 'ব্যর্থ

যৌবন' (আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে)—ভাল কবিতা। কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতাটিই উত্তম। ওড্ টু এ নাইটিঙ্গেল এ প্রসঙ্গে উত্তম কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে কবিতার সেই বিশিষ্ট কাঠামোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় —যে কাঠামোর মধ্যে বিরোধী আবেগের ভাবসাম্য স্বাভাবিক ভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' নিঃসন্দেহে ভাল কবিতা—হৃদয়গ্রাহী কবিতা। কিন্তু তাঁরই রচিত 'হায় চিল' রসের প্রসঙ্গে উত্তম কবিতা। বিষ্ণু দে-র 'এলূসিনোর' অপেক্ষা তুলনায় তাঁর 'জল দাও' উত্তম কবিতা। উত্তম কবিতার Structureএ বা সমগ্র-বিন্যাসে লভ্য—রিচার্ডস্ কথিত an equilibrium of opposed impulses। এইখানে কবি নানা প্রতিমুখে, নানা বৈপরীত্যে স্থাপিত আবেগের মধ্যে শৃংখলা রচনা করেন। কবি-কর্তৃত্বের প্রকৃত পরিচয় এক্ষেত্রেই। গভীরতর কবিত্বের নিদর্শন এই কবিতাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়।

জটিলতার মধ্যে ঐক্যরচনা উৎকৃষ্ট কবিতার প্রধান লক্ষ্য। জটিলতাকে বিসর্জন না দিয়ে, ঐক্যের বা অখণ্ডতার গূঢ়ার্থ সঞ্চারের জন্য কবিকে প্রয়াসী হতে হয়। এই জন্যেই কাব্যের বা রসের বিভাব সম্বন্ধে কবির প্রাণবন্ত চেতনার প্রয়োজন একান্তভাবে প্রাথমিক ও আবশ্যিক। ভাবগত উত্তেজনার জাগরণ ও প্রশান্তি, (রবীন্দ্র-কাব্য ও বিষ্ণু দের 'পদধ্বনি') বিরোধী আবেগের সমন্বয়, ('প্রশ্ন' কবিতা) মনোভঙ্গির জটিলতা, (প্রুফ্রকের প্রেমের গান) বিরোধ অলঙ্কারের সমাবেশ, (বলাকা) আপাত অসংলগ্ন গ্রন্থনা (নরেন্দ্রের কোনো কোনো কবিতা)—এই সমস্ত চারিত্র্য ও গুণাবলী একটি উৎকৃষ্ট কবিতায় বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করে। এবং সেই বিকাশের ফলেই কবির অখণ্ডতা ও ঐক্যের পরম চেতনার প্রসাদ আমরা লাভ করি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Intimations' ode-এ আলোক-অন্ধকারের চেতনায় এই ঐক্যসন্ধানী বৈপরীত্যের বোধ কার্যকরী। আবার রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী-সংবাদে অন্ধকার-অবগুণ্ঠন-জমাট তুষার এবং আলোক-অবগুণ্ঠনমোচন ও তুষার-বিগলন, পূর্বোক্ত বিপরীত আবেগের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রসসিদ্ধ নিদর্শন। রাইম অফ দি এনশ্যেন্ট মেরিনার-এ আবেগ সমূহের বিরোধ-মূলক অবস্থিতির সাহায্যেই কবির রসোদ্দেশ্য অখণ্ডতা ও ঐক্য লাভ করেছে।

কোনো কবিতায় বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্পের, এবং প্রতীকের ব্যবহার কোন্ তাৎপর্যে অন্বিত তা বুঝতে হলে উক্ত অখণ্ডতা ও ঐক্যের স্বরূপটি বিশেষভাবে

অনুধাবন করা দরকার। তাই বিভিন্ন ধরনের ও ধর্মের পৃথক পৃথক আবেগের টানাপোড়েনে যে সূক্ষ্ম বুনুনির শিল্পকর্ম রচিত হয়ে থাকে তা কাব্যের মূল বিভাবের আত্মার আকর্ষণেই রসবস্তুতে রূপান্তরিত হয়। বলাকার কবিতার মূল বিভাব বলাকার পংক্তি। এই পক্ষধ্বনি কবিমানসে জীবন্ত ও চলিষ্ণু হয়ে উঠল বলেই সমস্ত রসসৃজনীবৃত্তি, যথা স্মৃতি-ভাবনা-কল্পনা, চঞ্চলতা-প্রাপ্ত হয়েছে। কবির জীবনচেতনা উপযুক্ত বিভাবের প্রেরণা ও টান অনুভব না করা পর্যন্ত তা উৎকৃষ্ট কবিতার জননী হতে পারে না। 'চঞ্চলা' কবিতায় বিভাব প্রাণবন্ত নয়, তা কবির কল্পনাকে চলিষ্ণু করে তুলতে পারেনি। এর এক বছর পরে লিখিত বলাকা কবিতায় ভাবনার মুক্তি ঘটেছে। সমস্ত কবি-ভাবনার বস্তু-বিগ্রহ-রচনা সেখানে সম্ভব হয়েছে। এই ভাব-বিগ্রহ রচনায় নানা বিরোধী উপাদানের ব্যবহার যত ঘটেছে, কবিতাটি তত রসসিদ্ধ হয়েছে। ভাব-বিগ্রহ সুনির্দিষ্ট না হলে বাক্-প্রতিমা বা চিত্রকল্পের রাশি রসের প্রসঙ্গে তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

দুই

তাই উৎকৃষ্ট কবিতার উৎকর্ষ বিচারে শুধু চিত্রকল্পের সংলগ্নতা-বিচার শেষ কথা হতে পারে না। চিত্রকল্পের বিভিন্ন প্রকৃতি কাব্যের রস-প্রবর্তনায় বৈচিত্র্য আনে বিভিন্ন পথে। কিন্তু তার মধ্যেও গুণবত্তার তারতম্য বিচারের অবকাশ আছে।

সরল চিত্রকল্প মাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতির ভাব জাগায়। { (ক) হলুদ নদী সবুজ বন। (খ) রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।

জটিল চিত্রকল্প একটির মধ্যে একাধিক চিত্রের ব্যঞ্জনা আনয়ন করে। (ক) 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'!

কিন্তু এই দুই প্রধান বিভাগ ছাড়া চিত্রকল্পকে আরো কয়েকটি শিরোনামায় বিভক্ত করা হয়। পরোক্ষ চিত্রকল্প এবং অপরোক্ষ চিত্রকল্পের কথা এখানে বলা চলে। অপরোক্ষ চিত্রকল্প শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ-গন্ধের ধারণাকে জাগ্রত করে। 'রামধনু রঙের কাচের জানালা' 'কমলারঙের রোদ' বর্ণ চেতনাকে পরিতুষ্টি করছে। পরোক্ষ চিত্রকল্পের কাজ হল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করা।

কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ধারণাকে জাগ্রত না করে একটা সমগ্র মানসিক অবস্থার ধারণাকে স্পর্শ করা এ জাতীয় চিত্রকল্পের কাজ। 'ভোরের আলোব মূর্খ উচ্ছ্বাসে', 'অসহ সুখের মতো'—এ জাতীয় চিত্রকল্পের উদাহরণ। 'চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে'—এ জাতীয় চিত্রকল্প কত চমৎকার হতে পারে তার নিদর্শন। আলস্যের, ক্লান্তির, পক্ষান্তরে তেজের বীর্যের মানসিক ছবি পরিস্ফুট করার কাজে এ জাতীয় চিত্রকল্পের বহু ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় সার্থকতা লাভ করেছে। এ ছাড়া চিত্রকল্পের আরো শ্রেণী বিভাগ হতে পারে। কোনো কোনো চিত্রকল্পের কাজ হল দুটি অর্থ বা ভাবকে সমন্বিত করা। কিন্তু আসলে তারা একটি মাত্রই ছবি, এবং সে অর্থে সরল চিত্রকল্প। রবীন্দ্রনাথের 'জালি দিল অরণ্য বীথিকা শ্যাম বহ্নিশিখা, অথবা জীবনানন্দের 'সূর্যের সোনার বর্শা'—এ জাতীয় চিত্রকল্প। সমন্বিত চিত্রকল্প বলে এদের আখ্যাত করা হয়।

পূর্বোক্ত সমস্ত চিত্রকল্পের মধ্যে যাকে আমরা জটিল চিত্রকল্প বলছি কবিতার গূঢ়ভাষা রচনায় সেই হল সর্বাপেক্ষা কার্যক্ষম—এবং সে প্রসঙ্গে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো কবি যখন বলেন—'হে হৃদয় মুল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে'—তখন তা শুধু কাব্যের অলঙ্কার নয়। তাই কবির অনুভূতির ভাষা আমরা এই আলোচনায় যে ধরনের কবিতাকে উত্তম কবিতা বলেছি সেই উত্তম কবিতার আবেগের বহুধা বৈপরীত্যের ঐক্য বন্ধন রচনার কালে জটিল চিত্রকল্পের বহু ব্যঞ্জনাময় বর্ণচ্ছটা বিশেষ কার্যকরী। 'বাঁকাজল' ছবি হিসাবে কতটুকু? 'চারিদিকে বাঁকাজল করিছে খেলা'—এই বর্ণনায় জলের কুটিলতার সর্পিল প্রকৃতিকে প্রস্ফুট করা হয়েছে। প্রতিকূলতার এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের চিত্র যুগপৎ এখানে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'চারিদিকে' শব্দটির প্রয়োগ কৃষকের নিঃসহায়তার ছবি মুল চিত্রকল্পকে আরো তাৎপর্য প্রদান করেছে। এইভাবে কবিতার অন্তর্গূঢ় সমগ্র কল্পনাকে 'বাঁকাজল' মূর্ত করে তুলেছে। ঠিক এমনি ভাবেই কবি বিষ্ণু দে যখন বলেন, 'অসহিষ্ণু অন্ধকার কোজাগরে মেশে', কিম্বা "চৈতন্যের কপিল সাগরে", এবং জীবনানন্দ যখন বলেন "অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়" কিম্বা "স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো"—তখন আমরা কবিতার গূঢ় ভাষার সাক্ষাৎ পাই। এগুলি শুধু চিত্রকল্প নয়, সমগ্র কবিতার সমভাষার অংশবিশেষ।

কবিতার সমগ্রে পটকে আলোকিত করে তোলা এই জাতীয় চিত্রকল্পের

কাজ। তা নইলে কেবল মাত্র চিত্রকল্প হিসাবে বিচার করলে আমাদের কেবল এই জ্ঞানটুকুই হয় যে সবকিছুই কবির দৃষ্টিতে নতুন করে দেখা এক একটি প্যাটার্ন। অন্ধকার রাত্রি ও নক্ষত্র-বিষয়ক কতকগুলি চিত্রকল্প বিচার করা যাক :

(ক) নক্ষত্রের পাথার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।
(বলাকা)

(খ). তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস।
(আহ্বান)

(গ) অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের
শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা।
(হাওয়ার রাত / জীবনানন্দ)

(ঘ) অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ সাদা বেলফুল।
(জল দাও / বিষ্ণু দে)

উল্লিখিত সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করে। কিন্তু এদের প্রাণবত্তার তুলনামূলক বিচার করতে গেলে কবিতাগুলির সমগ্রার্থের প্রশ্নই বিশেষভাবে প্রধান হবে। জীবনানন্দের যে কাব্যাংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি তা যে চিত্রকল্পের পৃথক বিচারে একটি চমৎকার চিত্রকল্পের মর্যাদা পাবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। কবির চেতনায় এক অসামান্য চিত্রল প্রবণতা যে সদাই কার্যকরী সে কথা আমরা জানি। কিন্তু এই চমৎকার চিত্রকল্পটি কবিতার কোনো মর্মভাষাকে রূপায়িত করছে না। বস্তুত কাব্যের মূল বিভাবের কোনো চেতনাদীপ্ত ও প্রাণবান আকর্ষণে চিত্রকল্পটি জন্মায় নি। বলা যায় যে কবির দৃষ্টির কাছ থেকে সে সাহায্য পেয়েছে বটে, কিন্তু কবির চিন্তার কাছ থেকে নয়। বরঞ্চ, হাওয়ার রাতে চেতন-অবচেতনের ভাঙা স্বপ্নস্মৃতির মেলায় ব্যাবিলনের রানীর ঘাড়ে চিতার চামড়ার উজ্জ্বল শালের প্রসঙ্গ মূল বিভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত।

বলাকা কবিতাটি থেকে যে অংশ তোলা হয়েছে তার তাৎপর্য বিচারে সমগ্র কবিতার প্রসঙ্গ অবশ্যই মনে পড়বে। চিন্তার, বা কবি-ভাবনার গতিশীলতা উৎকৃষ্ট কবিতাকে সকল দিক থেকে সমৃদ্ধ করে। বলাকা কবিতাটি নিঃসন্দেহে তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কবিতাটির কাঠামোয় সেই গতিশীলতার রূপ পরিস্ফুট হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে। ভাব এবং ভাবনার ক্রম গভীরতার আকর্ষণে চিত্রকল্পও ক্রমশই অধিকতর অন্তর্গূঢ় হয়েছে। বলাকা কবিতার প্রধান চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুধাবনীয় :

(ক) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হলো—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ; -

(খ) ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেলো চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

(গ) পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

(ঘ) নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

উদ্ধৃত শেষতম চিত্রকল্পটি সমগ্র কবিতার চিত্রকল্পাশ্রয়ী আবেগের চূড়ায়িত ক্ষণ। (ক)-চিহ্নিত প্রথম চিত্রকল্পটি কবিতাটির পরবর্তী সমস্ত চিত্রকল্পের যা অর্থ তার বিপরীত অর্থকে ব্যঞ্জিত করছে। এই হল কবি-ভাবনার গতিশীলতার পূর্ব মুহূর্ত। স্তব্ধতার, আবরণ-বদ্ধতার এই অন্ধকার বিন্দু থেকে কবির ভাব-ভাবনা সক্রিয় হয়ে উঠল। এই অর্থব্যঞ্জনার চিত্রকল্প এর পর কবিতাটিতে আর স্বভাবতই নেই। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ—এই অংশে আবেগের নাটকীয় রস রূপায়ণ পাঠকমানসকে সম্পূর্ণভাবে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায় নিয়ে গেছে। স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বের, এবং আবেগের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী ঐক্যসন্ধানী কবিপ্রয়াস এই মুহূর্তেই বাঙ্ময় হয়েছে—তারই চূড়ান্ত পরিণতি আমরা পেলাম (ঘ)-চিহ্নিত চিত্রকল্পে। এই ভাবে এ জাতীয় চিত্রকল্পে গূঢ় চৈতন্যের অব্যর্থ ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অনুরূপ ভাবেই বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' কবিতার চিত্রকল্প প্রসঙ্গে কবিতার কেন্দ্রীয় চিন্তার দীপ্তি অনুভব করা যায়। গুমোট এবং হাওয়া, স্রোতোহীনতা এবং স্রোতের চিন্তায় কবিতাটিতে বিরোধী এবং বিপরীত আবেগের ভাববন্ধন

সৃষ্টি হয়েছে। অস্থির নৈঃশব্দ্য ও দুঃসহ স্তব্ধ গ্রীষ্মোত্তাপ এবং অন্যদিকে স্রোত এবং হাওয়ার কল্পনা জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে মূর্ত করে তুলেছে।

(ক) হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরস সজল সংকল্পে গম্ভীর—

(খ) যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে—

(গ) বালি চড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের—

(ঘ) তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে—

এগুলি চিত্রকল্প হিসাবে উদ্ধৃত হল না। সমস্ত কবিতায় যে আবেগ-দ্বন্দ্ব তারই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এদের কথা স্মরণীয়। এই আবেগ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান বলেই 'একরাশ শাদা ফুল' এই নক্ষত্রের চিত্রকল্প, কবিতার মূল আবেগ দ্বন্দ্বের সাহায্যে মূর্ত হয়েছে। এবং কবিতার প্রধান ভাবরূপ প্রতিটি চিত্রকল্পে প্রতিফলিত হতে হতে মূল ভাবরূপের উপরও আলোকসম্পাত করেছে। 'অনিবার্য যতির স্তব্ধতা', 'প্রতীক্ষার স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত / অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার / আগের মুহূর্তে আভঙ্গ আতত / বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো'—প্রভৃতি চিত্রকল্প তারই কয়েকটি। 'কিম্বা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপ / যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে / অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান'—জটিল অনুভূতির যোগ্য চিত্র, অথচ মূল তাৎপর্যকে উদ্ভাসিত করছে অব্যর্থভাবে। কবিতাটির শেষাংশে (তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই…) সমস্ত আবেগ-দ্বন্দ্ব এক পরম ঐক্যময় প্রশান্তিতে ফিরেছে ঐসব পথ ধরে।

তিন

থিম্ বা সমগ্রার্থ সম্বন্ধে কবির ধারণা বা চেতনাকেই কবি অভিব্যক্ত করেন শব্দ-বিন্যাসে, এবং চিত্রকল্প বিন্যাসে। শেক্সপীয়রের নাট্যকাব্যেই হোক অথবা ব্লেকের ব্যাঘ্র বিষয়ক কবিতাতেই হোক, প্লট অথবা বিষয়বস্তু অপেক্ষা থিম্ টোটাল মিনিং বা সমগ্রার্থ-চেতনার কথাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। উইল্‌সন নাইট যে কারণে ওথেলো, ডেসডিমোনা, ও ইয়াগোকে কেবলমাত্র ব্যক্তিপ্রসঙ্গে বিচার না করে, সে ক্ষেত্রে ওথেলো-ডেসডিমোনা ও ইয়াগো-ধারণার ("The Othello, Desdemona and Iago Conceptions") কথা পেড়েছেন তা এই থিম্

বা টোটাল মিনিং বা সমগ্রার্থের সঙ্গে গ্রথিত। এই সূত্রেই বলা যায় কোনো শিল্পসৃষ্টির কোনো অংশের একক বিচার মানেই খণ্ডিত বিচার। কোনো রীতির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার জীবন সংক্রান্ত সমগ্র চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা না করে, পক্ষান্তরে তাকে অস্পষ্ট করে—তবে তা পরিহার্য।

কবির সৃষ্টিতে তাৎপর্যের বিন্যাসই আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করে। এই সমগ্রার্থের গূঢ় ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া গোটা কবিতাটিতে বস্তুময় হয়ে ছড়িয়ে থাকে। কবির কাজ হল বস্তুরূপের মাধ্যমে উক্ত সমগ্র তাৎপর্যকে অভিব্যক্তি প্রদান। কিন্তু অভিব্যক্তি প্রদান তাঁর কাজ বলে তাঁর বক্তব্যের আত্মরূপকে বিশ্বরূপে আবিষ্কার করাও তাঁর কাজ। এই দুই কাজের মধ্যে কবির কাছে কোনো বিভেদ থাকে না বলেই কবি—কবি। কবিতাটির সমগ্র তাৎপর্য তখন একটি প্রতীকী মর্যাদা লাভ করে। সেই তাৎপর্য তখন হয়ে ওঠে পৃথক জীবন্ত সত্তা; রূপকে, শব্দশৈলীতে চিত্রে সে তখন প্রাণবান; সে আর, জীবন এবং মৃত্যু বিষয়ক, অথবা আলোক এবং অন্ধকার বিষয়ক কোনো তত্ত্ব মাত্র নয়। সে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে, কল্পনাকে পরিপূর্ণ আলিঙ্গন করতে পারে। তার কথা মনে রাখলে সকল ব্যাখ্যাই প্রাসঙ্গিক, সে কথা বিস্মৃত হলে সবই অবান্তর। ডানকানের হত্যা সুশৃংখল ন্যায় রাজ্যে রাজনৈতিক অসদাচরণের অনধিকার প্রবেশের প্রতীক কি না, অথবা এডমাণ্ড্ গণেরিল ও রিগান হল দেহ, কর্ডেলিয়া আন্তর-সত্তা, এবং লিঅর আত্মা—এ-বিচার ঘাতসহ কিনা—সে সমস্তেরই বিচার হবে কাব্যের সমগ্র-সত্যের প্রতীকী মৌল ব্যঞ্জনার পটে। রূপক-সন্ধানের আতিশয্য অথবা আধুনিক মোটিভ-হাণ্টিং-এর বাড়াবাড়ি দুই-ই সেই প্রকৃত বিচারের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

সে বিচারেই জীবনকে কবি কোন্ মূল্যে দেখেছেন তার নির্দেশ মেলে। 'রাইম অফ দি এন্‌শ্যেণ্ট মেরিনার'-এ সূর্য-চন্দ্রের ধারণায় একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা চলে, পাঁচ থেকে দশ রকমে বলা চলে হয়তো কর্ডেলিয়া কিসের প্রতিনিধি। সকল সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। কিন্তু কাব্যের সত্যকে শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াতে হবে কবিতার মধ্যস্থিত আবেগের প্রতিবিম্ব-রূপী বস্তু-বিগ্রহদের পরস্পর সম্পর্কের সজীবতার ভিতরে। যতক্ষণ না এই অন্যান্য সম্পর্কে স্থিরীভূত হচ্ছে ততক্ষণ কবিকর্ম রসগত এবং চিদ্‌গত ভাবসাম্য রচনা করতে পারে না। ব্লেকের 'The Tyger' কবিতার পঞ্চম স্তবকের (when the stars threw their spears···)

একাধিক তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। উক্ত stars এবং spears প্রসঙ্গে কারো বা মনে হয়েছে ওরা হল বস্তুনির্ভর শক্তির প্রতীক, কারো বা মনে হয়েছে খ্রীষ্ট-করুণা আবির্ভাবের পূর্বের কঠিন নিস্তাপ যুক্তি ও শক্তির জগতের প্রতীক হল ওরা। এই যে একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা এও কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবসত্যের দ্বারা উদ্দীপিত। কবিতার মূল বিষয়ের তাৎপর্য-চিন্তায় সব কিছুর সঙ্গে কবি তার প্রতীকী ভাবব্যঞ্জনাটিও সৃষ্টি করেছেন। কবির কৃতিত্বের বিচারকালে এই পথেই আমাদেরও অন্বেষা। এই অন্বেষায় বিশ্লেষণী বুদ্ধি সহায়তা করতে পারে বটে, কিন্তু পথের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কাব্যজিজ্ঞাসাই একমাত্র দিশারী।

এ কারণেই সমগ্রার্থ বা কেন্দ্রীয় তাৎপর্য কিম্বা মূল বিভাবের আত্মিক সহায়তার প্রশ্ন কাব্যবিচারে চূড়ান্ত প্রশ্ন। থিম-এর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতীকী-ভাবের শক্তি নিহিত থাকে, তাই কাব্যের সর্বাংশে সর্বাঙ্গ পত্রে পুষ্পে পল্লবে পরিণত হয়। সমালোচনার কাজ কবিতার সেই সত্তাকে সর্বতোসম্পর্ক সূত্র সমেত আবিষ্কার করা। এই আবিষ্কারের কালেই সমালোচক দেখেন যে কবিতার সমগ্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবির জীবনার্থ-বোধ। দীর্ঘ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবিতায় অথবা যে কোনো সাধারণ কবিতায় এই থিম্ বা সমগ্রার্থ-বোধের প্রকাশে বিচিত্র তারতম্য লক্ষিত হয়। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় থিম্ নিঃসন্দেহে স্পষ্টতা লাভ করেছে। 'বাঁশী' কবিতা, তথাপি, কাব্যের দিক থেকেই থিমের বিচারে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় বহন করছে। ব্যাপক পটভূমি কল্পনায়, যাত্রী জনতার গতিবেগ রূপায়ণে ওই রূপক কবিতাটি শেষ পর্যন্ত বক্তব্য-প্রধান হয়ে পড়েছে—এর রূপের দিক সত্যতা লাভ করে নি। প্রথম স্তবকের রাশীকৃত চিত্রকল্প ও প্রতীক কোনো দিক দিয়েই কবিতাটির উদ্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ নাট্যময় আবেগ দ্বন্দ্বের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে না। অন্তর্গূঢ় নাট্যস্রোত প্রথম থেকে এই ভাবে শিথিল থাকার জন্য অধিনেতাকে হত্যার মুহূর্তের নাটকীয় চূড়ান্তে ঘটনাটি কেবল সংবাদ হয়েই থাকল, তার কোনো আবেগজাত সমরূপ সৃষ্ট হল না। যে জনতা-চরিত্র এই কবিতার মূল ধারণার আধার তাকে প্রত্যয়-গ্রাহ্য করে তোলা যায় নি বলেই এমন হয়েছে।

পক্ষান্তরে 'বাঁশী' কবিতায় কোনো ব্যাপক পটভূমি নেই। আপাত গতিবেগের চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। হরিপদ কেরানীর জীবনে গতিশীলতা নেই। নাটক নেই। কিন্তু কবিতাটিতে আবেগ দ্বন্দ্বের সর্বতো-সমগ্রতায়

প্রতীকী ব্যঞ্জনা বিগুমান। ইঞ্জিনের ধস্ ধস্—দূরের স্মৃতি—ধলেশ্বরী নদী তীরের পিসিদের গ্রামের কথা শুধু তার একদিক। কর্পেটে সিন্ধু বারোয়াঁর তান এবং কিনুগোয়ালার গলি এমন ভাবে কাব্যের সত্যতা লাভ করেছে যে উভয়ের সংমিশ্রণে কোনো তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় নি। উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সত্য। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতার কাজ হল এই সত্য সঞ্চারিত করা। ইতিহাসের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য, রাজনীতির সত্য যা খুশি সে হতে পারে—কিন্তু তাকে প্রাথমিক এবং আবশ্যিক ভাবে যা হতে হবে তা হল কাব্যের সত্য। 'শিশুতীর্থে' বক্তব্যের সত্যতায় কেউ সন্দেহ করছে না। কিন্তু 'বাঁশী' কবিতায় যে সত্যকে লাভ করা যাচ্ছে, তা হল কাব্যের সত্য।

চার

ঠিক এই কারণেই কাব্য-সমালোচকদের ভাষার বহু বৈচিত্র্যে আমাদের ভীত হবার কিছু নেই, আপত্তি করারও কিছু নেই। মনস্তাত্ত্বিক সমালোচকের আর্কেটাইপ আবিষ্কার, অথবা সমাজতাত্ত্বিক সমালোচকের সমাজ-ইতিহাসের পটভূমি ব্যাখ্যা, কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সবাইকেই সাধুবাদ এবং স্বাগতম জানানো উচিত। ততক্ষণ পর্যন্ত উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্ত দৃষ্টিবিন্দু মূলত কাব্যের সত্যকে খুঁজছে, খুঁজতে চেষ্টা করছে। সেই সত্যই যে কাব্যের সকল শিল্পময় পাপড়ির ধারিকাশক্তি এই আবিষ্কারেরই তাৎপর্য শিরোধার্য—অন্য কিছু নয়। গ্রীক নাটকের মধ্যে সাহিত্য সমালোচক নাটককেই খুঁজে থাকেন। সেই নাটকের ধর্মীয় বাহ্য অনুষ্ঠান-গত উৎস (Ritual origin) সম্পর্কে বিচার ইতিহাসের বিচার, কাব্যের বিচার নয়। কাব্য-সমালোচকের আলোচ্য হল কী ভাবে তারা মূল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আত্মস্থ হয়েছে তা দেখা এবং দেখানো। উক্ত বিচারের জন্য সকল সমালোচকের বহুবিধ ভাষার সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে হিসাবে সকল কাব্য-সমালোচকের কাছেই আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে ঋণী। কিন্তু আমাদের এই জাতীয় সকল সহায়তা গ্রহণের একটি মাত্রই লক্ষ্য। তা হল কাব্যের স্বরাজ্যকে আবিষ্কার করা। আধুনিক কবিতা জটিল সময়কে—মানুষের অনুভূতির এক জটিল চলিষ্ণু সমগ্রতাকে রূপায়িত করার জন্য উদ্যোগী। তাই এ কবিতা-সমালোচনার ভাষায় নিঃসন্দেহে একাধিপত্য আশা করা যাবে না। যতই আমরা কাব্যের আত্মাকে তার সক্রিয়তা সমেত উপলব্ধি করতে চাইব—ততই আমরা পরস্পরের বিরোধী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যকে সমন্বিত করার জন্য চেষ্টিত হব।
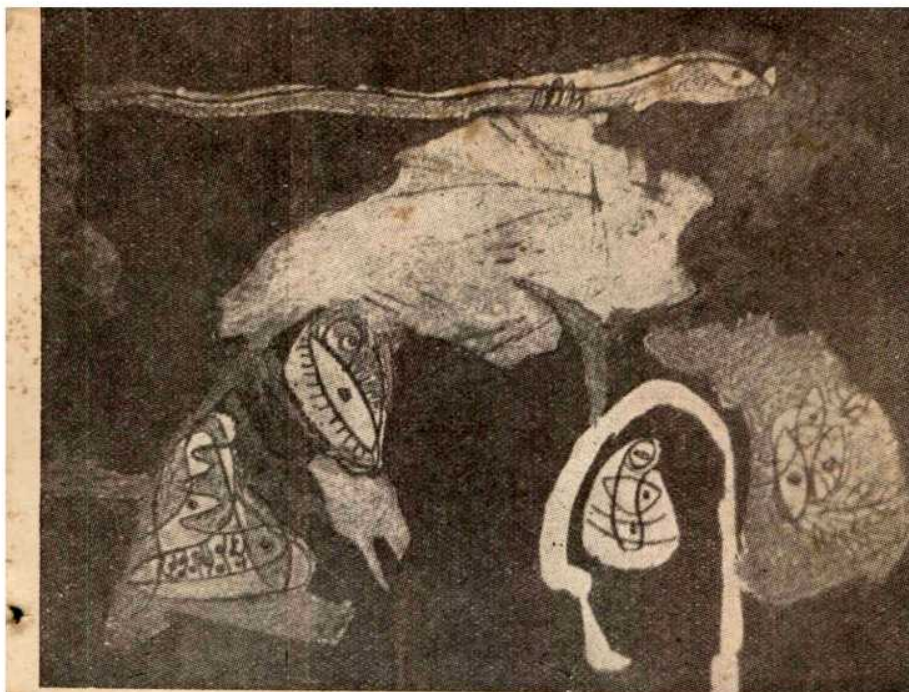
স্বপ্ন

সোমনাথ হোড়

ক্যাকটাস মা

উমা সিদ্ধান্ত
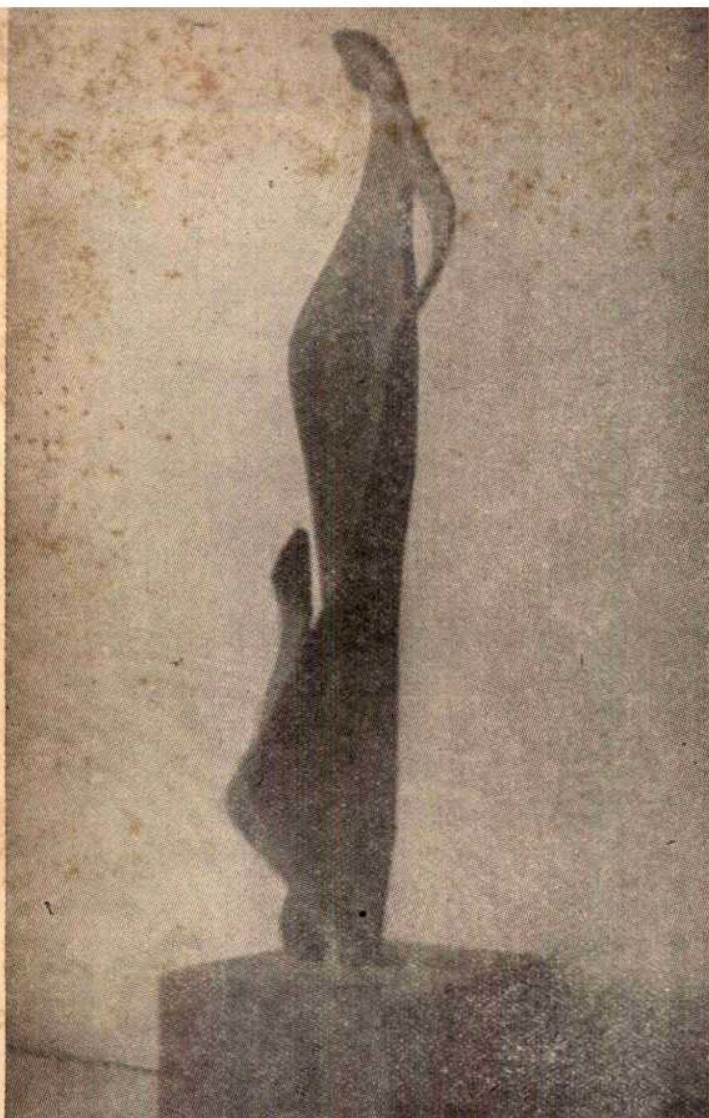
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

গগনেন্দ্রনাথ

১৯০৭ সালে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি গড়ে তোলার কাজে গগনেন্দ্রনাথ যখন আত্মনিয়োগ করেন সেই সময় থেকে তিনি বাংলার শিক্ষিতসমাজে সবিশেষ পরিচিত হন। ক্রমে অবনীন্দ্র-পরম্পরার অন্যতম শিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ভারতের সর্বত্র। প্রাচ্য শিল্পকলার অন্যতম ধারক রূপে যখন তিনি সর্বত্র স্বীকৃত সেই সময় গগনেন্দ্রনাথের 'কিউবিজম' নামধেয় রচনার সাহায্যে রসিক সমাজ গগনেন্দ্রনাথের প্রতিভার যে-পরিচয় পেলেন সেটির যথার্থ মূল্য-বিচার হয়তো এখনও হয়নি।

গগনেন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের রচনার সঙ্গে তাঁর প্রথম-জীবনের চিত্র বা অন্যান্য পরিকল্পনার সম্বন্ধ অনুসরণ করলে সহজেই লক্ষ করা যাবে যে, তাঁর পরবর্তী রচনা একেবারেই আকস্মিক নয়। এই বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে হলে বহু দিক দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন। কারণ তাঁর প্রতিভা বহুমুখী, উদ্ভাবনপ্রিয়তা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ।

সম্ভ্রান্ত মার্জিত শৌখিন মন নিয়ে গগনেন্দ্রনাথ শিল্পের ক্ষেত্রে নানা ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য বা সহানুভূতির অপেক্ষা না করেই।

মধ্যযুগীয় স্থপতি যেমন মন্দিরকে কেন্দ্র করে সকল রকমের শিল্পকর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রকাশ করতেন, তেমনি গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাব, পোশাক ইত্যাদি থেকে শুরু করে সকল রকমের ব্যবহারিক বস্তুকে নূতন ভাবে গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল গগনেন্দ্রনাথের। তাঁর বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনার সাহায্যে আধুনিক মনোভাব জাগাবার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। বিশেষ ভাবে গৃহসজ্জা-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষিত সমাজকে ইউরোপীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে নূতন দিকে চালিত করবার সূচনা তাঁরই শক্তিতে সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় চিত্র রচিত হয়েছিল অত্যন্ত বিজাতীয় পরিবেশে। সে সময় অনেকেই এ কথা অনুভব করেছিলেন। তাই দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের রচনার উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সে সময় ছিল না। দেশী ছবির উপযুক্ত বাঁধাই ও ফ্রেমের পরিকল্পনা গগনেন্দ্রনাথ নানা ভাবে করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সব পরিকল্পনার মূল্য যথেষ্ট বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু সামাজিক রুচি গড়ে তোলার মুহূর্তে এ-সবের মূল্য সামান্য নয়। যে-সব শিল্পীর পরিকল্পনা অনায়াসে সমাজদেহের অঙ্গ হয়ে ওঠে, সেই সব শিল্পীদের নামগোত্রের কথা দৈবাৎ আমরা স্মরণ করি। এই মনোভাবের কারণেই রুচিমান গগনেন্দ্রনাথের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। যদিও আধুনিক সমাজের সৌন্দর্যরুচি বহু পরিমাণে গগনেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

প্রথম জীবনে তাঁর ফোটো তোলার শখ ছিল। বিলেতি কায়দায় জল রঙের কাজ শিখেছিলেন হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। জাপানি শিল্পীদের সংস্পর্শে জাপানি কায়দা তিনি আয়ত্ত করেন নিজের রুচি-মেজাজ অনুযায়ী। শিল্পশিক্ষার বাঁধা পথ দীর্ঘকাল অনুসরণ না করলেও শিল্পের ভাবাগত প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতিশয় স্পষ্ট, এবং বিভিন্ন শিল্প-পরম্পরার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল গভীর।

দৃশ্যচিত্র

জলরঙের আঙ্গিক তিনি যে ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর প্রথম দিকের রচিত দৃশ্যচিত্রগুলি তার সাক্ষ্য। বাংলার পল্লী-অঞ্চল এই সময়ের ছবিগুলির প্রধান বিষয়। দৃঢ় আকার অপেক্ষা উন্মুক্ত পরিবেশই শিল্পীর দৃষ্টি অনুসরণ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বস্তু অপেক্ষা আবহ (atmosphere) সৃষ্টি করাই ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্য। এক দিকে যেমন বাংলার সমতলভূমির দৃশ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, অপর দিকে রাঁচি, হাজারিবাগ ইত্যাদির পাহাড়-জঙ্গল গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে ধরা পড়েছে অনেকবার। এই শ্রেণীর দৃশ্যচিত্রে বস্তুর যে-রকম ঘন সন্নিবেশ, বাংলার দৃশ্যচিত্রে অনুরূপ প্রয়াস শিল্পী করেননি।

বিষয়গত বৈচিত্র্য ছাড়া রাঁচির ও বাংলার দৃশ্যচিত্রের মধ্যে অভাবনীয় কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি কলকাতা শহরের দৃশ্য গগনেন্দ্রনাথকে যেভাবে আকৃষ্ট করেছিল, অনুরূপ

মনোভাব সমকালীন অন্য কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। কৃত্রিম আলোর শোভা শহরের দৃশ্যচিত্রগুলির সর্বপ্রধান আবেদন। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ আলোর আবেদন গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রের মূলগত বিষয়।

কালীতুলির কাজ

কালীতুলির ছাপছোপের সাহায্যে সাদা-কালোর মিশ্রণ বা সংঘাত যে-ক্ষেত্রে বস্তুকে অনুকরণ না করে কেবল চিত্রধর্মী আবেদন সৃষ্টি করেছে, সেই ছবিগুলিকেই গগনেন্দ্রনাথ-রচিত দৃশ্যচিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু গগনেন্দ্রনাথ জাপানের পরম্পরা থেকে কালীতুলির কাজের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেই কারণে এই বিষয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। জাপানি মতে কালী ও তুলির প্রকৃতি এক নয়। আলোছায়ায় আর্দ্রতা শুষ্কতা ইত্যাদি দৃশ্যগত গুণই কালীর ব্যবহার থেকে আসে, অপর দিকে রূপ আকার গঠন ইত্যাদি নিপুণ তুলির সাহায্য ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ দৃশ্য গুণের উৎস কালী। স্পৃশ্য গুণের নিদান তুলি।

গগনেন্দ্রনাথ কালীর ছাপছোপের সাহায্যে দৃশ্য ও অদৃশ্যের ব্যবধানকে অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তুলির টান রেখা ইত্যাদি তাঁর রচিত প্রতিকৃতিতে পাওয়া গেলেও ক্যালিগ্রাফি বা রেখাঙ্কনের ধর্ম গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রধান লক্ষণ ছিল না।

নরনারীর জীবন অবলম্বনে রচিত ছবির সংখ্যা অনেক কম। এই শ্রেণীতে চৈতন্যচরিতমালা নামে পরিচিত ছবির কথাই উল্লেখ করতে হয়। উল্লিখিত ছবিতে আকারগত বাঁধুনির আদর্শ লক্ষ করলে শিল্পীর নির্মাণদক্ষতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়। বর্ণের উজ্জ্বলতা ও সংঘাত যে-প্রকার প্রত্যয়ের সঙ্গে শিল্পী তাঁর এই চৈতন্যচরিতমালার স্থানে স্থানে প্রয়োগ করেছেন, অনুরূপ প্রয়াস তাঁর দৃশ্যচিত্রে আমরা কোথাও লক্ষ করি না। এই সব ছবিতে ভাবব্যঞ্জক ভঙ্গির চূড়ান্ত পরিমিতিও লক্ষ করার বিষয়।

গগনেন্দ্রনাথের শেষদিকের রচনাতে বিমূর্ত গুণের যে সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখি, চৈতন্যচরিতমালার বহু রচনাতে অনুরূপ বিমূর্ত গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। পুরীর মন্দিরের দ্বারে পূজারিণী ইত্যাদি আরো যে-সব

নরনারীর জীবনকথা গগনেন্দ্রনাথ রচনা করেছেন কখনও রঙে কখনও কালীতে, সে ক্ষেত্রেও নির্মাণরীতির কৌশল ও বিমূর্ত গুণ সহজেই লক্ষগোচর হয়। বলা যেতে পারে নরনারীর অন্তর্নিহিত ভাব বা তীব্র অনুভূতির অনুসন্ধান অপেক্ষা গগনেন্দ্রনাথ নরনারীর আকারগত বৈশিষ্ট্যকেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের সুখদুঃখ বা দৈহিক সৌন্দর্যের আবেদন গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে বোধহয় কখনোই প্রতিফলিত হয়নি। চিত্রে রূপায়িত নরনারী আকারে ভঙ্গিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং ছবির মধ্যে সর্বত্র একরকমের আবেগরহিত কাঠিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলি উল্লেখযোগ্য। আকারগত বৈশিষ্ট্য (character) ছাড়া অন্য কোনো আবেদন গগনেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে নেই। মুখচোখের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা অথবা মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রকটিত করার সামান্যমাত্র চেষ্টাও প্রতিকৃতি অঙ্কনকালে তিনি করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিষয় অপেক্ষা বস্তুই, অন্তর্ভাব অপেক্ষা আকারই গগনেন্দ্রনাথকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছিল এ কথা ১৯১০—১৯২০ সালের রচনার সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে।

ইউরোপে আধুনিক রূপকলার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর গগনেন্দ্রনাথের কাছে ঠিক কী ভাবে কোন্ সময় পৌঁছেছিল সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।[১] তবে নিশ্চিত ভাবে বলা চলে ১৯২০ সালের পর গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব আত্মপ্রকাশ করেছিল। শিল্পের অবচ্ছিন্ন (abstract) গুণ আবিষ্কার করার নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের পরিচয় সম্ভবত ছিল। জার্মান শিল্পীদের সৃষ্টি callage মন্ড্রিয়ানের (Mondrian) রচনা, ক্যান্ডিনস্কি (Kandinsky) ইত্যাদি শিল্পীদের রচনাতে যে দ্বিমাত্রিক (two-dimensional) প্যাটার্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় গগনেন্দ্রনাথের কাজের সাদৃশ্য তারই সঙ্গে। গগনেন্দ্রনাথের তথাকথিত কিউবিজমের সঙ্গে ফরাসী কিউবিজমের সম্পর্ক তেমন নেই, কারণ গগনেন্দ্রনাথও প্রথম থেকেই দৈর্ঘ্য প্রস্থ এই দুই মাত্রার মধ্যে তাঁর

১. শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ-এর চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট এ আধুনিক জার্মান শিল্পীদের চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়েছিল এতে ক্যানডিন্‌স্কি প্রমুখ শিল্পীদের রচনা ছিল। গগনেন্দ্রনাথের বিমূর্ত রচনা এই প্রদর্শনীর পরে বা পূর্বে শুরু হয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই।

রচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। একান্ত ভাবে কিউবিজম থেকে গগনেন্দ্রনাথ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন এই ধারণা অনেকটাই ভিত্তিহীন। সমগ্র ভাবে বিমূর্ত শিল্প প্রচেষ্টার লক্ষ্য ও লক্ষণগুলি গগনেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল এ কথা বলাই সংগত।

প্রধানতঃ ছোট বড়ো তিনকোণা আকারের সাহায্যে কালোসাদার সংঘাত সৃষ্টি করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল। জালের ফাঁক দিয়ে আকাশ যে-রকম দেখায় গগনেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা অনেকটা সেই রকম। এই সব ছবিতে আলোর বিচিত্র ভঙ্গি ছাড়া কোনো সাদৃশ্যযুক্ত আকার সৃষ্টির তিল মাত্র চেষ্টা নেই। কাজেই অবচ্ছিন্নতা-গুণ থাকলেও এগুলি কিউবিজম্ নয়। কারণ তিন মাত্রা দ্যোতক দেশ বা স্পেস সৃষ্টি করার পরিবর্তে দ্বিমাত্রিক সারফেসের উদ্ভাবনই গগনেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। নিখুঁত কঠিন আকারের বাঁধন গগনেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বিমূর্ত রচনার বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট আকারের ইটে গাঁথা দেয়ালে যেমন টেন্‌সনের সৃষ্টি হয় অনুরূপ টেন্‌সন বা বাঁধুনি গগনেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্রের প্রাণস্বরূপ। তাঁর প্রথম দিকের বিমূর্ত রচনাকে কেন্দ্রস্থল বলে কোনো একটা স্থান চিহ্নিত করা চলে না। কালোসাদায় নির্মিত নকশায় পটভূমির সীমা অতিক্রম করার ব্যঞ্জনাই তাঁর এ সময়ের সকল রচনার বৈশিষ্ট্য।

বস্তুসাদৃশ্যবর্জিত চিত্র রচনার চেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কারণ আকারের যোগ-বিয়োগ অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে বাধ্য। গগনেন্দ্রনাথের রচনাতেও পুনরাবৃত্তি হয়েছে যথেষ্ট। আকারনিষ্ঠ আলোছায়ার খেয়ালী রচনার মধ্য দিয়ে ক্রমে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত প্রকাশিত হতে দেখা যায় গগনেন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের রচনাতে। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা বিচিত্র বর্ণের দ্যুতিতে ঝলোমলো রচনাগুলিকে গগনেন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। সেই সব ছবিতে সাদৃশ্যের অভাব নেই। তবে বাস্তব আকারপ্রকারের অনুসরণ অপেক্ষা বাস্তবের রূপান্তর সাধনের চেষ্টাই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিউবিজম-ধারার নেভিন্‌সন্ প্রমুখ শিল্পীদের রচনার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মিল থাকলেও অমিলও যথেষ্ট। যে-দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বোক্ত ছবি রচিত হয়েছিল সে ক্ষেত্রে আকার উদ্‌ভাবন অপেক্ষা আলোর বিচ্ছুরণ ছিল প্রধান লক্ষ্য।

ইম্‌প্রেশনিস্টরা অনুসন্ধান করেছিলেন আলোর মৌল প্রকৃতি। গগনেন্দ্র-

নাথ রঙ-তুলির খেলায় পেয়েছিলেন আলোর খামখেয়ালীর ভাঙাচোরা। যেমন ভেঙে-চুরে যায় আলো স্ফটিকের সংস্পর্শে এসে, এই ভাঙাচোরার ফলে দৃশ্য জগতের কৌতুককর রূপ প্রকাশ পায় বস্তু-সাদৃশ্যেরই আধারে। গগনেন্দ্র-নাথ বস্তু-সাদৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই দিক দিয়ে। তাঁর এই সব ছবিতে বর্ণের উজ্জ্বলতা ও বিচ্ছুরণ চমৎকৃত করে দর্শককে। দৃশ্যগত উদ্দীপনার এমন বিশুদ্ধ প্রকাশ আধুনিক শিল্পে অল্পই পাওয়া যাবে। স্ফটিকের দানার মতো এক-এক টুকরো আকার মিলেমিশে ক্রমে আর-এক রঙের ও রূপের জগৎ দেখা দিল গগনেন্দ্রনাথের রচনাতে। ক্রমে সত্য বস্তু ও কল্পনা মিলিয়ে একটি রূপকথার মতো চিত্তাকর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন গগনেন্দ্রনাথ। অতি-বাস্তবিক সুররিয়ালিস্ট চিত্রে পাওয়া যায় অবচেতন মনের প্রতীকযুক্ত আদিরসাত্মক পরিবেশ। স্বপ্নে ভারশূন্য এবং স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অস্থির দৃশ্যপ্রবাহ যেভাবে জাগরণের সীমানায় এসে অদৃশ্য হয়, অনুরূপ ভাবে গগনেন্দ্রনাথের এই সময়ের রচনা দর্শকের অভিজ্ঞতাকে ক্ষণমাত্র স্পর্শ করে। বস্তুভার অপেক্ষা বর্ণের উদ্দীপনা দর্শকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

বিশুদ্ধ প্যাটার্ন বা নকশা তৈরি করার থেকে শুরু করে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আইডিয়ার ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ যেরূপে পৌছেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ পর্যন্ত করা হয়েছে। এই সব ছবিতে রেখাত্মক গুণ থাকলেও রেখার প্রয়োগ যৎসামান্য। গগনেন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের এমন কতকগুলি রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি পূর্বোক্ত রচনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ এই সব রচনাতে উদ্ভাবন অপেক্ষা একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি প্রকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

পরিত্যক্ত গৃহের অভ্যন্তর, এই বিষয় অবলম্বনে ভাঙন-ধরা ঠাকুর-পরিবার ও জীর্ণ অট্টালিকার জীবন-কথা প্রত্যক্ষ করা যায় শিল্পীর এই সব রচনাতে। ভুতুড়ে (uncanny) ভাবভঙ্গী এই সময়ের প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়গত ব্যঞ্জনা থাকলেও এই ছবিগুলির সর্বপ্রধান আবেদন বস্তুসমাবেশে। 'স্টিল লাইফ'-এর অনুরূপ অচল স্থির বিভিন্ন আকারের সমাবেশে এক-একটি নির্মিতি। 'স্টিল লাইফ'-এর গুণান্বিত গৃহের অভ্যন্তরদৃশ্য গগনেন্দ্রনাথের শাশ্বত সৃষ্টি। বিমূর্ত আকার ও বর্ণের সমাবেশে রচিত চিত্রের মাধ্যমে যে-অভিজ্ঞতা শিল্পী আয়ত্ত করেছিলেন তারই সার্থক প্রয়োগ উল্লিখিত চিত্রগুলিতে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ছবিগুলি একরঙা।

স্পষ্ট ও পরিষ্কার কালো-সাদার বিন্যাস গগনেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কালো-সাদার সংঘাত যেভাবে শিল্পী নির্ভীক ভাবে প্রয়োগ করেছেন তার তুলনা গগনেন্দ্রনাথের পূর্বের কোনো রচনাতেই পাওয়া যাবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আঙ্গিকগত দক্ষতার পূর্ণ পরিচয় তাঁর গৃহাভ্যন্তর বিষয়ক চিত্রে।

ব্যঙ্গচিত্র

ব্যঙ্গ বা কৌতুক চিত্রের পরম্পরা উন্নত রূপকলার সঙ্গে কোনোদিনই এক আসন পায়নি। ব্যঙ্গচিত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার পর্যায়ভুক্ত না হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় রূপে ব্যঙ্গচিত্রের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে-সব সামাজিক সমস্যা সামনে রেখে গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র রচিত হয়েছিল সে-সবের তীব্রতা অনেক পরিমাণে আজ হ্রাস পেয়েছে, এমন-কি হয়তো বা সে-সব সমস্যা লুপ্ত হয়ে গেছে। শিল্পীর দেখবার ও দেখাবার বিশেষ ভঙ্গি এখন আমাদের আলোচনার বিষয়।

'বিরূপ বজ্র' এবং 'অদ্ভুত লোক' প্রভৃতি গ্রন্থে ছাপা যে-সব ছবিতে সামাজিক বহু কুসংস্কার সম্বন্ধে শিল্পী ব্যঙ্গকৌতুক করেছেন সেগুলি তাঁর সার্থক রচনা। মুখ-ভঙ্গি অপেক্ষা নাটকীয় পরিবেশের সাহায্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌতুকরস প্রকাশিত হয়েছে। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ আঘাত দেওয়া অপেক্ষা কৌতুক করাই গগনেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল।

সম্ভ্রান্ত সমাজকে লক্ষ্য করেই গগনেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্র রচিত হয়েছে। কলকাতা শহর ও শহরবাসীর শখ, শৌখিনতা ও সংস্কার একত্রে মিলিয়ে যে বিসদৃশ অবস্থা তারই বাস্তব রূপ গগনেন্দ্রনাথের কৌতুকচিত্রের সর্বপ্রধান অবলম্বন। তাঁর রচিত কলকাতা শহরের দৃশ্য এবং কলকাতা-বাসীর কৌতুককর জীবনের চিত্র শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

মিষ্টভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় গগনেন্দ্রনাথের কৌতুকবোধের সংঘাত প্রকাশিত তাঁর ব্যঙ্গচিত্রে। পূর্বোক্ত ছবিগুলির সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলে, তাঁর শেষ-জীবনের রচনাতে যে হাস্যোজ্জ্বল ভাব দেখা যায় সেটিকে আকস্মিক বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

গগনেন্দ্রনাথের শিল্পের যে-পরিচয় দেওয়া গেল তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, তিনি অবনীন্দ্র-পরম্পরার ধারক-বাহক ছিলেন না বিভিন্ন পথে নানা বিচিত্র পরম্পরা আত্মসাৎ করার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। ইউরোপের বিমূর্ত শিল্পরীতি তাঁকে যে কতটা আকৃষ্ট করেছিল তার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর শেষ-জীবনের রচনাতে। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিল্পের ভাষা গগনেন্দ্রনাথই যে প্রথম আয়ত্ত করেছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই প্রয়াসের পরিণামে তিনি প্রথম জীবনের শিল্পরীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিমূর্ত শিল্পরীতির প্রতি গগনেন্দ্রনাথের আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এইবার করা যেতে পারে। মানবিক ভাব, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ধারণার রূপায়ণ গগনেন্দ্রনাথের রচনাতে কোনোদিনই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি। আলোকে মগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ গগনেন্দ্রনাথের সৃষ্টির সর্বপ্রধান বিষয় ছিল। বিমূর্ত শিল্পের সংস্পর্শে এসে গগনেন্দ্রনাথ বস্তুসাদৃশ্যরহিত বা ন্যূনতম সাদৃশ্য-যুক্ত প্যাটার্ন সৃষ্টি করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হন। উদ্ভাবনপ্রিয় গগনেন্দ্রনাথ নূতন শিল্প-উপাদান অনায়াসে এবং অতি অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। ক্রমে বিমূর্ত ও মূর্ত উভয়ের সংযোগে গগনেন্দ্রনাথ এমন একটি শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যার মৌলিকতা আধুনিক কালের বিমূর্ত শিল্পপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নূতন ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি স্বতন্ত্র থেকেছেন, তেমনি স্বতন্ত্র তাঁর শিল্প-সৃষ্টি। গগনেন্দ্রনাথের প্রতিভার আলোকে যে-দিক উদ্ভাসিত হয়েছে, সে পথে তাঁর অনুগামী কেউ নেই।

এই মুহূর্তে শিল্পের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্নই সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জন্যই সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃত হলেও তাঁকে অনুসরণ করার প্রশ্ন জাগে নি। আন্তর্জাতিক পটভূমিতে বিচার করলে গগনেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য ও তার রচিত শিল্পরূপের অভিনবত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে না।

[সজল রায় চৌধুরী
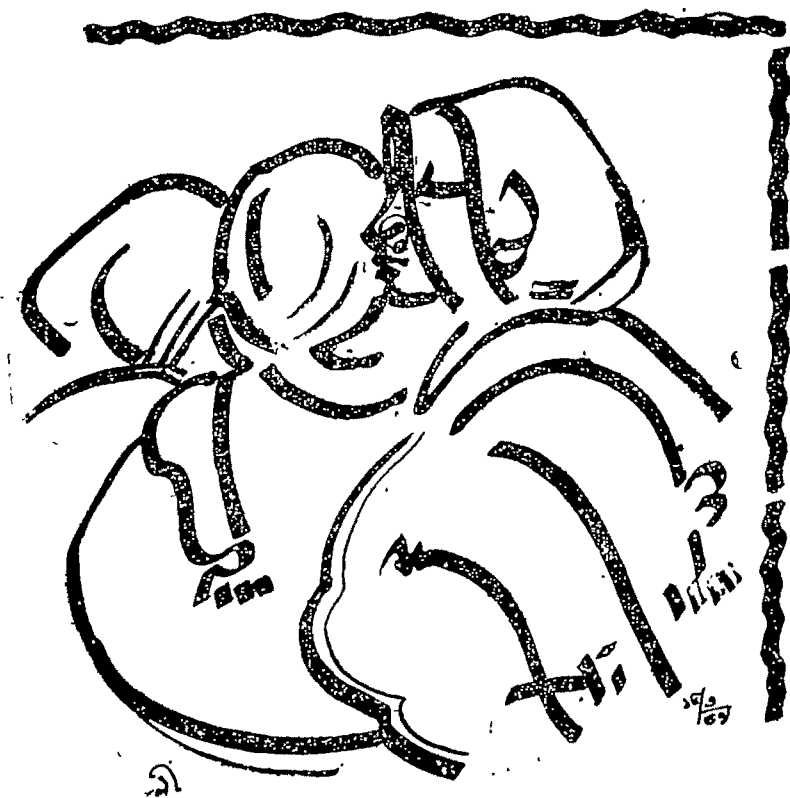
[সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোপাল হালদার

উপহার

হাত-ব্যাগটা নিচেকার আসনে রেখে হোল্‌ডল্‌টা উপরে তুলে রাখছিলাম অমনি পায়ের কাছে একটা ধপাস করে শব্দ হল। দেখি ব্যাগটা ধরাশায়ী। টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট-টাউজার্সের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শুনলাম: বো সামন্‌কা লিয়ে নেহি, বৈঠনেকা—

ভদ্রলোকের পাশেই তো তাঁর এয়ারব্যাগ ও নাইলন-আভাসিত-বক্ষা তাঁর মুক্তোদরা সহধর্মিনীর গা-ঘেঁষে তারও একটি নাতিকৃশা ব্যাগ। হাত-ব্যাগটাও উপরে তুলে রেখে সেদিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললাম 'ও দুটি মিস্টার ও মিসেস বুঝি ?'

কথাটা তাঁর বুঝবার আগেই পিছনে খিল খিল করে একটা হাসির হাল্‌কা ঢেউ খেলে গেল। ফিরে দেখলাম—এ আবার কোন্ দেশীয়া ? পাঞ্জাবী না, সিন্ধী ? না, উত্তরপ্রদেশিনী ? না দেশীয়াই নয়, দোআঁশলা, অথবা সবই, আন্তর্জাতিকা। পরনে বিলিতী যুবতীদের আঁটোসাঁটো টাইট্‌স্, ততোধিক আটোসাঁটো ব্লাউস্, চূড়াকৃতি পিঙ্গল কেশপাশ, লাল ঠোঁট, লাল নখ, সুচিক্কণ সুদীর্ঘ কালো ভুরু, এক হাতে একটা সোনালি শিকল, গলায় টকটকে লাল পাথরের মালা।

ট্রাউজার্স-হাওয়াই পাঞ্জাবী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল: আমি মিস্টার মেহ্‌তা, ডিপুটি সেক্রেটারি সেন্ট্রাল গবর্মেণ্ট! ইনি মিসেস মেহতা—পিছনের সেই আন্তর্জাতিকা মনে হয় হাসি চাপল। আমি মাথা ঝুঁকে বললাম: আপনাদের জেনে ধন্য হলাম। আমি চ্যাটার্জি সওদাগরী আপিসের অ্যাসিস্টেণ্ট। তাঁর পাশের ব্যাগটা উপরে তুলে দিয়ে বসবার উদ্যোগ করতেই 'ওটা ধরছ কেন ?' বলে এক ছোঁতে তিনি তা হাত থেকে কেড়ে নিলেন।

ধৈর্য রক্ষা করে বললাম—বসবার আসনে বসব বলে।

তাঁর ক্রোধ প্রবলতর হল: এখানে লেডিজ্‌ আছে দেখছ—সম্মান করতে জানো না ?

—একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন পুরুষে মিলে লেডিজ হয় না। হয় 'পেয়ার', 'জোড়', 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্।' বেপরোয়া মেয়েটা মনে হয় আবার হাসি চাপল।

আমার কিন্তু কান গরম হয়ে উঠেছে। এদের সঙ্গে একাসনে বসব? বরং দাঁড়িয়ে থাকব বা অন্য আসনে বসব। বসতেই সেই রঙ্গিনী চোস্ত ইংরেজিতে বললে: 'শেষ পর্যন্ত বসবার আসন চিনতে পেরেছেন!' বসুন, বসুন।—আমি 'লেডিজ' নই, শেইলা গুপ্তা। হাঁ, 'মিস্' যদি তা বলা দরকার মনে করেন, না হলে শেইলা। ভেনিটি কেস্ নিয়ে খুলে ধরলে আমার সামনে সিগারেট কেস—ইচ্ছা করুন।

আমি!—বেকুফ্ বনে গেলাম। ধন্যবাদ, এইমাত্র একটা শেষ করেছি।

—দ্বিতীয় একটা?

—থ্যাংক্স্, এত শীঘ্র চলবে না।

এ আবার কেমন চিজ্!

ওদিক থেকে মিসেস মেহতা উর্দুতে কী পরিহাস করলে, শেইলাও তেমনি উত্তর দিলে। অর্থ কিছুটা বুঝে মাথা গরম হতে লাগল।

এক সময়ে ডাক শোনা গেল—শেইলা,—শেইলা, সুতোগে নেহি।

অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ছিল। দাঁড়িয়ে উঠে উপরের বার্থে হোল্ডল্ খুলতে যাব কী ঘটে গেল। নিজেই জানি নি কখন বসে পড়েছি সেই নিচেকার আসনে মাথা গুঁজে, চোখ বুজে।

কি ব্যাপার? মিস্টার চ্যাটার্জি! মিস্টার চ্যাটার্জি!

প্রেসারটা বেড়েছে। বুকে একটা ব্যথা।

বলে দাঁড়াতে গেলাম। মিস গুপ্তা দু হাতে বাধা দিয়ে বসিয়ে দিলে। এন্‌জিনা? নিশ্চয় এন্‌জিনা। ডোন্‌ট্ ম্যুভ্ প্লিজ্। বিছানা করে দিচ্ছি।

'এনজিনা' কি? সকালেই পৌছেছি। সারাদিন ছুটেছি, খেটেছি, তারপর কাজ থেকেই ছুটে এসে ধরেছি ট্রেন। এই মিস্টার মেহতার ইতরতায় মাথা গরম করে দিয়েছে, একটু বিশ্রাম করছি।

মিস্ গুপ্তা উপরের বার্থে নিজের বিছানা তুলে ফেললে।

আমি বাধা দেবার আগেই আমার চোখের সামনে দিয়ে সে এক লাফে উঠে গেল উপরের বার্থে—জানালায় উঠে বসল যেন মার্জারী নিস্তব্ধ পদে। নিচে থেকেই বুঝলাম, সেখানে সে খোলস বদলাচ্ছে।

সকালে ট্যাক্সি কম। দেরীতে দেরীতে আসে। আমার পালাই আসছিল।

মিস্টার চ্যাটার্জি, দক্ষিণে যাচ্ছেন আপনি ?

সেই বেপরোয়া মিস্ গুপ্তা আমার গাড়িতে উঠে বসেছে। বললাম: আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে গেলেন না ?

—তারা আমার সঙ্গী কে বললে, ওদের গাড়িতে ওরা যাচ্ছে আলিপুর। আমি যাচ্ছি দক্ষিণে। শুনেছি বড় গোলমেলে রাস্তায় বাড়িটা। বলে উঠে বসল—জিনিস নিয়ে রাস্তার নাম ও নম্বর বললো: আশ্চর্য হলাম।

ও নম্বরে ? গুপ্ত সাহেবের ওখানে ? কি হন তিনি আপনার ?

—ড্যাড্। জানেন নাকি তাঁকে।

—কিছুটা! এক বাড়িতেই আমরা থাকি। তিনি দোতলায়। আর আমি তেতলায়।

—সো !—চোখেমুখে বেশ খুশির আভাস—হোয়াট্ এ ফান্ !

ফান্ নয় ? মাস পাঁচেক আগে দেড় শ টাকার আড়াই ঘরের ফ্লাটটা সাড়ে তিন শ টাকা মাসে ও নগদ দু হাজার সেলামি দিয়ে ভাড়া নিয়েছেন মিস্টার এন্, জি, গুপ্ত। মিস্টার না হলেও মিসেসকে ত না চিনে উপায় ছিল না—পাঞ্জাবীদের ভীড় ফ্লাটে, এক-আধটা মোটর দাঁড়িয়ে থাকে। না চিনে আরও উপায় ছিল না। তখন থেকে মিস্টার মজুমদার আমাকে তুলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। দোষ দিতে পারি না।

গত দশ বৎসর আমরা এক শ টাকাতে আছি তেতলার ফ্লাটটা জুড়ে। তবে তিনি বলেন ভাড়ার জন্য নয়। তার ছোট ছেলে দেশে ফিরে আসছে, তাই। ছ বছর ধরে সে পশ্চিম জার্মানিতে আছে। সেখানে বিয়ে করেছে, একটি ছেলেও হয়েছে। এতদিন মিস্টার মজুমদার বলতেন, 'দেশে এসে কি হবে ? এই তো দেশের অবস্থা!' মজুমদার গিন্নী বলতেন, 'ভানু বলে তোমরা এসো। এখানেই থাকবে। ভাবছি কিছু দিনের মতো তাই যাই বরং। এখন কিন্তু তিনি বলেন: 'দেশ ছেড়ে থাকবে কেন ? ওর কিসের অভাব ? তাই লিখছে—দেশে আসছে। চাকরিও ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু বলো তো এখন কোথায় রাখি ? না হলে কি বলি—তুমি অন্যত্র বাড়ি দেখে নাও।'

'ফান্' নয় কি ? মিস্টার গুপ্তের তিন মাসের মধ্যেই একেবারে নোটিশও পেয়ে গিয়েছি বাড়ি ছাড়ো। কিন্তু আমিও তো ফান্ বুঝি। যাবো কোথায় আর যাবই বা কেন ? যাক কোর্টে।

এদিকে মিস্ গুপ্তা সিগারেট বের করছে দেখেই বললাম : না।

—ঠিক্। আপনার এনজিনাতে সিগারেট 'কাট্' করা উচিত।

আমি বললাম : আপনারও তাই—বাঙলা দেশে এসে পড়েছেন যখন।

—ওঃ! শুনেছি বটে বাঙালি মেয়েরা স্মোক্ করেন না। হাউ ফানি—

—আরও 'ফানি' এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলছি আমরা।—বলে এবার বাঙলায় বললাম,—অথচ দুজনাই বাঙালি। হাউ ফানি।

মিস্ গুপ্তা বাঙলায় বেশ বললেন, আমি তা মনে করি না।

আমি হেসে বললাম : ফানি বৈকি। এই তো বেশ বাঙলা বলতে পার।

—বলতে আমি উর্দুতে পারি আরও ভালো। আর তার থেকেও বেশি ভালো ইংরেজিতে, তাহলে ইংরেজ বলে ভাবব না কেন নিজেকে?

না বলে পারলাম না : তারা তোমাকে ভাবতে দেবে না বলে।

আর আমার রঙটাও তা দেয় না বলে, না?—বলে হেসে উঠল।

—মিস্টার চ্যাটার্জি, তাতে কি? আমি রক্তমাংসে বাঙালি। কিন্তু নয়া দিল্লী আমার জন্মস্থল। কিন্তু বাসস্থল?—আই বিলং নোহোয়্যার, কোথাও নয়।

মালতী ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠিয়ে দিল, 'পড়ো তো পরে মিহিদানা আনছি।' চটি জোড়া এগিয়ে দিতে দিতে বললে :

—ও মেয়েটি কে—তোমার সঙ্গে এল?—জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল ট্যাক্সি থেকে নামতে।

—বললাম, মিহিদানা নয়, দিল্লী কা লাড্ডু।

—তা সত্য। কিন্তু পেলে কোথায়! দিল্লী তো যাও নি।

—পেলাম দিল্লী এক্স্প্রেসে—এক ট্রেনে, এক কামরায়—

—তারপর এক ট্যাক্সিতে, একাসনে—

—হাঁ। তারপর বাতায়নে মধ্যবর্তিনীর আবির্ভাব, এবং ছাড়াছাড়ি।

—সম্ভবত, কারণ মিস্টার গুপ্ত 'ডাড'।

—তাই নাকি? শুনেছি বটে, ওদের ছেলে 'নেভিতে'। মেয়ে এয়ার হোস্টেস্ এক বিদেশী কোম্পানিতে, জামাইও সে লাইনে পাইলট।

দেখলাম মালতী আমার থেকে বেশি জানে। আমি জানতাম 'মিস গুপ্তা', মালতী জানে 'মিসেস্ অ্যাণ্টোনিও লুচিও।' আমি জানি 'গার্ল গাইডের

কর্ত্রী', মালতী জানে 'এয়ার হোস্টেস।'—ইন্টারেসটিং। তবে আমারও বোঝা উচিত ছিল—ও মেয়ে উড়তে পটু। কেমন এক লাফে উপরের বার্থে উঠে গেল। আমি তো কাল উঠতে গিয়ে নাজেহাল। বলেই বুঝলাম—ধরা পড়ে যাচ্ছি।

মালতী উৎসাহিত হয়ে বললে: কেন কি হয়েছিল?

গল্পটা হালকা করে বললাম। সেই পুরনো ভাঙা কাঁধটা মট করে উঠল।

তোমাকে নিচের বার্থে দিয়ে মেয়েটা গেল উপরের বার্থে?

—শুধু তাই? হাওড়া অবধি একটানা ঘুমুলে।

মালতী ভুলল না। আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা করলে। তারপর শান্ত স্বরে বললে: ব্যথাটা কেমন এখন?

—প্রায় নেই। ইচ্ছা করেই প্রায় যোগ করলাম। না হলে বিশ্বাস করবে না।

আচ্ছা। এখন হাত-মুখ ধুয়ে নাও। চা খাও। আমি ব্যাগে গরম জল পুরে আনছি সেঁক দিয়ে দেব। আজ বাড়িতে বিশ্রাম করবে।

বুঝিয়ে রাজী করালাম: আপিসে রিপোর্টটা দিয়ে সাহেবকে বলে তাড়াতাড়ি চলে আসব।

সেদিনই বাড়ি ফিরতে দেরী হল—শেষ দিকে নতুন এক ঝামেলায় পড়লাম আপিসে—ট্রেনে আমার সঙ্গে যারা এসেছে তারা কে। যেন তা আমার জানা উচিত। বাড়ি ফিরলাম তাই দেরীর জন্য ভয়ে ভয়ে—নিশ্চয়ই মালতী রাগ করবে। দেখলাম তা মিথ্যা নয়। নিজে থেকে বলতে লাগলাম জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে—'দেরী করিয়ে দিলে। যত রাজ্যের ঝামেলা কি শেষের দিকে?' ইত্যাদি। কিন্তু উত্তর নেই। চা ও খাবার দিয়ে মালতী আবার ভিতরের ঘরে চলে গেল।

চা শেষ করে সিগারেটের জন্য হাত বাড়াতেই দেখলাম কেসটা অন্তর্হিত। মিতুকে বললাম: দেখ তো কোথায় রেখেছেন সিগারেট তোর মা।

মালতী এসে দাঁড়াল, বললে: পাবে না। এখন যাও, বিশ্রাম করোগে। বিছানা তৈরি করে দিয়েছি। খানিক পরেই ডাক্তার আসছে—খবর দিয়েছি।

—ডাক্তার!—হেসে উড়াতে চাইলে হবে কি? বুঝলাম সব বৃথা।

—কাল গাড়িতে হার্ট অ্যাটাক্ হয়েছিল, আর তা না বলে আজ গেলে আপিসে?—গাম্ভীর্য থাকলেও দুশ্চিন্তা সেই স্বরে।

আপত্তি করা নিষ্ফল। খাটের উপরে কাৎ হয়ে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টানো ছাড়া উপায় রইল না।

ডাক্তার এলেন। আমাকে শুইয়ে বসিয়ে কোনো পরীক্ষা বাদ দিলেন না। কিন্তু চলে গেলে বুঝলাম—মালতী নিশ্চিন্ত হয়েছে কিছুটা। খাটের কাছে এসে দাঁড়াল।—অসুখের কথাটা আমাকে বললে না। আমার শুনতে হল অন্যের থেকে। বুঝলাম, এ দুশ্চিন্তা নয়, অভিমান।

আমিও বললাম অভিমান করে: তোমার কাছ থেকে আমি অসুখ গোপন করতে পারতাম! তুমি আমার মুখ দেখে বুঝতে না!

—ও মেয়েটা ওরকম বললে কেন—'কাল ওর এন্‌জিনা গিয়েছে। আজ আপিসে যেতে দিলেন কেন?' বুঝলাম বিরূপতা ও বেদনাটা কোথায়।

—থ্রম্বোসিস্ যে বলে নি, তাই আশ্চর্য—যা একখানা চিজ তোমার এই মিসেস্ লুচিও।

কাজ হল। মালতী আরও নিশ্চিন্ত হয়ে বসল:

—জানো, ও নাকি মিসেস্ লুচিও নেই।

স্কুল থেকে ফিরে মালতী গিয়েছিল মা ও মেয়েকে নিজে ধন্যবাদ দিতে। তাতেই শুনল অসুখের কথা, আর এসব। মালতী বলছিল, 'ভাগ্যে আপনি ও-কামরায় ছিলেন। ভাগ্য বলতে হবে, স্বামী স্ত্রী দুজনাই তো আপনারা না হলে বিমানে চলেন।' মেয়ে বললে: 'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' মা তাড়াতাড়ি বললে: 'ও-কাজ শেইলা ছেড়ে দিচ্ছে। আর সে ছোঁড়া বিদেশী, বিমানে বিমানে ঘোরে। তাকে বিয়ে করা কি ঠিক হত? একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ?' মালতী জিজ্ঞাসা করলে: 'বিয়ে হয় নি তাহলে?' মায়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে মেয়ে বললে: 'সে অতীত অধ্যায়, মিসেস চ্যাটার্জি।' তারপরে মাকে বললে: 'তোমরা ভয় কর কেন ফ্লাইটে?' মালতীর ও মায়ের দিকে মেয়ে সিগারেট এগিয়ে দিল। মিসেস গুপ্তা ভাব দেখালেন যেন তিনি খান না। বললেন: 'তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি শেইলা। বিমানে ভয় নেই? ভয় তবে কিসে? গাড়িতে, বাড়িতে?' 'ওসব সেকেলে ভয়। বাঙলাদেশে আসতে

তোমাকে পেয়ে বসেছে। সিগারেট খেতে ভয়। বিমানে ভয়। বিয়ে করলে ভয়, ছাড়লে ভয়। ভয়, ভয়, ভয়।'

শুনতে শুনতে আমি পরিহাস করে বললাম : 'ডোন্‌টু কেয়ার !'

মালতী চুপ করে থেকে বললে : ও কেমন মেয়ে বল তো ?

—কি করে বুঝব ? মেয়ে জাতকে চেনা যায় ?

মালতী বঙ্কিম হাস্তে বললে : কেন এক ট্রেনে, এক কামরায়, এক রাত্রি কাটালে—

—এক সঙ্গে, এক ঘরে, এক শয্যায় যার সঙ্গে এত রাত্রি কাটাচ্ছি তাকেই কি চিনতে পেরেছি ?

সলজ্জ কণ্ঠ : পার নি বুঝি ?

—পেরেছি ?—একটু কাছে টানতে গেলাম। মালতী সরে বসল আরও। বললাম : 'তাহলে অমন ফোঁস ফোঁস করছিলে কেন ?'

—ও-রকম কথা কেমন লাগত তোমার শুনলে ? আচ্ছা, নিচের বার্থ তো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিল সে। কেন দিলে ?

—খুশি। বার্থ কেন, স্বামী-ও ছেড়ে দিতে পারে মর্জি হলে। মালতী বিশ্বাস করতে পারে না—তোমার সত্যি মনে হয় ?

—কেন ? বাধা কিসের ? কিসের ভয় ? কিসের ভাবনা ? তুমি বাপ-মাকে ছাড়তে পারলে, আমি বাবা আর বোনদের ছাড়তে পারলাম—

কিন্তু একটা মানুষ, যাকে দেখলাম, শুনলাম, ঘর করলাম যার সঙ্গে—

—ও ঘর করলে কোথায় ? উড়ছে—

—তবু ঘর করবে তো—

—করবে হয়তো মাঝে-মাঝে।

মালতী চুপ করে কী ভাবল। তারপরে বললে : না, আমি ভাবতে পারি না।—বলে উঠে দাঁড়াল। বলল, যাও, বিশ্রাম কর এখন। আমি ছেলেমেয়েদের খাবার দিই। তিনটা দিন কিন্তু বিশ্রাম করবে। কেমন ?

—ওই ডাক্তারের কথায় ? অসুখ বুঝলে আমি বলতাম না তোমাকে ?

—বলতে ?—আচ্ছা, না হোক অসুখ। ডাক্তারের কথা নয়—আমার কথা, বল কেমন ? দুটো দিন, কাল আর পরশু, রাজি ?

—তোমার কথায় ? রাজি—একটা শর্ত আছে। তুমিও স্কুল যাবে না—কাল আর পরশু।

—দূর সে কি হয়। অসুখ নয়, বিসুখ নয়।

—হয় না? আমার কথায়ও? পরশু আমাদের বিয়ের বার্ষিক—তবু নয়?

মালতীর মুখে কেমন সলজ্জ উজ্জ্বলতা দেখা দিল—আচ্ছা।

ছুদিনের মতো অনেক প্রোগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু প্রোগ্রাম চালু হবার মুখেই দেখা দিল মিস শেইলা। কেমন আছি আমি? মিতু, বিনু, ইনু অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। শাড়ি পরনে, কিন্তু এ কি বেশবাস? মাথায় চূড়া, হাতে সিগারেট—শেইলার ভ্রুক্ষেপ নেই। কাল সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে মিস্টার আহ্লাদের ক্লাবে গেছল। কলকাতা কিন্তু বড় জলুষহীন। ক্যাবারে-ডান্স হল পুওর।

মালতী চা নিয়ে এল। ছেলেমেয়েদের ধমকে স্নানে পাঠিয়ে দিল। মিস গুপ্তাও উঠে দাঁড়াল, আপিসে যাবে। আজ কাজে যোগ দিচ্ছে।

চলে গেলে মালতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।—মাগো মা! মেয়ে না কী! তিনটে সিগারেট পুড়িয়ে ঘর ছাইতে ভরে দিয়ে গেল।

ছুপুরে ছুজনাতে দাবা খেলছিলাম। মিসেস মজুমদারের গলা শোনা গেল: এলাম। শুনলাম মিস্টার চ্যাটার্জির অসুখ। দেখতে এলাম।

মিসেস মজুমদার পঞ্চাশোর্ধ্বা, ষাটে পৌছান নি—চল্লিশেই তবু থাকতে চান। দেহের মধ্যদেশ একটু বেশি পরিস্ফীত। বুটা-তোলা ঢাকাই শাড়ি, তা মানিয়ে নিতে সচেষ্ট। পেট-খোলা ব্লাউজে, আঁটা ব্রাসিয়েরে তিনি অপ্‌টুডেট। গা-ভরা গয়না। মাথায় পাকা চুল থাকলেও কাঁচা কম নয়। মুখে, চোখে, ঠোঁটে, নখে ইদানীং রঙের প্রলেপ দিতে ভোলেন না। কিছুই তার দৃষ্টিও এড়ায় না:—ওই গুপ্তদের বাড়িতে এসেছে ওদের মেয়ে—তোমার সঙ্গেই তো। আমার তো কেমন ভালো মনে হয় না। ভালো হবেই বা কতটা। ওই তো মা—সেই পাঞ্জাবীটাকে নিয়ে ঘুরছে। আর, বাপ, ভেরুয়ার মতো—শোনো নি মেয়েটা পালিয়ে এসেছে—গলার স্বর নামিয়ে মিসেস মজুমদার ইংরেজিতে বললেন,—এবরশন করাবে।

আমার কান প্রায় লাল হয়ে উঠল। মালতী উঠে পড়ল—একটু চা তৈরি করে আনছি।

—না, থাক। কিন্তু শুনেছ তো ভানু এসে যাচ্ছে। তোমাদের কিছু ঠিক হল?

চা না আসা পর্যন্ত আর অন্য কথা রইল না। তারপর উঠে পড়লেন—কাল আসব আবার। এখন হ্যাণ্ডক্রাফটের কারখানায় রিফিউজীদের তদারক করতে যাবেন—সোশ্যাল সার্ভিস।

তাকে এগিয়ে দিয়ে মালতী দড়াম করে দুয়ার বন্ধ না করে পারল না। ঘরে ঢুকে বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল—উফ্।

—শুনলে তো 'মাসীমায়ে'র কথা—বাড়ি খালি করে দাও।

—'মাসীমা' বললে কিন্তু উনি এখন চটে যান। ছেলে জার্মানিতে, বউ মেমসাহেব, নাতি মেয়ের ছেলে। এখন 'মিসেস মজুমদার' তিনি।

—তাই বুঝি ইংরেজি বলেন? শুনলে তো।

সন্ধ্যায় মিস্টার মজুমদারও এলেন। গোলোক মজুমদার—আপিসে নাম ছিল গলাকাটা মজুমদার। সেলামের জোরে হেড্ অ্যাসিস্টেন্ট হয়েছিলেন। প্রতি বিলে তার বখরা ছিল সাড়ে বারো পার্সেন্ট। পেনশন নিয়ে এখন কমার্সিয়াল ট্যাক্স এ্যাডভাইসার নিজ বাড়িতে। আর দুখানা বাড়ির বাড়িওয়ালা। এখন 'মিস্টার মজুমদার'। ছোট ছেলে বিলাত যাবার পর থেকে বাড়িতেও ঢোলা ইজের পরেন, বাইরে ট্রাউজার্স-শার্ট-টাই। হাতে লাঠি।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন: কি হয়েছে তোমার, বিভাস? মিসেস মজুমদার বলেন—'অসুখ, তোমার দেখে আসা উচিত।' এদিকে সময়ও তো নেই। বেড়িয়ে ফিরবার পথে তাই কণ্টাকটরকে খবর দিয়ে এলাম। কি-কি মেরামত করা দরকার—কালই দেখতে আসবে।

আমি বললাম: তা তো ঠিকই। দশ বছর ধরে কলি-ও ফেরান হয় নি।

মিঃ মজুমদার মেনে নিলেন: ঐ একবারেই হবে এবার।

—সে তো বহু দূরের কথা।

—দূর কি? তোমরা গেলেই কাজ আরম্ভ হবে।

—কিন্তু কেমন করে যাই বলুন। কোথায় বাড়ি আছে?

—সে আমি দেখব নাকি? তুমি ইয়ংম্যান। মিসেস চ্যাটার্জিও সেকেলে মেয়ে নয়। পাশকরা মেয়ে—স্কুলে মাস্টারি করে—

—ওই মাস্টরনী—স্কুল পর্যন্ত দৌড়।

তিনি মানলেন না।—তা একটা কথা। আজকালকার মেয়েরা কী না

করছে ! ছাখো মিসেস গুপ্তাকে ! পাঞ্জাবী, গুজরাতী—সকলকে কেমন চরিয়ে খাচ্ছে। সেদিন দেখি এক সর্দারজীর মোটর বাইকের সাইড কারে চলেছে উড়ে। কে বলবে বাঙালি মেয়ে। কে বলবে বয়স ত্রিশের বেশি এক দিনও। আর মেয়েটাকে তো দেখেছ—তোমার সঙ্গেই তো এল। ট্যাক্সি ভাড়াটা—ঘাড় ভাঙল তোমার। তুমিই তো দিলে দেখলাম।

'চা আনছি' বলে মালতী উঠে গেলেও পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, শুনছিল বাড়ি সম্বন্ধে কী কথা হয়। এবার ভেতরে চলে গেল। কারও কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। মিস্টার মজুমদার মিসেস মজুমদারের থেকে বেশি জানেন।

—মেয়েটাকে সেই সাহেব স্বামীটা ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেপিলে হবার কথা। সাহেব ছোঁড়া বলে—'আমি কি জানি ? কার না কার ছেলে।' অবশ্য সে-ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়ে এসেছে, দিল্লীতে তাতে অসুবিধা নেই।

হে-হে করে হাসলেন মিস্টার মজুমদার। মিস্টার মজুমদারের একটা কিন্তু ত্রুটি—মিসেস মজুমদারের মতো ইংরেজি বলতে পারেন না। বাঙলায় বললেন 'চুকিয়ে দিয়ে এসেছে'।

আমি বললাম : মেয়েটাকে দেখে কি তা মনে হয় ?

—কি মনে হয় তবে ?—মিস্টার মজুমদারকে যেন আমি চ্যালেঞ্জ করেছি—তোমরা দেখেছ কি ? রঙমাখা মুখ ?—একবার থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : 'লোলিটা' পড়েছ ?

পড়েছি, কিন্তু ও-রকম বয়স্ক লোকের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা হল। বললাম : না।

—পড়ো, পড়ো, বুঝবে এই কচি ছুঁড়ীরা কী না জানে, আর কী না করতে পারে। আর, ইনি তো কচিও নন, কাঁচাও নন, দুনিয়ার কত ঘাটের জল খেয়েছেন, ঠিকানা নেই। এই ফিরছি সন্ধ্যার পরে, দেখি একটা সাহেবের সঙ্গে বেরুচ্ছে। ছোকরা হাফ-প্যান্ট পরা, হাফ-শার্ট গায়ে, স্যাণ্ডেল পায়ে, একমুখ দাড়ি, কমিউনিস্ট নিশ্চয়। ছুঁড়িটা এসেছে তো মাত্র কাল, এর মধ্যেই জুটিয়ে ফেলেছে।

মালতী চাকরকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিলে, নিজে এল না। চায়ের জন্য মিস্টার মজুমদারের কথায় ছেদ পড়ল। পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন,—কিন্তু, কবে তোমরা যাচ্ছ।

প্রস্তুত ছিলাম। বললাম : যাচ্ছি, বললে কে ?

—বলতে হবে কেন ? আমার বাড়ি—আমার দরকার। তুমি তা বুঝবে না কেন ?

—ঠিক। আপনিও তো বুঝছেন 'যাও' বললেই কি যাওয়া যায় ?

—কিন্তু বলছি তো কম দিন নয়। তিন মাস ধরে বলছি। এ মাসে চার মাস। নোটিশও পেয়েছ—বেশ, মাসটা শেষ হোক।—উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি অনরিজিনবল নই, তুমিও অনরিজিনবল হয়ো না।

দুয়ার বন্ধ করে ফিরে আসতেই মালতী বললে : শুনলে তো, এখন কি করবে ?

—যেমন দ্যাবা তেমন দেবী—কাল থেকে আপিসে যাব। না হলে বাঁচব না।

—আপিসে গেলেই কি বাঁচবে ? খেটে-খুটে ফিরে এসেই দেখবে হয় মিস্টার নয় মিসেস হানা দেবে—'কবে বাড়ি ছাড়ছ।'

—পরিষ্কার বলব, ছাড়ব না। যা পারেন করুন।

মালতী চুপ করে থেকে বললে : শুনতে পারবে—যা তা বলতে আরম্ভ করবে যখন ?

—ডোন্‌টু কেয়ার।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শুয়ে-শুয়ে একটা গল্পের বই পড়তে লাগলাম। ঘুমুবার আগে অন্তত মেজাজটা ঠাণ্ডা হোক। নিচে গাড়ি থামবার শব্দ হল। কিছু উচ্ছল কলকণ্ঠ, সুরা-তরল। বুঝলাম কার।

মালতী হেঁসেলের কাজ চুকিয়েছে। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল। খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, বললে : শুনলে ? মেয়েটাও কিন্তু ভালো নয়। আর বাপ-মাই বা কেমন ? এত কথা ওদের নিয়ে হচ্ছে—

—হোক। পরোয়া করবে নাকি তোমার এই দ্যাবা-দেবীকে ?

—এও কিন্তু ভালো নয়। না, না।

ওদের মূল কথা—সাতদিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ো।

আমারও মূল কথা—ছাড়ো বললেই কি ছাড়া যায়।

দোতলায় গুপ্তদের সঙ্গে মেলা-মেশার মতো উৎসাহ মালতীর বা আমার বিশেষ হয় নি। ওরা দিল্লী-পাঞ্জাবের মানুষ—ও-দিকের লোকের সঙ্গেই

খাতির-ইয়ার্কি, চাল-চলনও অন্যরকম। অবশ্য মিস গুপ্তা সিঁড়িতে বা পথে দেখা হলে ছাড়ত না। আর ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও অসাধ্য—মালতীও পারত না। একদিন আবার মা-মেয়ে দুজনাই সকালে এসে হাজির। সন্ধ্যায় আমাদের নিমন্ত্রণ। শেইলার বার্থডে-পার্টি। অন্যে নয়, শেইলার বন্ধুরাই আসছে শুধু।

যেতে হল। মালতী নিজেব তৈরি করা সন্দেশ নিয়েছে জন্মদিনের উপহার।

এত লোকের সঙ্গেও মিস গুপ্তার এখানে বন্ধুত্ব। ঘরটা বড়োই—কিন্তু লোকে ভরা। আপিসের চেনা, পাড়ার চেনা, ক্লাবের চেনা, ক্যাবারের চেনা, নাচের পার্টনার, সুইমিং-এর সাথী,—মেয়ে-পুরুষে দেশী জন বার-তের আর বিদেশীয় জন চার-পাঁচ। পাশের টেবলে ড্রিংকস্‌ও সামান্য নয়। কেউ তারা বীট, কেউ 'এ্যাংগ্রি', কেউ কবি, কেউ ছবি আঁকে; অনেকেই 'ক্রিটিক'। সকলেই একমত 'না, না, না'—কোন বিষয়ে তা ঠিক নেই।

দুজনায় সসঙ্কোচে বসলাম মিসেস গুপ্তার পাশে। একজন বাঙালি যুবা ইংরেজিতে বলছিল—ইংরেজিতেই সকলে বলে—না, আমরা পোস্ট-এক্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিস্ট নই, আমরা নন-এক্‌জিস্টেনশিয়ালিস্ট। সে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল।

মাঝ বয়সের এক বাঙালিনীকে দেখিয়ে আরেকজন বললে, আমরা তাও মানি না। ইনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন নিওপজিটিভিজম্‌-এর। জেঁকে বসেছিলেন সেই মহিলা। না দেখে উপায় নেই, আর দেখবারও বেশিক্ষণ উপায় নেই, চোখে, মুখে, পোশাকে- পরিচ্ছদে এ-শতাব্দীর তারকা। তিনি বললেন—সেক্‌স্‌ থ্রু সাকসেস, সাকসেস থ্রু সেক্‌স্‌, এই হচ্ছে দুই পজিটিভ এণ্ড। তারপর যা বললে তা—মালতী দাঁড়িয়েছিল—শুনতে-না-শুনতেই পালিয়ে গেল। মিস গুপ্তা তার নাগাল পেল না। সন্দেশের বাক্স দিতেই আমাকে বললে—আপনাকে থাকতে হবে। ইট ইজ ওনলি ফান। একটু সফট ড্রিংক অন্তত নিতেই হবে।

দাড়িওয়ালা একটি আমেরিকান ছোকরা তার সঙ্গেকার একটি আমেরিকান ছোকরাকে পরিচয় করিয়ে দিলে—'মাই ওয়াইফ জিমি। ইয়া—আমার স্ত্রী।' এইটাই নিউ এ্যাণ্ড পজিটিভ—এই থার্ড সেক্‌স্‌।

আরেকটা আমেরিকান ছোকরা ততক্ষণে হুইস্‌কি শেষ করে ট্রাউজার্সের এক পকেট থেকে বের করছে মিকশ্চার আর অন্য পকেট থেকে—কি ওটা? গাঁজার কল্কি? তর্ক বাধল—পাইপ, না, কল্কি, গাঁজা কিসে সেব্য? ছোকরা বললে, 'আমার গুরু বলেছেন—তিনি গঙ্গার পাড়ে থাকেন—গাঁজার মিষ্টিক বুঝতে চাইলে তোমাকে কল্কিতে টেনে তা পেতে হবে।' আরেকজন বললে—'কিন্তু ড্রাগস অনেক ভালো। দেখো বলে সে বের করলে, 'তুমি মহাবিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে যাবে কসমিক কলেকটিভ-এ। এদিকে গাঁজার কল্কিতে টান দিয়ে সেই আমেরিকান ছেলেটা দুলতে দুলতে বললে, 'আমি আউটার স্পেসে প্রবেশ করছি।' বলেই সোফার পাশের যুবতীর কোলে শুয়ে পড়ল। গ্লাসের এক ঝলক মদ ছলকে পড়ে তার জামাও ভিজিয়ে দিল। মিস গুপ্তা উঠে গিয়ে ছোকরাটার গালে কষিয়ে বসাল দুই চড়। অন্যদের সঙ্গে নিজেও উচ্চ স্বরে হেসে উঠল। কে একজন তাকে জড়িয়ে চুমু খেল। একটা হুল্লোড়। আর দাঁড়ালাম না।

মালতী অপেক্ষা করেছিল।—এলে!—সভয়ে বললে:—ওরা কেমন বল তো?

আমি বললাম: কি করে জানব? কিছু আগাছা কিছু পরগাছা, হয়তো মতলববাজিও আছে। কিন্তু হুল্লোড়বাজই বেশি।

জাহান্নামে যাক! এসব দোতলায় চললে এ-বাড়িতে থাকাই মুশকিল। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে।

—ওরা বড় হতে-হতে এরাও অচল হয়ে যাবে।

—তাড়াতাড়ি গেলেই ভালো।

—তাড়াতাড়িই যাবে। আরও তাড়াতাড়ি আসবে পরেকার হুল্লোড়বাজরা।

—কি বলছ তুমি?

—বলছি, ছেলেমেয়েরা তোমাকে-আমাকে আরও বেশি দেখে—তাদের বিশ্বাস কর।

কিন্তু বাড়ি ছাড়তেই হয়তো হবে। সত্যই, দেখলাম ভানুর টেলিগ্রাম—দিন দশেক পরে সে পৌছবে। আমাব তা কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু তা বলে বাড়ি ছেড়ে যাই কোথা! বললাম: ছাড়ো বললেই তো ছাড়া যায় না। আমি বাড়ি ছাড়তে পারব না।

মিস্টার মজুমদার লাঠি মেঝে ঠুকে বললেন,—ছাড়তে হবে, আমি বলছি। এ কি জুলুম পেয়েছ? ভালো কথা অনেক শুনেছি।

যথাসাধ্য মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করলাম। আসলে মাথা গরম করবার মতো জোরও পাচ্ছিলাম না। সত্যই তো ওদের ছেলে আসছে—আইনের জোরও পেতে পারে ওরা। অবশ্য বললাম: আইন দেখুন না।

ক্রোধে মিস্টার মজুমদারের বাকরুদ্ধ হল।—কি দেখতে হবে তা আমি জানি।—কিন্তু আইন যে অত সহজ নয়, তাও তাঁরা জানেন। ঘণ্টাখানেক পরেই তাই মিসেস মজুমদার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। মালতীকেই সামনে পেলেন। আমি স্নানঘরে। শুনতে পেলাম—

—তুমি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ বোঝা উচিত ছিল আগেই। শুনেছিলাম যে-পাড়াতে ছিলে সেখানেও কম কেলেঙ্কারি কর নি। 'দেশের কাজ করি' 'দেশের কাজ করি' বলে বেরিয়ে গেছলে—

মালতী বিমূঢ়ভাবে বলছে: কি বলছেন আপনি?

—যা করেছ, করেছ। এখন ছেলেমেয়ে হয়েছে, ভদ্রলোকের পাড়ায় আছ, ভদ্রলোকের বাড়িতে জায়গা পেয়েছ, ভদ্র হতে হবে না?

ভেজা গায়েই বেরিয়ে এলাম।—থামুন! আর এক কথাও নয়। বাড়ি যান।

—'বাড়ি' যাব? কেন, 'বাড়িটা' কার? তোমার?

—সে আইন বুঝবে। যতক্ষণ আমরা আছি ততক্ষণ এসব সহ্য করব না।

—সহ্য আমরাই বা করব কেন? বামুনের ঘরের ছেলে, কোন্ জাতের না কোন্ জাতের একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর করছ—

—বেরোন!—বলে আমি এগিয়ে গেলাম,—না হলে জোর করেই বের করে দেব। মালতী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করল:—তুমি কি পাগল হলে? কি করছ?

—জোর করে বের করে না দিলে এ যাবে না।

কিন্তু সত্যই পুরুষের জোর সামান্য। মাঝখান থেকে রক্তের চাপ বাড়ল। না পারলাম আমি আপিসে যেতে, না মালতী স্কুলে।

প্রায় বিশ বৎসর আগে আমি ছিলাম ছাত্র, মালতী ছাত্রী। ইস্তাহার লিখতে গিয়ে আর বিলোতে গিয়ে দুজনার পরিচয়। তারপর, বুভুক্ষুর লঙ্গরখানায়, পথের মিছিলে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তির মধ্য দিয়ে—সে

কমিউনিস্ট দলের মেয়ে আর দলহীন আমি—জীবনের স্বপ্নের দিনগুলির নাগাল পাই। সে-স্বপ্নকে সত্য করতে মালতীই দাম দিয়েছে বেশি—বাড়ি দ্বারা বর্জিত হল, দলও ছাড়ল। তার মাস্টারির আয়ে চলে আমাদের দুজনার সংসার, আমার এম-কম পড়া ও পরীক্ষার সাফল্য, কার্যলাভ। কাজ পাবার সঙ্গেই দুজনার সংসার তিনজনার হল—তখনো মালতীরই উপর ভার। তারপর আজ পনের বৎসর। পনের বৎসরে দুজনাতেই দাঁড়িয়ে গেছি আমরা—মালতীও ছাড়েনি স্কুলের কাজ। কিন্তু সেই পাঁচটি বছর যখন সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়েছে মাথার উপর প্রতি মুহূর্তে, অথচ মাথা নোয়াই নি আমরা একটি বার—সে পাঁচ বৎসরের স্বপ্ন ও সত্য আমাদের জীবনের প্রধান সঞ্চয়। সেখানে বিষ ঢাললে তাই শিরার রক্তে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। বাড়ি বসে দুজনায় হিসাব করলাম—বীমায় ধার পাওয়া যায় না—যে করেই হোক, কোথাও একটা কুঁড়ে—চব্বিশ পরগণায়, শহরতলীতে।

রাত্রি পর্যন্ত কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল। এমন অস্থির হই কেন? হাসতেও তো পারি। আমরা তো জানি—কে কেমন। আর আইন যখন আমাদের পক্ষেই আছে—সহজে বাড়ি ছাড়ব কেন তবে? আমিই কি সহজ পাত্র।

মালতী কিন্তু হাসতে চায় না—ছেলেমেয়েরা শুনেছে সব।

—নতুন শুনেছে কি আর? আমি বামুন তুমি কায়স্থ, এ কথা তো জানেই ওরা।

—না ছ্যাখ, আমাকে হাসাতে পারবে না। ছেলেমেয়েরা যা শুনলে, তাতে কি ভাববে ওদের মা-বাপকে?

—কে ভাববে? মিতুটা? বুঝবে, বাবা-মা একদিন কম কাণ্ড করেন নি। এখন তো মা বলেন—'স্যুইমিং ক্লাবে যাওয়া চলবে না', 'ঠোঁটে রঙ মাখিস না' —বাড়িতেও যেন স্কুলমাস্টারনী। কিন্তু একদিন সেই মা হাসত, গাইত, চুপে-চুপে মুখে স্নো-পাউডারও ঘষত—পুরুষদের মাথা ঘুরিয়েও বেড়িয়েছেন—

মালতী আমার মুখ চেপে ধরে বললে: মিথ্যা কথা।

—নিশ্চয়ই না। অন্তত একজন পুরুষ সাক্ষী আছে—সেই যে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ এখনো তা ঠিক হয় নি।

—বাজে কথা বল না।—সলজ্জ হাসি দেখা দিল মালতীর চোখে—এখনো ওই পেখম-ধরা মেয়ে দেখলেই তাকিয়ে থাক না, বলতে পার?

—থাকি। চোখে ভালো লাগে—বেশ তো ওরা! তোমারই কি ভালো লাগে না ট্রাউজার্স-হাওয়াই ওড়ানো ওই স্মার্ট ইয়ং ম্যান্‌দের দেখতে?

আবার মুখ চেপে ধরলে—ছিঃ। না।

আমি হাত জড়িয়ে ধরে বললাম: ওই 'না' মানেই 'হ্যাঁ'।

—না, না, না।—মালতী হাত জড়িয়ে ধরলে আরও।

—হাঁ, হাঁ, হাঁ।—চোখে চোখ রেখে বললাম, পুরনো কথা—আমরা দুজন স্বর্গ খেলনা গড়ি নাই এই ধরণীতে।

—এও কিন্তু ঠিক নয়—এই ওই ওদের মতো।

দোতলায় একটা নাচ-গানের হুল্লোড় কানে পৌঁছচ্ছিল।

আমি বললাম—মন্দই বা কি?

মামলার জন্য উকিল বন্ধুদের কাছে দৌড়চ্ছি। কিন্তু তার আগেই বন্ধ হল কলের জল। এ আশঙ্কাও করেছিলাম। রাস্তার কল থেকে জল তেতলায় আনা সহজ কথা নয়। চাকর বললে, অসুখ। ভারী ঠিক করব। কিন্তু ততক্ষণ আমি ও বিনু বালতি করে পথের কল থেকে জল আনছি। দু বারের শেষে সিঁড়িতে দেখা হল মিস গুপ্তার সঙ্গে।

—গুডনেস্‌। একি করছেন মিস্টার চ্যাটার্জি?

জানালাম বাড়িওয়ালা জল বন্ধ করেছে।

—কিন্তু এ যে ক্রিমিন্যাল, ইনহিউম্যান।

—হতে পারে। কিন্তু ভাড়াটেকে তাড়ানোর জন্য আবশ্যক।

—আপনাব এন্‌জিনা নিয়ে আপনি জল টানবেন?

—জল চাই, এন্‌জিনা অর্‌ নো এন্‌জিনা।

—আচ্ছা দেখছি—সড়-সড় করে নেমে গেল মিস গুপ্তা।

একবার ভাবলাম দাঁড়াই—শুনি। কিন্তু ঠিক করলাম, না। কিছুক্ষণ পরে মিস গুপ্তাই আমাদের ফ্লাটে এল। চোখমুখ আরক্ত; মুখে তীব্র ভাষা 'সোয়াইন্‌। তাকায় যেন জামা কাপড় ভেদ করে গিলবে।' একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে:—মিস্টার চ্যাটার্জি। কাল থেকে আমাদের কল থেকে জল পাবেন। সিঁড়ি ভাঙবেন না। আমাদের চাকর দিয়ে যাবে। বরং—সে উঠে চলল। আমি জানালাম, ধন্যবাদ! আমিও একটা বুদ্ধি করে ফেলব—অন্য কলের সঙ্গে যোগ করে নেব।

মিনিট পাঁচ পরে দু-বালতি জল নিয়ে এসে শেইলা গুপ্তা উপস্থিত।

—আপনি! ছি-ছি, চাকরকে দিয়ে পাঠাতে পারতেন।

—কেন? সে বাজারে গিয়েছে। আমি কাজকে ভয় করি না—মানুষকেও না।

মালতী রান্না ফেলে এসে এদিকে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলায়ও খানিক পরে একটা গোলমাল বাধল, টের পেলাম। মিসেস মজুমদারের গলাটাও ছোট নয়। বিধবা-বধূকে বাড়িছাড়া করতে এ-গলা আগে দুবেলা গর্জাতে শুনেছি। মিস গুপ্তার গলাও তীব্র। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মালতীর থেকে শুনলাম—মিস গুপ্তা বলে দিয়েছে আমাদের জল আমরা যেভাবে খুশি ব্যবহার করব—অন্যের অসুবিধা না ঘটিয়ে। 'সব সহ্য হয়, কিন্তু এই ইনহিউম্যানিটি সহ্য করতে পারি না। জলের জন্য বাড়ি ছাড়বেন না কিছুতেই, মিসেস চ্যাটার্জি।'

আমি বললাম: আরেক হাঙ্গামা বাধালে সেই বেপরোয়া ছুঁড়িটা।

মালতী উন্মনা হয়ে আছে। দোতলার থেকে জল পেলে সুবিধা অনেক। কিন্তু এই মিস গুপ্তা মেয়েটাকে সে ভয় করে। তাছাড়া, মজুমদারদেরও তো অসাধ্য কিছু নয়।

—জানি না, কি রটাবে তোমার আমার নামে।

—রটাক। ভয় পাও কেন তুমি?

—ভয় না। খারাপ লাগবে—বিশ্রী কথা রটালে। ছেলে-মেয়েরা এসব শুনে-শুনে কি রকম হয়ে উঠবে বল তো?

—আমরা বড়রা যেমন ওদের করে তুলি—

—ওদের ভালো হবার পথ না করে আমরা ওদের মন্দ হবার পথ খুলে দিচ্ছি যে।

ভানু মজুমদার এসে গেল কলকাতায়। আর সত্যই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। এল একা। সে ছুটি নিয়ে এসেছে মাস তিনেকের মতো—তাই একা। এখানে কাজ প্রায় ঠিক আছে। জার্মান বন্ধু লিখেছে—'এসে দেখে যাও একবার প্রথম।' তাই আসা।

মিস্টার মজুমদার ও মিসেস মজুমদার বড় হতাশ, শুনলাম। বউমা আর নাতি এল না। তাঁরা অপেক্ষা করেছেন। ফ্লাটটা খালি করবার জন্য

মামলা দায়ের করেছেন। তা ছাড়া, একা বাড়িতে এ বুড়ো বয়সে তাঁরা কি করে থাকেন?

ভানু অতটা জানে না—একা কেন? বউদিকে আনিয়ে নাও না? আর খুকীও তো এখন বড় হয়েছে। তাদেরই তো বাড়িঘর।

মিসেস মজুমদার খুশি হলেন না :—সে কথা আর বল কেন? তোমার দাদার ইন্‌সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা প্রভৃতি নিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ি বসেছে। বলে 'ও আমার মেয়ের বিয়েতে লাগবে।'

—তোমরাই ওকে টাকাটা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলে।

—নষ্ট হবে যে না হলে। দশজনে জুটবে—লুটে খাবে। না, ছাড় সেসব কথা—বাপের বাড়িতে কি খুব সম্মানের ভাত। কতজনে কত কি বলে।

—আর, তোমরাও তার সঙ্গে বল। তা কি হয়েছে? বিয়ে করুক না বরং।

—বিয়ে করবে কি? তের-চোদ্দ বছরের মেয়ের মা।

—তের-চোদ্দ বছরের মেয়ের দিদিমা ঠাকুরমারাও বিয়ে করে ওদেশে। তোমারও অসুবিধা হত না।

ভানুর মেজাজটা সাহেবী হয়ে গিয়েছে, বুঝলাম।

বিলাত যাত্রার পূর্বে তাকে অনেক দেখেছি। কথাবার্তায় একটু বখা ছিল। কিন্তু বেচাল নয়। এবার তবু এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে বাধা হল। চা খেলে, গল্প করলে। বললে, 'কি হবে বলুন তো? ভাবলাম দেশে কত কি হচ্ছে—দেখি সেই খোড়-বড়ি-খাড়া। প্যানেলে নাম লেখাও, তারপর ধর মুরুব্বি।' দুজনেই আমরা একটু বিমূঢ় বোধ করলাম। বুঝতে পারলাম না কি ব্যাপার। ভানুর না জানবার কথা নয়-বাড়ি নিয়ে বিরোধ। কিন্তু বাড়ি ছাড়ার কথা বললে না। দেশের সব বিষয়ে বিরক্ত।

আবার সে ভদ্রলোক আপিসে এলেন। আমার বিবৃতি মতো তিনি খোঁজ পেয়েছেন। তবে তারা আলিপুরেও যায় নি। আর তারা মিস্টার মেহতাও নন, মিসেস মেহতা নন পথের স্বামী-স্ত্রী—সোনার বাট পাচার করবার জন্য। 'স্বামীটি' বোম্বাইর 'স্ত্রীটি' দিল্লীর। তবে তাদের ঘাটানো যাবে না, ভি-আই-পি ব্যাপার। কিন্তু তাদের সঙ্গী মেয়েটা সম্বন্ধেও ভদ্রলোক নিশ্চিত হতে পারছেন না। 'এয়ার হোস্টেস্' ছিল। ওর স্বামী ইতালীয় সত্যই।

কিন্তু ড্রাগ র‍্যাকেটের মধ্যেও সে ছিল, এখন এদেশ থেকে সরে পড়ছে। মেয়েটার সম্বন্ধে সন্দেহ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে।

—বেড়ে যাচ্ছে কি করে?

—এই বাড়ির ছেলে মিঃ ভানু মজুমদার, বলুন তো হঠাৎ সে এল কেন দেশে? তার সঙ্গে মিস গুপ্তাকে দেখা যায় নানাখানে—রাত-বেরাত করছে জুহুনায় ক্লাব-ক্যাবারেতে।

—তাই নাকি? করুক। ভানুর মেমসাহেব এসে যাবে। জার্মান মেয়ে—হিটলারী বাচ্চা; এলেই সব বন্ধ হবে।

—সে আর আসছে! ওর জার্মান বন্ধুরা বলেছে—সে স্ত্রী ভানুকে ছেড়ে দিয়েছে কবে—এক বৎসরের বেশি। ওদেশে সে হামেশাই হয়। না, মজুমদারের সম্বন্ধে এখনো ওসব পাচার করার রিপোর্ট নেই। কিন্তু এই বিদেশ-ঘোরা মানুষগুলো নিয়ে বড় মুশকিল। সোনার বাট কার পকেটে, কার ভ্যানিটি কেস-এ হীরের বাক্স—বলা যায় না।

ভানু আর মিস গুপ্তাকে দুই-একদিন একসঙ্গে বেরুতে না দেখেছি তা নয়। এখন শুনলাম—তা নিয়ে মিস্টার মজুমদার ও মিসেস মজুমদারের আপত্তি হয়; ওই গুপ্তদের মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা কি ভালো?

ও মেয়েটার একটা ইতালীয় স্বামী আছে, জানো?

—হয়তো একটার থেকে বেশিও আছে। কিন্তু তাতে তোমার আমার কি?

কিন্তু যে-মেয়ে বাড়ি বয়ে এসে তাদের অপমান করতে পারে তার সঙ্গে নিজের পেটের ছেলের এতটা খাতির, ইয়ার্কি দেখতে হবে মিসেস মজুমদারের? ইত্যাদি। মেম সাহেবের শ্বশুর শাশুড়ির মাথা হেঁট হচ্ছে লোকের কাছে।

এ-সব মালতী শুনেছে। কিন্তু ওরা কি সোনা-স্মাগলিংর দল? মালতীকে বললাম, তারও কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তবে এত বাজে লোকের সঙ্গে মিস গুপ্তার ইয়ার্কি। আর ইয়ার্কিই কি শুধু?—মালতী কথা শেষ করতে পারল না: ওতো মন্দ নয়। তবে এসব করে কেন?

—ভালো লাগে বলে।

—ভালো লাগে? নিশ্চয়ই না।—ওকে দেখে আমার ভয় করে।

—কেন?

—মিতু মনে করে—শেইলা গুপ্তা একটা আশ্চর্য মেয়ে! কেমন করে

তাকিয়ে থাকে ওর দিকে বিনু—এখনো যে বার বছরের ছেলেমানুষ। ইনু বলে, 'শেইলা 'অন্টির' মতো চূড়ো করে চুল বেঁধে দাও।'

তুমি ওদের দাবিয়ে রাখবে? তাহলে তো ওরা রাজকাপুর-বৈজয়ন্তীমালার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে গিয়ে হোটেলের দরজায়।

—তুমি ঠাট্টা করছ—কিন্তু ওরা বড়ো হচ্ছে। তোমার ভয় করে না?

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম: ওরা বড়ো হচ্ছে, আমরা বুড়ো হচ্ছি, হয়তো তাও ভয়ের কথা।

—তাতে ভয় কি? যদি একটু টাকা জমাতে পারি—বাড়ি-ঘর করতে পারি—

—আমি হয়ে উঠব মিস্টার মজুমদার তুমি মিসেস—

মালতী সবলে মাথা নেড়ে বললে: না, কিছুতেই না। কিছুতেই না।

কিন্তু ভয় তার পেল কি?

দুপুরবেলা ফোন এল আপিসে। মিঃ চ্যাটার্জি? আমি শেইলা—মিস শেইলা গুপ্তা। একবার আসবেন আমাদের এয়ার আপিসের লাউঞ্জে? দুটোর বেশি দেরি করবেন না।

কোনো ফ্যাসাদে পড়েছে নাকি? না, ফ্যাসাদে ফেলবে? ভয় কি আমার। লাউঞ্জে যেতেই এগিয়ে এল মিস গুপ্তা। সেই বেশভূষা; সেই রঙে, প্রসাধনে দীপ্তা, আন্তর্জাতিকা। এ-রকম এতদিন দেখি নি। জানালে: আর দেরি হলে দেখা হত না। এখনি দমদমে যাচ্ছি।

—দমদমে? কেন?

—টেক ওফ ঘণ্টা দেড়েক পরে।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ফ্রাঙ্কফুর্ট।

—ফ্রাঙ্কফুর্ট? কেন?

—আপাতত সেখানে থাকব, ভানু আর আমি, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস।—বলে হেসে উঠল।

আমার সন্দেহ হল: কি করে ব্যবস্থা হল? পুলিশেও আটকালে না!

—আটকাবার কারণ নেই। আমি অন্তোনিওর সঙ্গে সম্পর্কও রাখি না—সোনার চোরাই চালানীও করি না। আই হেট অল ছাট।

হাতের প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বললে: হাতির দাঁতের এই শাঁখাজোড়া মিসেস চ্যাটার্জির জন্য। ওর জন্মদিনের উপহার।

—জন্মদিনে? সে কবে? বার্থডে পার্টি হয় না তাতে।

—না হোক। আমাকে তো নিমন্ত্রণ করতেন।

ভানু এল। হ্যাণ্ড শেক করে দাঁড়াল। শেইলা তাকে দেখিয়ে বললে: জানেন ওয়েস্ট বের্লিনের ড্যান্স হল-এ প্রথম দেখা দুজনায়। ও ভাবলে আমি মিশরী, আর আমি ভাবলাম ও ইন্দোনেশীয়। তারপরে দেখা এবার—বাড়ির সিঁড়িতে। ইজ নট ইট ফান? মজা না?

—কিন্তু দেশে থাকবে না তোমরা?

—থাকলে মরতাম। আর আপনারও কি বাড়ি-সমস্যার সুবিধা হত?

হাসতে বাধ্য হলাম।—তা হত না।

—এবার চললাম। গুড বাই—

বললাম: গুড বাই অ্যাণ্ড গুড লাক। সুখি হও দুজনায় দুজনাকে নিয়ে।

মিস গুপ্তা খিল খিল করে হেসে উঠল: যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ফানি মিস্টার চ্যাটার্জি, 'দুজনায় দুজনাকে নিয়ে'—পৃথিবীটা কি অত ছোট? বাই-বাই—

সরোজ আচার্য

'খৃষ্টের প্রতিনিধি' এবং আরও অনেকে

রল্‌ফ হক্কুথের নাটক Der Silvertreter প্রথম অভিনীত হয় গত বছর পশ্চিম বার্লিনে। Der Silvertreter মানে প্রতিনিধি—খৃষ্টের প্রতিনিধি; ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে দি ডেপুটি, দি রিপ্রেসেনটেটিভ, দি ভিকার। দি ভিকার অর্থাৎ মহামান্য খৃষ্টীয় ধর্মগুরু পোপ, যিনি মর্ত্যধামে খৃষ্টের প্রতিভূ ও প্রতিনিধি। হক্কুথের নাটকের পোপ পিউস ১২, নাৎসী জার্মানীর উদ্ভব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত যিনি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান জগতের ধর্মাবতার, গুরু, পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক, নীতিনিয়ন্তা, সব কিছু।

পোপ পিউস ১২ নাৎসী নৃশংসতার বিরুদ্ধে, লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস-চুল্লীতে দাহনের প্রতিবাদে নিন্দাবাণী-উচ্চারণে বিমুখ হয়েছিলেন, হক্কুথের নাটকের এই হল অভিযোগ ও ধিক্কার। নাটকের কিছু অংশ ঐতিহাসিক তথ্যমূলক, আর অনেকখানি কল্পিত। এই নাটকের নায়ক তরুণ-ইতালিয় ক্যাথলিক পাদ্রী রিচার্ডো ফণ্টানা। নাৎসী বন্দী শিবিরে ইহুদী হননের বীভৎসতা তিনি দেখেছেন; আর দেখেছেন মহামান্য পোপ এবং তাঁর সম্ভ্রান্ত পারিষদ প্রতিনিধিদের নির্বিকার নিষ্করুণ নীরবতা। ফণ্টানার মুখে তাই দুঃসাহসিক কঠোরতম অভিশাপ করুণাময় খৃষ্টের প্রতিভূ পোপ পিউস ১২-র বিরুদ্ধে—

"খৃষ্টের প্রতিনিধি, যিনি এসব জিনিষ দেখছেন, তবু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের যুক্তিতে তাঁর মুখ বন্ধ রেখেছেন। তিনি সেই পোপ—একজন অপরাধী।" জার্মানদের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কেও হক্কুথ রেখেঢেকে কথা বলেন নি।

মনে রাখা দরকার এই স্পষ্টভাষী নাটক রচনা করেছেন পশ্চিম জার্মানীর তরুণ লেখক রলফ হক্কুথ। প্রথম অভিনীত হয়েছে পশ্চিম বার্লিনে, পেয়েছে অভিনয়-রজনীতে বিপুল সংবর্ধনা। তারপর শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ। বর্তমান

পোপের সদর দপ্তর ভ্যাটিকান থেকে এই নাটকের মূল অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা হয়েছে; বর্তমান পোপ পল ৬ বলেছেন, হক্কুথের নাটকে পোপ পিউস ১২-র চরিত্র বিকৃত করা হয়েছে। তবু আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার নিরিখে বিস্ময়ের কথা, এই নাটকে পরমপূজ্য ধর্মগুরুকে নৈতিক ভীরুতার দায়ে অপরাধী করা সত্ত্বেও এর অভিনয় বন্ধ হয় নি; নাট্যকার রল্‌ফ হক্কুথ অপদস্থ অথবা নিগৃহীত হন নি। আরও আশ্চর্য, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও অনেকে, এমন-কী ধর্মযাজকও বলেছেন, হক্কুথের নাটকের মূল বক্তব্য পোপ এবং অন্যান্য সকলের নৈতিক ভীরুতার অভিযোগ যুক্তিসংগত। মত প্রকাশে এই নির্ভীক অপক্ষপাত আমাদের মনে করা উচিত সবচেয়ে অর্থবহ। কারণ নাৎসী বিভীষিকা এবং সে সম্পর্কে নৈতিক কর্তব্যপালনে দ্বিধা, এটাই আমাদের কালের একমাত্র বিবেক-সংকটের দৃষ্টান্ত নয়। স্টালিনের বন্দীশালায় এক দিবসের জীবনকাহিনী একাধিক যন্ত্রণাময় প্রশ্নদ্যোতক।

প্যারিসে, নিউইয়র্কে হক্কুথের নাটক 'খৃষ্টের প্রতিনিধি' অভিনীত হয়েছে, চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অভিনয় বন্ধের চেষ্টায় হাঙ্গামা যে ঘটেনি তা নয়। গত বছর ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে প্রথম অভিনয়। দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয়ের শুরুতে দর্শকমণ্ডলীর মাঝ থেকে কয়েকজন তরুণ রঙ্গমঞ্চে লাফিয়ে উঠে অভিনেতাদের উপর হামলা করেছে। শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিয়েছে পুলিস। ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিকরাই সংখ্যায় বেশি। ধর্মগুরু পোপের আচরণের বিরূপ সমালোচনায় কিছু লোকের উত্তপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। তবু এ নাটকের অভিনয় চলেছে, রাষ্ট্র-কর্তারা বাধা দেন নি, উপরন্তু অভিনয়ে শান্তিভঙ্গকারী যারা তাদেরই পুলিস বাধা দিয়েছে। নিউইয়র্কে ব্রডওয়ের প্রথম অভিনয়ের দিনে আমেরিকান নাৎসী পার্টির জন পনেরো বাদামী কোর্তাপরা লোক থিয়েটার হলের বাইরে হল্লা করেছে, এ নাটক অভিনয় বন্ধ করার দাবিতে। কিন্তু অভিনয় বন্ধ হয় নি, প্রতিটি দৃশ্যের অভিনয় শেষে অভিনেতারা বারবার জয়ধ্বনি পেয়েছেন।

হক্কুথের নাটকের বিষয় ইতিহাসাশ্রিত, সে-বিষয়ের গুরুত্ব নাৎসীদের পরাজয়ের সঙ্গে নিঃশেষিত হয় নি। নাটকের বক্তব্য যুদ্ধ ও পোপ পিউস ১২-এর আচরণের সমালোচনাতেই সমাপ্ত, এ-রকম মনে করলে আমাদের নিজেদের বিবেকের অনেক গ্লানি অনাবিষ্কৃত, অপরিশুদ্ধ থেকে যায়। ক্ষমতার ব্যভিচার ও পৈশাচিক বিকার আমাদের কালের একটা বৃহৎ মানবিক সমস্যা; এ-সমস্যার

স্পষ্ট সাহসিক পর্যালোচনার নৈতিক দায়িত্ব কেবল জার্মেনীর নয়, আরও নানা দেশের এবং যুক্তিনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধানী বুদ্ধিজীবী সকলেরই। হক্কুথের নাটকে নৈতিক দায়িত্বভঙ্গের অভিযোগটা প্রধানত পোপ পিউস ১২-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত। সে দায়িত্ব নাৎসী বন্দীশিবিরে গ্যাসচুল্লীতে লক্ষ লক্ষ ইহুদী-নিধন সম্পর্কে। জার্মান পণ্ডিত হান্স কুনেরের অভিমত, পোপ পিউস ১২ এবং ভ্যাটিকানের সম্রান্ত ক্যাথলিক পাদ্রী কূটনীতিকরা হতভাগ্য ইহুদীদের রক্ষা করার জন্ত কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাইকারী হত্যার বিরুদ্ধে পোপ পিউস ১২ স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ ঘোষণা করেন নি; ভ্যাটিকানের সরকারী মুখপত্রে ফিকে প্রতিবাদ নয়, পোপ পিউস ১২-এর কর্তব্য ছিল প্রাঞ্জল ভাবে খৃষ্টের বাণী ঘোষণা। ফাদার উইলহার্ট একজন ক্যাথলিক যাজক। তাঁর মত, পোপ পিউস ১২ স্পষ্ট প্রতিবাদ করলেও সম্ভবত একজন ইহুদীকেও বাঁচাতে সক্ষম হতেন না; বরঞ্চ এর জন্ত নাৎসীরা হয়তো ক্যাথলিকদের উপর প্রতিশোধ নিত। কিন্তু তবু স্পষ্ট ভাষণ ছিল পোপের কর্তব্য। হক্কুথের নাটকে একটি চরিত্রের মুখের ধিক্কৃত জিজ্ঞাসা তাই—"পোপ কেন নীরব? তাঁর গীর্জার চূড়া যেখানে সমুন্নত ঠিক সেখানেই হিটলারের চিমনী থেকে ধোঁয়া উদ্‌গীরিত হচ্ছে, যেখানে রবিবারে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, সেখানেই সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে মানুষমারা চুল্লীগুলি জ্বলন্ত, আজকের পশ্চিমী খৃষ্টান জগতের এই অবস্থা।" ফ্রাঁসোয়া বঁদিও এই নৈতিক প্রশ্নের মূল্যায়নে বলছেন, ফল হোক বা না হোক পরিণামের ভাবনা উপেক্ষা করে 'খৃষ্টের প্রতিনিধি'র নৈতিক কর্তব্য ছিল খৃষ্টের নাম স্মরণ করে নাৎসীদের পৈশাচিক অপরাধের প্রতিবাদ করা। 'খৃষ্টের প্রতিনিধি'র উপর সব দোষ ও দায়িত্ব আরোপ করা অবশ্য অন্যায়।

'খৃষ্টের প্রতিনিধি' পাঁচ অঙ্কে এগারোটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বার্লিনে পোপের দূতাবাসে। রোম থেকে সদ্য এসেছেন তরুণ জেসুইট যাজক রিচার্ডো ফন্টানা, পোপের দূতকে (যিনি একজন মহাসম্রান্ত যাজক) ফন্টানা তাঁর মনের দুঃখ ব্যক্ত করছেন—ক্যাথলিক ধর্মগুরু ইহুদীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নিরস্ত কেন? এমন সময় নাৎসী ঝটিকা-বাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট ঘেরস্টাইনের প্রবেশ; ঘেরস্টাইন বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত; প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে পোপের দূতকে তিনি আবেদন জানালেন, "মান্যবর! আমি পোলাণ্ড থেকে আসছি, বেলজেক বন্দীশালা দেখে এসেছি; ওখানে প্রতিদিন

দশ হাজার, দশ হাজারেরও বেশি, ইহুদী গ্যাসচুল্লীতে পুড়ছে। দয়া করে ভ্যাটিকানকে (পোপের সদর দপ্তর) এ খবরটি পাঠান।" পোপের দূত—"ওসব কথা আমাকে বোলো না, হিটলারের কাছে যাও। এক্ষুনি, এখান থেকে বিদায় হও। আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।" লেফ্‌টন্যান্ট ঘেরস্টাইন তবু থামলেন না, "জানেন আমি এঞ্জিনীয়ার, আমাকে দিয়ে এই বীভৎস খুনের কাজ চলবে না। দেখেছি স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়োর উলঙ্গ মৃতদেহ সব পাথরের মতো জমে আছে, পরিবারের পর পরিবার কঠিন মরণ-আলিঙ্গনে পাশবদ্ধ।" পোপের দূত—"আর নয়, আর শুনতে চাইনে।" ঘেরস্টাইন—"পরম পিতা পোপ, তিনি উদ্যোগী হোন, বিশ্ব-বিবেকের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষণে অগ্রণী হোন।"

তরুণ জেস্যুইট যাজক রিচার্ডো ফন্টানার তখনও আশা পোপ হয়তো সাড়া দেবেন। ঘেরস্টাইন সে-আশা করেন না; জানেন ১৯৩৮ সন থেকে মহামান্য পোপ নীরব দর্শক।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কে

ফন্টানা রোমে; পোপের হৃদয়ের পরিবর্তন-চেষ্টায় ব্রতী। ফন্টানার পিতা সম্ভ্রান্ত, ধনশালী ব্যক্তি, পোপের অন্তরঙ্গ পারিষদদের সঙ্গে তাঁর আলাপ সমানে-সমানে। ফন্টানার অনুনয় বিনয়ে, যুক্তিতে তার পিতা কিন্তু কান দেন না। তাঁর মতে হিটলারের সঙ্গে পোপের প্রত্যক্ষ বিবাদ করা ভ্যাটিকানের স্বার্থহানিকর। ইতিমধ্যে পোপের পার্শ্বচর একজন কার্ডিনাল উপস্থিত হলেন। বিবেক-পীড়িত তরুণ ফন্টানার বিপরীত চরিত্র এই ধর্মযাজক চূড়ামণি, স্ফূর্তিবাজ, সুবারসিক, কূটনীতিকুশলী। কার্ডিনালের উপদেশ, "ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, হে ছোকরা! এ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আশা—প্রাচীন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" অতএব হিটলার-জার্মেনীর বিরোধিতা ক্যাথলিক চার্চের কর্তব্য নয়। তৃতীয় অঙ্কে রোমে পোপের প্রাসাদের ছায়াতলেই বারশো ইহুদীকে গ্রেপ্তার করে নাৎসী গেস্টাপো তাদের কসাইখানায় চালান দিচ্ছে। লেফ্‌টন্যান্ট ঘেরস্টাইন কার্ডিনালের মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে সেই চিরন্তন সংশয়—"ঈশ্বর যদি হিটলারকে তাঁর কাজে ব্যবহার করেন তবে তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না।" তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য রোমে নাৎসী গেস্টাপোর সদর দপ্তরে—ইহুদীদের উপর অত্যাচারের নিষ্ঠুরতম চিত্র।

[বিক্ষুব্ধ, যন্ত্রণা-দগ্ধ নাৎসী লেফ্‌টেন্যাণ্ট যেরস্টাইনের চরিত্র এবং রোমের এই ঘটনাবলী বাস্তব ইতিহাস থেকে নেওয়া।]

চতুর্থ অঙ্কে নাটকের তীব্র সংকটক্ষণ। তরুণ ক্যাথলিক যাজক রিচার্ডো ফন্টানা পোপের দর্শনপ্রার্থী। ভ্যাটিকান প্রাসাদে পোপ তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় ব্যস্ত; চার্চের পার্থিব ধনসম্পদ বিপুল; যুদ্ধের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে শেয়ার কেনা-বেচার লাভ-লোকসানের হিসাব 'খৃষ্টের প্রতিনিধি'কেও রাখতে হয়। অতঃপর মহামান্য ধর্মগুরুর সঙ্গে খৃষ্টের দীন সেবক ফন্টানার সাক্ষাৎকার। ফন্টানা—"পোলাণ্ডে মরেছে আঠারো লক্ষ ইহুদী। পূজ্যপাদ, আপনি এটা উপেক্ষা করবেন, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তা চান না।" পোপের ক্রুদ্ধ জবাব, "উপেক্ষা! আমরা কী করি না করি তার কৈফিয়ৎ রিচার্ডো ফন্টানার কাছে দেব না।" 'খৃষ্টের প্রতিনিধি' পিউস ১২ পারমার্থিকের চেয়ে পার্থিব হিসাব-নিকাশে নিপুণ; তরুণ যাজক ফন্টানা তাঁর কাছে ভাবপ্রবণ শিশুমাত্র। ঝানু কূটনীতিকের যুক্তি খৃষ্টের প্রতিনিধির মুখে—হিটলারের বাড়াবাড়িতে ফন্টানা বিচলিত কেন? ওর চেয়ে অনেক বড়ো বিপদ পূব দিক থেকে কম্যুনিজমের প্রসার। অতএব নাৎসী বিভীষিকার প্রতিবাদ পোপের অনভিপ্রেত। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে ফন্টানা আত্মহারা। পোপের সামনেই ফন্টানা সগর্বে তার বুকে ঝুলিয়ে নিল নাৎসীদের ঘৃণিত ইহুদী প্রতীক—হলুদ তারকা-চিহ্ন। পোপ বাক্যহত; একজন পার্শ্বচর কার্ডিনাল গর্জন করে উঠলেন, "সাংঘাতিক মূঢ়তা! দূর হও।" ফন্টানার উত্তর—"মূঢ়তা? কখনই না, প্রভু। ডেনমার্কের রাজা আজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তবু তিনি, এমন-কী, তিনিও হিটলারকে জানিয়ে দিতে ভয় পান নি, ডেনমার্কের ইহুদীদের যদি ঐ ঘৃণিত হলুদ তারকা-চিহ্ন পরতে বাধ্য করা হয় তাহলে রাজা ও তাঁর পরিবারের প্রত্যেকে ঐ চিহ্ন ধারণ করবেন। এরপর নাৎসীরা ডেনমার্কে কাউকে হলুদ তারকা-চিহ্ন পরতে বাধ্য করে নি।

আমরা চার্চের সেবক—যে-চার্চের প্রথম অনুজ্ঞা সকলের প্রতি প্রেম; ভ্যাটিকান কবে সেই সাহসিক কর্মের ভূমিকা নেবেন যাতে আমরা প্রকৃতই চার্চের সেবকরূপে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ না করি?" পোপ নিরুত্তর; ফন্টানার চরম ধিক্কারবাণী, "ডাক যখন এল পোপ তখন সাড়া দেন নি, ঈশ্বর যেন এর জন্য চার্চকে ধ্বংস না করেন।"

অতএব পঞ্চম অঙ্কে তরুণ ক্যাথলিক যাজক ফন্টানার স্বেচ্ছাবৃত স্থান

নাৎসীদের শিকার হতভাগ্য ইহুদীদের সঙ্গে, তাদের মৃত্যুযন্ত্রণার অংশীদার রূপে। আউসভিস্ বন্দীশালায় জীবন্ত কবরখানায় আদর্শবাদী ক্যাথলিক যাজক ফণ্টানার জীবননাট্যের শেষ। নাটকেরও। নাৎসী লেফ্টন্যাণ্ট যেরস্টাইনও ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ এই সন্দেহে বিলুপ্ত হলেন। ফণ্টানার আদর্শ-প্রীতি তার গভীর ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে নাৎসী বন্দীশালার ঘাতক-ডাক্তারের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ মানবিক মূল্যবোধের বিকার সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন-সূচক। "মরণ দেবতার দূত" এই ডাক্তার রিচার্ডো ফণ্টানাকে বলছেন, "ইহুদীদের উপর দরদে তুমি মরতে এসেছ কেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমাদের চার্চ ইহুদীদের উপর কি অত্যাচার চালায় নি? মানুষকে কয়লার মতো দগ্ধ করা যায় এটা তোমাদের চার্চই তো প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর যদি আছেন, তবে পাপ থাকে কেন, কেন জয়ী হয় পাপ? ঈশ্বর নীরব।" ঈশ্বরের নীরবতা ভঙ্গ করে যবনিকাপতনের আগে ঘোষিত হল পর পর দুটি বেতারবার্তা—(১) পোপের দরবারে হিটলারের রাষ্ট্রদূতের আশ্বাস, শত্রুরা যতই অপপ্রচার করুক, ইহুদীদের চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে মহামান্য পোপ কোনও বিবৃতি দেন নি। (২) গ্যাসচুল্লীর কাজ পুরাদমে চলছে আরো এক বছর।

ঐতিহাসিক কারণে হকুথের নাটকে বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়েছেন পোপ পিউস ১২ এবং ক্যাথলিক চার্চ। প্রকৃতপক্ষে এ নাটকে যে নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত সেটা সর্বকালের, সর্বদেশের। ক্ষমতার ব্যভিচার, মানবিক মূল্য-বোধের বিপর্যয়, নির্বিচার নিগ্রহ এবং নিধন কেবল নাৎসী জার্মানীতে নয়, আরও নানা দেশে সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে, এখনও ঘটছে; সে বিষয়ে নীরবতা অথবা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের অপরাধ কেবল পোপ পিউস ১২ অথবা ক্যাথলিক চার্চের নয়, প্রগতিবাদী মানবপ্রেমী বুদ্ধিজীবী মহলেও এ-ধরনের নৈতিক বিচ্যুতি ও ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত অজস্র; প্রতারণা অথবা আত্মপ্রতারণার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন 'খৃষ্টের প্রতিনিধি' ছাড়া আমাদের আরও অনেকে, যাঁদের রাজনৈতিক রং লাল, শাদা, কালো, বাদামী, বেগ্নী হরেক রকমের। ভারতবর্ষেও সাম্প্রতিক কালে অনেক কিছু ঘটেছে যা মনুষ্যত্বের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক। সুতরাং জাত হিসেবে কিংবা কোনো রাজনৈতিক মন্ত্রের মাহাত্ম্যে "আমরা ভালো, অন্যেরা খারাপ" এমন অন্ধ বিশ্বাসকে কপট যুক্তি দেখিয়ে সমর্থন করা প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীর কাজ নয়। সবচেয়ে

প্রশংসাযোগ্য মনে হয়েছে হক্কুথের নাটক সম্পর্কে একাধিক ক্যাথলিক মনীষীর অপক্ষপাত সমালোচনার সাহসিকতা। গুরু অথবা রাজনৈতিক সর্দারদের যে-কোনো অভিমত বা আচরণ অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে, যুক্তিসংগত সমালোচনা চলবে না—এরকম বিধান মানবিক মূল্য-বিরোধী, অপমানকর এবং প্রকৃতপক্ষে প্রগতিবিরোধী। সত্যের সন্ধানে, অনুশীলনে দ্বিধা ও বাধা যে-সমাজে যত বেশি সেই সমাজের দুর্গতি এবং গ্লানিও তত বেশি। আমাদের দেশেও সেটা এখন মর্মে মর্মে অনুভূত। অন্যত্র কোনো কোনো দেশ ও কোনো কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধা পোষণ করেছি, পরে নানা কারণে সেসব দেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচলিত, স্তম্ভিত হয়েছি। এগুলি নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও মূল্যায়ণের প্রয়োজন শেষ হয় নি। হক্কুথের নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে ক্যাথলিক গর্ডন ঝানের মন্তব্যটি সেজন্য উল্লেখযোগ্য—"এ-সমস্ত ব্যাপার আত্মাকে পীড়িত করে এমন একটা সত্যকে মানতেই হবে—জার্মানী, আমেরিকা কিংবা অন্যত্র যেখানেই হোক, ক্যাথলিকরা যদি এই নাটকেব বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত না-মঞ্জুর করেন তবে তাঁরা স্পষ্ট জানবেন, পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে ঠিক আবার ঐরকম ব্যাপার ঘটবে।" এই সতর্কবাণী কেবল নাৎসীতন্ত্রের বিভীষিকা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়; সব রকম জুলুমতন্ত্র তার মুখোস এবং মন্ত্র যাই হোক না কেন, তার সাহসিক যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার নৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করা বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিশ্বাসভঙ্গের সামিল।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বিচ্ছিন্ন গোপন

চাঁদ যদি ওঠে, যাব একদিন সান্নিধ্যে তোমার।
চতুর্দিকে অস্পষ্ট কুয়াশা। থমথমে
সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত মেঘের পাহাড।
সন্ধ্যা হয়ে গেল যে কখন,
কখন সন্ধ্যার পাখি ফিরে গেল ঘরে,
এবং নারকেল গাছে শেষ চুম্বনের
স্মৃতিচিহ্ন রেখে স্বর্ণ সূর্যাস্তের রেখা
মুহূর্তে বিলীন,
জানতে পারিনি আর। কেবল স্মৃতির

সোনার কপাটে জ্বলে রক্ত-আকাঙ্ক্ষার
ক'টি তীক্ষ্ণ রেখা। কে যেন কেবল
রক্ত-পলাশের নেশা ধরায় দু' চোখে। এবং অস্তত
মৃতের সমাধিপাশে ফুলের সভায়
দু হাতে ঢাকতে চায় ব্যর্থ উদ্যমের
বিচ্ছিন্ন গোপন দুষ্ট ক্ষত।

সন্ধ্যা হয়ে গেল সে কখন,
কার্জন পার্কের অন্ধকারে
দু' তিনটি যুগ্মমূর্তি ইতস্তত নির্জনে, আড়ালে
কম-বেশি সমর্পিত, কেউই এখন
বিশেষ চিন্তিত নয় প্রাত্যহিকতায়,—
ভুলে থাকতে চায়
ব্যর্থ উদ্যমের সেই বিচ্ছিন্ন গোপন দুষ্টক্ষত
কয়েক নিমেষ।

আকাশ এখন কোনো অস্থির যন্ত্রণা
বুকে ক'রে গুম হয়ে আছে ;
বৃষ্টি হলে কিঞ্চিৎ অসুখ
তিরোহিত হতো। বদরক্ত বেরুলে যেমন
কিছুটা আরামবোধ অসুস্থ শরীরে।
চাঁদ যদি উঠতো এখন
আবর্তিত অন্ধকার পার হয়ে মাঠের ওপারে,
চম্পকের মতো তার আঙুল বুলিয়ে
সংলগ্ন এখন হ'লে আকাশের বুকে
বুকের বিষণ্ণ গুরুভার
অপসৃত হতো। কিন্তু ব্যাপ্ত চতুর্দিকে
থমথমে অস্পষ্ট কুয়াশা ;
রাত্রি গভীরতর হয়েছে কখন,
কার্জন পার্কের সেই যুগল মূর্তিরা
ফিরে গেছে, শেষ ট্রাম
ফিরছে নির্জিব মুখে
আশ্রয় শিবিরে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে
ভোর হবে, আবার বেরুতে হবে
সেই অতি পুরাতন
যন্ত্রণা যাত্রায়।

বৃষ্টি নেই, জ্যোৎস্না নেই,
কেবল বিচ্ছিন্ন অন্ধকার
বিমলিন স্মৃতিপটে ;
চাঁদ যদি ওঠে, যাব সান্নিধ্যে তোমার
একদিন, ততদিন রক্ত-আকাঙ্ক্ষার
ক'টি তীক্ষ্ণ রেখা
আড়ালে ঢাকতে চায় ব্যর্থ উদ্যোগের
বিচ্ছিন্ন গোপন দুষ্টক্ষত।

চিত্ত ঘোষ

শেষ স্বপ্ন

শেষ স্বপ্ন দেখা হয়ে গেছে
আর স্বপ্ন দেখবো না কখনো
স্বপ্ন বড় প্রতারণা করে।

ঘোরলাগা চোখের মণিতে
নিবে আসে সকালের মুখ
নির্জনতা, সময়ের শব্দ শোনো
দেখো : ঝরে ফুল, ঝরে পাতা, ঝরে স্মৃতি,
সময়ের হাতে স্বপ্ন, স্বপ্নকে ভাঙার শব্দ শোনো।

কোলছেঁড়া কৈশোরের চারিদিকে মাটি
প্রথম পায়ের শব্দ, আঙুলের দাগধরা মাটি
হে ঘন পল্লব বৃক্ষ, সজীব দীঘল বাড়
জ্বলন্ত শাখার শক্তি, স্বেদ
অন্য এক শৈশবের দিকে যেতে হবে।

এখন রাস্তার ধারে কোনো গাছ নেই
রাত্রি নীল দূরময়, নক্ষত্রখচিত অন্ধকার
গাছের উজ্জ্বল শবে সাজানো শয়ন ঘর
নিবাতনিষ্কম্প কোনো শিখা নেই ঘরে
আদিম একাকী শূন্যে বাতাসের বালু।

আমি পলাতক পাপী, স্বপ্নকে ভেঙেছি দুই হাতে।

মৃগাঙ্ক রায়

আশ্বিন

তুমি কি আমার বন্ধু হবে? নির্জনতায় পরবাসে দুঃখে ও দহনে
কাছে থাকবে? উজ্জ্বল অভিজ্ঞ নই আমি, আমার প্রাতঃস্মরণীয়
কীর্তি কিছু নাই, বাঁ হাতের কব্জিতে বাজপাখি নিয়ে ক্রূর সৈনাপত্যে
কখনো উৎক্ষিপ্ত করি নি ভুরু। তবুও তুমি কি আসবে?

আমি আজ প্রৌঢ় ও নির্জন, আমাকে ভুলেছে বহু বিগত বান্ধব।
তবুও আকণ্ঠ তৃষ্ণা অবিরল, মরে নাই, বেহায়ার মতো ফের
জল চায় জিহ্বামূলে। অথচ মানবসম্পর্ক বাঁচে না, মরে যায়
যেন প্রজাপতি স্নিগ্ধদ্যুতিময়। মানুষ বৃক্ষের মতো প্রশান্তি পায় না কখনো।
তবে কার কাছে যাবো? নীলকুম্ভ থেকে তুমি কি গণ্ডূষ ভরে দেবে?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভ্রান্ত

আমি এক-একবার তোমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবো ভেবেছি
ভীষণ লোভ হয়েছে পায়ের পাতার নরম ছুঁতে
হাতের উপর চাপ দিয়ে লুব্ধ যুবকদের ঈর্ষা কুড়োতে
ভুরুর জোড়াসাঁকোয় চুম্বনের ত্রিকোণ স্বর্গ রোপণ করতে
এক-একবার তোমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবার কথা ভেবেছি।

কিন্তু পরক্ষণেই দীপংকর-বিতৃষ্ণায় সবে এসেছি বলে
নিজের উপর ধিক্কার বেজে ওঠে
তোমার শতনরী হারের বৃশ্চিক চিরাচরিত দক্ষতায়
একজন পুরুষের চুম্বনের বিষ অন্য পুরুষের মুখে ঢেলে আসে,
এমন কি সেই-সব পুরুষের নামও জানো না তুমি!

তুমি কি আমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবে বলে কখনো ভেবেছো ?
আমার সংলাপের অঝোর মুকুলে স্নান করতে
আমার ব্রততী-পৌরুষের বিরোধাভাসের আস্বাদ নিতে
চরিত্রের গঙ্গোত্রীতে স্নান করে রক্তাভ তসরের শাড়ি প'রে নিতে ?
ভাবো নি, কেন না সমর্পণকে তুমি জরতীর ধর্ম ব'লে মনে করো !

তরুণ সান্যাল

বকুলের কথা

কোনো কোনো বেদনার্ত হাত বড় প্রীতিময় ঠেকে
...প্রবল জ্বরের দৃশ্যে মায়ের শাড়ির পাড়, তাঁর
আঙুলের ছোঁয়া চুলে, অথবা কপালে, মনে হয় ..

বড় বড় আশাগুলি নখের দর্পণে মুখ দেখা সাঙ্গ করে, মনে রাখে
উড়ন্ত ধুলোর চাকা, বিদ্যুৎ কেশরে খ্যাপা ঝড়,
বড় বড় গাছগুলি শুয়ে আছে, বাংলা বাড়িঘর
ঠোঁটের অনেক কাছে জল ভেবে মুখ থুবড়ে নদীর তরল দাগ ঘেঁষে

সব দুঃখ দুঃখ নয়, ও কেবল অভিমানে দুঃখ দুঃখ খেলা, একা ঘরে

মা, আমার জন্মদিনে বিশ্ব জুড়ে এত বৃষ্টি ঝরে
হাওয়া গোঙায় খিদিরপুর ডকে :
মাঝ রাতে সরু প্যাণ্ট খাটো কুর্তা বার-ফেরত দেহ
কেবিনে ঘুমের আগে পোর্টহোলে টাপুর টুপুর টোল দেখে
: এ কোন ট্রাক্টার ছেঁড়ে খাবায় নখরে জলস্থল
জলের বিস্তারে যেন শুয়ে আছে চূর্ণ হাড় পুঞ্জ ফেনা গুঁড়ো জল
খালের দু পাশে থরে থরে—
সমস্ত বাঙলায় যেন সবুজ শ্রাবণ, কিংবা শ্রাবণ সবুজে বৃষ্টিবেলা
শস্যের শিসের ফেনা বিপুল কোটালে

মা, আমার সব নৌকা ঢলের প্লাবনে যায়
বালিয়াড়ি পার হয়ে বিপুল মৌসুমী জলোচ্ছলে

একটি বকুল যেই ধুলো মুছে কলেজ স্ট্রীটে, মোড়ে, হাতে পাই—
প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে তখনি শুনি প্রত্ন আলোচনা···
···লাল সালু মুড়ে কার লাশ গেল···দূরে যেন ঢের সম্ভাবনা
বিপুল শব্দের নদী পাড়ি দিয়ে বাড়ির ঘাটের পৈঠা ছোঁয়ার ছলাৎ···
কেমন সিনেট হল চলে গেল গল্পবলা ফোটোগ্রাফে, আর
কেমন বয়সগুলি ঝরে গেল দমকা হাওয়া রুক্ষির আঙুলে কুটি কুটি

চৌমাথার ঘোর সন্ধ্যা হেঁকে ওঠে পাঁচটার ট্রাফিকে অবেলায়
: কোথা হাত, কোথায় তর্জনী নখ, হাতের কঙ্কালে এ যে
নিহত বকুল

বিশাল কীনাঙ্ক হাত—বিপুল অঞ্জলি—
সমস্ত আকাশ মাটি মানুষের কাছে ঢের মানবতা প্রশ্ন করে
কলকাতা বোম্বাই দিল্লী পাটনায় কটকে পড়ে আছে
লক্ষ হাতে লক্ষ হাতে হা অন্ন হা অন্ন সর্বনাশ

হায় রে সে কোন দেশ, কোন কেশবতী নগরের
এ বকুল হতে পারে কেশগুচ্ছে অশেষ বিদ্যুৎ জ্বালা—
কলকাতা আমার ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দী

পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দী গাঁয়ের মাটি
তবু মুক্তির রহস্যে পরিপাটি
জনসভাতেই পড়ে আছে তার মন
সে কি একাত্ম ?   সংশয়ে অগণন ?

দূরে যাই, তবু তার কথা 'তুমি আছো'
নগর-জড়ানো মননের বাঈ-নাচও
পারে না ভুলাতে তুচ্ছ ঘরের কোণ্
'প্রিয় তুমি তারই একাত্ম, অগণন।'

পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দী গাঁয়ের মাটি
তবু মুক্তির রহস্যে পরিপাটি—
'তোমার বসতি করে নিতে চাই আধা'
সেখানে অনেক বাধা।

সেদিন কিভাবে চঞ্চল বনভূমি
বলে—'বসতির দ্বিগুণ নিয়েছো তুমি
বিদেশিনী, কোথা যাবে ?
দূরে গেলে এই গ্রামখানি ব্যথা পাবে !'

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

স্নান

স্নান করে যাব বলে এসেছি এখানে
নানান কারণে বড় দেরী হয়
পথে বড় রৌদ্রপাত ;
যতটুকু ছায়া
চুরি ক'রে নিয়ে যায় রূঢ় মানুষেরা।
ডালিমের ক্ষেতে
সন্ধ্যা হলে চাঁদ নামে আঁচল ভাসায়ে
জ্যোৎস্নায় নীরব রসে ভরে যায় লাল লাল দানা।
দু' একটা পাখি
আমাদের চমৎকৃত বক্ষোদেশ ভেদ করে আসে
ইচ্ছে হয়, উড়ে যাবে ফলের ভিতর ;
ফলের ভিতর সিক্ত উজ্জ্বল সাগর
জমে আছে আরক্তিম ডালিম কণায়,
এ রকম মৌচাক ভেঙে নিয়ে যায় কিছু রূঢ় মানুষেরা···
আমাদের বুকে বহু পাখির বিষাদ !

আমাদের বুকে বড দীর্ঘ রৌদ্রপাত !
স্নান করে যাব বলে এসেছি এখানে
মনে আছে মালিনীর নম্র জল
মনে আছে সেই সব বকুল পারুল
মনে আছে ধ্বংসহীন প্রবল নীলিমা।
মনে থাকে ব'লে সব বেঁচে যাই ;
কয়েকটি ফুলের শান্ত দেহভাব ছুঁয়ে
কয়েকটি মানুষ এলে দরজার কাছে
কয়েকটি পাখির ডাক আঁধার ভোলালে
আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় হয়

আমাদের চমৎকৃত বুকের ভিতর
ডালিম ফলের ক্ষেত নড়ে ওঠে
নক্ষত্রের মতো সব দানাগুলো ভরে যায় জ্যোছ্‌নার রসে
মনে পড়ে,
স্নান সমাপন হ'লে পৃথিবীতে আহার রয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

অনৈসর্গিক

আছি বহুকাল ঘন আঁধার-রচিত এক দেশে।
দুয়ার জানালাগুলি ঘনঘোর শব্দে যায় খোলা,
খুললেই, স্বীয় মুখ—শব্দহীন, বালুকাপ্রতিম!
বুকেব ভিতরে আজো 'চাই ফুল' রবগুলি ভাসে,
কারো হাঁকডাক আজো বানায় বেলুন ; জানে বেশ
আমাদেব নাম, রুজিরোজগার, স্মৃতির বিষয়।
কিন্তু এই সবই এক কায়াহীন সাক্ষাৎকার।
কার প্রতি এই চাহনির আলো ভেসে চলে, কাকে
আপন-আপন স্মৃতি, মেলা দেখা অভিজ্ঞতার
বেদনাদায়ক ছবি ব'লে যাই ; জানি, সকলের
এই একই হাতখানি প'ড়ে আছে অনৈসর্গিক,
ফুলমালাহীন মুণ্ড কার প্রতি করে উপদেশ,
আমরা জানি তো—আছি, রয়ে যাবো কচিৎ বিকালে :
স্থিতিস্থাপকতা, রৌদ্রে শরীরসর্বস্ব অভিযান,
স্বেদ, ক্লান্তি, বিচক্ষণতার এক হীন অভিনয়ে।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শহরের দিকে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শিল্পবিপ্লবে অগ্রণী ইংলণ্ড যখন উন্নতির পথে দ্রুত এগোতে শুরু করল, তখন থেকেই সেদেশে শুরু হয়েছিল ব্যাপক আকারে rural exodus। গ্রামের লোক অন্নের সংস্থান খোঁজবার জন্য ভিড় করল শহরগুলিতে: অট্টালিকার সঙ্গে গড়ে উঠল অবর্ণনীয় বস্তি। শিশু-শ্রমিক নারী-শ্রমিকদের মজুরির হার গিয়ে পৌঁছলো এমন এক স্তরে যেখানে মানুষের মতো জীবনধারণের উপযোগী অর্থ রইল তাদের নাগালের বাইরে; স্বদেশের কারখানাগুলিতে শ্রমিক-নির্যাতনের বহর দেখে দাসব্যবসায়ীরাও গেল চমকে।

শতাধিক বছর ধরে স্বদেশে ও বিদেশে নির্জলা ধনতন্ত্রবাদের রথ চালিয়ে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যে-মূলধন সঞ্চয় করেছেন তার কিছু অংশ কালক্রমে পৌঁছলো গিয়ে সেখানকার গ্রামগুলিতে। আজ যখন ইংলণ্ডের শতকরা প্রায় আশীজন লোক শহরবাসী, সে দেশকে নূতন করে ভাবতে হচ্ছে কিভাবে গ্রাম ও শহরের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায়, কিভাবে শিল্পের সঙ্গে কৃষির, অগ্রগতির সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমন্বয় ঘটানো যায়। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করার সে সুবর্ণ-সুযোগ গত শতাব্দীতে ছিল আজ সে সব সুযোগ একে একে অন্তর্হিত হচ্ছে: তাই আজ সে দেশকে ভাবতে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের কথা। ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে এই একই চিন্তা দেখা দিয়েছে।

ভারতবর্ষে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম হবে, তাই নিয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে অনেককাল থেকে; পরিকল্পনাপর্বে চেষ্টা হচ্ছে একদিকে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা অল্পনির্ভরশীলতা আনবার, আর-এক দিকে চেষ্টা চলছে শিল্পের বুনিয়াদ শক্ত করে গ্রামাঞ্চলের উদবৃত্ত লোকজনকে কাজে লাগাবার। রাস্তাঘাট উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-জীবনের বহুশতাব্দীব্যাপী অভিশাপ যাচ্ছে ঘুচে; রেডিও, সাইকেল ও মোটর আজ শহর ও গ্রামের

অস্বাভাবিক ব্যবধান দিচ্ছে ভেঙে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই যে-ঢেউ এসে পৌছেচে আমাদের দেশে, তারই ধাক্কায় আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে অথচ সুস্পষ্টভাবে এক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এই বিরাট পরিবর্তনের মুখে আমাদের সামনে যে-প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সেটি হচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো কিভাবে গড়ে তোলা হবে। শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বে যন্ত্র এবং মানুষের প্রবৃত্তির যে অসামঞ্জস্য ঘটেছিল তারই যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে অচিরে আমরা জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হব। আমাদের দেশে এখনো প্রতি পাঁচজনের চারজনই গ্রামবাসী, জাতীয় আয়ের পরিমাণ সামান্য। সাম্রাজ্যবিস্তারের চিন্তা আমরা করি না, সম্ভাবনাও দেখি না; 'উদ্‌বৃত্ত' লোকসংখ্যা বিরলবসতি কোনো দেশে পাঠাবার উপায় নেই। বহির্বাণিজ্য বিস্তারের পথও সীমাবদ্ধ, আর লড়াই বাধিয়ে বা মহামারীর মধ্যে দিয়ে 'অবাঞ্ছিত' লোকসংখ্যা হ্রাস হবে সে চিন্তাও এ-যুগে 'কল্যাণমূলক' রাষ্ট্রে কেউ চিন্তা করে না। বৃহদাকার ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়, গ্রামবাসীর স্বার্থের সঙ্গে শহরবাসীর স্বার্থের সামঞ্জস্য, কৃষির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক এই সব প্রশ্নের মূলে আছে, সে যুগের 'প্রাণের কেন্দ্র' গ্রামগুলির মধ্যে আমরা কিভাবে নূতন প্রাণের সঞ্চার করতে চাই এবং 'শক্তির কেন্দ্র' শহরগুলিতে কতখানি শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে চাই।

দুই

একশো বছরের কিছু আগে ভারতবর্ষে শহরের সংখ্যাও যেমন ছিল নগণ্য, তেমনি সেইসব শহরে লোকসংখ্যাও ছিল কম। কি কি কারণের সমন্বয়ে ক্রমে গ্রামগুলি জনবিরল, নিরানন্দ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে আর অল্প কয়টি শহর বৃহদাকারে স্ফীত হয়ে ওঠে, তাই নিয়ে এ যাবৎ বহু আলোচনা হয়ে গেছে।

বৃহদাকার শহর এবং ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে কতকগুলি ছোট শহর গড়ে উঠেছে যার অনেকগুলিই আদমশুমারির সংজ্ঞা-অনুযায়ী 'শহর' পর্যায়ভুক্ত হলেও কার্যতঃ 'বৃহত্তর গ্রাম' মাত্র। ১৯২১-এর আদমশুমারিতে এই সব শহরগুলিকে 'sleepy country towns' আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই সব শহরের অনেকগুলিই বেড়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে এই সব ক্ষুদ্র শহরগুলির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। এই যোগাযোগ-বৃদ্ধির সঙ্গেই যে-প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তা হচ্ছে—শহর ও গ্রামের

মধ্যে যে-বিনিময় চলছে তার ফলে গ্রামগুলির শ্রীবৃদ্ধি হবে কি? অথবা কালক্রমে, কৃষিনির্ভব গ্রামগুলিব প্রাণশক্তি ক্রমেই বহির্মুখী হয়ে এই সব ক্ষুদ্র শহরগুলিতে এসে জমবে? গত কয়েক বছর ধরে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কিছু পরিমাণে উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এক দিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে—অথবা বলা যেতে পারে গ্রামাঞ্চলের অবস্থাপন্ন কৃষকের ঘরে—কিছু পরিমাণে বর্ধিত আয় গিয়ে পৌছেচে তেমনি অপর দিকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমেই গ্রামের থেকে সরে এসে শহরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জমিহীন গ্রামবাসীর আয়ের অন্যতম পথ ছিল ঢেঁকিতে ধানভানা, তারই সঙ্গে অন্যান্য অনুরূপ কাজ গ্রামেই কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে চাল-কলগুলি ঢেঁকির কাজের এক বিরাট অংশ দখল করে নেয়; দ্বিতীয়-যুদ্ধোত্তর পর্বে 'প্রগতি'র নামে 'হাস্কিং মেশিন' এসেছে, ফলে যেটুকু ধান গ্রামে ঢেঁকিতে ভানা হচ্ছিল তা জমা হয়েছে কল-মালিকের কাছে। আর তারই সঙ্গে, যাতায়াত-ব্যবস্থা সুগম হবার ফলে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে শহরে তৈরি বিভিন্ন শখের সামগ্রী। গ্রামবাসীরা যেসব সুখস্বাচ্ছন্দ্য এতকাল ভোগ করতে পারেনি, সেসব যখন ঘরের দরজায় সুলভে পাচ্ছে, প্রতিবেশীর তৈরি জিনিস কেনই বা কিনবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে গ্রামবাসীদের কাছে কি শখের সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হবে না?—সে-যুগেব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের যে-চিত্র কল্পনা করা হয়, তার ক্ষীণতম পুনরাবৃত্তি ঘটা আজকের দিনে সম্ভব নয়। গ্রামবাসীরা যে-কাজে পটু সেই কাজে অর্থাৎ কৃষি-কাজে লিপ্ত থাকুক, আর শহরেই গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী তৈরি হোক—এই ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে না; উপরন্তু গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই সামগ্রিকভাবে দেশের সম্পদ-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবাব একমাত্র পথ যদি কৃষি-পণ্য বিক্রয় হয় তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কিনা সন্দেহ; সব দেশেই দেখা গেছে কৃষি-এবং অ-কৃষি-পণ্যের বিনিময়ব্যবস্থায় কৃষকরা বঞ্চিত হয়ে এসেছে। আমাদের দেশেও পরিকল্পনা-পর্বে কৃষি এবং অ-কৃষি গোত্রের মাথাপিছু আয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কৃষি-গোত্রের মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর অপর গোত্রের তুলনায় কমে আসছে। এ ছাড়া রয়েছে গ্রামাঞ্চলে বছরের প্রায় ছয় মাস ধরে বিনা কাজে বসে থাকার সমস্যা। কৃষিনির্ভর সমাজের এই সব বিবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে নানান ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে; আর তারই পাশাপাশি নূতন

সমস্যা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সংঘবদ্ধ প্রাইভেট 'সেক্টর' প্রধানতঃ শহরে কেন্দ্রীভূত, সমবায়কে গড়ে তোলবার বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

এই বিবিধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রাকৃতি শহরগুলির কার্যধারায় যে-পরিবর্তন ঘটছে তার মোটামুটি গতি কোন্ দিকে ? এই বৃহত্তর প্রশ্নের মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রবেশ করব না।

যুদ্ধোত্তর পর্বে এই রকমেরই একটি ক্ষুদ্র শহরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ কত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, তারই এক আংশিক বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থিত করবার চেষ্টা করব। এই যোগাযোগ যে বাঞ্ছনীয় এবং অনিবার্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কালক্রমে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে গ্রামবাসী কতখানি উপকৃত হবে সে প্রশ্নের উত্তর আমরা এই প্রবন্ধে বিবৃত তথ্যাদি থেকে পাব না ; দেশ জুড়ে যে-পরিবর্তন ঘটছে সেই সর্বজন-বিদিত তথ্যটুকুই কতকগুলি পরিসংখ্যানের সাহায্যে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

তিন

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মোট প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার গ্রাম (বা 'মৌজা') এবং মাত্র সোয়া শো শহর ; মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ শহরবাসী, তার মধ্যে অধিকাংশই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরে (যাকে বলা যেতে পারে Greater Calcutta বা Calcutta Conurbation অথবা Calcutta Metropolitan District) কেন্দ্রীভূত। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়েব এক বিরাট অংশ এই অঞ্চলেই উদ্‌ভূত: সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে কলকাতাবাসীর মাথাপিছু গড় আয় সেখানে বাৎসরিক ৫৫০ টাকা, পার্শ্ববর্তী চারটি জেলার (হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া) মাথাপিছু গড় আয় ৪০০ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশে মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ২১২ টাকা। এর থেকেই কলকাতার প্রত্যক্ষপ্রভাবান্বিত অঞ্চলের বহির্ভূত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনির্ভর অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুব অঞ্চল। বীরভূম জেলার মোট ছয়টি শহরে জেলার মাত্র শতকরা ৭জন লোক থাকে—এই শহরগুলির প্রায় সব কয়টিই আদমশুমারির সংজ্ঞা-

অনুযায়ী non-industrial বা residential town, এবং জনসংখ্যার বিচারে 'গ' বা 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত (অর্থাৎ জনসংখ্যা ৩০ হাজার বা ২০ হাজারের মধ্যে)। ১৯৫১-৬১-এর মধ্যে যদিও পশ্চিমবঙ্গের গড় অঙ্কের তুলনায় বীরভূমে শহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সত্ত্বেও মোট শহরবাসীর হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এখনো বহু কম। ছ'সাতটি শহরের মধ্যে তিনটি হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি; অপর তিনটি এখনো এই পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট স্বল্পবারিপাতবিশিষ্ট বীরভূমের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার রূপায়ণের পর; সম্প্রতি বহু রাস্তা পাকা হওয়াতে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিখ্যাত ইলামবাজারের কাছে অজয় নদের উপর ব্রীজ হবার ফলে বীরভূমের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে।

এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় বোলপুর শহরে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত লোকের সমাগম নিয়ে সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান গৃহীত হয়।[১] বর্তমান প্রবন্ধে এই সূত্রেই কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চেষ্টা করব।

চার

একশো বছরের কিছু আগে, রেলপথ স্থাপিত হবার পূর্বে, দক্ষিণ-বীরভূমের এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল সুরুল সুপুর ও রায়পুর। বোলপুর তখন তুলনায় নগণ্য গ্রাম; সে সময়কার তথ্যাদি থেকে দেখা যায় সুরুল গ্রামে ছিল প্রায় ৭০০টি পাকা ও কাঁচা বাড়ি (তখনো আদমশুমারি শুরু হয়নি), আর বোলপুরে মাত্র ১৬০টি। জন চীপ-এর তৈরি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মিলনস্থল ছিল সুরুল গ্রাম। বর্ধমান থেকে সিউড়ির রাস্তা বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী (এখানে জন চীপের 'ফ্যাক্টরি' ছিল) থেকে বীরভূমের পূর্বপ্রান্তে 'গুমুটিয়া' গ্রাম পর্যন্ত আর-একটি রাস্তা সুরুল গ্রামেব কাছে মিলিত হয়, আর এখান থেকেই অপর একটি রাস্তা কাটোয়ার দিকে যায়। রেলপথ খোলবার কয়বছর বাদে বোলপুর শহর চাল-রপ্তানি-কেন্দ্র হিসাবে অন্যান্য রেল স্টেশন-(আমদপুর,

---

১. এই পরিসংখ্যান-সংগ্রহকার্য পরিচালিত হয় বোলপুর কলেজের উদ্যোগে। গত ১লা মার্চ একটি হাটের দিনে শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে কতজন লোক, গোরুর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন কতদূর থেকে, কি কাজে এসে শহরে জমায়েত হয়েছে, সেই তথ্য সংগৃহীত হয় বোলপুর কলেজের প্রায় ৬০টি ছাত্রের দ্বারা।

সাঁইথিয়া)-এর মতো বাড়তে থাকে। দেশবিভাগের পর বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে বোলপুর শহর-পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বীরভূমের অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে লোকসমাবেশ বেড়ে যায়।

১৯৬১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী বোলপুর শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৪০০০, শহরকে কেন্দ্র করে তিন মাইল ব্যাসের মধ্যে আরো প্রায় কুড়ি হাজার লোকের বাস। ১৯৫১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী বোলপুরকে কেন্দ্র করে Rural Tract 10 (বোলপুর, নান্নুর, লাভপুর, ইলামবাজার থানা অঞ্চল) এলাকার মোট ৪৫০ বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ, ১৯৬১ সাল এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে তিন লক্ষ। 'বোলপুর' 'ব্লক' (বা থানা অঞ্চল) এলাকার ১৩০ বর্গমাইলে লোকসংখ্যা, শহর বাদে, প্রায় নব্বই হাজার। এই 'ব্লক' এলাকার মধ্যে ১৫৫টি 'মৌজা' (এবং প্রায় দুই শত গ্রাম) অবস্থিত, প্রায় তিনশো মাইল কাঁচা গ্রাম্য রাস্তা এবং পঁয়ত্রিশ মাইল পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কে বোলপুর শহর পূর্বে নান্নুর, কীর্নাহার প্রভৃতি গ্রামের সঙ্গে যুক্ত, উত্তর-পশ্চিমে সিউড়ি (জেলার প্রধান শহর) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ইলামবাজার হয়ে বর্ধমান জেলার শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত।

বোলপুর শহরে প্রধান 'শিল্প' চালকল; এরই সঙ্গে আছে আনুষঙ্গিক কিছু ব্যাবসা। অর্ধশতাব্দী পূর্বে এখানে তাঁতের কাপড় তৈরি হত, বর্তমানে তার স্থান নগণ্য। কিছুদিন পূর্বে শহরের 'শিল্প'গুলির এক পরিসংখ্যান গৃহীত হয়, তাতে দেখা যায় যে মোট প্রায় ৩০০টি 'শিল্পকেন্দ্রে' ১৩০০ জন কর্মী, অন্যান্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে লিপ্ত, যথা কাঠগোলা, বিড়ি তৈরি, দর্জি, স্বর্ণকারের দোকান, সাইকেল মেরামত ইত্যাদি; অর্থাৎ সেই সব 'শিল্প' যেগুলি অধ্যাপক স্পেট (O. H. K. Spate)-এর ভাষায় "some crafts which have as it were a market sheltered by its poverty" অথবা "services following population"।

বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বোলপুরের যে-কারণে বিরাট পার্থক্য সেই কারণ সুবিদিত। বর্তমান পরিসংখ্যানে এই সূত্রে স্বতন্ত্রভাবে তথ্য সংগ্রহ না করা হলেও প্রসঙ্গতঃ সেই প্রভাবের উল্লেখ আমরা পাব।

পাঁচ

গ্রামীণ জীবনের যে-পরিবর্তন এ-যুগে লক্ষ করা যাচ্ছে সেই সূত্রেই প্রায় দশ-বারো বৎসর পূর্বে তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন :

> Though the substratum of life—the gruelling round of the seasons—remains and will ever remain the same, though a miserable livelihood exacts an exorbitant price in endless toil, there have been great changes, material and psychological, since Edwin Montague, Secretary of State for India, spoke in 1918 of the "pathetic contentment" of the Indian village. Pathetic it still too often is, contented less and less which is as it should be. ··· Now new motifs are changing the tempo of life in the large villages ; perhaps a radio, perhaps a mobile film unit, more and more frequently a school. ···All are helping to break down the isolation and lack of information which rendered the villager so helpless a prey to the money-lender, the retailer and the grain-broker—often all three being one and the same person. Perhaps the most powerful agent of change is the battered, ramshackle motor bus packed to the running board and coughing its way through clouds of dust, along the unmetalled roads to the nearest town. There may be loss as well as gain in all this, but it is idle to bewail the break-up of integrated codes of life—too often integrated by religious, social and economic sanctions which were a complete denial of human dignity.

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালের সরকারী তথ্য থেকে দেখা যায় যে সিউড়ি-বোলপুর রাস্তায় সে-সময়ে গড়ে সপ্তাহে ১২।১৪টি বাস চলাচল করত, এখন সে-ক্ষেত্রে চলে গড়ে ৭৫টি, অর্থাৎ পাঁচ গুণেরও বেশি। অপর

দিকে দেখা যায়, পদচারী গড়ে সপ্তাহে আসত প্রায় আড়াই হাজার জন এখন সে-ক্ষেত্রে আসে মাত্র ৭০০ জন। অন্যান্য রাস্তাতেও একই ধারা লক্ষিত হয়। এই একটি তথ্য থেকেই পরিবর্তনের ধারা ও পরিমাণ অনুমাণ করা যাবে। বাস্-এর প্রচলন শুধু একটি রাস্তায় নয়, প্রতিটি পাকা সড়কে হয়েছে এবং আমাদের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে অন্য স্থান থেকে আগত প্রায় চল্লিশটি বাস্-এ সারাদিনে প্রায় দেড হাজার লোক শহরে প্রবেশ করেছে। পদচারীর সংখ্যা হ্রাস পাবার অন্যান্য কারণ থাকতে পারে; কিন্তু একদিকে বাস্‌যাত্রীর সংখ্যা, সাইকেল-আরোহী ও রেলযাত্রীব সংখ্যা বিচার করে দেখলে অনুমান করা যায়, গ্রামবাসীরা যেখানেই এই দ্রুত যানবাহনের সুবিধা পাচ্ছে, হেঁটে আসার পরিবর্তে অল্প সময়ে দ্রুততর গতিতে আসাই পছন্দ করছে। সময়ের মূল্যবোধ যেমন লোকের বেড়েছে, অযথা পরিশ্রম বর্জন কবার ইচ্ছাও তেমনি প্রবলতর হয়েছে।

যাতায়াত সুগম হওয়াতে, পূর্বের মতো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় প্রয়োজনীয়তা সম্ভবতঃ কমেছে; যদিও অবস্থাপন্ন কৃষকরা শহরের জীবন পছন্দ করে বলে হয়তো পয়সা জমলেই শহরে এসে জমি কিনছে। গ্রামের তুলনায় শহরে জমির দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির অন্তত একটি কারণ এই exodus।

মফঃস্বলের প্রায় সব শহরেই সপ্তাহে দুদিন হাট বসে; আমাদের পরিসংখ্যানটি এইরকম এক হাটবারে (রবিবার) গৃহীত হয়। শহরের মোট জনসংখ্যা যেখানে ২৪ হাজার, আমাদের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১০ হাজার (অর্থাৎ স্থানীয় লোকসংখ্যার তুলনায় day-time population প্রায় শতকরা ৪০) লোক পায়ে হেঁটে, বাস্-এ, সাইকেলে, গোরুর গাড়িতে ও রেলপথে শহরের ছয়টি বিভিন্ন পথে ঐদিনে শহরে এসেছেন। উদ্দেশ্য প্রধানতঃ হাট করা অথবা হাটে পণ্য বিক্রী করা, ধান বিক্রী, খড় বিক্রী; আর তারই সঙ্গে আছে, মিলে কাজ করা, ধান ভানাই করা, কলের থেকে তুষের ছাই সংগ্রহ করে চাষের জন্য নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তারই সঙ্গে আছে ডাক্তারখানা বা উকীলবাড়ি যাওয়া, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মাস্টারের কাছে পড়তে আসা; আর আছে সিনেমা দেখা কিম্বা শহরের সেলুনে চুল ছাঁটতে আসা!

রাস্তার অবস্থা জনসংখ্যার তারতম্য ও অন্যান্য বিবিধ কারণের সমন্বয়ে শহরের ছয়টি রাস্তায় জনসমাগমে প্রচুর পার্থক্য লক্ষিত হয়। মোট পদচারীর (৩০০০) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসেছে একটি পথ দিয়ে: এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত প্রচুর উদ্বাস্তু বসবাস করছেন। এই উদ্বাস্তুরা কী পরিমাণে বিভিন্ন রকম কাজে লিপ্ত হয়ে গেছেন তার আংশিক আভাস পাওয়া যায় এই পরিসংখ্যান থেকে।

শহরে আগত প্রায় ১৮০০ সাইকেল-আরোহীর মধ্যে একটি পথে যাত্রীসংখ্যা সমগ্র সংখ্যার মাত্র ৩ ভাগ, অপর এক রাস্তায় ৩০ ভাগ। ঠিক এই রকম তারতম্য লক্ষিত হয় গো-শকটের ক্ষেত্রেও; জনবহুল ও কৃষিকার্যে অগ্রণী নানুর ও লাভপুর অঞ্চল থেকে বহু গো-শকট আসে বিভিন্ন তরিতরকারি সবজি বিক্রী করার জন্য; অনেক গাড়ি বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও আসে।

শহরের উত্তরে ও দক্ষিণে পথঘাটের স্বল্পতার জন্য ঐ দিক থেকে লোক-সমাগম অপেক্ষাকৃত কম; শহরের hinterland, বলা যেতে পারে পূর্ব-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অন্য একটি সম্ভবপর কারণ, মাত্র ১২ মাইল উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় সমান 'আকর্ষণীশক্তি'সম্পন্ন শহরের অবস্থান। বাজার হিসাবে যদিও গুসকরা বা আমদপুর তত প্রসিদ্ধ নয়, কিন্তু ধান-বিক্রেতাদের কাছে দরের সামান্য পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; যদিও ধান বিক্রী ক'রে প্রয়োজনীয় সওদার জন্য অনেকে বোলপুরে আসে, তেমনি অনেকে ধানের দর অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হলে নিকটবর্তী অন্য শহরে চলে যায়।

আমাদের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে রেলপথ বা বাস্-যাত্রী ছাড়া অন্যান্য যাত্রীরা মোট ৫০০টি গ্রাম থেকে বোলপুরে সমাগত হয়েছে; এই গ্রামের প্রায় অর্ধেক বোলপুর থানা অঞ্চল বা 'ব্লক' (১৩০ বর্গমাইল)-এর মধ্যে অবস্থিত; বাকী অর্ধেক অন্যান্য পার্শ্ববর্তী থানা অঞ্চল ও মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এর থেকে একটি ক্ষুদ্র শহরের 'প্রভাবান্বিত অঞ্চল'-এর আনুমানিক সীমানা অনুমান করা যায়। বীরভূমের মোট গ্রাম ও শহরের সংখ্যা বিচার করে দেখা যায় প্রতি শহর পিছু প্রায় ৩০০ গ্রাম; বোলপুরের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।

শহরের 'প্রভাবান্বিত অঞ্চল' অবশ্য বরাবর একই থাকতে পারে না; রাস্তাঘাট ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন এই এলাকা বৃদ্ধি পায় তেমনি

অন্যান্য স্থানে দোকানপাট বসাতে retail business-এর কেন্দ্র সরে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় এক দিকে যেমন retail business ছোট ছোট জনপদে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অপর দিকে বোলপুর শহরে wholesale ব্যাবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'প্রভাবান্বিত অঞ্চল' ব'লে তাই কোনো নির্দিষ্ট সীমানা টানা চলে না। পাইকারি ব্যাবসার কেন্দ্রও অন্যান্য স্থানের মতোই বোলপুরের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনশীল; এ ক্ষেত্রে এখন বোলপুরকে দক্ষিণ-বীরভূমের অন্যান্য শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে: এক-একটি শহরের আপেক্ষিক সুবিধা এক-একটি দিকে পরিস্ফুট।

ছয়

মাত্র চব্বিশ হাজার লোকের বসতি যে-শহরে, যে-শহরের কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্পও নেই, সেই শহরের প্রভাবান্বিত অঞ্চল কতদূর বিস্তৃত, তার সামান্য আভাস বর্তমান প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। পাঁচশোটি গ্রামের বহির্দ্বার হচ্ছে এই একটি শহর: এই শহরে লোক আসছে শস্য বিক্রয় করতে, শহরে কেন্দ্রীভূত দোকান থেকে সওদা করবার জন্য, মামলা-মোকদ্দমা করার জন্য, চিকিৎসার জন্য, অন্যান্য সরকারী দপ্তরে কাজ উপলক্ষে, এবং মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে আনন্দ পাবার জন্য। শহরে না এলে তারা যেমন টাকা রোজগারের পথ পায় না তেমনি প্রবহমান জীবনধারার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে-পরিমাণ লোক গ্রামের থেকে এই শহরে আসত তা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই কয় বছরে—লোকসংখ্যা যত বেড়েছে তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। তার বিবিধ কারণ থাকতে পারে—হয়তো কৃষকের marketable surplus বেড়েছে, হয়তো চাষের কাজে বা সংসারে ব্যবহার্য পণ্যের জন্য শহরে আসার প্রয়োজন বেড়েছে অথবা হয়তো যে-কাজ পূর্বে গ্রামে হত সে কাজ শহরে ছাড়া আর পাওয়া যাবে না বলে আসতে হচ্ছে।

কারণ যাই হোক-না কেন, গ্রামের লোক উত্তরোত্তর শহরমুখী হচ্ছে এ কথা অনুমান করা হয়তো অন্যায় নয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে এই পরিসংখ্যান নিলে এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হত; তবে যতটুকু দেখা যায় (এবং যে-ধারা অন্যান্য অনুরূপ শহরেও চলছে বলে অনুমান করা যায়) তাতে গ্রামবাসীর পরিবর্তিত মনোভাব ও প্রয়োজন উভয়ই লক্ষ করা যায়।

প্রবন্ধের শুরুতে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছি পুনরায় সেই প্রশ্নই মনে জাগে—এই যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ঘটছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে, এর ফলে গ্রাম কি তার সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারবে? অথবা শহরেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে? এই প্রশ্নের সমাধান হয়তো আজকেই করা যাবে না, বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য থেকেও পাওয়া যাবে না।

অন্যান্য অনেক তথ্যানুসন্ধানের মতো এটিও একটি পন্থা যার দ্বারা আমরা পরিকল্পনা-পর্বে গ্রামীণ জীবনধারার পরিবর্তন যথাযথ রূপে বিচার করে দেখবার সুযোগ পেতে পারি।

অমল দাশগুপ্ত

অভিযান

ভোর থেকেই তোড়জোড়।

অন্যদিন ঘুম ভাঙবার পরেও অসীমা চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকেন। সারা রাত ঘুমিয়েও মনে হতে থাকে ক্লান্তিতে সারা শরীরটা অবশ। তারপরে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতেই যখন মনে পড়ে সামনে পুরো একটি দিন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, পুরো একটি দিনের সংসারযাত্রা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জামাকাপড় কাচা, অ্যালুমিনিয়মের কৌটোতে টিফিন সাজিয়ে দিয়ে স্বামীকে আপিসে ও দুই ছেলেকে স্কুলে পাঠানো, কোলের মেয়েটিকে স্নান করানো খাওয়ানো ঘুম পড়ানো, তাছাড়াও আরো অজস্র অজস্র খুঁটিনাটি কাজ—তখন ক্লান্ত শরীরটা বিরক্তিতে জ্বলতে থাকে। অভ্যেসবশে ঠাকুরের নাম স্মরণ করেন বটে কিন্তু নিজেই বুঝতে পারেন যে ঠাকুরের কাছে চাইবার বা কামনা করবার আর কিছুই নেই। একসময়ে মনের শান্তি কামনা করতেন। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে তাঁর বাকি জীবনটায় মনের শান্তি নাগালের বাইরেই থাকবে। কখনো কখনো সত্যিকারের চিনি দেওয়া চা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে যায়। কারণ স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি বেধে যায় তখন থেকেই। কারণ ছেলেমেয়েদের পেছনে কিটকিট করে লেগে থাকতে হয় তখন থেকেই। সামান্য সামান্য কথা থেকেই শুরু হয়ে যায় মতের অমিল, কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া, শেষ পর্যন্ত গালিগালাজ। বহুদিন ঘুম ভাঙবার পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সারাটি দিন তিনি শুধু একটি যন্ত্রের মতো পরিশ্রম করে যাবেন, হাজার উত্তেজনার কারণ ঘটলেও মুখ খুলবেন না—তবুও শেষরক্ষা হয়নি। কোনো রকমে সকালবেলার চা-পর্ব কাটে তো বাজারের ফর্দ লিখতে গিয়েই অবস্থা তুঙ্গে পৌঁছে যায়। বাজারের অবস্থাটা হয়েছে যেন সকালবেলার কলের জলের মতো। কোথায় কোন্ বাড়ির কল বন্ধ করলে তবে এ-বাড়ির কলে জল আসে, কখনো ফোঁটায় ফোঁটায়, কখনো সুতোর মতো সরু রেখায়। আর সবসময়ে একটা তটস্থ

অবস্থা—এই বুঝি সারাদিনের মতো জল বন্ধ হয়ে গেল! ফর্দ লিখতে গিয়ে হাত কাঁপে। কতবার হরিনাথকে বলেছেন, ফর্দ লিখে কি হবে, তুমি ভালোমন্দ বিবেচনা করে যা হোক এনো। হরিনাথ তাতেও রেগে যান, বলেন, অত ভাববার সময় আমার নেই, আমাকে আপিসে যেতে হবে তো, নাকি সারাদিন ধবে তোমাদের বাজার করব! ওদিকে ফর্দ লিখলেও মুশকিল। একদিন লিখেছিলেন, পটল আড়াইশো। হরিনাথ বাজার থেকে ফিরে এসে বাজারের থলেটা প্রায় মুখের উপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, ঠিক টের পাও তো পটলের দাম পাঁচসিকে হয়েছে—কেন, পটল না খেলে মানুষ মরে যায়! লাউশাক লিখেও একদিন একই অবস্থা। একটিমাত্র ডগার দাম নাকি তিনআনা! এমনকি কাঁচাপেঁপেও নাকি বারোআনা কিলো! তবুও ফর্দ লিখতে হয় আর যাই লিখুন না কেন মনে মনে প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হয়। আগে ফর্দের শুরুতেই লিখতেন—মাছ বা ডিম। মাছ কোনোদিনই আসেনি। কিন্তু সেজন্যে তিনি কোনো অনুযোগও করেন নি। দুটি ডিমকেই ফেটিয়ে বড়া করে আশ্চর্য কৌশলে পাঁচটি পাতে ঘুগিয়েছেন। কিন্তু অনুযোগ না করাটাই হরিনাথের কাছে অনুযোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন অসীমা মাচের থলের ভিতর থেকে ডিমদুটি বার করছেন, হরিনাথ মুখ খিঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে প্রায় একটা হুংকার ছেড়েছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবো যে বাজারে মাছ পাওয়া যায় কিন্তু আমি ইচ্ছে করে আনি না! অসীমা বলেছিলেন, তা কেন ভাবব, আমি কি কোনো খবর রাখি না! হরিনাথ আরো গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, তা যদি রাখতে তবে এমন প্যাঁচার মতো মুখ করে ডিম বার করতে না। অসীমা একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলেন, আমার মুখটা এখন তোমার কাছে প্যাঁচার মতোই লাগে, আমার মুখের দিকে না তাকালেই হয়! হরিনাথ তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিলেন, তাহলে তোমাকেও বারণ করে দিচ্ছি, আমার মুখের দিকেও তাকাবে না, যদি তাকাও তো বিধবা হবে। অসীমা তখন রাগ সামলাতে না পেরে বলেছিলেন, বিধবা হবার আগেই তো মাছের পাট উঠিয়েছ! বাস্, তারপরে সারাটি দিন শুধু জের টেনে চলা। অনেকটা সুর বেঁধে রাখা সেতারের মতো (বিয়ের আগে একসময়ে অসীমা সেতার বাজাতেন—কোলের মেয়েটি বড়ো হয়ে সেতার বাজাবে বলে সেটি তোলা আছে)—যেভাবেই টোকা দেওয়া যাক না কেন, একই সুর বেজে ওঠে।

এমনি প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারে। এমনকি একটা কাচের গ্লাস কিনে আনতে বলেছিলেন বলে একবার অসীমাকে মন্তব্য শুনতে হয়েছিল : কেন, আমার শ্রাদ্ধের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতে হচ্ছে নাকি! রাত্তিরবেলা একা হাতে এতগুলো মানুষের জন্যে রুটি তৈরি করতে অসীমার কষ্ট হয়। একবার তাই হরিনাথ খুব ভালো মেজাজে আছেন মনে করে মুখ ফুটে বলেছিলেন, আর কিছু চাল জোগাড় করা যায় না? হরিনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন, চাল কি কম পড়েছে নাকি? অসীমা আমতা আমতা করে বলেছিলেন, তাহলে দুবেলাই ভাত হতে পারত। হরিনাথ রেগে উঠেছিলেন, ও, নবাবপুত্তুরদের একবেলা রুটি খেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি! এমনি অজস্র ঘটনা ঘটবার পরে অসীমা ধরেই নিয়েছিলেন যে হাসিমুখ আর মিষ্টিকথা তাঁর জন্যে নয়। আস্তাকুঁড়ের পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকলে আস্তাকুঁড়ের গন্ধও যেমন গা-সওয়া হয়ে যায় তেমনি এই জীবনটাও তাঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। মোটা মোটা চালের ভাত, গুয়ের মতো রঙ ও দুর্গন্ধ (চার বছরের কোলের মেয়ে খুকু কথাটা বলেছিল : মা, ভাতগুলো দেখতে গুয়ের মতো, না?), থালায় বেড়ে দিতে গোড়ার দিকে তাঁর কান্না পেত—এখন দু-বেলাই এই ভাতের ব্যবস্থা হলে তিনি খুশি হতেন। সরষের তেলের স্বাদ তো ভুলেই গিয়েছেন—তা নিয়েও এখন আর কোনো আক্ষেপ নেই। সরষেবাটা দিয়ে ঢেঁড়স-সেদ্ধ একসময়ে তাঁর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। মায়ের স্বাদ পানু ও বানুও পেয়েছে (বারো ও দশ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বে ওরা এখনো মাঝে মাঝে অবুঝের মতো বলে ফেলে : মা, সরষেবাটা দিয়ে ঢেঁড়সসেদ্ধ করো না!)। কিন্তু সরষের কিলো আড়াইটাকা ও ঢেঁড়সের কিলো পাঁচসিকে হবার পর থেকে (খবরটা জানিয়ে হরিনাথ আশ্চর্য শান্ত স্বরে বলেছিলেন, ঢেঁড়স না খেয়ে আমার জিভটা সরষেবাটা দিয়ে মেখে খেলে হত না!) তিনি আর কোনোদিন ভুলেও বাজারের ফর্দে সরষে বা ঢেঁড়সের নাম উল্লেখ করেন নি। ইলিশমাছের রান্নায় আত্মীয়মহলে তাঁর জুড়ি ছিল না বলতে গেলে। নরম শাঁসওলা ডাবের মধ্যে সরষের তেল ও সরষেবাটা মাখা ইলিশমাছ পুরে, ডাবের ওপরে মাটি লেপে, উপরে-নিচে আঁচ দিয়ে বসিয়ে রাখতেন—কিছুক্ষণ পরে যে-খাদ্যবস্তুটি তৈরি হত তার স্বাদ সারা জীবনে ভুলবার নয়। প্রথম দিন খেয়ে হরিনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, আমার জীবনটা আজকে সার্থক হল। পানু ও বানু বলেছিল, মা, খুব ভালো। আর তিনি

ভেবেছিলেন, মানুষকে খুশি করা কত সহজ। এখন অবশ্যই তা আর ভাবেন না। ইলিশ মাছের স্বাদ তো দূরের কথা, ইলিশমাছের চেহারাও তিনি ভুলতে বসেছেন (গঙ্গার ঘাটে নাকি পঁচিশ টাকা কিলো ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। নিশ্চয়ই আরকে ডুবিয়ে রেখে দেবার জন্যে)। এমনকি কুঁচো-চিংড়িতেও তাঁর রান্নার হাত অসাধারণ। কুচিকুচি কুমড়োর সঙ্গে সরষেবাটা দিয়ে মেখে, ডুমোডুমো আঁচে বসিয়ে, কুঁচোচিংড়ির বাটিচচ্চড়ি—তা বোধহয় তাঁকে আর এ-জীবনে রাঁধতে হবে না। আরো একটি সামান্য রান্নায় তিনি অসামান্য স্বাদ আনতে পারতেন। রান্নাটি বেগুনপোড়া। কৃতিত্বটা ছিল পোড়ানোয় নয়, তার পরের পর্বে। সরষের তেলে অল্প লাল করে পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে তার মধ্যে কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা বেগুনপোড়া সঁাতলানো হত। নামাবার আগে ছড়িয়ে দেওয়া হত একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। বেগুনের কিলো একটাকা হবার পর থেকে এই রান্নাটিও তাঁকে ভুলতে হয়েছে।

ভুলতে হয়েছে আরো অনেক কিছুই। হরিনাথ নামক ব্যক্তিটির কাছে তিনি যে একসময়ে নবপরিণীতা বধূ ছিলেন তা এখন আর মনে পড়ে না। পানু ও বানুর গর্বিতা জননী কোলের চারবছরের মেয়েটির জন্যে মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে করেন। হরিনাথের যে বাজারে দু-হাজার টাকা দেনা রয়েছে এবং দেনার অঙ্ক প্রতিমাসেই বেড়ে চলেছে সেজন্যে যেন তিনিই দায়ী। পানু ও বানুর স্কুলের মাইনে দিতে না পারার লজ্জাটাও যেন তাঁরই। চারবছরের খুকু যে প্রায়ই অসুখে ভোগে সেজন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষী করবেন তিনি। এত অপরাধ, এত দায়িত্ব, এত লজ্জা, এত দোষ, তবুও তাঁর পাপের শাস্তি পূর্ণ হয়নি। বাকি ছিল নিজের ওপরে ঘেন্না। রোজ দু-বেলা স্বামী ও ছেলেদের খেতে দেবার সময়ে নিজেকে তাঁর মনে হয় অতি নীচ ও অপদার্থ। কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন, স্বামী ও ছেলেদের কাছে খাওয়ার ব্যাপারটা এখন হয়ে উঠেছে নিতান্তই গলাধঃকরণ। তাব মধ্যে পরিতৃপ্তি নেই। ফলে রান্নার ব্যাপারটাও তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে রীতিমতো একটা শাস্তি। রাগে দুঃখে মাঝে মাঝে তাঁর গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়।

আজ কিন্তু বাড়ির চেহারা একেবারেই অন্যরকম। সেই ভোর থেকেই শুরু হয়েছে তোড়জোড়।

আজ আর অসীমা চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন নি। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসেছেন। খুকুকে বললেন, খুকু, তুমি এখন উঠো না,

তুমি শুয়ে থাকো। খুকু মায়ের আঁচলটা চেপে ধরে বলল, তাহলে তুমি উঠছ কেন? খুকুর কপাল থেকে চুলের একটা গোছা সরিয়ে দিয়ে অসীমা বললেন, জানো না, তোমার বাবা আর দাদাদের আজ সকাল সকাল বেরোতে হবে যে!

তারপরে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে হরিনাথকে ডেকে তুললেন। পানু ও বানুকে ডাকতে হল না, সোরগোল শুনে তারা আগেই উঠে পড়েছে।

অসীমা বললেন, লক্ষ্মী বাবারা আমার, দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নাও, আমি তোমাদের খেতে দিচ্ছি।

খুকুর দুধ থেকে বাঁচিয়ে অল্প একটু দই পেতে রেখেছিলেন। ঢাকা খুলে দেখলেন দইটা খুব ভালো জমেছে। দেখে খুশি হলেন, খুশি হয়ে ভাবলেন যে সকলের হাতে কিন্তু দই ভালো জমে না। তাড়াতাড়ি চিঁড়ে ভিজিয়ে রাখলেন। তারপরে আক্ষেপের সঙ্গে ভাবলেন, কলা থাকলে বেশ হত।

খেতে খেতে হরিনাথ বললেন, দই-চিঁড়েই তো যথেষ্ট ছিল, আবার চা কেন!

অসীমা বললেন, কখন ফিরবে তার কি কিছু ঠিক আছে! চা না খেয়ে গেলে রোদ উঠলেই মাথা ধরবে।

পানু বলল, মা, তুমিও চলো না, বেশ মজা হবে।

বানু বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা চলো।

অসীমা হাসতে হাসতে বললেন, খুকুকে কে দেখবে শুনি!

হরিনাথ বললেন, খুকুর জন্যে আর তোমার জন্যে দই রেখেছ তো?

তিনজনে বেরিয়ে যাবার পরে অনেকদিন পরে অসীমার মনে হল, আপাতত তিনি কিছুক্ষণ কুঁড়েমি করেও কাটাতে পারেন। তখন খুকুর কাছে এসে বললেন, খুকু, আর শোয়া নয়। উঠে পড়ো। তোমার জন্যে দই-চিঁড়ে রেখেছি, খেয়ে নাও। তারপরে বই নিয়ে এসো, আমি আজ তোমাকে পড়াব। চার বছর বয়েস হল, এখনো তুমি অ-আ-ক-খ শিখলে না। ছি, ছি।

খুকুকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি যেন নিজের সঙ্গেই বলছেন এমনভাবে বলতে লাগলেন, জানিস খুকু, আজ আমরা সত্যিকারের মাছের ঝোল দিয়ে সত্যিকারের ভাত খাব। হ্যাঁ রে, দেখলি না, সকালবেলা তিনজনে বেরিয়ে গেল! লাইনে দাঁড়াতে হবে যে! একজন দাঁড়াবে মাছের লাইনে, একজন চালের লাইনে, একজন তেলের লাইনে। হ্যাঁ রে, আমাদের বাজারে আজ থেকে মাছ, চাল আর তেল পাওয়া যাবে। তোর বাবা কাল সন্ধের সময়ে বাজারে গিয়ে শুনে এসেছে যে। তোর বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না! এই বলে নিচু হয়ে খুকুর কপালে চুমু খেলেন।

খুকু মুখখানাকে গম্ভীর করে বলল, মা, আজ তাহলে খুব মজা হবে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

ভারতীয় সংহতির সমস্যা প্রসঙ্গে

ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা বহুকালের, কিন্তু তা নিয়ে কিছুটা তলিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়েছে মাত্র বছর কয়েক। শুরু হয়েছে, কারণ শুরু না করার আর যো নেই আমাদের। ইংরেজ শাসনকালে কথাটা থেকে থেকে নেতাদের বা দেশবাসীর মনে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূত্রে (সমস্যার অন্যতর রূপগুলি তখন তেমন জানান দেওয়া শুরু করেনি আমাদের দেশে)। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কাঁটা আমাদের মনে নিরন্তর খচ্‌খচ্‌ করলেও আর দু-চার বছর অন্তর এখানে ওখানে তার রক্তাক্ত প্রকটতায় আবহাওয়া বিষিয়ে উঠলেও, মোটের উপর আমাদের মধ্যে বেশ যেন একটা নিশ্চিন্ততাও ছিল এ ব্যাপারে। ভাবখানা এই যে, বিরোধকে ছাপিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী কারণ বিদেশী আধিপত্যের বিপক্ষে ভারতবাসীর প্রবল বিতৃষ্ণা তাদের শেষ অবধি মেলাবেই ইংরেজের বিরুদ্ধে। শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, বাঙালি-পাঞ্জাবি-মারাঠি-দক্ষিণী সবার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়দেব প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতর রূপে আমাদেব প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্য-

---

Problems of National Integration : Jolly Mohan Kaul—People's Publishing House, New Delhi. Rs. 5·50

Standing at the Cross-roads : Nirod Mukerji—Publishers, Allied Bombay. Rs. 12·00

> বিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপ অবলম্বন করিতে হইবে।

অসামান্য দূরদৃষ্টিবলে তিনি কিন্তু তখনই আমাদের সতর্ক করেছিলেন :

> এ-কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ-দেশ ত্যাগ করিবে, তখন কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।'

রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ সাবধানবাণীতে আমরা যথাসময়ে, যথোচিত কর্ণপাত না করায় তাঁর আশঙ্কা যে বহুলাংশে সত্যে পরিণত হয়েছে—সে-কথা অস্বীকারের আজ আর যো কোথায়? ভারতবিভাগ, এমন কি ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন সর্বব্যাপী রক্তপাত ও গান্ধীহত্যাতেও বিরোধের অবসান হয় নি আদৌ। বরঞ্চ সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, আঞ্চলিক, উপজাতীয়, জাতিভেদসংশ্লিষ্ট নিত্যনতুন বিরোধের তাড়নায় জাতীয় জীবন আজ একান্তই জর্জর। ভেদবুদ্ধির বিষময় প্রকোপ এত অতিকায় রূপ ধারণ করেছে যে অবশেষে সরকারের টনক নড়েছে। চিন্তাশীল মহলেও শুরু হয়েছে এ-সমস্যা নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামানো। জাতীয় সংহতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে পরের পর কয়েকটি মন্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান হয়েছে। ১৯৫৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সর্বপ্রথম আয়োজন করেন এক 'সেমিনারের'। তারপর সমস্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সম্মেলন আহুত হয় ১৯৬১ সনে। শিক্ষামন্ত্রীরা আলোচনার পর সম্পূর্ণানন্দজীর নেতৃত্বে ভাবগত সংহতির জন্য যে কমিটি (Committee on Emotional Integration) গঠন করেন ১৯৬২ সনে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আর ব্যাপকতর জাতীয় সংহতি সম্মেলনও প্রথম বিবৃতি প্রকাশের পর দ্বিতীয় দফা আলোচনা করেছে পরের বছর। কেবল সরকারী রিপোর্টই নয়, দ্বিতীয় বইটির লেখক শ্রীযুক্ত নীরদ মুখার্জি জানিয়েছেন যে শুধু ১৯৬১ সনেই না কি চারশোরও বেশি বই ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে এ-বিষয়ে। দেশের সরকার ও ভাবুকেরা যে সমস্যার

গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে বাধ্য হয়েছেন অবস্থাগতিকে—এর থেকে তার পরিচয় মেলে কিছুটা।

শ্রীজলিমোহন কাউলের ছোট বইটি লেখা ১৯৬১ সনের মাঝামাঝি যদিও তার প্রকাশকাল প্রায় একবছর পরে। লেখক তাই ভূমিকায় কিছু কুণ্ঠাভরে জানিয়েছেন যে চীনা আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর লেখা হলে স্বভাবতই এ বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় তাঁর জোর পড়ত ভিন্ন মাত্রার—হয়তো বা দু-একটি অধ্যায় পুনর্লিখিতও হত কিছুটা। তবু সমস্যার মূল চরিত্রের কোনো রূপান্তর ঘটে নি অবস্থান্তরেও—শুধু ঘটনার ফেরে তার প্রকটতা হয়তো কিঞ্চিৎ চাপা পড়েছে সাময়িকভাবে। সমস্যার চরিত্র ও তার সমাধানের পথ সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রাথমিক বক্তব্যের কোনো রদবদল করেন নি এই বিবেচনায়।

আরো এক বছর পর বইটি সম্পর্কে লিখতে বসে এই সুবিবেচনার জন্য শ্রীযুক্ত কাউলকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ ইতিমধ্যে আমরাও পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে কয়েক হাজার নরহত্যা ও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস বা লুট করেছি, দক্ষিণ দেশে দ্রবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর আবার ভারতীয় সংবিধান পোড়ানোর তোড়জোড় চালাচ্ছে, কাশ্মীরের প্রশ্নেও নব জটিলতার উদ্ভব হয়েছে শেখ আবদুল্লার মুক্তি ও জওয়াহরলালের মৃত্যুর ফলে। আর রক্তক্ষয়ী নাগা-সমস্যার চূড়ান্ত সুরাহার সম্ভাবনাও এখনো পর্যন্ত যথেষ্টই অনিশ্চিত।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিক হিসাবে শ্রীযুক্ত কাউল সুপরিচিত। তাঁর পক্ষে তাই অ্যাকাডেমিক নির্লিপ্ততাভরে এমন সমস্যার অবতারণা বা আলোচনা স্বাভাবিক নয়। তিনি প্রশ্নটিকে দেখেছেন মুখ্যত ভারতীয় রাজনীতির এক জীবন্ত ও জটিল সমস্যা হিসেবে, যার যথাযথ সমাধানের উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল আমাদের ভবিষ্যৎ। সমস্যার উৎস-সন্ধানে ইতিহাসের গভীরে পথ-হাতড়ানোর চাইতে তাই তার নিরাকরণের বাস্তব কর্মকাণ্ড-প্রণয়নের দিকেই তাঁর ঝোঁক। সমস্যার মতোই সমাধানের রূপও তাঁর চোখে প্রধানত রাজনৈতিক।

'রাজনৈতিক' কথাটিকে এক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থে ধরলে অবশ্য শ্রীযুক্ত কাউলের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির

সমস্যা যে মূলত এ-দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরসাধন ও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ব্যাপকতর সমস্যার অঙ্গ—এ-বিচারই হচ্ছে তাঁর আলোচনাব ভিত্তিস্বরূপ। এই ভিত্তির 'পরে রচিত তাঁর মূল বিশ্লেষণ-পরম্পরা এই ধরনের :

বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ-দেশের মানুষের মনে মোটের উপর একটা অখণ্ড ভারতবোধ ছিল। তবু ইতিহাসের গতিপথে ক্রমেই এখানে উদ্ভব হয়েছে নব নব বৈচিত্র্যের। ধর্ম, জাত, ভাষা প্রভৃতি নানা ধরনের বৈচিত্র্যের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলিকে আশ্রয় করে ক্রমে জমে উঠেছে বিচিত্র স্বাজাত্যবোধের উপাদান। ইতিহাসের প্রক্রিয়া দু-দিক থেকে ত্বরান্বিত হয়েছে ইংরেজেব সংস্পর্শে। একদিকে আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেমন ভারতের ঐক্যবোধ জেগেছে, তেমনই আবার প্রধান প্রধান ভাষাগুলিকে অবলম্বন করে দানা বেঁধে উঠেছে বেশ কয়েকটি জাতি—আরো কয়েকটি গড়ে ওঠাও বিচিত্র নয় ভবিষ্যতে। এর মূলে আছে ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমপ্রসার। সর্বভারতীয় বাজারকে সুসংহত করার তাগিদে সব থেকে প্রতিপত্তিশালী ধনিকমহল যেমন ভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় বিশেষ তৎপর, তেমনই আবার মূলত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ধনিকদের ঝোঁক বিভিন্ন জাতির পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকেই। উভয় পক্ষই শোষণের জন্য উন্মুখ বলে এ দুইয়ের মধ্যে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয় এবং সে-সংঘাতের তাড়নায় দুই প্রয়াসের অন্তর্নিহিত সত্যই বিকৃত রূপ ধারণ করে। বড় তরফ ভারতীয় ঐক্যের দোহাই পেড়ে বিভিন্ন জাতির উপরে জবরদস্তি চালাতেও পিছ্‌পাও হয় না আর ছোট তরফ প্রত্যেক জাতির স্বাধিকারের নামে উৎকট কেন্দ্রবিরোধী বা অন্য জাতিবিরোধী সংগ্রামে মেতে ওঠে। ফলে এদের হাতে প্রায়শই বিপন্ন হয় ভারতের ঐক্য এবং বিভিন্ন জাতির স্বাধিকার। সুতরাং বহুজাতিক ভারতবর্ষে বিচ্ছেদের অধিকার সমেত বিভিন্ন জাতির স্বাধিকারকে স্বীকার করেই শুধু সম্ভব ভারতের সংহতিসাধন অর্থাৎ বহুজাতির স্বেচ্ছামিলনেই ভারতীয় মহাজাতি গঠন। বিচ্ছেদের অধিকার দিলে বিচ্ছেদ ঘটবে না, বরঞ্চ ঐক্যই সুপ্রতিষ্ঠ হবে। আর সে দায়িত্বপালন নির্বিঘ্নে ঘটতে পারে যদি কোনো শোষক শ্রেণী নয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই যদি সে-কাজে নায়কতা করে।

ভারতীয় সংহতি সমস্যার মূল চরিত্র এই হলেও বর্তমানে তার যে-দিকটি উদগ্র রূপে সমগ্র জাতীয় জীবনকে থেকে থেকে বিপন্ন করছে সেটি হল সাম্প্রদায়িকতা। লেখকের মতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান—সব সাম্প্রদায়িতাই বীভৎস। তবু তার ভিতরেও এ-দেশে সবচাইতে বিপদজনক হচ্ছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, ঠিক যেমন পাকিস্তান রাজনীতিতে প্রধান দুষমন হচ্ছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। সাম্রাজ্যবাদী ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রীদের সব থেকে মারাত্মক হাতিয়ার এটি। কারণ ধর্মের নামে মানুষকে অন্ধ করে তোলা সহজ আর একবার তা করতে পারলে সমস্ত সুস্থ ও শুভবুদ্ধির অবসান ঘটিয়ে অনায়াসে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় গণতন্ত্রবিরোধ ও পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীলতার শিবিরে।

চরিত্রের দিক থেকে এর দোসর হচ্ছে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ সমস্যা। এর দুই রূপ 'উচ্চ'-'নীচ' জাতের সংঘাত এবং দুই 'উচ্চ' জাতের সংঘাত। এর মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে তফশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ তথাকথিত নীচ জাতের মানুষ আবার অর্থনৈতিক দিক থেকেও সব থেকে শোষিত ও প্রপীড়িত। ক্ষেতমজুরদের এক বিরাট অংশও এরাই। আর 'উঁচু জাতের' সংঘাত বিহারের মতো রাজ্যের রাজনীতিতে যে কী দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে থাকে তাতো সুবিদিত।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা তথাকথিত নীচ জাতের ভিতরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বা 'উচ্চ' জাতের অত্যাচার, অবিচার বা বৈষম্যমূলক আচরণেব বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জাগে তা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। তাকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা বা 'উচ্চ জাতের' জাত্যাভিমানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কোনোক্রমেই উচিত নয়। কিন্তু একান্তভাবে নিজ সম্প্রদায় বা জাতকে আঁকড়েও আবার সমস্যার সমাধান হয় না। বরঞ্চ তাতে বিপথচালিত হবার আশঙ্কা যথেষ্টই। যেমন তামিলনাডে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজগম আন্দোলনের উদ্ভব 'ছোট জাতের' মানুষের ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন হিসেবেই।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা তথাকথিত নীচ জাতের ঐ স্বাভাবিক ক্ষোভ বাদ দিলে সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিভেদ হচ্ছে সর্বৈব মন্দ। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সর্ববিধভাবে—আইনের সাহায্য, শিক্ষা মারফৎ এবং মৌলিক সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কারের সহায়তায়। এর সঙ্গে ভাষাগত, আঞ্চলিক, সংখ্যালঘু বা আদিবাসী সমস্যা ঠিক এক পর্যায়ের নয় (যদিও

সঠিক ব্যবস্থা না হলে এগুলিও যে বহু অনর্থের হেতু হতে পারে তা ১৯৬০ সনের আসাম দাঙ্গা বা এখনো যার চূড়ান্ত অবসান ঘটে নি সেই নাগাবিদ্রোহের দিকে তাকালেই বোঝা যায়)। কারণ এ-সবের একটা গণতান্ত্রিক সারবস্তু আছে যার উৎস বিভিন্ন জাতি উপজাতির স্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের কামনা। এই ন্যায্য কামনা দমনের চেষ্টা করলেই তার থেকে সৃষ্টি হয় বিপত্তির, যেমন ঘটেছিল হিন্দী চাপানোর জবরদস্তি এবং আরো প্রকটভাবে ভাষাগতভাবে রাজ্যপুনর্গঠনের দাবির ক্ষেত্রে (সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও তার পর শাসক দল—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এ-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গজনিত ক্ষোভও দেশবাসীকে উত্তেজিত করেছিল)।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য যথোচিত উন্নয়নব্যবস্থা গ্রহণ, আর বিচিত্র ভাষাভাষী জাতি, উপজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা মারফতেই শুধু এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এরই সঙ্গে সংগতি রেখে সংবিধানে উল্লিখিত প্রধান ১৩টি ভাষাকে (সংস্কৃত বাদে) সমভাবে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং শুধু বিভিন্ন রাজ্যের ও ভাষাভাষীর মধ্যে সংযোগের ভাষা হিসেবেই ক্রমে চালু করতে হবে প্রচলিত হিন্দুস্তানী।

আদিবাসীদের সমস্যা আবার কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ অন্যান্যদের মতো এদের ততটা আলোড়িত করে নি। শিক্ষাদীক্ষার মাপকাঠিতেও এরা অনগ্রসর। ফলে জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে এরা মোটের উপর বিচ্ছিন্ন। তার উপরে মান্ধাতার আমলের উপকরণই এদের অধিকাংশের জীবিকা অর্জনের সম্বল—আর যারা কয়লাখনি, চা বাগিচা বা শহরের কলকারখানায় কাজ করে, অদক্ষ মজুর হিসেবে তারা মাইনে পায় সব থেকে কম এবং তাদের দুর্গত অবস্থার থেকে উদ্ভব হয় নানা সামাজিক বিপত্তিরও। এদের সম্পর্কে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত। কেউ কেউ মনে করেন আদিবাসীদের অপাপবিদ্ধ আদিমতায় সুরক্ষিত করাই আমাদের কর্তব্য, প্রত্নতত্ত্বাগারের সাজানো সামগ্রীর মতো। অন্যেরা বলেন যে যত দ্রুত সম্ভব, যে-কোনো মূল্যেই এদের মিলিয়ে দিতে হবে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের মূলপ্রবাহের সঙ্গে—শেষপর্যন্ত সেটাই

নাকি ন্যূনতম যন্ত্রণার পথ। আবার তৃতীয় একদল মনে করেন যে ঐ মিলন কাম্য হলেও তার জন্য নিশ্চয়ই এদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে না। ভাষার প্রশ্নের মতো এ-ক্ষেত্রেও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ ধৈর্য ধরতে হবে—তাড়াহুড়া করলে হিতে বিপরীত হবে। তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে একমত হয়ে লেখক ব্যাপারটা যাতে নির্বিঘ্নে সমাধা হতে পাবে তার জন্য প্রস্তাব করেছেন, যেখানে এরা এক এক অঞ্চল জুড়ে বেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে বাস করে সেখানেই 'স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল' বা 'এলাকা' প্রতিষ্ঠার। কিন্তু এ-দেশের সংবিধানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে-ব্যবস্থা আছে আসলে তা রাজ্যপালের নিরঙ্কুশ শাসনেরই নামান্তর। তাতে কোনো ফল হবে না। বরং হুবহু নকল না করেও সোভিয়েতের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে এ-ব্যাপারে।

জাতীয় সংহতির প্রশ্নে এই সাধারণ নীতি নির্দেশ ছাড়াও শ্রীযুক্ত কাউল খুঁটিনাটি বহু মূল্যবান প্রস্তাব বা মন্তব্য করেছেন প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়েই। যেমন সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে জাতীয় সংহতি সম্মেলন এ-ব্যাপারে যে আচরণবিধির প্রস্তাব করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য হলেও সংবাদপত্রের মালিকানা যদি এখনকার মতো একচেটিয়া মালিকাধীনই থাকে তাহলে আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা থেকে থেকে দেখা দেবেই। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাভের একান্ত ন্যায্য কামনাকে বিকৃত ক'রে সংকীর্ণ প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক মনোভাবে পরিণত করে ঠিক এই মালিকেরাই এবং সে অপকর্মে তাদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল সংবাদপত্র। তাই প্রস্তাবিত আচরণবিধি বর্তমানে কঠোরভাবে পালনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকানা খর্ব করার চেষ্টাও চালান দরকার ভারতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে।

শ্রীযুক্ত কাউলের আর দুটি প্রস্তাবও প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন রাজ্যের এবং সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার দিকে নজর রাখার জন্য তিনি যথাক্রমে কেন্দ্রে রাজ্য-পরিষদের বদলে সোভিয়েত আদর্শে জাতিপরিষদ স্থাপন এবং স্থায়ী সংখ্যালঘু কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। অবশ্য তিনি রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সঙ্গে একমত যে 'কোনো গ্যারান্টিই রাজ্যসরকারের তরফের সমস্ত রকম বৈষম্যমূলক আচরণের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে

পারে না। রাজ্যস্তরের সরকারী কাজকর্ম মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককেই প্রভাবিত করে আর গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণেব কামনা ও রাজনৈতিক মানের প্রতিফলন করতে বাধ্য। সুতবাং ক্ষমতা যাদের হাতে তারা যদি সংখ্যালঘুদের প্রতি বিরূপ হয় তবে এদের ভাগ্য অনিবার্যভাবেই শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই সংখ্যাগুরুদেব তরফের ন্যায়বোধ আর সংখ্যালঘুদের তরফ থেকে তেমনি রাজ্যের সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল অগ্রগতির পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিজেদের খাপ খাওয়ানোব দায়িত্ব—এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না।' যুক্তিটা বিভিন্ন বাজ্যের স্বার্থবক্ষাব ব্যাপাবেও সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই কাজটা নিছক শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ উদ্ভাবনের মাত্র নয়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সমাজিক-শিক্ষাগত-সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু, সমস্ত মানুষের মন পরিবর্তনই এখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের আমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর-সাধনের মৌল প্রশ্ন থেকে এ-প্রশ্নকে স্বতন্ত্র করা চলে না কোনোক্রমে।

ভারতীয় সংহতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত কাউলের এই মতামত সুস্থ ও শুভবুদ্ধিচালিত। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, নিপুণ বিষয়বিন্যাস এবং বচনার প্রসাদগুণে তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বইটির স্বল্প আয়তনের মধ্যেও। তবে দু-একটা ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ আরো একটু গভীর হলে ভালো হত। যেমন আমাদের জাতীয় সংহতি সাধনের পথে এক প্রধান অন্তরায় হিসেবে লেখক গণ্য করেছেন শাসকশ্রেণী ও দলের প্রতিশ্রুতিভঙ্গকে, বিশেষ করে ভাষাগত রাজ্যগঠনের মতো ব্যাপারে। কথাটা ঠিক। এও ঠিক যে একমাত্র উত্তাল গণ-আন্দোলনের চাপেই তাঁরা মত পবিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন শেষপর্যন্ত। কিন্তু এই শাসক-শ্রেণী ও দলই আবার জাতীয় সংহতি সমস্যার আর-এক গুরুত্বপূর্ণ দিক—সাম্প্রদায়িকতাব (এবং জাতিভেদের মতো সামাজিক প্রশ্নেও) ক্ষেত্রে মোটের উপর সুস্থ মনোভাব বজায় রেখেছে এবং তদনুসারে কাজও করেছে কিছুটা। অল্প-বিস্তর দুর্বলতা নিশ্চয়ই দেখা গেছে কখনো কখনো, যেমন কম-বেশি দেখা গেছে অন্যান্য দলের ক্ষেত্রেও আর শাসক পক্ষের দুর্বলতাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি মারাত্মক দেশের পক্ষে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ ঠিক ওঠে না তার বিরুদ্ধে, বড জোর দুর্বলভাবে প্রতিশ্রুতি-পালনের অনুযোগ করা চলে। আর জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রের যে জরুরী

প্রসঙ্গটির উল্লেখ তিনি কেন জানি একবারও করেন নি তাঁর লেখায়—সামন্ততন্ত্রের দুর্গ সেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভেঙে ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের ভিতরে তাদের পুনর্বিন্যস্ত তো করেছিল ঐ শাসকশ্রেণী ও দলই। আর সে কাজ প্রধানত যে-নেতা সমাধা করেছিলেন কংগ্রেসী রাজনীতিতে সঠিকভাবেই তাঁর পরিচয় নির্ভেজাল দক্ষিণপন্থী হিসেবে। এও লক্ষণীয় যে দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের কথা বাদ দিলে শাসক দল কাজটা তখন সম্পন্ন করেছিল মোটের উপর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই। কাজেই জাতীয় সংহতির এই তিনটি জরুরী প্রশ্নে একই শ্রেণী বা দল বা সরকারের কেন এমন বিভিন্ন আচরণ—তার কোনো বিশ্লেষণ লেখক করেন নি। ধনিকশ্রেণীর ভিতরে সর্বভারতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিসরেই বিশেষ করে প্রতিপত্তিশীল বলে তিনি যে দু-পক্ষকে চিহ্নিত করেছেন তাদেব স্বার্থসংঘাত সাম্প্রদায়িকতার বা দেশীয় রাজ্যের প্রশ্নের চাইতে ভাষাগত রাজ্যগঠনের ক্ষেত্রে সমধিক বলেই কি এই আচরণবৈচিত্র্য ?

আর-একটি কথা। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রীযুক্ত কাউল সমস্যা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন সেটি নিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদী। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে ঐ দৃষ্টিভঙ্গির (এবং কার্যক্ষেত্রে সোভিয়েতের দৃষ্টান্তে) গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং তার সাহায্যে যে সাধারণ নীতিগুলিতে তিনি পৌঁচেছেন সেগুলিও নিশ্চয়ই নির্ভুল। কিন্তু এও মানতে হবে যে সঠিক সাধারণ নীতিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগকালে অতীতে অনেক সময়ে বিপত্তিও দেখা গেছে। পাকিস্তানের দাবির ব্যাপারে দুর্বলতা ও সতেরোটি সংবিধান-পরিষদের ভ্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্যে একদা প্রকট হয়ে উঠেছিল ঐ নির্ভুল মূল নীতিরই অপপ্রয়োগ। অবশ্য পরে এই ভুলের সংশোধন হয় আর শ্রীযুক্ত রজনী পাম দত্তের মতো মার্কসবাদী সুপণ্ডিত তখনই এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন এও মনে রাখা দরকার। তবু কেন এমনটা হতে পারল, তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই বইয়ে সম্ভব না হলেও ইঙ্গিতে তার কিছুটা হদিশ পেলেও পাঠকের উপকার হত। মুসলীম লীগের ধর্মান্ধতাকে বহুলাংশে উপেক্ষা করে তার গণভিত্তিকেই একান্ত করে দেখা নিশ্চয়ই সেদিনকার মৌলিক ভ্রান্তি। তাছাড়াও বিভিন্ন জাতির বিচ্ছেদের অধিকার সমেত পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত মহাজাতি গঠন—মার্কসবাদের এই দু' ফলা সূত্রের ভিতরে কার্যক্ষেত্রে তখন প্রথমটির

উপরেই কি অতিরিক্ত জোর পড়ে নি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর নায়কতায় শ্রমিক বিপ্লবের সময়ে ও তার পরে যে-কাজ সহজসাধ্য হয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই সম্ভাব্য মনে করা হয় নি ? এ প্রশ্নকে আজ শুধু ময়না তদন্তের সামিল মনে করলে ভুল হবে। কারণ আজো এ সমস্যা রয়েছে অবশ্যই অন্তরূপে। কারণ রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই ভারতীয় সংহতি সম্ভব—এই মূল সত্যকে, ঐ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হলে আপনা থেকেই ভারতীয় সংহতি সুসাধ্য হয়ে উঠবে—এই সরলীকরণে পর্যবসিত করার ঝোঁক আজো কি সম্পূর্ণ কেটেছে ? প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি কথায় কথায় যে রাজ্যে বুদ্ধিজীবী মহলেও 'স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাঙলা' ও 'জাগো বাঙালির' রণধ্বনিতে উদগ্র হয়ে ওঠে সেখানে কি মার্কসবাদীরা যথেষ্ট সচেষ্ট ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে ?

পরবর্তী সংস্করণে আশা করি শ্রীযুক্ত কাউল এ সব দিকে আরো একটু তলিয়ে বিচার করবেন। ইতিমধ্যে তাঁর বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং এমন জরুরী বিষয়ে বাংলা ভাষাতেও যাতে অবিলম্বে এ-ধরনের প্রবেশিকা প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থার জন্য দেশের চিন্তাবিদদের কাছে আবেদন জানাই।

শ্রীযুক্ত নীরদ মুখোপাধ্যায়ের Standing at the Cross-reads স্বতন্ত্র ধরনের বই। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে জাতীয় সংহতি সাধনায় প্রেরণা যোগানো তাঁব উদ্দেশ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য শুধু সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সমস্যার বিচার। শেষ অধ্যায়ের সূচনাতেও তিনি বলেছেন ভারতীয় এক জাতি তত্ত্বের দাবিকে তিনি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে খতিয়ে দেখিয়েছেন অ্যাকাডেমিক ধরনের যুক্তির সাহায্যে। এই অ্যাকাডেমিক দৃষ্টির দরুণ শ্রীযুক্ত কাউলের মতো কোনো সমাধানে পৌছোনোর ব্যাপারে তাঁর তেমন ব্যগ্রতা নেই। আবার মনোবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তিনি তাঁর বিচারক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন মনঃ-সামাজিক সংহতির (Psycho-social Integration) মৌল সমস্যাদি-বিশ্লেষণের চৌহদ্দীর ভিতরেই (বইয়ের উপশিরোনামা দ্রষ্টব্য)।

একদিক থেকে এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা অনস্বীকার্য। সমস্যাকে তলিয়ে বোঝার কোনো চেষ্টা না করে কোনোমতে তড়িঘড়ি সমস্যার সমাধানের ঘাটে পৌছোনোর মনোভাব বহু ক্ষেত্রেই এত প্রকট যে আর কিছু না হোক তার প্রতিষেধক হিসেবেও এর মূল্য অনেকখানি। তাছাড়া আশু, অব্যবহিত ও সাময়িকের চাপ এড়িয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছোনোর

চেষ্টার জন্য খানিকটা নির্লিপ্ত দৃষ্টির হয়ত প্রয়োজন আছে—এই বইটির মধ্যে তার প্রমাণ মিলবে যথেষ্ট। তবু এর সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখা দরকার। তার প্রমাণও এই বইয়ে পাওয়া যায় কিছু কিছু। দু' দিকেরই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে বহুল প্রচারিত ধারণা, জাতীয় সংহতি সম্মেলনের রিপোর্টের এ-সম্পর্কিত কিছু কিছু মন্তব্য, বিশেষ করে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের দু' চারটি বক্তব্যকে উপলক্ষ করেই বইটি মূলত লেখা। লেখকের মতে এই ধারণা মূলত sentimental। আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির দরুণই অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনায় গভীরতা ও বস্তুনিষ্ঠার অভাব দেখা যায় আর বর্তমান অবস্থা অনুধাবনে কোনো যথাযথ সমীক্ষার ব্যবস্থাও হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে বিশেষ করে এই কারণে যে আমরা ক্রমাগত একালের মাপকাঠিকে প্রয়োগ করছি অতীতকে বোঝার ব্যাপারে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু তথ্যযোগে লেখক দেখিয়েছেন যে সত্যই অমন কোনো ঐক্যবোধ তখন ছিল না ভারত জুড়ে আর তাই প্রকৃত ভারতীয়ের জন্ম হয়েছে আসলে ইংরেজের আবির্ভাবের পরেই। তার কারণ এই আধুনিক কালেই শাসনতান্ত্রিক ঐক্য এবং সত্যকার Common Law-র প্রাদুর্ভাব বাস্তব ভিত রচনা করেছে সর্বভারতীয় নাগরিকত্বের তথা ভারতীয় ঐক্যের। সেই প্রক্রিয়াই আরো অগ্রসর হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার পর।

মানতেই হবে এই বক্তব্যটি জনপ্রিয় নয়। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লেখকের তথ্য সমাবেশ যথেষ্ট জোরালো। আর ভারতের সুপ্রাচীন ঐক্যবোধ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার পিছনে এক ভাষার (অবশ্যই হিন্দী) প্রাধান্যের ভিত্তিতে ভারতের একজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক কালের প্রভাবশালী মহলের 'হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্তানে'র ধারণা যে অনেকটাই কার্যকর লেখকের এই অনুমানও যথার্থ। তবে শিথিল হলেও এক ধরনের ভাবগত ঐক্যবোধ যে এদেশে বহুকাল থেকেই চালু ছিল—এর পক্ষেও তথ্য ও যুক্তি আছে যথেষ্ট। একেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না একেবারে।

কিন্তু লেখক একজাতি তত্ত্বের বিরোধী বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে শ্রীযুক্ত কাউলের মতো তিনিও বহুজাতিক ভারতবর্ষে বিশ্বাসী। কোনো কোনো জায়গায় এমন ধারণা তাঁর লেখা থেকে কিছুটা পরোক্ষ প্রশ্রয় পেলেও

এক জায়গায় (৮০ পৃষ্ঠায়) তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন যে বহুজাতির অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাসী নন। এর কারণ মিল্ থেকে স্তালিন পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তাবিদদের সংজ্ঞায় উল্লিখিত nationality-র বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে nationality বলে আসলে কোনো পদার্থই নেই—বড় জোর ethnic group-এর অস্তিত্ব পর্যন্ত তিনি মানতে পারেন !

আবার এই সিদ্ধান্তকেই অংশত খণ্ডন করে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অন্যত্র বলেছেন যে nationality-র ধারণার পিছনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক (socio-cultural) উপাদানের অস্তিত্ব না থাকলেও রাজনৈতিক-আইনগত উপাদান নিশ্চিতভাবেই আছে। ভাবগত ঐক্য তাঁর কাছে নিছক 'ভাই-ভাই' মনোভাবের সামিল এবং তার সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা বইয়ের সর্বত্রই প্রকট। কিন্তু বাস্তব উপাদান হিসেবেও তিনি শুধু রাজনীতি ও আইনকেই দেখেছেন—খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার বইয়ের কোথাও তিনি ভারতীয় ঐক্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি—ভারতজোড়া বাজারের উল্লেখ-মাত্রও করেন নি।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

পূর্বদিক

পূর্বদিক থেকেই আবার সূর্য উঠবে, এ কথা আমি বার বারই বলেছি, আবার আজও বলছি। কেননা বার বার বললেও বেশি বলা হয় না, কেননা আজ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাঙালি-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালিদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়টা এত শোচনীয়ভাবে ভেঙে গেছে যে বলার নয়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায়, আর অপর দল পশ্চিম থেকে পূর্বে উদ্বাস্তু হয়ে যখন উঠে গেল, তখন গোটা বাঙালি জাতটাই যে স্থান হিসাবেই উদ্বাস্তু হল তাই নয়, মনের দিক থেকেও উদ্বাস্তু হয়ে গেল, আত্ম-উৎপাটিত হয়ে গেল। যাদের বাড়িঘর পাল্টাতে হয় নি, তাদের জীবনে, সমাজে, মনেও এর প্রভাব পড়ল। আরও পাঁচটা কারণ এসে এমন ভাঙন ধরিয়ে দিল যে সবটা মিলে যে ছবিটি আজ দেখছি তা যেমন করুণ তেমনি লজ্জাকর। আর সমস্তটা যেন অন্ধকার। এমন দিনে সূর্য আবার পূর্বদিক থেকেই উঠবে এ-কথাটা যেন একটা অলীক স্বপ্ন—যা কেবল একটা দীর্ঘশ্বাসই বহন করে আনে।

গঙ্গা যমুনা মেঘনা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ঘেরা নদীমাতৃক এই অঞ্চলের অধিবাসীরা চিরকালই নদীর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে, এপার ভেঙেছে ওপারে উঠে গেছে, চর পড়েছে—নতুন করে বসতি করেছে। রক্তের মধ্যে এই ভাঙা-গড়ার জন্য প্রস্তুতি আছে বাঙালিদের। বিরাট সৌধ ও কীর্তি এ-অঞ্চলে দেখা যায় নি, সবই যেন ভঙ্গুর, অথচ গতিশীল। অধিবাসীরা চরিত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে যে ভাঙন এল—সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল—এত বড় ভাঙনের জন্য এরাও প্রস্তুত ছিল না। কাজেই ভাঙন সামলে নিতে তাদের বেগ পেতে হবে—কিন্তু সামলে নেবেই—সে কেবল নদীর এপারে ওপারে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাঙ্গনে।

আজ অবশ্য কেউ বলবার নেই যে আজ যা বাংলা ভাবে আগামী কাল ভারত তাই ভাববে। এমন দাবি আজ আমরা লজ্জায় উচ্চারণ করতে পারি না। সেদিন এমন ভাবা গিয়েছিল কেন? বাংলার মনীষাই একদিন ভারততীর্থের মূর্তিকে রচনা করেছিল, বাংলার শহীদেরা দলে দলে স্বাধীন ভারতের সেই মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিল, বাংলা থেকেই নেতাজীর বাণী সৃষ্টি হয়েছিল—জয় হিন্দ, দিল্লী চলো। এত সব সাহিত্য, কাব্য, কর্ম, প্রাণোৎসর্গ ও সংগ্রাম যারা করেছিল, তাদের দেশে যখন এই দুর্দশা নেমে এল, কোনো কিছুরই মূল্য দাঁড়াল না, তখন স্বভাবতই একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হল নতুন জেনারেশনের উপর। তারা দেখতে পেল রাজনীতি করলে কী হয় শেষ পর্যন্ত, উঞ্ছবৃত্তি করে শেষ বয়সটা কাটাবে হয়তো? দূর ছাই রাজনীতি, আদর্শ—এসব, এগুলি ধোকা মাত্র, আত্মবঞ্চনার অভিমান মাত্র। অথচ জীবনে 'বাস্তবতার' অনুসন্ধানে সার্থকতাও মিলছে না। সুবিধাবাদী হয়েও উপায় নেই। সুবিধাবাদ যদি সবাইকে সুবিধা দিতে পারত তবে তো চলতই, ঘুষ নিয়ে দুর্নীতি করে যদি সবার চলে তবে ঘুষটা অপরাধ হয় না। মিথ্যা, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার এগুলি শেষ পর্যন্ত মানুষকে রক্ষা করতে পারে না বলেই, লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকেই তা বর্জনীয় হয়ে এসেছে, এবং ওগুলি সমাজে দেখা দিলেই সমাজের অবচেতন মন ক্ষুব্ধ, শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, অস্বাভাবিক ব্যাধি বিশেষ, এগুলিকে নিয়ে আমরা বেশি দিন ঘর করতে পারি না, সমাজ দেশ তো দূরের কথা। ফলে সততা, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির কথা বারে বারেই প্রতিক্ষণেই আমাদের 'বিবেক দংশন' করতে থাকে। এই বিবেকটা আর কিছুই নয় মানবজাতির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটা নির্যাস; যেদিন থেকে আমরা মানুষ হয়েছি, সেদিন থেকেই এর জন্ম, এটা এমন কোনো বোঝা নয়, বা ক্রুশ নয়—যেটা ফেলে দিলেও আমরা মানুষ থাকতে পারি অথবা মনুষ্যত্ব বাদ দিয়েও মানুষ বাঁচতে পারে। পশু যেমন পশুত্ব ছাড়া বাঁচতে পারে না, মানুষও মনুষ্যত্ব ছাড়া বাঁচতে পারে না। অসম্ভব।

ছবি এসেছে, সিনেমা এসেছে, টেলিভিশান আসছে, যন্ত্রদানব এসেছে অথবা যন্ত্রদেবতা এসেছে, বিদ্যাবিস্তারের বহু রকমের পথ খুলে গিয়েছে, মানুষ সমাজকে ফাঁকি দিয়ে যা-তা করতে পারছে, এবং করে পার পেয়ে

যাচ্ছে দিব্যি, ভোগের নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার হচ্ছে, তবে কি মনুষ্যত্বের কোনো প্রয়োজন নেই? একটু রুটি আর কিছু মজা (Bread and Circus) হলেই মানুষের চলবে? অসম্ভব। মনুষ্যত্বের অভাবে এসব বস্তুবাহুল্য একটি বিষকুণ্ড সৃষ্টি করে ছাড়বে, এবং শেষ পর্যন্ত ভোগও সম্ভব হবে না, মানুষ শুধু উদ্বাস্তু হবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। নবাগত নতুন সভ্যতার বিপুল বাস্তব সম্ভাবনাকে ভোগ করতে হলেও মনুষ্যত্বের পরিধিটাকে তদনুরূপ বিস্তৃত করতে হবেই। মনুষ্যত্বের দায় কমে নি, বেড়েছে এবং বাড়বে। নইলে মহতী বিনষ্টি হবে—হতে বাধ্য।

এমন দুর্দান্ত চাপ, এমন কঠিন সমস্যা ও অগ্নিপরীক্ষা আজ ভারতবর্ষে কাদের কাছে সবচেয়ে বেশি নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে? কাদের জীবন নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে? কাদের জীবন এমন বেপরোয়া পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে যখন মৃত্যু নয় জীবন দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে? কাদের জীবনে পশ্চাৎ অপসরণের পথ রুদ্ধ দেয়ালে এসে ঠেকে গেছে? এই বাঙালিদের—হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়ে বাঙালিদের—পূর্ববাংলা ও পশ্চিম-বাংলার অধিবাসীদের। স্বাধীনতার জন্য, প্রগতির জন্য, ভারতের জন্য যারা মূল্য দিয়েছিল বেশি তাদেরই। মনে হয় এ বুঝি ইতিহাসের আদর্শের স্বপ্নের নিষ্ঠুর পরিহাস। কিন্তু এটা পরিহাস নয়, চলার পথে একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর। আধাপথে এসে মনে করার কারণ নেই চলা আমাদের শেষ হল—গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছি। তা মোটেই নয়।

যারা চলে, তাদেরই চলার ভঙ্গির দুর্বলতা ধরা পড়ে। যারা ভার নেয়, তাদেরই উপর ভারের বোঝা পড়ে। যারা চলে না, ভার নিতে গররাজী, তাদের সমস্যা তত নয়—অন্তত এ জাতীয় নয়।

কয়েকটি প্রতিভা, কয়েকটি শহীদ, কয়েকটি নেতা সৃষ্টি করে দিয়ে আমরা যদি ভেবে থাকি খুব করা হয়েছে, তা তো হয় না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম এঁদের জন্ম দিয়ে বাংলা আমাদের বিপদেই ফেলে গেছে। এরা নিখিল ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছে, নিখিল মানুষের দরবারে আমাদের টেনে নিয়ে গেছে। এরা সমস্ত ভারতের সমস্ত মানুষের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এদেরকে স্বীকার করব, এদের জন্য গৌরব অনুভব করব, এদের স্মৃতিবার্ষিকী পালন করব, অথচ দেশের দায়িত্ব নেব না, পালিয়ে যাব—একি কখনো সম্ভব? যদি ঘাড়ে বোঝা

নিয়েছ, তবে তাকে শেষ পর্যন্ত বহন করতেই হবে। আর এই বোঝা বহন করতে গিয়ে দেখা যায়, আমাদের অনেক দুর্বলতা ছিল, সংকীর্ণতা ছিল—এঁরা থাকা সত্ত্বেও, এঁদের ত্যাগ কর্ম সাধনা মহিমা থাকা সত্ত্বেও। সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকেই দেখান, দেখিয়েছেন কাজেই তাদের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা এমন বেপরোয়া অবস্থায় পড়ে নি, যেমন অবস্থা এ অঞ্চলের লোকদের—কিন্তু এই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছিল একটা আদর্শ রূপায়িত করার প্রেরণা ও প্রয়োজন থেকেই, ভারতের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বপ্ন ও সাধনার সংগ্রাম থেকেই। আর যা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে আজ পর্যন্ত—তার দায় দায়িত্ব অন্যদের অর্পণ করবার লোভ পরিত্যাগ করে নিজেদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্মেই তার অনুসন্ধান করতে হবে। চরিত্রের ত্রুটিগুলি, চিন্তার ভুলত্রুটিগুলি এবং আদর্শের অপর্যাপ্ততা দূর করতে হবে—তবে যাত্রা আমাদের আবার শুরু হবে।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হাজার বছরের বিরোধিতা, জাতি ও উপজাতিসমূহের মধ্যে সংহতির অভাব, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যের অভাব—এসব ঐতিহাসিক দুর্বলতাকে দূর করে এক মহান ভারত সৃষ্টির দায়িত্ব যদি আমরা একদা নিয়েই ছিলাম—এত বড় সাহস ও স্বপ্ন যখন আমাদের ছিল, তবে তা সম্পূর্ণ করার দায়িত্বটা এবং তার জন্য দুঃখ বরণটা ও মেহনতটাকে আজ আমরা অভিশাপ বলেই-বা কেন মনে করব? পৃথিবীতে কোনো কোনো জাতি গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে ও কায়েম করেছে, কোনো কোনো জাতি সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে, আমাদের দায়িত্ব কেবল অতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, ও-তো করতেই হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহুভাষী বহুধর্মী এক বিরাট মানবগোষ্ঠীকে একত্র করে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দেশ করতে হবে—এবং হাজার হাজার বছরের প্রাচীন অথচ অনগ্রসর একটা মহাদেশকে পথ দেখাতে হবে—এটাকে কেবল একটা বোঝা মনে করব কেন, এ তো আমাদের ভাগ্য—সৌভাগ্য। এত বড় একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই ঘাড়ে পড়েছে, এ তো করবার মতো একটা কাজ—এ কাজ করতে পারলে কেবল ভারতের মুক্তির পথই খুলবে না, বহুজাতি অধ্যুষিত বিচিত্র মানুষের মেলাকে নিয়ে বৃহৎ মানবজাতি

গঠনের পথে মানুষ যে-যাত্রা করেছে, তার উপযুক্ত যাত্রিক বলে গৌরবের আসন অধিকার করতে পারব। এই মিশনটা আমাদের বুঝতে হবে। এবং তাই দিয়েই সৃষ্টি হবে মনুষ্যত্ব।

আঘাতের পর আঘাত আজ পূর্বদেশকে অস্থির করে তুলেছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে রাজনৈতিক সামাজিক আন্তর্জাতিক সংকট ঘনঘোর আকার ধারণ করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যে ঝড় উঠছে তা ক্রমশ পূর্বপাকিস্তান, আসাম, পশ্চিমবাংলা, উত্তরবাংলাকে ঘিরে ফেলবে। তা ছাড়া এই অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমগ্র ভারতের সাধারণ আভ্যন্তরীণ সংকটের চেয়েও কয়েকটি কারণে বিশেষত্বপূর্ণ—এ কথা মার্কসীয় শাস্ত্র অনুযায়ীও সত্য যে বিপ্লবাত্মক ঘটনা সাধারণ কারণ থেকে ঘটে না, ঘটে বিশেষ কারণগুলি থেকেই—যদিও সাধারণ পরিস্থিতির পরিপক্বতা বর্তমান থাকা চাই।

এই ঘনায়মান পরিস্থিতির মোকবিলা করার ক্ষমতা আমাদেরই অর্জন করতে হবে প্রথম—প্রথম ধাক্কা আমাদেরই সামলাতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। টয়েনবীর কথামতো আশা করা যায় যে ইতিহাসেব সাক্ষ্য হল এই যে যে-জাতি সবচেয়ে বেশি আঘাত পায়, সেই জাতি থেকে প্রত্যুত্তরটাও আসে তত জোরে—greater the challenge, greater the response. এর আভাষ পূর্বদিগন্তে দেখা দিয়েছে। ঘনতমসাচ্ছন্ন পূর্ব-পাকিস্তানের দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়। আসাম, পূর্ববাংলা, পশ্চিমবাংলার আকাশ থেকেই সূর্য উঠবে—যদি কখনও এই দেশে আবার সত্যিই সূর্য ওঠে।

ভূমিজ] [দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিজ্ঞানীর জগৎ

যা-কিছু পরিমাপ করা যায়, বিজ্ঞানীর কাছে তা-ই হল 'বাস্তব' সত্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র-লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি। যাকে আমরা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলি, ন্যায় ও যুক্তি বলি, এই সবের মূলে অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য ও ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান যে-ইমারতটি গড়েছে—এই অভিজ্ঞতার উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানীর একদিন মনে হয়েছিল—এই বুঝি-বা মানুষের স্থির ও ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীর সে-ভুল অনেকদিন ভেঙেছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের জগৎকে অনেক বিজ্ঞানী আজ অস্বীকার করেন না। কোয়াণ্টাম্-তত্ত্ব বা শক্তিকণাবাদের প্রবর্তক মাক্স্ প্লাঙ্ক্ (Max planck) তাঁর 'Survey of Physics'—পুস্তকে বহু বছর আগে লিখে গেছেন—"ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এমন সব সত্য আছে, আমাদের সমস্যায় ও সংগ্রামে আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ রত্ন অপেক্ষাও যাদের মূল্য অনেক বেশি।" বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানীর এই উক্তির মূল্য এই যে ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানী আজ সচেতন হয়েছেন।

বিজ্ঞান যাকে বহির্জগৎ বলে, যেমন আকাশ-বাতাস-জল-স্থল, ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত এই যে জগৎ—এর মূলগত স্বরূপটি কি? বহিঃপ্রকৃতি ও বহির্জগতের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসে মৌলিক ও প্রাথমিক উপাদান কি? বিজ্ঞানীর উত্তর—কণা ও তরঙ্গ। যা অতি নীরেট, বিজ্ঞানীর কাছে তা অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি মাত্র। কত রকমেরই না প্রাথমিক কণা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে! প্রোটন্, ইলেক্ট্রন্, নিউট্রন্, পজিট্রন্, মিসন্ প্রভৃতি প্রাথমিক কণার কথা সাধারণ লোকেও আজ জানেন। অণু, পরমাণু ও প্রাথমিক জড়কণাই সব নয়। শক্তিকেও কণারূপে আজ জানা গিয়েছে—কোয়াণ্টাম্ বা ফোটন্ শক্তির এক-একটি কণা। জড় ও শক্তির তুল্যতা আইন্‌স্টাইন্ (Einstein) বহু বছর আগেই প্রমাণ

করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের এই সব সমাধান নিছক কল্পনা নয়। সাংসারিক ঘর-করনার ছোট-বড় সুখ-দুঃখ, আসা-যাওয়া, উত্থান-পতনের মতো পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনের ঘূর্ণন, স্খলন ও পতন, এ সবই বিজ্ঞানীর কাছে কল্পনার বস্তু নয়। প্রাথমিক কণা অণুবীক্ষনের সাহায্যে দেখা সম্ভব না হলেও, এদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির নির্ভরযোগ্য অনেক প্রমাণ আছে। আবার জগতের এই মৌলিক ও প্রাথমিক উপাদানগুলি কেবল গতিমান কণামাত্রই নয়—এদের তরঙ্গ-গুচ্ছও বলা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে কণা ও তরঙ্গ আজ সর্ববাদিসম্মত।

কিন্তু এর পরেও যদি প্রশ্ন করা যায়—প্রাথমিক কণা কি? তরঙ্গ-ই বা কি? বিজ্ঞানীর কাছে এ-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই। এর উত্তরে শুধু কতকগুলি গাণিতিক বিধি-নিয়মের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয় মাত্র। সরল রেখা, বৃত্ত, উপবৃত্ত প্রভৃতি যেমন এঁকে দেখান যায় ও সঙ্গে-সঙ্গে formula বা নিয়মসূত্র দিয়ে তাদের বিশেষত্বগুলিকে নির্দেশ করা যায়—প্রাথমিক কণাকেও নির্দেশ করবার জন্য বিজ্ঞানীরা তেমনি কতকগুলি তত্ত্বীয় বিধি-নিয়ম বেঁধে দিতে পেরেছেন। এই বিধি-নিয়মগুলি প্রাথমিক কণার symbol বা বিগ্রহ মাত্র। যার বিগ্রহ, তার প্রকৃত সন্ধান বিজ্ঞানী পেলেন না—তার বিগ্রহ বা প্রতীকে এসেই বিজ্ঞানীকে ঠেকতে হল। এডিংটন্ (Eddington) ঠিক্ এই কথাটাই একদিন বলেছিলেন: "The scientists get the tune but not the player", অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা শুধু সুরেরই সন্ধান পান—সুরকারের সন্ধান আর পান না। 'প্রকৃত'-কে পাওয়া বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রের বাইরে—'প্রকৃতের' প্রকাশই হল বিজ্ঞানীর কাজ। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেম্‌স্ জিন্‌স্ (James Jeans)-এর 'The New Background of Science' পুস্তক থেকে কিছু উদ্‌ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনুবাদ করলে উদ্‌ধৃত কথাগুলি অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—"বিশ্বপ্রকৃতিকে ইতস্তত ভ্রাম্যমান অসংখ্য কণার সমষ্টিরূপে পরিকল্পনা করে বিজ্ঞানীরা একদিন দাবি করেছিল যে এক নিরপেক্ষ জগতের সে সৃষ্টি করেছে—যা মনোরাজ্যের বহির্ভূত, যা মন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞানী আজ সে-দাবী করে না। বিজ্ঞানী আজ সরলভাবেই স্বীকার করে যে প্রকৃতিকে জানা তার কাজ নয়—প্রকৃতির পর্যবেক্ষণই তার প্রধান কাজ। এই নতুন পরিকল্পনায় দ্রষ্টা মন ও দৃষ্ট জগতের কথা আপনা থেকেই এসে

পড়ে।" কাজেই বিজ্ঞানীর জগৎ 'আত্ম-নিরপেক্ষ' (objective) নয়— 'আত্মমুখ' (subjective) জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানীর কারবার। নতুন কোয়াণ্টাম্-তত্ত্বে-ও ঠিক এই সিদ্ধান্তেই বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। কোপেনহাগেন্-এ নীল্স্ বোর (Niels Bohr), হাইসেন্বার্গ (Heisenberg) প্রমুখ প্রখ্যাত পদার্থবিদ্গণ যেসব যুক্তি দিয়ে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তার আলোচনা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন। আইন্স্টাইন্ কিন্তু এই সিদ্ধান্তে ঠিক সায় দিতে পারেন নি এবং যুক্তিসংগত অন্য কোনো মতও তিনি দিতে সক্ষম হন নি। এই প্রসঙ্গে লাউয়ে (Laue), শ্রোয়ডিংগার (Schrodinger), বোম্ (Bohm) প্রভৃতি পদার্থবিদ্দের বিরুদ্ধ মতামতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাইসেন্বার্গ তাঁর 'Physics and Philosophy' পুস্তকে কোপেন্হাগেন্-এর মতবাদটি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন: "The quantum theory starts from the division of the world into the 'object' and the rest of the world.... That part of matter or radiation which takes part in the phenomenon is the natural 'object' in the theoretical treatment and should be separated in this respect from the tools used to the study the phenomenon. This again emphasizes a subjective element in the description of atomic events, since the measuring device has been constructed by the observer, and we have to remember, that what we observe is not nature in itself, but nature exposed to our method of questioning." কাজেই প্রাথমিক কণার ব্যবহার কতখানি বস্তু-ঘটিত ও কতখানি যন্ত্র-ঘটিত তা পৃথকভাবে জানা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীকে সেজন্য শেষ পর্যন্ত 'আত্মমুখ' জগৎকেই মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের দেশের পদার্থবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'-গ্রন্থে, 'বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা' প্রবন্ধটিতে ঠিক এই ধরনের উক্তি দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন: "যে-সকল জাগতিক সত্য লইয়া আমরা স্পর্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্বভৌম সত্য বলিয়া নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্বত্রই মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপী পরম দেবতা কোথায় কী ভাবে আছেন, আমরা জানি না; আমরা কেবল

'উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং' কতকগুলি মন-গড়া পুতুল স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহাদের পূজা করিতেছি।" এডিংটন্ বলেছিলেন: "শুধু বিগ্রহ বা symbol নিয়েই বিজ্ঞানীর জগৎ।" এ-তো সেই বিজ্ঞানে পুতুল-পূজারই কথা!

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানীদের এখানেই প্রভেদ। গত শতাব্দীতে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্ (Helmholtz) বলেছিলেন: "যান্ত্রিক বিধি-নিয়মে রূপায়নই প্রাকৃত বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।" জগতের সব কিছুই যেন কারখানায় গড়া সম্ভব। বিশ্বকর্মা যেন যন্ত্ররাজ অঙ্কবিদ্! কারখানায় যার নকল বা model-ই না গড়া গেল—লর্ড কেল্‌ভিন্ (Lord Kelvin) তা বুদ্ধিগ্রাহ্যই মনে করতেন না। জগৎকে যন্ত্রের সাহায্যে গড়ে তোলার প্রচণ্ড প্রয়াস আমরা গত শতাব্দীতে দেখেছি। কিন্তু বিজ্ঞানী আজ অনেক ঠেকে ও অনেক ঘুরে তার নিজের স্থানটি খুঁজে পেয়েছে। এ শুধু পদার্থবিজ্ঞানীদের কথা নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও প্রাণি-বিজ্ঞানেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীর জগতের সীমা-রেখাটির কথা মনে রাখলে বিজ্ঞান ও ধর্মে কোনো বিরোধ থাকে না। প্রতীক বা বিগ্রহের জগৎ যেমন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্র—ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের জগৎ তেমনি আর্ট ও অধ্যাত্ম-চেতনার রাজ্য। আর্ট ও অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানুষের যোগ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। এ-যোগ হৃদয়ের যোগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির যোগ। এক কথায় ঘনিষ্ঠ জ্ঞান-প্রসূত এই জগৎ রসসৃষ্টির জগৎ। মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী তাদের ব্যাখ্যা দিতে পারেন সত্য, কিন্তু রসজগতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে বিজ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করে তাঁকে শিল্পী ও সাধকের মতো প্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে-বিজ্ঞানী শিল্প, কবিত্ব বা ধর্মের রসাস্বাদনে অসমর্থ, তিনি শুধু বিজ্ঞানীই। এ-অক্ষমতায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র গ্লানি নাই—আপন রাজ্যেই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু যখনই কোনো বিজ্ঞানী ঘনিষ্ঠ জ্ঞান-প্রসূত রসজগতের আস্বাদ পান—তখন বলতেই হয় তিনি বিজ্ঞানী ছাড়া আরও বেশি কিছু। এ-রসানুভূতি তাঁর বিজ্ঞানের কোনো গ্লানি বা হানির কারণ হয় না।

পূর্বে জেম্‌স্ জিন্‌স্-এর উক্তির অনুবাদ করে বলেছি: "প্রকৃতির নূতন পরিকল্পনায় দ্রষ্টা মন ও দৃষ্ট জগতের কথা আপনা থেকেই এসে পড়ে।"

কাজেই এ কথা হয়তো বলা যায় যে, যে-মন জগৎকে অনুভব করে, সেই মনকে যদি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে দেখি, তবে বিজ্ঞানীর জগতের পরিসর অনেকখানি বর্ধিত হয় সন্দেহ নেই। অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ এইভাবে বিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করেছেন। এ-বিষয়ের বিশদ আলোচনা না করে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের এক বিশেষজ্ঞ Pierre Teilhard Chargdin-এর লিখিত 'The Phenomenon of Man' পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করব। তিনি লিখেছিলেন : "In the eyes of the physicist, nothing exists legitimately, at least up to now, except the *without* of things. The same intellectual attitude is still permissible in the bacteriologist, whose cultures (apart from some substantial difficulties) are treated as laboratory reagents. But it is still more difficult in the realm of plants. It tends to become a gamble in the case of a biologist studying the behaviour of insects or coelenetrates. Ftnally it breaks down completely with man, in whom the existence of a *within* can no longer be evaded, because it is the object of direct intuition and the substance of all knowledge." পরিশেষে তাঁর বক্তব্য এই : "Co-extensive with their Without, there is a Within to things" বিশ্ব-বস্তুর অন্তর ও বাহির—এই দুইয়ে বিশ্বাসী আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয় জন আছেন জানি না।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একাঙ্কে

একটি মাঝারি গোছের রাস্তা। মঞ্চের মাঝামাঝি বাঁ ফুটপাথে ময়লা ভরা ডাস্টবিন। উপচে পড়ছে। ডান দিক থেকে আসছে একটি ষাঁড়। তার ছায়া দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে আসছে একটি আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে—হরিণনয়না। তার পরনে আধুনিক হাল ফ্যাসানের সালোয়ার কামিজ। কামিজটির তলার দিক এত চাপা যে মেয়েটি খুব ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। ডাস্টবিনের উল্টো ফুটপাথে, ল্যাম্প পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে—বিম্বিসার। যাকে ড্রেন-পাইপ বা চোঁচাড়ু প্যান্ট বলা হয়, তার পরনে তাই। ছেলেটি অসম্ভব রোগা। অতএব সে একটি অতিরিক্ত ঢিলে জামা পরেছে। যখন পর্দা উঠছে তখন বিম্বিসার ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে।

হরিণনয়না : [থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে] উ-উ-উ। [ষাঁড়ের ছায়ার দিকে চেয়ে] ওটা কি ?

বিম্বিসার : [মেয়েটিকে বা ষাঁড়ের ছায়া দেখে নি] মেয়েদের সঙ্গে ডেট্‌ করা মানেই রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা। [ঘন ঘন সিগারেটে টান] ডাস্টবিন! একেবারে ডাস্টবিনের সামনে! মনে ছিল না। কী ই বা এসে যায়! After all—Sort of—date বই তো নয়!

ষাঁড়ের বিকট আঁক্‌ করে ডাক। ছায়াটা এগোচ্ছে। বিম্বিসার চমকে লাফিয়ে ওঠে।

হরিণনয়না : বিম্বিসার! Believe me, ওটা ষাঁড়!

বিম্বিসার : এগিও না। [ঘন ঘন সিগারেট টানে] Let me think!

ষাঁড়ের ছায়া নড়ছে। হরিণনয়না সেদিকে

চেয়ে মেমি গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। কয়েকটা লোক জড় হতে থাকে। তাদের মধ্যে পাড়ার কবি সোমেশ্বর।

একজন লোক : ওটা ধর্মের ষাঁড়। কিচ্ছুটি করবে না।

হরিণনয়না : [ছোট ছোট পা ফেলে] উ—উ—উ! বিম্বিসার, ষাঁড়টা তাড়া করে আসছে।

ষাঁড়ের পায়ের শব্দ বাড়তে থাকে। ছায়াটা শুঁতোবার ঢঙে এগোচ্ছে। মেয়েটি ছুটতে গিয়ে কামিজের ছোট ফাঁদের জন্যে দড়াম করে ঠিক ডাস্টবিনের সামনে পড়ে যায়। হৈ চৈ। কিন্তু কেউ নড়ে না।

বিম্বিসার : [ঘনঘন সিগারেট টানে] Good lord, what a sight!

লোকেরা : আরে মশাই, একে তুলুন না!

সোমেশ্বর : Oh, what a fall! তবু যা হোক কিছু ঘটছে। ষাঁড়-বাবাজীকে ধন্যবাদ।

বিম্বিসার : Shut up—ফচ্‌কে কবি! যেমন রাবিশ লেখে তেমনি—

লোকেরা : [নির্লিপ্তভাবে] আহা, একি কাণ্ড দেখো! তুলুন না। আপনারা না তুললে চলবে কেন?

সোমেশ্বর : [লোকেদের] উনি ডেট্ করেছেন, আমি তুলব! Philanthrophy!

হরিণনয়না : [ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে] ও-ও-উ-উ! Give me a hand! আমাকে ধরুন—!

ভীড়ের লোকেরা এগোয়। মনে হয় তুলবে। কিন্তু তারা মেয়েটিকে সেমি সারকেলে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। চেঁচায়। কিন্তু কেউ গায়ে হাত দেয় না।

লোকেরা : ভদ্দরলোকের মেয়ের গায় হাত দিই কি করে?

সোমেশ্বর : ব্রাদার, ডাস্টবিনে পড়ে গেলে ভদ্দর অভদ্দর থাকে না।

বিম্বিসার : [সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] Take care, মুখ সামলে!

ছুটে আসতে গিয়ে বিম্বিসারের পকেটের কলমটি

হরিণনয়না যেখানে পড়ে তার একটু তফাতে পড়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে থাকে। ষাঁড়ের ছায়াটা থম্‌কে আছে।

ভীড়ের একটি ছেলে : কলমটা তুলে নিয়ে চলে আসুন না দাদা। ওঁকে তুলুন।

সোমেশ্বর : তেরো ইঞ্চিতে আটকে যাচ্ছে।

বিম্বিসার : মোটেই আটকাচ্ছে না। দেখবেন ?

বিম্বিসার নানাভাবে মাটিতে পড়া কলমটি তোলার চেষ্টা করে। তার টাইট প্যাণ্টের চাপে স্প্রিং-এর মতো সে বার বার ছিট্‌কে উঠে পড়তে বাধ্য হয়। কিছুতেই মাটি থেকে কলম তুলতে পারে না। ওদিকে হরিণনয়না ঘুরে উঠতে গিয়ে অসহায় পা দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়তে থাকে। ভীড়ের লোক খুব মনোযোগের সঙ্গে একবার একে একবার ওকে দেখছে। ঠিক সাপ খেলা দেখার মতো। ষাঁড়টা গাঁক্ করে ডেকে উঠল।

হরিণনয়না : Help ! উ-উ-উ ! বিম্বিসার, you make me sick.

সোমেশ্বর : হাঃ হাঃ, এর শরীরে এখনও রাগ আছে। তাহলে এ হয়তো শেষ পর্যন্ত উঠতে পারবে।

বিম্বিসার : [আবার কলমটি ধরতে গিয়ে বিফল হয়ে] আমি চেষ্টা করছি নয়না। কলমটা তুলে নিয়েই আসছি।

সোমেশ্বর : ম্যাদামোয়াসেল নয়না, ভুলে যাচ্ছেন কলমটা দামী। তদুপরি উনি তেরো ইঞ্চিতে নিজেকে বেঁধেছেন।

ভীড়ের লোক : [থুথু ফেলে] শা-আ-ল্লা !

ভীড়ের লোক : [থুথু ফেলে] মাইরী !

বিম্বিসারের কলম তোলার প্রচেষ্টা চলেছে। হরিণনয়নার ওঠার চেষ্টা বেড়েছে। ভীড়ের সকলে দু'জনকেই মনোযোগের সঙ্গে দেখছে !
ষাঁড়ের প্রবল ডাক। ষাঁড়ের ছায়া ছুটছে। হৈ চৈ। কুরুক্ষেত্র।

ভীড়ের লোক : ধম্মের ষাঁড়! কিচ্ছু করবে না। ভয় পাবেন না দিদি!

ভীড়ের লোক : চু-চু-চু-চু!

ষাঁড়ের ছোটার শব্দ। মঞ্চের আলো দপ্ দপ্ করছে। একটা মুহূর্তের উত্তেজনা। তারপর সব চুপ। হরিণনয়না ডাস্টবিনের গায় উঠে বসেছে। বিম্বিসার কলম হাতে বাঁ-কাতে রাস্তায় বসে। গাড়ির হর্ণ বাজছে। ভীড় হাসতে হাসতে ছড়িয়ে পড়ল। 'খেল খতম' হলে যেমন হয়।

হরিণনয়না এদিক ওদিক চেয়ে উঠে চলে যাচ্ছে। কামিজটা তলার দিকে ফেটে গেছে। বিম্বিসারও উঠে পড়েছে। পায়ের দিকে প্যাণ্ট ছেঁড়া।

সোমেশ্বর : ষাঁড়টা দারুণ ব্রিলিয়েন্ট। এসব খেজুরে প্রেমের ওরা ধার ধারে না। চলে গেল।

বিম্বিসার : হুঁ! মানে? [নির্লিপ্ত]

সোমেশ্বর : খেজুর মানে date—বুঝলেন না? তেরো ইঞ্চির চিচিং ফাঁক।

বিম্বিসার : To hell with তেরো ইঞ্চি। আমি আজই সতেরো ইঞ্চিতে উঠবো।

সোমেশ্বর : Good. [দর্শককে] ছেলেটা এখনও অভিজ্ঞতার ধার ধারে। [হরিণনয়নার দিকে চেয়ে] মাদামোয়াসেল—উঁ কি যেন নাম?

বিম্বিসার : Clean ভুলে গেছি।

সোমেশ্বর : Good. এই যে শুনছেন!

হরিণনয়না : [আপনমনে বিড়বিড় করে বকছিল] আমার নাম হরিণনয়না। you know what, আপনাকে দেখেই আমার একটা ভীষণ—

সোমেশ্বর : [হেসে উঠে] No, no, sister, আমাকে দেখে—কিচ্ছুটি হবার উপায় নেই।

হরিণনয়না : ছিঃ! কথাটা শেষ করতে দিলেন না।

হঠাৎ হরিণনয়না কাঁদতে আরম্ভ করে।

সোমেশ্বর : কাঁদছে! [বিম্বিসারকে] ওকে থামান। কান্না দেখলে আমার এখনও কি রকম একটা হয়। [উত্তেজিত]

বিম্বিসার : আমি interested নই।

হরিণনয়না : [চোখ মুছে] আমিও নই। Spell-টা কেটে গেছে।

সোমেশ্বর : তবে কাঁদছেন কেন ?

হরিণনয়না : নতুন জামাটা ছিঁড়ে গেছে।

হর্ণের প্রবল শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জন দু'দিকে অচেনা দু'টি লোকের মত চলে গেল।

সোমেশ্বর একা। একটু হাসে। এগিয়ে এসে দর্শকের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ গলায় :

সোমেশ্বর : কলকাতার রাস্তায় এই যে সব ষাঁড়, এরাই যা আমাদের একটু জ্যান্ত রাখছে!

ষাঁড়ের ডাক। হর্ণের আওয়াজ। মঞ্চ অন্ধকার হতে থাকে। সোমেশ্বর সিগারেট ধরায়। ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়ায়। সে উদাস।

যবনিকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের সমস্যা

মস্কো থেকে রুশ ভাষায় প্রকাশিত দুটি পত্রিকার ('বিদেশী সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের সমস্যা') উদ্যোগে এশীয় এবং আফ্রিকান দেশসমূহে সাহিত্যের সমস্যা সম্পর্কে অয়োজিত এই আলোচনাচক্রে যোগদান এবং মস্কোয় আসার এই সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রথম থেকেই সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল দেশ সম্পর্কে এবং বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা সম্পর্কে জীবনসমস্যা, চিন্তা, কৃষ্টি, কর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসন ও শক্তিলোভী রাজনীতির শাসনে অর্থনৈতিক ও অন্তর্জাতীয় শোষণে জীবন ও প্রগতির যেসব নীতি বিঘ্নিত হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে, তাদের মূল্যায়নে রাজনৈতিক মূল্যসমূহের পাশাপাশিই মানবিক মূল্যসমূহের স্থাপনা এই দৃষ্টিকোণের প্রধান বিশেষত্ব। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরে মানবিক বিজ্ঞান রূপে ভাষাতত্ত্বের এবং সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ-নৃতাত্ত্বিক চর্চায় নিয়োজিত ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষকরূপে আমি মনে করি যে, সাহিত্যক্ষেত্রের (সাহিত্য জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিফলন এবং বাস্তবের পথে আদর্শে পৌছবার প্রয়াসেব প্রতিফলন ভিন্ন কিছুই নয়) কর্মীবৃন্দ যদি কিছুকাল অন্তর এই রকম আন্তর্জাতিক সমাবেশে মিলিত হয়ে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোচনা করে বর্তমান প্রত্যাশা ও প্রয়াস সম্পর্কে ভাবতে পারেন, তাতে তাঁরাই লাভবান হবেন। তাই এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব বন্ধু ও সহকর্মীরা এখানে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করার ও তাঁদের মতামত থেকে শিক্ষালাভ করার এই সুযোগকে আমি স্বাগত জানাই।

যে-কোনো দেশের সাহিত্যেব সমস্যা নিয়ে আলোচনার আগে আমি কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। যেহেতু মানবসমাজ এক ও অখণ্ড

এবং এই সমগ্র মানবসমাজ যে কালচক্রে আবদ্ধ, ইতিহাস তারই অন্তরে গতিমান অন্তহীন পরিক্রমা, যেহেতু ইতিহাস এই মানবসমাজের খণ্ড খণ্ড অংশের সঙ্গে যুক্ত বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের সমাহার নয়, সেই হেতুই বর্তমানের সাহিত্য বিচারের আগে অতীতের পটভূমিকার জ্ঞান ও ধারণা অপরিহার্য। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমান অতীতের জের বয়ে চলেছে; এক যুগ থেকে অন্য যুগে যে-অভিজ্ঞতা জমে, তারই ভিতের উপর আমরা নতুন কীর্তি রচনা করি। এও তো সকলেরই জানা—ইংরেজ কবি টেনিসন্ যা বলেছিলেন: "পুরনো ধারা বদলায়, নতুনের পালা আসে। ঈশ্বর নিজেকে কতভাবে প্রকাশ করেন, যাতে একটি সুঅভ্যাসও পৃথিবীকে কলুষিত করতে না পারে।" প্রাচীন ভারতে এই একই চিন্তা সুদূর অতীতে গীতা নামধেয় ভারতের সেই চিন্তোদ্দীপক ধর্মগ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছিল। সেখানে সর্ব-অস্তিত্ব ও সর্ব-অভিজ্ঞতার আধার স্বয়ং ঈশ্বরেব মুখ-নিঃসৃত কথা: "ধর্মের শাসন যখনই শিথিল হয়, অধর্ম তখনই মাথা তোলে, তখনই আমি আমার সমগ্রতায় নিজেকে নতুন করে রচনা করি।"

সবই গতিশীল। জীবনের ধর্ম এই পরিবর্তন; সবার উপরে যে বাস্তব, সেও এতে অংশ নেয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনো নিয়ম আবিষ্কার কবা যায় কিনা আমরা জানি না। কিন্তু সম্ভবত একটা থীসিস্ থাকে, তারপর অ্যান্টিথীসিস্, এইভাবেই চলে। এ কথা স্বীকৃত যে, কোনো বিশেষ কালে যে অ্যান্টিথীসিস্ দেখা দেয়, তাকে সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে তার আগের থীসিস্‌টির ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই সাহিত্য বিচারে, বিশেষত বর্তমান যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে, আমরা তার অতীতকে অবহেলা করতে পারি না। এক যুগ অন্য যুগের হাতে তার মশাল ধরিয়ে দিয়ে যায়। অতীতের ঐতিহ্য এবং তার মধ্যে যা-কিছু মূল্যবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ, যাতে বিস্মৃতির মধ্যে না চলে যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা যে-কোনো দেশের লেখকেরই বিশেষ দায়িত্ব। পৃথিবীর সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় কৃষ্টির প্রহরীস্বরূপ, সাহিত্যিকদের যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ।

যে-কোনো সাহিত্যসেবীকেই, বিশেষত তিনি যদি সমগ্র মানবসমাজের কাছে পৌঁছতে চান, দুই জগতের অংশভাক্ হতে হবে—যে-অর্থে কথিত আছে, "যিনি সবচেয়ে গভীরভাবে জাতীয়, তিনিই কেবল যথার্থ আন্তর্জাতীয়

হতে পারেন।" মানবিক মূল্যগুলি সর্বত্রই এক। তাই নিজের পরিবেশে যিনি যত গভীরভাবে এই মূল্যবোধের চেতনা লাভ করতে পারবেন, অন্যতর পরিবেশের কাছে তাঁর আবেদন ততই নিশ্চিত হবে, কারণ মৌল প্রশ্নসমূহ অমৌলকে অতিক্রম করে যায়। যথার্থ সাহিত্যসেবী সকল সংকীর্ণ সংস্কারের উর্ধ্বে থাকবেন; এবং যেহেতু সাময়িককে অতিক্রম করাই তাঁর আদর্শ, তাঁর দৃষ্টিকে বাস্তব পেরিয়ে যেতে হবে; তাঁর দৃষ্টি থাকবে (রোমঁ্যা রোলাঁর ভাষায়) "সংঘাতের উর্ধ্বে"।

সাহিত্যসেবীর কর্মধারা এবং বিশেষত তাঁর নিজের প্রতি ও তাঁর চিন্তা-সমূহের প্রতি তাঁর দায়িত্ব, যে-জনসাধারণের তিনি প্রতিনিধি, যে-জনসাধারণের সেবায় তিনি নিয়োজিত, তার প্রতি তাঁর দায়িত্ব—এই সব প্রশ্নে বহু বিবাদী মত বর্তমান, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক কথাই বলা হয়েছে। এখনই সেই আলোচনায় যোগদান সংগত হবে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যেসব সমাজ বহু শতাব্দী ধরে নিদ্রিত থেকেছে, যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি, সেই সব সমাজে লেখকের অন্যতম মূল দায়িত্ব তাঁর সমাজকে জাগিয়ে তোলা, অগ্রগতির পথে তাকে এগিয়ে দেওয়া, অগ্রগামীদের অগ্রগতিকে তারা যাতে ধরে ফেলতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, 'পশ্চাৎপদ সমাজের' লেখককে প্রথমেই নিজের মনকে আধুনিক করে তুলতে হবে, তারপর নিজের লেখার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মনকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আধুনিক করে তোলা বলতে আমি বুঝি সংস্কৃতির তিনটি মৌলিক বলে বিবেচিত নীতিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করা—বুদ্ধিবৃত্তিব চর্চা ও বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টির প্রয়োগ: সার্বভৌমিকতা বা সমগ্র মানবজাতির কাছে যার স্থায়ী মূল্য, সত্য বা অ-সত্য সমগ্র মানবজাতির যৌথ প্রয়াসের যা ফলস্বরূপ, তার মূল্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা; এবং কল্পনাপ্রবণতা বা ভিতরে-বাহিরে গভীরভাবে দেখা এবং অন্য মানুষের স্থানে নিজেকে স্থাপন করতে পারার সহৃদয়তা। সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞার আবেদন আমার কাছে অত্যন্ত গভীর, সেই সংজ্ঞামতে, "সহৃদয় চেতনায় উদ্ভাসিত চিন্তার প্রয়োগই সংস্কৃতি।" লেখক নামের যোগ্য লেখককে চিন্তাশীল হতে হবে, হৃদয়বান হতে হবে। সারবস্তুকে চিনে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই, যা দেখেন তাকে সুন্দর ও আবেদনক্ষম

রূপ দেবার ক্ষমতা থাকা চাই। নিজের পরিবেশে তাঁর মনের দিগন্ত যদি সীমিত থাকে, আরো অগ্রসর যেসব সমাজের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব ও সহজ, অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাদের বিস্তৃততর দিগন্তে পৌছবার চেষ্টা করতে হবে।

এইবারে আসব, যে-বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হয়েছে, সেই বিষয়টির আলোচনায়—এশীয় ও আফ্রিকান সাহিত্যে য়োরোপীয় ঐতিহ্য। বিষয়টি সহজেই আলোচনা করা যাবে, বিশেষত যদি আমরা এশীয় সাহিত্যসমূহের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। এশিয়া ও য়োরোপে বহু সমতুল্য ধারা আছে—উদাহরণত, রোমে হেলেনিক ঐতিহ্য, নবজাগৃতির য়োরোপে তার পুনরুজ্জীবন ; স্লাভ রাশিয়ায় পশ্চিম য়োরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ; ফার্সী ভাষায় আরবী ঐতিহ্য ; জাপানী ভাষায় চীনা ঐতিহ্য ; চীনা, তিব্বতী, মোঙ্গোলীয়, কাম্বোডীয়, শ্যামদেশীয় ও ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্য। এগুলির মধ্যে মিল আছে, কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-বিনিময়ের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারতম্য হেতু বিকাশের ধারা অভিন্ন থাকে নি। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও লেনদেন (যেমন, গ্রীস ও ভারতের পরস্পরের উপর প্রভাববিস্তার, ভারত ও চীনের মধ্যে চিন্তার দেওয়া-নেওয়া বা গ্রীস যখন রোমান জগতের উপর একপেশে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে নবজাগৃতির য়োরোপের উপরও প্রভাব বিস্তার করে, এবং চীন যখন কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েৎনামের সংস্কৃতিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলে) এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রাক-কলম্বীয় আমেরিকার উপর আধুনিক য়োরোপের প্রভাবে যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটেছে (যেমন অগ্রসর য়োরোপের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংগঠন ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভাবেব মধ্য দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলির জীবন ও সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বিকাশের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে)—এই দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান। শুধু এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় আধুনিক মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে নয়, য়োরোপীয় মানুষের ইতিহাসে এই দ্বিতীয় ধারাটির তাৎপর্য বিপুল। গত চারশো বছরের মধ্যে পরিবর্তমান ও প্রগতিশীল য়োরোপ নির্জীব ও চলচ্ছক্তিহীন এশিয়া ও আফ্রিকার ভাগ্যের

নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা সংস্কৃতিগতভাবে ইতিমধ্যেই য়োরোপের অংশ হয়ে গেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাগ্রসর ও পশ্চাৎপদ যে-জাতিগুলি কোনো না কোনো সময়ে য়োরোপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীন হয়েছে, এই কয়েক শতাব্দীর যোগাযোগ, সংঘাত ও আপসরফার মধ্য দিয়ে, এবং আরো বেশি করে সংঘাতের মধ্য দিয়েই (এই সংঘাত চলেছে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ও শক্তিশালী বিদেশী গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের প্রভাববিস্তারের মুখে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখে দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষার তাগিদে) "এক য়োরোপীয় ঐতিহ্য" লাভ করেছে।

এই য়োরোপীয় ঐতিহ্য এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, জীবনের বিভিন্ন প্রদেশে নানারূপে তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। যেমন, উত্তর আফ্রিকার সংগঠিত মুসলিম সমাজ তাঁদের বলিষ্ঠ সংগ্রামী মুসলিম আরবী সংস্কৃতির জোরে য়োরোপীয় প্রভাববিস্তারের কয়েকটি দিককে প্রতিরোধ করতে সফল হন। এই প্রতিরোধ ধর্মের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অন্যদিকে অসংগঠিত মানুষ আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলে (যার মধ্যে ধরতে হবে মেক্সিকো ও পেরুর অ্যাজ্‌টেক্‌ ও ইন্‌কা সাম্রাজ্যের কথা, যেখানে অস্ত্রের শক্তিতে স্থানীয় সংগঠনকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়) এবং এশিয়ায় ফিলিপাইন-এ স্পেনীয়দের রোমানক্যাথলিকবাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। যেসব দেশ নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন এবং ইতিহাস, সমাজসংগঠন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার (যেমন ভারত, চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া) তারা য়োরোপীয় প্রভাববিস্তারের শুরু থেকেই আত্মসমর্পণ প্রতিরোধ করেছে। ভারত, চীন ও জাপানের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশে কেবল নতুন চিন্তার ক্ষেত্রেই, কিংবা যেসব পুরনো চিন্তা য়োরোপে নবজীবনলাভ করেছে, সেই ক্ষেত্রেই য়োরোপীয় প্রভাব কার্যকর হয়েছে, এবং তাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় (যেমন ভারতে) কিংবা অনুৎসাহ, এমনকি বিরোধিতার মধ্যেও (যেমন চীন ও জাপানে) যে য়োরোপীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আজ তা এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে আমি কেবল ভারত সম্পর্কেই বলতে পারি। চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আমার জ্ঞান যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, তবুও প্রায়সই পরোক্ষসূত্র থেকে প্রাপ্ত। আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার জ্ঞানও তথৈবচ। ভারতে অষ্টাদশ শতকে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশে জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বন্ধ্যাত্ব এসে পড়ে, যদিও এই শতাব্দীতেই হিন্দু ও মুসলিম জগতের মধ্যে এক সমন্বয় পরিপূর্ণতার বিন্দুতে পৌঁছচ্ছিল। ভারত ও পারস্যের দুই সংস্কৃতির এই সমন্বয়ে ভারতসভ্যতার উদ্যানে চমৎকার এক ফুল ফুটেছিল; মহান হিন্দুস্তানী ভাষার উর্দু ধারার এই ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতি যে সমৃদ্ধ সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিল, প্রথমে তার মূল্য সামান্য হলেও, তারই মাধ্যমে পারস্যের গুলবাগের সৌরভ ভারতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু তখনই এখানে-ওখানে এক নতুন চেতনা, য়োরোপীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর উদারনৈতিক ও মানবিকবাদী চিন্তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রকাশ পাচ্ছে। উত্তর ভারতে দিল্লীতে মুসলিম চিন্তানায়ক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভূস্বামীশ্রেণী কর্তৃক মেহনতী মানুষের হৃদয়হীন শোষণ সম্পর্কে আশ্চর্যরকম আধুনিক চিন্তার পরিচয় দেন। একই শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশে ঝাঁসীর জনৈক মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশপাল রঘুনাথ হরি নাওয়লকর নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা শিখে য়োরোপীয় বিজ্ঞান অধ্যয়নের চেষ্টা করেন; তদুদ্দেশ্যে তিনি একটি গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞানকে এনেই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে নতুন জীবন আনা যাবে, আনতে হবে। কিন্তু এমন লোক তখন সংখ্যায় খুবই নগণ্য। ইংরেজ জাতির সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই (যদিও বিদেশী বলে তাঁদের বুঝতে প্রায়ই অসুবিধা হত) ভারতীয়দের নিজেদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে য়োরোপের দর্শন, বিজ্ঞান ও পরে প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চার দ্বারাই ভারতে য়োরোপীয় ঐতিহ্যের বীজ রোপিত হয়েছিল।

তখনকার কালে, যেমন এশিয়ার অধিকাংশ দেশে, তেমনিই য়োরোপে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত ছিল না, যদিও বিদ্যোৎসাহী সাধারণ নাগরিকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গেলে সরকারী সাহায্য পেতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাই রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব বলে স্বীকৃত ছিল,

জনকল্যাণের সে-গুরুত্ব ছিল না। ভারতে শাসকশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ইংরেজরা কয়েক দশকের মধ্যে মানুষকে শিক্ষাদান করার কোনো ব্যবস্থাই করে নি, ইংরেজি ভাষার শিক্ষা বা সেই ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা তো নয়ই। বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজ গভর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর নিজের উৎসাহে ভারতীয় ছাত্রদের ফার্সী ভাষায় শিক্ষাদান করার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কারণ তখনও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির অনেক ক্ষেত্রেই মুঘল ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ ফার্সী ভাষাই সরকারী ভাষা রয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয়েরা নিজেরাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মনকে আধুনিক করে তোলার জন্য বস্তুলোক ও মানসলোকে অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এবং তাঁরা নিজেরাই ইংরেজি ভাষার চর্চা শুরু করে দেন। হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর একাংশের যৌথ উদ্যোগেই ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের য়োরোপের সাহিত্য, চিন্তা ও বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ১৮১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিখ্যাত হিন্দু কলেজ আজও কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে জীবিত আছে।

ইংরেজির মধ্য দিয়ে নতুন শিক্ষাধারা নব্য বাংলার অন্তরে এক প্রাণোন্মাদনা এনে দেয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক দশকের মধ্যেই ইংরেজি-চর্চার এক বলীয়ান ঐতিহ্য বাংলাদেশে (বোম্বাই ও মাদ্রাজের কোনো কোনো অংশেও) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও যায়। য়োরোপের মন (যে-মনে, হেলেনিজ্‌ম্‌-এর ধারায় মানুষ বলে মানুষের স্মৃতি প্রেম ও মানুষ সম্পর্কে কৌতূহল এবং গণতান্ত্রিক জীবনের নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত) এক উচ্চতর দার্শনিক স্তরে প্রাচীন হিন্দু ভারতের মনের প্রতিফলন বলে স্বীকৃত হয়। ইংরেজিতে নব্য-শিক্ষার ধারকেরা যখন (অনেক ক্ষেত্রেই য়োরোপীয় ভারততত্ত্বের পথ বেয়ে) সংস্কৃত চিন্তা এবং হিন্দু ও অন্যান্য ভারতীয় সভ্যতাকে পুনরাবিষ্কার করেন, তখনই এই চেতনা আসে। ভারতীয় চিন্তানায়কেরা প্রাচীন ভারতের আত্মা ও আধুনিক য়োরোপের আত্মার মধ্যে এক সমন্বয় রচনার চেষ্টা করেন। আমার মতে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলঙ্‌, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, আলতাফ হুসেন পানিপতি হালি, অরবিন্দ ঘোষ, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখের চেষ্টায় এই প্রয়াস ভিন্ন পরিবেশে সক্রিয় মানবচেতনার

মধ্যে ঐক্যরচনার এক আশ্চর্য ও সাহসদীপ্ত অ্যাড্‌ভেঞ্চার। সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই প্রয়াস অত্যন্ত সফল এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

ভারতে এইভাবেই ইংরেজি ঐতিহ্য এই সমন্বয় রচনায় সহায়ক হয়েছে। এই সমন্বয় ভবিষ্যতে সমগ্র মানবসমাজের বুদ্ধিনির্ভর ও হৃদয়নির্ভর সংহতি রচনার ভিত্তি হতে পারে। অন্তত চার যুগ ধরে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে য়োরোপীয় ঐতিহ্যের দীপ্তি বিভিন্ন ভাষার মহান্‌ লেখকদের অধিকাংশেরই অন্তরে সক্রিয় থেকেছে, এ কথা মানতেই হবে। আজ কে অস্বীকার করবেন যে, বর্তমান যুগের ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আমাদের মহত্তম দার্শনিক, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ, কে, এস্‌, কৃষ্ণণ, এস্‌, রামানুজম ও বীরবল সাহনি ভারতের তথা পৃথিবীর মহত্তম বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম, এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ ও জওহরলাল নেহরু ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক নেতারূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন? তারস্বরেই প্রশ্ন করি, এঁদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কীর্তির পশ্চাতে ইংরেজির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত য়োরোপীয় ঐতিহ্য কি একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল না?

ভারতের কোনো কোনো মহলে ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে এক প্রচারযুদ্ধ চালিয়ে এই য়োরোপীয় ঐতিহ্যকে খর্ব করার কিংবা সম্পূর্ণ বর্জন করার দিকে এক অবিবেকী ও সংকীর্ণ স্বাজাত্যাভিমানী অভিযান চলেছে। এটা অবশ্য নিতান্তই ভারতের ঘরোয়া সমস্যা, এবং সেইহেতু এই আলোচনাচক্র তার আলোচনা-ক্ষেত্র নয়। আবার এ-সমস্যা শুধু ভারতের নয়। ইংরেজি বা ফরাসীর মধ্য দিয়ে য়োরোপীয় ঐতিহ্যের যোগসূত্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো দেশের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারে এ-পন্থা সুফলদায়ী হবে না। বস্তুত, প্রকাশ্যে ও গোপনে ভারতে ইংরেজি-চর্চার মূলোচ্ছেদ করার কিছু উন্মত্ত চেষ্টা চললেও, মূলগুলি যেন ভারতের মাটির আরো গভীরে প্রবেশ করছে; অন্য দেশও ক্রমশই এ প্রশ্নে নরম হয়ে আসছে।

চিন্তার ঐক্যের প্রশ্নে যেখানে অন্য কোনো ঐক্যসূত্র নেই, অথবা অতীতে শক্তিমান থাকলেও অধুনা মৃতপ্রায়, সেক্ষেত্রে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির মধ্যে একটি দৃঢ় সাধারণ ঐক্যক্ষেত্র হতে পারে এই য়োরোপীয় ঐতিহ্য।

তাই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষার চিন্তাশীল লেখকেরা যেন এই মহান্ আধুনিক ঐতিহ্যের চর্চায় অবহেলা না করেন। মানবজাতির উপকারার্থেই য়োরোপের যে মহান ভাষাগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও চিন্তার আকর, তার মধ্যে এক বা একাধিক ভাষা-শিক্ষার চেষ্টা তাঁদের করতে হবে।

তবু আরেকটি কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। য়োরোপীয় ধারার (অথবা তারই চরম বিকাশ মার্কিন ধারার) বন্যায় এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির (বিশেষত আধুনিক য়োরোপীয় জাতিসমূহের সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এমন কোনো ঐতিহ্য যাঁদের নেই) জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্ যেন ভেসে না যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বা প্রাচীন চীনাদের মতোই সকল জাতিই প্রাচীন জাতি। কোনো জাতিই বিশ্বজাতিসঙ্গমে খালি হাতে আসেন নি। তারা যা এসেছে, তা হয়ত ব্যাবিলনীয় সাহিত্য, স্থাপত্য ও বিজ্ঞান, মিশরের স্থাপত্য ও শিল্পকলা, গ্রীক দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প এবং ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও শিল্পের মতো সমৃদ্ধ ও প্রভাবশীল নয়; তা হয়ত সামান্য কিছু হাতের কাজ, সংগীতে দু'একটি সুর, হয়ত কোনো নৃত্যরূপ, নয়ত এমন এক সরল ও সংগতিপূর্ণ জীবনযাত্রার রীতি যা শান্তি ও স্থিরতা আনে। যারা এমনি কোনো বিশেষ অবদান আনতে পারে নি—তাদেরও নিরাশ হবার বা ধিকৃত হবার কোনো কারণ নেই। ইংরেজ কবি মিল্টন সংগতভাবেই বলেছেন—"যারা শুধু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, তারাও তাঁরই সেবা করে"। দু' হাজার বছর আগে কোন্ গ্রীক বা রোমান বুদ্ধিজীবী মধ্য, উত্তর ও পূর্ব য়োরোপের বর্বর জাতিগুলিকে দেখে ভাবতে পারতেন যে, এরাই কোনো ভবিষ্যতে আধুনিক জার্মান ও স্লাভ জাতিরূপে আধুনিক সভ্যতা ও প্রগতির পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে? কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান (বা মেলানাফ্রিকান) অদ্যাবধি সাহারার উত্তর থেকে ও সমুদ্র থেকে দুই প্রচণ্ড বাধার মুখে দাঁড়িয়ে থেকেছে; তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, জীবনদর্শন ও ধর্মকে যারা অবদমিত করে রেখেছে, সেই স্বার্থপর শোষকেরাই তাদের নামে কুৎসা রটনা করেছে। উচ্চৈঃস্বরে প্রচার চলেছে যে, কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের কোনো সংস্কৃতি নেই, তাঁদের অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই, তাঁরা কেবল শ্বেতাঙ্গদের ভিক্ষান্নেই চিরকাল কাটিয়ে যাবেন। তথাপি কালচেতনায় আত্মবিশ্বাসে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদেরই স্বার্থে

ও মানবজাতির স্বার্থে য়োরোপের শিল্পীকুল ও শিল্পরসিকেরা এবং সমাজ-তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা তাঁদের সংস্কৃতি পুনরাবিষ্কার করছে, তাঁদের জীবনরীতির মূল ধর্মের সন্ধান করছে। তবু আশঙ্কা হয়, সংগঠন না থাকায়, লিখিত সাহিত্যের সুদৃঢ় ঐতিহ্য না থাকায় তাঁরা হয়ত তাঁদের ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে যাবেন। তাঁদের সরল ও আদিম বিশ্বলোকদর্শনকে কালোপযোগী করে তুলতে, তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনবোধকে বিস্তৃততর করে তুলতে হয়ত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের প্রয়োজন হবে, পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদ বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে উদারনৈতিক পার্লামেন্টিয় গণতন্ত্রের প্রয়োজন হবে; আধুনিক পৃথিবীতে অস্তিত্বের সংগ্রামে এর প্রয়োজন অনেক। কিন্তু যেসব আফ্রিকান লেখকেরা নিজেদের ভাষায় লেখেন, কিংবা ইংরেজি বা ফরাসীতে লিখতে বাধ্য হন (যাকে বলা হয়েছে, 'ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরার চাপে'), তাঁরা যেন কখনও তাঁদের জাতীয় আফ্রিকান সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিস্মৃত না হন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর অধিকাংশ আফ্রিকান রাষ্ট্রেই তাঁদের জাতীয় (এবং কখনও কখনও তাঁদের বিশিষ্ট উপজাতীয়) সংস্কৃতির রক্ষার্থে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকা তার সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে, সে য়োরোপ বা আমেরিকার ম্লান প্রতিধ্বনি হবে না। এটা সম্ভব হবে, যদি তার সন্তানদের রচিত সাহিত্যে সে নিজের কাছে এবং পৃথিবীর কাছে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে তার দেশজ চিন্তাধারার অন্তর্গত মৌল মানবিক মূল্যগুলিকে বাঙ্ময় করে তুলে সেই চিন্তাধারা ও জীবনধারাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে।

এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায়। আমি চাই, তাঁদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এইসব ও অনুরূপ বিষয়ে আফ্রিকান লেখকদের মতামত ও চিন্তা বহির্দেশীয়দের কাছে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হোক। ভারতীয় হয়ে আফ্রিকার গঠনে ও পরিস্থিতিতে আমি যদি এমন কিছু খুঁজে পাই যা আমাকে চমৎকৃত করে, কোনো মানবিক গুণের আভাস, হয়ত বাস্তবের পরিমণ্ডলে, নয়ত শিল্পে, হয়ত আধ্যাত্মিকতা কিংবা আধ্যাত্মিক কোনো অভিজ্ঞতা যা আমাকে পূর্ণতর মনুষ্যত্বের অনুভূতি দেবে, আমি আনন্দ পাব। যদি একটি কণ্ঠ বা যন্ত্রও নীরব থাকে, কিংবা বিশ্ব মানবিকবাদের সমষ্টির সুরে না মেলে, মানবলোকের সর্বজাতির উদার ঐকতান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য সকল দেশের লেখকদের, বিশেষত সেই সব জাতির যারা হয় এখনও নিজেদের খুঁজছে নয়তো নিজেদের হারিয়ে ফেলবার ভয়ে মরছে, বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

১৯৬৪ সালের ৮ জুন মস্কোয় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশোক রুদ্র

শিল্পীর স্বাধীনতা

ইংরেজিতে একটি কথা আছে Hamlet without the Prince of Denmark. আমরা বাংলায় বলি, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ। কোনো শিল্পী যদি Prince of Denmark-কে বাদ দিয়ে Hamlet-এর মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করেন অথবা সীতা কার বাপ না জেনে রামায়ণের চলচ্চিত্র রূপায়ণে প্রয়াসী হন তাহলে আপত্তিটা নিশ্চয়ই এই বলে কেউ করবে না যে অন্য সব স্বাধীনতার মতো শিল্পীর স্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিত। সন্দেহটা উঠবে একেবারেই অন্য প্রকৃতির—শ্রীসত্যজিৎ রায় আমাকেই লক্ষ্য করে একটি ইংরেজি কাগজে যা লিখেছিলেন [1] তারই উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হবে, শিল্পী নিশ্চয়ই, "to say the least, imperceptive."

রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পটা একটি নারীহৃদয়ের গল্প বলে আমার এতদিন যাবৎ ধারণা ছিল। রতনকে নারী বলে বর্ণনা করায় কোনো পাঠক যদি আপত্তি তোলেন তো তাঁকে গল্পগুচ্ছের [2] ৩৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ করে দেখতে অনুরোধ করব লেখকের আক্ষেপ, "...কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে।" আগে মেয়েটির যখন প্রথম উল্লেখ পাই তখন পড়ি "বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।" অর্থাৎ যে-বয়সে অন্য মেয়েদের বিবাহ হয় সে বয়সের। শ্রীসত্যজিৎ "তিন কন্যা" ছবিতে রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টারের চিত্ররূপ হিসেবে যা পরিবেশিত করেছেন তাতে দেখি রতন একটি শিশু, বয়স আটের বেশি হবে না। আমার এতদিন ধারণা ছিল পোস্টমাস্টার গল্পটির প্রাণকেন্দ্রই হল এই সংলাপটি :

> [পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"
> পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কি করে হবে।"]

১. Mainstream, November 3, 1962 এবং November 17, 1962-র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. আমার সবকটি উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড থেকে করা হবে।

ধারণা ছিল গল্পের সবচেয়ে বড় ঘটনাই হল এই যে [সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে ও জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, "সে কি করে হবে।"] সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিবরণই হল [কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টঅপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—···] পোস্টমাস্টার গল্পটির উল্লেখে যে-দৃশ্যটি সেই ছোটবেলার প্রথম পড়া থেকে আজ অবধি সর্বদা সর্বপ্রথম মানসচক্ষে উদিত হয়েছে তা হল "যখন নৌকায় উঠিলেন—এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।"

এই সংলাপ, এই ঘটনা, এই বিবরণ, এই দৃশ্য এদের কোনোটিই শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পোস্টমাস্টারে পাওয়া যায় না। এক-একটি করুণরসাত্মক গল্পের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে আমরা একটি অদ্ভুত বা বীভৎসরসাত্মক কাহিনী দেখে ফিরি। কারণ শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবিতে রতনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে একটি ভীতি-উদ্রেককর উন্মাদ চরিত্র। পোস্ট-মাস্টারের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে কোনো বালিকা-হৃদয়ের মর্মব্যথা পিছু টানে না, বিঘ্ন ঘটায় পথের উপর সেই উন্মাদ চরিত্রের উপস্থিতি।

মণিহারা গল্পে আমরা পড়ি, [ঠক্ ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা] যেতে [পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না।] কিন্তু প্রথম রাত্রে সে [তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল] দ্বিতীয় রাত্রিতে [ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "মণি।"] সেদিনও সে ব্যর্থ হয়ে [নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।] তৃতীয় রাত্রিতে [ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।] যে

মণিমালিকা সম্বন্ধে যে ফণিভূষণ আগে বলেছে, 'এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে' এবং যে ফণিভূষণ বিগতা পত্নীর প্রেতাত্মার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় [দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল] তাদের অন্তিম সাক্ষাতের দৃশ্যটা রবীন্দ্রনাথে যা আছে তার মধ্যে এইটুকু অংশ মনে হয় বিশেষ রকমের গুরুত্বপূর্ণ : [শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচান আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।] কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমরা কি দেখি? মণিমালিকা আসে, "তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে" ফণীভূষণের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নয়, একটি নতুন সোনার গয়নার লোভে যার কোনো উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের গল্পে নেই। মণিমালিকা আসে ফণীভূষণের ভালোবাসার আকর্ষণে নয়, সোনার আকর্ষণে। [নহবতের শাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল] সেই চোখে তাকিয়ে কঙ্কাল ফণিভূষণকে সম্মোহিত করে না, অশ্লীলভাবে অস্থিময় হাত দিয়ে গয়নাটির জন্য তার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে। ফণিভূষণও [মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল] না, কঙ্কালের অনুগমন করে নদীর স্রোতে জীবন হারাল না। ভয়ার্ত হয়ে কুৎসিত গলায় চিৎকার শুরু করল। এই কাড়াকাড়ি ও চিৎকারই হয়ে দাঁড়ায় গল্পটির চরমবিন্দু, একটি প্রেমের গল্পের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে আমরা দেখে আসি নিতান্তই একটা ভূতুড়ে গল্প।

পোস্টমাস্টার ও মণিহারা দুটি গল্পের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি চলচ্চিত্রশিল্পী শুধু সংলাপ এবং ঘটনা পরম্পরার পরিবর্তনের মধ্যেই নিজের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, গল্পের থীম পর্যন্ত সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন, যে-রসে গল্প লেখা তাকে পর্যন্ত গ্রহণ না করে অন্য রসের সিঞ্চন করেছেন, করুণ রসের গল্পকে

বীভৎসরসে এবং আদিরসের গল্পকে ভয়ানক রসে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এতটা স্বাধীনতা যখন নেওয়া হয়েছে তখন কোনো বিশেষ ঘটনা কোনো বিশেষ সংলাপকে কেন বর্জন করা হল তার প্রশ্ন তুলে বোধহয় কোনো লাভ নেই।

গল্প উপন্যাস বা নাটকের চিত্ররূপ দিতে গেলে তাতে যে খানিকটা অদলবদল করতে হতে পারে এ তত্ত্ব বা তথ্যটা আমার একেবারে অজ্ঞাত নয়। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের যদিও ধারণা যে এদেশের যারাই তাঁর ছবির কোনো দোষ ধরে তারা কখনই কোনো ভালো ছবি দেখে নি এবং সেজন্যই কিছু বুঝতে পারে না তা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে বলব, ভালো-মন্দ কিছু ছবি আমরাও দেখেছি এবং সেই দেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নিতান্তই নিজের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় পরিবর্তনের শিল্পসংগত প্রয়োজন দুই কারণে হতে পারে। প্রথমত, গল্পে বা উপন্যাসে লেখক অনেক ঘটনাকে অত্যন্ত সাধারণ খবরের আকারে পাঠককে শোনাতে পারেন, কোনো মানসিক অবস্থার উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা বা সংলাপের মারফৎ তাকে নাও ফুটিয়ে থাকতে পারেন। চলচ্চিত্রকার যদি ঘোষণার আকারে সেই খবর দর্শককে লিখে বা কোনো টিপ্পনীকারের কণ্ঠে তা শোনাতে চান তো তাঁকে সেখানে ঘটনা ও সংলাপ সংযোজনের স্বাধীনতা নিতেই হবে। যেমন, ধরা যাক নষ্টনীড়ে যেখানে ভূপতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—" এখানে ভূপতির এই দেখা ও এই ভাবনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে শিল্পীকে কিছু ঘটনা ও কিছু সংলাপের উদ্ভাবন করতেই হবে। কারণ ঠিক এই স্থানটিতে কোনো বিশেষ একটি ঘটনা বা বিশেষ কোনো সংলাপ গল্পলেখক দেন নি, যদিও চারুর কি ধরনের ব্যবহার ভূপতি দেখল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। তেমনি, পোস্টমাস্টার গল্পে গল্পলেখক এটুকু লিখেই খালাস: "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিল।" কিন্তু এখানেও গল্পলেখকের বক্তব্যকে রূপদান করতে চলচ্চিত্রশিল্পীকে উদ্ভাবনের আশ্রয় নিতেই হবে।

সংযোজনের প্রয়োজন যেমন হতে পারে, বর্জনেরও হয়। বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জ যদি অত্যধিক হয় এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র যদি ক্ষীণ হয় তো চলচ্চিত্রে রূপ দিতে অনেক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সংলাপকে ছেঁটে বাদ দিতেই হবে যদি কালের ব্যাপ্তিতে দু-আড়াই ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ

এই বিশেষ মাধ্যমে সংহতিপূর্ণ শিল্পরস পরিবেশন করতে হয়। এই সমস্যা উপন্যাসেই দেখা দিতে পারে ছোটগল্পে না। কারণ সংহতিহীন ঘটনাপুঞ্জ ও পরিহার্য সংলাপে ভারাক্রান্ত লেখাকে ছোটগল্প আখ্যাই দেওয়া যায় না। এই জাতীয় উপন্যাসের চলচ্চিত্রে রূপায়ণ অনেক সময়েই অসন্তোষকর হয়, কারণ ক্ষীণ যোগসূত্রে গ্রথিত বহুল ঘটনাপুঞ্জ ও সংলাপাবলীও সামগ্রিকভাবে একটা রসের সৃষ্টি করতে পারে যা তাদের থেকে বেছে বেছে তুলে নিয়ে সংহত করে গ্রথিত করা কোনো চিত্রকাহিনীতে পাওয়া যেতে পারে না। উপন্যাসের প্রকৃতির উপর এই পদ্ধতির সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ভর করবে, বলাই বাহুল্য। David Copperfield-এর চিত্ররূপ দেখে বিরক্ত না হয়ে উপায় নেই, কিন্তু A Tale of Two Cities-এর রসগ্রহণ করা অসম্ভব হয় না। উপন্যাসের চিত্ররূপায়ণে শিল্পীকে বর্জন ও সংযোজনের স্বাধীনতাকে যেহেতু অনেক পরিমাণেই প্রয়োগ করতে হয় সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ নতুন একটি শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হয়। এবং তা যদি শিল্পবিচারে মূল কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় উৎকর্ষ দাবি করতে পারে তো সেস্থলে শিল্পীর স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারে পরিণত হল কি হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনেকটা অবান্তর। এই কারণেই সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী যে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী নয় সে নিয়ে নালিশ বা আক্ষেপ করা অর্থহীন। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অবিকৃত চিত্ররূপ সম্ভবই না। তা এত দীর্ঘসূত্র তাতে এত চরিত্র, এত ঘটনা, গতি এত মন্থর যে তাকে কেটেছেঁটেও এমন কিছুতেই দাঁড় করান যায় না যাকে বলা যেতে পারে বিভূতিভূষণের পথেব পাঁচালীর চলচ্চিত্র। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীও যেহেতু নিছক শিল্পবিচারে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর তুল্যমূল্য দাবি করতে পারে সেহেতু মূল কাহিনীর প্রতিবিম্ব না পেলেও, এমন কি বিভূতিভূষণের মেজাজ ও সুরের স্পর্শ না পেলেও শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী তার স্বকীয় রসেই আমাদের মজাতে সমর্থ হয়।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পোস্টমাস্টার বা চারুলতাও তাদের স্বকীয় রসে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারে না এমন কথা বলছি না। কিন্তু আমার প্রশ্নটা অন্য। পোস্টমাস্টার, মণিহারা বা নষ্টনীড় গল্পের চিত্ররূপায়ণে সংযোজনের প্রয়োজন কিছু হতে পারে, কিন্তু বর্জনের শিল্পসংগত কারণ কি দেখান যেতে পারে? যেমন ধরুন নষ্টনীড়ের শেষ দৃশ্য ও সংলাপ :

[…হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে নিয়ে সঙ্গে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না"।]
[ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।]…
[ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারি না।"
মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক শাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।
তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।"
চারু বলিল, "না, থাক।"]

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভক্তসম্প্রদায় হয়তো বলবেন, এই দৃশ্য ও সংলাপ দিয়ে শেষ না করে শ্রীসত্যজিৎ রায় যেভাবে শেষ করেছেন তাই অনেক বেশি শিল্পসম্মত হয়েছে। এবং চারুকে দিয়ে ভূপতির হাত না চেপে ধরিয়ে অমলের হাত চেপে ধরানটাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে বেশি পরিস্ফুট করেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন করব, শ্রীসত্যজিৎ রায় যখন নষ্টনীড়ের চিত্ররূপ দিতে বসেছেন তখন এই অতুলনীয় দৃশ্য ও এই সংলাপটি বর্জন করলেন কোন শিল্পপ্রেরণার তাগিদে? এর আগাগোড়াই কি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্ক্রিপ্ট-এর অন্তর্ভুক্ত করাব কোনো অসুবিধা ছিল? এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নষ্টনীড় গল্পটিতে প্রচুর ছোট ছোট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, প্রচুর সংলাপ আছে। কিন্তু সমস্ত গল্পটির মধ্যে যত সংলাপ আছে তার একটিও কি কোথাও অপরিবর্তিত আকারে স্ক্রিপ্‌ট্‌-এর অন্তর্গত করা হয়েছে? একটা কোনো বিশেষ ঘটনার বিবরণও কি পরিচালক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন? একটি কোনো বিশেষ ঘটনা বা একটি কোনো বিশেষ সংলাপকেও যে পরিচালক তাঁর স্ক্রিপ্‌ট্‌-এ স্থান দেন নি তার অবশ্য একটা কারণ এই বোঝা যায় যে যেহেতু তিনি নষ্টনীড় গল্পের প্লট এবং থীম দুইই বদলেছেন তখন সমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত সংলাপও তাঁর নিজেকেই নতুন করে লিখতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি থীম ছিল, তাকে প্রকাশ করতে তিনি একটি অতি সুসংবদ্ধ সুসংহত প্লট-এর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং বহুবিধ ঘটনা ও সংলাপের জটিল জাল বুনে বুনে এমন একটি গল্পে দাঁড় করিয়েছেন যা পড়ে আজ অবধি আমাদের অনেকের মনে হয়েছে, এ হল এমন একটি শিল্পসৃষ্টি যাকে

বলা যেতে পারে নিখুঁত। নষ্টনীড়ের চেয়ে ভালো গল্প লেখা হয়ে থাকতে পারে, নষ্টনীড়ের লেখকের চেয়েও ভালো গল্প-লেখক অনেক থাকতে পারেন (এবং শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁদের একজন হতে পারেন) কিন্তু এই বিশেষ গল্পটির কোথাও একটি আঁচড় দেওয়ারও উপায় নেই, একটি কমা সেমিকোলন এদিক-ওদিক করলেও গল্পটির রসহানি ঘটবে। কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায় যাকে নষ্টনীড়ের চিত্ররূপ বলে উপস্থিত করেছেন তাতে দেখি, থীমও ভিন্ন, প্লটও ভিন্ন। চরিত্র সবকটিই পরিবর্তিত, সংলাপ আগাগোড়াই সংযোজিত। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে যেটুকু মিল আছে তেমন মিল দুনিয়ার হাজার হাজার গল্পে আছে। একটি বিবাহিতা রমণী স্বামীর প্রেমে পরিতৃপ্তি না পেয়ে দ্বিতীয় পুরুষে আসক্ত হয়েছে। মিলন যেমন অসম্ভব, বিচ্ছেদ তেমনি অসহনীয়। এছাড়া নষ্টনীড় ও চারুলতার মধ্যে থীম-এর দিকে অন্য কোনো মিল আছে কি ?

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভক্ত সম্প্রদায় সমালোচনার নামে যে-ধরনের ভাষায় তাঁর প্রতিটি ছবির স্তুতি গেয়ে থাকেন তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকার ফলেই থীম এবং প্লট উভয়কেই যে পরিবর্তিত করা হয়েছে এই প্রস্তাবের সপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি, অন্যথায় করতাম না।

নষ্টনীড় গল্পটিতে কুড়িটি পরিচ্ছেদ, এক একটি পরিচ্ছেদ প্লট-এর এক একটি ধাপ। অত্যন্ত ঠাসবুনুন গল্প, জটিল ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটনার গতি অমোঘ এক পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। কিন্তু পাঠক যদি মিলিয়ে দেখেন তো দেখবেন চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে বিংশতি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে যা যা ঘটে তার আগাগোড়াই শ্রীসত্যজিৎ রায় অবান্তর বলে মনে করেছেন। তার ফলে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে নষ্টনীড়ে যা আছে তা অবশ্যম্ভাবী কারণেই অবিকৃত রাখা যায় নি, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয় এমন অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে, কারণ শুধু প্লট নয়, থীমও ইচ্ছাপূর্বক বদলান হয়েছে। বাগান করা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্যে দিয়ে অমল ও চারুর যে সখ্য সম্পর্কের প্রকাশ গল্পে পাই, তা চিত্রে পাই না, কারণ এই প্রাথমিক সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের থীম-এ আছে, শ্রীসত্যজিৎ রায়ের থীম-এ নেই। চারু ও অমলের সাহিত্যচর্চার চেহারাটা ছবিতে ও গল্পে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের চারু অমলের লেখা কাগজে প্রকাশ হয়েছে জেনে [খুশি হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না], পরে যখন চারুকে না জানিয়ে অমল চারুর

লেখা কাগজে প্রকাশ করে দেয় তখন [তাহার মন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না] কিন্তু তবু অমলের মনে হল [আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই] এবং এই থেকে যে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হল এবং তাতে যেভাবে মন্দা জড়িয়ে পড়ল তারই মধ্যে আমরা প্রথম নীড়ের মধ্যে নষ্টের ছায়া পড়তে দেখি। কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারু নিজেই অমলকে না জানিয়ে তার লেখা কাগজে পাঠায় এবং যখন তা ছাপা হয়ে আসে তখন সেই কাগজ দিয়ে অমলকে মারে। শুধু এইটুকুতেই গল্পের প্লট ও থীম এবং চারু ও অমল উভয়েব চরিত্রই বিকৃত করা হয়েছে এ যিনি মানবেন না তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে একটি দৃশ্য আছে, [পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল] এবং [চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।] শ্রীসত্যজিৎ রায় এরকম দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাসের একটি দৃশ্য দেখিয়েই ভূপতিকে তার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে দিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ, [অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল] এই বিন্দুতে পৌঁছতে প্লট-এর আরও ছয়টি ধাপের প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন। নষ্টনীড়ে ভূপতির জ্ঞানোদয় হয় উনবিংশ পরিচ্ছেদে, এর মধ্যে চারুর গহনা বন্ধক রেখে প্রীপেড টেলিগ্রাম পাঠানর ব্যাপারটা ভূপতির গোচরে এলো [একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলখ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল]; সন্দেহমাত্র, তার চেয়ে বেশি নয়। অমলের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর বর্ধমান থেকে ফিরে এসে ভূপতি ভাবে [তবে কি চারু অমলকে ভালবাসে না !] এবং বিবাহ করতে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও [বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে (চারু) হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া—ছি ! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র ? এত কলুষিত ? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে ? অসম্ভব।] কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা অমলের বিদায়ের কাল উপস্থিত হলে, তার হাত চেপে ধরে তাকে যেতে মানা করে, তারও আগে অমলের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। এই কান্না দেখাতে হয়েছে "পর্বত পথে

ঋত্বিক ঘটক

বাংলা, ১৯৬৪

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এবং আরও কয়েকজন চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে আমরা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলাম: আপনাকে যদি 'বাংলা, ১৯৬৪' এই নামে কোনো তথ্যচিত্র তুলতে বলা হত তাহলে কী ভাবে আপনি তা তুলবেন।

ইতিমধ্যে শ্রীঋত্বিক ঘটক আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। নিচে তা মুদ্রিত হল। অন্যান্যদের বক্তব্য আমরা আশা করি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করতে পারব।

সম্পাদক পরিচয়

প্রিয় সম্পাদক মশাই,

আপনি আমাকে 'বাংলা ১৯৬৪' এই নামে একটি তথ্যচিত্র তুললে আমি কী ভাবে তুলবো এ বিষয়ে কিছু লিখতে বলেছেন। মশাই, ভেবে পাচ্ছি না যে ছাপার অক্ষরে আপনারা ব্যাপারটাকে ধরে রাখতে পারবেন কি না।

দেখুন, একটা ছবি আমি করেছিলাম তার নাম ছিল 'সুবর্ণরেখা'। দুর্ভাগ্যবশত এখনও সেটা সাধারণ্যে প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি। তাতে এক ব্যক্তি মদ্যপান করে বেশ্যালয়ে যাবার জন্যে রওয়ানা হয়ে এক রেফেউজী কলোনীতে নিজের মায়ের পেটের বোনের সামনে গিয়ে হাজির হয়। এবং মেয়েটি আত্মহত্যা করে। এবং লোকটি সর্ব-ব্যাপারের জন্য নিজেকে দোষী বলে জগতের সামনে জাহির করে।

এর শেষ দৃশ্য ছিল এক সাংবাদিক লোকটিকে প্রশ্ন করতে যায়। আমার ইচ্ছে ছিল, এই যে শেষ ভোটাভুটি হয়ে গেল তারই পটভূমিতে এই দৃশ্যটি নেওয়া। এক পাশে কংগ্রেস, এক পাশে কমিউনিস্ট পার্টি, অন্য দিকে স্বতন্ত্র,—আরো যে কত কি, উদ্ভট প্রলাপের বিকার সমস্ত। রাজনীতি যে কত ভুয়ো হয়ে গেছে আজকে সেটাই দেখানো ছিল আমার উদ্দেশ্য। আজকের বাংলাদেশে আমরা গুণ্ডামী করি। আমরা ধর্মবিদ্বেষ প্রচার করি,—এত বছরের আন্দোলন এইখানে এসে পর্যবসিত হচ্ছে, এ যে কত বড়ো মর্মান্তিক ব্যাপার তা ভাবতেও আমার কষ্ট লাগে। বাংলা দেশের তথ্য চিত্র যদি আমাকে তুলতে বলা হয়, আমি তুলবোই না মশাই।

দেশটি ক্রমশঃই ইতরের দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর, কোনো সৎ শিল্পীর নিজের দেশকে ইতর বলে দেখানো উচিত নয়। ব্যাপারটা অধার্মিক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুলের লোক্যালে ফেরা

লোকটাকে এ বছরও শেয়ালদার রথের মেলায় খুঁজে পেলাম না। এইবার নিয়ে চার বার হল। বলেছিল, 'ভাল গাছ রেখে দেব, আসবেন। আসবেন কিন্তু—'

প্রথম বছর নাম মনে ছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে মুখ মনে ছিল। এ বছর নাম কিংবা মুখ কিছুই মনে পড়ল না। তবুও রথের মেলায় গাছ-পট্টিতে ঘুরলাম। আমি ভুলে গেলেও তার তো আমাকে মনে থাকতে পারে? ছাই! মাঝের থেকে নতুন জুতো পরে হাঁটতে গিয়ে পায় ফোস্কা পড়িয়ে ফেললাম। লোকটিকে খুঁজে বার করে খুব যে ফয়দা হবে, তাও নয়। বাড়িতে তো আমার নিতান্ত হাতে মাটি করার জমি। টবে ফুলগাছ লাগাব এমন ফুলবাবুও আমি নই। কাজেই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই বা কী!

তবু মধ্যে মধ্যে মনে হয় চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে সুনীলকে পাকড়ানো। ব্যস, তারপর বাগনান। ঠিক চার বছর আগে যেভাবে গিয়েছিলাম।

ট্রেন থেকে তো নামলাম। এবার স্টেশন থেকেও নামতে হবে। খাড়া সিঁড়ি। খলবল খলবল করে নেমে গেছে সোজা রাস্তায়। ডাইনে তাকান। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাইকেল, টায়ার, স্পোক, চেন, সিট, বেল, হ্যাণ্ডেলের এক অফুরন্ত দুর্ভেদ্য জঙ্গলই বটে। ট্রেনে করে অফিস-ফেরতা বাবুরা ফিরবেন, তার পরই সব ভোঁ ভোঁ। তখন ওখানে ছুঁচোর ডন দেওয়া ছাড়া আর কিছু দেখবার থাকবে না।

বাজারে অমল গাঙ্গুলিকে কি পাওয়া যাবে? তাহলে এক আঁচড়ে বাগনান থানার ছবিটা একবার হালফিল এঁকে নেওয়া যেত।

আটটি ইউনিয়ন নিয়ে বাগনান থানার চৌষট্টি বর্গমাইল আয়তন। পুবে দামোদর, পশ্চিমে রূপনারায়ণ। এ ছবিটা বদলাবার নয়। লোকসংখ্যা নিশ্চয়

এখন এক লক্ষ তিরিশ হাজারের বেশি। মাটির ওপর জনসংখ্যার চাপ তাহলে আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। মোট জমির যে অর্ধাংশ বসতভূমি, আর বাকি অর্ধাংশের যে দশ শতাংশ জমি জলাভূমি—এ চার বছরে তার কোনো হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না।

জলা বলতে মনে পড়ে গেল তারাপদ সাঁতরার কাছে শোনা সেই ছড়াটা:

বাগনানের জলার ধারে
মাগশয়নী কাছে
যদিও বা শোয়
ফিকির ফিকির হাসে।

বাগনানের মাঠে ধান না হওয়ার বর্ণনা। যারা পাটের দড়ি বুনত আর চট তৈরি করত, সেই কপালীদের কাছ থেকে ছড়াটা পাওয়া।

মোট লোকের অর্ধেক কৃষিজীবী হলেও এ থানায় মোট জমির অর্ধাংশেরও ঢের কম জমিতে চাষ হতে পারে। চাষ হয় প্রধানত ধান; তারপর পান, পাট, আলু, আর অন্যান্য রবিফসল। পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে বিঘায় গড়ে ধান হত দশ মণ—এখন চার মণে এসে ঠেকেছে। বড় বড় দুটো নদীই মজে যাওয়ায় সেচ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার দাখিল। তার ওপর হয় অনাবৃষ্টি, নয় বন্যা। ধানের ফলন যেমন কমেছে, তেমনি মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমে গেছে। কাজেই কম জমিতে লোকে এখন পান চাষের দিকে ঝুঁকছে। চার বছর আগেও দেখা গেছে, এ থানায় মোট দু হাজার পান-বরোজ এবং প্রতি তেরোজনে একজন লোকের নির্ভর পান-বরোজ।

সেবার বৈদ্যনাথপুরে আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম ষোল আনাই পান চাষ। বাঁটুল, মাশুমা, লুন্ঠিয়া, পালোড়া, বীরকুল, খানআদাপুরে ধানজমি নামমাত্র। ছাঁচি কম, বাংলা পানই বেশি। দামোদর আর রূপনারায়ণের চরে পাট চাষ ছিল তিন চার হাজার কৃষক-পরিবারের নির্ভর। ফড়েদের হাতে পড়ে পাটচাষীরা এখন নিঃস্ব।

চাষীবাসী বাদ দিয়ে শতকরা যে-পঞ্চাশজন বাকি থাকছে, তাদের মধ্যে বিশজন গ্রামে মজুর খাটে, দশজন কলকারখানার মজুর, দশজন অফিসের কেরানী, স্কুলের মাস্টার, ছোট দোকানদার আর বাকি দশ জন কামার, কুমোর, জেলে, শঙ্খকার, চিরুনীকার, চর্মকার—এই সব।

মনে আছে, বাজারটা পেরোতে গিয়ে দেখেছিলাম সারি সারি

মাইক্রোফোন, রেডিওর গমগমে আর সেই সঙ্গে দু চারটে ফটো তোলার ঝকমকানো দোকান। বাজী রেখে বলতে পারি এ চার বছরে এ লাইনের দোকান বেড়েছে বই কমে নি। মন্তর পড়তে পুরুতেরও এখন মাইকের দরকার হয়। নইলে মন্তরের জোর বাড়বে কেন? আর শুধু বিয়ের সম্বন্ধে কেন, পরীক্ষায় চাকরিতেও তো ফটোর দরকার।

তেমাথাটা আছে নিশ্চয়। বলা যায় না, এ চার বছরে চৌমাথাও তো হয়ে যেতে পারে। তা হলেও ডানদিকে এগিয়ে যেখানে তেরাত্তির ছিলাম সেই দোতলা মাটির বাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। বলা যায় না, মাটির বাড়ি ভেঙে দালানকোঠা হওয়াই তো নিয়ম। তাছাড়া ও রাস্তার এখন পায়া বেজায় ভারী। রূপনারাণে গাড়ি যাবার ব্রিজ হয়ে গেলে এটাই হবে জাতীয় সড়ক। তখন এ রাস্তার খাতিরই আলাদা। ও রাস্তার দুপাশে জমির দাম এখন নিশ্চয় আরও বেড়েছে।

রূপনারায়ণ আর দামোদরকে যোগ করছে ছ মাইল লম্বা মেদিনীপুর ক্যানেল। এপারে আঁটুলে ওপারে বাঁটুল। চার শো ঘর লোকের মধ্যে ঘর চল্লিশ শাঁখারী। তাঁদের কো-অপারেটিভের বয়স তখন তিন বছর। সেক্রেটারি রাধারমণ দাস। কো-অপারেটিভ এখন নিশ্চয় সাত বছরের হল। দশ টাকা শেয়ারে তখন এক শো সাত জন সভ্য।

শাঁখ থেকে শাঁখা হয় ধাপে ধাপে। প্রথমে হয় শাঁখ ভাঙা, ফোঁড়া, মালোই করা, মালোই ঘষা, শাঁখ চেরা। তারপর হয় সারাই—ভেতর ঘষা, ওপর ঘষা, নক্সা। তারপর পালিশ, তারপর মেরামত, তারপর সুতো বাঁধানো বা পেয়ার বাঁধা। ঘষামাজার কাজটা করে মেয়েরা।

শাঁখ আসে মাদ্রাজ আর সিংহল থেকে। কো-অপারেটিভ হওয়ার আগে সেই শাঁখ কিনতে হত কলকাতার ব্যাপারীদের কাছ থেকে। ওরা যখন রদ্দি মাল দিতে শুরু করল, তখন সরকারের চেষ্টায় মাদ্রাজ থেকে সরাসরি মাল আনাবার ব্যবস্থা হল। দু-এক খেপ দিব্যি ভাল মাল কম দরে পাওয়া গেল। টিউটিকোরিনকে শাঁখারীরা বলে তিতকুরি। কলকাতার বাজারে যা দাম, সে তুলনায় দেড় শো শাঁখে কমসে কম এক শো টাকা বাঁচল। হলে হবে কি, সরকারী চাকুরেরা জানেন না কোন্ মাল কোন্ দামে কিনতে হয়। তাঁরা ক্রমেই নিরেস মাল দিতে থাকায় ষোলটা সমিতিই সরকারের কাছ থেকে মাল কেনা বন্ধ করে দিল। সরকারী গুদামে পচতে থাকল ষোল লক্ষ টাকার মাল।

কলকাতার দালালদের ব্যবসা আবার ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে জমজমাট হল। গোড়ায় গোড়ায় তারা কম দাম নিল, জিনিসও ভাল দিল। তারপর থেকে সেই। জিনিস চলনসই, দাম বেশি। যে তিতকুরি মাল সরকারের কাছ থেকে ২৬০ টাকায় মিলছিল, দালালদের কাছ থেকে তা কিনতে হচ্ছে ৩৩০ টাকায়। এই মালে শাঁখা হবে ৪২৫ টাকা দামের। উদ্বৃত্তের সবটাই চলে যাবে মজুরি দিতে। একটা কারখানায় দশ জনে মাসে গড়ে ছ বস্তা শাঁখা তৈরি করতে পারে। যুদ্ধের আগে শাঁখার জোড়া ছিল ছ আনা; এখন দু টাকা। আসলে আড়াই টাকা হলে তবে পড়তায় পোষায়। কিন্তু দাম বাড়ালে লোকে কিনবে না।

এখন গেলে পদে পদে দিগ্‌ভ্রম হবে। আচ্ছা, দেউলগ্রাম দক্ষিণে নয়? গদি, কল্যাণপুর, মানকুড়—ঐ রাস্তাতেই তো!

দেউলগ্রামে গেলে হয়ত পাব কুশধ্বজ চন্দ্রকে। যারা মোষের শিঙের চিরুনি বিক্রি করে, এ চার বছরে তাদের হাল আর কতটা বদলাবে? শিঙের চিরুনির চাহিদা এখনও বেশ ভাল। চলছে বটে প্ল্যাস্টিকের চিরুনি। তবে শিঙের চিরুনির কদর তাতে কমে নি। তবে দামটা বাড়তে পারছে না প্ল্যাস্টিকের চিরুনিরই জন্যে।

শিঙের চিরুনি বলতে নানান ডিজাইনের খোঁপা-চিরুনি, তুতকুম-চিরুনি, পকেট-চিরুনি—এসব তো আছেই, তাছাড়া তৈরি হয় ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল, ছুরির বাঁট।

এ কাজ করে এ গ্রামের প্রায় তিরিশ ঘর লোক। এ শিল্প শুধু দেউল গ্রামে। আমতার কাছে থলেরসপুরেও দু-এক ঘরে কিছুটা হত।

কুশধ্বজেরা জাতে সূত্রধর। কোনো কোনো পরিবারে এখনও চিরুনি তৈরির সঙ্গে কাঠের কাজ আর প্রতিমা গড়ার কাজ হয়। কুশধ্বজেরা চিরুনি তৈরি করে আসছে প্রায় পাঁচ-সাত পুরুষ ধরে।

মোষের শিং আসে কলকাতার মীর্জাপুর, মেছোবাজার, কলুটোলার হামিদ সাহেব রশিদ সাহেবের গোলা থেকে।

ফাটাফুটো রদ্দি শিঙের মণ চব্বিশ টাকা। শিঙের আগাল যে নিরেট অংশটা দিয়ে ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল কিংবা ছুরির বাঁট তৈরি হয়, তার দাম তিরিশ থেকে চল্লিশ। ভালো ভালো বড় চিরুনি তৈরি করবার শিং পঞ্চাশ টাকা মন।

গ্রামে মহাজন চারজন। তার মধ্যে দুজন করে নিছক কেনাবেচার

কাজ—তারা বানানো-তৈরির মধ্যে নেই। মহাজন শিং এনে কারিগরকে দেয় বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ টাকা মন দরে। সেই শিঙের চিরুনি তৈরি করে কারিগর মজুরি পায় বিশ থেকে তিরিশ টাকা। ছাঁটগুলো পায় কারিগর। এক মন শিং থেকে মোটা কুচো হয় পঁচিশ সের আর গুঁড়ো কুচো পাঁচ সের। চাষীর কাছে সার হিসেবে দশ-বারো টাকা মনে মোটা কুচো আর পনেরো-বিশ টাকা মনে ছোট কুচো বিক্রি হয়। দুই মহাজনের কারখানায় দু টাকা রোজে যারা মজুরি করে, তারা কিন্তু কুচোকাচাগুলো পায় না।

এক মন শিঙের চিরুনি তৈরি করতে একজন লোকের চোদ্দ-পনেরো দিন লাগে। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে খাটতে হয় সকাল ছ-টা থেকে রাত ন-টা। কলকাতায় মাল বেচে মহাজনদের মন পিছু লাভ থাকে দশ থেকে পনেরো টাকা। বাগড়ি-মার্কেট, তামাপট্টি, মালাপট্টি, খ্যাংরা-পট্টির সামনের মাঠ—এই সব হল তাদের বেচবার জায়গা।

যারা ছিল স্বাধীন শিল্পী, তারা ক্রমে মহাজনদের কারখানার মজুর হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি বসে কাজ করলেও মজুরি নিচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে।

কুশধ্বজেরা দেখেছিলাম তখনও মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়ে নি। বাপ বেটায় মিলে মাসে মন দুই শিঙের চিরুনি তৈরি করে নিজেরাই কলকাতার মনিহারি-পট্টিতে বেচে আসত। এখনও কি তাই করে?

শাওড়া, মুগকল্যাণ আব খাজুবনান—এই তিন গ্রাম যেখানে এসে মিশেছে, তারই মোড়ের উপর রাস্তার পশ্চিমে গ্রামসেবা সঙ্ঘ। চণ্ডীবাবু নিশ্চয় আছেন?

তাঁরই মুখে শুনেছিলাম সেবাসঙ্ঘ পত্তনের গল্প। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। সাতচল্লিশ সালে বাগনান থানার ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে জাতীয় পতাকা তোলবার সময় যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আজও তা বুকের মধ্যে খচ খচ করে। তখন কী ভাবা গিয়েছিল আর পরে কী হল। ক্ষমতা হাতে পেলে বোধহয় এই রকমটাই হয়। কংগেস ছেড়ে প্রজাপার্টি, কিছুদিন ভূদান। তারপর সব ছেড়ে গঠনমূলক কাজ।

ঊনপঞ্চাশ সালে চণ্ডীবাবু এ জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন সবচেয়ে ওঁছা বলে। এখানে দুটো পাড়া—গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়া। এরা না-হিন্দু, না-মুসলমান। মেয়েরা চুড়ি বিক্রি করে, ছেলেরা সাপ ধরে। এরা যা ক্ষতি করত তা নিজেদের—পরের ক্ষতি পারতপক্ষে এরা করত না। মদ চোলাই করত, তেতাস জুয়ো খেলত আর ছিল মেয়ে আমদানি করার ব্যবসা।

এখন এ দুপাড়া পুরোপুরি শ্রমজীবী। মেয়েরা এখনও চুড়ির ব্যবসা করে। সেই সঙ্গে ঢেঁকিতে ধান ভাঙে, চরকায় সুতো কাটে। ছেলেরা দু-চারজন এখনও সাপ ধরে। তবে বেশির ভাগই হয় রিক্সা চালায়, নয় জনমজুরি করে, নয় ছোট ছোট দোকান করে।

প্রথমে এখানে কাজ শুরু হয় কস্তুরবা গ্রামসেবিকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুজন মহিলাকর্মী নিয়ে। গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়ায় খোলা হল বালবাড়ি। আড়াই বছর থেকে আট বছরের মধ্যে যাদের বয়েস, তাদের বালবাড়িতে এনে নিয়মানুবর্তিতা আব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখানো আর দৈহিক শ্রমের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা হল। বালবাড়িতে ক্লাস টু অব্দি পড়ানো হয়। সেই সঙ্গে নাচ গান খেলা। এ দুই পাড়ায় পনেরো বছরের কম যাদের বয়েস, এখন আর তাদের মধ্যে কেউ নিরক্ষর নেই। বালবাড়ি চালাবার খরচের তেরো আনা অংশ আসত কস্তুরবা ফাণ্ড থেকে। গোড়ায় গোড়ায় বছরে বারোটা করে তিন দিনের শিবির হত। তাতে হাওড়া জেলার নানা এলাকা থেকে যুবকেরা আসত। একেকবারে গড়ে তিরিশজন করে। শিবিরের কর্মসূচী ছিল: পুকুরের পানা তোলা, রাস্তা তৈরি, আগাছা পরিষ্কার, কম্পোস্ট সার তৈরি, পাঠচক্র, আলোচনা বৈঠক, সুতো-কাটা, প্রার্থনা। দুঃস্থদের ওষুধপত্র, রোগীর সেবা, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার আর বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষার ভাঁড় বসানোর ব্যবস্থা হল।

কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল, সমাজসেবাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে গেলে হয় চাষবাস নয় কুটির-শিল্পের আশ্রয় নিতে হবে। এ অঞ্চলে চাষের চেয়ে কুটির-শিল্পেই সুবিধে বেশি। সুতরাং জন তিরিশ কর্মীকে কয়েক খেপে পাঠানো হল ওয়ার্ধা, নাসিক, বেলগাঁওয়ে তেলসাবান-তৈরি, কাঠের কাজ, চামড়া, তাঁত, মৃতশিল্প, মৌমাছি-পালন শিখতে। ধাত্রীবিদ্যা শিখতে পাঠানো হল এলাহাবাদে।

সেবাসঙ্ঘে এখন সতেরো জন ট্রেন্‌ড্‌ কর্মী। ঘানি দিয়ে শুরু হয়ে এখন মাটির কাজ, সাবান-তৈরি, তাঁত, মৌমাছি-পালন, হাঁসমুর্গীর চাষ। সমাজসেবার কাজ বলতে বালবাড়ি ছাড়াও আছে ভ্রাম্যমান পাঠাগার, সপ্তাহে দুদিন মেয়েদের দর্জির কাজ শেখানো, পঞ্চাশ জন দুঃস্থকে গুঁড়ো দুধ বিলি। তাছাড়া আছে দাতব্য চিকিৎসালয়—অর্থাভাবে সেখানে শুধু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ব্যবস্থা। আর দুজন ধাত্রী নিয়ে মাতৃমঙ্গল।

জাপানী প্রথায় চাষ শেখাবারও একটা ব্যবস্থা আছে। বিঘায় খরচ বাড়ে চল্লিশ টাকা, কিন্তু তেমনি লাভও বাড়ে বিঘায় পঞ্চাশ টাকা। ফসল আড়াই গুণ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে। কিন্তু হলে হবে কি, যে-চাষী জমি চাষ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিটা তার নয়। যে-জমিতে সে সার দিচ্ছে, সে জমি পরের বছরও তার থাকবে কিনা ঠিক নেই। তাছাড়া ফসল যেমন বাড়বে, তেমনি সে-ফসলে মালিকের ভাগটাও তো সেই হারে বেড়ে যাবে।

সেবার রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে সত্যিই চোখে পড়েছিল—দুপাশের বাড়িগুলোর উঠোনে বিলিতি আর দো-আঁশলা মুর্গীর ছড়াছড়ি।

দেউলটি মহাশ্মশানের রাস্তাটা একা গেলে এখন আর খুঁজে পাব না। সেই যে যেখানে মুলো-কালী আর তাল-কালীর ভারি মেলা হয়। আর ভল্টাসের সেই প্রাক্তন কেরানিটি? কাঠের কাজ ছিল যাঁর বংশগত পেশা? আশ্রম খুলে যাঁর দিব্যি শাঁসে-জলে চেহারা হয়েছে!

দেবানন্দপুরে শরৎ স্মৃতি-সংগ্রহশালায় দেখেছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ওভারকোট, ছাইদানি, লেখবার ডেস্ক, চটিজুতো, পাণ্ডুলিপি আর অপ্রকাশিত বহু চিঠিপত্র। পাথরে খোদাই গুপ্তযুগের সূর্য-মূর্তির ভগ্নাংশ, পাল আর সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তি, কালো পাথরের বিষ্ণুপট্ট, জৈনমূর্তি, চামুণ্ডামূর্তি। প্রাচীন মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য আর বিভিন্ন যুগের মুদ্রা। তালপাতা আর তুলোট কাগজে লেখা তিনশো সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার পুঁথিপত্র, মূল্যবান পুরনো দলিল-দস্তাবেজ। নানা জেলা থেকে আনা হাতেটেপা পুতুল, রংকরা পুতুল, নক্সীকাঁথা, মাটির ঘোড়া, পট, নক্সা-করা কাঠের কাজ। কত কী!

সাত কাঠা জমির উপর মিউজিয়ম গড়ার স্বপ্ন কতদূর সফল হল?

যে-লোকটাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, তাকে আমি পাব ভুরবেড়িয়ায়। ভুরবেড়িয়া, না, ভুলবেড়িয়া? লোকে দু-রকমই বলে। যে নামই হোক, বদলে বদলে একদিন হয়ত হয়ে যাবে ফুলবেড়িয়া।

এ গ্রামে ফুলের চাষ হচ্ছে হালে। দশ এগারো বছর আগেও এ গাঁয়ে ফুলের চাষ করত মোটে দু-তিন ঘর। গ্রামে ছেচল্লিশ ঘর লোক। বলতে গেলে ষোল আনাই এখন ফুলচাষী। ধানচাষ সামান্য। এ গাঁয়ের প্রায় বারো আনা লোককে চাল কিনে খেতে হয়।

ফুলের চাষে অনেক হ্যাপা। মাটি কোপানো। সার দেওয়া। কলম

বাঁধা। নিড়ানো। জল দেওয়া। গাছ হাপর দেওয়া, অর্থাৎ ডাল থেকে কেটে মাটিতে পোঁতা। চারানো। রোজ গড়ে পাঁচটা করে জন লাগে। কোপানো আর সার দেওয়ার কাজে রোজ দু টাকা। কলম বাঁধতে পাঁচ টাকা। হাপর দিতে তিন টাকা। অন্যান্য টুকিটাকি কাজে দু টাকা।

বাজারে বিক্রির জন্যে গাছ বয়ে নিয়ে যাবার একটা খরচা আছে। তাকে বলে বউড়ি খরচা। ঝুড়ি পিছু এক টাকা। তা বাদে আছে পার্সেল খরচা।

চার বিঘে জমিতে বছরে বীজ কিনতে হয় তিন-চারশো টাকার। সবচেয়ে বেশি দাম পামগাছের বীজের। পিচাড়িয়া দশ টাকা হাজার, অ্যারিকা আট টাকা হাজার।

দাম পাওয়া যায় চারা বিক্রিতেই সবচেয়ে বেশি। এক ধরনের বিলিতি গোলাপ আছে, একটা চারার দাম তিরিশ টাকা। তাছাড়া ফুল বিক্রি আছে। সবচেয়ে বেশি কাটে গোলাপ।

কোলাঘাট থেকে ভোরবেলায় ছাড়ে 'ফুলের লোক্যাল'। রোজ যায় প্রায় তিনশো ফুলওয়ালা।

বলাই মান্নার বাগানটা আরেকবার দেখে আসতে হবে। ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফুলচাষী বলাই মান্নার বয়েস এখন বোধহয় চুয়ান্ন হল?

ওর বাগানে ফলের চাষও কিছু হয়। আম, কালোজাম, গোলাপজাম, লিচু, সবেদা, জামরুল, পেয়ারা, কাগজী লেবু, বাতাবী লেবু, কমলা, ন্যাসপাতি, ডালিম, বেদানা। কলমের চারা বিক্রি হয়। সবচেয়ে দাম বেশি আমের চারার। একেকটি তিন টাকা।

আসল বাগান ফুলের। কত সব রকমারি ফুল। কত সব বাহারী নাম।

বিলিতি গাছ: ট্যালিসম্যান। ভট্টচাষ্যি হোয়াইট। স্নো হোয়াইট। ইজি হিল। ফর্টিনাইনা। গোল্ডেন ফেয়ারি। লেডী হ্যারিংটন। পলিরন। গ্লোরিয়া ডি ডচার। অ্যামেরিকান বিউটি। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। পীস। বার্সিলোনা। সুলতান। আলেকজাণ্ডার বার্নেস। ইটয়েল ডি নিয়ন। ইটয়েল ডি ফ্রান্স। কালো গোলাপ নিগ্রেন্ডি। নাইট। এলিট। পিকচার। ব্ল্যাক প্রিন্স।

আছে বসরাইল, দো-রঙা, চাইনিজ গোলাপ। বেল, রাইবেল, মোতিয়া বেল, মডরু বেল, থ'য়ে বেল, জাপানী রাইবেল। যুঁই, ডবল আর সিঙ্গেল যুঁই, চীনে যুঁই, চামেলী, জাপানী আর দেশী জেসমিন, লতানো টিকোমা জেসমিন, স্বর্ণ যুঁই, স্বর্ণ চামেলী। ডবল আর সিঙ্গেল জাপানী গন্ধরাজ।

ডবল আর সিঙ্গেল টগর। কামিনী। লাল আব সাদা করবী, কাশীর করবী, কপিলাক্ষ করবী। বোগেন ভেলিয়া। রিডাই, জার, বিউটি, ইণ্ডিয়ান প্রিন্স, টর্টিলাস, মহারাজা অব মহীশূর, ভিক্টোরিয়া পাতাবাহার। রজনীগন্ধা। কাঞ্চন। শিউলি। লাল আর সাদা স্থলপদ্ম। ম্যাগ্নোলিয়া। গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। ডালিয়া।

চন্দ্রমল্লিকা। স্বর্ণ চাঁপা, জহুরী চাঁপা। হাস্নুহানা। পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী, অরোরা জবা।

আছে তেজপাতা, দারচিনি, পাম, ঝাউ। আর রকমারি ফুলেব রকমারি নাম: নেতাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিধান রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ।

ফুলচাষী যে-দামে যে-ফুল বেচছে, আপনি তার দশ বারো গুণ বেশি দামে সেই ফুল কিনছেন। হেঁয়ালীর মতো শোনালেও কথাটা সত্যি। কেননা সটান চাষীর হাত থেকে তো আর আপনার হাতে যাচ্ছে না। চাষী আট আনা শ-য় চালানদারকে বেচছে। চালানদার সে-জিনিস পাইকারকে বেচছে দু-টাকা শ-য়। পাইকার সে-ফুল দোকানদারকে তিন-চার টাকা শ-য় বেচছে। দোকান থেকে আপনি পাচ্ছেন পাঁচ-ছ টাকা শ-য়। এই মাঝের ধাপগুলো কমিয়ে আনতে পারলে চাষীরও কিছু বেশি থাকত আর আপনারও কিছু কম পড়ত।

দেখুন, এতক্ষণে লোকটাকে মনে পড়েছে। দাওয়ার উপর বসে কথা হচ্ছিল। সামনের একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল গাঁক গাঁক করে রেডিওর আওয়াজ। মুড়ি, তেলেভাজা আর গরম চা এল। ঢ্যাঙা মতো সেই লোকটা। মুখ মনে পড়ছে। ভুরবেড়িয়ায় গেলেই চিনতে পারব। দাওয়াটার উপর আবার গিয়ে বসলে নামটাও হয়ত মনে পড়ে যাবে।

চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে কেন? এবার অছিপুরে গঙ্গা পেরিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠব।

আর ফিরব ভোরবেলাকায় ফুলের লোক্যালে।

তা যদি করি, তাহলে আসছে বার শেয়ালদার রথের মেলায় একটা ভালো ফুলের গাছ আমার কপালে নাচছে।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কয়েকটি শব্দের গল্প

নিভৃত দুয়ারগুলি খুলে যায়। প্রসিদ্ধ উত্তাপ
প্রস্তরে গলায় তৃষ্ণা। জানালার সঠিক নিকটে
অর্ধত্যক্ত অন্ধকার ক্রীড়া করে। ঝর্ণার উপমা
শয্যায় শায়িত। দীর্ঘ দৃশ্যমান আনন্দের দ্যুতি
শব্দের সৈকত ঘেঁসে ছায়া রাখে। রতি রঙ্গে সুধা
দুহাতে সৃষ্টির মুখ তুলে ধরে নির্বাক বিরলে।

মিলনের মধ্যরাত্রি হাতে করে, বেলা দ্বিপ্রহরে
হেঁটে যাই, অন্তরাল হতে দূরে তীব্র কোলাহলে।
পায়ে পায়ে ফেরে নদী। জনপদে শব্দ অবিরাম
মেঘের সমুদ্র ভাঙে। প্রসাধন সাজায় সংসার।
দৃশ্যপুঞ্জে খেলা করে উৎসবের বিবিধ বন্ধন।
সহস্র সংবাদ জাগে প্রতিদিন। সময়ের হাতে

চতুর্দিকে খুলে যায় অবরুদ্ধ দরোজা-জানালা
মধ্যরাত্রি দ্বিপ্রহর একই সঙ্গে প্রতিশ্রুত শব্দের সৈকতে ॥

শিবশম্ভু পাল

এক একটা কথা বড় গেঁথে যায়

এক একটা কথা বড় গেঁথে যায় ত্বকপৃষ্ঠের নিচে
অনেক তলায় দৃঢ় বেঁচে থাকে, তার পাশে আরও কত কথা
স্বতই ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ছায়াঘন বনস্পতি হয়
তাদের স্পর্ধিত শির মৃত্যুর চেয়েও বড় বহুগুণ। মৃত্যুকে তখন
বামনের মতো লাগে হাস্যকর অথচ করুণ।

সেইসব কথা নিয়ে মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ বনমহোৎসবে
মেতে উঠি, চলে আসি বিশ্ব থেকে বাড়ির ভিতরে।
স্পষ্ট এক অন্তরাল তৈরি হয় স্বেচ্ছাপ্রয়াণের
অলৌকিকে। কাকে আমি কৃতজ্ঞতা সঁপে দেব, আর কেউ নেই
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

দৈবের মতন কেন কথা বলো মনে হয় ঝড়ের নিশীথে
আকাশের মধ্য থেকে দেবতার কণ্ঠস্বর আনম্র বজ্রের মতো
গেঁথে যায় স্নায়ুর ভিতরে।
কেন সূর্য হয়ে যায় আমার যন্ত্রণা কেন আমার কল্পনা
বৃষ্টি হয় কেন স্মৃতি অনুকূল হাওয়া…
ভরে যায় বনতল কবিতার ছায়াঘন অসংখ্য উদ্ভিদে।

পাতার মর্মরধ্বনি ফিরে আসে বার বার শ্রুতির দুয়ারে
বক্ষোদেশে শব্দময় হিল্লোলিত ফসলের ক্ষেতের মতন
অগাধ আনন্দ জাগে। প্রিয়তমা বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে
তীব্রতর বনফুল প্রতিধ্বনি করে : ওগো তুমি
কখনো মরার নাম মুখে আনবে না…।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

আত্মহত্যাপ্রবণ

এর থেকে তো ভালোই ছিল অথৈ সরোবরে
ডুবে মরতে গিয়ে আবার চমকে ফিরে আসা
হয়তো ভালোবাসা
ফিরিয়ে দিতে পারতে তুমি যখন এলে ঘরে ॥

জলের ছায়ায় আকাশ কাঁপে অচেনা দর্পণ
কেমন যেন স্বচ্ছ মনে হয়
হাওয়ার স্রোতে রটিয়ে দিল তীব্র পরাজয়
এবারে তার সঙ্গী একা হত্যাকারী মন।

দূরের আলো কাঁপছে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে
অন্ধকার, শীতল এই জল
এইতো আছে চিরকালের জমানো সম্বল
কোনখানে আর যাবি পালিয়ে ?

গলায় বাঁধা তীব্র স্মৃতি হলাহলের মতো
একদা যে ছিল তোমার প্রিয় ;
পরম স্নেহে যত্নে রাখা অভিজ্ঞান চিরস্মরণীয়
পাগল, তুই হবি না সংযত ?

ওই যে দ্যাখ্ দীঘির জলে রৌদ্র খেলা করে ॥

সম্পাদকীয় নিবেদন

প্রকাশনের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেল। সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে তা মার্জনা করবেন। কয়েকটি বিজ্ঞাপিত রচনা ছাপা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে না পৌছনয় এ-সংখ্যায় পত্রস্থ করা গেল না। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমরা নিরুপায় ছিলাম।

রবীন্দ্র-ভারতী কর্তৃপক্ষ গগনেন্দ্রনাথের ছবিটি মুদ্রনের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন পরামর্শ দিয়ে এবং আরও নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন।

বাংলাদেশের প্রবীন ও নবীন লেখক ও শিল্পীরা পরিচয়-এর আহ্বানে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন তাতে আমরা নতুন প্রেরণা পেয়েছি। আমরা আশা করি, পরিচয় তাঁদের স্নেহ থেকে কখনও বঞ্চিত হবে না।

নাথ প্রেস, মোহন প্রেস ও গণশক্তি প্রেসের কর্মীরা পরিচয়কে নিজ পত্রিকা জ্ঞান করে মুদ্রন-ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন বলেই পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হল।

পরিশেষে বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, গ্রাহক ও পাঠক ও লেখকদের প্রতি জানাই আমাদের শারদ সম্ভাষণ। তাঁদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়।

[শম্ভু রায়
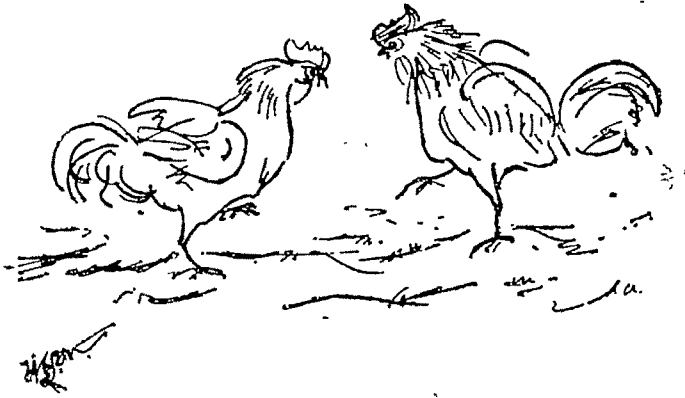
১৩৭১

কার্ত্তিক সংখ্যা

প রি চ য়

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত

সাহিত্য প্রকাশিকা : প্রথম খণ্ড — দশ টাকা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থশাস্ত্রী

মহাভারতের সমাজ : দ্বিতীয় সংস্করণ — বার টাকা

জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তার — সাড়ে পাঁচ টাকা

তন্ত্র পরিচয় — দুই টাকা

মীমাংসা দর্শন — এক টাকা

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

সাহিত্য প্রকাশিকা : দ্বিতীয় খণ্ড — ছয় টাকা

সাহিত্য প্রকাশিকা : তৃতীয় খণ্ড — আট টাকা

সাহিত্য প্রকাশিকা : চতুর্থ খণ্ড — পনের টাকা

পুঁথি পরিচয় : প্রথম খণ্ড — দশ টাকা

পুঁথি পরিচয় : দ্বিতীয় খণ্ড — পনের টাকা

পুঁথি পরিচয় : তৃতীয় খণ্ড — সতের টাকা

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র : দ্বিতীয় খণ্ড — পনের টাকা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি সম্পাদিত

রবীন্দ্র রচনা কোষ : প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব — সাড়ে ছয় টাকা

রবীন্দ্র রচনা কোষ : প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব — সাত টাকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাজশেখর ও কাব্য মীমাংসা — বার টাকা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার — আড়াই টাকা

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

মাধব সংগীত — পনের টাকা

শান্তিনিকেতন

॥ নতুন বের হল ॥

শান্তনু সেনগুপ্ত

মতাদর্শের সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন

এক টাকা

●

রেবতী বর্মণ

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ৩'৫০

●

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ২'৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর

শ্রীগোপাল প্রকাশনীর সদ্যপ্রকাশিত বই ঃ—

মহাস্থবির

দীর্ঘকাল পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের একখানি বই

শিউলি ৩'০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রসমধুর উপন্যাস

বধূমল্লার ৪'৫০

শ্রীবাসব-এর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

বাঁধন ছেঁড়া দাগ ৫'০০

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

জীবন-সৈকতে ২'৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ ডি. এম লাইব্রেরী ॥ ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পরিচয়

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৪
কার্তিক, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : প্যানোর‍্যামা

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মনীষার প্রথম বই

অধ্যাপক **হীরেন মুখার্জির**

দি জেণ্টল কলোসাস

এ স্টাডি অব জওয়াহলারল নেহরু

পনেরো টাকা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
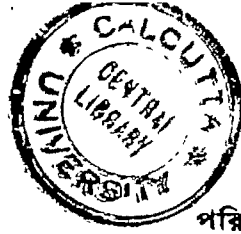
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির দৃষ্টি

আমরা কাজের কথা বলি প্রতিদিনের চলতি ভাষায়, তাতে ছন্দ নেই, তাতে যত্ন নেই। আমরা ভাবের কথা বলি কাব্যের ভাবের ভাষায়, তাতে সংগীত আছে, গতি আছে। তার কারণ, আমাদের কাছে ভাবের কথা বহুমূল্য, তাকে আমরা আত্মার গভীরতার মধ্যে দৈববাণীর মতো আবিষ্কার করি। তাকে প্রকাশ করার দ্বারা মানুষের চিরকালের ভাণ্ডারে আমরা সম্পদ বাড়িয়ে তুলি। যে-জাতি মানুষের এই অন্তরতম বোধশক্তির ঐশ্বর্যকে সাহিত্যের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেনি তাদের চিত্তের জড়তায়, তাদের আত্ম-প্রকাশের দারিদ্র্যে বিধাতার অভিসম্পাত।

আমরা চোখের দেখা যা দেখে থাকি দরকার হলে তাকে প্রতিরূপ দিয়ে আঁকি। প্রাণীবৃত্তান্তের বইয়ে যখন ঘোড়া আঁকি, সে চোখের দেখা ঘোড়া, তার মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত লাইনের হিসাব মেলে। আমরা প্রাণের দেখা যা দেখি তাকে প্রকাশ করি চিত্রকলায়, সে কেবলমাত্র বাহিরের নকল নয়, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্চে আমাদের মনের অনুভূতি। চিত্তের গভীরতায় চোখের দেখা বিশ্বকে আমরা আত্মার দেখায় দেখি, সেই দেখা-বিশ্বকে যখন বাইরে প্রকাশ

করি তাতে আমাদের আত্মার রস আত্মার রঙ লাগাতে হয়, তাতে এমন কিছু থাকে যাতে বোঝা যায় সেটি আর্টিস্টের প্রাণে প্রাণ পেয়েছে। যে-জাতির চিত্রকলায় মানুষের এই প্রাণের দেখা আপন জগৎ বিচিত্র শক্তিতে ও সৌন্দর্যে ধরা পড়েনি, সেই জাতির চিত্রের অন্ধতায়, তার আত্মপ্রকাশের দারিদ্র্যের পরে সৃষ্টির আনন্দে আনন্দিত বিধাতার অভিসম্পাত।

এই রচনাটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'চতুরঙ্গ' (ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীসুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত) পত্রের বৈশাখ, ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত কোনো পত্রে বা গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।
শ্রীসিদ্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সি. এফ. অ্যাণ্ডুজ

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

পুনা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২০

আপনার জন্ত আমাদের সকলেরই মন কত ব্যাকুল। তবু গত চিঠিতে আপনার বিরাট কাজের যে-পরিকল্পনাটি জানিয়েছেন, তাতে আমাদের মনেও উদ্দীপনা জেগেছে। আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি: যে-ধরনের বৃহৎ কাজের কল্পনাও এ জীবনে করতে পারি নি, আপনার সে কাজে সাহায্য করতে পারলে যে-আনন্দ আমি পাব, তা প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। আপনি যে-পথ পরিক্রমণ করে চলেছেন, তার প্রতিটি পদক্ষেপে আমার হৃদয় চলেছে আপনার সঙ্গে। এখানে ভারতবর্ষে চারিদিকে যে বিরাট আন্দোলন চলেছে, তার থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখা খুবই কঠিন। তবু এতে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মন তৃপ্ত হয় নি।

আমি উপনিষদের একটি বাক্যের অনুকরণে কেবলই বলে চলেছি, 'নেতি, নেতি।' কারণ মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তো এ নয়! তাই যতবার বক্তৃতা দেবার জন্ত আমাকে শান্তিনিকেতনের বাইরে যেতে হয়েছে, ততবারই একই ধরনের অতৃপ্তি এসে আমার মনকে অধিকার করেছে। আমি বুঝেছি যে বাহিরের এই পরিবর্তনে বিশেষ আনন্দের কিছু নেই। জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বমানবিকতাবোধে না পৌছনো পর্যন্ত জগতে শান্তি নেই। আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং মুক্ত করবই। কারণ এই পরাধীনতা তার অন্তরাত্মাকে শোষণ করছে। ক্ষমতার গর্ব করার জন্ত নয়, স্বার্থপর কলহে মত্ত হবার জন্তও নয়, আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব কেবল মানবকল্যাণের জন্ত। মনের দিক থেকে এখন আমি এতটা ক্লান্ত যে, যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারছি না। তবু এই উৎসবের সময় আমার সমস্ত ভাবনা আপনাকে ঘিরেই ছিল। আপনার কাজে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে আমার মনে যে অপার আনন্দ এল—সেই কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় অনুরাগে আমি নতশির হই।

দিল্লী, ৫ই জানুয়ারি, ১৯২১

এই চিঠিতে আপনাকে যা জানাতে চাই তা হল—এই অসহযোগ আন্দোলনটি ক্রমশ শুচিশুদ্ধ আত্মিক শক্তিতে সুদৃঢ় হয়ে উঠছে। অস্পৃশ্যতার গ্লানি দূর করতে চাইছে এবং ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে, হিন্দু মুসলমানে ভেদবুদ্ধির অপসারণের জন্য দেশকে প্রদীপ্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

সামাজিক উন্নয়নও এই আন্দোলনের অঙ্গ। একনায়কত্বের ভয়ও দূর হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত গান্ধী বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চান, শুধু তাঁর নিজের মতেই একে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান না।

সবচেয়ে আনন্দের কথা—ভারতবর্ষের যুবচিত্ত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। মডারেটদের দলে যাঁরা আজও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন নি, তাঁরাও শিগগিরই দ্বিধা কাটিয়ে উঠবেন। সম্মিলিত ভারতের স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলেছে আশা হয়।

গুরুদেব, আমার সমস্ত মনপ্রাণ ইয়োরোপে আপনার কাছে ছুটে যেতে চায়। উইলি লিখেছে আপনিও তাই চান। কিন্তু এ সময়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই আমার পক্ষে ঠিক হবে না মনে হচ্ছে। কর্ম সমিতি একযোগে আমাকে এখন চলে না যেতে অনুরোধ করছেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের এই উদ্বেল অবস্থায় আমার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ১৯১৯ সালে আপনি আমাকে যখন পাঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন, দেশের অবস্থা এখন প্রায় সে রকমই সঙ্গীন।

বোলপুর, ১৭ই জানুয়ারি [১৯২১]

আজ ভোরে উঠে সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে দেখতে আমি আপনার উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করেছি, মনে হচ্ছিল যেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক এই অনুভূতির যোগেই বিশ্বপিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমি মিলিত হই। আমার ব্যক্তিসত্তা তাঁর চিরন্তন সত্তার কাছে পৌঁছয়। যখনই মানুষের প্রেম আমাকে এভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে যে মনে হয় আমার সমস্ত প্রকৃতি আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হয়ে গেছে, তখনই বুঝতে পারি আমার অন্তরে বাহিরে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এসেছে—

A Sunset touch
A chorus ending from Euripides
And there's an end of all our hopes and fears.

তাঁর যে-স্পর্শ, যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত, সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় তারই ক্ষণিকের প্রকাশ। সংগীতেও তার রেশ দুঃখ-সুখের সীমার পারে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই রসসৃষ্টির ক্ষমতা আমার কম। তবু তা আস্বাদনের অন্য উপায় জানি। বর্ণে ও রেখার ভঙ্গিতে তা ধরা দেয়, সে বিষয়ে আমার কিছু দক্ষতাও আছে। কবির বাণীর ছন্দেও সেই অপূর্ব রহস্যের ইশারা। সেই আবেদনেই আমার মন সহজে দোলে। সেই একটুকু কথা, একটুকু ছোঁওয়াই চকিতে মন মধুর রসে ভরে দেয়। তিনি আসেন, আমাদের কাছে আসেন, আমরাও তাঁকে চাই। তাতেই আমাদের আনন্দ। এ যে অন্তরের আকৃতি, বুদ্ধিতে এর বিচার চলে না।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯২১

আপনার চিঠিগুলো পেয়ে কি যে আনন্দ পাই, তা আমি বলতে পারি না। এই সপ্তাহে চিঠি পাওয়া আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। আর যে-চিঠি আমি পেলাম সে আমার কাছে বহু মূল্যবান। আপনি লিখেছেন, সুজাতা বুদ্ধকে যে পরমান্নের পাত্র দিয়েছিলেন, সে ঘটনাটি স্মরণ করলে আমাকে আপনার মনে পড়ে! অতি দুর্বল শরীরে যখন শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন এই চিঠি আমাকে কতখানি আনন্দ দিল, আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারবেন।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯২১

পূজনীয় গুরুদেব,

শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত হয়েছি। এখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিজেদের পাঠ্যসূচী অনুসারে কাজ শুরু করব। আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই পরীক্ষা-পদ্ধতিটা আমাদের উপর এতকাল ভার হয়ে চেপেছিল।...

অসহযোগ আন্দোলনের দোলা লেগে সারা দেশের জীবনের স্পন্দন আজ দ্রুত অনুভূত হচ্ছে। ছাত্রদের জীবনও যেন উদ্বেল হচ্ছে। তারা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। সকলকে ওরা আশ্চর্য করে দিয়েছে—এমন কি মনে হয় ওদের নিজেদের বিস্ময়ও কম নয়। এখন নেতাদের বলছে—আমরা ফিরে যেতে চাই না। আমাদের কাজ দিন। আমরা গ্রামে গিয়ে দেশের লোকের সেবা করতে চাই। এর আগে আর কখনও গ্রামসেবার জন্য এতখানি

উৎসুক এমন একটি যুবদল গঠিত হয়ে ওঠে নি। এ খবরে আপনার যে কত আনন্দ হবে জানি। আর এতে সাধ্যমত আমরাও এগিয়ে যাই, এটাই আপনি চাইবেন, তাও জানি। আমরা সকলে একমত হয়ে সমিতিতে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি যে, স্কুলকে গ্রামোন্নয়ন শিক্ষার কেন্দ্র করা হবে।...

আজ সকালে বোলপুর স্কুলের কয়েকটি বড় ছেলে আবার আমাকে এসে বলল, তারা সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে আর চলতে চায় না, নিজেদের স্কুল নিজেরা গড়তে চায়। তারা জানতে চাইল, এ ব্যাপারে কি তাদের কিছু সাহায্য করতে পারি? আর যদি তাদের চেষ্টা সার্থক হয়, তবে কি তারা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত হতে পারে? এতে বিশ্বভারতীর ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবার সম্ভাবনা দেখে গৌর আর অন্য শিক্ষকরা অনেকে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমিও এ বিষয়ে খুব উৎসুক। 'গুরুদেব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর' এই মন্ত্র জপ করার দলে আমি নেই। তবু আমি বুঝি যে আপনার যে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নতুন আদর্শ তাকে আপনা থেকে গড়ে উঠতে দিতে হবে। যদিও এ ধরনের কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব, কিন্তু আপনি ফিরে আসার আগে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেরকম নিশ্চিত পরিণত যোগাযোগ গড়ে তোলাও ঠিক হবে না। তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে আপনার কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। শুধু শিক্ষার দিকে নয়, গ্রামোন্নয়নের কাজেও শান্তিনিকেতন সমগ্র দেশের সত্যকারের কেন্দ্র হবে।

আজ একটি ছোট ঘটনায় খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনি জানেন বোধহয় বাঙালি ছাত্ররা আগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসে খায়। কিন্তু গুজরাটি ছেলেদের খাবার ঘরে এখনও আমি ঢুকিনি। কারণ কারো মনে কষ্ট দিতে আমি চাই না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় এই প্রথমবার গুজরাটি ছাত্ররা এসে তাদের সঙ্গে খাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করল। এটি বড় কম সংস্কার নয়। মনে হচ্ছে আমাদের সব চেষ্টা এতদিনে সার্থক হল।...

এ বছরে আমার আর আপনার কাছে যাওয়া হল না। না যেতে পারার সবচেয়ে বড় কারণ হল, আপনি ফিবে আসার আগে প্রতিদিনের যত্ন দিয়ে আশ্রমকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাছাড়া আমার যেটুকু উদ্বৃত্ত সময় তা এখন কলকাতার ছাত্রদের জন্য দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের কথাও ভাবতে

হবে—কেউ জানে না কোন্ মুহূর্তে এখানে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে? এপ্রিল আর মে—এ দুটি মাসই বিশেষ সংকটের সময়।

১

বোলপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

আপনার চিঠি পড়ে কত আনন্দ, কত উৎসাহ যে পাই, সে আমি কথায় বলে বোঝাতে পারব না। আপনার নিগূঢ়তম হৃদয় আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। তাতে আপনাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বোঝার সাহায্য হল। আমার প্রতি যে আপনার আন্তরিক ভালোবাসা, তাও বুঝতে পারলাম। প্রতিদিনের জীবনে যত সংঘর্ষ আসে তা উত্তীর্ণ হবার জন্য এই আশ্রয় আমার অত্যন্ত দরকার ছিল।...

আমার চিঠিতে আমি কেবল আশ্রম সম্বন্ধেই আপনাকে লিখি, আর তাই আমি লিখে যাব, কারণ তার সঙ্গেই আমার যোগ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া জানি যে আপনিও আশ্রমের খবর জানবার জন্য কতখানি উৎসুক হয়ে থাকেন। কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা সর্বদা সমুদ্র পার হয়ে দ্রুত চলে যায়—আপনি কেমন আছেন, কি করছেন, কিভাবে আপনার বাণী প্রচারিত হচ্ছে—এসব চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন থাকে।...

স্কুলের নতুন কর্মসূচী তৈরি হয়েছে। দেখছি এত বছর যা মনে ভাবা হয়েছে, অথচ হয়ে ওঠে নি, এখন তা করতে পারব। যেসব বিষয়ে মাথার পরিশ্রম দরকার সেগুলি সকালে ছয় পর্বের মধ্যে শেষ করা যাবে। বিকেলের পর্বগুলিতে কেবল শিল্পকলা, সংগীত, বিজ্ঞান এবং হাতের কাজ শেখানো যেতে পারে। এরই মধ্যে সুতো-কাটা আর তাঁত-বোনার কাজে যতটা উন্নতি হয়েছে—তা আশাতীত।...

পুরোনো সংস্কার সহজে মরতে চায় না। আমি যা ভয় পাচ্ছি তা হল নতুন স্কুলগুলো পাছে পুরোনো স্কুলেরই নবতর অথচ অপকৃষ্ট খেলো সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই আমি যে শুধু ছাত্রদের গ্রামোন্নয়নের শিক্ষা দিতে চাই তা নয়, বরং শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের আপনার অন্তরের এ কথাটি বুঝতে সাহায্য করতে চাই যে, বিদ্যালয়ের শুকনো পুঁথির বিদ্যায় ছাত্রদের ক্ষুধা মেটে না—সৃষ্টিকর্তার যে অমৃতময় বাণী স্থলে জলে আকাশে সঞ্চারিত—পাত্র ভরে তা গ্রহণ করাতেই তাদের অন্তরের পুষ্টি নির্ভর করে।

বোলপুর, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

আশ্রমের দারিদ্র্যই যে আমাদের গর্বের সম্পদ ও বিধাতার মহত্তম আশীর্বাদ—সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। এই বছরে আমাদের সকলকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এই অর্থাভাব। এমন কঠিন সময়ও গেছে যখন খুব দুশ্চিন্তায় কাল কাটাতে হয়েছে। কিন্তু আমরা একযোগে মিলে মিশে সে কষ্ট বহন করেছি। তা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপই হয়েছে। আমিও আপনার মতো দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে-সংগতি, তাকে ভয় পেতে শুরু করেছি। শুধু আশ্রমের অর্থ সংস্থানের জন্যই যদি হত, তবে আপনার পশ্চিমে যাওয়াটাই বৃথা এবং নিরর্থক মনে হত। কিন্তু আপনার পাশ্চাত্য ভ্রমণের আরো বড় কারণ তখনও ছিল, এখনও আছে। সেই জর্মান ভদ্রলোকটির চিঠিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তা হল পশ্চিম আপনাকে চায় এবং ভালোবাসে। আপনি তাদের গুরুর মতো ধর্মপথে নির্দেশ দিতে পারেন, বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারেন। 'কবির ধর্ম' প্রবন্ধে আপনি যা বলেছেন, তা যদি আরো নানাভাবে বার বার ওদের শোনাতে পারেন, তার ফল ভালো হবে। পশ্চিমের আজকের দিনের সব সমস্যার সমাধান তাতে রয়েছে। কি চমৎকার ভাষণই না হয়েছে! যতবার পড়ছি, ততই গভীরভাবে তার সত্য উপলব্ধি করছি, আমার অন্তরে তা প্রবেশ করছে। জানি এখন থেকে সেই ভাবটি আমার সত্তায় লীন হয়ে যাবে।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

ছেলেদের পক্ষে কি দিনই সব যাচ্ছে! প্রথম তো এল জাদুকর। আমরা সবাই গিয়ে দিনুর বারান্দায় বসলাম। দিনু ছেলেদের সকলকে ডেকে এনেছে, ও নিজেই দেখাবার খরচ দেবে। কুমড়োর গড়নের বাঁশিটির বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সাপের খেলা যখন শেষ হল, তখন সে নানারকম হাতের কৌশল দেখাতে শুরু করল। কখনও মুখ দিয়ে আগুন বের করছে, কানের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া। ভয় ও বিস্ময়ের পুলকে ভরা কী উদ্‌গ্রীব শিশুদের মুখগুলি! হঠাৎ সকলের চমক লাগিয়ে মিশু আর কয়েকজনের পিঠের দিক থেকে টাকা বের করে আনল। তারপরে আবার জাদুকরের জামার আস্তিনের ভিতর থেকে একটা খরগোসও বেরোল। কৌতূহলী ছেলেরা কেউ কেউ ঘুরে গিয়ে ওর পিছনে দাঁড়াতেই লোকটি বিরক্ত হয়ে ধমকে

উঠল। তারপর বল নিয়ে পিরিচ নিয়ে আরো নানারকম জাদুর খেলা—ছেলেরা প্রাণ ভরে এসব দেখে নিল।

এর মধ্যে আবার একটা কথা আপনাকে লিখতে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি। আমাদের এখানে একটি বিবাহের অনুষ্ঠান হল। পুরুত হলেন নেপালবাবু আর আশ্রমের সকলেরই রাতে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। একই দিনে জাদুর খেলা আর বিয়ে—ভেবে দেখুন একবার, সে কত মজা! সুধাকান্তর ভাগ্নী পারুল হল কনে, আর কলকাতার একটি তরুণ (ভারি লাজুক ছেলে) হল বর। খুব খাওয়াদাওয়া হল। হঠাৎ রাত একটায়, আমি তখন সবেমাত্র শুয়েছি, অনিল এসে ডাকল। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত মিশ্রজীর পেটে ভয়ানক ব্যথা। ব্যাপার হল খাওয়াটা তাঁর পক্ষে একটু অতিমাত্রায় হয়ে পড়েছিল। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম গুরুদয়াল মল্লিকই হবে হয়ত। তা কিন্তু নয়, সে খুব ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। এভাবে সুখদুঃখের নানারঙে মেশানো আমাদের এখানকার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কী অবাধ সহজ আনন্দের আবহাওয়ায় আমরা বাস করি, পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি পাওয়া যায় কি?

সন্তোষ আর আমি এখন স্কুলের নতুন দৈনিক কার্যসূচী প্রস্তুত করা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। আশা করছি শিগগিরই আমরা বর্গগুলি ঠিকমত ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা করতে পারব। তাতে কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে। প্রতি বিষয়ের জন্য ছাত্রদের বিভিন্ন বর্গের ব্যবস্থা হচ্ছে। তাতে উপরের বর্গে গিয়ে পিছিয়ে-পড়া ছাত্ররা মুখ হাঁ করে, মগজের কাজ বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারবে না। যেমন ধরুন, আভাসের মতো ছেলে, অঙ্কে নিচের বর্গে থাকবে আর ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোলে উপরের বর্গে থাকবে। সংস্কৃতে হয়ত উপরের বর্গে থাকবে, আবার বাংলায় হয়ত নিচের বর্গে থাকবে। আপনি ফিরে এসে এই ব্যবস্থা সমর্থন করবেন জেনে আমরা এটা করে যাচ্ছি। আগেও এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেটা কাজে লাগানো হয় নি। ইংরেজির উপর জোর দিয়েই ক্লাস ভাগ করা হয়েছে, যেন ওটা একমাত্র পাঠ্য বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার একটি কুফল হল এটি।

আগেকার যেসব স্কুল জাতীয়-বিদ্যালয়ে পরিণত হতে চায় তাদের অনেকে এখন সাহায্যের জন্য অথবা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য চিঠিপত্র

লিখছে। তাদের পরামর্শ দেওয়া ও অন্যান্য সব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আমাদের খুব পরিশ্রম করতে হবে। অধ্যাপনায় ও অভিজ্ঞতায় বিশ্বভারতী সমৃদ্ধতর হবার আগে এবং আপনার প্ল্যান আরো স্পষ্ট হবার আগে affiliation-এর কাজ আমি শুরু করব না। আমরা যাই করি, নিখুঁতভাবে করব, কাঁচা কাজ করব না। আমার ধারণা জাতীয় শিক্ষার নামে অনেকগুলো সস্তা, খেলো, বিবেচনাবর্জিত প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষকের বেতন দেবার ব্যাপারে বোধহয় বিবেচনাবোধের সবচেয়ে বেশি অভাব দেখা যায়। সে সবের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ যেন না থাকে।…

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উঠিয়ে দেবার সব বাধা দূর হয়ে আশ্রমে আমরা সবাই বেশ স্বস্তি পেয়েছি। এ ব্যাপার আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে বরং আরো মিলিয়েছে দেখছি। অন্যান্য স্কুল কলেজ এখন কত সংকটে পড়েছে। ছাত্র শিক্ষক সব চলে যাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে কেউ তো যায়ই নি, বরং অভিভাবকরা ছেলেদের এখানে পাঠাবার জন্য আরো বেশি উৎসুক হয়েছেন।

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১

ইয়োরোপে আপনার কাছে যাবার জন্য আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। কিন্তু এখন আশ্রমে থাকার প্রয়োজন আমার পক্ষে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। কি করে যে এই অবস্থায় আশ্রম ছেড়ে যাব বুঝতে পারছি না। ছাত্র-আন্দোলনের এই সংকট মুহূর্তে যখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করার উপর সমস্ত নির্ভর করছে, তখন আমি যদি ইয়োরোপে চলে যাই, তবে আমার মনে হবে যেন আমি কর্তব্য ছেড়ে পালিয়ে রইলাম।…

তাছাড়া যে নতুন কাজে হাত দিয়েছি তাতেও এখন খুব আশা ও উৎসাহ পাচ্ছি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব ব্যাপার ঘটছে। এবার আমার বিশ্বাস হচ্ছে, আপনি একলা যে-কাজ এতদিন করে এসেছেন তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। এবার তার বীজ কঠিন মাটির আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসবে আর তাতে আশানুরূপ ফলও ফলবে।

মাত্র দুদিন আগে যা ঘটে গেছে তার একটি বর্ণনা আপনাকে দিই। খুব ভোরে নেপালবাবু এসে বললেন, সেদিন সন্ধ্যায় যেন একবার সুরুলে যাই। সেখানে তাঁর ছাত্র কর্মীর দল উপস্থিত থাকবেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলাম। পাঁচটার সময় সুরুলে পৌঁছে

দেখি, একটি বড় খোলা মাঠে গ্রামের সবাই জড়ো হয়েছেন। মাঝখানটায় দিনু, তেজেশ, পণ্ডিতজীকে নিয়ে আমাদের গানের দল বসেছে, সকলে মন দিয়ে গান শুনছে। সেখানে গ্রামের ভদ্রলোকরাও গেছেন, সব মিলে মিশে বসে গেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে চমৎকার একটি ঐক্যের ভাব দেখা গেল। নেপালবাবু আমাকেই প্রথম কিছু বলতে বললেন। পরম উৎসাহে আমি তাঁদের বললাম, কী করলে স্বরাজ এখনই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আরও বললাম, তা পেতে হলে ভিতর থেকে কাজ শুরু করতে হবে। সবচেয়ে আগে বর্জন করতে হবে সুরাপান, যার জন্য সুরুল গ্রাম আজকাল কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া হিন্দু, মুসলমান, উঁচু জাত, নিচু জাত—সকলকে একসঙ্গে মিলতে হবে। আমরা শিক্ষিত লোকেরা এখন এ বিষয়ে যতটা পারি সাহায্য করতে উৎসুক। আরো আগে যে তা করিনি, তার জন্য আমরা লজ্জিত। কিন্তু এখন থেকে স্বরাজ যে আমাদেরই হাতে তা প্রমাণ করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

হাওড়া স্টেশন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

আমেরিকায় আপনার কাছে যে-চিঠি পাঠিয়েছি তাতেও লিখেছি, আবারও লিখছি, আমার খুব আশা হচ্ছে এতকাল আপনার যেসব কথা শোনার লোক পান নি, এখন সেই সব আদর্শ নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহী কর্মী অনেক পেয়ে যাবেন। আমাদের আশ্রম এবার তার সত্যকারের কর্তব্যবোধে জাগ্রত হয়েছে, আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররাও কাজে যোগ দিয়েছে। ক্ষিতিমোহনবাবু, নেপালবাবু আর শাস্ত্রীমশায়ের নেতৃত্বে আমরা সবাই এই জেলার গ্রাম-সংগঠনের কাজে মিলিত হয়েছি। সুরুলের ওই সভাতে সব জাতের লোক যোগ দিয়েছিলেন। গানের দল নিয়ে দিনুও ছিল। এই ভাবে আনন্দে আমাদের গ্রামের কাজ শুরু হল।

বোলপুর, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

গত দুই ডাকে দু'খানা বড় বড় চিঠি বিলেতে পাঠিয়েছি, কারণ, জানিনা এখন আপনি কোথায় আছেন। যাই হোক, আপনি সেখানে ফিরে গিয়ে সেগুলো পাবেন আশা করছি। গত রাতে আমাদের পূর্ণিমা-উৎসব শেষ হয়ে গেল। আমার ধারণা, আগে যত উৎসব হয়ে গেছে, তাদের সবার

চেয়ে এটি সুন্দর হয়েছে। আমাদের সকলের মনে কেবল একটি বেদনা ছিল—সেটি হল—আপনি সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। আমার মনে তা এত গভীরভাবে বেজেছিল যে আমি যেন সেখানে বসে গাছপালার মধ্যে আপনার মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছিলাম, এক একবার মনে হচ্ছিল আপনাকেই যেন দেখতে পাচ্ছি। ছেলেরা শেষ পর্যন্ত তাদের মঞ্চের জায়গা পরিবর্তন করেছিল। গৌরদার ঘরের বাইরে শালগাছের নিচে স্টেজ করে সেখানে ফাল্গুনী নাটকেব গান আর অভিনয় করল। আমাদের শিল্পীরা আর আশ্রমের মহিলারা সামনের প্রাঙ্গনে বেশ বড় গোল করে একটা সুন্দর আলপনা দিয়েছিলেন। সেটা ঘিরে আমরা বসেছিলাম। এবার গানেব দলে অনেক মেয়ের গলা ছিল। চন্দ্রালোকিত রাত্রে সে সুর কী যে অপূর্ব মধুর শুনিয়েছিল কি বলব! দিনুর এবারকার গানেব আর তুলনা ছিল না। অনাদি আর সন্তোষের বোন বাসুও চমৎকার গাইল। সমস্ত দৃশ্যটাই হয়েছিল অপরূপ। মরিস আমাকে বললেন, শান্তিনিকেতনে না এলে জীবনের একটি নিষ্কলুষ আনন্দসম্ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম। সেটি হল—গুরুদেবের গান শোনা ও সেই গানে যোগ দেওয়া।

উৎসবের পরে আশ্রমের মহিলারা খাবার আয়োজনও করেছিলেন। চাঁদের আলোয় বাইরে মাটিতে বসে মহানন্দে আমাদের রাতের খাওয়া হল। মীরা তো খুব খুশি। এ দিনটি ওর জীবনেও বিশেষ একটি আনন্দের দিন।

শিল্পকলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী—এসব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্যও অজস্র দরখাস্ত রোজ আসছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেককে কাজে নিতে পারছি না। যাই হোক সব দিক থেকেই মনে হচ্ছে, এতকাল যে-বীজ আপনি ছড়িয়ে গেছেন, এবার তার ফসল ফলবে।

১১ই মার্চ, ১৯২১

এটা ঠিক যে পুরোনো অভ্যাস ও সংস্কারের বেড়া ভাঙছে। ভারতবর্ষে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে। এই সংকটকাল আসার আগে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেখানে আর ফিরে যেতে পারে না। একদিক থেকে ধরতে গেলে এ ভালোই। আপনিও স্বীকার করবেন—কারণ আপনার 'অচলায়তনে' এই পরিবর্তনেরই আপনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আজকের দিনে ভারতের দুর্ভাগ্যের কারণ হল বহু শতাব্দীর জীর্ণতার ফলে জীবনধারা

এখানে অতি মন্দগতি, ক্ষীণ ও সংকীর্ণ। তাই মুক্তিসাধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্যাগস্বীকারের ভয় ভাঙিয়ে রুদ্র যখন আজ তাঁর ধ্বংসের কাজ সাঙ্গ করছেন, তখনও দেশে নতুন যুগকে বরণ করে নেবার শক্তি কোথায়? তাই এই আকস্মিক প্রয়াসের প্রচণ্ড ঢেউ উঠেই পাছে মিলিয়ে যায় সেই ভয় হয়।

বোলপুর, ১৯শে মার্চ, ১৯২১

উইলি পিয়রসনের চিঠিগুলো সব পেয়েছি। তার সঙ্গে আপনার A Cry for Peace নামে চমৎকার প্রবন্ধটিও পেয়েছি। সেটি গভীরভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করেছে আর তার কথাগুলি যে যথাযথ তা এখানে থেকেই প্রতিদিন অনুভব করছি। শক্তিমানের যে-ভার তাই তাকে নিচে টেনে নামায়—এ কথা বোঝাবার জন্য চোরাবালিতে পড়া হাতীর সুন্দর উপমাটি আপনার ছাড়া আর কার কল্পনায় আসত? বড়দাদাকে লেখাটি আমি পড়ে শুনিয়েছি। শুনে তিনি অভিভূত হয়েছেন। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, আপনার যে-কাজ তা বৃহৎ বিশ্বের জন্য, তা কেবল জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। আর বর্তমান ভারতের অস্থির চাঞ্চল্যেও তার অবসান হবে না, ভবিষ্যতের দিকে তার গতি।

অনুবাদ : মলিনা রায়

অমিতা ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথ

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথম ও একমাত্র পুত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। মাতা বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার রাখাল রায়চৌধুরীর কন্যা সুশীলা দেবী। একমাত্র বোন নলিনী দেবীর বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছোট ভাই ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর সঙ্গে।

দিনেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮২ সালের ২রা পৌষ। অল্প বয়সে তাঁর প্রথম বিবাহ হয় সুবিখ্যাতা শিল্পী সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণা দেবীর সঙ্গে। তখনকার দিনে অল্প বয়সেই বিবাহের চল ছিল, তাছাড়া মহর্ষি তখন জীবিত, বোধহয় আশা ছিল সকলের নাতির নাতি যাতে দেখে যেতে পারেন মহর্ষি। অনায়াসেই তা সম্ভব হতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিনেন্দ্রনাথের কোনো সন্তান হোলো না! প্রথমা স্ত্রী অতি অল্পকালই জীবিতা ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় কমলা দেবীব সঙ্গে। কমলা দেবীর বয়স তখন মাত্র দশ। দিনেন্দ্রনাথের নিজের পছন্দ অনুসাবেই এই বিবাহ হয়। মহর্ষি তার পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি। দ্বিতীয়বার বিবাহেব পর দিনেন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠান হয় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য, কিন্তু সেদিকে তাঁর মন ছিল না কাজেই ব্যারিস্টার না হয়েই ফিরে এলেন তিনি। দিনেন্দ্রনাথের সংগীতে অনুরাগ ও বিশেষ শক্তিব পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ টেনে আনলেন তার শান্তিনিকেতনে—দিলেন তাঁর হাতে তুলে তাঁর গানের ভাণ্ডারের চাবিটি। সেই থেকেই দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সংগীতকে রক্ষা করে এসেছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

অনেকদিন পর্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্র-সংগীতের কথা রবীন্দ্রনাথের ও সুর দিনেন্দ্রনাথের।

মহর্ষির মৃত্যুর পব দ্বিপেন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে এবং সেখানেই 'নিচু বাংলায়' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ জীবিত। প্রিয় নাতি দিনেন্দ্রনাথ তখন রয়েছেন দুই দাদামশায়েব

মাঝখানে। নিচু বাংলার বাগান ঘেরা একটি টালির ছাওয়া ঘরে প্রাচীন-কালের ঋষির মতোই দ্বিজেন্দ্রনাথ বিরাজ করতেন।' পশুপাখির প্রতি তাঁর প্রীতি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি ; তাঁর কাছে নির্ভয়ে তারা আনাগোনা করত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য !

শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর যখন আত্মীয়-পরিজন সকলকে ছেড়ে শিক্ষা-লাভের জন্য শান্তিনিকেতনে গেলাম তখন যিনি আমার শিশুমনের সব বিচ্ছেদ বেদনা ও ভয় দূর করে দিয়ে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলেন তিনি হলেন দিনেন্দ্রনাথ—আমাদের সকলের 'দিনূদা'।

তাঁর বিশাল দেহ ও বড় বড় দুই চোখ দেখে শিশুদের ভয় পাবারই ত কথা, কিন্তু ভয় তাঁকে কেউ কোনোদিন পেয়েছে বলে শুনিনি। সব শিশুদেব চিরদিন তিনি খেলার সাথীর মতোই ছিলেন। তাঁর মতো শিশুদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতেও আর কাউকে আমি দেখিনি। এখন সে কথা মনে করলে ভারি আশ্চর্য লাগে।

শান্তিনিকেতনকে তখন আমরা আশ্রমই বলতাম। আশ্রমের মাস্টারমশায়রা ও গৃহিণীরা তাঁকে বলতেন 'দিনুবাবু' আর বাকি সকলেই 'দিনূদা'। মাস্টারমশায়দেরও যেমন তাঁকে নইলে চলত না আমাদেরও তেমনি।

বাইরে থেকে অতিথি এসে তাঁর কাছে সমাদর পাননি এ কখনও হয়নি। কী আশ্চর্য রকম আপন করে নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল ! কত সহজে মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারতেন—কোনো বাছবিচার সেখানে তাঁর ছিল না। কি শিশু কি বড়, কি ধনী কি নির্ধন, পরিচিত কি অপরিচিত কোথাও তাঁর বাধা ছিল না। এমনই একটি সহৃদয় সহজ ও বিরাট মানুষ ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

প্রথম যখন 'দিনূদা' বলে ডাকি, আমায় তিনি ধমক দিয়ে বললেন "তুই দিনূদা বলিস কি বলে ? তোর বাবা বলত 'দিনূদা' আবার তুইও বলবি দিনূদা ? আমি তোর জ্যাঠামশায়।" কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বাপ, জ্যাঠা, ছেলেমেয়ে সকলেরই তিনি 'দিনূদাই' রয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। এমন কি আমার বিয়ের পরে যখন তাঁর সঙ্গে আমার ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক হল, বাড়িতে সকলে এমন কি তাঁর স্ত্রী 'কমলবৌঠান' বলে যিনি আশ্রমে পরিচিত তিনিও বললেন, "এখন থেকে বড়ঠাকুর বলে ডাকবি।" দিনূদা শুনে বললেন, "না, না, ও আমাকে 'দিনূদা' বলেই ডাকবে।" আমিও বেঁচে গেলুম।

'বড়ঠাকুর' যখন ফসকে গেলেন তখন মেজঠাকুরের পালা পড়ল। যদিও সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল কিন্তু যিনি আমার মেজঠাকুর অর্থাৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ, তিনি এমন ঘোরতর আপত্তি করে বসলেন যে মেজঠাকুর বলাও আর ঘটে উঠল না। এখানে এ কথা বলা অবান্তর হবে না বোধ হয় যে জোড়াসাঁকো-বাড়িতে এটার চল অবশ্য আগেই ছিল। আপন ভাসুরদের ছাড়া সম্পর্কিত ভাসুরদের নাম ধরে 'দাদা' বলে আমার শাশুড়িদেরও বলতে শুনেছি, এমন কি আপন খুড়োশ্বশুরদেরও নাম ধরে কাকা তাঁরা বলতেন, যেমন 'সোমকাকা', 'রবিকাকা' ইত্যাদি। যাই হোক দাদা ডাকার প্রসঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল। প্রথম দিনদার সঙ্গে আলাপের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমি অত্যন্ত ভীরু ও মুখচোরা প্রকৃতির মেয়ে ছিলুম। আমার নতুন সঙ্গিনীদের মধ্যে কেউ একজন আমায় জোর করে দিনুদার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "দিনুদা, এ কেমন উল্টে 'জাগরণে যায় বিভাবরী' গান করে জানেন?" দিনুদা বললেন, "তাই নাকি? কই গাত?" আমি "ণেরগজা য়যা রিবভাবী" এই রকম করে উল্টে গাইতেই তাঁর ভারি মজা লাগল আর যখন তখন ডেকে ডেকে আমায় সকলের কাছে ঐ রকম করে গাইতে বলতে লাগলেন। এমনি করে আমাদের ভাবও দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল।

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমে সকলেই গুরুদেব বলেন। তিনি তখন থাকতেন 'দেহলী' বাড়ির উপরে আর নীচতলায় থাকতেন দিনদারা। কখন উপর থেকে শুনতে পেয়ে দিনদাকে কিছু বলে থাকবেন। দিনদা একদিন খুব হতাশ মুখ করে বললেন "নারে, আর গাসনা, রবিদা রাগ করেছেন।" আমার তখন বোঝবার বয়স ছিল না যে কেন রাগ করেছেন তাই খুব দুঃখও হল আর আশ্চর্যও লাগল। কিন্তু সে কথা ভুলিয়ে দিতে দিনদার এক মুহূর্তও দেরি হয় নি।

দিনদার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকত তাঁর একটি লালচে রঙের কুকুর, নাম ছিল তার 'টম'। সে আমাদেরও খুব চিনে গিয়েছিল আর কমল বোঠানের ছিল সাদায় কালোয় একটি কুকুর 'পপি' নামে। আর ছিল একটি হরিণ, সে যথেচ্ছ আশ্রমে ঘুরে বেড়াত। এই টম কুকুর আর হরিণশিশুকে নিয়েই 'পলাতকা'র প্রথম কবিতাটি "ঐ যেখানে শিরীষ গাছে ঝুর ঝুরু কচি পাতার নাচে" ইত্যাদি বিখ্যাত হয়ে রইল। দিনদারা জীবজন্তু খুব ভালবাসতেন। হরিণ আর কুকুর কত যে পুষেছেন তার ঠিক নেই।

দিনদার দেহলীর বারান্দায় ছিল আমাদের খেলার জায়গা। একেবারে তাঁর

ঘরের সামনেই। রাস্তা থেকে কাঁকর তুলে এনে বোঝাই করতাম সে বারান্দায়, তারপর কত খেলা। লাফালাফি চ্যাচামেচিরও অন্ত ছিল না—অবশ্য সেসব উপরে যখন গুরুদেব না থাকতেন তখনই পুরোদমে চলত।

তাঁর বাগানে পাতা থাকত একটা বিরাট তক্তাপোষ। তার উপর বসত বিকেলবেলা চায়ের মজলিস। মাস্টারমশায়রা সকলে এসে জমতেন সেখানে। তাঁদের আসর ভাঙবার মুখে আমরা খেলাশেষে হাজির হতাম। তাঁর মস্ত চওড়া পিঠের উপর পড়ে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে দোল খাওয়াতে আমাদের ভারি আনন্দ ছিল।

প্রকাণ্ড বড় গড়গড়া থাকত ঘরের বারান্দার কোন কোণায় লুকনো, আর তার মস্ত লম্বা নল চলে আসত সেই তক্তাপোষের কাছে। ভারি মজার লাগত গড়গড়ার আওয়াজ, কিছুতেই ভেবে পেতুম না কোথা থেকে ঐ আওয়াজটা হচ্ছে। একদিন মনে আছে দিনুদা উঠে গেছেন ঘরে, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মজলিস গেছে ভেঙে, কেউ কোথাও নেই, শুধু মস্ত নলটা বাগান বেয়ে এসে তক্তাপোষের উপর দিনুদার বসবার জায়গাটিতে পড়ে আছে। আমি আর ঔৎসুক্য চেপে রাখতে না পেরে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে নলটা মুখে দিয়েছি কি দিইনি এমন জোরে গড়গড়াৎ করে ডেকে উঠল যে আমি ত চমকে উঠে নলটল ফেলে দে ছুট। বুকের কাঁপুনি আর থামে না। এ গল্প তাঁকে বোধহয় করিনি। এই রকমই ছিল তাঁর কাছে আমাদের সহজ গতিবিধি।

শুধু নিষেধ থাকত খাবার পরই দুপুরে যখন তিনি শুতে যেতেন সেই ঘণ্টাখানেক সময়ের জন্য। আমরা কিন্তু ভুলেও তাঁকে ঐ সময় বিরক্ত করতুম না।

শান্তিনিকেতন থেকে যখন বরাবরের মতো কলকাতায় চলে এলেন তখন জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে (বিচিত্রা) থাকতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিশুর দৌরাত্ম্য তাঁকে সহ্য করতে দেখলুম—কখনও এতটুকু বিরক্ত হননি। তখন পাঁচ নম্বর বাড়ি অর্থাৎ গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ি একেবারে ভর্তি আর ছয় নম্বর বাড়িতে তখন জনসংখ্যা 'নেই'-এর কোঠায় যেতে চলেছে। ও বাড়িতে (পাঁচ নম্বরে) তখন ছেলেপিলে অগুন্তি। লালবাড়ির বারান্দায় বসে ওদের ডাক দিতেন আর সব পিলপিল করে এসে হাজির হত। তারপর তাঁকে ঘিরে ওদের কলরবের অন্ত থাকত না। আমরাই এক একদিন চ্যাচামেচিতে অস্থির

হয়ে উঠতুম কিন্তু দিনদার এতটুকু আপত্তি হতে দেখিনি। এমন শিশুপ্রীতি আর আছে কিনা জানি না, আমার ত এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা' সত্যিকার রূপ নিয়েছিল দিনেন্দ্রনাথে। শান্তিনিকেতনে আমাদের ছেলেবেলায় বহুবার 'শারদোৎসব' হত। দিনদা ঠাকুর্দা আর আমরা বালকের দল তাঁকে ঘিরে। এতো অভিনয় নয়, এতো আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক পালা।

যেবার গুরুদেব কলকাতায় 'শারদোৎসব' করালেন অ্যালফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটারে, সেবার হঠাৎ দিনদার বাবার (দ্বিপেন্দ্রনাথ) অসুখের টেলিগ্রাম এল। অভিনয়ের মাঝখানেই তাঁকে শান্তিনিকেতনে চলে যেতে হল কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। শুনলাম দ্বিপেন্দ্রনাথ নিজেই মিথ্যেমিথ্যি দিনদাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ায় ডাক্তারের উপর বিরক্ত হয়ে অভিনয়ের ক্ষতি হবে বলে দিনদাকে ফিরে যেতে বলেন। দিনদাও বুঝতে পারেন নি এবং কলকাতার বড় ডাক্তারও বুঝতে পারেন নি তাই তাঁর কথায় নির্ভর করে দিনদা কলকাতায় ফিরে এলেন, কিন্তু শেষে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে অভিনয়ের মাঝখানেই চলে যেতে হল। আশ্রমের লোকের মুখেই শুনেছি যে দিনদা শিশুর মতোই অস্থির ও আকুল হয়ে পড়েছিলেন। সেবার অবনীন্দ্রনাথ প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও বেশ ভালভাবেই ঠাকুর্দার অভিনয় করে সে-যাত্রা রক্ষা করেছিলেন কিন্তু আমাদের মন দিনদার অভাবে খুবই দমে গিয়েছিল।

এখানে দিনেন্দ্রনাথের পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথের কথা বললে বোধহয় অবান্তর হবে না। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মতোই খুব মজলিসি ছিলেন। একমাত্র দ্বিপেন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বোলপুর ও সুরুলের যোগসূত্র শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে যে কত ভালবাসত তা তাঁর মৃত্যুর পর সকলেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের যত দরবার তাঁর কাছেই হত। নালিশ মকদ্দমা তাঁর কাছেই হত এবং তাঁর রায়ই তারা নির্বিচারে মেনে নিত। তিনিও তাদের ভালবাসতেন, তাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল।

এদিকে আবার তিনি বোলপুর ও সুরুলের সেতুস্বরূপ ছিলেন। নিয়মিত গাড়ি চেপে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। বোলপুরের উকীল, মোক্তার, ডাক্তার সকলের সঙ্গেই তাঁর খাতির ছিল, আবার সুরুলের জমিদারবাড়িও বাদ যেত না। সকলেই তাঁকে মানত। সকলের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা সমান ছিল। নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল অথচ নিজের

স্বাতন্ত্র্য রেখেও চলতেন। আশ্রমের কার কি প্রয়োজন সেই নিচু বাংলায় বসে থেকেই সব খবর রাখতেন আর সাধ্যমত সাহায্য করতে বিমুখ হতেন না। দিনেন্দ্রনাথের স্বভাবে এই গুণটি ষোলোআনাই বর্তেছিল।

গানের সুন্দর ও সুমিষ্ট গলাটি পেয়েছিলেন তিনি তাঁর মা সুশীলা দেবীর কাছ থেকে। আগেই বলেছি তাঁর মা বরিশালের জমিদার বংশের কন্যা। দেবকুমার রায়চৌধুরী ছিলেন দিনদার মামা। বরিশালে অশ্বিনীবাবু যখন বয়কট আন্দোলন করছিলেন সেই সময়কার সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন এই দেবকুমার রায়চৌধুরী।

তাঁর মায়ের যে আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ছিল সে কথা দিনদার মুখেই শুনেছি। প্রথম যখন ঠাকুরবাড়িতে মায়ার খেলা শুধু প্রমীলারা মিলেই করেন তখন দিনদার মা অমরের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, মায়ার খেলায় অমরের গানগুলি সুর তাল লয়ে খুব সহজ ও হালকা নয়। তিনি গানগুলি খুব চমৎকার গেয়েছিলেন শুনেছি। বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবীর মুখেও তাঁর সুকণ্ঠের কথা অনেকবার শুনেছি।

পিতামাতার কাছ থেকে এই দুটি বড় গুণের অধিকারী দিনেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন।

আশ্রমে তখন গান, আবৃত্তি ও অভিনয় অধিকাংশ দিনদাই শেখাতেন। ইংরেজি ও বাংলার ক্লাসও নিতেন প্রতিদিনই। পড়াবারও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

আমরা ছোটরা তেজেশবাবুর কাছে গান শিখলেও দিনদার গানের ক্লাস কোনোদিনই বাদ দিইনি। তাঁর ক্লাসের বাইরে বারান্দায় বসে শুনে শুনে শিখে নিতাম।

দিনদা টের পেয়ে তাঁব ক্লাসে তুলে নিলেন আমায়।

দিনদার গান শেখানোয় কোনো আড়ম্বর ছিল না। তাঁর হাতে থাকত শুধু একটা প্রকাণ্ড এস্রাজ। কী গম্ভীর ছিল তার আওয়াজ! হারমোনিয়াম নিয়ে কোনোদিনই শেখান নি। শুধু মন্দিরে অনেককাল আগে জোড়াসাঁকো থেকে আনা একটা চমৎকার অর্গান ছিল, সেইটে সাতই পৌষের সময় বা এগারই মাঘে দিনদা বাজাতেন, গমগম করত সেই বাজনা। একটি ছেলে পাশ থেকে বেলো করত আর দিনদা বাজাতেন। "আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও" এই গান হচ্ছে সাতই পৌষের সকালে। সবে ভোরের প্রথম রোদ

উঁকি মারছে মন্দিরের গায়ে। ছেলেমেয়েদের গলা মিশে গেছে অর্গানের সঙ্গে —সে যে কী চমৎকার লাগত বলতে পারি না! সে আনন্দের রেশ এতদিনেও মিলিয়ে যায় নি।

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই শিখত, একসঙ্গেই গাইত, কিন্তু দিনদার এমন আশ্চর্য কান ছিল যে কোথাও একটু বেসুরো হলেই ধরে ফেলতেন। তাকে তখন একা গাইয়ে নিতেন। একটি মস্ত সুঅভ্যাস দিনদা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের করিয়ে দিয়ে গেছেন, সেটি হচ্ছে বই না দেখে গান গাওয়া। গান প্রথম শেখবার সময়ও তিনি কাউকে খাতা বা বই খুলতে দিতেন না। শেখাবার আগে বলে বলে গানটি খাতায় লিখিয়ে দিতেন তারপর একলাইন করে গাইতেন, সেই শুনে সকলকে কথা মনে রেখে রেখে গাইতে হত। ফলে সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথাও শেখা হয়ে যেত। আর-একটা ছিল—গলা ছেড়ে গাইতে হত। উচ্চারণেও দোষ ঘটতে দিতেন না। বলা বাহুল্য, তখন মাইক নামে পদার্থটি ছিল না, তার ফলে গলা না ছেড়ে উপায় ছিল না। এগারই মাঘের উৎসবে জোড়াসাঁকোর দালানে যে একক সংগীত হত তা শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা না গেলে চলত না। অভিনয়ের সময়ও তাই পরীক্ষা করে দেখা হত। গুরুদেব অভিনয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ বা আধ-আধ জড়ানো কথা একেবারেই বাতিল করে দিতেন।

বড় অভিনয় যখন হত অর্থাৎ কলকাতায় যে-অভিনয় নামানো হত তাও দিনদা একমেটে করে দিলে তবেই গুরুদেব তাকে মাজাঘষা করে তুলতেন। আসল খাটুনি দিনদার উপরই পড়ত।

যেমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর, তেমনি ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি। নইলে গুরুদেবের এই হাজার হাজার গান কোথায় হারিয়ে যেত তার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে তিনি রাখতেনও না।

একবার গরমের সময় যখন কলকাতায় এলেন (বোধহয় তারপর আর ফিরে যান নি), আমায় বললেন "আড়াই হাজার গানের স্বরলিপি করে দিয়ে এলুম।" এত দ্রুত স্বরলিপি করতেন যে কী বলব। যন্ত্র প্রায় নিতেনই না। সুরটা গুণগুণ করতেন, পায়ে তাল দিতেন আর স্বরলিপি করে যেতেন।

আমার মনে হয় সেবার অত তাড়াতাড়ি হাজার হাজার গানের স্বরলিপি করার ফলে কিছু কিছু ভুলচুক হয়ে গেছে যা তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সংশোধিত হত।

'ফাল্গুনী'তে উৎসর্গ-পত্রে গুরুদেব দিনদাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন "সেই বালক-

দলের সকল নাটের কাণ্ডারী—আমার সকল গানের ভাণ্ডারী"—এ যে কত বড় সত্য তা যাঁরা সে সময় দিনদাকে দেখেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন।

তাঁর ভাণ্ডারে গানগুলি জমা না থাকলে আজ রবীন্দ্র-সংগীতের কী দশা হত তাই ভাবি। সেইজন্ত রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে।

নিজে গান দিনদা বড় গাইতেন না, প্রকাশ্যে ত নয়ই। অমন গলা অথচ তাঁর গলায় stage-এ কটা গানই বা কে শুনতে পেয়েছে! নিজেকে এত আড়াল করে রাখতেন! তাঁর স্বরচিত কবিতা ও গান অতি সুন্দর। দু'একটা গানের একটু অংশ উদ্‌ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। দেখতে পাবেন যে কি মিষ্টি ভাষা এর। সুরও ভারি মিষ্টি। দিনদার মৃত্যুর পর কমলা দেবী সযত্নে তাঁর যে-ক'টি গান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন স্বরলিপি সহ না ছাপালে এই ক'টি চিহ্নও কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

১। পথ পাশে মোর রচিনু দেউল
　　পথিক নিতুই আসে যায়
কেহ আনন্দে হাসিয়া আকুল
　　কেহ মূর্ছিত বেদনায়॥

২। পলাশ রাঙা বাসনাগুলি
　　মনের কোণে বিছায়ে
আজিকে সব করম ভুলি
　　আসিনু তারি নিছায়ে। ইত্যাদি

ভারি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ কয়েকটি গান যা রক্ষিত হয়েছে, শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এখনও সেগুলি থেকে গান করে তাঁকে স্মরণ করে ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

তাঁর কবিতা কেন ছাপেন না এ নিয়ে আমি অনুযোগ করায় বলেছিলেন "রবিদার এত অজস্র আর অপূর্ব কবিতার পর আর কি প্রয়োজন?" অনেক বলে অনেক আবদার করেও তাঁর মত বদলানো যায় নি। তাঁর কবিতার ধরন ও ভাষা তাঁর দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। বহুকাল আগে কোন খেয়ালে 'বীণা' নাম দিয়ে একটি কবিতার বই ছেপেছিলেন তাও নষ্ট করে ফেলেছিলেন সব।

বোধ হয় সে 'বীণা' সত্যিই আজ হারিয়ে গেছে আর তাকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

শুধু গান নয়, অভিনয়-ক্ষমতাও তাঁর কম ছিল না। 'বিসর্জন' নাটকে দিনদা সেজেছিলেন রঘুপতি আর গুরুদেব জয়সিংহ। 'তপতী' নাটকে রাজসখা দেবদত্ত। এ দুটি অভিনয়ই কলকাতায় অভিনীত হয়। দিনদার অভিনয় খুব স্বাভাবিক হত। অত্যন্ত অনায়াসে করে যাচ্ছেন এমনি মনে হত। গুরুদেবকে কখনও ওঁর অভিনয় সংশোধন করে দিতে দেখিনি। পড়াশুনায়ও ওঁর অত্যন্ত অনুরাগ দেখেছি। বই কত যে কিনতেন তার ঠিক নেই। পড়তেন সেগুলি এবং পড়া হয়ে গেলেই লাইব্রেরীতে দান করে দিতেন। কোনো কিছুই সঞ্চয় করে রাখা বা নিজের করে আঁকড়ে রেখে দেওয়া তাঁর স্বভাবেই ছিল না।

ভাষা শেখার উৎসাহ তাঁর প্রায় শেষ পর্যন্ত দেখেছি। ফরাসী ভাষা ভালই জানতেন। জর্মান ভাষাও শিখেছিলেন মনে হয়।

বিদেশী যাঁরা আসতেন তাঁরা দুদিনেই দিনদার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেন। ভাষা শেখার আগ্রহ বোধহয় এই কারণেই দেখেছি।

আশ্রমে দীর্ঘকাল আছেন অথচ দিনদার বাড়ি খান নি এরকম কখনও হয় নি। ছেলেমেয়েদের ত কথাই নেই। রান্নাঘরের খাওয়া তখন লোভনীয় ছিল না কোনোদিক দিয়েই, নিরামিষ খেতে হত। তাই ছাত্রদের প্রায়ই নেমন্তন্ন হত মাস্টারমশায়দের বাড়িতে। অবশ্য এ নেমন্তন্ন তারা নিজেরাই আদায় করে নিত। দিনদার কাছে ত একবার বললেই হল। এ ছাড়া তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হত উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য। তাই প্রতি বছর একবার করে দিনদা এদের ভাল করে খাওয়াতেন। এরা চলে যাবে আশ্রম ছেড়ে এই বেদনা সম্ভবত তাঁর মনকে ব্যথিত করে তুলত বলেই কখনও এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি।

এখানে তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী—আশ্রমের 'কমলবৌঠানে'র কথা না বললে দিনদার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আগেই বলেছি দশ বছর বয়সে বধূ রূপে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসেন। তাঁর মতো পতিগতপ্রাণা নারী খুব কমই দেখেছি।

দিনদার কোনো ইচ্ছাই তিনি কখনও অপূর্ণ রাখেন নি। স্বহস্তে রেঁধে সকলকে খাওয়াতেন। আত্মীয় স্বজন বা যে-কেউ তাঁদের বাড়িতে অতিথি

হয়েছে, তাঁর কত যত্ন সমাদর পেয়েছে তার ঠিক নেই। দিনদা শুধু ফরমাস করে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। কোথা থেকে হবে বা কোনো অসুবিধে আছে কিনা সে সব কোনোদিন ভাবতেন না, জানতেন তাঁর ঘরে 'কমলা' অধিষ্ঠিতা। আর সত্যিই তিনি কষ্ট করেও, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও তা পালন করতেন—সুসম্পূর্ণ করে তুলতেন। রন্ধনে তাঁর অনুরাগ ছিল আর পটুতাও খুব ছিল। স্বামীই তাঁর সব ছিলেন। একাধারে স্বামী ও শিশুকে তিনি দিনদার মধ্যেই পেয়েছিলেন তাই তাঁর সহস্র আবদার তিনি হাসিমুখে সহ্য করে যেতেন। এঁর মতো ধৈর্যশীলা সহিষ্ণু নারী দিনদার গৃহিণী না হলে দিনদার সংসার বোধহয় অচল হত। এঁর মৃত্যুর পর ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী আমায় লিখেছিলেন "সতীলোক বলে যদি কিছু থাকে তবে কমল সেখানেই গেছে।" এ থেকেই তাঁর স্বভাবটি বোঝা যাবে।

শৈশবে মাতৃহীন হয়ে বিমাতা শ্রীহেমলতা দেবীর কাছেই দিনদারা ভাইবোন মানুষ হয়েছিলেন। তাঁকে ছোট মা বলে ডাকতেন শুধু নয় মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন ও বাধ্য ছিলেন। ছোট মা বললে তা করবেন না এ হতেই পারত না। তাঁর মুখেই দিনদার ছেলেবেলার একটি গল্প শুনেছি যা এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না।

একবার বড়মা (শ্রীহেমলতা দেবী) ওঁদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। বড়মা পড়াতে পড়াতে 'দুর্বিপাক' কথাটির মানে দুজনকে জিজ্ঞাসা করেছেন। নলিনীদি বললেন "জানি না"। দিনদা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন "হ্যাঁ, আমি জানি, দুর্বিপাক মানে বদহজম"। গুরুপাক কথাটা জানা ছিল, পরিপাকের মানে জানতেন কাজেই দুর্বিপাক 'বদহজম' হবে না ত কি হবে। এই ছোট্ট ঘটনা থেকে একটি সপ্রতিভ, সবল, নির্ভীক বালকের চেহারা ফুটে ওঠে। ছেলেবেলার দু' একটি গল্প শুনে এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। ছোট বোনটিকে অসম্ভব ভালোবাসতেন আর বোনটিও 'দাদা' বলতে অজ্ঞান ছিলেন। ছেলেবেলায় দিনদা সেন্টজেভিয়ার্সে পড়তেন। সেখানে ফিরিঙ্গি ছেলেদের মার হজম করার পাত্রই ছিলেন না তিনি, ফলে মারামারি লেগেই থাকত। কোনোরকম অভিযোগ পেলে ওঁর বাবা যখন চাবুক নিয়ে দিনদাকে শাসন করবার জন্য ডেকে পাঠাতেন তখন বোনটি ব্যাকুল হয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরতেন যাতে বাবা বেশি মারতে না পারেন। এ গল্প নলিনীদির মুখেই শোনা। বলতেন "দাদার কত চাবুক যে আমার পিঠে

পড়েছে তার ঠিক নেই, কিন্তু দাদার ভয় ডর ছিল না। এসেই জামা খুলে পিঠ পেতে দিতেন।"

এবার তাঁর জীবনের সাধারণ আচার আচরণের কথা বলে শেষ করতে চাই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোটখাটো অভ্যাস থেকেই মানুষের আসল রূপটি সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে বলে মনে হয়। তাই এর অবতারণা না করলে তাঁর কথা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

অতি প্রত্যুষে ওঠা তাঁর বরাবরের অভ্যাস ছিল। সূর্যোদয়ের আগেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বাইরে বাগানে এসে বসতেন। চা আসত আর আসতেন তাঁর বিশেষ বন্ধু তেজেশবাবু। ধারে কাছে ঐ সময় কাউকে যেতে দেখলেই ডাক দিতেন, এই রকমই তাঁর অভ্যাস ছিল। লোক না হলে একেবারে থাকতে পারতেন না। চা-ও তাঁর রুচত না। বৈকালিন চায়ের আসর দিনদাকে ঘিরেই একদিন জমে উঠেছিল। গুরুদেব একবার জাপান থেকে ফিরে এখনকার লাইব্রেরীর উপরের ঘরে চা-চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি এর 'সুসীম চা-চক্র' নাম দিয়েছিলেন আর গান বেঁধেছিলেন এই উপলক্ষে :

"হায় হায় হায়
দিন চলে যায়
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতক দল চল
চল চল হে
টগবগ উচ্ছল
ক্বাতলি তল জল
ছল ছল হে" ইত্যাদি

আমাকে মাস্টারমশায় নন্দলালবাবু জাপানি মেয়ে সাজিয়ে চা পরিবেশন করিয়েছিলেন। সবুজ চা গুরুদেব নিয়ে এসেছিলেন তাই দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল চা-পর্ব।'

দিনদার মৃত্যুর পর মাস্টারমশায়দের সকলের উৎসাহে ও চেষ্টায় সেই স্মৃতি আজও স্বাক্ষরিত হয়ে রয়েছে 'দিনান্তিকা'তে। সেইখানেই পরে চা-চক্রের স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে।

দিনদার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে চায়ের আসরের কথা এসে পড়ল।

দিনদা মানুষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যাকে বিপুলাকার বলে তাই ছিলেন। অতবড় শরীরটি নিয়েও কিন্তু তাঁর সব কাজ এত দ্রুত ছিল যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। স্নানে গেলেই খাবার ঠিক করতে হত। তাও খাবার সাজিয়ে আনবার আগেই তিনি স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে চেয়ারে বসে যেতেন। তখন আর কিন্তু তাঁর বিলম্ব সহ্য হত না। খাওয়াও ছিল খুব দ্রুত কিন্তু খুব পরিপাটি।

কেউ নেমন্তন্ন করলে কী খুসিই যে হতেন আর কত আনন্দ করে খেতেন সেটাও দেখবার মতো ছিল। যিনি খাওয়াতেন তিনিও কম আনন্দ পেতেন না। এমন খুসি হয়ে আর রান্নার প্রশংসা করতে করতে খেতেন যে মনে হত যেন এরকম সুস্বাদু জিনিস কখনও আর খাননি। সকলকে সব কিছুতেই আনন্দ দেওয়াই যেন তাঁর ধর্ম ছিল।

একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। দিনদাকে নেমন্তন্ন করে এলাম দুপুরবেলা খাবেন। এ কথা মনে করার বয়স তখন ছিল না যে দিনদার দুপুরে এতদূর হেঁটে আসতে কষ্ট হবে, বা স্নান করেই যিনি খেতে বসেন তাঁর দেরী হলে পরে।

যাই হোক, দিনদা তো মহাখুসী হয়ে বললেন নিশ্চয় আসবেন। সেদিন সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। তখনকার দিনের বর্ষা শান্তিনিকেতনে পুরনো যাঁরা তাঁদের মনে থাকবার কথা। এমন বর্ষাও কোথাও দেখিনি। মাঠঘাট দিয়ে ছোটখাটো যেন নদী বয়ে যেত। যেখানে একটু খাদ বা উঁচু নীচু জায়গা পেত সেখানে যেন ঝর্ণার আওয়াজ হত, গাছপালা বিরল খোলা মাঠের উপর এমনই প্রবল হত বর্ষণ। খোয়াই-এর মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে লাল ঘোলা জল যেরকম ফুলে ফেঁপে ঘুরপাক খেতে খেতে চলত তা দেখলে সময় সময় ভয় করত।

এইরকম এক বর্ষায় দিনদার আসবার আশা ছেড়ে দিয়ে মন খারাপ করে বারান্দায় বিষণ্ণ মনে বসে আছি, হঠাৎ দেখি ছাতা মাথায় দিয়ে পাজামা একটু গুটিয়ে নিয়ে ভিজতে ভিজতে দিনদা এসে হাজির! সেদিনের আনন্দ কি এ জীবনে ভুলতে পারি? তাড়াতাড়ি দিনদাকে নিয়ে বসালাম বারান্দায় তক্তাপোষে। এখনকার মতো তখন বসবার ঘর ছিল না কারো। বাড়ির

বারান্দায় তক্তাপোষ পাতা থাকত ও গুটিকতক মোড়া এই ছিল বসবার ও বসাবার আয়োজন। আমরা থাকি 'গুরুপল্লী'তে আর দিনদা 'দেহলী'তে। অতদূর থেকে ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে জল ভেঙে ঠিক এসেছেন একটি ছোট্ট মেয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। একবারও মনে হয়নি তাঁর বাড়ির কাউকে জিজ্ঞেস করে সঠিক জেনে নেবার দরকার আছে বলে। আমাদেরই সমবয়সী বন্ধু যেন। সেদিনের তাঁর স্নেহের স্মৃতি স্মরণ করলে আজও চোখে জল এসে যায়। শিশুদের এতো মূল্যই বা ক-জন এমন করে দিতে পারে।

আগেই বলেছি সব কাজই তাঁর অত্যন্ত দ্রুত ছিল। তাঁর সঙ্গে হাঁটতে গেলে বড়দেরও দৌড়তে হত। দু'একবার গাইলেই তাঁর গান শেখা হয়ে যেত। বলতেন "কাল ভোরবেলা ঠিক সুরটি এসে ধরা দেবে। এখন আর নয়।" লিখতেন তাড়াতাড়ি, ছোট ছোট অক্ষরে। ইংরেজি পারতপক্ষে ব্যবহার করতেন না কিন্তু যখন বলতেন সুস্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণে অনর্গল কথা বলে যেতেন।

ঘরদোর নানা আসবাবে সাজানো কখনও দেখিনি, সেদিকে কোনোই আড়ম্বর ছিল না কিন্তু রুচি ছিল। আড়ম্বরহীন পরিচ্ছন্নতা তাঁর স্বভাবেই ছিল। আলস্য তাঁর মধ্যে কখনও দেখিনি। খাওয়া-শোওয়া তাসখেলা বেড়ানো সবই নিয়মে বাঁধা ছিল। তাঁর সঙ্গে কোথাও যেতে হলে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হত জানি দেরী হলেই দিনদা রাগ করবেন। তাঁর সময়জ্ঞান এইরকম প্রখর ছিল।

কলকাতার জোড়াসাঁকোয় এসে থাকবার পর খুব দীর্ঘদিন আর তাঁকে পাইনি। যতদিন ছিলেন জোড়াসাঁকো-বাড়ি ভরপুর করে রেখেছিলেন।

গান শেখানো, ছেলেদের দল নিয়ে হৈচৈ, সকলকে খাওয়ানো, তাসের আড্ডা, গল্প, বেড়ানো সবই ঠিক চলতে চলতে হঠাৎ আকস্মিকভাবেই থেমে গেল একদিন।

রাত্রে সেদিন খাবার আগে আমার সঙ্গে শেষ গল্প করলেন। সে যে কত গল্প—কত ভ্রমণকাহিনী—তাঁর সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ইচ্ছের কথা—স্বামী বিবেকানন্দর বক্তৃতা তাঁকে কী দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল ইত্যাদি সন্ধ্যার কয়েকঘণ্টায় উজাড় করে যেন ঢেলে দিলেন। তার কিছু আগে গগনেন্দ্রনাথের stroke হয়ে কথা বলার শক্তি চলে গিয়েছিল, শুধু মিষ্টি করে হাসতেন কাউকে দেখলে। দিনদা বিচিত্রার বারান্দায় বসে থাকতেন আর ও বাড়ির

জানলায় গগনেন্দ্রনাথ দাঁড়াতেন, মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতেন দিনদাকে দেখে, ওঁর কথা শুনে। এইভাবেই আলাপ চলত। দিনদার বড় কষ্ট হত ওঁকে দেখে। সে কথাও সেদিন বার বার বলতে লাগলেন। শেষে বললেন, "আমি ভগবানের কাছে কখনও কিছু চাইনি, কিন্তু এই একটি প্রার্থনা করি যেন পড়ি আর মরি—আমায় যেন ভুগতে না হয়। গগনকাকাকে দেখি আর আমার এ কথাই মনে হয়।" ঠিক তাই-ই হল। গভীর রাত্রে সেইদিনই চাকরের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে এসে দেখি বসে আছেন তাঁর বিছানায় বড় বড় দুই চোখ সম্পূর্ণ মেলে আরো বড় করে। এমন বোবা চাহনি —যেন প্রশ্ন করছেন "আমার কি হয়েছে?" যেন অবাক হয়ে গেছেন ঘটনার আকস্মিকতায়। দিদি (কমলবোঠান) আমায় বললেন, "ছাখ্‌ত কি হল! কথা বলতে পারছেন না কেন?" আমি চেঁচিয়ে বললাম "দিনদা, কি হয়েছে?" জড়িয়ে জড়িয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট করে বললেন "বড় একটা বিপদ হয়েছে।" সেই তাঁর শেষ কথা।

পরদিন ৫ই শ্রাবণ ১৯৩৫ সালের বেলা দশটায় সব চেষ্টা বিফল করে চলে গেলেন। জোড়াসাঁকো-বাড়িতে উৎসবের যে-আলোগুলি জ্বেলেছিলেন সব যেন হঠাৎ নিভে গেল। দিনেন্দ্র অস্ত গেলেন লালবাড়ির পশ্চিমের ঘরে। শিশুর দল নিমেষে অন্তর্হিত হল, নিস্তব্ধ হল সদা মুখরিত লালবাড়ি। শুধু দিনদার প্রিয় কুকুর বারান্দার রেলিঙের ফাঁকে মুখ গুঁজে পথ চেয়ে বসে রইল।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রাজধানী

ইতিহাসই জানে, আর তুমি জানো নাজির হাসান,
দরিবা কালানে এক পুরোনো দালানে বসে
আঁধি লাগা দিল্লীর ঘোলা-আকাশ চোখে
তুরুক্-সওয়ার ঘোড়া খুরে খুরে শব্দের স্বপ্নই দেখো।
এখন হঠাৎ টুক্‌রো বর্তমান নিয়ে,
টঙ্গাওয়ালা, স্কুটারের শব্দ ধাবমান,
মনসব্‌দার কোনো বাস থেকে নামে—
ফর্‌সীর নল মুখে চমকে ওঠো নাজির হাসান॥

অনেক দূরের পথ—ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে,
অতিবৃদ্ধ পিতামহ রাজধানী পাশা খেলা হেরে,
যুগে যুগে পাঠান-মুঘল রাজ্যে যুধিষ্ঠির হয়ে
মিশে গেছে ইংরাজের কালে।
এখন পাণ্ডব-পণ্ড ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডুর বাতাসে
বিবস্ত্র বেপথু কোনও দ্রৌপদীর কান্না নিয়ে
আধুনিক রেডিওর গান, আর রাস্তায়।
বরাত্ মিছিলে মেশে সিনেমার ধুন্।
শ্রদ্ধা হয় তোমাকেই,
তোমার এই বিচিত্র কেলাসে,
সময়ের মদ পান করে মত্ত সুচারু গেলাসে
রাজধানী ছিলে তুমি সিপাহী-বিদ্রোহেও—
রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসীকাঠ, "খুনী দর্‌বাজা"
হুঁশিয়ারী চিৎকার—ক্ষুধিত পাষাণ।

একটি প্রবল ইচ্ছা সমবেত হয়ে
মরে মরে ধূলি হয়ে গেছে সব দিল্লীর রাস্তায় ॥

তবু, কতখানি সব মনে আছে তোমার, জানি না
নাজির হাসান,
সেদিনও যেমন
এখনও অগুণতি সব সবুজ টিয়ার ঝাঁক,
ময়ূরের বর্ণালী বিলাস
সন্ধ্যার আরক্ত আকাশ আর লাল-কেল্লা ছুঁয়ে
যমুনার পারে উড়ে যায়, বর্ণাঢ্য পাখায়,
লাল-নীল-সবুজের শামিয়ানা
ঢেকে রাখে আকাশের চোখ।
শাহ্‌জাহান্‌ আলমগীর বাহাদুর শাহেরাও
দেখে গেছে সব।—
হাতীর পায়ের তলে অপরাধী পেষা
ঘাম আর গায়ের রক্ত জল করে করে
গড়ে তোলে সাধারণ লোক,
ভাস্কর কামার
নিষ্ঠুর প্রতিমা সব প্রাসাদে মন্‌জিলে।
এরই সব বিচিত্র আড়ালে,
চাঁদনি চকের কোনও অন্ধকার গলির গহনে,
তোমাকেও টেনেছিল, নাজির হাসান,
সুর্‌মা টানা মৃত্যু-হানা চোখ
তুর্কী সুন্দরীর।
তোমার যৌবন ছিল আঙুরের মতো
নিটোল মদির ॥

আজ সবই ইতিহাস।
অথচ তুমি-ও আমি, আমরা সবাই
এখানেই আছি, এই রাজধানীতেই

মিলে মিশে এক গালিচায়।
ওপরে পালাম থেকে জেট্ প্লেন
পুরোনো আকাশটাকে ছিঁড়ে চলে যায়।
আগুনের আলো জ্বলে,
হল্লা শোনা যায় দূরে রাস্তার মোড়ে।
আমি সেই মন্‌সব্‌দার, দিল্লীর বাস থেকে নেমে
জানাই সেলাম।
পুরনো কালের ঢুলু ঢুলু চোখে চারপাইএ
উবু হয়ে বসে,
ফর্‌সীর নল মুখে চমকে ওঠো নাজির হাসান ॥

'ইন্দ্রপ্রস্থ', দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৬৮, পত্রিকার সৌজন্যে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গা গূঢ় জলধারা

(শরদিন্দু সেনরায়-কে)

সঙ্গে সেই জলধারা। যতদিকে যতদূর যাই
সেই শর কাশ কাঁটাঝোপ কাদা কলকাতা বোম্বাই

ধূমাক্ত চিৎকার চিম্‌নি ঘুঘুর ঘুঙুর গ্রাম হাট
দিগন্তের দস্যু, দ্রুত পশ্চাদ্‌ধাবিত শস্য মাঠ

সেই এক জলধারা। বর্তমান এঘাটে, ওঘাঁকে
ইতিহাস পুরাণের কাশী কাঞ্চী পঞ্চাল পা রাখে

স্রোতে ভেসে ভেসে ফুল কলার মান্দাস কোলাহল
রৌদ্র মন্ত্র সামগান ধাবমান ছলাৎছল জল

চকিতের নৌকা বুকচেরা চিহ্ন চিরকাল আর
শ্রমস্বেদ অশ্রু বীতরাগ রক্ত শ্মশানঅঙ্গার

স্রোতে আরো এক স্রোত, সময় সময়াতীত যদি,
গঙ্গার গাঁওয়ার রোখ চরাচর চৈতন্য অবধি

যাই সঙ্গে জলধারা, যাই ভেসে যায় রাত্রি যায়
গর্ভের বিদীর্ণ রাত্রি আলোকিত জন্মের গঙ্গায়

বসে থাকি বহে দিন দিনধারা নয়নাভিরাম
হানে রৌদ্র টানে ছায়া তৃষ্ণা তৃপ্তি আত্মার আরাম

চিন্তাচেষ্টাচারণার চপল বহতা, কানে আছে
ব্যর্থ বিভ্রমের মৃদু জলধ্বনি কাছে দূরে কাছে

অবিকল এই মুখ, নিচে তার উন্মাদ মেদুর
হাস্য লাস্য ক্রোধদীপ্ত ঘৃণায় ঘোলাটে কতদূর

গঙ্গা গূঢ় জলধারা। ক্লেদক্লিন্ন স্নানপুণ্যসুখ
টানো স্বর্গে বাঁধো মর্ত্যে নামাও নরকে নিরুৎসুক

স্বর্গমর্ত্যনরকের ত্রিবেণীসঙ্গম জলমেলা!
গঙ্গা-গাঙুরের নীরে ভাসালাম বেহুলার ভেলা।

সিদ্ধেশ্বর সেন

দেবী পক্ষ

সেই অলৌকিক নারী, যজ্ঞমেধ পশু, বারবার
ফিরে ফিরে আসে,
আমারই দিকে ব্যাপ্ত, যৌথ

দৃশ্যাবদান, মনে হয়, আদিম
সর্বগ্রাসে

শরতের হাওয়ায় ওড়ে, স্বচ্ছন্দে, পুরা
ও নৃতত্ত্ব

স্বচ্ছ, চৌকো মেঘের আড়ালে, হতবুদ্ধি
দর্শকের মতো

আর, মনে হয়, আমার দৃষ্টিতে কোনো প্রজ্ঞা
নেই, যা ছিল, আমারও দৃষ্টির
প্রজ্ঞা
অমন ইচ্ছানুযায়ী হাওয়ায়,—তা
সাযুজ্যে ভেসেছে

আর, সমস্ত অতীত, জাতিস্মর
-কাল
একসঙ্গে নেমে পড়ে, আশ্বিনের দেবী-
পক্ষের ছায়ায়

তারপর, উন্মাদের মতো নদীতীরে, নদীতীরে
উন্মাদের মতো
ভাসানে, খড়কুটোয় ভেসে যায়

আকাশে এখন উঁচুতে-ঘোরানো, তুঙ্গী,

নিকষ-মেঘ
জলাধারগুলি ফেটে ভেঙে চৌচির

এখুনি বুঝিবা, মুষল
-ধারায়
বিশ্বের ভাবাবেগ
নামবে
রয়েছি বিপন্ন নাকি স্থির

বেজে বেজে গেল, বাদিনী
তোমার বীণা
বেজে বেজে গেল, আমাদের ঘিরে
অযথা, পাওনা-দেনা
পুণ্যপাপের
সময়ের ভাঙ্-চুর

হঠাৎ পাল্লা খুলে পড়ে গেল,
শূন্য—
ধাঁধিয়ে আলো
পড়ল লাফিয়ে
অজস্র ধার
বিদ্যুৎ-বহ
লাফিয়ে-লাফিয়ে
বাঁকাচোরা আলো

অরণ্য যেন নগরীও এ
বিংশ-শতাব্দীর
নিকট অথচ দূর

আর, নগরীর মধ্যে কোলাহল, কোলাহল

পূজার্চনা, ধুনীরও ধোঁয়া
হে প্রচণ্ড আরাধনা

হে, হে, হে প্রচণ্ড আরাধনা—

সবই শিশুর মতো, অপ্রাপ্তবয়সে স্বাভাবিক
মেলানো সহজই,—বুদ্ধির ;
তারিফের এই শতকের, শত
শত-আস্তরণ
খসিয়ে ফেলার ঝোঁকে, ঠেলে
এনে দিল আদি প্রস্তাবনা

আমার তো মনে হয়, এই অর্বাচীন যদি
এতই প্রাচীন
আর, সমস্ত প্রাচীন, সনাতন, এক
কোনোকালে অর্বাচীন
এই প্রবহমানতা, তবে পরম্পরা, আশ্চর্যমুকুরে
ধরা আছে

আর, মনে হয়, এই যিনি দেবী
সিংহবাহিনী
গঙ্গামৃত্তিকার অথবা ক্রীটের
মাতৃ উপাসনা-তন্ত্রে, বেঁচে

ক্ষণিক, অনিত্য, তাহলে কী নয় নিত্যেরই ?—
আমি তো জানি না
আরো ভবিষ্যতে আরো বয়স্কমন্যতা, ফের, ভিন্ন
কায়া রচে কিনা
এ-বিরাট, ব্রতাচারে, স্ত্রীপুরুষে—অবশ্যম্ভাবিতা কিছু বেয়ে
নাকি যেচে ॥

স্বগত সেন

প্রথম বিধবা-বিবাহ

আমরা সবাই জানি আইন পাশ হবার পর প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী দশ বছরের কন্যা কালীমতী দেবী। রাতারাতি নায়ক হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র। গোঁড়া অথবা প্রগতিবাদী, বাংলা বা ইংরেজি সবরকমের খবরের কাগজের প্রধান সংবাদ তিনি, পাড়া-পড়শির মধ্যাহ্নের মুখরোচক আলোচনা-সভায়, কলেজে-গোলদীঘিতে তর্কে-বিতর্কে, চণ্ডীমণ্ডপের আসরে তাঁর তখন অপ্রতিহত প্রভাব। শ্রীশচন্দ্রের মধ্যেও দোটানা কম ছিল না—বিয়ের তারিখ একবার পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। তাই নিয়ে আবার 'ইংলিশম্যানে'র ঠাট্টা।[১] তবে শেষ পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। সেদিনের কথা উল্লেখ করে রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, "মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।" রামগোপাল ঘোষ ছাড়া আরো যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'ভাস্কর' সম্পাদক। এঁরা সকলেই স্বনামধন্য, নতুন করে এঁদের পরিচয় দেবার দরকার নেই। কিন্তু 'ভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে খ্যাত) এই প্রথম বিধবা-বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এর আগেও তিনি একটি বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, শুধু যোগদান করেন বললে কম বলা হয় কেননা উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁকেই পৌরোহিত্য করতে হয়। কিন্তু সেদিনের সেই বহুবিশ্রুত ঘটনা আজ প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। বিদ্যাসাগরের আধুনিকতম চরিতকার শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা

---

১. বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (৩য়)'-এ এ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

করেন নি। বিদ্যাসাগরের আগে রাজা রাজবল্লভ অথবা নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কিন্তু বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হবার আগেই বিধবা-বিবাহ করেন ইয়ং বেঙ্গলের স্বনামধন্য সদস্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই বিবাহ বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন নিজেই রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন যে, 'তিনি বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার স্থায় সমাজ-সংস্কারক আর কে আছে?' বিবাহের পাত্রী ছিলেন বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্তকুমারী দেবী।

অবশ্য এটা ঠিক কোনো সমাজ-সংস্কারের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিবাহ সংঘটিত হয় নি। রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং বসন্তকুমারী দেবী পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। সেদিন সাধারণ থেকে সম্ভ্রান্ত সবাই এই ঘটনার কুৎসা এবং কেচ্ছার অংশটাই বিশেষভাবে উপভোগ করেন। ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডোয়ার্ডস থেকে শুরু করে অনেকেই দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা করেছেন। এ বিবাহ আদৌ সংঘটিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে এডোয়ার্ডস সন্দেহ পোষণ করেছেন। অনেকের ধারণা দক্ষিণারঞ্জন যে অযোধ্যাপ্রবাসী হয়েছিলেন তাও কতকটা এই কারণে। লোকনিন্দা তিনি আর সইতে পারছিলেন না। তবে রটনা যতই মুখরোচক হোক ঘটনার সঙ্গে তার সবসময় ঐক্য থাকে না। বিশেষত রাজা দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে সে যুগে আরো অনেক গল্প প্রচলিত আছে, কেননা বিত্ত-বিদ্যা-বংশ এবং রূপের সমাহারে এরকম ব্যক্তিত্ব সে যুগে দুর্লভ ছিল। একবার গুজব রটে যে ডিরোজিওর ভগ্নী এমিলিয়ার সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা এবং তিনি শিগগিরই এমিলিয়াকে বিয়ে করবেন। বলা বাহুল্য, কিছুদিন বাদেই এ গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্যকুমার ঠাকুরের (প্রসন্নকুমারের ভ্রাতা) দৌহিত্র। তাঁর পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হিজলি-কাঁথির লবণকুঠির সদর আমিন ছিলেন। তাঁর পিতা পরমানন্দ (ওরফে জগন্মোহন) ঠাকুর-পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথমা পত্নীর (দক্ষিণারঞ্জনের মাতা) মৃত্যুর পর তিনি সূর্যকুমারের আরেক কন্যাকে বিবাহ করেন।

দক্ষিণারঞ্জন ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেন। তিনি জলের মতো ইংরেজি লিখতেন। দক্ষিণারঞ্জন এবং তাঁর সহপাঠী

রামগোপাল ঘোষের ইংরেজি লেখার এতদূর খ্যাতি ছিল যে কথিত আছে, তাঁরা যখন নীচু ক্লাসে পড়তেন তখন তাঁদের ইংরেজি রচনা নিয়ে ডঃ উইলসন উপরের ক্লাসের ছাত্রদের লজ্জা দিতেন।

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা প্রকাশ করেন। মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন এবং সেই টাকায় তিনি উক্ত সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশের সংকল্প করেন। তাঁর উদার মতামতের জন্য পিতার সঙ্গে দু-একবার মনোমালিন্য হয় এবং বার দুই-তিন তিনি গৃহত্যাগও করেছিলেন। মেটকাফের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিল গৃহীত হলে তিনি টাউন হলে আয়োজিত একটি সভায় মেটকাফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি ডিরোজিও-প্রবর্তিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। কিন্তু "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা"-র প্রতিষ্ঠার সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন না। পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি এর একজন বিশিষ্ট সদস্য বলে পরিগণিত হন এবং এই সভায় প্রবন্ধও পাঠ করেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি "জ্ঞানোপার্জিকা সভা"র অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিষয়: "Present condition of the East India Company's courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency." আগে জ্ঞানার্জন সভার অধিবেশন হিন্দু কলেজ গৃহেই অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু এর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত প্রবন্ধে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের নির্ভীক মতামত ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় অনেকে অস্বস্তি বোধ করেন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন। তিনি এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে সভাস্থলেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "I cannot convert the college into a den of treason." এই মন্তব্যে উপস্থিত সদস্যগণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহ ত্যাগ করে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং পরে ডি. গুপ্তের ডাক্তারখানার উপরতলায় ফৌজদারি বালাখানায় সভাব অধিবেশনাদি পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এখানেই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়—দক্ষিণারঞ্জন এই সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। বস্তুত ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যদের মধ্যে রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় রামগোপাল ঘোষ ছাড়া তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

দক্ষিণারঞ্জন আইনব্যবসায়ী হিসেবে জীবিকার সূত্রপাত করেন। এবং আইনের পরামর্শদান উপলক্ষে বর্ধমানের মহারানী বসন্তকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহ সুখের হয়নি। মুক্তকেশী নামে একটি কন্যা প্রসবের পর জ্ঞানদাসুন্দরী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। যাই হোক, বসন্তকুমারীকে বিয়ে করবার পর তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে কলকাতার কালেক্টরের পদগ্রহণ করেন। তারপর কিছুদিন ত্রিপুরা এবং মুর্শিদাবাদে দেওয়ান নিজামতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর প্রবন্ধাদি পড়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হন। বিদ্রোহ-দমনের পর ডফের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জনকে রায় বেরিলির অন্তর্গত শঙ্করপুরের বাজেয়াপ্ত তালুক প্রদান করেন। পরে সরকার কর্তৃক তাঁকে কে সি. এস. আই. এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দক্ষিণারঞ্জনের বদান্যতা সে যুগে প্রায় প্রবাদবাক্যের মতো ছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় থেকে অযোধ্যার শিশুহত্যা-নিবারণ আন্দোলন পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

এটা এক হিসেবে মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, প্রথম বিধবা-বিবাহ যিনি করেন তিনি "ইয়ং বেঙ্গলের" একজন সদস্য। উক্ত দলের মুখপত্র দক্ষিণারঞ্জন প্রতিষ্ঠিত "জ্ঞানান্বেষণ" (১৮৩১) পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের বহু আগেই এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য একবার এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন আমারদিগের নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি ...... ।"

এই গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যই প্রথম বিধবা-বিবাহের প্রথম পুরোহিত।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে ইয়ং বেঙ্গলের সহযোগিতার কথা সর্বজনবিদিত। তাঁরা যে শুধু এই আন্দোলন সমর্থন করে তিনশো পঁচাত্তর জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তাই নয়, এ জাতীয়

বিবাহ-নিবন্ধনের একটি খসড়াও তৈরি করেছিলেন।[২] তার মধ্যে একটা শর্ত হলো এ জাতীয় বিবাহকে বৈধ করতে হলে কোনো সরকারি কর্মচারীর সাক্ষ্য আবশ্যিক। তখনও তিন আইনের বিয়ে (Civil marriage Act III of 1872) প্রচলিত হয় নি। মনে হয় ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যগণ তাঁদের সুহৃৎ এবং সহযোগী রাজা দক্ষিণারঞ্জন যেভাবে "সিভিল বিবাহ" করেছিলেন, সেই পদ্ধতিকেই বিধিসংগত করতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন বসন্তকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বার্চকে সাক্ষী রেখে। এবার ভূমিকা রেখে মূল ঘটনাটি বিবৃত করা যেতে পারে।

বসন্ত পঞ্চমীতে বর্ধমানে বিরাট উৎসব হয়। একবার এই উপলক্ষে দক্ষিণারঞ্জনও আমন্ত্রিত হন। এখানেই মহারাজা তেজচন্দ্রের বিধবা পত্নী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। তেজচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহাতপচাঁদ তখন নাবালক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এই মহাতপচাঁদ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ছিলেন।[৩] মহাতপচাঁদ রানী বসন্তকুমারীর ভ্রাতা। যাঁরা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' পড়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের বর্তমান কাহিনীর কুশীলবেরা অপরিচিত নয়। মহারাজ

---

২. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (৩য়)' দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠা থেকে ইয়ং বেঙ্গল প্রস্তাবিত বিবাহের অঙ্গীকারপত্রের খসড়া তুলে দেওয়া হলো :

Declaration A

"I......, widower or bachelor. and I...widow or spinster, do hereby jointly and severally declare that of our own free will and accord, we have solemnised our marriage with each other on this day of...

Witness our hands etc.

The above declaration were made in the presence of......

Agreement B

"I......, having taken...as my wedded wife on this day, do hereby bind myself not to contract a second marriage during her lifetime, and n breach of this engagement on my part, to pay to her the sum of Company's Rupees......on the date of any second marriage."

৩. বর্ধমানের মহারাজা মহাতবচাঁদ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের যে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বর্ধমানের মহারাজার সমর্থনের কথা উল্লেখ করে গ্র্যান্ট সাহেবকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন : "It is realy a matter for congratulation that the first man of Bengal is going to take up the cause." বি. ও বা. স. পৃঃ ২০১।

তেজচন্দ্রের অনেক বিয়ে ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন, "তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষ বিবাহটি (বসন্ত-কুমারীর সঙ্গে) অতি বৃদ্ধ বয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবা পুরুষ, বিষয়-কার্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে-সকল কার্য হইতে নিবস্ত হইয়াছিলেন।" যাই হোক, তেজচন্দ্র প্রথমা মহিষী নানকি রানীব জীবৎকালেই কাশীনাথ রায়ের কন্যা কমলকুমারীকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের পর "মৃচ্ছকটিক"-এর শ্যালক শর্বিলকের মতো কমলকুমারীর ভ্রাতা পরানবাবু বর্ধমানের রাজদরবারে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। হবেনই বা না কেন! "বর্ধমানের বুড়া রাজা"র ব্যক্তিত্বের পরিচয় সঞ্জীবচন্দ্র-বর্ণিত এই কাহিনী থেকে পাওয়া যাবে: "প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীরা অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথাসময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন। পিঞ্জরে কতকগুলি লাল নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে থাকিতেন। সম্মুখবর্তী হইবামাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত; মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জরহস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্মচারী অগ্রসর হইয়া জোড় করে নিবেদন করিল, 'মহারাজ, হুগলিতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠানো হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।' তেজচাঁদ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, 'চুপ! হামরা লাল ঘবড়াওয়েগা।' এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লাল পক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্যই তাঁহার কষ্ট হইল।" এ হেন রাজার কাছে পবানবাবুর প্রতিপত্তি যে দিনদিন বৃদ্ধি পাবে তাতে আর সন্দেহ কি! এদিকে পরানবাবু রাজার সঙ্গে শ্যালক-ভগ্নীপতির সম্পর্কটি আরো ঘনিষ্ঠ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি ভগ্নীপতির সঙ্গে স্বীয় কন্যা বসন্তকুমারীর বিবাহ দিলেন। এই ঘটনায় প্রতাপচাঁদের প্রতিক্রিয়া হলো, "পরানমামা দড়ি পাকাচ্ছেন।" যাই হোক, ভগ্নীপতি হলেন জামাতা। মহারাজা তেজচন্দ্র যতই দুর্বলচিত্ত হন, তিনি প্রথমা মহিষী নানকি রানীর গর্ভজাত প্রতাপচাঁদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিই যে বর্ধমানের ভবিষ্যৎ রাজা এটা একরকম নিশ্চিত ছিল। পরানবাবু, বলা বাহুল্য, প্রতাপচাঁদের প্রতাপ খুশিমনে মেনে

নেন নি। তিনি চক্রান্ত করতে লাগলেন। ভাগ্যও তার সহায় হলো। প্রতাপচাঁদের কঠিন পীড়া হলো। বৈদ্যরা জবাব দিলেন, অন্তর্জলির জন্য মুমূর্ষুকে গঙ্গাতীরে আনা হলো, তার মৃতদেহ সৎকার হলো। কিন্তু শ্মশানযাত্রীরা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন না সত্যি সত্যিই শবদাহ হয়েছে কিনা। কেননা অন্তর্জলির সময় থেকেই সেই মুমূর্ষু নিখোঁজ। তারপর প্রতাপচাঁদের এক যুগ পরে পুনরাবির্ভাব এবং সেই জাল রাজার কাহিনী সবারই জানা। এই বিরাট মামলায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ সে যুগের অনেক মনীষীবৃন্দ সাক্ষী ছিলেন। তবে (জাল!) প্রতাপচাঁদ তাঁর মৃত্যু-ঘটনার হেতু বিষয়ে বলেন: "বিমাতা মহারানী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোলো কি সতেরো, তখন তিনি আহারের সঙ্গে আমায় দুইবার বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর-একবার তাহা একটি ইন্দুরকে খাইতে দিই, ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরান আর বসন্তলালবাবু আমার সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষে তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহার আর কোনো উপায় করিতে পারিলাম না।

আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম, শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্যবস্থা দিলেন, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস', এই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, 'এরূপভাবে করিবে যেন সকলেই জানে, তুমি—মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীর উদ্দীন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে পিতা মহাশয় পরানের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরানের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন; আমাকেও অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র,

সেইরূপ কর্তব্য। আমি মরিয়াছি—সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম। কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন, আমি শয্যায় শুইয়া সেই সংকেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কি করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জলি করিল। অন্তর্জলির পর যখন রাজবাটীর অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল দুই-চারিজন মাত্র আমার নিকট থাকিল, সেই সময় আমি তাহাদিগকে শপথ করাইয়া জলে সরিয়া পড়ি; নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি; রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুর্শিদাবাদ যাত্রা করি।"

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হোক অথবা তিনি নিরুদ্দেশ হোন, এর পর বর্ধমানের রাজাকে দত্তকপুত্র গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা প্রথম প্রথম অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রতাপচাঁদ জীবিত! শেষ পর্যন্ত তাঁকে বোঝানো হলো যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন এবং এর মধ্যে যদি মহারাজার দেহনাশ হয় তবে উত্তরাধিকারীর অভাবে সমুদয় সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুর নিয়ে নেবেন। অগত্যা তেজচন্দ্র পরানবাবুর পুত্র মহাতপচাঁদকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। পরানবাবুর স্বপ্ন সফল হলো।

পরানবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা বসন্তকুমারীর জীবনের বিনিময়ে। কেননা বিবাহের সময় তিনি ছিলেন নাবালিকা এবং কিছুদিন পরেই তিনি বিধবা হন। তাছাড়া পরানবাবুর যাবতীয় চক্রান্তে কন্যা বসন্তকুমারীর চেয়ে ভগ্নী কমলকুমারীই ছিলেন বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। বিধবা রানী বসন্তকুমারী অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও স্বজনদের চক্রান্তে কিছু ভোগ করতে পারতেন না। রাজপরিবারেও এই বিধবা রানীর বিশেষ কেউ সহমর্মী বা সমব্যথী ছিল না। এমন সময় এই নাটকীয় সন্ধিক্ষণে দক্ষিণারঞ্জনের বর্ধমানে আবির্ভাব। তিনি আইনব্যবসায়ী জেনে বসন্তকুমারী তাঁর সঙ্গে পরিচয় করার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। দক্ষিণারঞ্জনের পরামর্শে স্থির হয় বসন্তকুমারী তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তির জন্য সদর আদালতে মামলা করবেন। কিন্তু এ জন্য রানীর স্বয়ং কলকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। একে অঙ্গনা, তার উপর রাজগৃহের বিধবা। আর কমলকুমারী তখন কার্যত বর্ধমানের অধীশ্বরী—তিনি বসন্তকুমারীর

কলকাতায় যাবার কারণ জানলে সমূহ বিপদ। অতএব ঠিক হলো বসন্তকুমারী দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে গোপনে কলকাতায় যাত্রা করবেন।

কিন্তু তাঁরা বর্ধমান ত্যাগ করবার কিছুক্ষণ করেই খবরটা চাপা রইলো না। চারদিকে রটে গেল বিধবা রানী বসন্তকুমারী দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন। রাজপ্রাসাদ থেকে সশস্ত্র সওয়ার বেরিয়ে পড়লো পলাতকার সন্ধানে। দৃপ্ত গতিবেগে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণারঞ্জনসহ বসন্তকুমারীকে ধরে ফেললো। দক্ষিণারঞ্জনকে সমবেত প্রহার অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তারা প্রহারেই তাঁর প্রাণনাশের সংকল্প করেছিল। কিন্তু বাদ সাধলো তিনজন ইউরোপীয় মিশনারি। তাঁরা ডাকগাড়ি করে কলকাতা থেকে আসছিলেন। তাঁরা সওয়ারদের ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করেন। তাঁরা বললেন যে, তারা যদি মুহূর্তে দক্ষিণারঞ্জনকে মুক্তি না দেয় তাহলে তাঁরা আদালতে নালিশ করবেন। অগত্যা প্রহরীগণ দক্ষিণারঞ্জনকে পরিহার করে শুধু রানী বসন্তকুমারীকে নিয়ে বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল।

এদিকে দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে রানীর পক্ষে মোকদ্দমা দায়ের করেন। এবার আদালতের শমন। সুতরাং রানীকে বাধা দেবার কেউ রইলো না। আদালতে রানীর অনুকূলেই মামলার নিষ্পত্তি হলো—ঠিক হয় বর্ধমানের রাজকোষ থেকে মাসিক পাঁচশো টাকা বৃত্তি তিনি আজীবন পাবেন। কিন্তু রানী আর বর্ধমানে ফিরে যান নি। রাজা দক্ষিণারঞ্জন তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বার্চকে সাক্ষী রেখে বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। পুরোহিত ছিলেন গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য। অন্যান্য সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ডি. গুপ্ত। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় যে বিধবা-বিবাহ বিধির জন্য তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন ঘটনাচক্রে ঐ পত্রিকারই প্রথম সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শুধু তাই নয় বিধবা-বিবাহ আইন এবং তিন আইনের বিবাহ প্রচলিত হবার বহু আগেই একই সঙ্গে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং সিভিল বিবাহের অভূতপূর্ব উদাহরণ হয়ে রইলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে যে-কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নেই। সত্যিই তো তাঁর মতো সমাজসংস্কারক আর কে আছে?

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে নেপোলিয়ন যেমন প্যারিসে পোপ সপ্তম পায়াসকে অভিষেকক্রিয়া-সম্পাদনে বাধ্য করেছিলেন, তেমনি দক্ষিণারঞ্জনও তাঁর অনুগত গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যকে (তৎকালে) শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিধবা-বিবাহে পৌরোহিত্য করতে বাধ্য করেন।

কিন্তু উক্ত ঘটনার বহু বৎসর পরে আজ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি দক্ষিণারঞ্জন স্বৈরাচারী না সমাজসংস্কারক? আজ আমরা তাঁর দার্ঢ্য এবং দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারি না। সেদিন যা ছিল কেচ্ছা, আজ তা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

আশিস ঘোষ

বিবর্ণ

শরীরের কোনো এক অজ্ঞাত স্থান থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হতে হতে নিজের অজ্ঞাতে দেহ রক্তশূন্য হয়ে গেলে, নিজেকে যেমন দুর্বল, শূন্য এবং ভারহীন মনে হয়,—ঠিক তেমন একটা দমবন্ধ করা অস্বস্তিতে অনিল ঘামছিল, মর্গের ভিতরটা আবছা অন্ধকার, কেমন যেন ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেতে। ওষুধের ভ্যাপসা গন্ধে মাথায় ঝিম্ ধরে আসে।

একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক। কিছু একটা আলোচনা চলছিল বোধহয়। অনিলদের দেখে অধ্যাপকটি ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন। কোনো কথা না বলে অনিল করোনারের রায়টি এগিয়ে দিল। বিজন খানিকটা সামনে গিয়ে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। ডাক্তার গম্ভীর মুখে রায়ের পাতা উল্টে গেলেন। ম্লান আলোয় পড়তে অসুবিধা হওয়ায় মুখটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

—মিত্র, ৬ নম্বর লাশটা খালাস করে দাও। লোক এসে গেছে। আজকে আর কোনো কাজ নেই তাহলে। রায়টা অনিলের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। —যান ওর কাছে, ও-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। মিত্রর দিকে তাকিয়ে ও-দিকে যেতে ইঙ্গিত করলেন। হাতের গ্লাব্‌স্ খুলতে খুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনিল মিত্রর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—আসুন, এদিকে। অনিল ওর পিছন পিছন ঘরের একেবারে কোণের দিকে এগিয়ে চললো। বিজন পাশে পাশেই হাঁটছিল। ফিসফিসিয়ে কী একটা বলল, ঠিক শোনা গেল না। ওর দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। এই প্রায়-অন্ধকার প্রেতপুরীতে কোনো কথা বলা যায় না। নিজেকে কেমন যেন সম্মোহিত মনে হচ্ছে।

মিত্র আলমারীর ড্রয়ারের মতো কী যেন একটা টেনে খুলে আবার বন্ধ করলেন। রবির মতো একটা বাচ্চা ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেল অনিল। মুখটা ফ্যাকাশে নীল। পায়ের চেটোয় কাঁচা হলুদের রঙ। মাথার পিছন

দিকটা শিরশির করতে থাকলো অনিলের। মৃত্যুর এত বেশি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আর কোনোদিন হয়নি, ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বিজন বলল,—'একমাস আমার রাত্রে ঘুম হবে না অনিলদা, It is horrible উঃ, চেয়ে দেখা যায়!' উত্তরে অনিল শুধু মাথা নাড়ল একবার। কপালের দু-পাশের রগ দপদপ করছে বুঝতে পারল। বুকের ভিতর একটা কেমন দমবন্ধ করা ভাব ক্রমশ দলা পাকিয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

—এই নিন আপনাদের···।—ও-পাশের একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মিত্র ওদের ডাকতেই, অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ধবধবে শাদা কাপড়ে মোড়া শমিতার সমস্ত শরীর। পায়ের নীচের দিকের কিছুটা অংশ বেরিয়ে আছে। কয়েক বছর আগে গরম জল ঢেলে পড়ার শাদা দাগটা দেখতে পেল। পায়ের পাতা একেবারে শাদা। নীল শিরা-উপশিরা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—'সত্যি, বৌদিকে এ অবস্থায় দেখব, কোনোদিন ভাবতেই পারি নি।' বিজন কাঁধে হাত রাখতেই, অনিল ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। বুকের ভিতরটা একেবারে ফাঁকা মনে হচ্ছে। কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি চেতনার গভীরে প্রবাহিত হতে হতে নিজেকে ক্রমশ অসাড়, নিশ্চল ও নিশ্চেতন করে দিচ্ছে। অনিল ভাবছিল—হয়তো এমন করেই ও প্রতিশোধ নিয়ে গেল।

পায়ে আলতা পরানো হতেই একটা পরিষ্কার শাদা কাপড়ে সমস্ত দেহটা ঢেকে দিল বিজন। মুখে, হাতে-পায়ে এবং চুলে ঘি মাখানো হয়েছে। লাল সিঁদুরের আঁচড় কপালে আর সিঁথিতে দগদগ করছে। মৃত শরীরেও যে আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে, এটা অনিলের জানা ছিল না। জীবন্ত মানুষের প্রাণময়তা ও সজীবতার স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এটাই। এ সৌন্দর্যে এমন একটা গভীরতা, অলৌকিকত্ব এবং তন্ময়তা আছে, যা যে কোনো মানুষকেই অন্যমনস্ক এবং ভাবুক করে দেয়।

পুরোনো দিনের কিছু কিছু স্মৃতি মনে পড়ছিল। প্রথম বিয়ের পর বয়স্ক পুরুষ আত্মীয়েরা বলতেন,—'বাঃ, বেশ লক্ষ্মীর প্রতিমা হয়েছে! মা খুব ভাগ্যবতী হবে।' মহিলারা বলতেন,—'সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! অনিলের ধাতে সইলে হয়। ওটা তো একটা আস্ত পাগল!' আর বন্ধুরা বলতো,—

'মাইরি অন্থ, তুই দেখালি বটে। বলা নেই কওয়া নেই সেরেফ তপোবন থেকে এক শকুন্তলাকে নিয়ে এলি! দেখিস আবার 'অঙ্গুরীয়' হারিয়ে না যায়।'

অনিল ভাবছিল: পুরোন দিন আর ফিরে পাওয়া যায় না। এক-একটা দিন, এক-একজন পরিচিত মানুষ ক্রমশ স্মৃতি হয়ে যায়।...মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? বেঁচে থাকার অধিকার যেমন সহজাত, মৃত্যুতেও কি তেমন কোনো অধিকার আছে? নিজের কাছে জীবন মূল্যহীন হয়ে গেলেই কি মানুষ আত্মহত্যা করে?

পর্যাপ্ত কাঠে সাজান চিতায় শবদেহ তোলার সময় সমবেত কয়েকবার হরিধ্বনি দেওয়া হলো।

—দোহাই মা, রাগ করে উঠে বসবেন না আবার! হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বেখাপ্পা রসিকতা করলো।—'কী হচ্ছে ফটিক, দেখছিস তো অনিলদা পাশেই দাঁড়িয়ে। সব সময় ছ্যাবলামি ভালো লাগে না।' সব কিছু শুনেও না শোনার ভান করতে হলো অনিলকে।

একটু পরেই পুরোহিত এসে সামনে দাঁড়াল,—'তাড়াতাড়ি করবেন। আমার তো আরও কাজ আছে।' নবাগত আর-একদল শবযাত্রীর দিকে তাকাল—'এই সব অপঘাত মৃত্যুর ব্যাপারে, আমরা কিন্তু কিছু বেশি দক্ষিণা পেয়ে থাকি।'

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কাজ তো আগে হোক আপনার।—রবি আবার কোথায় গেল। রবি—এই রবি! ব্যস্ত মানুষ বিজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। সামনের একতলা বাড়িটার উঁচু রকে রবি বসেছিল। বিজন ওর হাত ধরে নিয়ে এলো।—'বলুন ঠাকুরমশাই, এখন কী করতে হবে। এই হচ্ছে ছেলে।' অনিল লক্ষ করলো রবির মুখটা কেমন যেন করুণ আর পাংশু হয়ে আছে। দেখলেই মায়া হয়। বাচ্চা ছেলে, কাল থেকে কম ধকল তো যায় নি! অনিলের ইচ্ছে করছিল, ওকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কয়েকটা প্যাকাটি কাঠি একসাথে জ্বালিয়ে রবির হাতে দিল বিজন। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে চিতা প্রদক্ষিণ করতে করতে মায়ের মুখে

আগুন ছোঁয়াল রবি। শুকনো কাঠের চিতা দাউদাউ জ্বলে উঠলো। চুল-পোড়া গন্ধ। গায়ের চামড়া ফেটে টস টস শব্দে জল পড়ছে। দেহটা ক্রমশ বিকৃত হয়ে গেল। লাল আগুনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে এলোমেলো। কে একজন ঘুরে ঘুরে আগুন খুঁচিয়ে দিচ্ছে। সব কিছু ঝাপসা দেখছিল অনিল। গঙ্গার দিক থেকে সাঁই সাঁই ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদ একবার ঢাকা পড়ছে। আবার ভেসে উঠছে। ও-পাশে একটা নিভন্ত চিতার চারদিক ঘিরে বসে কারা যেন গাঁজা টানছে। শ্মশানের হাওয়ায় পোড়া চামড়ার গন্ধ। একটা কেমন মাদকতা আছে এতে। অনিল জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টানলো। ও-পাশের একতলা ছাউনিতে খুব জোর কীর্তন জমে উঠেছে। অনিল হেঁটে গিয়ে সামনের ডোমেদের বাড়ির রকটায় বসলো। মাথাটা ঝিমঝিম করে চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু জল পড়ছে না। হাঁটু মুড়ে, দু-হাতের ভাঁজে বসে থাকলো অনিল।—'উঃ, আর পারা যায় না। কতক্ষণ এখানে থাকতে হবে, কে জানে!'

পুরোন কথা ভাববার চেষ্টা করলো অনিল। কিছু কিছু ঘটনা, এলোমেলো স্মৃতি,—মনের পর্দায় কাঁপাল। কেঁপে কেঁপে অনুভূতি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। অনিল ভাবছিল, শমিতা মরেছে এক নিদারুণ শীতে, অসহ্য বেদনায় কাঁপতে কাঁপতে। এটুকু এখন বুঝতে পারছে যে, কোনো আবরণে এ শীত যাবার নয়। মানুষের ভিতরের উত্তাপ শুকিয়ে গেলে, বাইরের তাপে তাকে কখনো বাঁচানো যায় না। মন নামক পদার্থটি,—স্পর্শে কাতর হয়, আবার অনাদরে পেয়ে বসে।—'কে জানে, হয়তো এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কিংবা হয়তো, আমার এ চিন্তা ঠিক নাও হতে পারে।'

স্ত্রীকে ভালোবাসতে হবে এটা যদি দাম্পত্য জীবনের কোনো সর্ত হয়, তবে এ কথা ঠিক যে অনিল তা পুরোপুরি পালন করার চেষ্টা করেছে। স্ত্রীর পক্ষে প্রাপ্য যা কিছু, তার কোনো অভাব ছিল না শমিতার জীবনে। কিন্তু শুধু সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অভিমান নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। শমিতাও পারে নি।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে: চশমা নেওয়ার জন্য শমিতা এক ছুটির দিনে অনিলের সাথে বাইরে বেরোতে চেয়েছিল। শরীর খারাপ থাকায় অনিল যেতে রাজী হয় নি। শমিতাকে বলতে শুনেছে,—'তা যাবে কেন

বন্ধুপত্নীরা বললে তো অফিস ছুটি নিয়ে যেতে।' মনে আছে, এর পর তিনদিন ধরে কোনো কথা বলেনি শমিতা। আর-একবার বন্ধুর বিয়েতে ব্যারাকপুর গিয়েছিল অনিল। রাতের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হয় নি। পরদিন সকালে এসে দেখে শমিতা বাপের বাড়ি চলে গেছে।

এ ধরনের বহু ঘটনায় অনিল ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কোনো কোনোদিন ভীষণ দাম্পত্য কলহের পর হয়তো দুজনের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে। কেন জানিনা অনেকদিন শমিতার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে,—ওর দেহটা আছে ঠিক, কিন্তু মনটা বোধহয় কবেই মরে গেছে। শত চেষ্টা করেও তাকে আর বাঁচানো যাবে না। যে-দেহে মন নেই, অকারণে তাকে জীইয়ে রাখা অর্থহীন। এই সত্যটুকু বোধহয় শমিতাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এবং এর ফলেই ওর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে।

অনিল জানে শমিতার মৃত্যু সহজ মৃত্যু নয়। যদিও ডাক্তারী পরীক্ষায় রক্তে সাপের বিষ পাওয়া গেছে কিন্তু আসলে সাপে কাটাটা একটা বাইরের ঘটনামাত্র। জীবন সম্পর্কে ওর নিজের ধারণা নিজের কাছে খুব স্পষ্ট ছিল। ফলে, মৃত্যু সম্পর্কেও কোনো বিকার, দুশ্চিন্তা কিংবা উদ্বেগ জন্মাতে পারে নি। এবং সেই কারণেই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে,—দিনের শেষে সন্ধ্যা নামার মতো,—ও মৃত্যুর অন্ধকারে মিশে যেতে পেরেছে।—'কিন্তু আশ্চর্য, কাউকে এ কথা বোঝাতে পারব না। মানুষ বাইরেটাই দেখে, ভিতরটা আর বুঝতে চায় না।'—অনিল ভাবছিল; শমিতাও আমাকে ঠিক বুঝতে পারে নি। আর বুঝতে না পারার দুঃখেই ও ক্রমশ শীতল হয়ে গেছে।

শ্মশানে ইতস্তত কয়েকটা চিতায় দাউদাউ আগুন জ্বলছে। এলোমেলো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা আগুনের শিখায় আশেপাশে দাঁড়ানো আবছা মানুষগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম গুহামানবের মতো মনে হয়। মাঝগঙ্গায় ভাসমান কোনো নৌকোয় আলো দুলছে। একটু কান পাতলেই গঙ্গার একটানা ছলাৎ শব্দ কানে আসে। দূরে—অনেক দূরে কে যেন একটানা বাঁশী বাজাচ্ছে। ক্ষীণ সুরটা ক্ষীণতর হতে হতে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ক্রমশ থিতিয়ে পড়ছে। অনিল অন্যমনস্কভাবে ও-পাশের একটা প্রায়-নিভন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রবি এতক্ষণ একতলা ঘরটার এক কোণে চুপচাপ বসেছিল। ও-দিকটায় কয়েকজন গোল হয়ে বসে কীর্তন গাইছে। বুড়ো মতন একজন, হাত-পা নেড়ে, খোল বাজিয়ে দন্তহীন মুখে কী যে গেয়ে গেল, রবি কিছুই বুঝতে পারল না। বাঁ পাশে দেওয়াল ঘেঁষে একজন খুব কালো আর মোটা দাঁড়িগোঁফওয়ালা জটাধারী লোক অনেকক্ষণ থেকে চোখ বুজে চুপচাপ বসে আছে। আশ্চর্য, লোকটার শরীরে কোনো স্পন্দন নেই! রবি একবার ভাবলো ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কিনা। কিন্তু যদি হঠাৎ চোখ মেলে তাকায়! বুকের ভিতরটা চনমনিয়ে উঠলো। কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল গায়ে মাথায় ঢেলে দিয়েছে,—এমন একটা শিরশিরিয়ে ওঠা ঠাণ্ডা অনুভূতি পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। ঘরের ভিতরের আবছা অন্ধকারে মুখগুলো প্রায় অস্পষ্ট। চুনবালি-খসা দেওয়ালে হাত-পা-মুখ প্রভৃতির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, কাঁপছে, আবাব অদৃশ্য হচ্ছে। একটা কেমন অচেনা ভয় বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠলো। ঘরের কোণ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রবি। কেন জানি না মনে হচ্ছে, একটা লম্বা লোমশ হাত যে-কোনো মুহূর্তেই কোণের অন্ধকারে গলা টিপে ধরতে পারে। চিন্তাটা মনে ভাসতেই প্রায় ছিটকে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

বাবা সামনেই রকে বসে আছেন, দেখতে পেল রবি। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বিজনকাকা কাকে যেন কী বোঝাচ্ছেন। জলন্ত চিতার দিকে চোখ রাখল রবি। পোড়া কাঠের গন্ধ। হঠাৎ ফট করে একটা খুলি ফাটার শব্দ হলো। গা ছমছম করছে। গঙ্গার দিক থেকে একটা কুকুরের তীব্র চিৎকার শোনা গেল। শ্মশানের ঘেরা জায়গার বাইরে, ঠিক গঙ্গার ধারে বটের ঝুরি নেমে গেছে। ঝুপসি অন্ধকারে এক-একটা বিরাট বট কিংবা আমগাছের বিস্তারিত শাখা-প্রশাখার দিকে চোখ পড়লে গা ছমছম করে। দু-হাঁটু মুড়ে, মুখ গোঁজ করে রবি বসে থাকল। আর ঠিক ও-ভাবে বসে থাকতেই উল্টো দিকের দেওয়ালে লেখা কয়েকটা লাইন চোখে পড়লো। লাল,- কালো, শাদা প্রভৃতি রঙের মোটা-সরু অক্ষরে বিভিন্ন নাম লেখা। ভ্রূ কুঁচকে চোখের দৃষ্টি আরও স্পষ্ট ক.লো রবি। আবছা অক্ষরগুলি এখান থেকে ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

……৺বাসন্তীরানী দাসী। জন্ম ১৩২৯ সন, ১৮৪৪ শকাব্দ। মৃত্যু ১৩৬৯

সন, ২৩শে আষাঢ়। আদি নিবাস নিমতা। ২৪ পরগণা।······'ঈশ্বর তোমার আত্মার মঙ্গল করুন।'—এই লেখাটার নিচে কোনো নাম ঠিকানা নেই। আর-এক জায়গায় লেখা আছে,—'আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান সুভাষ। জন্ম: ১৩৪৩ সন। মৃত্যু: ১৯৬০ সন। ২৫শে জুলাই। সকাল সাতটা।' নীচে একটা নাম সই করা আছে দেখতে পেল।

রবি কিছুক্ষণ লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো—'আমিও লিখলে কেমন হয়? কেউ কিছু বলবে না তো!' এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো রবি। কেউ লক্ষ করছে না। দেওয়াল থেকে খানিকটা চুন খসিয়ে নিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো-আঙুল চেপে চেপে লিখতে থাকলো।···৺শমিতা দত্ত। জন্ম? তারিখটা ঠিক জানা নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করবো?—বাইরে তাকাল রবি। বাবাকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে, আবার লিখতে শুরু করলো: মৃত্যু,—১৯৬৩ সাল, ২১ জানুয়ারি। আদি নিবাস, বাগেরহাট, খুলনা। নিচে আর একটা লাইন লিখল: আমার মা। তারপর নিজের নাম।

আশ্চর্য, এই কথা কয়টা লেখার পর কেমন যেন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করলো রবি। এতক্ষণের গুমোট ভাবটা আর নেই। নিজেকে খুব হাল্কা মনে হচ্ছে। বার বার লেখাটা পড়লো রবি। আঙুলে লেগে-থাকা চুনের দাগ প্যান্টেই মুছলো।—মা থাকলে বলতো, কতদিন প্যান্ট কাচার সময় পকেট থেকে ট্রামের টিকিট, সিগারেটের ছেড়া প্যাকেট, গুলি-পাকানো মাঞ্জা সুতো প্রভৃতি বার করতে করতে ধমক দিয়েছে। হঠাৎ মাকে মনে পড়ায়, বাইরের জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকাল রবি। এলোমেলো আগুনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে। কেঁপে কেঁপে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। কে-একজন বাঁশ দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে দিতেই, কিছু অঙ্গার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো, হাওয়ায় পোড়া-মাংসের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। ঝিম মেরে চুপচাপ চুপচাপ বসে থাকলো রবি। কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো হঠাৎ।—

রবির সেদিন স্কুল ছিলো না। দুপুরবেলা কোনো কাজ না থাকায়, ঘরের মেঝেয় খড়িমাটি, কয়লা প্রভৃতির দাগ কেটে কেটে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকছিল রবি। কিছুক্ষণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানেব বই দেখে দেখে একটা কঙ্কালের ছবি আঁকার চেষ্টা করলো। এমন সময় আচমকা একটা অস্ফুট গোঙানির

শব্দে তাকিয়ে দেখলো, মা ঘুমের মধ্যে খাটে শুয়ে ছটফট করছে। রবি ছুটে গিয়ে কয়েকবার ধাক্কা দিতেই ঘুম ভেঙে গেল। একদৃষ্টে রবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা পড়লো বারকয়েক।

—মা! খুব আস্তে ডাকলো রবি।

—কি রে!

—ও-রকম শব্দ করছিলে কেন? স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?

মা হাসলো রবির কথায়।—'না কিছু না। আচ্ছা, দেখতো রবি, জানলার নিচের কার্নিশে কোনো কিছু দেখতে পাস কিনা।' একটা বালিশ টেনে নিয়ে ঠেস দিয়ে একটু উঠে বসলো।—'শার্সি খোলার দরকার নেই, কাঁচের ভেতর দিয়েই দেখ।'

রবি ছুটে গিয়ে জানালায় দাঁড়াল, স্পষ্ট দেখতে পেল একটা সরু হিলহিলে সাপ, গায়ে লাল-হলুদ ছিটে ছিটে দাগ, শীতের নরম রোদে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। রবি জানলায় দাঁড়াতেই, সাপটা ফনা তুললো। পুঁথির দানার মতো কালো কুচকুচে চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে কার্নিশ বেয়ে নিচে নেমে গেল। একটা কেমন চাপা আতঙ্ক বুকের ভিতর শিরশির কবে উঠলো রবির। গত রবিবারেব কথা মনে পড়লো। উঠোনের পেয়ারা গাছটার নিচে একটা মোটা সাপকে বাবা পিটিয়ে মেরেছিলেন। তারপর বাবার কথা মতো রবি কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে সাপটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য, সেদিন বিকেলেই নিচের রান্নাঘরে আর একটা সাপ দেখে মা রবিকে ডেকেছিল। ছুটে গিয়ে রবি অবশ্য কিছুই দেখতে পায় নি। সাপটা ততক্ষণে গা-ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যের পরে ওপরে উঠে আসার সময়, ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় একটা সাপ দেখতে পেল রবি। চিৎকার করে কাউকে ডাকবার আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সাপটা সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐ কথা বাবাকে বলে নি রবি। কেন জানি না ঐ প্রসঙ্গে কথা বলতেও ওর কেমন ভয়-ভয় করছিল। রাতে শোয়ার পর মাকে সাপের কথা বলেছে রবি।

: আমার কেমন ভয় করছে মা!

: না ভয়ের কী আছে। ওটা বোধহয় ওর জোড়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

: কিন্তু খুঁজে তো পাবে না।—তাহলে! আতঙ্কে জড়সড় হয়ে যায় রবি।

: না, তেমন কিছু ক্ষতি বোধহয় করবে না। আর তা ছাড়া তোর কি? তুই তো আর মারিস নি। পিঠে মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করলো রবি।

: যদি ধর, বাবাকে কামড়ে দেয়! আজ যে-ভাবে শুয়েছিল সিঁড়ির গোড়ায়! কেমন যেন শীত অনুভব করছিল রবি। মনে হচ্ছিল, সাপটা বুঝি ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

—'কী জানি কী করবে!'—নিস্তেজ কণ্ঠে মা উত্তর দিলো। তারপর উল্টো দিকে ফিরে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে চুপচাপ শুয়ে থাকলো। সেদিন সারারাত মা ঘুমোতে পারে নি। বার বার উঠে উঠে জল খেয়েছে। পাখার বাতাস করেছে। আর এক দমবন্ধ-করা অস্বস্তিতে রবি শুধু ছটফট করেছে। সারারাত সাপের চলাফেরার হিস্-হিস্ শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

এরপর থেকে প্রতিদিন রাতেই ঘুম ভাঙলে রবি সাপের চলাফেরার শব্দ শুনতে পায়।

গত পরশু রাতে, যেদিন মা মারা গেলো, সেদিনই বোধহয় শেষবার দেখেছে রবি সাপটাকে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন। শীতকালের বৃষ্টি, ঠাণ্ডায় হাত-পা প্রায় জমে যাচ্ছিল। সন্ধ্যের পর আরও ঘন করে মেঘ জমে, বৃষ্টি নামলো জোরে। রবিদের বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো। জলের ধারা ছাদের ফাটল বেয়ে-বেয়ে পড়ে, ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

বাবা বাড়ি ছিলেন না। কাজে কোথাও গিয়ে থাকবেন হয়তো। কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল রবির। ঘরের একদিক ক্রমাগত ভিজে যেতে থাকায়, মার সাথে রবি জিনিসপত্র টানাটানি করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনছিল। হঠাৎ এক সময়ে, জানলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো। সেই সাপটা জানলার ফাঁক দিয়ে গলে, ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে! আতঙ্কে মাকে আঁকড়ে ধরলো রবি। মা কিন্তু খুব ব্যস্ত হলো না। চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা ভাবান্তর দেখা গেল শুধু।

—'অত ভয় পাচ্ছিস কেন? ও আমাদের কিছু করবে না।' রবির দিকে

তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে মা বললো,—'এই সাপটাকে তো কয়েকদিন ধরেই দেখছি !' মার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদাস আর বিষণ্ণ মনে হলো।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই সাপটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওকে আর দেখতে পেল না রবি। রাতে বাবা বাড়ি ফিরলে, রবি সাপটা সম্পর্কে সবকিছু বললো। এও বলতে ভুললো না যে, মা ওকে বার কয়েক দেখেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মা ঐ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলো না।

বাবা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের মধ্যে প্রতিটি সম্ভাব্য স্থানে সাপটাকে খুঁজলেন। —'তুই ঠিক দেখেছিস তো রে ?'

মাথা নাড়লো রবি।—'মা-ও তো দেখেছে, জিজ্ঞেস কর না।'

—'চিন্তার কথা!' বাবাকে খুব যেন বিচলিত মনে হলো। একটা লণ্ঠন-হাতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বাবা সাপের সন্ধানে বেরুলেন। নিচের উঠোনে খুঁজলেন। রান্নাঘরের পিছনের ছাইয়ের গাদায় দেখলেন। অথচ, সাপটাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

রাতে খাওয়ার পর মা একবার জিজ্ঞেস করেছিল,—'তোর বাবা কোথায় রে রবি ?'

—নিচে আছে। সেই সাপটাকে খুঁজছে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে রবি নিচের দিকে তাকিয়েছিল। বাবার হাতের আলোটা পেয়ারা গাছের চারদিকে ঘুরছিল। অন্ধকারে বাবার শরীরটা দেখা দেখা গেল না।

—'তোর বাবা বোধহয় পাগল হয়ে গেল রবি। তাকে কী ঐভাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে ? একবার কিন্তু হারিয়ে গেলে কী আর তা পাওয়া যায় !' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মা সিঁথির সিঁদুরে আঙুল ঘষছিল। বাবার জন্যে কেমন যেন মায়া হলো রবির। অনেকক্ষণ পরে বাবা যখন ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে ফিরে এলেন, তাঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রবির কান্না পেল।

শোবার আগে আলো নেবাবার সময় মাকে বলতে শুনেছে,—'আচ্ছা, সব ব্যাপারেই এত দুশ্চিন্তা কেন তোমার ? লোকে শুনলেই বা ভাবে কি !'

'—দুশ্চিন্তা করার মতো ব্যাপার হলেই ভাবতে হয় এত বেশি। তুমি তা বুঝবে না। কোনোদিন বোঝার চেষ্টাও কর নি। বুঝতে যদি, তাহলে আব আজকে এই অবস্থা হতো না !' বাবার অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে কয়েকটা ভাঁজ লক্ষ করলো রবি।

হঠাৎ ঐ ধরনের প্রসঙ্গ এসে পড়ায়, দুজনেই চুপ করে গেল। ভীষণ

অস্বস্তি বোধ করছিল রবি। সাধারণ,—অতি-সাধারণ বিষয় নিয়েও রবি লক্ষ করেছে, বাবা-মার ভিতর কেমন যেন এক ধরনের তির্যক কথাবার্তার বিনিময় হয়। রবি কতদিন ভেবেছে, হয়তো ওঁরা কেউ কাউকে পছন্দ করেন না। কিংবা এমনও হতে পারে, একজন অন্যজনকে সহ্য করতে পাবে না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর, রবি মার মৃতদেহ দেখেছে। বোধহয় মধ্যরাতের পর বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকায়, ঝলমলে রোদ উঠলো। দেওয়ালে গত রাতের বৃষ্টির জলের দাগ দেখতে পেয়েছে রবি। বাবা কাঁদতে নিষেধ করলেন। তাঁর মুখে দুঃখের কোনো চিহ্ন ছিল না।

এখন, এই শ্মশানের আলো-অন্ধকারে কিছু দূরে বসে-থাকা বাবার মুখটা আর একবার স্পষ্ট করে দেখতে ইচ্ছে করছিল। গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। দেওয়াল-ঘেরা শ্মশানের জমিটুকুর ও-পাশে নিকষ-কালো অন্ধকার, মাঝ-গঙ্গায় একটা লঞ্চের সিটি বারকয়েক কেঁপে কেঁপে উঠলো। হাওয়ায় পোড়া কাঠকয়লার গন্ধ।

রবি ভাবছিল: কে জানে, হয়তো আর কোনোদিন সাপটাকে দেখতে পাব না!

আগামী সংখ্যায়
চারুলতা প্রসঙ্গে
শ্রীসত্যজিৎ রায়-এর
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

অশোক রুদ্র

মানবিকবাদ প্রসঙ্গে

গত পৌষ সংখ্যা পরিচয়-এ প্রকাশিত আদাম শাফের পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের উপকারার্থে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবিকবাদের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ জানাই। পূজা-সংখ্যা পরিচয়-এ তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করেছেন, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ইতিপূর্বে পরিচয়-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য এবং শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীনিশীথ কর আমাকে উদ্দেশ করে কিছু কিছু মন্তব্য ও প্রশ্ন পেশ করেছেন। বিষয়টা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে আরও খানিকটা চলতে দিলে বোধহয় কোনো ক্ষতি নেই, বরং সকলেরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব আমিও কিছু পাল্টা বক্তব্য উপস্থিত করছি।

তাত্ত্বিক আলোচনায় তত্ত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই ভালো। প্রতিপক্ষের যুক্তির খণ্ডন এবং নতুন যুক্তি প্রদান, আলোচনা এতেই সীমিত হওয়া উচিত। আলোচনাকারী ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য করাতে কিছু পীড়ার উদ্ভব হতে পারে কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা তাতে ক্ষতিগ্রস্তই হয়।

শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য আমাব লেখার মধ্যে "আত্মতুষ্ট ন্যায়পরায়ণতা"র প্রচ্ছন্ন মনোভাব আবিষ্কার করেছেন। কেননা তিনি মনে করেছেন আমি humanism ও humanitarianism-এর তুলনা করে দ্বিতীয়ের অবমাননা করেছি। কিন্তু আমি শুধু বলেছি humanism "মানবপ্রেম বা জীবে দয়া জাতীয় কিছু নয়, humanitarianism-এর থেকে···একেবারেই পৃথক।" একথা বলার মধ্যে মানবপ্রেমের সঙ্গে যারা মানবিকবাদকে ঘুলিয়ে দেখেন তাদের ঘোলাটে দৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু মানবপ্রেমের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা নিশ্চয়ই পায় না। "টাকও ভালো, টিকিও ভালো" কিন্তু তাইবলে টাক আর টিকি এক নয়। এবং টাক ও টিকি একেবারেই পৃথক একথা বলার মধ্যে টাক বা টিকি সম্বন্ধে অনুরাগ-বিরাগ কিছুই প্রকাশ

পায় না। সম্পত্তির মালিকানার রাষ্ট্রীয়করণ আর সমাজতন্ত্র এক নয় বলতে নিশ্চয়ই সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থন প্রকাশ পায় না। এই সামান্য কথাটুকু মনে রাখলে এবং আমার ধারণা সম্বন্ধে তাঁর অনুমানকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে সেই অনুমিত ধারণাবলীকে নিদারুণ রকম ভুল প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র না হলে সিতাংশুবাবু তাঁর অনেকগুলি সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিকে নিজেই অবান্তর বিবেচনা করতেন এবং আমিও তাঁর অপ্রিয় বাক্যবাণের হাত থেকে রেহাই পেতাম। বাঙালির জীবনসাধনায় চৈতন্য-প্রভাব আমি অস্বীকার করি নি। তথাপি সিতাংশুবাবু এই ধারণা আমাতে কল্পনা করে নিয়ে আমাকে "চপলতার মনোহারিত্বে" চিহ্নিত করেছেন। Humanism-কে আমি "ঈশ্বরতত্ত্ববিরোধী আন্দোলনের নামান্তর" মনে করি নি। "চিত্তবৃত্তির সুনির্ভরতার মাপকাঠিতে সমগ্র প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র" "তাসের ঘরের মতো অলিক প্রতিপন্ন হবে" একথাও কোথাও বলি নি।

শ্রীনিশীথ কর আগে একবার "পুরাতন উদ্ধৃতির প্রতি সুবিরাট আকর্ষণ" যা মার্কসবাদ আলোচনাকে আজ অবধি প্রায়শই বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে তার নিন্দে করেন, কিন্তু পরে তিনিই লেনিনেব একটি পুরাতন উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, আমার "ধর্ম সম্বন্ধে মনোভাব তাই যেন লেনিন-উক্ত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটদের মতো মনে হয়েছে"। "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাট" এই মন্ত্রপূত শব্দ উচ্চারণের পর আর কোনো যুক্তিতর্কের প্রয়োজন অবশ্যই থাকে না। এবার আমার নিজস্ব এবং আমার উপর আরোপিত ধারণাবলীকে নেড়া করিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চাপিয়ে গ্রাম থেকে বিদেয় করে দেওয়া যায়। কিন্তু ধর্মের কোনো বিশ্লেষণই আমি করি নি, "শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টি" বাদ দিয়ে সেই বিশ্লেষণ করেছি এই পরিচয় নিশীথবাবু আমার সম্বন্ধে কোথায় পেলেন? তিনি প্রশ্ন করেছেন, "মার্কসবাদ কি মানবপ্রীতি, মানব-মমতা প্রভৃতি গুণের সমার্থক?" এর যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি: নিশ্চয়ই শোষিত পীড়িত মানবের প্রতি মমত্ববোধই মানবিকবাদের সমার্থক।

সমস্যাটা অবশ্যই সংজ্ঞার। এবং যদিও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংজ্ঞার ব্যাপারে শুদ্ধতার দাবিকে "কাঙালির ন্যায়ের উত্থাপন" বলে বিদ্রূপ করেছেন তবু বলব, সংজ্ঞার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে কোনো যুক্তিসিদ্ধ তর্কই সম্ভব নয়। এই শিথিলতা যে কি ধরনের অস্পষ্টতার সৃষ্টি করতে পারে

তার উদাহরণ হিসেবে শ্রীনিশীথ করের লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই। তিনি একজায়গায় লেখেন, "পূর্বে নির্বিশেষে পীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ মানবিকতা বলে অভিহিত হয়েছে" অন্যত্র লেখেন "যে মানবতা বুদ্ধ, টলস্টয়, রঁলা, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দকে উদ্বেলিত করেছিল—সেই মানবতাবোধই কার্ল মার্কসকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল।" অতঃপর তিনি আমাকে আশ্বাস দেন এই বলে যে ভালো করে বুঝে ও পড়ে দেখলে "ভারতীয় ইতিহাসও বোধহয় আর মানবতাবর্জিত মরুভূমি বলে মনে হবে না।" একেবারেই আশ্বস্ত হতে পারলাম না। কারণ নিশীথবাবু ঠিক কিসের কথা বলছেন তাই বুঝতে পারলাম না। তিনি কি humanity বোঝাচ্ছেন, humanitarianism বোঝাচ্ছেন, না humanism বোঝাচ্ছেন? ভারতীয় ঐতিহ্য প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত ধনী, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ভাবধারার সঙ্গে humanism বলতে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে বিশ্ববীক্ষা বোঝান হয় তার সম্পর্ক ক্ষীণ বলেই মনে করি।

সংজ্ঞার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হওয়া বলতে অবশ্য আমি এই বুঝি না যে তাকে একধারা স্রোতস্বিনী হতে হবে। Humanism-এর বৈশিষ্ট্য এক নয়, বহু, এ জ্ঞানটুকু আমার আছে। শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য যেহেতু Edward Cheyney-কে প্রামাণিক হিসেবে মেনেছেন সেহেতু তাঁরই লেখা থেকে আরও খানিকটা উদ্ধৃতি দিলে নিশ্চয়ই তিনি আপত্তি করবেন না। Humanism has meant many things বলে তিনি লিখছেন, "It may be the reasonable balance of life that the early Humanists discovered in the Greeks; it may be merely the study of the humanities or polite letters; it may be the freedom from religiosity and the vivid interest in all sides of life of a Queen Elizabeth or a Benjamin Franklin; it may be the responsiveness to all human passions of a Shakespeare or a Goethe; or it may be a philosophy of which man is the centre and sanction. It is in the last sense, elusive as it is, that Humanism has had perhaps its greatest significance since the 16th century." পাঠককে লক্ষ করে দেখতে অনুরোধ করি, Cheyney সাহেব humanism-এর যে অর্থকে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন একমাত্র তাই একটি পূর্ণাঙ্গ-

দর্শন বা বিশ্ববীক্ষার মর্যাদা দান করতে পারে। গ্রীকদের জীবনাদর্শের অনুকরণে মাতামাতি বা নঞর্থক ভাবে ধর্ম বা ঈশ্বরবিরোধিতা বা শুধুমাত্র জীবনে আসক্তি এসব মনোভাবে কোনোটাই একক বা সমষ্টিগত ভাবে একটা বিশ্ববীক্ষার মার্যাদা পেতে পারে না। A philosophy of which man is the centre and sanction এই সংজ্ঞায় মানবিকবাদকে গ্রহণ করে আমি বলেছি তা humanitarianism থেকে একেবারেই পৃথক, কোনো ধর্মীয় মতবাদ ও মার্কসবাদ সহাবস্থান করতেই পারে না, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই মানবিকবাদের কোনো মৌলিক সম্পর্ক নেই। এই বিশেষ ও কেন্দ্রীয় অর্থে মানবিকবাদকে গ্রহণ করার পরও আমার বক্তব্য সম্বন্ধে আপত্তি অনেক তোলা যেতে পারে, কিন্তু অনেকগুলি আপত্তি যা তোলা হয়েছে তা যে ভুল বুঝে তোলা হয়েছে তা মানতে হয়। কিন্তু শুধু তাই না। আমি বিশেষ ও কেন্দ্রীয় অর্থে যে শব্দ ব্যবহার করেছি তাকে যে তার বিস্তৃততর অর্থে বোঝা হয়েছে শুধু তাই না। শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মানবিকবাদকে যতটা প্রশস্ত আকারে দেখেন তার স্বপক্ষে আভিধানিক বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য কতটা দেখান যায় জানি না। সিতাংশুবাবুর মতে মধ্যযুগের অন্তে ইউরোপে (প্রথমে ইতালিতে) সংস্কৃতি ও চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে যে যুগান্তরকারী পরিবর্তনের জোয়ার আসেই তাই 'Humanism' আন্দোলন নামে ইতিহাসে খ্যাত। ঐ জোয়ারের নাম রনেসঁস্ বলেই আমার ধারণা ছিল—Humanism-এর আন্দোলন রনেসঁস্-এর অচ্ছেদ্য অঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু রনেসঁসের সব কিছুকেই কি Humanism বলে মানা যায়? রিফর্মিস্ট আন্দোলনও রনেসঁস্-এর আর এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু মানবিকবাদের বিস্তৃততম সংজ্ঞাতেও রিফর্মেশন-কে অঙ্গীভূত করা যায় বলে মনে হয় না।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদিও মানবিকবাদের বিস্তৃততর সংজ্ঞায় বিধৃত নানান লক্ষণের সঠিক উল্লেখ করেন তথাপি তাঁর প্রবন্ধটি আগাগোড়া পাঠ করলে মনে হয় তিনি মানবিকবাদকেও প্রায় সভ্যতারই সমার্থক বলে মনে করেন। তা নয়তো মৌর্যযুগের পাটালিপুত্র শহর রোমনগরীর চতুর্গুণ ছিল এবং সেখানে জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা হত। এই উল্লেখের প্রয়োজন বিবেচনা কেন করেন? আরও একবার কেন লোহার বিরাট থাম গড়া আর সমুদ্রযাত্রী জাহাজ নির্মাণে ভারতীয় কারিগরদের পারদর্শিতার কথা উল্লেখ

করেন। ভারতবর্ষও যে উচ্চসভ্যতার উত্তরাধিকারী এই সত্য আবিষ্কার করার প্রয়োজন হয়তো শ্রীনেহরুর জেনারেশনের ছিল, তাঁদেরকে তাই Discovery of India-র মতো অভিযানে পাড়ি জমাতে হয়েছিল। তাঁদের প্রচেষ্টার প্রসাদেই আমাদের জেনারেশনের সেই প্রয়োজন আর একেবারেই নেই। অজন্তা ইলোরার শিল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মেগেস্থেনিসের ভারত-বিবরণ প্রভৃতির উল্লেখ করে আমাদের মধ্যে জাতীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগানোর কোনো আবশ্যকতাই আর নেই। যে জাতীয় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কঠিন বিচারে জাতীয় আত্মসমালোচনায় রত হওয়া যায় সেই পরিমাণ আত্মবিশ্বাস অর্জিত হয়েছে বলেই ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারে অভিমানী বোধ করেও দুনিয়ায় যেখানে যা যখন সম্ভব হয়েছে তা ভারতবর্ষে হয়েছে এমনতর আজব দাবি জানিয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার প্রয়োজন বোধ আমাদের জেনারেশন করে না। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের সূত্রপাত করেন তাঁর এক বন্ধুর উক্তি দিয়ে "আমাদের সত্তার শিকড় যে মাটিতে ছুঁয়ে আছে সেটা ইউরোপ নয়, কখনও হতে পারে না।" সূত্রপাতের ঢংটা অত্যন্ত করুণ ঠেকে আমাদের কানে। আমাদের সত্তার শিকড় যে ইউরোপের মাটিতে প্রোথিত হতে পারে এমন একটা সাংঘাতিক রকমের হাস্যকর ধারণা হীরেনবাবুদের জেনারেশনের অনেকেরই ছিল সন্দেহ নেই। সে ছিল বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার আর আই. সি. এস.-দের সামাজিক নেতৃত্বের দিন, তখনকার দিনে অনেক ইঙ্গবঙ্গ পিতামাতা ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভুল ইংরেজিতে কথাবার্তা বলাটা শ্রেয় গণনা করতেন। এ-জাতীয় সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য ভারতবর্ষের অন্য কোনো কোনো প্রদেশে হয়তো এখনও আছে কিন্তু বাঙালি শিক্ষিত মহলে বোধহয় ধারণাটা একেবারেই সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। এখন বরং বলার দিন এসেছে, আমাদের সত্তার শিকড় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মাটিতে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এ মাটিতে অতীতে সব ফসল ফলেছে বা এ-মাটি বর্তমানে সব ফসল ফলার উপযুক্ত। এক-এক জাতীয় মাটিতে এক-এক জাতীয় ফসল ভালো ফলে, পাটের জমিতে চায়ের চাষ ভালো হয় না। আমাদের দেশে ধান বা গমের একর প্রতি উৎপাদন যা অন্য অনেক দেশের তুলনায় তা চার-পাঁচ ভাগ কম, এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয় না। তার কারণ, এমন অনেক জিনিস এদেশের মাটিতে ফলে যা অন্য দেশের মাটিতে

ভালো ফলে না। দ্বিতীয়ত, আজ যে শস্যের উৎপাদনের হার অত্যন্ত নিচুতে তাও অনেক ক্ষেত্রে দু-এক শতাব্দী আগে পর্যন্ত যথেষ্ট উঁচুতেই ছিল। তৃতীয়ত, যে শস্যের উৎপাদন আগে কখনই এদেশের মাটিতে হয় নি, আজও হয় না, তারও উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে ঘটান যেতে পারে আবাদের বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করে, এই বিশ্বাস আছে বলে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবিকবাদের মৌলিক সম্পর্ক নেই একথা বলতে আমার স্বদেশাভিমানে এইজন্য বাধে না যে মানবিকবাদ ও সভ্যতাকে আমি সমার্থক মনে করি না। মানবিকবাদী ভাবধারার ধারক না হয়েও এমন কি তার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট না হয়েও অনেক সমাজ সভ্যতার তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেছে। ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যেও এমন অনেক বিভূতিই আছে যা সভ্যতার উচ্চতম মার্গের লক্ষণস্বরূপ। কিন্তু তাই বলে তাদের সঙ্গে মানবিকবাদের কোনো মৌলিক সম্পর্ক আছে একথা নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না। মানবিকবাদকে আমরা আধুনিক কালের উপযোগী একমাত্র বিশ্ববীক্ষা বলে মানতে পারি (এখানে ভুলে না যাই মার্কসবাদ মানবিকবাদেরই বিজ্ঞান ও ইতিহাস-সম্মত এক ভাষ্যবিশেষ।) কিন্তু অতীতের অন্য কোনো যুগেও এই আধুনিক বিশ্ববীক্ষার প্রভাব দেখা না দিয়ে থাকলেই কি সেই যুগকে সভ্যতাহীন বলে বাতিল করে দিতে হবে? হবে না বলেই শ্রীনিশীথ করের আশ্বাস আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় ইতিহাসকে মানবিকবাদবর্জিত বলে মনে করেছি বটে, কিন্তু সেই কারণে তাকে মরুভূমি বলে কখনও মনে হয় নি। মানবিকবাদই ইতিহাসের সব যুগের উপযোগী চিত্তবৃত্তির একমাত্র উন্মেষক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে যেহেতু মনে করি না সেহেতু বুদ্ধের বাণীর মধ্যে "চিত্তবৃত্তির পরিমুক্তির যে উপলব্ধি ছিল" তাকে অস্বীকার করি না, কিন্তু সিতাংশুবাবুর মতো বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের মধ্যে মানবপ্রাধান্যের অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে পারি না।

পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই যে আমি man is the centre and sanction যে দর্শনের সেই মানবিকবাদের কথা বলছি এবং এই দর্শনের সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই বলি নি, বলেছি কোনো মৌলিক সম্পর্ক নেই। মৌলিক সম্পর্ক আছে তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি বা সাক্ষ্য শ্রীনিশীথ কর, শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য বা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কেউই দেন নি। আমি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, man is the centre and

sanction যার মূলমন্ত্র সেরকম কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় ঐতিহ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার কোনোদিনও করে নি। আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্র যে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্তির প্রবক্তা, নির্বাণই যে এই শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য এই সাধারণ সত্যগুলিকে হীরেনবাবু স্বীকার করে নেন দেখে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু মুশকিলে পড়ি যখন তিনি বলে বসেন, ভারতবর্ষে "অনাসক্তি বন্দিত হলেও কখনও জগৎ ও জীবন অবজ্ঞাত হয় নি।" এবং "সংসারবিমুখিতা বাস্তবিকই কখনও ভারতবর্ষের জীবনকে চিহ্নিত করে নি।" এ যুক্তিও না, তত্ত্বও না, তথ্যও না, নিছক মত, এবং কোনো যুক্তি তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে যখন এজাতীয় মতের খণ্ডন সম্ভব নয় এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সকাশে নিজের জ্ঞানের সংকীর্ণ পরিধির জন্য যখন স্বতঃই লজ্জা পেতে হয় তখন তাঁর এহেন মতে সম্মুখীন হয়ে চোখ নিচু করে মাথা চুলকানো ছাড়া আর কিছু করার কথা ভেবে পাই না। আরও মুশকিলে পড়তে হয় তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু কিছু অংশ লক্ষ করে যা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতিহীন। যেমন তিনি মানবিকতার ধারক হিসেবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধী উভয়কেই স্মরণ করেছেন, কিন্তু অন্যত্র ভারতীয় ভাবধারায় জীবনের স্বীকৃতির উদাহরণ হিসেবে আমাদের শিল্পে "নারীদেহ নিয়ে ব্রীড়াহীন আনন্দের" বিচ্ছুরণের উল্লেখও করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধী এঁরা কী নারীদেহ নিয়ে ব্রীড়াহীন আনন্দের সমর্থন করেছেন, নাকি যৌনতাকে তাঁদের জীবনাদর্শের পরিপন্থী হিসেবে মনে করেছেন ও প্রচার করেছেন? রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধী, বাৎসায়ন ও কৌটিল্য, উভয় পক্ষকেই মানবিকবাদের প্রতিভূ হিসেবে উপস্থিত করা হয় দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু অসঙ্গতিটা মানবিকবাদের প্রতিভূ হিসেবে এদের কল্পনাতেই বিধৃত। ভারতীয় ভাবধারার প্রতিভূ হিসেবে এরা পরস্পরের মধ্যে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ ভারতীয় শিল্পে যৌনতার যে অদ্ভুত প্রকাশকে সুস্থ মানবিকতার লক্ষন বলে হীরেনবাবু মনে করেছেন তা আমার কাছে মনে হয়েছে ভারতীয় ভাবধারায় যৌনতা সম্বন্ধে যে অসুস্থ অমানবিক মনোভাবকে গান্ধী ও রামকৃষ্ণ প্রকাশ করে গেছেন তারই প্রতিক্রিয়াগত প্রতিফলন। ভারতীয় কামশিল্পের থীম্ যদি নারীদেহ নিয়ে ব্রীড়াহীন আনন্দ হত তো তাকে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা হিসেবে, আত্মা ও পরমাত্মার মিলন

হিসেবে দেখানোর জন্য এত দুরূহ কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হত না। আধুনিক যুগে হিন্দুয়ানীর প্রচারকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কামশিল্পের নানাপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। মন্দির-গাত্রে মিথুন ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে কতপ্রকার পতনের প্রলোভন এড়িয়ে মুক্তিলাভ করতে হয় তার ইঙ্গিত প্রদানই নাকি এই বিষয় নির্বাচনের মূল লক্ষ্য। (পাঠককে নজর করতে অনুরোধ করি, আমার মন্তব্য শিল্পের বিষয়েই সীমিত, শিল্পোৎকর্ষের কোনো মর্যাদাহানি ঘটাচ্ছি না।)

মৌলিক সম্পর্ক নেই বলাতে অবশ্য কোনো সম্পর্কই নেই তা বোঝানো হয় না। এক "ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও কর্মধারায় যে গুণকে মানবিকতা আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয় তারই সমুজ্জ্বল অস্তিত্বের" ইঙ্গিত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যা দেন তার অনেকগুলি সম্বন্ধেই কোনো বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই, বিশেষত যখন তিনি নিজেই স্বীকার করেন "অবশ্য এতে মানবিকতা আমাদের চিন্তা ও কর্মধারায় উপস্থিত ছিল বলা আতিশয্য হবে।" কিন্তু হীরেনবাবুর মানবিকতা সম্বন্ধে যে ধারণা তার সঙ্গে আমার ধারণায় এখনও দুস্তর ব্যবধান থেকে গেল। গান্ধী রামকৃষ্ণ ও কবীর যে মানবিকবাদের প্রতিভূস্বরূপ, মুণ্ডোকোপনিষদের সত্যমেব জয়তের বাণী যে মানবিকবাদের অন্যতম মন্ত্র সে মানবিকবাদ অবশ্যই মানুষকে তার centre and sanction হিসেবে মানে না এবং মার্কসবাদ,—alienation মুক্ত মানুষের সমাজসৃষ্টি যার অন্তিম লক্ষ্য,—তার সঙ্গেও এই মানবিকবাদ কখনই সহাবস্থান করতে পারে না।

জাঁ-পল সার্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

এক দীর্ঘ, তিক্ত, মিষ্টি পাগলামি

[জাঁ-পল সার্ত্রের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড অনেক পাঠকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। বইটি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যেও তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়েছে। 'ল্য মঁদ' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সার্ত্রে বিতর্কের কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'এনকাউণ্টার' পত্রিকার গত জুন সংখ্যায় এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকে এই বাংলা অনুবাদ। অর্থাৎ অনুবাদের অনুবাদ! তবু সার্ত্রের বক্তব্য কিছু কিছু বোঝা যাবে নিশ্চয়ই। এই ভরসায় লেখাটি প্রকাশিত হল।]

সার্ত্রে। হ্যাঁ, 'লে মোৎ'-এ ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে অনেক গণ্ডগোল আছে। আগের ঘটনা পরে চলে এসেছে। এই তারিখবিভ্রাটের উপর জোর দিয়ে সমালোচকেরা ঠিক কাজই করেছেন। তারিখ সম্বন্ধে ভুল হওয়ার কারণটা এই-যে বইটার বেশির ভাগই লেখা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তার দশ বছর পরে প্রকাশ করার আগের কয়েক মাসে বইটাতে আবার হাত দিই ও রদবদল করি। তখন তারিখগুলোর সঙ্গতিসাধন করি নি।

—যখন আপনি বলেন, "দশ বছর ধরে আমি রয়ে গেছি এমন একজন মানুষ যে এক দীর্ঘ, তিক্ত, মিষ্টি পাগলামির ঘোর থেকে জেগে উঠেছে", তখন কি এটাই বুঝতে হবে যে ১৯৫৪ সাল থেকেই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে?

সার্ত্রে। হ্যাঁ। সে সময়ে রাজনীতিক ঘটনাবলীর ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়েই আমার মনটা আচ্ছন্ন ছিল। কাজের আবহাওয়ায় ছিটকে পড়তেই হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার আগেকার সমস্ত রচনা কি ধরনের মনোবিকারের বশীভূত ছিল। আগে তা বুঝতে পারি নি: ওটার ভেতরেই যে নিমগ্ন ছিলাম। কারণগুলো কি তা আমার পূর্বেই সিমোন দ্য বোভোয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেকটি মনোবিকারের বিশেষত্বই এই-যে তা নিজেকে স্বাভাবিক বলে জাহির করে। আমি খুব শান্তভাবে বিবেচনা করে ঠিক করেছিলাম যে লেখার জন্যই আমি জন্মেছি।

আমার অস্তিত্বটা যে বৃথা নয় তা প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। সাহিত্যকে করে তুলেছিলাম একটা পরমার্থ। ত্রিশ বছর লেগে গেল এই মনোভাব থেকে মুক্ত হতে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্রবের ফলে যখন উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত লাভ করলাম তখন স্থির করলাম আত্মজীবনী লিখব। দেখাতে চাইলাম, কি করে একজন মানুষ পীঠস্থান বলে বিবেচিত সাহিত্যজগৎ থেকে কাজের জগতে প্রবেশ করতে পারে, যদিও অবশ্য কাজটা বুদ্ধিজীবীর কাজই রয়ে যায়।

'লে মোৎ'-এ আমি আমার পাগলামির ও মনোবিকারের উৎপত্তিটা ব্যাখ্যা করেছি। যে সব তরুণেরা লেখার স্বপ্ন দেখছেন, আমার বিশ্লেষণটা তাঁদের উপকারে আসতে পারে। লেখক হওয়ার বাসনাটা, যে যাই বলুন, একটু খাপছাড়া মনে হয়। এক ধরনের "ছিটগ্রস্ত" গুণও যে তার নেই এমন নয়। যে ছেলে বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা বা নৌসেনাপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে বাস্তবকেই পছন্দ করে নেয়। লেখক যদি কাল্পনিককে বেছে নেয়, তবে সে দুটোকে গুলিয়ে ফেলে।

—আপনার লেখাটি পড়ে মনে হয়, সাহিত্যকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে আপনার মনে এখন যেন অনুশোচনা আছে।

সার্ত্রে। ব্যাপারটা কি জানেন, ১৯৫৪ সালে আমি অনুশোচনার কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম। অন্য এক জগতে আমি তখন সত্যোদীক্ষিত। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আমার জীবনটা ছিল একটা স্বপ্নদর্শন। (এখন আমার বয়স প্রায় উনষাট)। কিন্তু দেখুন 'লে মোৎ'-এ দুই সুর আছে: নিজেকে অপরাধী ঘোষণা করার প্রতিধ্বনি, আবার ওই কঠিন বিচারকে কিঞ্চিৎ নরম করার চেষ্টা। এই আত্মজীবনীকে তার সব চেয়ে নির্মম রূপে এবং আরো আগে যে প্রকাশ করি নি তার কারণ আমার মনে হয়েছিল এটা অতিরঞ্জিত। একজন হতভাগ্য ব্যক্তি লিখছে বলেই তাকে কাদায় ফেলে ঠাসতে হবে তার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে এটাও বুঝেছিলাম, কাজের জগৎটাও নিষ্কণ্টক নয় এবং মনোবিকারের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ সেখানেও গিয়ে পড়তে পারে। রাজনীতি করলেই আমরা বেঁচে যাই না। আমাদের বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতির একটুও বেশি নয়।

—আমরা বাঁচি কিসে ?

সার্ত্রে। কোনো কিছুতেই নয়। কোথাও মুক্তি নেই। মোক্ষলাভ

বলতেই বোঝায় কৈবল্যকল্পনা। চল্লিশ বছর ধরে পরমার্থবাহিনীর মধ্যে আটকা পড়েছিলাম। পরমার্থচিন্তাই মনোবিকার। কৈবল্যের ভূত কাঁধ থেকে নেমেছে। এখন চারিদিকে পড়ে রয়েছে শুধু অসংখ্য কর্তব্য। সাহিত্য তার অন্যতম। কিন্তু সাহিত্যের কোনো বিশেষাধিকার নেই। "আমার জীবনটাকে নিয়ে কি করবো তা আর আমি জানি না," কথাটা ওই অর্থেই বুঝতে হবে। সমালোচকেরা কথাটার মানেটা বুঝতে ভুল করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, এটা বুঝি সিমোন গু বোভোয়া-র "আমি প্রতারিত হয়েছি," এই ধরনের একটা হতাশার আর্তনাদ। লেখিকা যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি বোঝাতে চান তিনি জীবনের কাছ থেকে একটা কৈবল্য দাবি করেন কিন্তু সেখানে ওটাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। আমাদের উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি এক। আমি তাঁর চেয়ে বেশি নৈরাশ্যগ্রস্ত এই। উপরন্তু আমি বরাবরই আশাবাদী, এমন কি, বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায়…

—প্রথম সার্ত্রীয় জগৎ, 'লা নজী'-র জগৎ, মোটেই গোলাপী রংয়ের ছিল না। আপনি কি পৃথিবীটাকে ওই চক্ষে দেখা বন্ধ করেছেন?

সার্ত্রে: না, বিশ্ব এখনও আমার চোখে ছায়াবৃত। প্রলয়াহত জন্তু আমরা।…কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, বিযুক্তি (alienation), মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, অর্ধাশন, এরা পিছু হটিয়ে দিয়েছে আধ্যাত্মিক অমঙ্গলকে। ওটা তো একটা বিলাস। বুভুক্ষা একটা অশুভ: যুগগত। এক সোভিয়েত নাগরিক, তিনি আবার একজন সরকারী লেখক, একদা আমাকে বলেছিলেন: "যেদিন কমিউনিজম (অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের স্বাচ্ছন্দ্য) রাজত্ব করবে, সেদিনই আরম্ভ হবে মানবের ট্র্যাজেডি: তার সান্তত্ব (finitude)। এর রহস্যোদ্ঘাটনের সময় এখনও আসে নি। আমি বিশ্বাস করি, কামনা করি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দৈবের প্রতিকার সম্ভব। ভাগ্য একটু প্রসন্ন হলে সে যুগ এসে পড়তে পারে। যারা মনে করে পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটলে হালচাল আরো ভাল হবে আমি তাদের পক্ষে।

—সুতরাং একজন বেকেট-এর অভিশপ্ত জগৎ আপনার কাছে বর্জনীয়?

সার্ত্রে। আমি বেকেট-এর প্রশংসা করি কিন্তু আমি ষোল-আনা তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি তো কোনো দিক থেকেই কোনো উন্নতির সন্ধানী নন। আমার আশাহীনতা কোনোদিনই অতিস্ফীত হয়ে ওঠে নি। যখন 'লা নজী' লিখেছিলোম সেদিন থেকেই চেয়েছিলাম একটা নীতিধর্ম সৃষ্টি করতে। ওই

স্বপ্ন এখন আর দেখি না। এই আমার বিবর্তন। আজ মনে করি, 'লে মুরিতুরে ভেরেন্তে' একটা ভয়াবহ পুস্তক: "সর্বত্র ছাড়া কোথাও ঈশ্বরের সন্ধান কোরো না।" যান, কথাটা বলে দেখুন একজন শ্রমিককে, একজন এঞ্জিনিয়ারকে। জিদ অবশ্য আমাকে কথাটা বলতে পারেন: লেখকের নীতিধর্ম মুষ্টিমেয় বিশেষাধিকারভূষিত ব্যক্তির উদ্দেশে কথিত। এইজন্যে কথাটা আজ আর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। প্রথমে আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার সুবিধা পেয়ে সবাইকে মানুষ হতে হবে; তবেই সম্ভব হবে সর্বজনীন নীতিধর্মের সৃষ্টি। যদি আগেই তাদের বলতে শুরু করে দিই, "কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না," তবে রাজনীতিক সক্রিয়তার সম্ভাবনা রইল না। সবার আগে মানুষের মুক্তি চাই।

—এই যা সব বললেন তার ফলে কি আপনি আপনার আগেকার সব লেখাকে নাকচ করে দিচ্ছেন?

সার্ত্রে। মোটেই নয়। এ বিষয়ে আমি 'লে মোৎ'-এ যা লিখেছিলাম তাকে খুব ভুল বোঝা হয়েছে। আমার কোনো বইকেই আমি অস্বীকার করি না। তার মানে এমন নয়-যে বইগুলো আমার কাছে ভালো ঠেকে। 'লা নজী' সম্বন্ধে আমার দুঃখ এই-যে বইটাতে আমার আত্মাহুতি অপূর্ণ ছিল। আমি রইলাম আমার নায়কের ব্যাধির বাইরে, আমার মনোবিকারের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে, লেখার ভিতর দিয়ে আমার মনোবিকার আমাকে দিল সুখানুভূতি। সে সময়ে নিজের সম্বন্ধে যদি আমার আরো বেশি সততা থাকত, তবুও 'লা নজী' লিখতাম। আমার অভাব ছিল বাস্তববোধের। তারপর আমি বদলেছি। ধীরে ধীরে শিখেছি কি করে বাস্তব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। বাচ্চাদের দেখেছি খেতে না পেয়ে মরে যেতে। পাল্লায় একদিকে যদি থাকে মুমূর্ষু শিশু, অন্য পাল্লায় 'লা নজী'-কে ওজন হিসাবে চাপানো চলে না।

—কোন্ লেখা অন্য পাল্লার ওজন হিসাবে কাজ করতে পারে?

সার্ত্রে। ঠিক ওটাই হলো লেখকের সমস্যা। বুভুক্ষিত দুনিয়ায় সাহিত্য কিসের পক্ষে? নীতিধর্মের মতো সাহিত্যকেও সর্বজনীন হতে হবে। অর্থাৎ লেখককে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে, দু'-শ' কোটি উপবাসী মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে হবে যদি তিনি চান সকলের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমে উঠুক, সকলে তাঁর লেখা পড়ুক। তা যদি না হয়, তবে লেখক হয়ে পড়বেন উপরতলার

বিশেষাধিকারপ্রমত্ত এক শ্রেণীর সেবক এবং তাদের মতোই নিজেও একজন শোষক। সমগ্র জনসাধারণকে পেতে হলে লেখকের সামনে দুই উপায় বর্তমান। প্রথম উপায়টি হলো, সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ক্ষণিক বৈরাগ্যসাধন এবং লোকশিক্ষার ব্রতগ্রহণ, সোভিয়েত লেখকেরা যে পথ বেছে নিয়েছেন। ধরুন আফ্রিকার কোনো দেশ যেখানে নেতার অভাব। সেখানকার কোনো লোক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অধ্যাপনার কাজ করতে কি করে নারাজ হতে পারেন, এমন কি যদি তার দাম হিসাবে তাঁর নিজের সাহিত্যিক পেশা বিসর্জন দিতেও হয়? তিনি যদি ইউরোপে বসে উপন্যাস লেখার কাজ বেছে নিতেন তাহলে তাঁর ভাবখানা আমার চোখে দেশদ্রোহের মতো দেখাত। আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ সত্ত্বেও সমগ্র সমাজের সেবা ও সাহিত্যের প্রয়োজন, উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।

দ্বিতীয় উপায়টি আমাদের অবিপ্লবী সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে যখন প্রত্যেকেই লেখা পড়বে সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পথ হলো সব সমস্যাকে চূড়ান্ত ও অবাধ্যতম উপায়ে উপস্থিত করা। আল্যাঁ বাদিউ 'আলমাজেস্ত' গ্রন্থে এটাই করেছেন, ভাষাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন চিত্তশুদ্ধির ও ক্যাথারসিসের অভিলাষে।

—সর্বজনপাঠ্য এক 'আলমাজেস্ত'?

সার্ত্রে। সাবধান। ভাববেন না আমি এমন "জনপ্রিয়" সাহিত্যের সুপারিশ করছি যার লক্ষ্য সবচেয়ে নিচু। লেখককে বোঝার জন্য জনসাধারণকেও চেষ্টা করতে হবে। আত্মসন্তুষ্ট দুর্জ্ঞেয়তাকে বর্জন করলেও লেখকের পক্ষে সব সময়ে তাঁর নতুন ও গোপন চিন্তাকে স্বচ্ছভাবে ও চলতি মডেল অনুযায়ী প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মালার্মের কথাই ধরুন। আমার মতে তিনি ফরাসী কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁকে বুঝতে আমার সময় লেগেছে। তাঁর 'হারমেটিক'-এর তত্ত্বটা ভুল কিন্তু যখন তাঁর শক্ত কিছু বলার থাকে তখনই তাঁকে পড়ে ওঠা শক্ত মনে হয়। তাছাড়া এটাও কারো বিশ্বাস করা উচিত নয়-যে সহজে যা হজম করা যায় সাধারণ পাঠক শুধু তাই পড়তে চায়। তার প্রমাণ পকেট-বই সম্বন্ধে ইদানীন্তন অভিজ্ঞতা। আমাব বইগুলো ক্ষুদ্রতর ফর্মায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আমার পাঠকসাধারণও বদলে গেছে। এখন আমি শ্রমিকদের কাছ থেকে, আপিসের কেরানীদের কাছ থেকে চিঠি পাই…এইগুলোই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

—সংক্ষেপে, লেখক ও জনসাধারণের সংযোগ যতদূর সম্ভব ব্যাপক হোক এটাই আপনি চান যাতে করে সাহিত্য অবশেষে লাভ করে তার যাথার্থ্য এবং এর ফলে জয় উভয় পক্ষেই···

সার্ত্রে। এটা একটা যুদ্ধ যেটাকে লড়তে হবে। যতদিন পর্যন্ত লেখক দু'শ' কোটি বুভুক্ষু মানুষের জন্য লিখতে না পারছেন ততদিন তাঁর বুকের উপর চেপে থাকবে একটা 'ম্যালেজ'-এর অনুভূতি।

—আপনি কি চান, লেখক তাঁর কলমকে নিপীড়িতের সেবায় লাগান ?

সার্ত্রে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো লেখকের কর্তব্য এবং তিনি যদি এটাকে উচিতমতো পালন করেন, তার ফলে তিনি কোনো গুণার্জন করেন না। বীরত্ব একটা কলমের ডগায় জয় করার জিনিস নয়।

আমি লেখকের কাছ থেকে চাই, তিনি যেন বাস্তবকে এবং যেসব মৌল সমস্যা বিদ্যমান সেগুলোকে অবজ্ঞা না করেন। আমি বিস্মিত হই ভেবে-যে পৃথিবীর ক্ষুধা, পারমাণবিক সন্ত্রাস, মানবের বিযুক্তি, এই সবের ছাপ আমাদের সাহিত্যের উপর পড়ে না। আপনি কি মনে করেন, কোনো অনুন্নত দেশে আমি রব-গ্রিএ-র লেখা পড়তে পারি ? তিনি তো নিজেকে পঙ্গু মনে করেন না। আমার মতে তিনি ভাল লেখক কিন্তু তিনি কথা বলেন শুধু সুখী বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে। আমি চাই তিনি উপলব্ধি করুন গিনি নামে একটা দেশও আছে। গিনিতে বাস করে আমি কাফকা পড়তে পারতাম। তাঁর মধ্যে আমি নিজের অস্বস্তিকে পুনরাবিষ্কার করি। 'আলমাজেস্ত'-ও পড়তে পারতাম কেননা তাতে ভাষার ভিতর দিয়ে আমাদের জগৎটাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। দেখুন, সমসাময়িক লেখকের অবলম্বন হবে নিজের অস্বস্তিবোধ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশান্তির কারণকে পরিষ্কার করে দেখানোর চেষ্টা করতে থাকবেন। তিনি এমন একজন বেকেটও হতে পারেন যিনি হতাশার সঙ্গে পূর্ণভাবে চুক্তিবদ্ধ নন। এবং আঙ্গিকটা ক্লাসিক্যাল হোক বা আর কিছু হোক, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এরই হোক বা 'আলমাজেস্ত'-এরই হোক, সবই সন্তোষজনক। কোনো গ্রন্থের একমাত্র মাপকাঠি হলো তার প্রামাণ্য ; তা মনকে আঁকড়ে ধরুক এবং স্থায়ী হোক।

—আপনি কি আত্মজীবনী লেখা চালিয়ে যাবেন ?

সার্ত্রে। নিশ্চয়ই, কিন্তু এখুনি নয়। বর্তমানে আমি ফ্লবেয়ারের একটা জীবনী লেখা শেষ করছি।

—ফ্লবেয়ার কেন ?

সার্ত্রে। কেন না আমি যা তিনি ঠিক তার উলটো। প্রতিপক্ষের যুক্তির আঁচড় গায়ে লাগার দরকার আছে। 'লে মোৎ'-এ লিখেছিলাম, "আমি প্রায়ই নিজের বিরুদ্ধে নিজে মনে মনে তর্ক করেছি।" সে কথাটাও অনেকে বুঝতে পারেননি। সমালোচকেরা এটাকে আত্মনিগ্রহের স্বীকৃতি বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এই রকমেই চিন্তা করা প্রত্যেকের উচিত। নিজের মধ্যে যা কিছু বাইরে থেকে মন্ত্রের মতো এসেছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

—তাহলে: 'ম্যালেজ', বিচার, বিতর্ক, বিদ্রোহ, প্রমাদ, মুক্তি…… আপনার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।

সার্ত্রে। আমি বদলেছি যেমন অপর সকলে বদলায়, একটা অপরিবর্তনের গণ্ডির মধ্যে।

অনুবাদক: অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পুস্তক-পরিচয়

সংগীত : সেকাল ও একাল

মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। লেখক সমবায় সমিতি। পাঁচ টাকা।

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। ছয় টাকা।

রবীন্দ্রসংগীত সাধনা। শ্রীসুবিনয় রায়। গীতবীথি প্রকাশনী। চার টাকা।

ভারতীয় সংগীতের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এ পর্যন্ত রচিত হয় নি। না হওয়ার কারণও অবশ্য আছে। তার মধ্যে, মুদ্রাযন্ত্রপূর্ব অতি প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও, প্রাচীন যুগের সংগীতগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা, ভাষা ও ভাবের দুরধিগম্যতা এবং যথার্থ ভাষ্যের অভাবই প্রধান। মধ্যযুগের সংগীতগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে ততটা না হলেও তদ্রূপ কিছু-কিছু অসুবিধার দিক আছে—বিশেষত ক্রিয়া তত্ত্বের সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্যের দিক থেকে এই যুগের সংগীতগ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ-সবের বিবেচনায় মনে হয় বর্তমান কালে একখানি পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস রচনা বড়ো সহজ কাজ নয়। সুখের বিষয় এ ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হয়েছে।

সংগীতে দুটি দিক : ক্রিয়া (practice) ও তত্ত্ব (theory)। সাহিত্যে ভাষা যেমন মুখ্যত ব্যাকরণ-ভিত্তিক, সংগীতে ক্রিয়াও তেমনি তত্ত্ব-আধারিত। ক্রিয়ার উপস্থাপনায় ও তত্ত্বের সূত্রে সামঞ্জস্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে মূল-বিষয়ের ভিত্তি শ্লথ ও স্খলিত হয়। সংগীতের তত্ত্বনির্ভর গ্রন্থে ক্রিয়াত্মক সংগীতের মৌলিক সূত্রগুলির উপস্থাপনা অল্পবিস্তর থাকেই। তা ছাড়া যে-যুগে যে সংগীতগ্রন্থ রচিত সেই যুগের সংগীত-বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট আভাসও তা থেকে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র-কৃত 'মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা' গ্রন্থটি প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থে রাজ্যেশ্বরবাবু আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', ফকীর উল্লাহের 'রাগদর্পণ' ও মীর্জা খাঁর 'তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌' তিনটি গ্রন্থের মূলানুসারী অনুবাদ সহ আলোচনা করেছেন। তার

মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত গ্রন্থের সংগীত-সম্পর্কিত অংশ এবং 'রাগদর্পণ' গ্রন্থটি সম্পূর্ণত আলোচিত। তিনটি গ্রন্থেই, বিশেষ করে ফকীর উল্লাহ্‌র 'রাগদর্পণ' গ্রন্থে গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের উপাদান ও যুগোপযোগী তুলনামূলক তত্ত্ব-তথ্য-নিষ্ঠ আলোচনার বিষয়বস্তু আছে। তার মধ্যে রাগরাগিণীতে নরনারী-ভাবারোপ, স্বরতত্ত্ব, কণ্ঠতত্ত্ব, গায়কগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সঙ্কীর্ণ রাগাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির বিষয়াবলী সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পক্ষে ভাষার ভিন্নতা অনেকের পক্ষে অন্তরায় হয়ে থাকত। রাজ্যেশ্বরবাবু সে-অন্তরায় অপসারণে সাহায্য করলেন বলে ধন্যবাদার্হ।

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের সূচনাকাল পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতজ্ঞগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা যাবে যে তাঁদের জীবনে সংগীতধারা ও আধ্যাত্মিক ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছিল। নারদ, ব্রহ্মা, ভরত প্রভৃতি সংগীতজ্ঞগণ তো মুনিঋষি পর্যায়েরই। তা ছাড়া, তানসেন, বিলাস খাঁ ও তৎপরবর্তী বংশধরগণের জীবনেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অন্য দিকে, কবীর, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকাগণের জীবনে ভগবৎ-সাধনার সঙ্গে সংগীত ওতপ্রোতভাবে মিলে গিয়েছিল। অবশ্য এই আধ্যাত্মিক সাধনা-ধারার গতি ও পুষ্টি উভয়পক্ষে একরূপ নয়। যে কথা এস্থলে বলা উদ্দেশ্য সেটি হল এই যে তাঁদের জীবনে সংগীত ও সাধনা (ভগবৎ-সাধনা) এবং সাধনা ও সংগীত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল।

কর্মযোগী হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় সুবিদিত। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও অনেকের জানা আছে। কিন্তু তাঁর সংগীতশিক্ষা, সংগীতানুশীলন ও সংগীতকৃতী সম্পর্কে সুসম্বদ্ধভাবে ধারণা করা দুরূহ ছিল। এ দিক থেকে 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু' গ্রন্থ প্রণয়ন করে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় প্রশংসার কাজ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে দিলীপবাবু স্বামীজির সংগীত-জীবন সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন এবং শেষাংশে স্বামীজি-কৃত তথা 'শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ., ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত' 'সঙ্গীত-কল্পতরু' নামক সংগীততত্ত্ব গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংগীতের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।

তার জন্য ভারতীয় সংগীতের মৌলিক সূত্রগুলি তাঁর নিকটে সহজেই ধরা পড়েছিল এবং ভারতীয় সংগীতের বিশিষ্ট গীতধারায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংগীত-সম্পর্কে তাঁর বাণী বৈচিত্র্য ও ওজস্বিতাপূর্ণ ও দিক্‌দর্শনক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁর "গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তাব কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম?…এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সঙ্গীত কোনও কাজের কথা নয়।" ইত্যাদি বাণী আজকের দিনে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত 'সঙ্গীত-কল্পতরু' গ্রন্থখানি সংগীতশৈলী সম্বন্ধে স্বামীজির সচেতনতা ও সংগ্রহে আগ্রহশীলতার পরিচয় দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ ধ্রুবপদ্ধতির গানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গ্রন্থভুক্ত তালের ঠেকা ও পড়নে লক্ষ করা যায় যে পাখোয়াজে বাদনের উপযোগী ধ্রুপদেব তালের গুরুত্বই অধিক। আরো লক্ষ করবার বিষয় 'বিলম্ব এবং দ্রুত' এই দুই প্রকাব লয়। লয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মধ্য লয় উল্লিখিত হয় নি।

ললিতকলার ক্ষেত্রে স্টাইল-রক্ষণ একটি বড়ো কথা। যাঁরা প্রতিভাবান স্রষ্টা তাঁদের সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান থাকে। ভাবের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যার বিপুলতায় রবীন্দ্রসংগীতের এক বিশেষ স্থান। এই বিশাল সংগীতভাণ্ডার সম্পর্কে যত আলাপ-আলোচনা হতে পারে এখন পর্যন্ত তত না হলেও প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তার মধ্যে শ্রীসুবিনয় রায়-কৃত 'রবীন্দ্রসংগীত-সাধনা' গ্রন্থে কিছু অভিনবত্ব আছে। যেহেতু গ্রন্থটি প্রধানত প্রত্যক্ষ গায়ন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত।

সাহিত্যে স্টাইল-রক্ষণ যেমন আবশ্যক, সংগীতে গায়কি-রক্ষণও তেমনি আবশ্যক। ব্যক্তিভেদে কণ্ঠস্বরেব তারতম্য তো হয়ই। বিশেষ বিশেষ সংগীতধারার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কণ্ঠসাধনা ও কণ্ঠপ্রস্তুতির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। যথাযথভাবে কণ্ঠকে প্রস্তুত করে মূল-গাওনের সঙ্গে নিজের মনের ও কণ্ঠের সুরের তার ঠিক-ঠিক মেলাতে পারলে তবেই গায়কির অধিকার অর্জন করা সম্ভব হয়। সুবিনয়বাবুর বই সে-দিক থেকে শিক্ষার্থীগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

গ্রন্থভুক্ত দু-একটি বিষয়ে আরো স্পষ্ট নির্দেশ থাকলে ভালো হত।

রবীন্দ্রসংগীতে শ্রুতির ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার সাধু আলোচনা করেছেন। এই শ্রুতি-প্রসঙ্গ উত্তর ভারতীয় সংগীতের মৌলিক শ্রুতি-তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধিত। সে-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন "একটি সপ্তকের অন্তর্গত শ্রুতির মোট সংখ্যা ২২ থেকে ২৪।" আবার এক সপ্তকে বারো পর্দা (স্বর) নির্দিষ্ট হারমোনিয়াম সম্বন্ধে টীকায় বলেছেন "হারমোনিয়াম সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই।" কিন্তু প্রসঙ্গটি 'বিদ্বেষ'-এর নয়, প্রসঙ্গটি যৌক্তিকতার। কারণ, উত্তর ভারতীয় সংগীতে এক সপ্তকে শ্রুতির সংখ্যা (২২) ও সারণা-প্রক্রিয়া অনুযায়ী শ্রুতির ওজন নির্দিষ্ট এবং যে-সংগীতে এক সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি স্বীকৃত ও ব্যবহৃত সে-সংগীতে বারো পর্দা-নির্দিষ্ট হারমোনিয়ামের ব্যবহার অনুপযোগী।

'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম' প্রসঙ্গ গ্রন্থভুক্ত করে গ্রন্থকার সাধুবাদের কাজ করেছেন। এ দিকে বিশেষ করে শিক্ষার্থীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গটি প্রাণায়াম নামে আমাদের রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টাঙ্গ রাজযোগের মধ্যে আসন ও প্রাণায়াম দুটি অঙ্গ। বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়াম (সহজ) করতে পারলে অধিক ফল পাওয়া যায়।

প্রফুল্লকুমার দাস

কথাসাহিত্যের বিচার

কথা-সাহিত্য॥ নারায়ণ চৌধুরী। কনটেমপোরারী পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। পাঁচ টাকা॥

আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের বয়স এক শতাব্দী। জগতের অন্যান্য বহু সাহিত্যের তুলনায় এ বয়স নিতান্ত কম নয়। চকিতে ফরাসী বা ইংরাজি সাহিত্যের নজীর টেনেও বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না। কারণ সাহিত্যের এই শাখাটির উদ্ভব আধুনিক জীবন ও মননের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। অবশ্য শিকড়ের সন্ধানে বহু দূর অতীত পরিক্রমণ অপ্রতুল নয়। সে-চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি ব্যতীত কোনো ফল নেই। এমন কি, মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের আত্মিক সম্পর্ক অনেকেই (যেমন, টমাস মান) স্বীকার করেছেন— সে শুধু মহাকাব্যের মৌল স্বভাবের কথা মনে রেখে।

যেহেতু উপন্যাস একালের শিল্পবস্তু ও 'জীবন-সমালোচনা', তাই এর পাশে

সমালোচনা গড়ে উঠেছে প্রায় একই কালে। বোধ হয়, অন্য কোনো সাহিত্য-শাখায় সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা এভাবে একই সঙ্গে সৃষ্টি হওয়ার উদাহরণ নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে উভয় ব্যাপারেই সহায় হয়েছে বিজ্ঞান।

উপন্যাস আলোচনায় চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সমালোচকের চিন্তায় বৈজ্ঞানিকতা ও দার্শনিকতার সমবায় ঘটলে তবেই সার্থক উপন্যাস-বিচারের যোগ্যতা। গত শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে এর চমৎকার উদাহরণ দেখি। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ইত্যাদি থেকে বীরেশ্বর পাঁড়ে বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। উপন্যাসের জন্মলগ্নেই পাশাপাশি এসব রচনা ও সমালোচনা সাহিত্যের এই নব্য শাখাটির দ্রুত পুষ্টিলাভে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তখনকার জ্ঞানাঙ্কুর, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, আর্যদর্শন, প্রচার ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে উপন্যাস বিষয়ে নানা তত্ত্বালোচনা স্থান পেত। সে সমস্ত আলোচনা তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসগুলিব বিচারে পর্যাপ্ত ছিল; সে বিচার রীতিমত গভীরতার ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সন্ধানের সাফল্যের নিদর্শন। অতঃপর এ শতাব্দীতে উপন্যাসের বক্তব্যগত ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে অনেক। কিন্তু ক্ষোভেব বিষয়, সেই অনুপাতে সমালোচনার পদ্ধতি নিরূপিত হচ্ছে না এবং উপন্যাস সম্পর্কে বাংলায় সফল আলোচনার সংখ্যা নগণ্য। পশ্চিমী উপন্যাসের বহুবিচিত্র নিরীক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে কিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই এবং প্রতিনিয়ত তার সঙ্গে তুলনায় নিজেদের হীনমন্যতার উত্তরোত্তব বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই হীনমন্যতায় কখনো কখনো ইন্ধন যোগায় উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব। প্রায়ই দেখা যায় ছাত্রপাঠ্য অতিসরল আলোচনা। উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় এগুলির দ্বারা কিছুতেই পরিণত হতে পারে না। উপন্যাস কাহাকে বলে, উপন্যাস কয় প্রকার, ইহার উপকারিতা-অপকারিতা জাতীয় আলোচনা প্রায়ই আমাদের বয়স্ক সমালোচনা সাহিত্যের মর্যাদা পায় এবং কখনো গবেষণাগ্রন্থরূপে, কখনো সাময়িক পত্রের প্রবন্ধরূপে সাদরে গৃহীত হয়।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কারণ, তার ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন: "আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের

স্বরূপলক্ষণ নিরূপণ, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পলেখকদের রচনারীতির মূল্যায়ন ও তাঁদের প্রধান প্রধান গল্পোপন্যাসের বিচারক্রিয়া এই গ্রন্থের উপজীব্য।" এই গ্রন্থে "আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয়" দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। অর্থাৎ লেখক কথাসাহিত্যের শুধু তত্ত্বগত আলোচনাই নয়, তার প্রয়োগগত আলোচনাও বাঙালি ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের মূলায়নের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিকের দায়িত্বও কিয়ৎপরিমাণে পালন করবেন।

বইখানিতে মোট ষোলটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখক দাবি করেছেন, এগুলির মধ্যে "একটি সঙ্গতির সূত্র বিদ্যমান"। যেহেতু 'কথাসাহিত্য' বলতে শুধু উপন্যাস নয়, ছোটগল্পও বোঝা যায়, তাই ছোটগল্পের উপর লেখক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে কথাসাহিত্যে দেহবাদ বিষয়ে লেখকের প্রবন্ধ ও সাময়িক- পত্রের বিতণ্ডা যুগপৎ পুনর্মুদ্রিতও হয়েছে।

'ছোটগল্প' নামে প্রবন্ধটিতে ছোটগল্পের উদ্ভব ও চরিত্র সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন তাতে নতুন কোন সত্যের বা উপলব্ধির প্রকাশ দেখা গেল না। এ বিষয়ে প্রকাশিত বাংলা অন্যান্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধের বাইরে লেখকের গবেষণা ধাবিত হয় নি। ছোটগল্পের সংজ্ঞা বলে তিনি যে এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি (নিজেরই অন্য একটি গ্রন্থ থেকে) দিয়েছেন তাকে কোনোক্রমেই "সংজ্ঞা" বলা চলে কি ? হয়তো বড় জোর, একে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সূচক মনে করা যায়। এই একটি প্রবন্ধের মধ্যে সব কিছুই ঢুকিয়ে বলার চেষ্টা প্রবন্ধটির ভারসাম্য নষ্ট করেছে এবং ছোটগল্পের বিচারে বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্র পার হয়ে লেখক বিশেষ অগ্রসর হন নি। পরিশেষে একালের লেখকদের উল্লেখযোগ্য গল্পের তালিকা প্রস্তুত করেছেন।

ঐ প্রবন্ধে যেমন অন্যান্য প্রবন্ধেও তেমন, লেখক সর্বত্রই তালিকা প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন, কোনো একটি গল্প বা উপন্যাসের বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি পল্লবমাত্র গ্রহণ করেছেন, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এমন কি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও রচনা করেন নি। উপন্যাসের তত্ত্বগত আলোচনা অন্তত চারটি প্রবন্ধে লেখক স্থান দিয়েছেন। এগুলি পড়লে মনে হয়, 'মহৎ উপন্যাস' সম্পর্কে লেখকের একটি কল্পনা আছে, বিশেষত স্বদেশের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির উল্লেখ সে-ধারণাকে দৃঢ়

করে। কিন্তু কোথাও উপন্যাসের 'তত্ত্ব' লেখক আলোচনা করেন নি। উপন্যাসের 'সংজ্ঞা'র সন্ধানে বেরিয়ে জীবন ও জগৎকে উপন্যাসের প্রতিবিম্বে বিশেষরূপে প্রতিফলিত দেখেন নি ; জীবন-দর্শন, স্থান-কাল-সন্ততির অবস্থান, উপন্যাসের জৈব বিকাশ, চরিত্রের রূপান্তর রহস্য ইত্যাদি কিছুই তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। [শিল্প হিসাবে উপন্যাসের প্রতি লেখক বিশেষ শ্রদ্ধাশীল বলেই মনে হয় না ('সাহিত্যে উপন্যাসের স্থান' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।] অথচ উপন্যাসে আদর্শবাদের ভূমিকা লেখক গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন, অন্যান্য সাহিত্যের থেকে উপন্যাসের পার্থক্য চমৎকার নির্দেশ করেছেন এবং আমাদের দেশে সার্থক নাটক রচিত না-হওয়ার কয়েকটি কারণ যথার্থ ধরেছেন (পৃঃ ১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও সাধারণভাবে তাঁর সুরুচিপ্রিয়তার আতিশয্যের প্রতি লেখক যেন একটু অপ্রসন্ন, এমন কি তাঁর "জন্ম-আভিজাত্য" বিষয়েও মামুলি অনুযোগ (পৃঃ ৪২), "লালিত্য কমনীয়তা ও ভাবালুতা"র প্রতি কটাক্ষ (পৃঃ ৫৩) করতেও দ্বিধা করেন নি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও 'দরদ', 'ভাবালুতা' 'সংস্কারান্ধতা'র মামুলি মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি। এই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্বের প্রকৃত কারণ লেখক তাঁর বিশেষ কোনো উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে পাঠকদের সুবিধা হতো। এর পর বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, বনফুল, ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধে বারংবার উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও বিভূতিভূষণের সমাজচেতনার অভাব, তারাশংকরের আঞ্চলিকতা, মানিকের মনস্তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদির উল্লেখে প্রচলিত মতামতের ঊর্ধ্বে লেখক উঠতে পারেন নি একটি ক্ষেত্রেও।

একটি প্রবন্ধে ('সাহিত্যে পরিবেশ-বৈচিত্র্য') লেখক সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধি ও নানা বৈচিত্র্যের বিস্তারকে স্বাগত জানিয়েছেন। এমন কি, "বৈচিত্র্যের উপকরণ" হিসাবে "উদ্বাস্তু জীবন"কে অবলম্বন করতেও লেখকদের প্ররোচিত করেছেন। যে পরিবেশের সঙ্গে আমরা অতিপরিচিত সেখানে একঘেয়েমির চেতনা বড় পীড়াদায়ক। তাই এই একঘেয়েমির চেতনাই নাকি "সাহিত্যে আমাদের নব নব পটভূমি সন্ধানে প্ররোচিত করে।" আর যা-ই হোক, এ সন্ধান মহৎ উপন্যাসের অনিবার্য অন্বিষ্ট কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তা ছাড়া ইদানীং বাংলা সাহিত্যে তাহলে তো বিশেষ ক্ষোভের

কারণ ঘটার সুযোগ নেই! কিন্তু আদৌ ভূগোলের প্রয়োজন কেন, ও কতটা, সে বিষয়ে লেখক আমাদের বিশেষ আলোকিত করেন নি।

বাংলা দেশের জল-হাওয়ায় মহৎ উপন্যাস রচিত হয় না, এটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে লেখক ধরে নিয়েছেন। তার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন: "আমরা জাতি হিসাবেই কিছুটা পরিমাণে খণ্ডরসের সাধক" (পৃঃ ৫২)। বেশ দ্বিধাভরে কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, গোরা, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, পথের পাঁচালী, পঞ্চগ্রাম বইগুলির নামমাত্র উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে ('উপন্যাসের প্রকৃতি বিচার') উপন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় "সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী," "সুগভীর জীবনদর্শন," "প্রজ্ঞাদৃষ্টি," "জীবনরহস্যের তাৎপর্য," "আত্মানুসন্ধান" ইত্যাদির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর কোনোটিকেই বিশ্লেষণ করেন নি, কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন নি।

'সাহিত্যে বাস্তববাদ' প্রবন্ধটিতে লেখক সংসারের বাস্তব ও সাহিত্যের বাস্তবে পার্থক্যের কথা সুন্দর বলেছেন। সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের যোগ এবং বাস্তবতার নামে "ক্লেদরতি" পরিবেশনের অপচেষ্টার আধুনিক বিপদের সার্থক সমালোচনা করেছেন। এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সৌন্দর্যতত্ত্বই প্রকারান্তরে বলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। "শিল্পীর মানসিক গঠনের ভিতর সুগভীর নীতিনিষ্ঠার পোষকতা না থাকলে কখনও তাঁর পক্ষে মানবমনকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়"—এই উক্তিকে কিঞ্চিৎ বিশদ করলে আমরা সত্যই উপকৃত হতাম। "উদ্দেশ্যের সততার দ্বারা বচনার গুণাগুণ নির্ণীতব্য"—এই সুন্দর সিদ্ধান্তটি সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ আমরা চাইছি, লেখক শুধু সিদ্ধান্ত-বাক্য উপহার না-দিয়ে পাঠককে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করুন। তাহলেই তাঁর বক্তব্যের গভীরতা ও লক্ষ্য অব্যর্থ হয়। যেমন "বাংলা-সাহিত্যে অশ্লীল লেখনীর আজ জয়-জয়কার" (পৃঃ ৬৯)—এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত লেখকদেব নাম ও রচনার পরিচয় এবং সাহিত্য-অসাহিত্য হিসাবে তাদের মূল্যায়ন জানতে ইচ্ছে হয়।

একালেব কথাসাহিত্যে 'কল্লোল' গোষ্ঠী এবং মার্কসীয় লেখক-সম্প্রদায়ের ভূমিকা লেখক একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। 'কল্লোল' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্টতই বিরূপ, কিন্তু অপর সম্প্রদায়টি সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা কিছুতেই কাটে নি। তাঁদের বামপন্থা একটা "পোজ" মনে হয়েছে এবং এই সব লেখকদের "বুর্জোয়া-জীবনযাত্রাসুলভ আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দুর্নিবার লোভ"

তাঁকে পীড়িত করেছে, তাঁদের রচনায় "নগ্ন বাস্তববাদ তথা যৌনতার প্রাধান্ত" তাঁকে প্রশ্নাকুল করেছে। অন্যত্র লেখক "চায় নিষ্কলুষ সাহিত্য" (পৃ: ৭৮) বলে দাবিও জানিয়েছেন। তাঁর মতে, "মনোবৃত্তির অধোগামিতা"র জন্য দুই দশক আগের "মন্বন্তর-সাহিত্যে" মানুষের চরম অধঃপতনের চিত্রই ফুটে উঠতে দেখা গেছে, কিন্তু "দারিদ্র্যের চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার মধ্যেও নারীকে সত্যপথভ্রষ্ট করতে পারা যায় নি"—সে গৌরবোজ্জ্বল চিত্র আঁকতে আমাদের লেখকেরা, বিশেষত তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকেরা উৎসাহ পান নি। শ্রদ্ধেয় নারায়ণবাবু কিন্তু কোনো একজন লেখকের বিশেষ কোনো লেখার আলোচনা করেন নি—প্রায়ই "জনৈক লেখক" বা "একজন আধুনিক খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক" বলে উল্লেখ করেছেন। "সাহিত্য রাজনীতি নয়" (পৃ: ৮৩)—এ কথাও তিনি অনেকের মতো সোচ্চারে বলেছেন। কিন্তু অন্যত্রে বলেছেন: "গূঢ় অর্থে রাজনীতি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদেরই একটি অংশ মাত্র" (পৃ: ১৩৫)। তাঁর মতে "আনন্দের ভূরিভোজনে পাঠককে পরিতৃপ্ত" করাই সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারক। বাংলাসাহিত্যে তো ভূরিভোজনের আয়োজন প্রচুর, সে ক্ষেত্রে কিন্তু "জনৈক" নামক লেখকের উৎকর্ষ-বিচারের দায়িত্ব নিতে লেখক অস্বীকার করেছেন। অথচ লেখকের নাম না-করেও বামপন্থী একচক্ষুতার বিস্তর নিন্দাবাদ করে বাংলাদেশের একজন লেখকের লেখা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'আজ কাল পরশুর গল্প' কাহিনীদ্বয়ের (আমাদের গ্রন্থকারের কত সতর্কতা, পাছে লেখকের নাম করলে ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে যায় এবং সমালোচনায় নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠার অভাব ঘটে।) মধ্যে "কেবল পিচ্ছিল কর্দম" ও "নিতান্ত সাময়িক বিরূপ অবস্থার চিত্রণ ছাড়া আর কোন বিষয়" তাঁর "প্রশস্ত" দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। অধিকন্তু বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার "কঠোরহস্তে রোধ" করার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। তবে আশ্বাসের কথা, শুধু জনৈক বাঙালি লেখকই ন'ন, "সমাজজীবনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ" ঘাঁটার জন্যে গ্রন্থকার একদল পশ্চিমী লেখককেই বরবাদ করে দিয়েছেন; জোলা, সার্ত্র অপেক্ষা ভিক্টর হুগো-র উপর তিনি প্রসন্ন এবং সমারসেট মম্-এর ঔদার্যে তিনি মুগ্ধ।

তাঁর মতে, "আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আর একটি অভিশাপ হল অতিরিক্ত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-প্রবণতা"। তাই লেখকের ধারণা হয়েছে—"এমন কোন কোন কৌতূহল আছে, যা পরিতৃপ্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলেই

বরং মঙ্গল" (পৃঃ ৯০)। এবং ভারি চমৎকার সিদ্ধান্ত : "মানুষের মন জটিলতা-মুক্ত হয়ে আরও বেশি বহির্মুখী হলে এ অশুভ সম্ভাবনা বহুলাংশে তিরোহিত হতে পারত" (ঐ)।

লেখক "অসম সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় শোষণ" ও "পুঁজিবাদী সমাজের বিকার" সম্পর্কে সচেতন এবং মনে হয় "প্রতিক্রিয়াশীলতার" বিরুদ্ধে (পৃঃ ১২৮ দ্রষ্টব্য)। তিনি সাহিত্যে সমাজচেতনার মূল্য স্বীকার করেছেন জোরালো-ভাবে, এমন কি, অনেকখানি অগ্রসর হয়ে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্যের অন্তরালে "সুস্পষ্ট সমাজচৈতন্যের দ্যোতনা" খুঁজে পেয়েছেন। রাজনীতির গুরুত্ব কোথাও কোথাও স্বীকার করেও তিনি বলেছেন : "শিল্পীর পক্ষে দৈনন্দিন রাজনীতি থেকে কিয়ৎ পরিমাণে দূরে থাকা দরকার" (পৃষ্ঠা ১৩৬)। জানতে ইচ্ছে করে, কত পরিমাণ দূরে? লেখক যখন একস্থানে বলেন, "ভারতীয় কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের বিভেদ আছে" (পৃঃ ১৩৭), তখন মনে দুষ্ট বিশ্বাস জন্মায়, অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে অতটা বিভেদ নেই। আমাদের কম্যুনিস্ট শিল্পী-বন্ধুদের রচনারীতিতে "ঐতিহ্যচর্চা না করেই রাজনীতি নিয়ে দাপাদাপি" তাঁকে পীড়িত করে। কম্যুনিস্টদের সংস্কারমুক্তির প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দন জানান এবং তাদের ঐতিহ্য-চেতনার দুর্বলতাকে সমালোচনা করেন, যদিও সংস্কার ও ঐতিহ্যের পার্থক্যনির্দেশ লেখক উহ্য রাখেন। প্রগতিশীলতার সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনাকে যুক্ত করতে পারলেই তাঁর মতে "শিল্পসৃষ্টির আর মার নেই।" রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের অতিরিক্ত লালিত্য-প্রবণতা ও সুরুচিপ্রিয়তার আতিশয্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেও লেখক গ্রন্থের পরিশেষে একাধিক প্রবন্ধে দেহবাদী তথাকথিত সাহিত্যের প্রতিপক্ষে কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখানে লেখকের নৈয়ায়িক বুদ্ধির সার্থক প্রমাণ।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক যদি প্রতিটি প্রবন্ধের মূল সূত্র অবলম্বনে এগুলিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজাতেন তাহলে তাঁর পরিণত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিদগ্ধ মননের পরিচয় আরো সার্থকভাবে হয়তো পরিস্ফুট হতো॥

নির্মাল্য আচার্য

হেমিংওয়ে : আত্মজীবনীর এক অধ্যায়

A Moveable Feast : Ernest Hemingway. Jonathan Cape. 1964. 18 s.

নিউরসিসের দোহাই পেড়ে শিল্প বা সাহিত্য বিচারের ধারা কি ১৯১০ সালে ফ্রয়েডের 'লিওনার্দো' থেকেই শুরু হয়েছিল ? জানি না। শুরু যখনই হোক, সমালোচনার এই রীতি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংযতভাবে এই ধারার প্রয়োগ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত অন্য রীতিগুলি সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন, তাঁদের কথা আলাদা। বিশেষত তন্নিষ্ঠ তথ্যনির্ভরতায়, কখনও জীবনীর অনাবিষ্কৃত উপকরণসংগ্রহে এঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এঁরা তো মুষ্টিমেয়। সাংবাদিককুলের অনুগ্রহ-ভাজন বৃহত্তর সমালোচকমণ্ডলী এ-সাধুবাদ দাবি করতে পারেন না। এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কৃপায়, প্রধানত অবশ্য সংবাদপত্রের ও জনপ্রিয় সাময়িক-পত্রের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় হেমিংওয়ের যে-চরিত্রচিত্র বহুল প্রচারিত হয়েছে, সেই নিউরটিকের কেস্‌-হিস্টরি অনুসারে, এই মানুষটি নিজেকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে না পেরে, নিজের সমূহ দুর্বলতাকে ঢাকা দিতে এক রুক্ষ কঠিন মানুষের মিথ্যা ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। হেমিংওয়ের গল্প-উপন্যাসে আমাদের শতকের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরুষের স্বভাবনির্দেশ একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ইন্‌ আওয়ার টাইম'-এ নিক্‌ অ্যাডাম্‌স্‌-এর জীবনাবিষ্কারে সেও এই পৌরুষকে খুঁজেছে। তাই 'ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প' গল্পের মুখবন্ধে স্মার্না থেকে গ্রীক পশ্চাদপসরণের টুকরো ছবিতে মদের নেশার সাহস ও শত্রুপক্ষের চোখে পড়ার ভয়, পৌরুষের এই বিকৃত রূপ রচনা করেই হেমিংওয়ে স্ত্রীর গর্ভযন্ত্রণায় বিচলিত স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী বর্ণনা করেন। উভয়ই পৌরুষের বিপর্যয়, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সে-বিপর্যয় বৈনাশিক যুদ্ধের নৈতিক বিপর্যয়ের অংশমাত্র, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানবিক অনুভূতির তীব্রতায় পৌরুষ মারা পড়ে। হেমিংওয়ের প্রথম নায়ক নিক্‌ অ্যাডাম্‌স্‌ বয়ঃপ্রাপ্তির বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে পৌরুষের চরিত্র পরীক্ষা করেছে। দ্বিতীয় নায়ক জেক্‌ বার্নস্‌-এর পৌরুষহানি ও ব্রেটের অন্য সহচরদের ক্লীব অক্ষম প্রেমনিবেদনের মধ্যে লরেন্‌স্‌-এর 'লেডি চ্যাটার্লি'র ক্লিফর্ড-মিকেলিসের আভাস ধরা পড়ে। একালে যেন পৌরুষের বিপর্যয় শরীর ও মন, দুয়েরই ব্যাপার। বুলফাইটার পেড্রো রোমেরোর প্রায়

রিচুয়ল্-স্বরূপ জীবনযাত্রায় আধুনিক জীবনের বিকৃত মানসিকতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কিছুটা পৌরুষ অবশিষ্ট আছে; কিন্তু সে-পৌরুষ নিয়েও জীবন কাটানো চলে না; তাই ব্রেট্ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ব্রেটের অদমনীয় যৌনক্ষুধা যে জেক্-এর সঙ্গে পরিপূর্ণতর সম্পর্করচনার অপূর্ণ সাধের ব্যর্থতা-বোধেরই ফল, তার ইঙ্গিত হেমিংওয়ে দিয়েছেন—ব্রেট্ বার বার জেক্-এর কাছে ফিরে ফিরে এসে শুধু অনুশোচনাই প্রকাশ করে। পরবর্তী তিনটি উপন্যাসে ফ্রেডরিক্ হেনরি, হ্যারি মর্গান ও রবার্ট জর্ডান যুদ্ধ ও ভায়োলেন্স্-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এবং শেষ উপন্যাসে বৃদ্ধ সান্টিয়াগো জীবনযাত্রার কঠিন মাটি থেকে পালিয়ে আকাশ-জল-হাওয়ার এলিমেন্টাল পরিবেশে পৌরুষের চরিত্র পরীক্ষা করে। আধুনিক জীবনে পৌরুষের স্থাননির্দেশের এই যে চেষ্টায় হেমিংওয়ের প্রায় সমগ্র সাহিত্যসাধনা গ্রথিত, তার তাৎপর্য কি নিতান্তই নিউরটিক কোনো দৌর্বল্যের বহিঃপ্রকাশ?

নিউরসিস্ হয়তো কোথাও ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় তাগিদ ছিল। প্রথমত, একের পর এক যুদ্ধ ও রাজনৈতিক কলাকৌশলে (টরন্টোর 'ডেলি স্টার' ও 'স্টার উইক্লি'র সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকরূপে হেমিংওয়ে য়োরোপে-এশিয়ায় এ দুয়েরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন) নীতিবোধের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপর্যয়, ও দ্বিতীয়ত, গের্টুড স্টাইন বর্ণিত তথাকথিত 'লস্ট জেনারেশনের' জীবনবিমুখতায় ও নাটুকে ভঙ্গিসর্বস্ব জীবনযাত্রায়। এই দ্বিতীয় সংকটের পরিচয় ও সেই সংকট থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রাণান্ত চেষ্টার কাহিনী হেমিংওয়ের কাছ থেকে এই প্রথম শোনা গেল। এ পর্বের তথ্যসমূহ অবশ্য চার্লস্ ফেন্টনের "যথার্থ এফ. বি. আই-সুলভ খবর শুঁকে বেড়ানোয়" (কনিষ্ঠ ভ্রাতা লীস্টারের কাছে হেমিংওয়ের উক্তি থেকে) আগেই প্রায় সব সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু তথ্য নয়, তথ্যের তাৎপর্যই এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীর তাৎপর্য।

সাংবাদিকেরা যে হেমিংওয়ে লেজেণ্ড রচনা করেছিলেন, তার দায়ে স্বয়ং হেমিংওয়েকে জড়ানো যায় কিনা সন্দেহ আছে। ক্যানেডীয় গল্পকার মর্লি ক্যালাঘান ('দ্যাট্ সামার ইন্ প্যারিস্') হেমিংওয়ে সম্পর্কে তাঁর চাপা হিংসা ও হীনমন্যতাবোধসত্ত্বেও মেনেছেন যে, হেমিংওয়েকে খবরের বিষয়-বস্তুতে পরিণত করার দায় সাংবাদিকদেরই গ্রহণ করতে হবে। হেমিংওয়ের স্বভাবজ ব্যক্তিত্বে কোনো কোনো উপাদানের অস্তিত্বে তাঁকে এই রূপ দেওয়া

সহজ ছিল, এর বেশি অপরাধ হেমিংওয়ের ছিল না। লিলিয়ান রস্ ('পোর্ট্রেট্ অফ হেমিংওয়ে') ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলেছেন যে, সাহিত্য-সাধনায় ও জীবনযাত্রায় আন্তরিক সততাই তাঁর ধর্ম ছিল ; সাহিত্যসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও তিনি তাঁর দিনানুদৈনিক অভিজ্ঞতাকে লোকচক্ষে তুলে ধরেছেন, সেও কিন্তু "তাঁর অনন্ত সহৃদয়তায়, যাতে সকলেই তাঁর আনন্দময় জীবনযাত্রায় অংশ নিতে পারে।" জীবনযাত্রায় ভঙ্গিসর্বস্বতার অভিযোগে হেমিংওয়ে আহত হলেও কখনও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। সেই বিক্ষোভ এই আত্মজীবনীর মুখবন্ধে অভিমানাহত স্বরে প্রকাশ পেয়েছে : "পাঠক যদি চান, এই বইটিকে উপন্যাস মনে করতে পারেন। কিন্তু সর্বদাই সম্ভাবনা থেকে যাবে, তথ্য বলে যা প্রকাশিত হয়েছে, এই উপন্যাস হয়তো তার উপর কিছু আলোকপাত করবে।"

ভূমিকায় হেমিংওয়ের বিধবা পত্নী মেরী হেমিংওয়ে যদিও এই আত্মজীবনীর কালনির্দেশ করেন ১৯২১ থেকে ১৯২৬-এর পর্বে, আসলে এর শুরু ১৯২৪-এ। টরন্টোয় হেমিংওয়ের প্রথম পুত্র জনের (বাম্বি ডাকনামে পরিচিত) জন্মের পর সাংবাদিকের কর্মে ইস্তফা দিয়ে ১৯২৪-এর জানুয়ারিতেই প্রথমা স্ত্রী হ্যাড্‌লি রিচার্ডসনকে নিয়ে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। ১৯২৬-এর প্যারিসবাসের কাহিনী হেমিংওয়ে বর্ণনা করেন নি, প্রথম আলাপ ইত্যাদির কিছু বিচ্ছিন্ন স্মৃতি ইতস্তত ছড়ানো আছে, এইমাত্র। মধ্যে টরন্টোবাসের কথাও আসে না। টরন্টো পর্ব সম্পর্কে অন্যত্র (টরন্টো থেকে বিদায়কালে পূর্বতন সহযোগীদের কাছে) হেমিংওয়ে অনুযোগ করেন, "টরন্টো আমার জীবন থেকে পাঁচটা বছর ছিনিয়ে নিয়েছে।" ঠিকানা লেখার মার্কিনী কায়দায় ক্যানাডার টরন্টো হয়েছিল 'টরন্টো, ক্যান্', হেমিংওয়ের দুর্গতির কথা জেনে হেমিংওয়ের বন্ধু এজরা পাউণ্ড নতুন নামকরণ করেছিলেন 'টোম্যাটো, ক্যান্'। ওখানকার তিক্ত স্মৃতি পেছনে ফেলে রেখে প্যারিসে নতুন গৃহস্থালি প্রতিষ্ঠা এবং সেই সময় থেকেই আত্মজীবনীর এই পর্বের সূত্রপাত।

প্যারিস সম্পর্কে তাঁর মায়া পড়ে গেছল। ১৯৫০-এর সাক্ষাৎকারে তিনি লিলিয়ান রস্‌কে বলেন, প্যারিস ও ভেনিস, এই দুটি শহরকে তিনি আপন শহর মনে করতেন, প্যারিসে ফিরে যাবার ইচ্ছেও ছিল, "যে শহরে থেকেছি, কাজ করেছি, লিখেছি, বড় হয়েছি, পরে লড়াই করে ঢুকেছি, সে-শহরে আজও

নিজেকে একা করে নিয়ে আনন্দ পাই"—"সারা শহর হেঁটে বেড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, কোথায় ভুল করেছিলাম, কোথায় আমাদের দামী আইডিয়াগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম।" প্যারিসে যে-পরিবেশে হেমিংওয়ে এসে পৌছেছিলেন, সে পরিবেশ তাঁকে সোজাসুজি সাহায্য করে নি। আগের শতকের শেষে প্যারিসে ও লণ্ডনে ইস্‌থেটিসিজম্‌-এর বিষাক্ত হাওয়ায় জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে অসুস্থ ভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসে সেই মানসিকতা আবার ফিরে আসে। ফোর্ড ম্যাডক্‌স্‌ ফোর্ড হেমিংওয়ের সঙ্গে বসে অ্যালিস্টার ক্রাউলিকে দেখিয়ে হিলেয়ার বেলক্‌ বলে বর্ণনা করে আনন্দ পান, আগের পর্বে অস্কার ওয়াইল্ডের মিথ্যার মাহাত্ম্যকীর্তন মনে পড়ে যায়। হেমিংওয়ে যখন গের্ট্রুড স্টাইন ও স্কট ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের কথা বলেন, তখনও অস্বাভাবিকের প্রতি ইস্‌থীটের মোহ এঁদের জীবনযাত্রার প্রাণস্বরূপ বোধ হয়। বর্ণনায় সহানুভূতি সত্ত্বেও যে-দূরত্ব হেমিংওয়ে রেখে যান, তাতে বোঝা যায়, এই জাতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে হেমিংওয়ের আপত্তি ছিল। শ্রীমতী স্টাইন যখন সমরতির পক্ষে ওকালতি করেন, কিংবা অতর্কিতে হেমিংওয়ে যখন দরজার ওপাশে শ্রীমতী স্টাইনের কণ্ঠস্বরে এক জঘন্ত নাটকের আভাস পান (এই ঘটনাটি হেমিংওয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট রেখে যান; ইঙ্গিতে বোধহয়, এটি সমরতিরই ব্যাপার), তখন আবার অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌কেই মনে পড়ে। শ্রীমতী স্টাইন্‌ এই যুগকে 'লস্ট জেনারেশন'-এর যুগ বলে বর্ণনা করেন। কথাটা খুব সহজেই চালু হয়ে গেছল। উক্তিটির উপলক্ষ এবার জানা গেল—গ্যারেজের কর্তা তাঁর কর্মচারীকে ধমক লাগিয়েছিলেন, তাঁরই কথাটা শ্রীমতী স্টাইন্‌ তুলে নিয়েছিলেন, প্রয়োগ করেছিলেন হেমিংওয়ে ও তাঁর সমসাময়িকদের ক্ষেত্রে। অন্তত্র হেমিংওয়ে প্রতিবাদে বলেছেন, "কথাটা একটা চমক লাগানো অতিশয়োক্তি। আমার সমকালীনেরা অনেক মার খেয়েছে। কিন্তু মৃতেরা, সার্টিফিকেট পাওয়া পাগলের দল, আর মত্তপদের বাদ দিলে, আমরা হেরে-যাওয়ার দলে নেই। আমরা এক কঠিন যুগ, যদিও আমাদের শিক্ষায় ফাঁকি পড়েছে (কারো কারো)।" হেমিংওয়ে যাঁদের 'সার্টিফাইড্‌ ক্রেজীস্‌' (certified crazies) বলেছেন, শ্রীমতী স্টাইন্‌, স্কট ফিট্‌জ্‌জেরাল্‌ড্‌ বা ফোর্ডকে হয়তো সেই শ্রেণীতেই স্থান দেওয়া যায়।

অবশ্য অন্যদিকেও সিল্‌ভিয়া বীচ ছিলেন, জয়েস্‌ ছিলেন, পাউণ্ড ছিলেন।

যুয়ান মীরো-ও ছিলেন, যদিও, কেন জানি না, তাঁর কথা হেমিংওয়ে বলেন নি। জয়েসের 'ইউলিসিস্'-এর প্রথম প্রকাশক শেক্‌স্‌পীয়র এ্যাণ্ড কম্পানির অধিশ্বরী ছিলেন শ্রীমতী বীচ। এতখানি সহৃদয়তা হেমিংওয়ে জীবনে আর কারো কাছে পান নি, এ তিনি নিজেই বলেন। এঁরই রেণ্টাল লাইব্রেরিতে হেমিংওয়ের সাহিত্যশিক্ষার শুরু, তুর্গেনীভ, দস্তয়েভ্‌স্কি, তল্‌স্তয় ও লরেন্‌স্ দিয়ে। "প্রথম যেদিন দোকানে গেছি, তখনও আমি বড় লাজুক ; তা ছাড়া রেণ্টাল লাইব্রেরিতে নাম লেখানোর মতো টাকা সঙ্গে ছিল না। তিনি বলেন, যখন টাকা থাকবে দিলেই চলবে ; এই বলে একটি কার্ড করে দিয়ে বলেন, যতগুলো খুশি বই নিয়ে যেতে পারি। আমাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ তাঁর ছিল না। যে-ঠিকানা দিয়েছিলাম, তার চেয়ে গরীবী কোনো আস্তানা থাকতে পারে না।" শ্রীমতী বীচের এই আত্মীয়তাসুলভ বন্ধুত্ব সেদিনের দরিদ্র হেমিংওয়ে-দম্পতিকে বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, টাকা ধার দিতে শ্রীমতী বীচের কখনই আপত্তি হয় নি। লণ্ডনের ব্যাঙ্ক থেকে এলিয়ট্‌কে মুক্ত করে তাঁকে কবিতা লেখার অঢেল সুযোগ দিতে হবে, এই উদ্দেশ্যে এজ্‌রা পাউণ্ডের তহবিল সংগ্রহে হেমিংওয়ে সোৎসাহে যোগ দেন। 'ক্রাইটেরিয়ন'-এর পত্তন হওয়ায় এলিয়ট মুক্তি পেয়ে যান, এ তহবিলের আর দরকার হয় না। ঘোর সংসারী ক্ষীণদৃষ্টি জয়েস্ ও বন্ধুবৎসল পাউণ্ডের স্মৃতি হেমিংওয়েকে সবচেয়ে বেশি টানে।

ব্যক্তিগত জীবনে যে পৌরুষের কাল্ট্ হেমিংওয়ে চর্চা করেছিলেন, যা সাংবাদিকদের এখনও প্রিয় আলোচ্য, এ আত্মজীবনীতে তার কোনো স্থান নেই। তাই এজ্‌রা পাউণ্ডকে মুষ্টিযুদ্ধ শেখানোর কাহিনী, কিংবা ডস্ প্যাসস্, ম্যাক্যাল্‌মন্ ও ডোনাল্‌ড্ স্টিউআর্ট সমভিব্যাহারে পাম্‌প্লোনার মেলায় ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, কিংবা হ্যাড্‌লিকে দেওয়া বুলফাইটারের উপহার মরা ষাঁড়ের কাটা কান ('ফিয়েস্টা' উপন্যাসে ব্যবহৃত)—এ সবই সযত্নে বর্জিত। অথচ মূভেব্‌ল্ ফীস্ট-এর পরিবেশেই এই কাল্টের জন্মরহস্য নিহিত আছে। কলাকৈবল্যবাদের হাওয়ায় এই ধারণা রটেছিল যে, জীবনধারণ ব্যাপারটাই অতি হীন ; ওটা "আমাদের পরিচারকেরাই আমাদের হয়ে সামলে দেবে।" হুইস্‌লার বন্ধুদের ব্যায়াম করতে দেখে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "ওটা কঁসিয়েৰ্জ্‌দের হাতে ছেড়ে দিলে হত না?" শরীরকে সম্পূর্ণ ভুলে কেবল মন নিয়ে খেলা করার যে-মানসিকতা, তারই বিরুদ্ধে পৌরুষের আত্মঘোষণা

এই কান্ট্-এর তাৎপর্য। একই কারণে জয়েসের মতোই সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হেমিংওয়ের আপত্তি। হার্ভে ব্রীটকে ১৯৫৩-র সাক্ষাৎকারে হেমিংওয়ে বলেন, "নিজের লেখা নিয়ে কথা বলার সার্থকতায় আমি বিশ্বাস করি না। ও নিয়ে কথা বলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। নিজের লেখা বই নিয়ে কথা বলতে গেলে লেখার আনন্দ উবে যায়। লেখা যদি উৎরোয়, তারই মধ্যে পাঠককে সব কথা বলে দেওয়া যায়।" অথচ লেফ্ট্ ব্যাঙ্কের কাফেগুলিতে ঐ ফাঁকা আলোচনাই চলে। দুটি উপন্যাসে অন্তত দুটি চরিত্রে—রবার্ট কোন্ ও রিচার্ড গর্ডন—এই কথাসর্বস্ব লেখককুলের ব্যর্থতাকে হেমিংওয়ে উপহাস করেছেন। পৌরুষের কান্ট্-এর পরিচয় এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার আরেকটি দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে। কাফে-রেস্তোরাঁর ওয়েটারদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব প্রায়ই ধরা পড়ে।

নিজেব সাহিত্য নিয়ে হেমিংওয়ে আলোচনা করেন নি। তাই স্বভাবতই শ্রীমতী স্টাইনের 'প্রভাবেব' বহুবিতর্কিত বিষয়ে তিনি আর কোনো মন্তব্য করেন না (এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে প্যারিস রিভিউ-এর জর্জ প্লিম্প্টনেব সঙ্গে সাক্ষাৎকারে)। কিন্তু তবু দারিদ্র্যের 'শৃংখলায়' সাহিত্যরচনার অভিজ্ঞতাকে তিনি যে মূল্য দেন, তার মূল্য আগাদের কাছেও কম নয়। সাহিত্য বেচে দারিদ্র্যমোচনকে তিনি গণিকাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেন। এই দারিদ্র্য, ও দুই অনভিজ্ঞের জীবন কাটানোর ইতিবৃত্তে ছোট ছোট সুখ, মনান্তর বা নির্দোষ প্রতারণার খেলায় হেমিংওয়ে এক সরল সেন্টিমেন্টাল কাহিনী টেনে নিয়ে যান। দ্বিতীয়া স্ত্রী পলীন পফাইফাবের সঙ্গে প্রণয়ের সূত্রপাতের ইঙ্গিত আছে, অথচ হ্যাড্লির সঙ্গে কেন বিচ্ছেদ ঘটল, তার কোনো ইঙ্গিত নেই। লেডি ডাফ ট্রাইস্উড্ (যিনি 'ফিয়েস্টা'য় লেডি ব্রেট হয়েছিলেন)-এর নাম না থাকলেও, একটি উল্লেখে তাঁকে চেনা যায়, এই পর্যন্ত।

লুক্সেম্বুর্গে সেজানের ছবি দেখে লিখতে শেখার কথা হেমিংওয়ে আবার বলেছেন। ১৯২৪এর ১৬ই অগস্ট শ্রীমতী স্টাইনকে লেখা চিঠিতে "সেজানের মতো করে" স্পেন দেশটাকে দেখাবার চেষ্টার কথা হেমিংওয়ে বলেছিলেন। পরে তিনি লিলিয়ান রস্‌কে বলেছেন যে, সেজানের ছবি দেখেই তিনি নিসর্গপরিবেশ রচনা করতে শিখেছিলেন। এবারে তিনি আরেকটু স্পষ্ট করে

বলেছেন যে, বাক্যরচনার শিক্ষা তখন তাঁর সমাপ্ত; কিন্তু তাঁর লেখায় তিনি যে 'ডাইমেন্‌শন' আনতে চান, তা তখনও আনতে পারেন নি। সেই দিকেই সেজানের শিক্ষা ফলদ হয়। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম্ অফ মডার্ন আর্টে রক্ষিত সঁ্যাং ভিক্‌তওয়াব পাহাড়ের ছবি কিংবা ল্যুভ্‌র্-এ রক্ষিত 'ফাঁসিতে দণ্ডিত লোকটির বাড়ির' ছবির সঙ্গে 'ফর হুম্ বেল্'। টোলস উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিসর্গ দৃশ্যটি তুলনা করে দেখা যায়। সেজানের কোনো ছাত্রের মতোই হেমিংওয়ে 'শঙ্কু, বেলনাকার ও মণ্ডলাকারের' (the cone, the cylinder, the sphere) স্থাপত্য রচনা করেছেন, একই ভাবে তামাটে সবুজ পাইন কাঁটা থেকে কালো রাস্তা, শাদা জলে নিয়ে গেছেন, সমতলকে বারবার ভেঙে অনুভূমিক (horizontal) রেখাকে উল্লম্ব (vartical) রেখা দিয়ে কেটেছেন, পাহাড়ের ঢাল্ রেখাকে হঠাৎ খাড়াই রেখাতে মিশিয়ে অন্যদিকে গিরিপথের কালো রাস্তার বঙ্কিম রেখায় ভারসাম্য রচনা করেছেন, আরো নিচে বাঁধের সূর্যালোকিত জলের তোড়ে, রাস্তার কালো রেখাকে আরেক শাদা রেখা দিয়ে সামলেছেন। স্তরযোজনার এই সেজানীয় কারিগরি নিসর্গবর্ণনায় নিবদ্ধ রেখে হেমিংওয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। তাঁর এই সর্বাধিক প্রিয় উপন্যাসে (হেমিংওয়েব বন্ধু ম্যাল্‌কম্ কাউলির ১৯৪৯-এর প্রবন্ধে এ কথা জানা যায়) সামগ্রিক গঠনকৌশলেও এই সেজানীয় স্তরযোজনার রীতি অনুসৃত হয়েছে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে আন্‌সেল্‌মোর সঙ্গে গিরিপথ আরোহণ ও সেই সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে উপন্যাসের শুরু। কথোপকথন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, প্রায় তারবার্তা ভাষা; আরোহণের ক্লেশ ও অপরিচয়, সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশের রুক্ষতা—কিন্তু এই স্তরের উপরই এস্কোবিয়লে এক রাত আগে গোল্‌ৎস্-এর সঙ্গে কথোপকথনের ঘটনা চলে আসে—এবারে কথোপকথন অনেক তরল, সংলাপ দীর্ঘ, টেম্পরামেন্টের ছাপ অনেক স্পষ্ট—তারপর আবার সেই আরোহণে প্রত্যাবর্তন। প্রথম স্তর থেকে আবার অন্য স্তবে বিবর্তন শিবিরে আগমনমাত্রই। পথক্লেশ নেই, সন্দেহের দেয়াল কিছুটা নেমেছে, মাটি নরম, লোক বিশ্রামরত, ভাষাও স্বভাবতই সহজ হয়ে যায়—আগের স্তরভেদের চেয়েও এই স্তরপার্থক্য প্রকটতর—তাই কথায় রসিকতা আসে—মারিয়ার উপস্থিতিতে প্রেমের কোমলতা আসবে, কিন্তু এখানেই টেন্‌শনের ক্রমলাঘরে তার প্রস্তুতি চলেছে। এদিকে মদ আসে, থম্ আলগা হয়—মারিয়ার সঙ্গে রবার্ট জর্ডানের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়।

টোন (tone)-এর এই মডিউলেশনের উপরই সেজান সব চেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পারলো-পিলারের সংঘাতের পর সপ্তম অধ্যায়ে রবার্ট ও মারিয়ার নিশিযাপন—মধ্যে ঐ টেন্‌শন্‌কে ক্রমশই হালকা করা হয়—সংঘাতে যা চাপা ছিল, জিপ্‌সির তীক্ষ্ণ উচ্চারণে তা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখনই তার ঝাঁজ কিছুটা কেটে যায়, মারিয়া-পিলার-রবার্টের পরিচয়ের মধ্যে ঝাঁজ আরো কাটে—তারপর নরম ঘাসের উপর নরম প্রেমে নেমে আসা যায়। আভিলা অধিকারের কাহিনীর দীর্ঘ বিবৃতির পর আবার এল্‌সর্ডোর শিবিরে সংযত কথা—এখানে আবার সেই অপরিচয়, পথক্লেশের ক্লান্তি, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয়। এইভাবেই সমগ্র উপন্যাসে টোন্ বা স্বর বদলে চলেছে, এবং এই স্বরবিবর্তনের মধ্যেই উপন্যাসে ধারায় মানব-সম্পর্কের পবিবর্তন, কাহিনীব গতি, চরিত্রের বিকাশ এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থান, এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনা, এক মেজাজ থেকে অন্য মেজাজের বিবর্তন ঘটে চলেছে। হেমিংওয়ের রচনাশৈলীতে সেজানীয় শৈলীর অস্তিত্বের প্রমাণ আরো খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ আছে। এবং এই সেজানীয় রীতির মধ্যেই হেমিংওয়ের লেখার দৃঢ় বাঁধুনীর স্বরূপ চেনা যায়।

মর্লি ক্যালাঘানকে স্কট্ ফিট্‌জজেরাল্‌ড্ একদা এই তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন যে, হেমিংওয়ের নাকি প্রত্যেকটি বড় উপন্যাসের জন্য একজন কোনো মহিলার সঙ্গ চাই। 'ফিয়েস্টা'-র পিছনে ছিলেন প্রথমা স্ত্রী হ্যাড্‌লি, বই শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৪০এ 'ফর হুম দ্য বেল্ টোল্‌স্' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া স্ত্রী পলীন পফাইফারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। তৃতীয়া স্ত্রী মার্থা গেল্‌হর্নের আমলে হেমিংওয়ে কোনো উপন্যাসই লেখেন নি। চতুর্থা স্ত্রী মেরী ওয়েল্‌শ্-এর আমলেই তিনি 'ওল্‌ড্ ম্যান্ অ্যাণ্ড দ্য সী" লেখেন। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ থেকে যায়। মুভেব্‌ল্ ফীস্ট্-এর সমগ্র জীবনযাত্রার সঙ্গে 'ফিয়েস্টা'র যোগ আবিষ্কার করা যায়। হেমিংওয়ের প্রথম উপন্যাসের পেছনে যে-মন কাজ করেছিল, এখানে সেই মনের ছবি আছে—হ্যাড্‌লির সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর আস্থা তাঁর প্রথম উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করেছিল। তাই কি এই সম্পর্কের অবসানে তাঁর চাপা বেদনা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে ?

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

ভারতীয় ভাষায় সফোক্লিস

পরিচয়-এর ভাদ্র ১৩৭১ সংখ্যায় শ্রীগোপাল হালদার বহুরূপীর 'রাজা অয়েদিপুস' সম্বন্ধে লিখেছেন। বহুরূপীর নাটকটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি, সুখ্যাতি শুনেছি, ভবিষ্যতে অভিনয় হলে দেখার আগ্রহ রইল।

কিন্তু ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা গ্রীক নাটকের অভিনয় এই প্রথম নয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে Annual Conference of Indian Teachers of English হয়েছিল, তদুপলক্ষে অ্যানটিগনি অভিনীত হয়েছিল St. Stephen's College-এ, উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন আমার বন্ধু ঐ কলেজের অধ্যাপক M. M. Bhalla, অভিনয়কারীদের মধ্যে দুজন আমার ছাত্র ছিলেন, সবটিই amateurs from colleges। আমি যতটুকু উর্দু জানি ও বুঝি, profoundly impressed হয়েছিলাম, বিশেষত মনে হয়েছিল যে সফোক্লিসের masculine diction যেন উর্দুতে চমৎকার ফুটে উঠেছিল, রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলায় তেমনটি যেন হয় না। অভিনয়ের প্রশংসা সবাই করেছিলেন, যাঁরা গ্রীক জানেন, যাঁরা ইংরেজি জানেন, যাঁরা শুধুই উর্দু জানেন।

ভাল্লা পরে আরো ২।৩ খানা সফোক্লিস অনুবাদ করেছেন।

গ্রীক নাটকের অনুবাদে প্রথম না হলেও শম্ভু মিত্র মহাশয়ের কৃতিত্ব খর্ব হয় না। মিত্র মহাশয়ের অনুবাদটি, আশা করি, Yeats-এর অনুবাদের অনুবাদ।

অমলেন্দু বসু

হোয়েল-নারলিকার প্রসঙ্গ

দুই সংখ্যা পূর্বে আষাঢ়ের পরিচয়-এ জ্যোতির্ময় গুপ্তর 'হয়েল, নারলিকার এবং অতঃপর?' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে অবাক হয়েছি। তারপর হতাশ হয়েছি তার পরের সংখ্যায় কোনো-প্রতিবাদ না পেয়ে। আমার ক্ষমতা সীমিত বলে এহেন 'জটিল গণিত তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার' মধ্যে ঢুকতে চাই নি। কিন্তু

বিজ্ঞানের সম্মানার্থে এরকম লেখা বিনা প্রতিবাদে যাওয়া উচিত নয় মনে করে কলম ধরেছি।

জ্যোতির্ময়বাবুর মতো, আমারও হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব নিয়ে হৈচৈ খারাপ লেগেছে। অতিমাত্রায় জটিল এই তত্ত্বকে কতকগুলি বিজ্ঞাপনসুলভ সরলীকরণ করে কিছু দেশি-বিলিতি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে বলে অনেকেরই এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিরাগ জন্মেছে। অনুসন্ধিৎসাও। কিন্তু "বিজ্ঞানীমহল" এর "নিথরতা" ভেঙে "নারলিকার তত্ত্বে Field নেই বলে শুনেছি" বলে নারলিকার, হয়েল বা কোনো বিজ্ঞানীকে অজস্র ইংরেজি কথাভরা অর্থহীন প্রবন্ধে ব্যঙ্গ করা পরিচয়-এর পাতায় দেখব আশা করি নি।

হয়েল-নারলিকার ১৯৬৩-তে দুটি ও ১৯৬৪-র এপ্রিলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন রয়াল সোসাইটির মুখপত্রে। স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সীমা এতই ছোট যে আমি ১৯৬৩-র প্রথম প্রবন্ধটিই মাত্র দেখে উঠতে পেরেছি গত দুই মাসে। সেখানে অন্তত যা কিছু বলা হয়েছে—তা বিজ্ঞানসম্মত প্রথায়ই বলা হয়েছে এবং তার সমালোচনা বিজ্ঞানসম্মত প্রথায়ই করা উচিত।

এই প্রবন্ধে তাঁরা Newton's Icepail Experiment ও ঐ জাতীয় আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার কথা বলেছেন—যা থেকে দেখা যায় পৃথিবীর অনেক দূরবর্তী তারকারা নিউটনীয় স্থিতিশীল ফ্রেমের (যে ফ্রেমে জলের উপরিভাগ সমতল) পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীল। হতে পারে এটা দুর্ঘটনামাত্র। কিন্তু জ্যোতির্ময়বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে স্থিতিশীল ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (Steady-state Comologo)-তে রবার্টসন-ওআকর মেট্রিকের সাহায্যে এই দুর্ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী দেখানো যায়। এটাই 'ম্যাক্' বা মাখ্ প্রিন্সিপল্,—অন্তত এভাবেই হয়েল-নারলিকার তাকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রিন্সিপল্ বলছে যে মহাবিশ্বে ঘূর্ণন (Rotation)-এর অভাব দুর্ঘটনা নয়—দূরবর্তী তারকার জন্যই যেহেতু মহাকর্ষ তথা যাবতীয় ত্বরণের উৎপত্তি সেহেতু এবং মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ অতিমাত্রায় বর্তমান। কোনো ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের বই-এ অন্তত এই মাখ্ প্রিন্সিপল্‌কে অস্বীকার করা হয় নি। জ্যোতির্ময়বাবু এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করলে সুখী হতাম।

তারপর ১৯৪৯-এর কুর্ট গোএডেল (Godel) ও ১৯৫৫-র শ্রদ্ধেয় অমলকুমার রায়চৌধুরীর দুটি পেপারের সাহায্যে নারলিকার প্রমাণ করতে

চেষ্টা করেছেন যে (১) আইনস্টাইনের মহাকর্ষ সমীকরণ-এর পরিবর্তন প্রয়োজন যেহেতু তা রবার্টসন-ওআকব মেট্রিকের দাবি পূরণে অক্ষম।

(২) 'সবচেয়ে সহজ ও যুক্তিপূর্ণ পরিবর্তন আইনস্টাইনের 'Action'-এ স্ক্যালার পদ যোগ করা—যার যুক্তিপূর্ণতা Wiggs-এর graviton সম্বন্ধীয় কাজে মেলে।

(৩) উপরোক্ত পবিবর্তন সাধিত হলে একটি জটিল সমাধানে দেখা যায় যে মহাবিশ্বের ঘূর্ণন ক্রমশ কমছে এবং এও দেখা যায় যে ঐ স্ক্যালার ফিল্ডটির জন্য বস্তু-শক্তির সংরক্ষণ ভেঙে যাচ্ছে—অর্থাৎ স্ক্যালার ফিল্ডটি হচ্ছে Creation Field.

এই অংশের যুক্তি ও গাণিতিক সমীকরণের ভ্রম অবশ্য থাকতে পারে এবং তা দেখাতে পারলে পৃথিবীর গণিতসমাজ নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময়বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

এরপর হয়েল নারলিকার-এব পরবর্তী প্রবন্ধে আসা যাক। সেখানে Action at a distance থিওরীর কথা তাঁরা বলেছেন এবং জনপ্রিয় কাগজে তার সমূহ অপব্যাখ্যা কবা হয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় জ্যোতির্ময়বাবুও এই অপব্যাখ্যায় ভুলেছেন। যে Review of Mod. Phys.-এ কুর্ট গোএডেল-এর লেখা বেরিয়েছিল সেই ১৯৪৯-এর খণ্ডেই ফাতনমান ও হুইলর (Fatynmann & Wheeler)-এর একটি প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে সময় প্রতিসম (time symmetric) এক রূপায়ণ দেওয়া যায় ক্লাসিকাল লোরেনৎস্-ম্যাক্সওয়েল ইলেকট্রোডাইনামিক্সকে—বিলম্বিত ও ত্বরিত (retarded and advanced) পোটেনশিআলের যোগফল থেকে। হয়েল-নারলিকার এর কথাই বলেছেন। তাঁরা হয়তো কোয়াণ্টাম ফিল্ডের কথাও ভেবেছেন, কিন্তু তা তাঁদের পববর্তী প্রবন্ধ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত হয়েল-নারলিকারকে শ্লেষে বিদ্ধ করে শেষ কবে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অন্য কোনো বক্তব্য কিছুই পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি। আশা করি ভবিষ্যতে আরও সজাগ হয়ে তিনি আমাদের নারলিকার তত্ত্বের দুর্বলতার স্বরূপ বুঝিয়ে দেবেন।

জিষ্ণু দে

"শিল্পীর স্বাধীনতা"

বিতর্কমূলক আলোচনা যে কোনো বিষয়ের চর্চার পক্ষে ফলপ্রসূ বলে এককালে আমার বিশ্বাস ছিল—কিন্তু যেহেতু বর্তমানে আমাদের বাদ-প্রতিবাদের আসরের চেহারাটা দিন-দিনই কোন্দলের হাট হয়ে উঠছে তাই ঐ বিষয়ে আমার উৎসাহ কমে এসেছিল। আপনাদের পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আলোচনাতে শ্রীঅশোক রুদ্র মহাশয় তাঁর কলহ-পরায়ণতাকে চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে যে ভাবে আমার একটি উক্তির অপব্যাখ্যা করেছেন তাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রতিবাদপত্র পাঠাতে বাধ্য হয়েছি।

আপনাদের পত্রিকায় 'চারুলতা' ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যখন লিখেছিলাম যে 'চারুলতা' ছবির মধ্যে সত্যজিৎ রায় ঘর ও বাহির-কে একত্র করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (শ্রীযুক্ত কিরণ রাহার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কথোপকথন Times of India পত্রিকায় ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে) তখন আমার বক্তব্য আদৌ এই ছিল না যে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে' উপন্যাস এবং 'নষ্টনীড়' গল্পের একটা compound mixture তৈরি করবেন বলে জানিয়েছেন। আমার বক্তব্য ছিল এই যে 'নষ্টনীড়ে'র অন্দরকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যে তিনি অতিরিক্ত dimension সংযোজন করবেন বলে যে-পূর্বপ্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা 'চারুলতা' ছবিতে অপূর্ব শিল্পসম্মতভাবে পালিত হয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি—কেননা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম থেকে আমরা আনন্দ পেতে বা সেই আনন্দপ্রাপ্তির কথা জানাতে লজ্জা করিনে। সে যাই হোক, সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ না হয় অতিভক্তির লক্ষণ বলে ধিক্কৃতই হল—কিন্তু একজনের উক্তির ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে ঝগড়ার আসর গরম করবার এই যে দুরভিসন্ধি—এটা আর যাই হোক সুরুচির পরিচায়ক নয়।

মহাশয়, শিল্পীকে কি পরিমাণ স্বাধীনতা সমালোচকরা অনুগ্রহ করে দেবেন সে তর্কে না নেমেও গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। শিল্পী এক বিষয়ে সর্বদাই সমালোচকদের থেকে অনেক সার্থক হয়ে আছেন—তাদের কর্মে তারা তাদের অনন্যতাকে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—যদি ক্ষমতাসম্পন্ন হন। কিন্তু হায়, সমালোচকের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ অত সুগম নয়, তাই তাদের কত গলাবাজি করে, কত চোখ রাঙানির সাহায্যে

নিজেকে প্রকাশ করতে হয়। সমালোচকের এই আত্মপ্রকাশের গরজেই আসে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে debunk করার জোরালো চেষ্টা, ঐ আত্মাদরের প্রেরণাতেই না-দেখা ছবির সমালোচনাও করা হয় (অশোকবাবু যেমন Mainstream পত্রিকায় 'অভিযান' না দেখেই ঐ ছবি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন)। সেই সঙ্গে আসে শিল্পকর্মের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়েও অভিমান—মানবিকতার নামে technique-এর প্রতি মারমুখো হওয়া। আর তার চালেই আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিমান সমালোচক রং-তুলি সম্পর্কে কিছু না জেনেও পিকাসো সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখবার সাহস করেন; সরগম না জেনে সঙ্গীত-সমালোচক হন, শরীরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে না পেরে নাট্য-সমালোচক হন কিংবা নৃত্য-সমালোচক হন, এবং ফিল্ম-আলোচনা করতে এসে "টেক্‌নিকের কচকচি"র দিকে মুখ ফেরান। পাণ্ডিত্যের অভিমান নিন্দনীয়, কিন্তু অজ্ঞতার অভিমান অসহ্য। এই অভিমানের বশেই অশোকবাবু পরোক্ষ-উল্লাসে বলে নেন "অত্যাশ্চর্য প্রতীকের ব্যবহার-এর রসগ্রহণ করতে না পারা," "ক্যামেরার কাজের অপূর্ব নিদর্শন চোখে না পড়া" কী গৌরবের কথা! আর এ-জাতীয় নিম্নস্তরের literary bias-দুষ্ট চলচ্চিত্র আলোচনাই আবার অনেকের ভক্তি আকর্ষণ করে। (শারদীয় 'মহাদেশ' পত্রিকায় অশোকবাবুর ভক্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অশোকবাবুর "মানবিকতাবাদী" চলচ্চিত্র আলোচনার সাহায্যে দেশের ফিল্ম্ সোসাইটি আন্দোলনের বিশুদ্ধ শিল্পবাদী অতি সেকেলে টেক্‌নিক-সর্বস্ব চলচ্চিত্রালোচনার পূর্ণতা সাধন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন! মহাশয়, শিল্পের ফর্মটা কি 'মানবিক' নয়? ওটা কি ভৌতিক?)

যাই হোক আমরা যারা সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পীর কাছে শুধু অনুবাদ আশা করি না—তাদের কাছে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন অশোকবাবুর মতো করে আদৌ দেখা দেয় না এবং বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'চারুলতা'কে 'নষ্টনীড়'-এর চিত্ররূপ বলা হলেও, 'চারুলতা'কে অনেকাংশে স্বাধীন শিল্পকর্ম মনে করি। সাহিত্যকর্ম থেকে রসদ সংগ্রহ করে চলচ্চিত্রে যখন নতুন শিল্পকর্ম প্রস্তুত হয়, তখন নতুন মাধ্যমের logic অনুসারেই অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়, সত্যজিৎ সে-কাজ বিভূতিভূষণের বেলায় যেমন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তেমনি করেছেন। বিভূতিভূষণের বেলা অশোকবাবু বিশেষ আপত্তি করেন না—সত্যজিতের ছবির "স্বকীয় রসে

তিনি মজেছেন" বলে। তবে রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই বা "নালিশ বা আক্ষেপ করা অর্থহীন" নয় কেন? মজেন নি বলে? উপন্যাসের বেলা 'বর্জন' এবং ছোট গল্পের বেলা 'সংযোজন' প্রয়োজন হতে পারে বলে অশোকবাবু যে অপূর্ব নিজস্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন—তা চলচ্চিত্র সম্পর্কে বাস্তবিকই এতটা অগভীর বোধেব পরিচায়ক যে এ বিষয়ে আলোচনাই অবান্তর মনে হয়।

মাধ্যমের বিভিন্নতা হেতু 'অনুবাদ' যে ব্যর্থ হয় তার প্রমাণ Shakespeare-এর নাটকের চিত্ররূপ দেবার অসংখ্য প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে বিখ্যাত নন্দনতত্ত্ববিদ Panofsy-র লেখা উদ্ধৃত আমি করব না এই কারণে যে অশোকবাবু "আপ্তবাক্য আওড়ানোর" জন্য আমাকে তিরস্কার করবেন। শুধু আশ্চর্য এই যে অশোকবাবু Dickens অবলম্বনে নির্মিত উৎকৃষ্ট ছবি হিসাবে David Lean-এর 'Oliver Twist', 'Brief Encounter'-এর নাম আদৌ না করে 'David Copperfield' আর 'Tale of two Cities'-এর তুলনা করতে বসেছেন। এতে আরেকবার প্রমাণ হয় যে সত্যই চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিসর কি নিদারুণ সীমাবদ্ধ! হয়তো সে সম্পর্কেও তিনি গর্বিত।

সবশেষে একটি সাধারণ প্রশ্ন—অকস্মাৎ 'চরুলতা'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রভক্তির এই প্রবল বন্যা কেন? 'চিত্রাঙ্গদা', 'চিরকুমার সভা', 'চার অধ্যায়, (জলজলা—হিন্দী), 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি যখন রূপালী পর্দায় একের পর একে বিকৃত হয়ে আসছিল (অনেক সময় উপরে উপরে মূলানুগ থেকেও) তখন এই সব রবীন্দ্রভক্তরা কোথায় ছিলেন? এই নিদারুণ আকস্মিকতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে এই রবীন্দ্রপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রসূত নয়, বরং তা সত্যজিৎ রায়ের প্রতি পরশ্রীকাতরতা-প্রণোদিত?

ধ্রুব গুপ্ত

মার্টিন লুথার কিং : নোবেল শান্তি পুরস্কার

ডিনামাইট ব্যবসায়ী আলফ্রেড নোবেলের নামের সঙ্গে যে শান্তি পুরস্কারের যোগ, তার মূল্য কতটুকু, সে-প্রশ্ন সংগতভাবেই উঠবে। এঁদের বিচার-পদ্ধতিও তেমন কোনো বোধগ্রাহ্য মান প্রতিষ্ঠা করেছে বলে মনে হয় না। তবু কখনও কখনও এ পুরস্কারেও খুশি হয়ে ওঠা যায়। ১৯৬২-তে লাইনাস পাউলিঙ্ বা ১৯৬৪-তে রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং-এর পুরস্কারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে আনন্দসংবাদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বের দৌর্বল্যে যখন প্রায় ভাঙন দশা, সেই ১৯৫৫-৫৬ সালে মার্টিন লুথার কিং-এর আহ্বানে আলাবামার মণ্টগোমারিতে বাস বয়কট আন্দোলনের সাফল্যে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘোষিত হয়। তখন থেকেই দক্ষিণী খৃষ্টীয় নেতৃত্ব সম্মেলনের আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে। গত বছর এপ্রিলে বার্মিংহামে তাঁর নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয়, গভর্নর ওয়ালেসের জান্তব আক্রমণের মুখেও তা ভেঙে পড়ে নি। কারারুদ্ধ কিং তাঁর ১৬ই এপ্রিলের খোলা চিঠিতে সেণ্ট অগাস্টিনের কথা তুলে লিখেছিলেন, "অন্যায় আইন আইনই নয়।" আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়োপযোগিতা সম্পর্কে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিং তাঁদের জবাব দিয়েছিলেন : "বহু বছর ধরে ঐ একই কথা শুনেছি : অপেক্ষা কর। প্রতিটি নিগ্রোর কানে ঐ কথাটি পরিচিত আঘাতের মতো এসে লাগে। এই যে 'অপেক্ষা কর', প্রায় প্রতিবারেই এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'কোনোদিনই নয়'। এ যেন যন্ত্রণানিবারক থ্যালিডোমাইড, মুহূর্তের জন্য আবেগযন্ত্রণাকে নিরসন করে, অথচ পরে ব্যর্থতার বিকৃতদেহ সন্তানের জন্ম দেয়। সংবিধানে স্বীকৃত ঈশ্বরপ্রদত্ত আমাদের অধিকারসমূহের জন্য আমরা ৩৪০ বছরেরও অধিককাল অপেক্ষা করেছি। এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহ জেট বিমানের গতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভিমুখে যাত্রা করেছে, আর আমরা এখনও লাঞ্চ কাউণ্টারে এক কাপ কফি পাবার জন্য ঘোড়ার গাড়ির চালে চলেছি।"

নিগ্রোসমাজের স্বাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের মধ্যে অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থার প্রবক্তা মার্টিন লুথার কিং পুরস্কার ঘোষণার পর সাংবাদিকদের বলেন: "এই সম্মানকে আমি ব্যক্তিগত সম্মান বিবেচনা করি না; আমাদের এই দেশেপ্রেমের শাসন ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংসার পন্থা অনুসরণ করে যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গেরা ও অসমসাহসিক নিগ্রোরা শৃংখলা, সুদৃঢ় সংযম, ও অলোকসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এ তাঁদেরই সম্মান।" কৃষাঙ্গ মুসলিমদের নেতা দশম জেরেমায়া কিং-এর আন্দোলনকে গত বছরই "সফিস্টিকেটেড্ ভিক্ষাবৃত্তি" বলে বর্ণনা করেন। তথাপি এ-আন্দোলনের শক্তি অপ্রমাণিত থাকে নি। গান্ধীবাদী নীতির সচেতন বলিষ্ঠ প্রয়োগে কিং তাঁর আন্দোলনকে যে রূপ দিয়েছেন, তাতে এই নীতির মূল্য সম্পর্কে নতুন ভাবনার সময় হয়েছে।

শন ও' কেসি

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শন ও' কেসির জীবনাবসান হল। শতাব্দীর শুরুতে সিঞ্জ, লেডি গ্রেগরি ও য়েট্‌স্-এর নেতৃত্বে যে আইরিশ নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, পুরোদস্তুর 'সাহিত্যিক' হয়ে পড়ে সে আন্দোলন পদে পদে থিয়েটারের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। অ্যাবে থিয়েটারকে এই শোচনীয় বিপত্তি থেকে উদ্ধার করেন শন ও' কেসি। থিয়েটারের আঙ্গিকে তিনি ডাবলিনের জীবনযাত্রার বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশবাদী রীতির গভীর তাৎপর্যকে যুক্ত করেন (ও' কেসি অবশ্য ১৯৫১ সালের ২৯শে জানুয়ারির এক পত্রে কেনেথ হাউজকে লেখেন: "প্রকাশবাদ বলতে কী বোঝায়, আমি জানি না।' আমার কোনো নাটকে আমি এই রীতিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করিনি।")। ন্যাচরালিজম্-এর বিরুদ্ধে আইরিশ নাট্য আন্দোলন ও য়েট্‌স্-এর যে-অভিযান, তার অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি প্রকাশবাদ ও প্রতীকবাদ। অথচ 'সিল্‌ভার ট্যাসি' নাটকে এই নতুন রীতির প্রয়োগে য়েট্‌স্ কিছুই বুঝলেন না। ও' কেসির নাটকের অর্থ বুঝতে য়েট্‌স্-এর অপারগতা ও অন্যদের নিছক হিংসায় ও' কেসির এই নাটক অ্যাবে থিয়েটার প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে ও' কেসি ডাবলিন ত্যাগ করে লণ্ডনে চলে আসেন। আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগে স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবনযাপনে তাঁর নাটকের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিনা, সেই বহুবিতর্কিত প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত।

আঙ্গিকের পরীক্ষায় ও' কেসি নিজেকে নিঃশেষিত করেন নি। সমাজচেতনা তাঁকে কমিউনিস্ট চিন্তায় পৌঁছে দিয়েছিল। সারস্ কাওয়াস্জিকে লেখা চিঠিতে (৩১ মার্চ, ১৯৫৯) ও' কেসি বলেন : "পৃথিবীতে কমিউনিস্টরা তাঁদের কর্মে যতটা গৌরবার্জন করেছেন, উপন্যাসে ও নাটকে ততটা পারেন নি। দৃষ্টিভঙ্গি সদা পরিবর্তমান। আমি কোনোদিন আমার কমিউনিজ্‌ম্ ছাড়িনি, আমার আরো গভীরে প্রবেশ করে আরো নিশ্চিতি লাভ করে যেটুকু পরিবর্তন ঘটতে পারে, সেইটুকুই ঘটেছে।" অবশ্য "দ স্টার টার্ন্‌স্ রেড্"-এর মতো নাটকেও তিনি খৃষ্টীয় ধর্মচেতনার সঙ্গে তাঁর কমিউনিস্ট চিন্তাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন, কাওয়াস্জিকে লিখেছেন, এ নাটকে "কোনো কমিউনিস্ট ডগমা নেই। এতে আছে, শ যা বুঝেছিলেন—ইংরেজি বাইবেলের অথরাইজড্ ভাষ্যের চেতনা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী।"

নাট্যকার ও' কেসি 'দ প্লাও অ্যাণ্ড দ স্টার্স'-এ জাতীয়তাবাদের নামে মানবিক সম্পর্কের অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, 'সিল্‌ভার ট্যাসি'তে হাসপাতালে দেখা যুদ্ধবিধ্বস্তদের চিত্রকল্প রচনা করে প্যাসিফিজম্-এর প্রচার করেছেন, হাইড পার্কের দিনযাপনের মধ্যে 'উইদিন দ গেট্‌স্'-এ নগরজীবনের অর্থময় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। সহজ রিয়্যালিজম্ বা ন্যাচারালিজম্-এ জীবনভাষ্য স্বভাবতই সঙ্কুচিত হবে, এই ধারণায় ও' কেসি জীবনবোধের প্রকাশের তাগিদে নাট্যরূপের পরীক্ষায় নেমেছেন। স্তরবৈচিত্র্যে বুদ্ধির বন্ধনমুক্তি ও পারস্পেক্‌টিভের যোজনায় প্রকাশবাদী থিয়েটারের রীতি তাঁর সহায়ক হয়েছে। 'দ গ্রীন ক্রো'-র প্রবন্ধাবলীতে থিয়েট্রিক্যালিটির সপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি প্রোসেনিয়মের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন।

শন ও' কেসির মৃত্যুর পর আশা করব, তাঁর নাটকের আরো প্রযোজনা হবে, সার্থকতার প্রযোজনা হবে। বস্তুত, ১৯৫৫-য় স্যর টাইরোন গাথরি ছাড়া ('দ বিশপস্ বন্‌ফায়ার', গেইটি থিয়েটার ; ডাবলিন) অন্য কোনো অগ্রণী আধুনিক পরিচালক তাঁর নাটকে এখনও হাত দেন নি। রাজনৈতিক ছুৎমার্গ বোধহয় এজন্য অংশত দায়ী (অন্তত ও' কেসি তা-ই মনে করতেন)।

জঁ-পল সার্ত্র্ : নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

আমাদের কালের শিল্পভাবনায় ও জীবনচিন্তায় জঁ-পল সার্ত্র্-এর গুরুত্ব এই কারণে যে, তিনি তাঁর সাহিত্যে ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সমভাবেই মানবিকবাদী নীতিবোধের চর্চা করছেন একজন মানুষ জীবনে যে পন্থাই বেছে নেবে,

বাছবার মুহূর্তে সে সমগ্র মানবজাতির হয়ে এই পন্থা নির্বাচন করছে—এই দায়বোধেই অস্তিত্বের মূল্য তথা অস্তিত্ববাদী দর্শনে বর্ণিত 'অ্যাঙ্গুইশ' বা যন্ত্রণা। ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে বা আলজিরীয় মুক্তি আন্দোলনে সার্ত্র্ যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা নৈতিক কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও নাটকে শিল্পরূপের পরীক্ষাও আসলে মানবিকবাদী জীবনদর্শনের প্রকাশবাহনের অন্বেষণ।

নোবেল পুরস্কারের সম্মানের প্রলোভনও তাঁকে টলাতে পারেনি, এতে আমরা আনন্দিত। হয় প্রলোভনে, নয় সহজ লোকপ্রিয় সাফল্যের লোভে, নয় ভয়ে (গুণ্ডামির ভয়ই হোক আর সংবাদপত্রের কটুভাষণের ভয়ই হোক) বারে বারে যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের নীতিভ্রষ্ট হতে দেখি, কাপুরুষের মতো মাথা নোয়াতে দেখি, তখন সার্ত্র্-এর দিকে তাকিয়ে আশ্বাস পাই।

বিভিন্ন সংবাদসূত্র থেকে পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের যে কারণগুলি জানা গেছে, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। রয়টার প্রচারিত সংবাদ অনুসারে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, "লেখক রাজনৈতিক বা সাহিত্যসংক্রান্ত যে-ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন, তিনি কেবল একমাত্র মাধ্যম লিখিত শব্দের মধ্য দিয়েই তাঁর কর্ম সাধন করতে পারেন। আমার দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রত্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। লেখক কোনো সম্মান লাভ করলে সেই সম্মান তাঁর পাঠকদের উপর যে-চাপ সৃষ্টি করে, আমি তা অনভিপ্রেত মনে করি। জঁ-পল সার্ত্র্ বলে নাম স্বাক্ষর করা আর নোবেল পুরস্কারজয়ী জঁ-পল সার্ত্র্ বলে নাম স্বাক্ষর করা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।" এই ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিষয়গত কারণও তিনি দিয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সোভিয়েত বা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও মার্কিন-পশ্চিম ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী) মধ্যে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সংঘাত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই চলতে পারে। "এই সংগ্রাম মানুষ ও তাদের সংস্কৃতির মধ্যেই চলবে। তাতে কোনো প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। এই দুই সংস্কৃতির মধ্যেকার বিরোধ সম্পর্কে আমি নিজে গভীরভাবে সচেতন। আমার সমর্থন দ্বিধারহিতভাবেই সমাজবাদ বা তথাকথিত পূর্ব জোটের পক্ষে। কিন্তু আমি জন্মেছি ও বড় হয়েছি যাঁদের সঙ্গে, তাঁরা সকলেই এই দুই সংস্কৃতিকে পরস্পরের আরো কাছে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু আমি নিশ্চিত আশা করি যে, সেরা নীতি

সমাজবাদেরই জয় হবে। আমি তাই পূর্ব বা পশ্চিমের কোনো উদ্যোগী সংস্কৃতিসংস্থারই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি না।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের লিতেরাতুর্নায়া গেজেতা-র (২৪শে অক্টোবর; ১৯৬৪) সংবাদ অনুসারে (শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত) সার্ত্র সাংবাদিকদের আরো বলেছেন: "বর্তমানে নোবেল পুরস্কার বাস্তবে পশ্চিমের সর্ব শ্রেণীর লেখক ও পূর্বের বিবাদী লেখকদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়েছে। উদাহরণত, এ-পুরস্কার আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিমান কবিদের মধ্যে অন্যতম পাবলো নেরুদাকে দেওয়া হয়নি। লুই আরাগঁ নিশ্চিতভাবে এ পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও, এখনও তাঁর কথা ভালো করে উঠলই না। এ বড় দুঃখের কথা যে, শলোখভের আগে পাস্তেরনাক পুরস্কার পেলেন, এবং যে একমাত্র সোভিয়েত গ্রন্থ এ পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করল, সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রকাশিত।"

সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'দ প্রব্লেম অফ্ মেথড্'-এ সার্ত্র মার্কসবাদকে এ যুগের একমাত্র দর্শন বলে ঘোষণা করেও অস্তিত্ববাদের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মার্কসবাদের অধুনাতন প্রয়োগ সম্পর্কে যে সমালোচনা উপস্থিত করেছেন, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সার্ত্র অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনপর্বে দর্শনকে নিরাপত্তা তথা ঐক্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার তাগিদের কাছে পিছু হটে যেতে হয়েছে। এই পর্বে তত্ত্ব ও কর্মের ভেদের ফলেই তথ্যকে এড়িয়ে কন্‌সেপ্টের বন্ধনে সর্ব জটিলতার সরলীকরণের ঝোঁক এসে পড়েছে। সার্ত্র-এর এই বিচার অনুসরণ করলে মার্কসবাদ ও আধুনিক সমাজতত্ত্বের মধ্যে কোনো যোগসূত্র রচনা হয়তো সম্ভব হতে পারে। তাতে চিন্তায় নতুন রিয়্যালিজম্-এ পৌছনো যেতে পারে। এই সম্ভাবনা বিচার করে দেখবার দায় মার্কসবাদীদের গ্রহণ করতে হবে।

জীবনের মূল্য সম্পর্কে যাঁরা সদা সচেতন নন, জীবনচিন্তার দায়কে যাঁরা জীবনের সবচেয়ে বড় দায় বলে মানতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সার্ত্র একদা 'স্কাঙ্কস্' বলে বর্ণনা করেছিলেন। সেই সৌখীন 'ফর্ম'-বিলাসী শিল্পব্যবসায়ী, 'স্কাঙ্কস্'কুলের অটল আত্মসন্তুষ্টিকে সার্ত্র আবার আঘাত করলেন। তবু কি এদেশে এখনও ক্লাইভ বেলের জরাজীর্ণ ভূত বুদ্ধিজীবিদের একাংশের স্কন্ধ থেকে নামবে না? এত জল বয়ে গেল, তবুও শোনা যাবে, "ফর্মেই তো যত মূল্য নিহিত!" সার্ত্র-এর দিকে তাকিয়ে ভাবি, চিন্তা কত এগিয়ে গেল, কত গভীরভাবে জীবনসম্পৃক্ত হল, মানবিকবাদের জয়যাত্রায় কত কীর্তি গ্রথিত হল, তবু আমাদের শিক্ষা এত অসম্পূর্ণ, এত পুরাতন!

—অমিতাভ ভট্টাচার্য

বিয়োগপঞ্জী

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শারদীয় সংখ্যা বিয়োগ-ছায়ার মধ্যেই আমাদের প্রস্তুত করতে হয়েছে। বিয়োগব্যথা উৎসব পেরিয়েও বিলুপ্ত হয় না। সশ্রদ্ধ মনে তাই তাঁদের এখনো স্মরণ করতে হয়।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (জন্ম ২।৫।১৮৮২ ইং); ৮২ বৎসর অতিক্রম করেও আমাদের মধ্যে সগৌরবে এতদিন বর্তমান ছিলেন—এবার বিদায় নিয়েছেন। সুপণ্ডিত চিন্তানায়ক বাঙলা দেশে এখন আর বেশি নেই। তাঁর পরে তাঁর কালের সেই অগ্রণী মনস্বীদের মধ্যে আর কেউ বোধহয় রইলেন না। সে কালটাও তুচ্ছ ছিল না। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধ অনেকের দানে সমুজ্জ্বল। সেই মনস্বীদের মধ্যেও নরেশচন্দ্র ছিলেন অনেক বিষয়ে অনন্যসাধারণ। আইনজীবী হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি বিচার-বিশেষজ্ঞ ও আইন-বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানেই তা শেষ হয় নি। আইনের পিছনে যে সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ-চেতনা, তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেদিকেও ছিল সচেতন। আর আইনজ্ঞের দায়িত্ববুদ্ধি সেখানেও শুধু বিশ্লেষণে তৃপ্ত হত না, সক্রিয় ছিল সেই সমাজমানসের উদ্বোধনে, তার পরিমার্জনায়, তার সংস্কারে, তার কল্যাণকর বিকাশে। তাই বহুবিধ রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মে তিনি তাঁর মূল্যবান্ সময় ও কঠিন পরিশ্রম দান করতে ত্রুটি করতেন না। সে যুগ চলে গিয়েছে—অথবা, বাঙলার কৃষক-সংকট দেখে মনে হয়, সে সমস্যার ওপরে শুধু বিভ্রান্তির কুয়াশা চেপে বসেছে, আসলে তার সমাধান হয় নি। জমিদারতন্ত্রী বাঙালী সমাজের কৃষক-সমস্যার স্বরূপ যাঁরা নির্ভুল ও নির্ভীক ভাবে নির্ণয় করেছিলেন, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত লাভক্ষতির কথা মনে না রেখে কৃষক-আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করতেও দ্বিধা কবেন নি, তাঁদের মধ্যে ডাক্তার নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অতুল গুপ্ত মহাশয়দের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের যুক্তিবাদী, মানবিক চেতনা শুধু কলকাতা হাইকোর্টকে গৌরবান্বিত করেনি, দেশেব জনসাধারণকেও ঋণবদ্ধ করেছে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তাঁরা সমাজে, সাহিত্যে বহুদিকে অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীর কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের ইংরেজী-বাঙলা বহু লেখা ও বক্তৃতার পঞ্জীও আজ

সুলভ নয়, কিন্তু তা করা প্রয়োজন। শুনেছি, সে তালিকা অনায়াসে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। তাঁর প্রধান ধর্ম হল—প্রগতিবাদের অনুশীলন ও প্রচার—যখন পর্যন্ত প্রগতির অর্থও পরিষ্কার হয় নি, সমাজে সাহিত্যে প্রগতির প্রয়াসও রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই প্রগতিধর্মেরই প্রধান হোতা। কিন্তু ঐহিকতার (secularism) যে পথে প্রগতিবাদের প্রকাশ সুনিশ্চিত হয়, তা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো যুক্তিবাদী মনস্বীর ভাবনায় ও রচনায়। এদিকে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) তাঁর ভয়ডর ছিল না। জীবনের সমস্যাকে ও সমাজের প্রশ্নকে তিনি অভ্রান্ত ভাষায় ও ভাবে পরিবেশন করতেন,—শুধু প্রবন্ধে নয়—গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। সেজন্য তাঁকে সেদিনে রুচিবানদেরও বাক্যবাণ সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু নরেশচন্দ্র তাতে পশ্চাদ্‌পদ হন নি। আজ অবশ্য অন্যান্য সাহিত্যের অনুসরণে বাঙলা সাহিত্যেও বে-আব্রুতার উদাত্ত নৃত্য দেখা যায়; তার পাশে নরেশচন্দ্রের সেদিনকার দুঃসাহসকে মনে হবে সেকেলেপনা। নরেশচন্দ্রের সেদিনকার প্রয়াসের যথার্থ মূল্য বোঝা আজ তাই অপেক্ষাকৃত সহজ। বুঝতে পারি, তিনি জীবনকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখবার ও সমাজকে শুভবুদ্ধিতে পরিচালনা করবার একটা ঐতিহ্য বাঙলা সাহিত্যে দান করে গিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা সামান্য নয়; কিন্তু তার চেয়েও বড় তাঁর এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য, যুক্তিনিষ্ঠ, সমাজ-বুদ্ধি, সর্ব বিষয়ে প্রগতিমুখিতা। সেখানে নরেশচন্দ্র আধুনিক ভাবনার নির্ভীক ও অক্লান্ত পথিকৃৎ বলে গণ্য হবেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থি

প্রেমাঙ্কুর আতর্থি (জন্ম ১৮৯০, মৃত্যু ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৪) বা 'বুড়োদা' পরিণত বয়সে আমাদের মায়া কাটিয়ে গিয়েছেন। সম্ভবত, কথাটা ভুল হল। কারণ, 'বুড়োদা' তাঁর আত্মীয়, বন্ধু বা পৃথিবীব কোনো মানুষেরই মায়া কাটাতে পারেন, একথা আমরা অন্তত মনে করি না। দুঃসাহসী আদর্শবাদী ব্রাহ্মপিতার সন্তান হলেও প্রেমাঙ্কুরের আদর্শবাদ রূপ নিয়েছিল এক সরস স্বাভাবিক মানবীয় মমতায়। ভালো-মন্দ সুদ্ধ মানুষকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণে তাঁর কোনো বাধা হত না। আর ভালো-মন্দ সুদ্ধ এই পৃথিবীর অদ্ভুত জীবনকে স্বীকার করতেও তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না।

তাঁর একখানা ছোটগল্পের বই-এর নাম 'বিচিত্র লোক',—নামটিতেই তাঁর মনের ছাপ আঁকা। আর একখানা ছোটগল্পের বই-এর নাম 'স্বর্গের চাবি'—গল্পগুলি পড়লে তাঁর মনের চাবিও হাতে এসে পড়ে। উপন্যাস তিনি লিখেছেন, ছোটগল্প তিনি লিখেছেন, আর, 'নিউ থিয়েটার্সের' পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকদিন ছায়াছবিও তিনি রচনা করেছেন। এ সবের মধ্যে তাঁর একটা পরিচয় পরিষ্কার ভাবেই থাকবে। কিন্তু আরেকটা পরিচয় বোধহয় তাতে ধরা যাবে না।—সেই 'ভারতীর দলের' মানুষদের থেকে আরম্ভ করে একালের সাহিত্যিকদের আড্ডায়ও যে মানুষটি সমান স্বচ্ছন্দ,—গল্পে-আড্ডায়-কথায়-হাসিতে সকলকে মাতিয়ে রাখেন, নিজেও মেতে থাকেন,—সেই বুড়োদা'র রূপ খুঁজতে যেতে হবে অন্যত্র। হয়তো তাঁর সেই প্রীতিভাজন ও স্নেহ-ভাজনদেরই মনে-মনে খুঁজতে হবে সেই চিত্রের রূপ ও রেখা। তবে, সেই বুড়োদাকেও অনেকটা পাওয়া যাবে 'মহাস্থবির জাতকে'। এইজন্যই 'মহাস্থবির জাতকে'র তিনখণ্ড বাঙলা সাহিত্যে একটি অসামান্য সম্পদ হয়ে থাকবে চিরদিন। আর, আমরাও বলব—বুড়োদা পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারেন নি ॥

গোপাল হালদার

অপরিচিত অন্ধকারে

অজাতশত্রু

কলাবিলাসিনী প্যারিস থেকে মধ্যপ্রাচ্যের রোমাঞ্চকর ভূখণ্ড জুড়ে এই অন্ধকারের পটভূমি। দেশবিদেশের বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে এই অনন্য উপন্যাসে। খণ্ড বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশ নয়, অন্ধকারের নিরাবরণ উন্মোচনে প্রতিটি চরিত্র নতুন পরিচয়ের আলোকে দীপ্ত।

দাম: ছয় টাকা

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যকলা প্রসঙ্গে প্রথিতযশা শিল্পীর গভীর শিল্পজ্ঞান-সমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৬৫টি শুদ্ধমুদ্রার চিত্র ও অসংখ্য আর্টপ্লেট-সমৃদ্ধ শোভন সংস্করণ।

দাম: বারো টাকা

পাখিরা-পিঞ্জরে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শক্তিমান লেখক আধুনিক মানুষের যে আলেখ্য এই অসাধারণ উপন্যা[সে]
করেছেন, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রবাহে তা নতুন চিন্তার সূচন[া]

দাম: সাড়ে তিন টাকা

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস। লেখিকার সুদীর্ঘ ল[...]
অভিজ্ঞতা বহু আলোচিত এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্র[...]
নিঃশেষিতপ্রায়।

দাম: সাত টাকা

নবপত্র প্রকাশন ॥ ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকা[তা]

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প রি চ য়

অগ্রহায়ণ :: ১৩৭১

MANISHA GRANTHALAYA (PVT.) LTD.,

4/3B, BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-12

NATIONAL BOOK AGENCY (PVT.) LTD.,

12, BANKIM CHATTERJEE STREET. CALCUTTA-12

ন্যাশনালের প্রকাশিত

● জে. ভি. স্তালিন ●

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	০'৪০
অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল	০'৫০
সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিনীতির সমস্যাবলী	০'২৫
সর্বহারা শ্রেণী ও সর্বহারা পার্টি	০'১২

● ভি. আই. লেনিন ●

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে	৮'০০
জাতীয় কর্মনীতির প্রশ্নাবলী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ	৩'৭৫
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন	১'৫০
কী করিতে হইবে	২'০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর

কালান্তর

প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাপ্তাহিক

দাম: ২০ ন. প.

চাঁদার হার:

বাৎসরিক ১০৲ টাকা ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা

●

হীন কৌশল ও ভিত্তিহীন অভিযোগ—এস্. এ. ডাঙ্গে মূল্য ২০ পয়সা
কমিউনিস্ট পার্টির মতভেদ কি নিয়ে—ভবানী সেন মূল্য ৪০ পয়সা
জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন— মূল্য ২০ পয়সা

অফিসের ঠিকানা:
৫৯।১।বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

নবপত্রের বই

অপরিচিত অন্ধকারে

অজাতশত্রু

কলাবিলাসিনী প্যারিস থেকে মধ্যপ্রাচ্যের রোমাঞ্চকর ভূখণ্ড জুড়ে এই অন্ধকারের পটভূমি। দেশবিদেশের বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে এই অনন্য উপন্যাসে। খণ্ড বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশ নয়, অন্ধকারের নিরাবরণ উন্মোচনে প্রতিটি চরিত্র নতুন পরিচয়ের আলোকে দীপ্ত।

দাম : ছয় টাকা

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যকলা প্রসঙ্গে প্রথিতযশা শিল্পীর গভীর শিল্পজ্ঞান-সমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ-বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৬৫টি শুদ্ধমুদ্রার চিত্র ও অসংখ্য আর্টপ্লেট-সমৃদ্ধ শোভন সংস্করণ।

দাম : বারো টাকা

পাখিরা-পিঞ্জরে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শক্তিমান লেখক আধুনিক মানুষের যে আলেখ্য এই অসাধারণ উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রবাহে তা নতুন চিন্তার সূচনা করবে।

দাম : সাড়ে তিন টাকা

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস। লেখিকার সুদীর্ঘ লণ্ডনবাসের অভিজ্ঞতা বহু আলোচিত এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

দাম : সাত টাকা

নবপত্র প্রকাশন ॥ ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

পরিচয়

নিম্নলিখিত পুরনো সংখ্যাগুলি আছে

১৩৫৬ মাঘ, চৈত্র।

১৩৫৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন।

১৩৫৮ শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র।

১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফালগুন।

১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, চৈত্র।

১৩৬১ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, মাঘ।

১৩৬২ সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৩ শ্রাবণ, শারদীয় ছাড়া অন্য সবগুলি পাওয়া যাবে। মাঘ থেকে বারো আনা পৌষ (মানিক-স্মৃতি-সংখ্যা)

১৩৬৪ শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৫ বৈশাখ, শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৬ সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৭ শ্রাবণ ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৮ বৈশাখ, ফালগুন ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে। ফালগুন সংখ্যা থেকে ১.০০ দাম।

১৩৬৯ শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

ও

পরিচয় জয়ন্তী গল্প সংকলন

পরিচয়—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মনীষার প্রথম বই

অধ্যাপক **হীরেন মুখার্জির**

দি জেণ্টল কলোসাস

এ স্টাডি অব জওয়াহরলাল নেহরু

পনেরো টাকা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাভিদ — মাইকেল এঞ্জেলো

পরিচয়
বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৫

প্রভাস সেন

মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প ও শিল্পচিন্তা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে প্রতাপশালী মেদিচি পরিবার তাঁদের বাগানে যে ভাস্কর্য বিদ্যালয় খুলেছিলেন, লোরোন্সো দেই মেদিচি সেখানে ১৪।১৫ বছর বয়সের একটি ছেলেকে এনে ভর্তি করে দিলেন। ছেলেটি তেরো বছর বয়স থেকে দোমেনিকে ঘিবলানদাইও নামের এক শিল্পীর কাছে শিক্ষানবীশ হিসেবে ছবি আঁকা শিখছিল কিন্তু তার ঝোঁক ছিল মূর্তি করার দিকেই বেশি। মেদিচিদের বাগানে বিখ্যাত ভাস্কর দোনাতেল্লোর এক প্রবীণ শিষ্যকে গুরু পেয়ে ছেলেটি দোনাতেল্লোর কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করবার নেশায় মেতে উঠল। ছেলেটির নাম মাইকেল এঞ্জেলো।

জগদ্‌বিখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর মৃত্যু হয় ঠিক চারশ' বছর আগে ১৫৬৪ সালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উননব্বই বছর। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি যে ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যের চর্চা করে গিয়েছেন আজও পৃথিবীর শিল্পভাণ্ডারে তা অমূল্য সম্পদ। মেদিচির শিল্প-বিদ্যালয়ে ভাস্কর্যের আঙ্গিকের শিক্ষার সঙ্গে মাইকেল প্লেটোর দর্শনের চর্চায় গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি "ক্রিশ্চিয়ান প্লেটোনিস্ট" ছিলেন বলা যেতে পারে। দান্তের কাব্যদর্শনও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দী ছিল ইতালির শিল্প-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ও ফ্লোরেন্স নগর ছিল সেই যুগের পীঠস্থান। একই কালে মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও রাফায়েল-এর মতো তিন দিক্‌পালকে আমরা ফ্লোরেন্সে দেখতে পাই। ফলে পূর্বযুগের খ্রীষ্টিয় শিল্পরীতির আড়ষ্ট নিয়মকানুনের বন্ধন ভেঙে

যে নতুন প্রেরণার জোয়ার আসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মাইকেল এঞ্জেলোর ঝটিকাবিক্ষুব্ধ আত্মা এই নতুন জোয়ারের একটি প্রধান উৎস ছিল। ভাস্কর্য, ছবি ও শেষজীবনে স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর আত্মিক প্রকাশ রেখে গেছেন।

শিল্প-আন্দোলনের একটা যুগসন্ধিক্ষণে মাইকেল এঞ্জেলোর মতো মহান শিল্পীর শিল্পচিন্তা সম্বন্ধেও স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসা জাগে। শিল্পীর লেখা কিছু কবিতা ও নানা লোকের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় বা আলোচনা ইত্যাদির যা বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি থেকে শিল্পীর শিল্পচিন্তা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা করতে পারি।

লোরোনজো দেই মেদিচি যিনি কিশোর মাইকেলকে মেদিচিদের শিল্প-বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি ছাত্রাবস্থায়ই শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁকে নানারকম ভাস্কর্যের কাজ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে ও আর্থিক সাহায্য করে। এ সময়কার কাজের ভিতর খোঁজ পাওয়া যায় মার্বেলের তৈরি সেন্তৌরমাচিয়া (কাসা বুয়োনারতি, ফ্লোরেন্স। বুয়োনারতি মাইকেল এঞ্জেলোর পারিবারিক নাম)। কাজটির বিষয়বস্তু ও মূর্তির আঙ্গিক পুরনো ধরনের হলেও রচনাকৌশলের মৌলিকত্ব শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেয়।

১৪৯২ সালে লোরনজোর মৃত্যু হয়। লোরনজোর গুণাবলী তাঁর উত্তরাধিকারী পান নি। ফ্লোরেন্সের লোকেরা নতুন মেদিচির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল আর বিপ্লবের আশঙ্কা করে ১৪৯৪ সালে মাইকেল এঞ্জেলো 'ফ্লোরেন্স' থেকে 'বোলোনা'তে সরে এলেন।

বোলোনাতে শিল্পী দুটি সন্তমহাপুরুষের মূর্তি ও একটি দেবদূতের মূর্তি করবার কাজ পেয়েছিলেন।

বছরখানেক পরে ফ্লোরেন্সের নাগরিক পরিষদের কাজে নিমন্ত্রিত হয়ে শিল্পী আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এসেছিলেন। তিনি এই সময় ছোটখাট অনেকগুলি কাজ করেন এবং মেদিচি পরিবারের আর-একজন শিল্পামোদীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই বন্ধুটিকে আমোদ দেবার জন্য তিনি পুরনো মূর্তির অনুকরণে একটি কিউপিডের মূর্তি তৈরি করেন। মূর্তিটি প্রচুর টাকা দিয়ে রোমের একজন কার্ডিনাল সত্যিই পুরনো জিনিস ভেবে এক মূর্তির কারবারির কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। অবশ্য পরে বুঝতে

পেরে কারবারিটির কাছ থেকে সুদে আসলে টাকা আদায় করে নেন। এই ঘটনা থেকেই কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোর রোমের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

রোমক কার্ডিনালটি শিল্পীর পরিচয় জেনে মাইকেলকে আশ্বাস দেন যে তিনি যদি রোমে আসেন তবে পোপের দরবারে তিনি তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। রোমে পৌছে কিন্তু মাইকেল এঁর সাহায্য কিছুই পান নি বলে শোনা যায়। আর-একজন অভিজাতবংশীয় লোকের বন্ধুত্ব ও সহায়তায় তিনি ফরাসী কার্ডিনাল 'জঁ্য দে ভিলি-এর দে লা গ্রোলেই-এর সমর্থন লাভ করেন। এই দু'জন পৃষ্ঠপোষকের জন্য তিনি একটি 'কিউপিড' (সম্ভবত ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে যে-'কিউপিড'টি আছে সেটাই), একটি 'বাচ্চুজ্' (Bacchus। বারগেল্লো—ফ্লোরেন্স) এবং একটি 'পিয়েতার' (Pieta। সেণ্ট-পিটারের গির্জা—রোম) মূর্তি তৈরি করেন। রচনা-কৌশলের মৌলিকত্বে ও আঙ্গিকের সুনিপুণ প্রয়োগে এদের প্রত্যেকটিই সার্থক শিল্পসৃষ্টি। মাইকেল এঞ্জেলোর প্রথম রোম-প্রবাসের একটি কারণ বোধহয় ছিল তৎকালীন ফ্লোরেন্সের বহুদিনব্যাপী রাজনৈতিক অশান্তি। প্রথম পর্যায়ে ১৪৯৬ থেকে ১৫০১ সাল পর্যন্ত শিল্পী রোমে বাস করেন। ফ্লোরেন্সের গোলোযোগে তাঁর পিতা—গরীব ভূস্বামী—তাঁর শুল্ক বিভাগের চাকরিটি হারান ও সপরিবারে মাইকেল এঞ্জেলোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন এবং মাইকেল এই সময় বহু কষ্ট সহ্য করে পরিবার পোষণ করেছেন।

নিজেদের পরিবার সম্বন্ধে মাইকেলের একটি অটল কর্তব্যবোধ ছিল। যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কোনও সময়ই কোনো পারিবারিক দায়িত্ব থেকে তিনি পিছুপা হন নি।

১৫০১ সালে শিল্পী ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন এবং সিয়েনাতে পোপ 'দ্বিতীয় পিউস'-এর স্মৃতি-মন্দিরের জন্য কতকগুলি মূর্তি তৈরির কাজ হাতে নেন। এই স্মৃতিমন্দিরের যে চারটি মূর্তি এখন পাওয়া যায় সেগুলি সম্পূর্ণ মাইকেলের হাতের কাজ মনে হয় না। সম্ভবত এ কাজগুলি তিনি সহকারীদের হাতেই অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং নিজে ফ্লোরেন্সে 'দাভিদ'-এর বিশাল মূর্তিটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

দাভিদের মূর্তিটি পাথরে কাটতে শুরু করেছিলেন আর-একজন ভাস্কর প্রায়

চল্লিশ বছর আগে। প্রকাণ্ড পাথরটি একটি ব্যর্থ কাজের প্রতীক হিসেবে পড়েছিল। একটি ব্যর্থ ও দুর্বল কাজকে ভেঙে-চুরে তা থেকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সৃষ্টি করা মাইকেলের মতো বিশাল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। দাভিদের যে প্রস্তরময় রূপ শিল্পী দিলেন তা হল শক্তি প্রয়োগের জন্য ব্যগ্র, উত্তেজনায় কঠিন পুরুষের সুষম যৌবনমূর্তি। মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। দাভিদের মূর্তির অপূর্ব অভিব্যক্তি, করণকৌশলের অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় আর পূর্ব ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে গঠনের স্বাধীনতা—মাইকেল এঞ্জেলোকে ফ্লোরেন্সের শিল্পীমহলে ইতালীয় নবজাগরণের একজন নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এ যুগের অন্যান্য কাজের ভিতর একজন ফরাসী সেনানায়কের জন্য ব্রঞ্জের তৈরি একটি দাভিদের খবর পাওয়া যায়। মূর্তিটি ১৫০৮ সালে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে এর কোনও খবর পাওয়া যায় না। সমসাময়িক অন্য প্রসিদ্ধ কাজগুলি হল সন্ত ম্যাথ্যুজ-এর প্রকাণ্ড অসমাপ্ত মূর্তি, একটি মাতৃমূর্তি এবং দুটি শিশু খ্রীষ্ট ও মাতা মেরীর relief মূর্তি। শিল্পী সন্ত ম্যাথ্যুজ-এর মূর্তি করতে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের ক্যাথেড্রেলের জন্য, কিন্তু শেষ করেন নি। মাতৃমূর্তিটি আছে ব্রাগ (Bruges)-এর নতরডাম গির্জায়। রিলিফ দুটির একটি আছে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ও অন্যটি আছে ফ্লোরেন্সের বারগেলোতে। মূর্তির কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী তাঁর ছবির কাজও অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এ সময়ে অঙ্কিত তাঁর 'Holy family' আজকের উফিৎসি গ্যালারির (ফ্লোরেন্স) অমূল্য সম্পদ। দাভিদের মূর্তি যে-বছর শেষ হয় সেই বছরেই মাইকেল একটি বড় দেওয়াল-চিত্রের কাজ পান। নগর পরিষদের দেয়ালের জন্য লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একটি প্রকাণ্ড চিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন—বিষয় : 'আংঘিয়ারির যুদ্ধ'। মাইকেল আহূত হলেন ঐ সঙ্গে অপর একটি দেয়াল চিত্রিত করবার জন্য। মাইকেল পিসার যুদ্ধের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিত্রটি করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল ফ্লোরেন্সের স্নানরত সৈন্যদল হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করছে। চিত্রটির খসড়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এ সময় পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের ডাকে ১৫০৫ সালে তাঁকে রোমে চলে যেতে হয়। স্নানরত সৈন্যদের এই অসম্পূর্ণ কিন্তু অপূর্ব ছবিটিতে প্রথম তাঁর অঙ্কনশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঝঞ্ঝাকুল অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাশ—

এঞ্জেলোর পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সর্বদা পাওয়া যায়। আর দেখা যায় আঙ্গিকের উপর তাঁর অসাধারণ দখল এবং কল্পনার সঙ্গে আঙ্গিকের সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধনের ক্ষমতা। রোমে পোপ জুলিয়াস শিল্পীকে তাঁর সমাধি-মন্দির তৈরির কাজে নিয়োজিত করেন এবং মাইকেলও স্বভাবসিদ্ধ উত্তম নিয়ে কাজে লেগে যান।

পোপ কিছুদিন উৎসাহ নিয়ে এঞ্জেলোর কাজকর্ম লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কারারার মার্বলখনি থেকে পাথর এনে কাজ শুরু করবার কিছুদিনের ভিতরই পোপ তাঁর মত পরিবর্তন করেন। ভাটিকানের সন্ত পিতরের গির্জা এই সময় পুনর্নির্মাণ করান হচ্ছিল। স্থপতি ছিলেন মাইকেলের প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন। মাইকেল বড় ফ্রেস্কো করতে অপারগ মনে করে, তাঁকে অপদস্থ করবার ইচ্ছায় স্থপতিটি মাইকেলকে গির্জার Sistine Chapel-এ ফ্রেস্কোর কাজে লাগাবার জন্য পোপকে উদ্দীপ্ত করেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে শিল্পী তাঁর সদ্য প্রারব্ধ ভাস্কর্যের কাজ ছেড়ে এই চিত্রের কাজ শুরু করতে বাধ্য হন। পোপ জুলিয়াস ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালি লোক। সিস্টাইন চ্যাপেলের কাজ শুরু হবার কিছুদিন পর তিনি হঠাৎ যুদ্ধবিগ্রহের নেশায় মেতে উঠলেন এবং মাইকেলকে কাজের জন্য টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। জেদী মাইকেলও সমস্ত কাজ ফেলে রেখে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে এলেন। বহু সাধ্যসাধনা, অর্থব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পোপ তাঁকে আবার রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

মাইকেল নিজেকে চিত্রশিল্পী মনে করতেন না এবং শত্রুরা যে তাঁকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছিল সেটা জানা থাকা সত্ত্বেও পোপের নির্দেশে তিনি এই কাজের ভার নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে গৃহীত এই কাজ কিন্তু আজ সারা পৃথিবীতে মাইকেলের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে স্বীকৃত। সিস্টাইন চ্যাপেলের-এর ভিতবের ছাতের ফ্রেস্কোগুলি বোধহয় শিল্পীব একমাত্র সৃষ্টি যা তিনি নিজের মনমতো করে সম্পূর্ন করে গিয়েছেন। সিস্টাইন চ্যাপেলের কাজে মাইকেল এঞ্জেলোব সৃষ্টিশক্তির চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক চিত্ররীতির ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে শিল্পী মানুষের শরীর ও অবয়ব নিয়ে যতরকম সম্ভব রূপসৃষ্টি করে গিয়েছেন। মানুষের শরীর নিয়ে শিল্পী বিরাট কল্পনা ও অসামান্য রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর চিত্রে মানুষের মুখে ভাবব্যঞ্জনার অতুলনীয় মহনীয়তা ও

বিভিন্নতার প্রকাশ পেয়েছে। দান্তে ও প্লেটোর ভাবে উদ্দীপ্ত এই বিরাট শিল্পীর আত্মার ঝঞ্ঝাদীর্ণ ভাবপ্রবণতা, আদর্শবাদী বিক্ষুব্ধি ও উদ্বিগ্ন আত্ম-জিজ্ঞাসা সিস্টাইন চ্যাপেলের চিত্রে স্তবে স্তরে ব্যক্ত হয়েছে। সিস্টাইন চ্যাপেলের কাজ শেষ হতেই মাইকেল আবার পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধিবেদীর কাজে হাত দেন—কিন্তু নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত এই সমাধিবেদীর জন্য এ সময়ে তৈরি মাত্র তিনটি মূর্তির আমরা খোঁজ পাই। রোমে সন্ত পিয়েত্রোর গির্জায় রক্ষিত মোজেস-এর মূর্তি আর পারীর ল্যুভরে রক্ষিত দুটি ক্রীতদাসমূর্তি। তিনটিই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীক। ১৫১৬ সালে মাইকেল পোপ দশম লিও-র আজ্ঞায় ফ্লোরেন্সের সান লোরেঞ্জো (San Lorenzo) গির্জার অলংকরণের কাজ গ্রহণ করেন। বিশাল ভাবে পরিকল্পিত এই অলংকরণের কাজও বহু অসুবিধার ভিতর দিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পর মাইকেল ফ্রান্স, বোলোনা, জেনোয়া ও রোম থেকে নানা কাজের জন্য অনুরুদ্ধ হন কিন্তু ১৫১৮ থেকে ১৫২২-এর ভিতর পোপ জুলিয়াসের সমাধির জন্য করা আরো চারটি ক্রীতদাসমূর্তি ছাড়া তিনি অন্য কিছু করেছিলেন কিনা জানা নেই।

১৫২২ থেকে ১৫৩৪ সাল পর্যন্ত মাইকেল আবার ফ্লোরেন্সে বাস করেন। এবার তিনি মেদিচি পরিবারের জন্য একটি পুস্তকাগার ও গির্জার নক্সা করেন ও গির্জার ভিতরের সমাধিবেদিগুলির জন্য মূর্তির কাজ করেন।

১৫২৯ সালে বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন মাইকেল শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্লোরেন্সের দুর্গরক্ষা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং এর কিছুদিন পর অল্প সময়ের জন্য তিনি ভেনিসে রাজদূতের কাজও করেছিলেন।

নানা রাজনৈতিক গোলযোগের ভিতর দিয়ে মাইকেল ১৫৩৪ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সে থাকেন এবং যতদূর সম্ভব মেদিচিদের সমাধিমন্দির আর পুস্তকাগারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি ১৫৩৪ সালে ফ্লোরেন্স ত্যাগ করবার পর তাঁর ছাত্ররা বাকি কাজ শেষ করেন। মেদিচি স্মৃতিসৌধের কাজগুলির ভিতর একটি মাতৃমূর্তি ও স্ত্রী-পুরুষের অর্ধশায়িত মূর্তি-উৎকীর্ণ বেদীকার উপর মৃত ব্যক্তির মূর্তিসহ দুটি মূর্তিসমষ্টিকে মোজেসের সমগোত্রীয় শক্তিশালী কাজ বলা চলে। এই সময়ের অন্যান্য কাজের ভিতর মার্বেলে তৈরি একটি বিজয়ী বীরমূর্তি ফ্লোরেন্সের জাতীয় কলাশালায় রক্ষিত আছে। হারকিউলিস ও কাকুস ও সামসন ও ফিলিস্টাইনের নক্সা আছে বর্তমানে যথাক্রমে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও

অ্যালবার্ট কলাশালায় ও মাইকেল এঞ্জেলোর স্মৃতিসৌধ ফ্লোবেন্সেব কাসা বুয়োনারোতিতে। মার্বেলের তৈরি একটি অসম্পূর্ণ বালক মূর্তি আছে সেণ্ট পিটাবস্‌বার্গ-এ।

১৫৩৪ সালে মাইকেল রোমে আসেন ও বাকি জীবন এইখানেই কাটান। রোমে বসবাসের এই পর্যায়ের প্রথম সাত বছব তিনি পোপের নির্দেশে প্রধানত সিস্টাইন চ্যাপেলে 'শেষ বিচাব' (Last Judgment)-এর বিশ্ববিখ্যাত বিশাল চিত্রের কাজে ব্যস্ত থাকেন। এর পব ১৫৪৯-৫০ সালে মাইকেল দুটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি করেন। যার একটি হল বেদনাকীর্ণ পিয়েতার অপূর্ব অসম্পূর্ণ মূর্তিটি, অন্যটি পিয়েতার একটি সমষ্টিমূর্তি (group)। মাইকেল তাঁর নিজের সমাধির জন্য এটিকে উৎসর্গ করে যান।

উপবে উল্লিখিত প্রায় সব কাজগুলিব খসড়া হিসেবে মাইকেল নানা রকম চিত্র ও মূর্তি করেছেন। এগুলির বেশির ভাগই পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পসংগ্রহশালায় বহু যত্নে রক্ষিত আছে।

মাইকেল চরিত্রেব একটি দিক—তাঁর ঐকান্তিকতা বা দরদী ভাবপ্রবণতা তাঁর চিত্র বা ভাস্কর্যের ভিতর বিশেষ প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ষাট বছর বয়সের পর এই সঙ্গীহীন কঠোর শ্রমশ্রান্ত মহাধীমান মানুষটির আর-একটি সৃষ্টির উৎস খুলে যায়। ১৫৩৪-৩৫ সালে রোমের একটি কন্দর্পকান্তি প্রতিভাবান যুবককে তিনি কতকগুলি সনেট লেখেন—সমালোচকেরা যেগুলিকে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেন। এই সময় সুশীলা, সুধার্মিকা ও মহীয়সী মহিলা ভিক্তোরিয়া কলোম্বার সঙ্গে কবিশিল্পীর পরিচয় হয়। ভিক্তোরিয়ার ভাবসৌন্দর্য ও গুণাবলীতে মাইকেল মুগ্ধ হন এবং প্রধানত তাঁকে উপলক্ষ করেই তিনি ভিক্তোরিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত বহু সনেট ও কবিতা লিখেছেন। এইসব কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এতদিনের রুদ্ধদ্বার-দরদী মন গভীর অনুরক্তির সঙ্গে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে গিয়েছে। মাইকেলের এই কবিতাগুলির মধ্যে ভিক্তোরিয়ার গুণাবলীর কথা ছাড়া আমরা খ্রীষ্টধর্ম, প্লেটোর দর্শন, প্লেটোনিক ভালোবাসা ও শিল্পরহস্য সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা ও মতবাদ জানতে পারি।

মহাশিল্পী, ভাস্কর ও কবি মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনারতি ক্রমশ তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হলেন। ১৫৪৪ সালে নিজের অসুস্থতা ও ১৫৪৭ সালে ভিক্তোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর স্বাস্থ্য আর ফিরে আসে নি। ভাস্কর্যের শ্রমশীল কাজে অপারগ হলেও মাইকেল ক্রমশ স্থাপত্যকলায় আকৃষ্ট

হয়ে উঠলেন এবং এ-ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসামান্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন রোমের সন্ত পিতরের গির্জায় (St. Peter's Church)।

মাইকেল প্রধান স্থপতি হিসাবে এই বিশাল গির্জাটির নক্সা করেন এবং যদিও শেষ পর্যন্ত এর নক্সার অনেক অদল-বদল হয়—১৫৬৪ সালে মৃত্যুর পূর্বে মাইকেল এর প্রধান চূড়া ও তার আশেপাশের অংশ তাঁর নক্সামতো হতে দেখে গিয়েছিলেন।

কোনো শিল্পকর্মের মর্মার্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টা তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে কি বলতে চেয়েছেন সেটাও বোঝা দরকার। দুঃখের বিষয় যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, জস্থয়া রেনওস্ বা দেলাক্রোয় প্রমুখ দু চারজন ব্যতীত মহান্ শিল্পীদের ভিতর বিশেষ কেউই শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের মতামত বা প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করে লিখে বা বলে যান নি। মাইকেল এঞ্জেলোও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে যান নি। একাধিকবার তিনি বলেছেন যে শিল্প সম্বন্ধে কিছু লিখবার তাঁর বাসনা আছে। দোনাতে জিয়ানত্তির লেখা (১৫৪৬) 'দিয়ালোঘি' পুস্তকে আমরা পাই—মাইকেল লুইগি দেল রিচ্চিওকে বলছেন : "I have told you that I would, and I shall one way or another, if God will give me the time to do it." উননব্বুই বছর ব্যাপী দীর্ঘ জীবনেও অবশ্য তিনি এই সময় করে উঠতে পারেন নি। সুপণ্ডিত শিল্পী ভাসারি এর যে-কারণ দেখিয়েছেন তাই ঠিক মনে হয়। তিনি লিখেছেন যে মাইকেল তাঁর শিল্প-সম্বন্ধীয় বক্তব্য লিখে যান নি তার কারণ : "He mistrusted his ability to express in writing what he would have liked, not being trained in discourse."

প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা সম্বন্ধে শিল্পী যেরকম দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন সেই রকমই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তিনি নিজেব কবিতাগুলি সম্বন্ধে। নানা বিশেষণ যোগে তাদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে তিনি বলেছেন "এগুলি লিখে বুড়ো বয়সে আমি বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করছি।" অথচ তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা ও আজকের দিনের সমালোচকেরাও তাঁকে একজন সুনিপুণ সাহিত্যিক বলে মেনে নিয়েছেন।

শিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পিত লেখা হয়ে না উঠলেও মাইকেল-এর কবিতার ভিতর দিয়ে বা নানা জনের সঙ্গে কথাবার্তার যা বিবরণ পাওয়া যায় বা যে সব চিঠিপত্র তিনি লিখেছেন সেগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর শিল্প-সম্বন্ধীয় বক্তব্যের

মোটামুটি একটা ধারণা আমরা করতে পারি। রোমের লোকেদের নাস্তিকতা সম্বন্ধে শিল্পীর তীব্র অভিযোগ পড়লে তাঁর সৃষ্ট 'ক্রষ্টো প্যাডিস' অথবা 'ক্রষ্টো রিসোরতো' বুঝতে নিশ্চয় সাহায্য করবে। অটোগ্রাফ হিসেবে লেখা ছোট্ট একটা কবিতা পড়লে বোঝা যায় যে মেদিচি চ্যাপেলে রাখা দিনের চার প্রহরের মূর্তিগুলি শিল্পীর কাছে সময়ের বেগমাত্রা বা গতি সূচিত করত।

নানা জায়গায় ছড়ানো মাইকেল এঞ্জেলোর কবিতাগুলি ও তাঁর চিঠিপত্র, কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর শিল্প-চিন্তার একটি বিশদ বিবরণী তৈরির চেষ্টা বহুদিন থেকে ও বহুভাবে হয়েছে। এইসব বিবরণীর ভিত্তিতে সেই শিল্পচিন্তার সামান্য আভাস এই ছোট্ট প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মাইকেল এঞ্জেলোর মতে শিল্পের ধারক যে রূপ বা আকার তাকে বলা যায় ভাব-ধারণা বা ভাব-মূর্তি (conectti, immagini ও idee এই তিনটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন জায়গায় মোটামুটি একই কথা বোঝাতে)। প্লেটোর দার্শনিক ধারণাগুলির মতো এইসব রূপ বা আকার প্রকৃতির ভিতর বিদ্যমান থাকে। মানুষের উপলব্ধির বা অনুভূতির বাইরে হলেও এটা তাঁর মতে শাশ্বত সত্য। রূপ সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব—এবং মাইকেল এঞ্জেলোর বক্তব্যের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য ও শিল্প কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা যায়।

শিল্পীর অস্তিত্বের মূলে হল সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের সৃষ্টি তাঁর কাজ নয়, তাঁর কাজ হল প্রকৃতির ভিতর থেকে সৌন্দর্যকে চিনে বার করা ও সেই চির-বিদ্যমান সৌন্দর্যকে শিল্পরূপ দান করা। মাইকেলের নিও-প্লেটোনিক পরিভাষায় : "বাস্তব সৌন্দর্যের সামনে ভাবসৌন্দর্যকে উপস্থিত করানো।"

গিরোলামো সাভোনারোলা ছিলেন মাইকেলের একজন প্রিয় লেখক। তাঁর লেখা সৌন্দর্যের ক্ল্যাসিকাল সংজ্ঞা মাইকেল মানতেন মনে হয়—"Of what does beauty consist ? Colours ? No. The effigy ? No. Rather beauty is a form which results from the 'correspondence' of all members and colours. From this harmony there results a quality which the philosophers call beauty." গিরোলামো সাভোনারোলা একজন পাদ্রী ছিলেন। উপরের লেখাটি গির্জায় তাঁর একটি বক্তৃতার অংশ। মাইকেলের নিও-প্লেটনিক মতের প্রতিধ্বনি মিলবে তাঁর আর-একটি বক্তৃতায় যেখানে তিনি বলছেন : "Thus the beauty of man

and woman is greater and more perfect in so far as it is similer to the primary beauty."

মাইকেল এঞ্জেলোর দুটি সনেট পাওয়া যায় যার ভিতর দিয়ে শিল্পী কী ভাবে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করবেন সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে—সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি বা ধারণা হৃদয়ের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে এবং শিল্পীকে আবেগে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। একজন সুশিল্পী যখন সৌন্দর্যসৃষ্টির (বা নিও-প্লেটনিক ভাষায় Reproduction of beauty) চেষ্টা করেন তখন তিনি শুধু দৃশ্যমান সৌন্দর্যের নকল করেন না, দৃশ্যমান সৌন্দর্যের যে-ভাবরূপ তাঁর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে সেটাই প্রকাশের চেষ্টা করেন। শিল্পী কোনো কিছুর শিল্পরূপ দান তখনই করবেন যখন প্রকৃতিতে সদাবিদ্যমান কোনো সৌন্দর্যময় রূপের একটি ভাব ধারণা তাঁর মনে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে।

আর-একটি সনেটের ভিতর দিয়ে কবি-শিল্পী দেখাচ্ছেন কি করে বাইরের একটি প্রতিচ্ছবি শিল্পীর মনকে আলোড়িত করে ক্রমশ একটি কল্পনামূর্তিতে পরিণত হয়—বাইরের প্রতিচ্ছবিটির সঙ্গে হয়তো তার কোনও সম্বন্ধই থাকে না।—"As I draw my soul, which seen through the eyes, closer to beauty as I first saw it, the image there in grows, and the other recedes, and though unworthy and without any value."

সে যুগে দৃশ্যমান সৌন্দর্যের এই ভাবরূপে পরিণতি কোনও রকমের আধ্যাত্মিক আঙ্গিক ছাড়া হওয়া মুস্কিল ছিল। সমসাময়িক শিল্পীদের ভিতর আর কেউই বোধহয় পেসকারার বৃদ্ধা মারশেনিস্ (Marchioness)-এর মুখে মাইকেলের মতো সৌন্দর্যের দেখা পেতেন না। মাইকেল এঞ্জেলোর যুগের নিও-প্লেটোনিক চিন্তাধারা দৃশ্যমান সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্পী-সৃষ্ট সৌন্দর্যের যে পার্থক্যের স্বীকৃতি দিয়েছিল—চারশত বছর পর আজ তার পরিণতির রূপ অন্য রকম। এ যুগে তার আঙ্গিক প্রধানত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রেও বর্তমান চিন্তাধারার পথপ্রদর্শক হিসাবে মাইকেলের অবদান কেউ অস্বীকার করবে না।

শিল্পসৃষ্টি করবার অধিকারী কে—এ বিষয়ে মাইকেল একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—"intelletto"—বিশ্ব-প্রকৃতিব ভিতর সৌন্দর্য ও সংগতির যে-বোধশক্তি—তাকেই বলা হচ্ছে "intelletto"। ভাগ্যবান শিল্পী জন্ম থেকেই এই শক্তির অধিকারী হন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন "As a faithful

guide for my vocation, beauty was given me at birth, which is a beacon and mind for me in both arts ; if anyone think otherwise, his opinion is wrong. This alone hears the eye up to those lofty visions which I am preparing here below to paint and sculpting." আর-এক জায়গায় তিনি বলছেন "অতি মহান শিল্পীও এমন একটি মূর্তি কল্পনা করতে পারবেন না যা একটি মার্বেলের টুকরো তার বিস্তারের ভিতর ধরে না রেখেছে। কিন্তু শুধু সেই হাতই জিনিসটিকে রূপ দিতে পারবে যার পেছনে আছে intelletto। Intelletto শিল্প-ধারণায় সাহায্য করে। শিল্প-ধারণা শিল্পীর অন্তঃপ্রকৃতির জিনিস, তার বহিঃপ্রকাশ হল নক্সায়, যে-নক্সাকে নির্ভর করে তাঁর সৃষ্ট চিত্র বা ভাস্কর্য পূর্ণ রূপ নেবে।

"শিল্পরূপ একই সঙ্গে শিল্পীর অন্তঃপ্রকৃতিতে ও বাইরের বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজমান" শিল্পীর এই ধারণাও নিও-প্লেটনিক। এই ধারণা থেকে শিল্পীর বক্তব্য হল শিল্পরূপ বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে, তাকে সেখানে থেকে আহরণ করে নেবার জন্য শিল্পী থাকুন বা নাই থাকুন। কারারার মার্বল সম্বন্ধে বলেছেন —যখন পাথরের একটা চাঁইকে ফাটিয়ে নামিয়ে আনা হয় তার ভিতর তিনি দেখতে পান যেন কোনো মূর্তির খসড়া কুদে বার করবার অপেক্ষায় আছে।

ইতালীয় নবজাগরণের যুগে শিল্পী সাহিত্যিকদের ভিতর মাইকেল এঞ্জেলোর মতো ধর্মপ্রাণ লোক আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। যুবা বয়সে তিনি ডোমিনিক্যান ধর্মযাজক সাভনারোলার সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু সাভনারোলারই একটি বক্তৃতা শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে শিল্পী হিসাবেই তিনি সব চাইতে ভালভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। সাভনারোলা বলেন যে গীর্জার উৎকীর্ণ ছবি ও মূর্তিগুলি হল অশিক্ষিত মানুষের কাছে ধর্মপুস্তকের সমান। কোনো-রকম অবাঞ্ছিত মূর্তি বা ছবি সেখানে করা চলবে না এবং এমন কিছুও করা উচিত নয় যা অত্যন্ত সাধারণ ও মামুলী। গীর্জায় শুধু মহৎ শিল্পীরাই তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করবেন এবং সে সব শিল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকও হবে মহৎ।

মাইকেলের মনে সাভানারোলার এই বক্তৃতা এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে চল্লিশ বছর পর রোমে এক আলোচনা সভায় তিনি ঠিক এই কথাই নিজের মত হিসেবে বলেছেন।

পোপ সপ্তম ক্লেমেণ্ট মাইকেলকে সন্ন্যাসী সংঘে যোগ দিতে একবার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু মাইকেল যোগ দেন নি, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের মহিমাবিষয়ক ছবি ও মূর্তি করে যাওয়াই তাঁর পক্ষে ঈশ্বরের আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ—সাধু হবার তাঁর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সমসাময়িক সাধু সন্তদের সম্বন্ধে তাঁর মোটেই কোনও অন্ধভক্তি ছিল না। দান্তে পোপদের নরক বাস করিয়ে দেওয়ায় ভলটেয়ার খুব খুসী হয়েছিলেন। মাইকেল ঠিক পোপদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করলেও অনেক কার্ডিনালদের সম্বন্ধেই তিক্ত সমালোচনার মনোভাব দেখিয়েছেন। অন্তত একজন পোপ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে তিনি শিল্পমূল্য বুঝতে অপারগ।

মাইকেলের মতে পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ ইত্যাদি সন্ন্যাসী বা যাজকেরা শিল্পীদেরই মতো ভগবানের সেবক এবং প্রত্যেককেই আদর্শ জীবন যাপন ও নিজস্ব কাজের উৎকর্ষের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে হবে।

মাইকেল এঞ্জেলো শিল্পের নৈতিক ও নীতিবিগর্হিত দিক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং শিল্পের চর্চা সম্বন্ধেতাঁর মতামত ছিল অ্যারিস্টটলের মতানুগ। মানুষের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলাই তিনি শিল্পচর্চার অভীষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করতেন। শিল্প ও কাব্য সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণা ছিল যে ধর্মের প্রচার ও গুণকীর্তনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মাইকেলের যুগেও এ ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। কি রকম শিল্পী ধর্মীয় শিল্পসৃষ্টির অধিকারী এ সম্বন্ধে মাইকেলের বক্তব্য হল—সেই শিল্পীই অধিকারী যিনি—১। আঙ্গিকে ওস্তাদ ২। প্রতিকৃতির ভাবরূপ প্রকাশে সমর্থ ৩। দর্শকের মনে পুণ্যভাবের সৃষ্টি করতে দক্ষ ৪। নিখুঁত নৈতিক জীবনের অধিকারী

শিল্পের নৈতিক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মাইকেলের মতামত খানিকটা আলোচনা করা হল। শিল্পের বা শিল্পীর কোনও সামাজিক কর্তব্যবোধের প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্বন্ধে মাইকেলের বক্তব্যও কিছু পাওয়া যায়।

দিয়েলো রিভিয়েরাও তাঁর "Revolution in Painting" লেখায় বলেছেন যে যখনই কোনো জাত তার মৌলিক অধিকারের দাবীতে বিপ্লব করেছে তখনই সে জাত বিপ্লবী শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। রিভিয়েরা তের জন শিল্পীর নাম করেছেন যাঁদের শিল্পের নিশ্চিত রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে। গয়া, দোমিএ (Daumier) ইত্যাদির সঙ্গে মাইকেলের নামও সেখানে আছে। কিন্তু মাইকেলের জীবন, লেখা ও সমসাময়িক বিজ্ঞজনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার পর্যালোচনা করলে মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে রিভিয়েরার ধারণা ভুল। ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীর রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে মাইকেল যথাসম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর যেসব কাজে রাজনৈতিক অর্থ আরোপ করবার চেষ্টা করা হয় সেগুলির ধর্মীয় ব্যাখ্যাই সহজ ও সমীচিন।

গোপাল হালদার

রূপনারাণের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

গল্পাৎ পরতরং নহি

এস্রাজ সেতার থাক, 'হারমোনিয়ামও হা করে না'—এমন বাড়িতে আমার জন্ম। সুর ও তালের সঙ্গে কোনোকালেই কানের সন্ধি হয় নি। ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসীর নিশ্চয়ই ডাক পড়ত। ছড়া বা ছন্দবদ্ধ কবিতার সঙ্গে পরিচয় সেই তিন থেকে সাত বৎসরের মধ্যেই ঘটে থাকবে। ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসীর যা অসাধ্য তাও সাধ্য পিতামহীর। ছড়ার জোরে নয়, গল্পের জোরে। না হলে আমি ঘুমুব না, বাড়ি জুড়োবে না। পূর্ববাঙলায় ওরকম গল্পের নাম 'প্রস্তাব'। সে সব প্রস্তাবের ছায়া পরে খুঁজে দেখেছি সাজানো কথায় ছাপানো বইতে। ঠাকুরমা কথা সাজাতে জানতেন, মনে হয় না। অন্তত পরেকার দিনের 'ঠাকুর মা'র ঝুলির' রূপলোকের ঠিকানা আমার ঠাকুরমা'র কাছে পাই নি। গল্পটাই ছিল আসল কথা। গল্পাৎ পরতরং নহি। যেখানে এসে এই গল্পের রাজ্যের সিংহদ্বারের প্রথম সন্ধান পেলাম সে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'।

পুকুরের ও-কোণে আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসা। তিনি শিলেট জেলার লোক, পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর। পুলিশ বলতেই সাধারণ ভদ্রলোকের মনে যে একটা ভীতি ও বিরূপতা জাগে, তা অকারণ নয়। কিন্তু পুলিশের চাকরের মধ্যে সৎ, ভদ্র ও সম্মানীয় মানুষ কম দেখি নি। আনন্দ রায় মহাশয় নিজে ছিলেন সৎস্বভাব কর্মচারী, শান্তভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন তেমনি—স্নেহময়ী, প্রতিবেশিনী। পুত্রকন্যারাও সবাই শান্ত, অমায়িক প্রকৃতি, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার হলেও পুলিশের চাকরিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা দূরত্ব রাখতে হয়। আমাদের সঙ্গেও মাখন প্রভৃতির একটু দূরত্ব থাকত। তাদের জীবন বেশ নিয়মিত।

পড়ার সময়ে খেলা, বা সময়ে-অসময়ে গল্প-আমোদ, এসবে আমাদের প্রবল রুচি। মাখনদের কিন্তু তাতে নিষেধ ছিল। নিষেধ অমনি ছিল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বসন্ত সেন মহাশয়ের ছেলে মন্টুদের। নিজেদের স্বতন্ত্র করে রাখবার চেষ্টা তাদেরও ছিল। তারাই বেশি করে মনে করিয়ে দিত, মাখনদের পুলিশের বাড়ি—তাদের দূরে রাখাই নিয়ম। কিন্তু বাদামতলার টানে নিষেধ যতটাই টিকুক, দূরত্ব প্রায় মিলিয়ে যেতে চাইত। যতদিন মাখনরা ও-শহরে ছিল ততদিন দূরে থেকেও আমাদের সকলের সঙ্গে এক হয়েই ছিল।

আমাদের বয়সীদের মধ্যে ছিল মাখন ও আবু, মাঝখানে পুতুল। সে আমার একটু বড় হলেও প্রায় আমার বয়সের। তার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। কী হল, একবার একই বৎসরে পাড়ার প্রায় একই বয়সের তিনটি ছেলে কঠিন জ্বরে পড়ল। অনেক দিন পরে যখন জ্বর ছাড়ল, প্রাণ রক্ষা পেল, তখন তারা তিনজনাই দেখা গেল খঞ্জ। পুতুলেরই সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য। কোমর থেকে তার সমস্ত নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সে দাঁড়াতেও আর পারে নি। এ যে কোনো অপদেবতার কুদৃষ্টির ফল, সে বিষয়ে তখনকার দিনে সকলে একমত ছিলেন। এখনকার দিনে ওরিমাইসিন টেরামাইসিন প্রভৃতিতে বোধহয় ও-ভূত আগেই পালাত। তখনকার দিনে ওষুধপত্র শেষ করে সাধুসন্ন্যাসী ফকির দরবেশ কিছুই পুতুলেব বাবা বাদ রাখেন নি। কিছুই হল না। বৈঠকখানার জানালার ধারে পুতুলকে বসিয়ে দিয়ে যেত চাকরেরা, খাবার প্রয়োজনে তুলে বাড়ির ভিতর নিয়ে যেত। তাছাড়া, সারাদিন জানালায় বসে একা-একা সে দেখত দূরে বাদামতলার খেলাধুলা, চেঁচামেচি, জামরুল, গাব শেষ করতে গাছে গাছে ফেরা, ঘুড়ি-ওড়ানো—এমন হাজার রকমের ছুটোছুটি। পরে যখন প্রথম 'ডাকঘর' পড়ি অমলের কথায় আমার পুতুলের মুখ মনে পড়ে যেত। দু-চার বৎসর পরে আনন্দবাবু অবসর নিয়ে দেশে গেলেন। পুতুল কিছুকাল পরে সেখানে মারা যায়। আর মাখন-আবু প্রভৃতির সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হয় অনেক পরে—ছেলেবেলার সৌহার্দ্য একটুও চিড় খায় নি।

বাড়িতে শিক্ষক তাদের পড়াতেন—পুতুলকেও। বসে বসে খেলার জিনিসও পুতুলের ছিল। বাবা মা বিশেষ স্নেহ করতেন। কিন্তু তার বাবা

দিয়েছিলেন তাকে বিশেষ করে পড়বার জন্য একখানা বই—'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের অঙ্কিত রঙীন ছবিতে তা ভরা। সে ছবির ও এই রামায়ণ পাঠের লোভে আমি পুতুলের কাছে গিয়ে বসতাম। পড়তে পড়তে দুজনায় রামায়ণের আকর্ষণে একই রূপে মজে যেতাম। বাড়ি থেকে আসত খাবার তাগিদ। কিন্তু কিই বা খাওয়া, কিই বা নাওয়া—রাম লক্ষ্মণ হনুমানের সঙ্গ ছাড়া যায় কি? গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কতবার যে সে-কাহিনী পড়েছি তা জানি না। একবারও তা পুরনো হত না। কী পুরনো হবে—রামের কথা, সীতার কথা, লক্ষ্মণের কথা, না হনুমানের লঙ্কাদাহের কথা—না কুম্ভকর্ণের কথা, না কালনেমির কথা—কি পুরনো হবে? পণ্ডিতেরা যাই বলুন—ঐ অঙ্গদের কথা বার বার পড়ে আমরা কী মজাই না পেয়েছি। আর তরণী সেনের যুদ্ধ ও মৃত্যুতে কী কান্নাই না কেঁদেছি। রামায়ণের অনেকটাই মুখস্থ হয়ে গেছল। পরীক্ষাও দিতে পারতাম—কোথায় কি আছে, কি নেই। গল্পই ছিল প্রধান বিষয়; কিন্তু ছন্দবন্ধে না হলে কি তা সহজে মুখস্থ হয়ে যেত? এই গদ্য কবিতার যুগেও আমি ছন্দবদ্ধ কবিতার ভক্ত—লজ্জার কথা হলেও তা স্বীকার না করে উপায় নেই। সকলেই জানেও। সাহিত্যের রসাস্বাদন বোধহয় আমার সেই প্রথম—আর এখনো বলতে পারি, তা আমার সৌভাগ্য।

রামায়ণ যখন বেশ দুজনার আয়ত্ত হয়েছে, তখন এল 'কাশীদাসী মহাভারত'। গল্পের সেই মহারাজ্যেরই আর-এক বিরাট রাজ্য। উৎসাহ আর ফুরোয় না। এখন অবশ্য বুঝি—'মহাভারত' আরও বড়ো জিনিস। বলিও 'মহাভারতই পৃথিবীর মহত্তম গ্রন্থ'। শ্রেষ্ঠ 'সাহিত্যই' বলতাম, কিন্তু মহাভারত তো সাধারণ অর্থে সাহিত্য নয়। মানবমহারসের সমুদ্র। এ সত্য বুঝবার জন্য অবশ্য দুটি জিনিস দরকার—প্রথম, একটু বয়স, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়, মূল মহাভারতের একটু জ্ঞান; কারণ, কাশীদাসী মহাভারতে সে সমুদ্রদর্শনের কাজ হয় না। রামায়ণও অবশ্য মূলে পড়া দরকার—তা ভাগ্যে ঘটে যায় বিশ বৎসর পরে জেলে—সুনীতিবাবুর কৃপায়। কিন্তু বাঙলা রামায়ণে, বাঙালি রাম, বাঙালি সীতা, বাঙালি লক্ষ্মণ নিয়েও আমাদের দিন চলে। অথচ যে-বয়সের কথা বলছি—সে বয়সে তা ভালোই চলেছিল। রামায়ণের আদর্শ রাজা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ বধূ, আদর্শ ভ্রাতা প্রভৃতি আদর্শের যে-হাট তা বালকের গল্পের ক্ষুধায় অসুবিধা ঘটায় না। আবার

ভক্তিতে বীরত্বে মিশিয়ে মনকে আদর্শের টানেও বাঁধে। মহাভারতের বেলা কিন্তু মনকে ধর্মের বাঁধনে বাঁধতে গিয়েও এক-একবার কেমন উল্টো টানে সে বাঁধন ফসকে যেতে চাইত। ছোট হলেও বাঙালি ঘরের ছেলের কথাটা শুনে কেমন লাগত—দ্রৌপদীর পাঁচটা স্বামী, কিন্তু রাজবাড়িতে অমন করে দ্রৌপদীকে অপমান করা কেন? যুধিষ্ঠিরই বা ধর্মপুত্র হয়ে কেন অমন জুয়াড়ী? জতুগৃহে পাঁচ ছেলে নিয়ে পুড়ে মরল এক ব্যাধ। এটাই কি খুব ধর্মের কাজ হল যুধিষ্ঠিরদের? দুঃশাসনের রক্তপান একটা ভয়ঙ্কর কথা। মহাভারতের রূপশালায় তখনো আমার মানুষ চিনবার বয়স নয়—দ্রৌপদীকেও বুঝবার কথা নয়, কৃষ্ণকেও না। তবু ভীম অর্জুনে মিলে সব সংশয় উড়িয়ে দিয়ে কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলত। আর অভিমন্যুর বীরত্বে আমাদের ছোট বুক ভরে উঠত। তবে আমাদের মাথা নুয়ে পড়ত—লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কাছেও নয়—ভীষ্মের সামনে। কুরুপিতামহের আকাশচুম্বী বিরাট মহিমা বুদ্ধিতে না হোক অনুভূতির মধ্যে জাগাত বিস্ময়-নম্র শ্রদ্ধা। মহাভারত বুঝতে হলে চাই জীবনের প্রতি আগ্রহ; রামায়ণের জন্য আদর্শের প্রতি আগ্রহই যথেষ্ট। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত দুয়ে মিলে গল্পের প্রতি আগ্রহকে তখন থেকে এমন করে জাগিয়ে তোলে যে, গল্পের গঙ্গাজল যত পান করি না, তৃপ্তি সত্ত্বেও থেকে যায় পরম অতৃপ্তি। রূপ-সাগরের ঘাটে ঘাটে চোখে জেগে থাকে অনন্ত বিস্ময়।

শব্দময়ী অপ্সররমণী

রূপের নেশা থেকে ভাবের নেশা-ও কিন্তু কম ঘোর লাগায় নি চোখে। চোখ প্রথম দেখে দেখার আনন্দে। হয়তো তখনো রূপ আর ভাবে বিভাগ করতেও সে শেখে না। এই আনন্দেই দেখবার যা তার থেকেও বেশি দেখা হয়ে যায়। আগেও নিশ্চয় কবিতা পড়েছিলাম, নিজের বই-এর থেকে, নানা পাঠ্য বই-এর পাতায় বেশি পড়তাম—

> ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে
> কপোত কপোতি যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
> বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

কিন্তু একদিন দুপুরবেলা দাদার পরিত্যক্ত পুথিপত্রের মধ্যে পেলাম 'সীতার বনবাস'। পড়তে পড়তে পড়লাম—

"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

পূর্ব বাঙলার ঝাউ-নারকেল বাগান আর নদী খালবিলই দেখেছি। তখনো পাহাড় দেখি নি, প্রস্রবণও না। এবার তা দেখলাম। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সেই ঝাউ-নারকেলের আকাশ-আলোও মিশিয়ে ছিল; কিন্তু দেখলাম, তাতে ভুল নেই। আর এ দেখা চোখ দিয়ে নয়, প্রথমত কান দিয়ে, তারপর মন দিয়ে। আশ্চর্য এ শব্দের প্রস্রবণ। তার ধ্বনিতে যেন সমস্ত দুপুরটা ভরে গেল—ছাপিয়ে পড়তে লাগল। তাতে মনেরও চোখ খুলে গেল। দেখলাম সেই জনস্থান—যার শিখরদেশ নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। the gleam, the light, that was ne'er on sea or land.

বিদ্যাসাগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছি পরে। তা শুধু শব্দসমাবেশ নয়, বাঙলা ভাষার ছন্দাবিষ্কার, গদ্য ছন্দের রচনা। সে পরের বিচার পরে। তখনকার মতো তিনি আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন ধ্বনিলোকের মন্দিরদ্বার। সীতার বনবাস ও শকুন্তলার পথ বেয়ে বাঙলা সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য মন ধাবিত হল।

সেই সঙ্গেই চাবির আরেকটা মোড় ঘুরে গেল। 'সেই সূত্রে' কিনা বলতে পারব না। ক্লাশে ও পরীক্ষায় বাঙলা রচনা লেখার আদেশ থাকত। দু-একটা রচনা বই পাঠ্য বলেও বৎসরারম্ভে কিনতে হত। তা উল্‌টিয়েও দেখতাম না। রচনা যে কী জিনিস তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব মাস্টার মশায়রাও কেউ অনুভব করেন নি। বুদ্ধিমান ছেলেরা ওসব রচনা-বই মুখস্থ করত বা নকল করত। আমরা কিছুই ঠিক পেতাম না। একদিন দাদার পুরনো পুথিপত্রের মধ্যেই দেখেছিলাম তাঁর স্কুলে-লেখা একরাশ পুরনো রচনা—কোনো রচনা-পুস্তকে যার উদ্দেশ মিলে না। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করলাম—এই হবে আমাদের রচনার খনি। এগুলো টুকব, মুখস্থ করব। কিন্তু চাবি ঘুরে গেল আরেকটা দুয়ারেরও। দেখা দিল—শুধু বাঙলা পড়া নয়, রচনা-লেখার উৎসাহ। বহু ধরনের পাঠ্য বই ও সংকলন থেকে রচনার কথা, ভাষা, যুক্তি খোঁজ করে তা সাজিয়ে-গুছিয়ে রচনা

লেখার ঝোঁক মাথায় চাপল। ক্লাশের দাবী বা পরীক্ষার চাহিদা তাতে বিশেষ মিটত না। কিন্তু সে সব ছাড়িয়ে দেখা দিল ভিতরের তাগিদ—লিখতে হবে। সে লেখার সবটাই নিরর্থক, অনেকটাই হাস্যকর। বিষয় ছাড়িয়ে শব্দের আড়ম্বরের ঝোঁক। কিন্তু তাগিদটা সত্য। সেদিনের পথ না-পাওয়া মনের বিড়ম্বনা এদিনেও ভুলতে পারি নি। তাই প্রকাশকরা বলতেই এ-বয়সেও আমি দু-একটা স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের জন্য বই লিখেছি। অর্থাগম নিশ্চয়ই কামনা, কিন্তু উদ্দেশ্য রচনা শিক্ষা, ভাবতে শিখানো, লিখতে শিখানো। ছেলেদের মনে আঁচ ধরিয়ে দেওয়া যাতে তারা নিজেরাই লিখতে চায়। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরীক্ষার চাবিকাঠিটাই তো আসল কথা—মুখস্তের সিঁদকাঠি দিয়ে সে কাজ ভালোই চলে।

বিদ্যাসাগর যে-দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন তার পরে রচনা-লেখার কালেও শব্দের অরণ্যে শব্দ শিকারে মন গেল। সোনার হরিণ একবার দেখেছি কি ভাবলাম—সব হরিণই বুঝি সোনাব হরিণ, এমনকি, পশু-পাখি সবই ঐ জগতে সোনার না হয়ে যায় না। ক্ষেপে গেলাম। যেখানে যত ভারি ভারি শব্দ পাই, গুরুগম্ভীর, উদ্ভট, দুরুচ্চার্য, দুর্ব্যবহৃত শব্দ, ভাবি সবই বুঝি ধ্বনিরাজ্যের মনিমানিক্য হীরা। সুবেলা শব্দের জন্যও মন চন-মন করত, যেন, রচনাব পায়ে পরাতে পারলেই বেজে উঠবে ভাষার কনক-কিঙ্কিনী। 'শব্দময়ী অপ্সর রমণীর' এই মায়ায় বেশ মজে গেলাম। ফলে যা হল তা এই—বিদ্যাসাগরের ধ্বনির সেই সুন্দরকাণ্ড ছাড়িয়ে আমরা ভাষায় কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুললাম। তার স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি যা, তা এই—রঙীন খেলনাই শিশুর চাই। রূপের থেকে, রেখার থেকে, রঙটাই তার কাছে বেশি সত্য। তখন আমি সত্যই ও-জগতে শিশু। কিন্তু শৈশব বাল্য কেন, কৈশোর কাটতেই যে শব্দালঙ্কারের মোহ কাটাতে পেরেছিলাম তা নয়। তবে যে ধ্বনিরাজ্যের দ্বারে বিদ্যাসাগর পৌঁছে দিয়েছিলেন বুঝতে পারছিলাম শুধু শব্দ দিয়ে তা তৈরি নয়, কেমন একটা ভাবের মোহও সেই সঙ্গে চোখে লাগে।

বাবার পাশে বসে একদিন দেখছি তিনি প্রথম সংস্করণ 'চয়নিকা'র প্রথম কবিতাটি পড়ছেন—'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।' বার বার পড়ছেন, পাতা উল্‌টিয়ে যান শেষ পংক্তি অবধি, আবার ফিরে আসেন সেই শুরুতে

'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ'। তাঁর মতো তাড়াতাড়ি পড়া আমার অসম্ভব। তবু যেটুকু একবার বাকি থাকে তিনি পৃষ্ঠায় ফিরে এলে সেটুকুই আগে পড়ে নিই। সবটাই পড়া হয়। কিন্তু অর্থ ঠিক বোধগম্য হয় না। শব্দের ঘনঘটা নেই। অথচ ক্রমেই যেন একটু সুর মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করতে থাকল। শব্দের মোহ তাতে দূর হয় না, সুরের মোহের স্পর্শ লাগল মাত্র।

বঙ্কিমের রূপশালা

শব্দের হোক, সুরের হোক, মনে যে মোহেরই সঞ্চার হোক, বাবার আলমিরার বঙ্কিম, মধুসূদন প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর আকর্ষণই দুর্নিবার হয়ে উঠল। সেইখানেই অমৃতের ভাণ্ডার। নীতিবিদ্‌দের অনুশাসন মানলে আরও পাঁচ-সাত বৎসরেও আমরা সেখানে প্রবেশের অধিকার পেতাম না। সে শাসনে আমরা আস্থা রাখি না। কিন্তু বাস্তব বাধা বেশ ছিল। বাঙলা আলমিরার চাবি বাবার নিজের কাছে থাকত। তিনি জানতেন না হলে বাঙলা বই রক্ষা করা অসম্ভব। আর আমাদের পক্ষে বঙ্কিম মধুসূদনের জন্য পিপাসা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বাঙলা রচনা শেখার নেশায় পেয়েছে, বঙ্কিম মধুসূদন পড়ব না? দোসরা চাবি সংগ্রহ করতে আমাদের দেরি হল না। তারপর, আরম্ভ হল দ্বিপ্রহরের সেই স্বপ্নাবগাহন, সন্ধ্যার পূর্বেই যথাস্থানে সেই পুস্তকখানা রেখে সুবোধ বালকের মতো পর দিবসেব জন্য অপেক্ষা, জাগ্রতে বসে স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নেও সেই মধ্যাহ্নের স্বপ্নের অন্বেষণ।

বিধাতা সুপ্রসন্ন, বঙ্কিমের রাজ্যেই আমরা প্রথম প্রবেশ করলাম। দুই খণ্ডের একখণ্ডে একজন ডুবে গিয়েছি। অন্য খণ্ড অন্য জনকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করেছে। সঙ্গীর শেষ হলে সে খণ্ড আমার পাঠ্য, আমার খণ্ড তার। গড়মান্দারনের পথে সেই অশ্বারোহীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে আর থামতে পারলাম না। অশ্বপৃষ্ঠে নির্মলকুমারীর নামে স্বপ্নকুমারীকে বসিয়ে আমরা যে-রাজ্যে পাড়ি দিলাম সে রাজ্যের খোঁজ মানিকলালও জানে না। বাড়ির দক্ষিণের সেই প্রকাণ্ড মাঠটার উপর দিয়ে দক্ষিণের ঝিল পেরিয়ে, নতুন নতুন মাঠ-ময়দান ছাড়িয়ে আমাদের অশ্ব দিকদিগন্তে ছুটে চলল। পাঠান-মোগল-রাজপুত সকল দেশের সকল রাজ্যের সকল অফুরন্ত বিস্ময় আমাদেরও বুকের মধ্যে জমে উঠতে লাগল। সকল রাজ্যের সকল রূপশালার ছবি উন্মোচিত। আর রূপই বা

শুধু কেন ? মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দকে বললেন কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তখন তো বিশেষ করেই মন মাথা নেড়ে বললে, 'জানি, জানি, নিগূঢ় ইঙ্গিত, সমাপ্তি নয়, এই তো সূচনা !'

বলতে পারব না—কী বেশি ভালো লেগেছিল ! বঙ্কিমের গীতা-প্রচারে নিশ্চয়ই তখন মন দিই নি। আনন্দ মঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—এই তিনখানিই তো ছিল তাঁর 'প্রচারের কল'। কিন্তু সে কল বিকল হয়ে পড়ে থাকত, আমরা স্বপ্নসঞ্চরণ করে ফিরতাম বাস্তব ও রোমান্স মিশানো এক অদ্ভুত পৃথিবীতে।

পরে সঞ্জীবচন্দ্র রমেশচন্দ্র শেষ করলাম। আর শেষে দুঃসাহসে নির্ভর করে হাত দিলাম মধুসূদনের গ্রন্থাবলীতে। বাড়ির আলোচনায় প্রস্তুতি মন্দ ছিল না, তবু তা যথেষ্ট নয়। তবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাল—মহৎ কিছুর সামনে দাঁড়িয়েছি।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

এ বিশ্বাসটা সামান্য নয়—সেই বয়সের বালকের পক্ষে প্রয়োজনও। তাই এর পরে একদিন বাবাব আইনের বই-এর আলমিরা খুলতেই পেলাম সেই প্রথম সংস্করণ চয়নিকা। আর পাতা একটু উল্টাতেই পেলাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। কথায়, সুরে, ছন্দে মিলে একি কাণ্ড বাধাল! রূপের রাজ্য, কিন্তু তা গৌণ ; এটা ভাবের রাজ্য। যত পড়ি বুকের ভিতরে একটা ভাবোচ্ছ্বাস ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। ভাবের পাথায় ভর দিয়ে যে এক-একটা ভাবনা ভেসে ওঠে তার মধ্য দিয়েও অনুভূতিই তার আত্মপরিচয় পায়। কী যে এ রহস্য, কী যে এ কামনা তা বুঝবার কথা নয়। শুধু 'দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান'। সত্যই, আমার জীবনেও ঘটল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

অকাজের অগ্রজ

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নাম তো পূর্বেই বহু পরিচিত। নানা রকমের পাঠ্য বই-এর পাতাতে প্রথম থেকেই দেখেছি তাঁর চমৎকার কবিতা : 'দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহারবে', কিম্বা 'সুদাস মালীর ঘরে', এমনি কিছু কিছু, শিক্ষক মহাশয়রাও যা প্রশংসা করতেন। তারপরে ক'বৎসর ধরে প্রবাসী আসছে বাড়িতে—সে ব্যবস্থাও বোধহয় দাদার উদ্যোগেই বাবা

করেন। 'গোরা' নামে ধারাবাহিক গল্প লেখাও তাতে দেখেছি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। অথণ্ড মনোযোগে বাবা 'গোরা' পড়তেন। 'প্রবাসী' অবশ্য আমরা দেখতামই, পড়বার মতো যোগ্যতা ছিল না, সাহস না, সুযোগও না। অতি যত্নে বাবা তা আপন ডেস্কে বন্ধ করে রাখতেন। আমরা পেলে দেখতাম 'প্রবাসী'র ছবি—প্রথম ত্রিবর্ণ চিত্র। এ ছাড়া দু-একটা কথা শুনেছিলাম শিক্ষকদের মহলে—রবিঠাকুরের কবিতা বোঝা যায় না, আর তিনি 'স্বদেশী'র বিরোধী, হিন্দু সমাজেরও। এ কথাগুলো আমাদের বিমুখ করবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু হতে পাবে নি। কারণ—আমার দাদা রঙ্গীন হালদার। আর ও-সব কথার আগেই কানে গেছল বৈঠকখানায় বাবার ও দাদার মধ্যে গল্প আলোচনা। তবু কথাগুলো ভুলে গেলাম না। কারণ, শহরে তখনো সবাই বলত রঙ্গীন নাকি শুধু বাঙলা ভালো লেখে না, 'রবিঠাকুরের লেখারও ভক্ত।' সেকেণ্ড ক্লাশের ছেলের পক্ষে এটা 'বেয়াদবি' এবং 'পাকামি'। তবে তাঁরা জানেন, আমাদের বাড়িতে তো ও-সবে শাসন নেই, অকাজেই তাই আমরা ওস্তাদ। বাহিরের এই ইঙ্গিতও পরিহাস-উপহাসেই আমাদের মনে তাদের কথা অবিস্মরণীয় হয়ে যায়। কিন্তু সে কথাগুলো অশ্রদ্ধেয় হয়ে যেত সময়ে-সময়ে যে ছুটো-ছাঁটা কথা দাদা ও বাবার মুখ থেকে এসে কানে পৌছত বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে, তাতেই। বাড়িতে 'প্রবাসী' আসছে ১৩১৫।১৩১৬ থেকে—বাড়ির আবহাওয়াটা তার থেকেও অনুমান করা যায়।

তাছাড়া, সেকেণ্ড ক্লাশের আগে ও পরে যখনই হোক রঙ্গীন হালদারকে অবজ্ঞা করা কারো সাধ্য ছিল না। অঙ্কে তিনি শূন্য পান; ব্যাটে তিনি হাত দেন না; ফুটবলে পা ছোঁয়ান না; কিন্তু তাঁকে না পেলে তাঁর ক্লাশের ছেলেদের চলে না। খেলাও জমে না, গল্পও না। নানা বিষয়ে অতো কথা আর কেউ বলতে পারে? বলবে কি, জানেই কে কেউ? সেটাই তো 'ওদের বাড়ির' ধর্ম। আসলে তা ঠিক নয়, বাড়ির অন্যরা এরূপ ধাঁচের নয়। স্কুলে যদি কোনো সম্মেলন উৎসব হয়, তাতে রঙ্গীনই প্রধান। নিজেরও উৎসাহ আছে, সকলের উৎসাহও তিনি যোগাতে জানেন। বড়ো বড়ো চোখ, ভাবব্যঞ্জক মুখ, আর উদাত্ত কণ্ঠস্বর—আবৃত্তি বা অভিনয়ে এমন মানুষ প্রধান তো সহজেই হবে। মাস্টারমশায়রাও মানেন—রঙ্গীন এ-সব বোঝে ভালো, তালিম দিতেও জানে। তাছাড়া তাঁর রুচি আছে,

হাত আছে আঁকবার, চোখ আছে সুন্দর জিনিস চিনবার। একটা দৃষ্টান্ত দিই: তখন মেলা চলছে। মিস্টার জে. এন. গুপ্ত উদ্যোক্তা, তিনি ছিলেন মিঃ আর. সি. দত্তের জামাতা। ঠিক একটু আগেই রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। 'প্রবাসী'তে তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন শনিবার স্কুল থেকে ফিরে দেখি সেই ছবি নিয়ে দাদা বসে গেছেন আলেখ্য অঙ্কনে—'পেন্সিল স্কেচ্'। স্কুলে সেদিন বোধহয় যান নি—ও-রকম অনেক সময়েই তাঁর স্কুলে যাওয়া হয়ে উঠত না। বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, প্রথম ঘণ্টায় ক্লাশ তো তাঁর হয়ে উঠত না। কিছুদিন পরে শুনলাম মেলায় স্থানীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে দাদার সেই 'পেন্সিল স্কেচ্' প্রশংসিত হয়েছে, আর তিনি সেজন্য পেয়েছেন পারিতোষিক। এখন বুঝি—বাড়ির গুণ নয়, রঙ্গীন হালদারের নিজস্ব গুণ। জন্ম থেকে তিনি শিল্পে, সাহিত্যে রুচি ও শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে শক্তি সার্থক বিশেষ করেন নি। যা করেছেন, তা হচ্ছে পরোক্ষে—অন্যদের রুচির বিকাশ, বোধের উদ্বোধন। আর সব থেকে বড়ো কথা—মনের মুক্তি।

এখানে আবার বলে নিই—রঙ্গীন হালদারের কথা বারে বারে আসতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবি আমার পক্ষে লেখায় ধরা অসম্ভব। যে দু-চারজন লোক আমার কাছে অপরিমেয় তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রিয় সহযোগী চারুলাল একদিন বলেছিলেন, 'রঙ্গীনদা' হচ্ছেন ডাক্তার জনসন-এর মতো ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। আমাদের মধ্যে আর কারও সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারব না।' একটা কথা অস্পষ্টভাবে এখনো স্মৃতিতে আছে। দাদা তখন বোধহয় কলেজে পড়েন, কিম্বা স্কুল শেষ হয় নি। তাঁর থেকে বড়ো তাঁর সমসাময়িক একদল কলেজ-পড়া ছাত্রের সঙ্গে খেলার মাঠের নিকটের পোলটার উপর দু-সারে বসে তাঁর তর্ক হচ্ছে—'চোখের বালি' কেমন বই। সকলে বলছেন, ভালো নয়। হিন্দু বিধবাকে অপমান করা হয়েছে। আর দাদা বলছেন 'না। এতে আঁকা হয়েছে মানুষের চরিত্র,—সাইকোলজিক্যাল উপন্যাস।' রঙ্গীন হালদারকে অবজ্ঞা করা যায় না—তাঁর ব্যক্তিত্ব সবল ও সামাজিক, তা বুঝি। কিন্তু সেই ১৯১০।১৯১১ সালের সময়ে দূর 'পাণ্ডববর্জিত' নোয়াখালি শহরে এই যুক্তি ও এই সাহিত্যবোধ, এই রূপবিচারের দৃষ্টি আর এই চরিত্র-বিশ্লেষণের মনস্তাত্ত্বিক প্রণালী তো শুধু ব্যক্তিত্বের জোরে জোটে নি, বাড়ির প্রশ্রয়েও না। বরং কোনো একটি ব্যক্তির তা অর্জিত

হয়েছিল বলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের সূত্রে বাড়িতে একটা ও-রকম 'অকাজের' আবহাওয়া তৈরি হতে থাকে। তিনিই আমার অকাজের অগ্রজ! আমার থেকে সাত-আট বৎসরের বড়ো। তিনি যখন কলেজে গেলেন আমার তখন ন'বৎসর বয়স। নয়ে আর ষোলতে এক-আধটুকু চিঠি চলত। কিন্তু তেরতে-বিশে যে-সাহচর্য গড়ে উঠতে পারল, তা তাঁরই গুণে। আর কৈশোরে পা না দিতেই দেখেছি বাড়িতে আসছে 'প্রবাসী'। তিনিই কলেজ যেতেই বাড়ি ফিরতেন সঙ্গে নিয়ে 'চয়নিকা'। এই আবহাওয়া তিনিই সৃষ্টি করেছেন বাড়িতে, না, বাবা? হয়তো দুজনের যোগে দুজনায়। বাবার আলমিরাতে ইংরেজি বাঙলা নানা বই চিরদিন ছিল। ছোট থেকেই শুনেছি তাঁর মুখে অবারিত আলোচিত শেক্সপীয়র, মিল্টন থেকে বঙ্কিম-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পরে দেখলাম এই আবহাওয়ায়ও যেন সেই মহাসাগরের দূরের গানই ভেসে বেড়ায়।

বাঙালি আজ গানের রাজা

'চয়নিকা'র কবিতা বা বাবার সযত্নে রক্ষিত বাঁধানো 'প্রবাসী' থেকে পড়া এগারো (বারো) বছরের পাকা ছেলের পক্ষেও সম্ভব হয় নি—সুযোগও ছিল না। 'হাস্যকৌতুক' ছাড়া 'কথা ও কাহিনী', 'শিশু' নিয়ে আমরা তখনো সন্তুষ্ট। খুঁজছিলাম বঙ্কিম-মধুসূদনে পথ। তারই মধ্যে সেই ঘটনাটা ঘটল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবল পুরস্কার পেলেন। কথাটা শুনছিলাম—দাদাও পত্রে আমাদের ও-সব কথা না লিখে ছাড়তেন না। কিন্তু যে-ব্যাপারটা মনে আরও দাগ কাটল তা এই: ডব্লু. এস. এডি নামে এক খেয়ালী মানুষ ছিলেন তখন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। শুনতাম তিনি সিনিয়র র‍্যাঙলার। ছয় ফুটের উপর দীর্ঘ বিরাট দেহ, পাকা ইংরেজ—অথচ দেখতাম যা আই. সি. এস.-রা নন তিনি তা'ই। বাঙলা শেখেন, নদীর পারে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে বাঙলায় আলাপে তাঁর ঝোঁক, দু-একজন সামান্য যুবককেও নিজের বাঙলা শেখার মাস্টার রেখেছেন। চাইতে বা না-চাইতে তাদের নানা অনুগ্রহ দেন। ভদ্রলোকদের সঙ্গেও আলাপে আলোচনায় এডি উৎসুক। ভদ্রলোকরাই নিরুৎসুক। ১৯০৫-এর পরে ইংরেজ নিয়ে কে মাতবে? কেউ বলে এডি পাগল, কেউ বলে গভীর জলের মাছ। যাক, বোধহয় স্কুলের কাজে বা অন্য কী কাজে বাবা গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথ সদ্য তখন পুরস্কারটা পেয়েছেন। এডি

সাহেব প্রথমেই সে কথা তুলে জানালেন অভিনন্দন। তিনি বাঙলা শেখেন, তাই জানতে চাইলেন কেমন কবি 'ঠাকুর'। ('টাগোর' নয়, তিনি বাঙলা জানেন)। বাবা স্বভাবতই বললেন, 'খুব বড় কবি।' এডি আফশোষ করে বললেন, আমি বই-এর বাঙলা বেশি বুঝতে পারি না। না হলে পড়তাম। ভারতবর্ষের বিশেষ গৌরব। 'জানো আজ পর্যন্ত কোনো ইংরেজ লেখক নোবল পুরস্কার পান নি।'

বাবা বললেন, 'কেন ? কীপলিং পেয়েছেন তো।'

এডি বললেন, 'তিনি ইংলণ্ডের লোক নন—ভারতবর্ষেই তাঁর জন্ম।'

বাবা বললেন, 'তা বটে।'

এডি বাঙালি ও ভারতীয়দের নিকট 'উগ্র ইংরেজ নন, কিন্তু জাতে ইংরেজ।'

বাবা বাড়ি ফিরে বললেন, 'কীপলিংকেও তাই ইংরেজ বলতে চান না, ওঁদের হিসাবে কীপ্‌লিং 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'। মুস্কিলই হল ওঁদের। যত বড়াই করুক ওরা, বাঙালি কবিকে বিশ্ববাসী বরণ করেছে। ভারতবর্ষের মানুষকেই বা সভ্য জগতে এখন 'অসভ্য' বলবে কি করে ?'

সাহিত্যের স্বীকৃতিতে সমগ্র জাতির প্রতিষ্ঠা, এই কথাটাই বিশেষ করে মনে গেঁথে রইল এই সূত্রে। প্রয়োজনও ছিল। কারণ, আমরা বিবেকানন্দী ছাত্র, নানা ভাবে স্বদেশীর কর্মযোগে উৎসাহী হতে চলেছিলাম। ভাবতাম, ব্যবহারিক জগতে কবিতার দাম কম। তার মূল্য ভাবলোকে, রূপলোকে। তাই বুঝা দরকার ছিল—শুধু মূল্য নয়, কবিতার দামও অসামান্য।

ব্রুনো আপিৎজ

এসথার

এতো এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ক্যাম্পের পাশের জমিতে একটা গ্যাস চেম্বার তৈরি হচ্ছে। কারাগারের একজন কর্মী হল অসওঅল্ড্। সে এতদিনে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ফোরম্যান আর্নেস্ট অথচ কয়দিন ধরে বারবার এই কথাটাই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে এসেছে। প্রায় দিন পনের আগে যেদিন একশোটি গ্রীক ইহুদী মেয়ে এখানে এল, তখনই ওর সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু অসওঅল্ড্ ওর কথায় বিশ্বাস না করে বলেছে, গ্যাস চেম্বার? তুমি পাগল হয়েছ আর্নেস্ট। কেন, কার জন্য? আর্নেস্ট যখন বলল, এই মেয়েদেরই জন্য; সে তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

অসওঅল্ড্ তখন বলেছে, 'যত বাজে কথা। এই মেয়েরা যে-ক্যাম্প থেকে আসছে সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে গ্যাস দিয়ে মারা হয়। মাত্র একশোটি মেয়েকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে, কেবল তাদেরই জন্য সেখানে গ্যাস চেম্বার তৈরি করার কি কারণ থাকতে পারে? সেখানেই যে-কাজ আরো সহজে হতে পারত, তার জন্য এখানে তাদের নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?'

আরো পনের দিন পরে ঘর তৈরি শেষ হল। ঘরের মাঝখানে একটি গর্ত, তার মধ্যে একটি বালতি। বাইরে থেকে একটি নল এই বালতিতে এসে পড়েছে। ভারী লোহার গরাদ দিয়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করা হয়েছে।

আর্নেস্ট বলে, 'আমি জানি। ওই বালতিতে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ রাখা হয়। নল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ তার সঙ্গে মিশে গ্যাসের সৃষ্টি করে।'

এর পরে অসওঅলডের আর প্রতিবাদ করার উপায় থাকে না। সে ভাবতে থাকে—তবে এই পরিত্যক্ত স্থানে যে-ঘরটা তৈরি হয়েছে সেটা গ্যাস চেম্বারই হবে···ওই মেয়েদেরই জন্য।

সেই রাতে অসওঅলডের চোখে আর ঘুম নেই। দশ বছর আগে সে বন্দী

হয়ে কারাগারে ঢুকেছে। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম ও মেয়ে দেখল। পুরুষদের ঘরের পিছনে ব্যারাকে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেসব ঘরের চারপাশে ভালো করে কাঁটাতার জড়ানো হয়েছে। পরদিন সকালে ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েদের ঘরে যেতে হল। মেয়েরা কথা বন্ধ করল কিন্তু একজনও উঠে দাঁড়াল না। কেউ কেউ কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। কয়েদীদের ছেঁড়া জামাকাপড় তাদের সেলাই করে দিতে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ধীরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। এসথারের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি জার্মান ভাষা জান? এসথার হাতের কাজ রেখে মাথা নাড়ল। তখন ওকে আর অন্য দুটি মেয়েকে দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, এদের আমার কাছে নিয়ে এস।

রক্ত নেবার সব ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য ডাক্তার অসওঅলডকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, এর মধ্যে মেয়েগুলোর সম্বন্ধে এইসব জ্ঞাতব্য বিষয়ও জেনে নিও—এদের জন্মের তারিখ, মা বাবার কথা, এদের পেশা কি আর সমস্ত রোগের বর্ণনা।

অসওঅলডের জন্য মেয়েরা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। যে তিনটি মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাদের অদৃষ্টে কী আছে জানবার জন্য সকলে উৎসুক। এসথার চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্য মেয়েদের জানাবার জন্য অসওঅল্ড্ ওকে বলল যে এই ডাক্তারের বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণার আগ্রহ আছে। তাই তাদের কয়েকজনের রক্ত পরীক্ষা করতে চান।

রক্ত?

আরে না না। একটা মশার কামড়ে যতটা রক্ত যায়, তার বেশি নয়।

এসথার ওর কথা তাদের বুঝিয়ে দিল। অসওঅল্ড্ নীচু গলায় ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ভয় করছে?' ও মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি যদি বল যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, তবে আমরা তোমার কথাই বিশ্বাস করব।'

রক্ত নেবার পর অন্য দিনের মতো একটা নির্জন জায়গায় এসথারের সঙ্গে ও দাঁড়িয়ে রইল। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'খুব কি লেগেছিল?'

এসথার শান্তভাবে উত্তর দিল, 'এখানে আমরা দু সপ্তাহ ধরে রয়েছি। কিছুই জানি না আমাদের কি হবে। আগে যে-ক্যাম্পে ছিলাম সেখানে যে-কোনো দিন মৃত্যু ঘটতে পারত। সেটা ঠিক জানা ছিল। সেখানে কেবলমাত্র একটি

পথই ছিল। কিন্তু এখানে? এখানে আমরা কত ভালো আছি। আমাদের দিকে কেউ তাকায় না, আমাদের বিরক্ত করে না। এই অল্প একটু রক্ত আজ নেওয়া হল, আর সেদিন সেই যে ডাক্তার দেখতে গিয়েছিলেন—বাস, এটুকুই। চারিদিক শান্ত। এখানকার বাতাস কত পরিষ্কার। কত হালকা। দিনগুলো কত উজ্জ্বল।'

হঠাৎ অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে এসথার বলে ওঠে, 'এসব দিনের অর্থ কি আমাকে বলে দাও।'

অর্থ? কিছুই না।

সত্যিই কি কিছু না? সব যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে? আমার বন্ধুরা সবাই আর আমি প্রতিদিন এই ভাবনায় অস্থির হয়ে রয়েছি যে আমাদের কি হবে।

কেন তোমরা ভাবছ? তোমরা এখানে আসাতে আমবা খুশি হয়েছি। তোমরা মেয়েরা আমাদের পুরুষদের জীবনে কতখানি আলো আর উত্তাপ নিয়ে এসেছ!

এসথার সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। বলল, 'সেটাই নিশ্চয় আমাদের এখানে থাকার কারণ নয়।'

আমি তো অন্য কোনো কারণ জানি না।

এসথার বলে, 'তোমার উচিত আমাকে সব কথা বলা। আমি ভীতু নই, সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারি। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই। যে-ক্যাম্প থেকে আমি এসেছি সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার বার মরবার শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। সেখানে মৃত্যু যেন বিভিন্ন বেশে আমাদের সঙ্গী হয়ে ছিল। জীবন সেখানে ছিল মৃত্যুরই ছায়া। আমি জানি যে আমরা এই ক্যাম্প থেকেও জীবন্ত ফিরব না। কিন্তু এই যে অনিশ্চয়তার বিভীষিকা, সেটাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।'

'এ সমস্তই তোমার অলীক কল্পনা এসথার', বলল অসওঅলড। তিক্ত হেসে এসথার বলে, 'এখানে যেন কল্পনার কোনো সুযোগ আছে। আমি শুধু জানতে চাই কিভাবে আমাদের মরতে হবে। সেখানে আমাদের গ্যাস চেম্বারে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে কি হবে? তোমাদেরও কি গ্যাস চেম্বার আছে?'

অসওঅলড বলে, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ এসথার।'

'আমি নিজেকেই কষ্ট দিচ্ছি। আমি তো মরতে চাই না। আমার সাহস একটুও নেই—এতক্ষণ শুধু ভান করছিলাম'—বলে এসথার ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ে চুলগুলো এলোমেলো করে নিজের হাত দুখানা মোচড়াতে লাগল।

অসওঅলড অসহায়ভাবে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত সে সাহস করে এসথারের চুলে হাত রাখল।

সেই কোমল স্পর্শের আকুতি এসথারের অন্তরে আঘাত করল। অসওঅলড যে-কথা ওর কাছে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, এই স্পর্শেই তা জানা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে এসথার বলে 'তোমার উত্তরের জন্ত ধন্যবাদ।'

আমি তো তোমাকে কিছুই বলিনি এসথার।

এসথার চোখ বুজে যেন সেই অন্ধকারকে সম্বোধন করে বলল, 'যে-জন্তুকে বাঁচাবার আর উপায় নেই বুঝতে পারে তাকে ঠিক এই ভাবেই মানুষ আদর করে।'

কিছুক্ষণ সে সেখান থেকে নড়ল না, যেন অসওঅলডের সেই কোমল স্পর্শ সে তখনও অনুভব করছিল। তারপর নিজেই হেসে ফেলে বলল, 'আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। আমাদের মেয়েদের এ রকমই হয়। কিন্তু তোমরা ছেলেরা ঢের বেশি সাহসী। তোমরা যদি জান যে মৃত্যু তোমাদের জন্ত অপেক্ষা করে আছে, তবে তোমরা বলবে—কি আর করা, উপায় নেই।'

ওর কথার উত্তর দেবার মতো জোর অসওঅলড নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

ডাক্তার অসওঅলডকে ফোনে জানাল, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসছি। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখো, আর কি যেন নাম মেয়েটির, তাকেও নিয়ে এস।

এক ঘণ্টা সময় আছে। অসওঅলড তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি এনে সব গুছিয়ে ফেলল। তারপর এসথারকে ডেকে নিয়ে এল। আসার পথে ও যেখানে কাজ করে সেসব জায়গা এসথারকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসছিল। অফিসের ঠিক পাশেই ওর শোবার ঘর, মাঝখানে কেবল একটা সরু দেয়াল। সেই ঘরে এসথারকে এনে ওর কানে কানে বলল, 'এখানে জোরে কথা বলার যো নেই।'

এসথার ওর দিকে তাকাতেই দেখিয়ে বলল, 'দেয়ালগুলো এত পাতলা যে আমাদের প্রত্যেকটি কথা ওরা শুনতে পাবে।' এসথার চুপি চুপি বলল, 'তোমার ঘরখানি সুন্দর। এ ছবিটি কার?'

আমার মায়ের।

এসথার অনেকক্ষণ ধরে ছবিখানি দেখল, জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন?'

অসওঅলড মাথা নাড়ল।

দেশে এমন কোনো মেয়ে কি আছে যে তোমাকে ভালোবাসে?

অসওঅলড অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি যখন জেলে আসি তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো বছর।'

এসথার কিছু বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আহা বেচারা।'

অসওঅলড ওর হাত দুখানি ধরে বলল, 'আমার জীবনে তুমিই প্রথম মেয়ে। যখন থেকে তোমাকে দেখেছি—আমি বুঝতে পেরেছি…'

এসথার ওর বিছানার একপাশে বসে পড়ল। দুজনেই চুপ। এসথার ওর হাতখানি নিয়ে নিজের কপালে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ ওরা ওইভাবেই বসে রইল।

দেয়ালের ওপাশে অফিস। সেখানকার সব শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদের ঘর এত নিস্তব্ধ, পাশের ঘরের সব কথা ইচ্ছে করলেই শুনতে পেত। তবে সেই সময়ে ওদের কাছে সেসব কথার কোনো মূল্যই বোধহয় ছিল না। হঠাৎ এসথার সোজা হয়ে বসে মন দিয়ে কি শোনে। পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে অসওঅলডও যেন অসাড় হয়ে যায়। এসথার লাফিয়ে উঠে দেয়ালে কান পাতল। তখন শুনতে পায়…'এই মেয়েরা যদি জানত যে গ্যাস চেম্বারই ওদের ভাগ্যে আছে…'

অসওঅলড দৌড়ে অফিসে গিয়ে বলল, 'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখান থেকে যে সব কথা শোনা যায় তোমরা কি জান না?'

তাড়াতাড়ি আবার এসথারের কাছে এসে দরজা বন্ধ করে। তখনও এসথার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। একটু হেসে মৃদুস্বরে এসথার বলে, 'আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি।'

অসওঅলড এমনভাবে এসথারকে দেয়ালের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে যেন

আর একটু হলে ওর গায়ে আগুন ধরে যাবে। তারপরে যেন ওকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার চেষ্টায় জোরে নিজের কাছে টেনে রাখে।

পরে তারা ডাক্তারের ঘরে এসে তাঁর অপেক্ষায় রইল। দুজনের মনে একই চিন্তা। এসথার বলে ওঠে—'কখন হবে?'

অসওঅলডের মাথা তোলারও সাহস নেই। বলে, 'আমি জানি না।'

এসথার বলে, 'আমাদের মধ্যে আর কিছুই তো গোপন নেই, অসওঅলড, এখন তুমি আমাকে সব বলতে পার।'

'সত্যিই আমি জানি না'—উত্তর দেয় অসওঅলড।

এসথার আর কিছু না বলে যে-টেবিলে যন্ত্রপাতি ছিল সেদিকে স্থির দৃষ্টি রাখে।

ডাক্তার এসে মাপ নিতে শুরু করলেন। প্রথম এসথারের মাথার মাপ নিলেন। অসওঅলড তা লিখে নিল। তারপর তিনি বললেন, 'এবার জামা-কাপড় খুলে ফেল।'

এসথার ভয় পেয়ে যায়। যেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত দিয়ে শরীর ঢাকে। ডাক্তার কঠোর স্বরে বলেন, 'শিগগির কাপড় চোপড় খোল।'

অসহায়ভাবে ভয়ে ভয়ে সে সেই ঘরের পুরুষ দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিল চাপড়ে ডাক্তার আবার বলেন, 'তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।'

বিবর্ণমুখে কাঁপতে কাঁপতে এসথার বেল্ট আর বোতাম খুলে ফেলে লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

অসওঅলড দৃঢ়পদে ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, 'এবার তবে আমি যেতে পারি?' ডাক্তার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'না না, এবার আমাকে যেতে দিন'—বলেই অসওঅলড সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ওর পিছু পিছু ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

অসওঅলডের মুখ উত্তেজনায় বিবর্ণ, ও জানে এ জন্য ওর বিপদ ঘটতে পারে। তবু ওভাবে চলে আসায় যে কাজ হয়েছে তা ও বুঝতে পারল। 'আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব, নিজেকে কি ভেবেছ তুমি?' বলতে বলতে ডাক্তার নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। 'যাও, কয়েদীকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও'—অসওঅলডকে এভাবে নির্দেশ দিয়েই চিৎকার করে

এসথারকে বললেন, 'এখনই বেরিয়ে যাও।' এসথার বেল্টটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল।

অসওঅলড অপেক্ষা করে ছিল, এসথার মাথা নীচু করে সঙ্গে গেল।

সেদিন থেকে এসথারের মধ্যে পরিবর্তন এল। সে যেন এখন অন্য মানুষ। ওর মুখের ভাবও বদলে গেছে।

দুপুরে খাবার সময় ডাক্তার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলে অসওঅলড এসথারকে দেখতে যায়। মেয়েটিও খালি ঘরখানায় ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

এখন ওর মনও আগেকার চেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু এক-এক সময় ওর মধ্যে সেই পুরোনো ভয় জেগে ওঠে। অসওঅলড তা টের পায়। তখন দুজনে দুজনকে এভাবে জড়িয়ে ধরে যেন একে অন্যকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চায়। মন শান্ত হলে পর এসথার জানলার ধারে গিয়ে বাইরে তাকায়। বলে, 'মেঘগুলো কী সুন্দর, আর আকাশ কী নীল !'

ক্লান্ত স্বরে অসওঅলড বলে, 'এখন সেসব দিকে কি করে তোমার চোখ পড়ে ?' জানালার গরাদে কপাল চেপে রেখে এসথার বলে ওঠে—'এসব ছাড়া অন্য কোনো দিকেই আমার দৃষ্টি যায় না। এখন আমি কেবল আকাশ আর মেঘই দেখি। আহা, যদি আমি এসব আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম !'

অসওঅলড ওর কাছে গিয়ে ওর কাঁধে নিজের মাথাটি রাখে। এসথার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই বলে, 'তবু কিন্তু আরেকটি এসথার আমার মধ্যে আছে। সে মেয়েটি সারারাত ধরে নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবে। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, পাছে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সে-আশঙ্কায় ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে বলে ওঠে—'খুনে, খুনে, এরা সব খুনে'।'

ঝুঁকে ঝুঁকে কোনোমতে সে বেঞ্চের কাছে যায়। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ সেখানে বসে। তারপর সব ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে—'আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব। আমার এই হাত দিয়ে ওদের আঘাত করব। আমাকে যদি টেনে নিয়ে যেতে চায়, আমি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। হাজার যুদ্ধ করেও এই মৃত্যুর হাত থেকে তো আমার নিস্তার নেই! আমার পথের শেষ প্রান্তে সেই গ্যাস চেম্বার। যেভাবে আরো হাজার হাজার লোক

মারা গেছে—সেভাবে আমাকেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।'

অসওঅলড ওর খুব কাছেই বসেছিল। ওর বুকের কাছে মাথা রেখে এসথার বলে, 'প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে জেগে যখন চোখ মেলি তখন আবার এই পৃথিবীকে দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। দেখা, শোনা, ছোঁয়া—এ সবের মধ্য দিয়ে আমি সবরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। এখন একটি ছোট চারাগাছের মতো আমার প্রাণ সহজে নিজেকে মেলতে চায়।'

অসওঅলড কথাও বলতে পারে না, ওকে কোনো সান্ত্বনাও দিতে পারে না। কিছু বলার ক্ষমতাই যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। কেবল তার আঙুলগুলি এসথারের চকচকে চুলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ওর অসহায় ভাব দেখে এসথার মৃদু হাসে। বলে, 'আমার সময় তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কালই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আত্মা, সুখ, প্রেম—সবই কি শেষ হয়ে যাবে? আচ্ছা অসওঅলড, তোমাকে যদি কেউ বলে কাল তোমাকে বিষাক্ত গ্যাস দেওয়া হবে, কাল তুমি কালচে নীল রঙের স্ফীতকায় শব ছাড়া আর কিছুই নও, তীব্র দুর্গন্ধময়, ঘৃণ্য…'

অসওঅলড শিউরে উঠে ওর মুখ চেপে ধরে।

এসথার মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার বলে, 'তুমি কি এসব কথা অস্বীকার করতে পার অসওঅলড? অথচ আমি যে কেবল একটি মধুর ধ্বনির মতো মিলিয়ে যেতে চাই। আমার জীবনের ছন্দ বড় রকমের একটি দোলা দিয়ে শেষবারের মতো বিলীন হয়ে যাক—এই আমার সাধ। আমি যখন আকাশে মেঘ দেখি—অথবা তুমি যখন আমাকে আদর কর, তখন আমার মনে হয়—আমি অনেক উপরে ভেসে বেড়াচ্ছি। এ ধরণীর ধুলোয় জন্মেছি, ধুলোতেই মিশে যাব এ কথা ঠিক। কিন্তু এরই মাঝে যে রয়েছে জীবন, বেঁচে থাকা—আহা, শুধু বেঁচে থাকা!' আবেগে অসওঅলডকে জড়িয়ে ধরে বলে যায়, 'কেন জানি না আমার এখন এ তৃষ্ণা জাগল। সহজভাবেই তোমাকে বলি। তুমি বুঝতে পারছ তো? আমরা আর একটুও সময় নষ্ট করতে পারি না। মরতে তো আমাকে হবেই। আর ঠিক এই মুহূর্তেই প্রেম এল আমার দ্বারে। এ কি করুণা না ভাগ্যের কৌতুক? একে আমি কি ভাবে গ্রহণ করতে পারি? কি করে আমি নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত

করব ? ঝাঁপিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমার তো আর অন্য উপায় নেই।'

বলে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শুষ্ক, সংযত সেই ক্রন্দন। ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে, খুব ধীরে ধীরে ও শান্ত হয়। দুর্বলভাবে অসওঅলডকে ও জড়িয়ে ধরে। চোখের জলে ভেজা মুখ যখন তোলে, বেদনার মৃদু হাসিতে কেবল ঠোঁট দুটি একটু কাঁপে।

অসওঅলডের মুখে বার বার হাত বুলিয়ে এসথার বলতে থাকে, 'তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় অসওঅলড, তুমি মেঘের মতো, গাছপালার মতো—ঐ নীল আকাশের মতো।'···

সে-রাতে এসথারের ঘুম হল না। মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাবনার উদয় হতে লাগল। একবার দেখল, সে খুব জোরে ডাক্তারের গলা টিপে ধরেছে, তারপর ওর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার মনে হল অসওঅলড আর ওর সঙ্গীরা কয়েকজন ওকে বাঁচাবার জন্য কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করে আছে। এসথারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম শুনতে পায়, ও ডাক্তারের সঙ্গে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে কথা বলছে। ক্রমশ সেই গলার স্বর নেমে যায়। আবার শোনে সব মেয়েদের কাছে সে আবেদন করছে তারা যেন নিজেদের মুক্তি দাবি করে। হঠাৎ আবার এই দৃশ্যেরও পরিবর্তন ঘটে, দেখে ও গ্যাস-চেম্বারে গেছে, চিৎকার করছে। নিজের বিকৃত মুখখানা ও স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু ওর আতপ্ত মস্তিষ্ক এই ভাবনার শেষে পৌঁছতে পারে না। অপরিসীম ক্লান্তিতে ওর সমস্ত চিন্তা ডুবে যায়। তার পরেই আবার ডাক্তারের লালসাপূর্ণ কুৎসিত দৃষ্টি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঘৃণায় বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে হাত দিয়ে ও নিজের দুটো চোখই ঢেকে ফেলে। ওর রক্তের গতি আর নাড়ির স্পন্দন ও যেন নিজের কানে শুনতে পায়। মনে হয় যেন হাওয়ায় ভেসে ও চেতনার সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। হঠাৎ পাশের মেয়েটির কাশির শব্দে ওর ঘুম সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। তখনই কঠিন বাস্তবের আঘাত এসে ওর চেতনায় লাগে।

পরদিন দুপুরবেলা এসথার খুব তাড়াতাড়ি সেই খালি ঘরটায় চলে গেল। অসওঅলড আসামাত্র অধৈর্য হয়ে ওর কাছে ছুটে গেল।

কি হয়েছে, এসথার ?

কিছুই না, তুমি আজ এত দেরি করে এলে ?

কই, প্রতিদিন এই একই সময়ে তো আসছি।

না, না, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে—বলে অসওঅলডের কাঁধে মাথা রাখল। তারপর ওকে টেনে নিয়ে বেঞ্চের কাছে গিয়ে বলল, 'আমরা এখানে একটু বসি।'

দুজনে পাশাপাশি বসল। এসথার অসওঅলডের হাত ওর হাতের মধ্যে টেনে নিল। বলল, 'এখনও হয়তো কিছু দেরি আছে।'

থাক এসথার, এখন আর ওসব ভেবো না।

অনেকক্ষণ ধরে এসথার ওর হাত দুখানি দেখল। তারপর একখানি হাত নিয়ে ওর মুখে ঠেকাল। সমস্তটাই সে এক পূজারিনীর ভঙ্গিতে করল। পরে ওকে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ অসওঅলড ওকে কাছে টেনে নিয়ে আবেগে চুম্বন করল—আর সে আত্মসংবরণ করতে পারে না। এসথার চোখ বুজে রইল। এক সময় এসথার সরে আসছিল। কিন্তু যখনি অনুভব করল নারীদেহে অসওঅলডের এই প্রথম লাজুক স্পর্শ, সেই স্পর্শের শুচিতা তাকে মুগ্ধ করল। তার অন্তরতম সত্তা এই ভেবে গভীর ক্রন্দন করে উঠল যে অসওঅলডের পক্ষে যা প্রথম, ওর পক্ষে তাই শেষ।

চুপিচুপি ওকে বলল, 'এমন কিছু একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে অসওঅলড, যাতে আমরা একবার অন্তত নিজেদের একা পাই। তোমার ছোট ঘরখানার কথাই ভাবছি। আমি সেখানেই তোমার কাছে আসব। দেখো, কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখনও তো আমার মধ্যে জীবন রয়েছে, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। আমি দেখতে সুন্দর অসওঅলড, তোমার জীবনে যে পাওয়া হবে প্রথম, আমার জীবনে তাই হবে শেষ।'

অসওঅলড ওকে থামাবার চেষ্টা করতেই এসথার তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল। বলল, 'না না, তুমি কি বলতে চাও আমি জানি। সেসব কথার এখন কোনও প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি পার তুমি এর ব্যবস্থা কর। কালই কর নয়তো পরশু রবিবারে।'

এভাবে ছোটখাট প্রণয়লীলার মধ্যেই তাদের প্রেমের মিলন-সম্ভোগের

স্নানকালের ব্যবস্থা দুজনে মিলে করে ফেলল ; যে-মিলন অসওঅলডের জীবনে প্রথম আসবে, এসথারের জীবনে তাই হবে অন্তিম পাথেয়।

রবিবার বিকেলে ডাক্তার চলে যেতে আর ঘর খালি হতেই অসওঅলড এসে এসথারকে ডেকে নিয়ে গেল। এসথার সঙ্গে একটি ছোট প্যাকেট নিয়ে এসেছিল। এর-মধ্যে কি আছে জিজ্ঞেস করতেই এসথার বলল, 'গোপনীয় কিছু।'

অসওঅলড ডাক্তারের ঘরেই ওকে নিয়ে এসেছে। ভিতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল, কারণ জানালায় কালো পর্দা দেওয়া ছিল। রুগীদের পরীক্ষা করার জন্য যে বড় কোঁচখানা ছিল, সেখানা আগেই সে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে।

বাঃ কি সুন্দরভাবে তুমি সব প্রস্তুত করে রেখেছ। আমরা অনেকক্ষণ সময় পাব তো?

হ্যাঁ, রাত্তির পর্যন্ত।

এসথার দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাকে অবাক করে দেব। তুমি পিছন ফিরে চোখ বুজে বস। আমি যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চোখ খুলো না কিন্তু।'

কৌতূহলে অধীর হয়ে অসওঅলড প্রতীক্ষা করতে থাকে। কাগজের প্যাকেট খোলার শব্দ হয়।

তুমি কি করছ?

খবরদার, এদিকে তাকাবে না।

আবার কাগজে কিছু জড়িয়ে এক কোণায় ছুঁড়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। তার পরে সব চুপচাপ।

এবার এসথারের গলা শোনা গেল,—'চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিতে পার। কিন্তু চোখ বন্ধ রেখেই ঘুরে বস।'

অসওঅলডও তাই করল।

এইবারে তুমি আমার দিকে তাকাও।

অসওঅলড দেখল, ওর সামনে এসথার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুনিপুণ বেশে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী। ওর পোশাকটি তৈরি হয়েছে আকাশনীল রেশমে, তাতে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা যেন ফুটে রয়েছে।

অসওঅলড মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে অবাক করে দিতে পেরে এসথারের চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল।

কোথায় পেলে তুমি এই পোশাক ?

এসথার খুশির আবেগে ঘুরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের নরম ভাঁজগুলি ওর চারপাশে ঘুরে এল। বলল, 'আমার সুটকেসেই পেলাম। আমাকে বন্দী করার সময় ওরা বলেছিল কিছু কাপড়চোপড় সঙ্গে নিতে। তখনই তাড়াতাড়িতে এই পোশাকটিও ওর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। কত মাস ধরে মিথ্যে এটিকে বয়ে বেড়িয়েছি।' 'না না মিথ্যা নয়' বলে অসওঅলডের কাছে গিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে তোমার চোখে সুন্দর হয়ে ওঠার জন্য ওটা আমাকে আনতেই হত।'

অসওঅলড আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর দেহের উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল, তার পরেই লজ্জায় এসথারের কাঁধে ওর মুখ লুকোল।

এসথার টের পেল ওর মনে ভয় জেগেছে। তখনই মায়ের মুখের মতো স্নেহ-মধুর হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ঘুরে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে এসথার বলল, 'আমি সুন্দর তো ?' তখন ওর চোখ দুটো জ্বলছে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে এলোমেলো চুলে ও দাঁড়িয়ে রইল।

পোশাকটি সুন্দরভাবে আঁট হয়ে ওর শরীরে চেপে বসেছিল। অসওঅলডের মাথায় হঠাৎ এই ভাবনাটা এসে ওকে কষ্ট দিতে লাগল—কাল তো এই হবে এসথারের মৃতদেহ, এ ছাড়া আর কিছু নয়।—আবার অধৈর্য হয়ে এসথার বলে ওঠে, 'আমি সুন্দর কিনা তাই বল।'

বলে খুব জোরে হেসে উঠল। অসওঅলড দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে চুম্বনে চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুলল।

তুমি যে আমার ফ্রক ছিঁড়ে ফেলবে।

মুহূর্তের জন্য ওর মনে ভয় এল, পরক্ষণেই ওর বুকে মাথা রেখে বলল, 'ছিঁড়লেই বা কি, আমার তো আর কখনও এর প্রয়োজন হবে না।'

অসওঅলড ওর কথায় কান না দিয়ে কৌচের ওপর ওকে শুইয়ে দিল। দরজার বাইরে যে মৃত্যু নিঃশব্দে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে তাকে এসথারও ভুলতে চায়।

ওর জীবনের শেষ প্রেমের কাছে একবার ও সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ

করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ তা ও পারে না। ওর উত্তপ্ত রক্তের মধ্যেও মৃত্যুর পদধ্বনি বেজে উঠে অন্য সব শব্দকে ডুবিয়ে দেয়। সেই ছায়াশীতল স্পর্শকে ও কেবলি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

এসথার চায় ওর জীবনের এই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে ও সচেতনভাবে উপভোগ করবে, কিন্তু ও বার বার হেরে যায়—সমুদ্রকূলে বালুকণার মতো ওর চিন্তাগুলি ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে কোথায় উড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কটা বাজল ?'

অসওঅলড ওর বুকে মাথা রেখে স্বপ্নাতুর কণ্ঠে উত্তর দেয়—'আরো অনেক সময় আছে।'

এসথার আপন অঙ্গে অসওঅলডের প্রেমবিহ্বল স্পর্শ পায়, আর, মা যেভাবে ক্রন্দনরত শিশুকে আশ্বস্ত করে—তেমনি অসওঅলডের মুখে হাত বুলোতে থাকে। ওর নিজের অন্তরের অশ্রুনদীতে বান নেমেছে। কোন্ আশাহীন ভরসাহীন অজ্ঞাত কূলে গিয়ে ওর জীবনতরী ডুবে গেছে। ঠিক যেখানটায় অসওঅলড মাথা রেখেছে, সেইখানে সে অসহ্য বেদনা বোধ করে, চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, শূন্যদৃষ্টিতে সে রুদ্ধ ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুদিন ধরে এসথার অসওঅলডের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে। অবশেষে তৃতীয় দিনে যখন অসওঅলড খালি ঘরটায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এল তখন ও অত্যন্ত ক্লান্তভাবে মাথা তুলে তাকাল। একে অন্যের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকে যেন ওরা পরস্পরের অচেনা।

আমি আসতে পারি নি, এসথার।

হাসবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে এসথার।

হঠাৎ অসওঅলড মাটিতে বসে পড়ে এসথারের কোলে মুখ ঢাকল। এসথার ভয়ে বিস্ময়ে বলে ওঠে, 'তোমার হল কি ?'

অসওঅলড লাফিয়ে উঠে শক্ত করে ওর কাঁধ চেপে ধরে বলে, 'আজ রাতে তোমাকে আবার আমার কাছে আসতে হবে। আসতেই হবে কিন্তু, তোমাকে আমার খুব দরকার।'

আমাকে ?

তুমি আমার জন্য খালি ঘরটায় অপেক্ষা করবে, আমি এসে তোমাকে

নিয়ে যাব। এখন আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করো না, তোমাকে আসতেই হবে, বুঝেছ ?

সে-রাতে চাঁদের আলো ছিল না। ক্যাম্পের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। রাত একটায় অসওঅলড মেয়েদের ঘরের দিকে গেল। এসথার অপেক্ষা করেই ছিল। জানলা বেয়ে নেমে গিয়ে ও অসওঅলডের প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে ধরা দিল।

অসওঅলডের ঘরে গিয়ে এসথার ক্লান্ত হয়ে ওর বিছানায় বসে পড়ল। তার পরে ওর দিকে তাকাতেই ওর বিবর্ণ মুখখানি এসথারের নজরে পড়ল। ওকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এসথার নিজের মনেই অনুমান করল অসওঅলডের এই পরিবর্তনের কারণ কি ? বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'তোমাকেই করতে হবে বুঝি ?'

অসওঅলড ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বার বার ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল। এসথার ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকাল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অসওঅলডের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমিই ? তবে কি তুমিই ?'

অসওঅলড মাথা নীচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

এসথার ওকে স্পর্শও করল না। বিনা অভিযোগে ফিরে গিয়ে আহতের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওরা চিন্তাগুলো যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। একদৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

এসথারের অশান্ত হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ মুহূর্তগুলি অতিক্রান্ত হতে থাকে। অবশেষে এসথারের ঠোঁট একটু নড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'কখন ?'

অসওঅলড অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে আবার এসথার জিজ্ঞেস করে, 'কখন ?'

অসওঅলড কথা বলতে চেষ্টা করে, মুখ থেকে শব্দ বেরোয় না। এসথার আবার বলে, 'বলো না, কোন্ দিন ?'

অনুনয়ের ভঙ্গিতে অসওঅলড তার হাতটি তুলে ধরল। এসথার জিজ্ঞেস করে, 'কালই ?'

দুজনে একদৃষ্টে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অসওঅলড ওকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে আসে। ওকে ধাক্কা দিয়ে

সরিয়ে, দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে এসথার চুপি চুপি যেন নিজেকেই বলতে থাকে—আজই তবে আমার জীবনের শেষ রাত্রি! যাও সরে যাও—আমাকে ছেড়ে দাও। উঃ, কী অসহায় একা আমি। প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বিছানাতেই আবার শুয়ে পড়ে। কান্না চাপবার জন্য বালিশ কামড়ে ধরে।

অসওঅলড ওর পিঠে হাত বুলোতে থাকে। এবার অতিকষ্টে এসথার উঠে বসল। বলল, 'আমাকে দুর্বল হলে চলবে না। এখনই যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, কাল তবে কি হবে?'

অসওঅলড ভরসা দিয়ে বলে, 'কাল? কাল কিছুই হবে না।' ওর চোখ দুটো আশ্বাসে জলজল করে ওঠে। বলে, 'কোনো ভয়, কোনো কষ্ট নেই, কিছুই না।'

পাশের ছোট টেবিলটা একটা শাদা কাপড়ে ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলে বলে, 'দেখ, দেখ, তাকিয়ে দেখ একবার, তোমার আর আমার জন্ত কি এনেছি।'

দুটো সিরিঞ্জ আর অনেকগুলো ইনজেকশানের অ্যামপুল টেবিলটার উপরে পড়েছিল। এসথার জিজ্ঞেস করে, 'এসব কি?' উপহার দেবার মতো করে একটি অ্যামপুল হাতে তুলে নিয়ে অসওঅলড বলে, 'মরফিয়া।'

মরফিয়া?

নিশ্চয়—সজোরে চিৎকার করে উঠে অসওঅলড ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর মুখে যেখানে সেখানে চুম্বন করতে করতে বলে চলল,—'এ যে কী চমৎকার জিনিস, তোমার কোনো ধারণা নেই এসথার। আমরা দুজনে অনেক উঁচুতে উঠে কোমল মেঘের সঙ্গে ভেসে ভেসে বেড়াব।'

এসথার মুগ্ধ হাসি হেসে বলল, 'সত্যি, কি মজা! আচ্ছা, তার পরে কি হবে?'

তার পরে আমরা ঘুমোব।

এসথার যেন অনেক দূর থেকে বলে উঠল, 'আর কখনও জাগতে হবে না?'

না, আর কোনো দিনও জাগতে হবে না।

এসথার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'বেশ।'

অসওঅলড বলে যায়,—'তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমি তাই তোমাকে ফিরিয়ে দেব। তুমি একটি ঘরের দরজা খুলে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছ। আর কেবল একটি পা এগিয়ে এস এসথার, আমি তোমাকে অন্য একটি ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করব। তখন তুমি দেখবে যে এ দুইই সমান, কোনো তফাৎ নেই।'

এসথার এবার চোখ বুজল। একটি হাসির আভা এসে ওর মুখখানাকে অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে তুলেছে।

অসওঅলড একলাফে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার প্রস্তুত হও।'

অসওঅলড যখন টেবিলের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, এসথার তখন চোখও খোলে না, একটু নড়েও না। চুপ করে থেকে সিরিঞ্জের শব্দ, কাঁচ ভাঙার শব্দ সবই শুনতে পায়। তারপরে গভীর স্তব্ধতা। এবার সিরিঞ্জ ভরা হয়ে গেছে।

প্রগাঢ় অন্ধকার এসে এসথারকে ঢেকে ফেলল। সে যেন বহু বহু দূরে মিলিয়ে গেল। সে এখন সম্পূর্ণ একাকী। তার রুদ্ধ চোখের অন্তরালে স্থানকালের অতীত হয়ে সে অবস্থান করছে। অসওঅলড ওর বাহুতে হাত রেখে ডাকল—'এসো।'

অনেক দূরের পথ থেকে যেন এসথার ফিরে এসেছে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলল। অসওঅলড সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতের সিরিঞ্জটি চকচক করে উঠল। সকৃতজ্ঞভাবে অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসল, কিন্তু সিরিঞ্জটি ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এসথার বলে, 'না, না—এ কিছুতেই হতে পারে না। এ পথ যতই লোভনীয় হোক, তুমি বা আমি—কেউই এই ভুল পথে চলব না। আমরা তো অবাধ কল্পনাপ্রবণ প্রণয়ী নই। হয়তো তুমি এখনও বেঁচে থাকবে। আবার হয়তো নাও বাঁচতে পার। কিন্তু আমাদের পরে যে আরো হাজার হাজার মানুষ আসবে। যে-মৃত্যু আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে, সে মৃত্যুই আমাদের কামনা। আমাদের এই মৃত্যুর পিছনে আমি মহান একটি জাগরণের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার যুগের কুয়াশা ভেদ করে আমি নিজের চোখেই যেন অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি যা আসছে তা আমাদের মৃত্যুকে সার্থক করে তুলবে। এই মুমূর্ষু যুগ নিষ্করুণ ভাবে আমাদের জীবনের অবসান ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার

একার জন্য সহজ মৃত্যু কামনা করব না। কারণ ক্ষেতের প্রান্তে যে-বীজ ছিটকে পড়ে, তাতে ফসল হয় না। আমি ভাবিকালের ব্যাপক উর্বর মাটিতে পড়তে চাই।'

অসওঅলডের কাছে গিয়ে এসথার মায়ের মতো স্নেহভরে দু-হাতে ওর মুখখানি তুলে ধরল। বিদায় জানাতে গিয়ে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল। দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'অসঅলড, আমার জীবনের অন্তে পুরুষের শেষ প্রেম পেলাম তোমারই হাতে।'

একটি লরি এসে মেয়েদের ঘরের সামনে থামল। তার ভিতর থেকে ডাক্তার এবং কারারক্ষীরা নামলেন কয়েকটি কুকুর এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে। দুজন কারারক্ষী আর ডাক্তার ভিতরে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে আঠারোটি মেয়ে কয়েদী নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। ধীর শান্ত ভাবে মেয়েরা লরিতে গিয়ে উঠল। দলের মধ্যে সকলের পিছনে ছিল এসথার।

সে যেন চোখ বন্ধ করে চলেছে, তার কারণ বোধহয় দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসছিল। ডাক্তার অতি বিনীত হাস্যে তাকে লরির পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ফোরম্যান আর্নেস্টের কাছে পরে শোনা গেল, গ্যাস চেম্বারের সামনে নিশ্চয় মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে কেউ বাঁচার জন্য শেষ সংগ্রাম করেছিল। কারণ সেখানকার মাটি এবড়ো খেবড়ো, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গ্যাস চেম্বার থেকে আশি মিটার দূরে ওরা দেখল একটা জায়গায় রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—আর তার কাছেই একটা ছেঁড়া পোশাকের টুকরো পড়ে আছে। পাদপিষ্ট নোংরা একটা কাপড়ের ফালি—আকাশ-নীল রেশমে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অনুবাদ : মলিনা রায়

ইভা লিয়ুস্তারনিক

গোর্কী ও ভারত

[লেনিনগ্রাদের ভারতবিদ ইভা লিয়ুসতারনিক সম্প্রতি ইতিহাসে ডক্টর সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ডিগ্রীর জন্য তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রদান করেছেন। এই নিবন্ধের বিষয় ছিল, উনিশ শতকে সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। ইভা লিয়ুসতারনিক এই বিষয়ে গত তিরিশ বছর ধরে কাজ করেছেন, বিভিন্ন সোভিয়েত শহর ও নগরে গিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।]

ভারতের সুমহান ও উচ্চস্তরের মৌলিক সংস্কৃতির প্রতি গোর্কী গভীর আগ্রহশীল ছিলেন। ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি সর্বদাই আন্তরিক সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। স্বৈরাচার, অত্যাচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণের অবদানের সুনিশ্চিত অভিব্যক্তি যে ঘটতে বাধ্য, তার তাৎপর্যের উপর তিনি বরাবর জোর দিয়েছেন। সোভ্রেমেন্নিক সাময়িকপত্রের একজন প্রধান কর্মী হিসেবে ১৯১২ সালে তিনি ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও বি. আর. কামা-র সাথে সংযোগ স্থাপন করেন; তাঁরা সেই সময় পশ্চিম ইয়োরোপে ছিলেন।

গোর্কী তাঁদের সাথে সক্রিয় পত্রালাপ চালু রেখেছিলেন এবং ভারতীয় সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক সাময়িকপত্র সম্পর্কে আরো বেশি জানার চেষ্টা করেছিলেন।

১৯১২ সালের ১৪ই অক্টোবর গোর্কীর সেক্রেটারির কাছে এক চিঠি লিখে শ্রীমতী কামা জানিয়েছিলেন যে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কে কিছু বই-পত্র তিনি গোর্কীকে পাঠিয়েছেন। এ চিঠি থেকে এটাও অনুমিত হয় যে, গোর্কী বন্দেমাতরম্ পত্রিকার গ্রাহক হতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু শ্রীমতী কামা জানিয়েছিলেন: "মিঃ গোর্কীকে আমি পত্রিকাটি পাঠিয়ে যেতে পারলে খুবই আনন্দিত হব।"

প্রগতিশীল পত্রিকা ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট-এর প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ বর্মা ১৯১২ সালের অক্টোবরে গোর্কীর সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন: "আপনার ১১ই তারিখের চিঠির উল্লেখ করে জানাচ্ছি যে আমি আনন্দের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট-এর শেষের দশ সংখ্যা মসিয়ঁ এম. গোর্কীর নামে বুক-পোস্টে পাঠাচ্ছি; তাঁর নাম গ্রাহকতালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে পাঠান হবে।"

কিছুদিন পরে মূল সূত্র থেকে সংগৃহীত উপকরণাদির ভিত্তিতে গোর্কী সোভ্রেমেননিক-এ এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে লেখক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মুখোশ খুলে দেন এবং ভারতীয় জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের বিবরণ সহানুভূতির সাথে বর্ণনা করেন।

পরবর্তী কালে গোর্কী শ্রীমতী কামা ও শ্রীকৃষ্ণ বর্মাকে সোভ্রেমেননিকে প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। ১৯১২ সালের নভেম্বরে গোর্কী এক পত্রে সোভ্রেমেননিকের সম্পাদক ইভগেনী লায়াতস্কীকে বলেছিলেন: "ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাশিয়া ও বৃটেনের প্রতি ভারতের মনোভাব সম্পর্কে সোভ্রেমেননিক-এ একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য আমি কৃষ্ণ বর্মাকে (ভারত) বলেছি।...'বর্তমান কালে ভারতীয় নারীর সামাজিক স্থান এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে তাদের ভূমিকা' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ দেবার জন্য আমি কামাকে (ভারত) লিখেছি।" ভারতে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলনের বিষয়ে রুশ গণতন্ত্রীদের অবহিত করাবার ইচ্ছা থেকেই গোর্কী রাশিয়ান রিভিয়ুতে একটি প্রবন্ধ দেবার জন্য কৃষ্ণ বর্মাকে বলেছিলেন: "ন্যায়ের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, বিবেচনা বোধের সাথে সম্প্রীতির মধ্যে যাঁরা জীবনযাপন করতে চান, তাঁরা সকলে যাতে ..বিশ্বের সকল অশুভের চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে সমর্থ এক অদম্য শক্তি সৃষ্টি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন" তার জন্য দুইটি জাতির পরস্পরকে জানার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছিলেন। রুশ-ভারত সম্পর্কের বিকাশে লেখকের আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিচয়ই এই সব চিঠি থেকে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ বর্মাকে ভারতের স্বাধীনতার একজন অক্লান্ত যোদ্ধা হিসাবে বর্ণনা করে গোর্কী তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বর্মা লেখেন: "ইয়োরোপে অন্তত কয়েকজন প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজেদেরই নয়, বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

করেন, এটা লক্ষ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।...আপনার মহৎ সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

শ্রীমতী কামাকে ঘিরেই ভারতীয় বিপ্লবী দেশপ্রেমিকেরা সমবেত হয়েছিলেন। কামা কিভাবে এক সময় 'ঝোড়ো পাখির গান'-এর বিষয়বস্তু জানতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তৎকালীন আধুনিক প্রাচ্যের সমস্যার বিষয়ে গবেষণাকারী প্রথম রুশ মার্কসবাদীদের অন্যতম মিখাইল প্যাভলভিচ (ওয়েলট ম্যান) তাঁর স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেছেন : "আমি যখন তাঁকে বললাম, তিনি তখন কবিতাটি তাঁকে সংগ্রহ করে ও ফরাসীতে অনুবাদ করে দিতে বলেন। কিছুদিন পরে আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমি যখন গোর্কীর সেই কবিতাটি, অক্ষম অনুবাদ হলেও, যথার্থ ভাষান্তর করে তাঁকে উপহার দিলাম তখন তাঁর সেই আনন্দাশ্রু আমার এখনও মনে পড়ে।" গভীরভাবে অভিভূত হয়ে তিনি বলেছিলেন : "এই কবিতাটি যে-কোনো প্রবন্ধ বা ইস্তাহার থেকেই ভাল।"

সোভ্রেমেননিক-এর সাথে সহযোগিতার জন্য গোর্কীর আমন্ত্রণ কামা সাদরেই গ্রহণ করেন। গোর্কী তাঁকে লিখেছিলেন : "গঙ্গার তীরের অধিবাসীদের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে, মহান ভারতের গণতন্ত্রী ও নারীসমাজ সম্পর্কে রুশ গণতন্ত্রী ও রুশ নারীসমাজকে অবহিত করার জন্য তাঁরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

প্রত্যুত্তরে কামা লেখেন : "আমাদের দেশের আদর্শ ও সংগ্রামেতেই আমার সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয়িত...আমি আমার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করব।"

এই ভারতীয় দেশপ্রেমিক গোর্কীকে লেখা তাঁর চিঠির শেষে আন্তরিক অনুভূতি ও আত্মিক একাত্মতা ব্যক্ত করে লিখতেন : "আপনার সহোদরোপমা, বি. আর. কামা।" নিজের স্বাক্ষরিত এক আলোকচিত্র গোর্কীকে পাঠিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবও ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯১৭ সালের আগস্টে গোর্কীকে লেখা তাঁর শেষ পত্রটি এম. প্যাভলোভিচের (ওয়েলটম্যান) মারফৎ পাঠিয়ে পত্রটি রাশিয়ায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পত্রটি হারিয়ে যায়।

জে. বি. এস. হলডেন

বিশপ ও স্পুৎনিক

[পরিচয়, ১৩৬৫ মাঘ সংখ্যায় অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের 'বিশপ ও স্পুৎনিক' রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। মূল রচনাটি যে ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত তা এদেশে বিশেষ প্রচারিত নয়। অধ্যাপক হলডেন সে-সময়ে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে রচনাটি 'পরিচয়'-এ মুদ্রনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সমসাময়িক কয়েকটি ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি এই রচনায় যেসব মন্তব্য করেছেন তা থেকে তাঁর চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যাবে। বিজ্ঞানী হলডেন ও মানুষ হলডেন উভয়েই এই রচনায় সমভাবে উপস্থিত। অধ্যাপক হলডেনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনাটি আমরা পুনর্মুদ্রিত করলাম।—সম্পাদক]।

বিশ্ব-ক্ষমতালাভের চলতি লড়াইকে এখানে ভারতে আমরা হয়তো সবচেয়ে সংস্কারমুক্ত চোখে দেখতে পারি। এ কথা সত্যি যে ভারতই একমাত্র দল-নিরপেক্ষ দেশ নয়। সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রীয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, শেষোক্ত তিনটি দেশের অধিকাংশ লোকই চাইবে যে 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে' সোবিয়েত না জিতে আমেরিকা জিতুক। যদিও তারা ভালো করেই জানে যে মাত্র একটি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রও যদি পাল্লা শেষ হবার আগে মাটিতে পড়ে তাহলে তাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো বড়ো শহরগুলো লোপ পেতে পারে। এবং যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো (বা, অন্তত আমেরিকানদের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো) সত্যি সত্যিই পাল্লা শেষ হবার আগে মাটিতে পড়ে, সেক্ষেত্রে তাদের বরং চাওয়া উচিত যে এ-ধরনের অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার চেয়ে 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে' সোবিয়েতই জিতুক। একই কারণে এ-ও সম্ভব যে মিশরের অধিকাংশ লোক সোবিয়েতের জয়ের পক্ষে। যদিও তারা বিবদমান দলগুলোর কোনো পক্ষেই নয় এবং যেহেতু তাদের দেশে বৃষ্টি কম বলে তেজস্ক্রিয় অধঃক্ষেপণও কম—সুতরাং গরম লড়াই সম্পর্কে ভীত হওয়ার যৌক্তিকতাও তাদের কম।

ভারতে আমরা সত্যিকারের পক্ষপাতহীন। আমাদের কমিউনিস্টরা এবং হয়তো আরো কেউ কেউ চায় যে আমরা সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের দলে ভিড়ে পড়ি। আমাদের ধনীদের মধ্যে কারও কারও ইচ্ছে যে আমরা 'সিয়াটো' (SEATO) বা এ-ধরনের কোনো সংগঠনে যোগ দিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে আমেরিকানদের পক্ষে সামিল হই। জনকয়েক বুদ্ধিজীবীরও এই মত। আমরা অধিকাংশ ভারতীয় বাইরের জগৎ সম্পর্কে খুবই কম জানি, যেমন কম জানত সত্তর বছর আগে একজন সাধারণ ইংরেজ। কিন্তু পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদের পক্ষ সমর্থন করার কোনো যুক্তি আমাদের আছে বলে মনে হয় না। এ দুয়ের কোনোটাই ভারতীয় আদর্শের অঙ্গীভূত নয়। শিক্ষিত ভারতীয়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—ভারতের বাইরের জগৎ সম্পর্কে যাদের যথেষ্ট জ্ঞান—তারা তাদের সরকারের নীতিকে অবিচলভাবে সমর্থন করে। তারা কঠোর সমালোচনা করে 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে' উভয় পক্ষে সামিল দেশগুলোর সরকারের কার্যাবলীকে। যেমন, হাঙ্গেরি ও আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত কার্যাবলীকে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন দু-দুটো উপগ্রহ আকাশে তোলার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উপগ্রহ আকাশে তুলেছে। তা-ও অনেক ছোটো—এই ঘটনায় এখানকার শিক্ষিতমহল রীতিমতো নাড়া খেয়েছে। অবশ্য সামরিক ক্ষমতায় আমেরিকা সোবিয়েত ইউনিয়নের নাগাল ধরতে পারে। কিন্তু কথাটা আমার বলা দরকার যে এখানে সবাই মনে করে, এমন ঘটনা না ঘটাই বরং সম্ভব। সোবিয়েতবাসীরা কেন আমেরিকানদের ও তাদের মিত্রদের পিছনে ফেলতে পেরেছে—এ প্রশ্ন স্বভাবতই কৌতুহলোদ্দীপক। কমিউনিস্টরা বলে যে সাম্যবাদের উন্নততর নৈপুণ্যই এর কারণ। ভারত সরকারের সমর্থকরা কথায় ও লেখায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুণগান করে। যদিও তারা এ কথা বলতে কসুর করে না যে পুঁজিবাদকে দমন করার জন্যে সোবিয়েত ইউনিয়নে যেসব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার হয়েছিল বা চীনে হচ্ছে, তা না করেও ভারত সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। এই মনোভাব সঠিক কিনা তা ভবিষ্যতে জানা যাবে। আমার ধারণা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক অগ্রগতির বড়ো রকমের সহায়ক—এতে সন্দেহ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। আর এ কথাও অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে মার্কিন অর্থনীতি বৃটিশ অর্থনীতির চেয়ে অনেক বেশি সুপরিকল্পিত আর মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ কৃতিত্ব এফ-ডি রুজভেল্টের।

যাই হোক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে সওয়াল করার জন্যে এ প্রবন্ধ নয়। আমি যে-কথাটির উপরে জোর দিতে চাই তা হচ্ছে এই যে, ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোবিয়েত সাফল্যের একমাত্র কারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয়। ১৯২৮ সালে আমি যখন সোবিয়েত দেশ পরিদর্শনে গিয়াছিলাম তখন সেদেশে সমাজতন্ত্রের নিদর্শন দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও গবেষণার ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখে। তখনো পর্যন্ত সেদেশে সমাজতন্ত্রের পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হতে অনেক বাকি ছিল এবং স্পষ্টতই তার সফলতাও আসেনি। ভাগ্যক্রমে সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার মতামত সে-সময়কার একটি বক্তৃতায় লিপিবদ্ধ আছে। বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল ফেবিয়ান সোসাইটিতে, ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে এবং ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'মানুষের অসাম্য' (The Inequality of Man) বইয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ওই একই বইয়ে এমন কতকগুলো মতামত আমি প্রকাশ করেছি যে জন্যে এখন আমি দুঃখিত। এসব মতামতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার বিচার পরবর্তীকালের ঘটনায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তখন আমি যা লিখেছিলাম তারএকটি শব্দের জন্যেও আমি দুঃখিত নই। এমন কি গোটাকয়েক উদ্ধৃতিও দিতে পারি :

'রুশ শহরের ছেলেমেয়েরা ইংলণ্ডে একই ধরনের ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান শেখে এবং তাদের এই বিজ্ঞান-শেখাটা ফরাসী ব্যাকরণের মতো পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন নয়, তারা বিজ্ঞান শেখে সাধারণ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে।'

'আমি মুহূর্তের জন্যেও বলি না যে রাশিয়া বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র। আমি বলি, রাশিয়া বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে, ঠিক যেমন হতে পারে মধ্যযুগের ইউরোপ খ্রীষ্টীয় হিসেবে।'

'স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য অল্পবয়স্ক মানুষ নানা কারণে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে যাচ্ছে।'

'আমি মুহূর্তের জন্যেও এই মত প্রকাশ করছি না যে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিজ্ঞানের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মারাত্মক কোনো বিপদ দেখা দিতে পারে না। ...এমনও হতে পারে যে এর ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধ তত্ত্বানুগত্য (Dogmatism) দেখা দেবে এবং সরকারী তত্ত্বের বিরোধী সমস্ত মতামতকে দমন করা হবে। তবে এখনো পর্যন্ত তা হয়নি।'

এই পর্যন্ত পড়ে আমার অর্ধেক পাঠক লাইসেংকো-ভাভিলভ বিতর্কের কথা তুলবেন। তুলবেন শারীরতত্ত্ব, জৈব রসায়নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমনি ধরনের আরো সব ঘটনার কথা, যেখানে বিশেষ বিশেষ মতামতকে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ-ধরনের দমননীতি শুধু সোবিয়েত ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ নয়। মৃত স্যার ভিক্টর হর্স্‌লে ছিলেন একজন মস্ত ব্রেন-সার্জন। তিনি ছিলেন মদ্যপানের ঘোরতর বিরোধী এবং অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত রুগীদের অ্যাল্‌কোহল দেওয়া উচিত নয়। আজকাল সকলেই এই মত মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। হর্স্‌লে সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন আর-এ-এম-সি-তে কমিশন গ্রহণ করে। তাঁর সমালোচনায় উপরওলা অফিসারদের গায়ে জ্বালা ধরেছিল। সুতরাং তাঁকে পাঠানো হল ইরাকে, তখন যে-দেশের নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। সেখানে ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে সর্দিগর্মিতে (Sunstroke) তাঁর মৃত্যু হয়। সে-সময়ে কোনো যুদ্ধ চলছিল না। মেসোপটেমিয়ার গ্রীষ্মে রাইফেলগুলো পর্যন্ত গরম হয়ে প্রায় এমন একটা অবস্থায় পৌছয় যে হাতে ধরে রাখা যায় না। সুতরাং ব্রেন্‌-সার্জারি করার কোনো সুযোগ তিনি পান নি। আমার বাবা বলতেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। যদি আমরা বলি যে খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পাঠিয়ে ভাভিলভকে হত্যা করা হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে খুব গরম আবহাওয়ায় পাঠিয়ে হত্যা করা হয়েছে হর্সলেকে।

সকলেই জানেন, সোবিয়েত ইউনিয়েন স্তালিনের আমলের শেষ কয়েক বছরে যা ছিল তার চেয়েও এখন অনেক বেশি আছে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। প্রধানত ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দরুন এই ব্যাপারটি ঘটেছে—আমি তা মনে করি না। আমার মতে এ-ব্যাপারটি যে ঘটেছে তার কারণ, শিক্ষিত মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অপরের আধিপত্য আপত্তিজনক, এবং বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন।

মার্কিন ও বৃটিশ সরকার সর্বতোমুখী বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধিতা করছেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে এমন একটা ক্রিয়াকাণ্ড যাকে সম্মান ও মূল্য দিতে হয়—যেমন দেওয়া হয় খেলাধুলোকে, গানবাজনাকে, ধর্মকে, অর্থনৈতিক সংস্থাকে, এমনকি সেই সব উদ্ভট ধরনের সাহিত্যকেও যার নাম 'বেস্ট্‌ সেলার'—তাতেও মার্কিন ও বৃটিশ সরকার নারাজ। আমি একটা

ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বার্লিংটন হাউসের একটা অংশে রয়াল সোসাইটি আটক রয়েছে। ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে নিশ্চয়ই বলা চলত যে রয়াল সোসাইটির প্রচুর জায়গা। এখানে যে বক্তৃতা-ঘরটি আছে তা এতই ছোটো যে এক ইংলণ্ডেই রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সকলের ঠাঁই হয় না। প্রায়ই মারাত্মক রকমের ভিড় হয়। মাঝে মাঝে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে যাঁরা 'ফেলো' নন তাঁদের পক্ষে এখানকার কোনো বৈজ্ঞানিকসভায় ঢুকতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। এমনকি কোনো একজন 'ফেলো'র কৃপালাভ করতে পারলেও ঢোকা যায় না। কয়েক বছর আগে গভর্নমেণ্ট সোসাইটিকে কথা দিয়েছিলেন যে আগে যেখানে 'বৃটেনের উৎসব' হত সেখানে সোসাইটিকে নতুন জায়গা দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে ছাঁটাইয়ের প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই থেকে গিয়েছে। সুতরাং রয়েল সোসাইটিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও আরো বহু বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এ-ঘটনা নিতান্তই প্রতীক। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের উপরে ১৯৪০ সালে বোমা পড়েছিল। বাড়িটা এখনো নতুন করে তৈরি হয়নি। বৃটিশ বিজ্ঞানের ইতিহাস যদি আমাদের শাসকদের জানা থাকত তাহলে তাঁরা জানতে পারতেন এখানে যেসব জিনিস উদ্‌ঘাটিত বা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আমাদের জানা শ-খানেক মৌল পদার্থের মধ্যে চারটি মৌল পদার্থ, কলয়ড্, হর্মোন, ব্যালান্স্‌ড্ সল্ট সলিউশন, ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভ্, স্ট্যাণ্ডার্ড এরর্ ও হিউম্যান মিউটেশন রেট। হালের অবস্থাটা এই: জায়গা ও টাকা-পয়সার এতই অভাব যে আমি চলে আসার পরে আমার জায়গায় কোনো নতুন লোক নেওয়া হয়নি ; আমার প্রাক্তন সহকর্মীরা চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছেন যে অন্যান্য এলাকায় ছাঁটাই হচ্ছে। বলা বাহুল্য, গভর্নমেণ্ট প্রচুর টাকা খরচ করেছেন প্রতিরক্ষামূলক গবেষণায় ও পারমাণবিক ক্রিয়াশীলতা থেকে শক্তির যোগান গড়ে তোলার কাজে। প্রতিরক্ষামূলক গবেষণার ব্যাপারটি খুবই গোপনে ঘটে—এর অন্যথা হয় না। কিন্তু পারমাণবিক ক্রিয়াশীলতা থেকে শক্তির যোগান গড়ে তোলার কাজটিতে গোপনীয়তার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং গোপনীয়তা না থাকলেই কাজে আরো অনেক বেশি নিপুণতা আসবে। কারণ খুবই সহজ। গবেষণার প্রত্যেকটি ধাপকে সমালোচনা করা চলে—যেমন সাধারণ একটি গবেষণার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অন্যান্য জাতিও এতে

উপকৃত হবে সন্দেহ নেই কিন্তু গোপনীয়তা বজায় রাখলেও তারা কোনো না কোনো সময়ে পারমাণবিক শক্তি গড়ে তুলতই। এমনকি রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলেও মনে হতে পারে যে সোবিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ভারতের একটি পারমাণবিক চুল্লী উপহার পাওয়ার চেয়ে ভারতীয়রা যদি ইংলণ্ডে গিয়ে পারমাণবিক চুল্লী তৈরি করার বিদ্যেটা শিখে আসে—তাহলেই ভালো।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা শুকিয়ে মরছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের ইতিহাস থেকে এ কথাটি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখা যে-কোনো মুহূর্তে সামরিক দিক থেকে বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, খাদ্যের ব্যাপারে বৃটেনকে স্ব-নির্ভর করে তুলবে জৈব-রাসায়নিক গবেষণা। বা, অ্যাল্‌জি-র (algae) গঠনতত্ত্বের গবেষণা। বা, একেবারে অন্য ধরনের কোনো একটা গবেষণা। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা আমি জানি না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলানও জানেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে শুধু বৃটিশরাই তো নয়, আমেরিকানরাই বা কেন সর্বতোমুখী বিজ্ঞান-শিক্ষাকে জনকয়েক বাছাই-করা ছেলেমেয়ের বাইরে ছড়িয়ে দিতে অস্বীকার করে সোবিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করছে? এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে আমাদের শাসকরা বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও ভয় করে। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, এর কারণ—একটি বাতিল-হয়ে-যাওয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বাঁচাতে হলে একটি বাতিল-হয়ে-যাওয়া মতাদর্শকে তুলে ধরতেই হয়। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদী নন তাঁরা এটুকু মেনে নিতে পারেন যে মতাদর্শটা বাতিল-হয়ে-যাওয়া; মতাদর্শটা কেন এখনো টিঁকে আছে তার কারণটুকু না-ও জানতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমাদের অনেকের মধ্যে স্কুলে পড়ার সময়েই এই ঘৃণার ভাবটি সঞ্চারিত করা হয়েছে। পাদরিরা আমাদের সাবধান করে দিতেন যেন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস না করি (নিশ্চয়ই সব সময়ে নয়, বাইবেল পড়ার ও সুসমাচার শোনার সময়টুকু বাদ দিয়ে)। অ-পাদরিদের মধ্যে কেউ কেউ বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিজ্ঞান কত স্থূল; কেউ কেউ বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিজ্ঞান কত কুৎসিত। আমাদেব স্কুলে ক্লাসিক্‌-এর শিক্ষক ছিলেন মিঃ ম্যাক্‌নাটেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন আমাকে দিয়ে

দ্বি-মাত্রিক ছন্দে গ্রীক পদ্য লেখাতে এবং আমাকে লিপ্পি-র (Lippi) অনুরাগী করে তুলতে। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে যদিও ক্লাসিকাল ভাষায় আমার কিছুটা দখল আছে কিন্তু আমি সত্যিকার ভালোবাসি খরগোশের শিরদাঁড়া বা এমনি ধরনের কিছু একটা আঁকতে, তখন তাঁর কলম থেকে আমার সম্পর্কে যে-রিপোর্ট বেরিয়েছিল তা এই: 'ছেলেটাকে বোঝা যায় না। ওকে না পড়াতে হলেই আমি খুশি হই।' মনে হয়, আল্‌ব্রেশ ডুরার ও ক্রিস্টোফার রেন্‌ মিঃ ম্যাক্‌নাটেনের বিরুদ্ধে আমাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিছুকাল পরে মিঃ ম্যাক্‌নাটেনের মনে হল, এই জগতটাকেই আর বোঝা যাচ্ছে না এবং তিনি আত্মহত্যা করলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী আমার চেয়ে দু-ক্লাশ নীচুতে পড়তেন, স্কুলে পড়ার সময় ক্লাসিকের উপরে তিনি বীতরাগ হননি।

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রধান যে-আপত্তিটি প্রকাশ্যে শোনা যায় তা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞান ধর্ম-বিরোধী। এই আপত্তি তোলার সময়ে এ কথা বিবেচনা করা হয় না যে বহু বিজ্ঞানী ছিলেন ও আছেন যাঁরা ধার্মিক।

যাই হোক; এই শেষোক্ত ঘটনার কারণ হয়তো এই। অ-বিজ্ঞানীদের চেয়ে বিজ্ঞানীরাই অনেক কম সংখ্যায় ধর্মীয় মতামতে বিশ্বাসী। যেহেতু তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে মিল ঘটানো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অঙ্গ, সুতরাং, যেসব বিজ্ঞানী ধর্মবিশ্বাসী, তাদের আচরণও ধার্মিক। তবুও এ কথা বলতেই হবে যে সমগ্রভাবে বিজ্ঞানের ঝোঁকটাই হচ্ছে ধর্মবিরোধী, কারণ একদিকে বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের (যেমন, পৃথিবীর অতীত সম্পর্কে প্রশ্নের) এমন সব জবাব দিচ্ছে যার সঙ্গে ধর্মীয় জবাবের কোনোদিক দিয়েই মিল নেই, অন্যদিকে আরও মারাত্মক কথা এই যে বিজ্ঞান ঘোষণা করেছে যে কতকগুলো প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়। তার মানে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) নয়। আমি জানি না চন্দ্রের বিপরীত দিকের চেহারা কি রকম। তবে এটা খুবই সম্ভব যে আমার আয়ুষ্কালের মধ্যে আমি চন্দ্রের বিপরীত দিকের ফোটো দেখে যেতে পারব। আবার আমার আয়ুষ্কালের মধ্যে বুঝে উঠতে পারব না এমন ব্যাপারও আছে—যেমন, যন্ত্রণার মতো সাধারণ একটা মানসিক ঘটনার সঙ্গে তার পারম্পর্যের সঠিক সম্পর্ক। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করার কোনো যুক্তি নেই যে এই সম্পর্কটির চেহারা কোনো সময়েই ফুটিয়ে তোলা যাবে না।

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সত্যকারের আপত্তিটা হয়তো আরো অনেক বেশি গভীর। বিজ্ঞান এই মারাত্মক মতবাদ প্রচার করেছে যে মানুষকে মতিস্থির

করতে হবে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে ভিত্তি করে। আমি সন্দেহ করি, গভর্ণমেণ্ট যে পদার্থবিদ্যার ব্যয়বহুল গবেষণায় টাকা খরচ করতে রাজি হচ্ছে তার একটা কারণ এই যে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে কিছুটা নিশ্চয়তা রয়েছে। যদি বলা হয় যে একটি (pion) আলোর বেগের শতকরা ৯৯ ভাগ বেগে ছুটছে তবে তার সত্যমিথ্যা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—যেমন আমি যাচাই করতে পারি আরশোলা বা বাঁধাকপি সম্পর্কে কোনো উক্তিকে।

আমাদের কালের ইতিহাস লিখিত হবার সময়ে এ কথাটুকু লেখা চলবে যে সোবিয়েতের জয়লাভের অনেকখানি কৃতিত্ব আমাদের যাজক-সম্প্রদায়ের নেতাদের। এঁদের মধ্যেও আবার ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মতো স্পষ্টবক্তা খুব কমই আছেন। ১৯৫৭ সালের ২৪শে মার্চ তারিখের সুসমাচারে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একেবারে মানুষের জ্ঞানপিপাসাকেই হেয় করেছেন। আর একজন বিশপ আক্রমণ করেছেন বিজ্ঞানীদের ঔদ্ধত্যকে। অবশ্য এঁদের চেয়েও বড় কৃতিত্ব অন্য কয়েকজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের—যাঁরা বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের চেয়ে অন্য কতকগুলো বিষয়ের অগ্রাধিকারের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

আমার মনে হয়, এই ঝোঁকটা আরো জোরালো হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। তবে এখনো অন্তত এটুকু সম্ভাবনা আছে যে বৃটেনের জনসাধারণ তাদের গভর্ণমেণ্টের জঙ্গী নীতির আত্মঘাতী চরিত্র সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে তারা হয়ে উঠতে পারে কমাণ্ডার কিং হলের বিকল্প ব্যবস্থার সমর্থক। কমাণ্ডার কিং-হল সুপারিশ করেছেন যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে বছরে কোটি কোটি পাউণ্ড খরচ করতে হবে প্রচারকার্যে ও আক্রমণকারীকে অহিংস উপায়ে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ-আয়োজনে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রচারকার্যের একটা অংশ পরিচালিত হবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে, আর এই দার্শনিক ব্যবস্থার যা-হোক একটা বিকল্প উপস্থিত করার প্রয়োজন অনুভূত হবে। বিভিন্ন গির্জার পক্ষ থেকে সবচেয়ে সহজলভ্য বিকল্পের প্রচারও চলেছে। আমি মনে করি, রাষ্ট্র সহায় হলে এদের এখনো এতখানি ক্ষমতা আছে যে বৃটেনের সাংস্কৃতিক বিকাশকে শ্বাস টিপে মারতে পারে। এই মারণযজ্ঞের একটি কর্মসূচীও পাওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯৫৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারির 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধের উল্লেখ করা চলে। প্রবন্ধের একটি লাইন হচ্ছে এই : "যে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি একদা মহান পেগ্যান দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে প্রথমে প্লেটোর ও পরে

আরিস্টটলের দর্শনকে আত্মীকরণ করেছে, তার এই ক্ষমতাতেও সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে সে একইভাবে এই বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাকেও দোষমুক্ত করবে ও আত্মীয়করণ করবে।" সম্ভবত দোষমুক্ত করার দৃষ্টান্ত হচ্ছি আমি আর আত্মীয়করণ করা হবে আমার সহকর্মীদের। দোষমুক্ত করার দৃষ্টান্তই আমি হতে চাই। এই কর্মসূচী কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করবে তা জানা যেতে পারে 'কৃত-কৌশল ও উদ্দেশ্য' গ্রন্থমালা থেকে। এই গ্রন্থমালা প্রকাশ করেছেন 'বৃটিশ গির্জা পরিষদে'র পক্ষ থেকে 'ছাত্র খ্রীষ্টীয় আন্দোলন প্রেস'। 'নেচার' পত্রিকায় এই গ্রন্থমালার যে-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তা নির্দয় নয়। সমালোচনা পড়ে জানা যায়, ওয়াই-এম-সি-এর জাতীয় পরিষদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিঃ বার্কাব এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে "বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের শিক্ষার সংকীর্ণতা" নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমার তো মনে হয়, সোবিয়েত ইউনিয়নের একই স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সংকীর্ণ। কারণ, মানুষের সমাজ ও চিন্তার উপরে যন্ত্রশিল্পের ঘাত-প্রতিঘাতের পুরো বিশ্লেষণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেই—যা আছে সোবিয়েত শিক্ষা-ব্যবস্থায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের শিক্ষা কোনোক্রমেই সাহিত্যের শিক্ষার মতো সংকীর্ণ হতে পারে না, যে সাহিত্যের শিক্ষায় আমাদের পাদরিদের ও চাকুরেদের শিক্ষিত করে তোলা হয়। এই সাহিত্যের শিক্ষা থেকে ভারত ও চীনে সংস্কৃতির পাঠ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে—আর এটাই এর বিশেষত্ব। পনেরো শো বছর আগে ভারত ও চীন ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। আমার মনে হয় এমনকি পাঁচশো বছর আগেও ছিল। ইউরোপ যে ভারত ও চীনের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার কারণ ইউরোপের বিজ্ঞান-চর্চা—অন্য কিছু নয়। মিঃ বার্কারকে নিজস্ব পথে চলতে দিলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে তা এই : ছেলেমেয়েদের জন্যে আমরা যে ছিটেফোঁটা বিজ্ঞান বরাদ্দ করেছি তাকে আরও পাতলা করতে হবে—বিশ্ব-সংস্কৃতির পাঠ দিয়ে নয়—ইউরোপ ও প্যালেস্টাইনের সেই বিশেষ যুগসম্ভূত সাংস্কৃতিক ধরন-ধারণের পাঠ দিয়ে—যখন ইউরোপ ও প্যালেস্টাইন পৃথিবীর ইতিহাসে নায়কত্ব করেনি। যদি মিঃ বার্কারকে এবং আমেরিকায় তাঁর মতো যাঁরা আছেন তাঁদের নিজেদের পথে চলতে দেওয়া হয় তাহলে মিঃ ক্রুশ্চেভের খুশি হয়ে ওঠার সংগত কারণ আছে। তিনি জিতেছেন।

ভারতেও একই ধরনের আন্দোলন৷ চলছে আর আমরা তার ফল ভোগ

করছি। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আদর্শগত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি ছিল প্রধানত এই প্রচারের উপরে যে ভারতের অতীত গৌরবময়। বলা বাহুল্য, অতীতে ভারতে যে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু গ্রীকো-রোমান সভ্যতার ভিত্তিতে যেমন দাসপ্রথা, মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিতে যেমন ভূমিদাসপ্রথা, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাব ভিত্তিতে ছিল বর্ণ-প্রথা। এই বর্ণ-প্রথায় অধিকাংশ মানুষকে মাত্রাহীনভাবে শোষণ করা হত। ভারতের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের পুনরুত্থান। বস্তুত এর ফলে পুনরুত্থান হয়েছিল পৌত্তলিকতার ও নানা ধরনের কূপমণ্ডুকতার। আর এর ফলে পুনরুত্থিত হয়েছিল একই ধরনের মুস্লিম কূপমণ্ডুকতা। বৃটিশ সরকার এই মুস্লিম কূপমণ্ডুকতাকে আরো উশ্‌কিয়ে তুলেছিলেন আর তাবই পরিণতি হিসেবে ভারতের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের জন্ম। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্যে সত্যিকারের একটা আন্দোলনও ছিল। বিশুদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রামকৃষ্ণের মতো মানুষরা, আর ধর্ম ও রাজনীতির উভয় ক্ষেত্রে নেতা ছিলেন গান্ধী। এই দুই মহামানবের চেষ্টা ছিল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যেও বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলা। ফলে একজন গোঁড়াপন্থী (traditionalist) হিন্দুর হাতে গান্ধী নিহত হন। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর হাতে সংস্কৃত হয়ে হিন্দুধর্মের যে রূপান্তর ঘটল তার সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিচারে বিজ্ঞানের কোনো সামঞ্জস্য আছে বলে আমি মনে করি না। তবুও এ কথা বলতে হবে, খ্রীষ্টধর্মের যে যে-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তার চেয়েও এই নতুন হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বেশি। পুনরুত্থিত গোঁড়াপন্থী হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য আরো অনেক কম বলেই মনে হয়।

বর্তমানে ভারত সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের কয়েকটি দুর্নীতিব উপরে হস্তক্ষেপ করেছেন। যেমন, বহুবিবাহ। মুসলমান ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রেই বহুবিবাহ এখন আইনত নিষিদ্ধ। তবে ভারতে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি দল হচ্ছে জনসঙ্ঘ এবং এই দলটি গোঁড়া হিন্দুত্বের সমর্থক। যদি কখনো এই দলটি ক্ষমতায় আসে তবে অন্য অনেক কাজের মধ্যে এই দলের একটি কাজ হবে বিজ্ঞানকে নিরুৎসাহিত করা।

এমনকি এই দলটি যদি কখনো ক্ষমতায় না-ও আসে (আমারও তাই

ইচ্ছে), তাহলেও এদের একদেশদর্শী মতবাদের ধারকরা চেষ্টা করবে যাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আর এদের এই কাজের ফলেই এশিয়ায়—কিংবা হয়তো বা সারা পৃথিবীতে—কমিউনিস্ট আধিপত্য সুনিশ্চিত হবে। অবশ্য এ কথাও হয়তো সত্যি যে, যে বিপুল পরিমাণ কুসংস্কারের পাঁকে ভারতের সাধারণ মানুষরা ডুবে আছে তা পরিষ্কার করতে হলে কয়েক পুরুষ-ব্যাপী কমিউনিস্ট শাসনই চাই—কঠোরতার দিক থেকে তার চেয়ে কম কিছু নয়। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে যে জনসঙ্ঘ দেশের উপকারই করছে।

এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে ধর্মের বন্ধন না থাকলে উপগ্রহ তৈরি করার ক্ষেত্রে বৃটেন ও আমেরিকাই অগ্রণী হতে পারত। যদি আকাশকে বা নভোলোককে দেখে আপনি শুধু এ কথাই ভাবতে থাকেন যে ওখানে অপার্থিব জীবদের বাস—তাহলে আকাশ বা নভোলোক সম্পর্কে আপনার চিন্তায় অস্পষ্টতা থাকবেই। আপনি যদি বলেন, 'আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন' কথাটাকে রূপক হিসেবে ধরতে হবে তাহলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি আপনার চিন্তাকে অযথার্থ করে তুলতে সাহায্য করছেন—জগৎ ব্যাপারের রীতিনীতি ও তার প্রায় সবটুকু তাৎপর্য। আমি পুরাণের বিরোধী নই। ম্যাবিনোগিওন ও মহাভারত পড়ে আমি সত্যিকারের আনন্দ পাই, যদিও দুর্ভাগ্যবশত দুটি গ্রন্থই আমাকে ভাষান্তরে পড়তে হয়। তবে কোনো গ্রন্থকেই আমি ততটা গুরুত্ব দিই না যাতে বাস্তব সম্পর্কে আমার চিন্তা প্রভাবান্বিত হতে পারে। এতে হয়তো আমার চিন্তা আরো প্রসারতা লাভ করে, এই মাত্র। একই কারণে আমি কিছু কিছু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক লেখাও পড়ি। আমি এসব লেখায় বিশ্বাস করি তা নয়—পড়ি এ জন্যে যে আমার চেয়ে যাঁরা বড়ো মানুষ ছিলেন তাঁরা অতীতে যেসব ভুলভ্রান্তি করেছিলেন সেগুলো ভালোভাবে জানা থাকলে আমি আরও অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করতে পারব।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে অন্য নানা অবস্থার জন্যেও। গত কুড়ি বছরে যখনই কোনো বিজ্ঞানী সোবিয়েতের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশংসা-সূচক কথাবার্তা বলেছেন তখনই তাঁকে জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অধ্যাপনার আসন পাওয়া বা এ-ধরনের ব্যাপারে গুরুতর অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট ছিলেন নগণ্য কয়েকজন কিন্তু অধ্যাপনার

আসনের নির্বাচক-মণ্ডলী অন্যদেরও কমিউনিস্ট-চর ধরে নিয়ে ভীষণ রকমের সন্দেহের চোখে দেখেছেন। আর যাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে তৈরি ছিলেন যে মার্কসবাদী অন্ধ তত্ত্বানুগত্য সোবিয়েত বিজ্ঞানের টুঁটি টিপে ধরেছে—তাঁরা যে শুধু গোটাকয়েক নাইটহুড খেতাবই পেয়েছেন তা নয় (এ জন্যে তাঁদের উপরে আমার হিংসে নেই), তাঁদের এমন সব চাকরিও দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে তাঁরা বৃটিশ বিজ্ঞানকে প্রকৃত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও পশ্চিম জার্মানির অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। ফ্রান্সের অবস্থাও তথৈবচ। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অবস্থা বেশ খানিকটা ভালো।

আমরা মাঝে মাঝে পড়ি যে বৃটেনে একদল সুকৌশলী কমিউনিস্ট চর আছে। যদি তারা সত্যিই থাকে, তবে আমার মনে হয়, তাদের খুঁজতে হবে উপরওলা পাদরিদের মধ্যে আর সেইসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা আমাদের বলেছেন যে সোবিয়েত ব্যবস্থায় সত্যিকারের গবেষণা অসম্ভব। আমরা এ কথাও পড়ি যে সোবিয়েত ইউনিয়নের উপরের মহলে পুঁজিবাদের সুকৌশলী চর আছে—তাহলে এদেরও সম্ভবত খুঁজতে হবে সেইসব লোকের মধ্যে যারা দেশের শাসকদের ও মানুষদের বলেছে যে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এই দুই দেশের উপরের মহলেই যথেষ্ট সংখ্যায় এমন সব নির্বোধ লোক আছে যারা বিনে পয়সায় চরবৃত্তি করছে। এবং আমি মনে করি, যতো বেশি সংখ্যায় এই লোকগুলোর হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারব ততই ভালো।

এবারে আগে থেকেই সম্ভাব্য সমালোচনার কথা তুলি। কেউ কেউ বলতে পারেন—'হলডেনটা একটা খুঁতখুঁতে ধেড়ে ইঁদুর, যেই ওর ধারণা হয়েছে যে জাহাজডুবি হতে পারে অমনি জাহাজ থেকে উধাও, আর নিজের সাফাই গাইছে।' এ দের আমি এই বলে আশ্বাস দিতে পারি যে ভারত-রাষ্ট্রের জাহাজটি বৃটেন-রাষ্ট্রের জাহাজের চেয়েও অনেক বেশি ডুবন্ত। এমনকি এখনো পর্যন্ত আমার এই আস্থাটুকুও নেই যে ভারত-রাষ্ট্রের জাহাজটি ডুববে না, যদিও অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ডুবে যাওয়ার লক্ষণ এই মুহূর্তে নেই। তবে এ কথা বলতেই হবে, যে-ধরনের 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে ভারতে আমি অর্থ-সংস্থান করতে পেরেছি—নিউটন ও ডারউইনের দেশে তা সম্ভব হয়নি। এই প্রবন্ধ লেখার ফলে উল্টো ব্যাপার যদি কিছু ঘটে তাহলে আমি খুশিই হব। কিন্তু আমার ধারণা, বিশপ ও তাদের বন্ধুরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জিততে চলেছে—আর তা হবে কমিউনিস্টদের জিত।

(অধ্যাপক হলডেনের এই রচনাটি "The Rationalist Annual, 1959" নূপত্রিকা থেকে অদিত। পরিচয়, মাঘ ১৩৬৫ হতে পুনর্মুদ্রিত।)

তারাপদ রায়

ভারতবর্ষের মানচিত্র

ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্পর্কে আমার
ধারণা টারণা স্পষ্ট নয়;
সমুদ্র মেদিনীপুর থেকে কতদূর,
বন্যায় বাখরগঞ্জ ডুবে গেলে পরদিন গোহাটিও ডোবে,
কেন ডোবে?
নীল-লাল-হলুদ সীমানা, পূবে-পশ্চিমে সবুজে
সমস্ত রঙের অর্থ, লক্ষ বিন্দু, অজস্র রেখায়
আমার ধারণা খুব পরিষ্কার নয়।

নাম জানি, পর্বতের ঠিকানা জানি না,
কোথাও নদীর উৎস আছে,
কোথাও তীর্থের চূড়া, কোথাও হ্রদের সীমা আছে।
কোনোখানে কালোমাটি তুলোর পাহাড় মেলে ধরে,
বর্ষায় দিগন্ত ভাসে, শস্য পোড়ে চৈত্রের আগুনে,
গিরের সিংহের ছবি, সুন্দরবনের রাজা বাঘ
কখনো সংবাদ দেখি, জানি, ঠিক কোনোখানে আছে,
তবুও ভূগোল খুলে দেখাতে পারি না।

শুধু এক মানচিত্র পোড়ো ঘরে দেয়ালে নিয়ত
উলঙ্গ রিলিফ ম্যাপ। আধাক্ষ্যাপা ড্রইং মাস্টার
উপহার দিয়েছিলো রক্তের স্রোতের মতো নদী,
দাঁত বের করা হিংস্র অন্ধকার আদিম পাহাড়।

ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্পর্কে আমার
ধারণা টারণা আজো স্পষ্ট নয়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রেম, পুনর্বার : ১২

১

তোকে ভালোবেসে উন্মাদ হবো প্রিয়
বিবেক আমায় দংশিছে বারবার
ভালোবাসা ছাড়া কিছু নাই মহনীয়
তোর পদ মূলে রেখেছি অঙ্গীকার

বিশ্বে এখন কেহ নাই মুখোমুখী
অতলস্পর্শী ব্যবধান জনে জনে
এই পরবাসে কে আছে এমন সুখী
সে নহে প্রেমিক মানস বৃন্দাবনে ?

এখন আমরা বড়ো অসহায় একা
জনসমুদ্রে দিশেহারা ভাঙা তরী
ও-দুটি নয়ন যেন শ্যাম তটরেখা
কখনো সাগর—মনে হয় ডুবে মরি।

প্রাত্যহিকের হাজার বাঁধনে বাঁধা
কেরাণীর প্রেম স্পর্ধিত মাথা তোলে
মনে পড়ে যায় ঘরে অসুস্থ রাধা
রিকেটে পঙ্গু শিশু কাঁদে তার কোলে

অর্থনীতির টানা পোড়েনের স্রোতে
উর্বশী, তোকে মানবী ভাবি না আর
বিশ্বাস বল আসিবে বা কোথা হতে
পচে গলে মরা জেনেছি সারাৎসার

তবু ভালোবেসে উন্মাদ হতে চাহি
বিবেক আমায় দংশিছে দিবানিশি
প্রাত্যহিকের বাঁধনে-মুক্তি নাহি
এবং যখন নহি মোহান্ত ঋষি ॥

রত্নেশ্বর হাজরা

বাগানের কণ্ঠস্বর

তখন সাতশো বছর কবর-চাপা হাড়ের মতো সাদা দেয়ালে অন্ধকার
জ্বলে উঠছিল
তখন নিকটতম পর্বতশিখরে বড়শিঙ্গার পদশব্দ থেমে গিয়েছিল
তখন গর্ভবতী ক্ষেতের বাতাস চুপি চুপি কথা বলছিল
এবং যখন মধ্যসমুদ্রে পরিচিত নাবিকদের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছিল না—
আমি আবার শেষরাত্রের বাগানে ফুল ফোটার শব্দ শুনতে পেলাম।

ফুলেরা প্রত্যহ ফোটে না
কিন্তু ফুল ফোটার শব্দ অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হলে অন্ধকার জানলা
ছেড়ে সরে দাঁড়ায়
ছাদের আলিসায় জমানো শিশির দোল খেতে খেতে উজ্জ্বলতর
হয়ে ওঠে
মশারি জড়িয়ে থাকা ভীত বাতাস হেমন্তের নদী হয়ে যেতে যেতে
চলিষ্ণু হয়।

ফুল ফুটছে—
বুকের দেয়ালে অন্ধকার কেঁপে উঠল,

ফুল ফুটছে
পর্বতশিখরে বড়শিঙ্গা হরিণের চঞ্চলতা,
নীলকমলের রাজধানী ছুঁয়ে-আসা কুয়াশায় ফুল ফুটছে—
মধ্য সমুদ্রে আমি আবার পরিচিত নাবিকদের কণ্ঠ শুনতে পাব ॥

বিনোদ বেরা

স্মৃতির প্রতি

অন্ধকার বিজন বন শ্বাপদ সঙ্কুল
তোমাকে নিয়ে কোথায় যাবো আমি!
তুমি আমার বুকের স্নেহ সুগন্ধের উৎস
তোমাকে কোন আলোয় নিয়ে যাবো!
নিবিড় ভোরবেলার খুশি রক্তে, ভয় রক্তে
ভাঙে ফুলের দুর্গ দুঃস্বপ্ন,
অশুভ কৌতুকের হাত ছেড়ে মনের পাপড়ি—
সতেজ আলো হাওয়ার রাঙা গোলাপ
গন্ধে ভরে দেয় আকাশ, কি করে তাকে বাঁচাবো!
বড় বিজন অন্ধকার শঙ্কাকুল বন
তোমাকে নিয়ে কোথায় আমি যাবো ॥

সত্যজিৎ রায়

চারুলতা প্রসঙ্গে

১

আশ্বিনের পরিচয় খুলে দেখলুম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন।[১] মুশকিল হয়েছে কি, সিনেমাটা একটা বারোয়ারি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো বই পড়া, ভালো ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়া, বা গানের আসরে বসে ভালো গান শোনা—এ-সবের তাগিদ তাঁরাই বোধ করেন, যাঁরা ভালো ছবি, ভালো বই বা ভালো গানের কদর করেন, বা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিনেমার ব্যাপারে দেখি যাঁরা 'সংগম' দেখছেন, তাঁরাই আবার 'লা দোলচে ভিতা'-তেও উঁকি দিচ্ছেন। এতে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই—কারণ পকেটে পাঁচসিকা পয়সা এবং হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় থাকলে যে-কেউ যে-কোনো ছবিই দেখতে পারেন এবং তা নিয়ে মন্তব্য করতে পারেন।

মন্তব্য যদি কফি হাউসে বা পাড়ার রকে নিবদ্ধ থাকে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু সকলেই যদি পত্রপত্রিকায় তাঁদের ভয়ংকরী বিদ্যার পরিচয় দিতে শুরু করেন তবে আশঙ্কা হয় যে যখন সবে বাংলা দেশের দর্শকের মধ্যে সিনেমার বিষয় জানবার শেখবার একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতারও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তখন এসব লেখা অন্তত কিছু সংখ্যক পাঠক তথা দর্শকের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে না কি ?

রুদ্রমশাই সাহিত্য বোঝেন কিনা জানি না ; সিনেমা তিনি একেবারেই বোঝেন না। শুধু বোঝেন না নয়, বোঝালেও বোঝেন না। যাকে বলে একেবারে বেয়ণ্ড রিডেম্পশন্। বিদেশে কিছু ভালো ছবি তিনি দেখেছেন। কিন্তু ভালো ছবি দেখলেই ভালো ছবি বোঝা যায়, বা ভালো ছবি নিয়ে লিখবার অধিকার জন্মায়; এ কথা তাঁকে কে বলল ?

আসলে রুদ্রমশাই-র বাতিকই হল লেখা। চারুতলা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে যেটুকু মিল

১। পরিচয়, শারদীয়া ১৩৭১ সংখ্যায় শ্রীঅশোক রুদ্র লিখিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' দ্রষ্টব্য।

আছে, তেমন মিল ছুনিয়ার হাজার হাজার গল্পে আছে।' আমার বিশ্বাস চারুলতা ছবি চরিত্রের নাম ও ঘটনার সময়কাল পাল্টে আমার স্বরচিত চিত্রনাট্য বলে যদি বাজারে বেরুত, তবে রুদ্রমশাই তৎক্ষণাৎ তাঁর শতবার্ষিকী সংস্করণ রচনাবলী খুলে, হয়তো পরিচয়-এর জন্যেই, একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি-সংবলিত প্রবন্ধ লিখে আমায় Plagiarist প্রমাণ করে দিতেন।

শ্রীরুদ্র তাঁর লেখায় আমার তিনটি রবীন্দ্রভিত্তিক ছবির আলোচনা করেছেন। আমি কেবলমাত্র নষ্টনীড় নিয়েই কিছু বলব—কারণ আমার বিশ্বাস এই একটি উদাহরণ থেকেই সাহিত্যের গল্প থেকে ছবি করার সমস্যাগুলি পরিষ্কার হবে। বলা বাহুল্য, সব গল্পে সমান পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয় না। বিদেশী সাহিত্যে এমন অনেক ভালো গল্প আছে (চেকভ-মোপার্সাঁয় এর নিদর্শন পাওয়া যাবে) যা প্রায় তৈরি চিত্রনাট্যের সামিল। নষ্টনীড় এ-শ্রেণীর গল্প নয়। কেন নয় তা আশা করি আমার এ-লেখাতেই প্রমাণ হবে। তাই রুদ্রমশাই যখন প্রশ্ন করেন—'এর আগাগোড়াই কি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্ক্রিপ্ট-এর অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অসুবিধা ছিল ?' তখন বোঝা যায় যে তাঁকে চিত্রনাট্যের অ আ ক খ শেখানোর প্রয়োজন আছে।

শ্রীরুদ্র নষ্টনীড়ের 'সুসংবদ্ধ ও সুসংহত' প্লটের কথা বলেছেন। আমার মতে নষ্টনীড়ে প্লট জিনিসটা গৌণ। যদি তা না হত তবে মূলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নষ্টনীড়ের 'গল্প' মুখে বলা সম্ভব হত। রুদ্রমশাই এ কাজটি একবার চেষ্টা করে দেখবেন কি ? নষ্টনীড়ের প্রধান সম্পদ হল এর চারটি প্রধান চরিত্রের মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ। এই সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলতে যেসব ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা থেকেই একটা কাহিনীর সূত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে বিশেষ ঘটনাটিকে আশ্রয় করে এ-কাহিনীকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা আকস্মিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য—কারণ উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতায় কোনো পূর্বাভাস গল্পের কোনো ঘটনায় বা সংলাপে রবীন্দ্রনাথ দেন নি।

গল্পের গোড়া থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

ভূপতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল—দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল।'

এই বর্ণনার মধ্যে যে মক্-সিরিয়াসনেসের স্বরটি প্রকাশিত, গল্পের আগাগোড়াই এ-স্বরের আভাস আছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ গল্পের জন্য এই বিশেষ স্বরটি বেছে নিয়েছেন, কারণ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে এ-স্বর ছাড়া এই বিশেষ চরিত্রসমষ্টি নিয়ে এই বিশেষ কাহিনীটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব হত না।

নষ্টনীড়ের প্রথম 'ঘটনা' হল উমাপদর প্ররোচনায় ভূপতির খবরের কাগজ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া। এই কাগজে লিপ্ত থাকার ফলে ভূপতি জানতে পারলেন না—'কখন তাঁহার বালিকা-বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল।' খবরের কাগজের গোড়াপত্তন দিয়ে যদি ছবি শুরু করতে হয় তাহলে চারুকে বালিকা অবস্থা থেকেই দেখাতে হয় এবং কিছু নতুন দৃশ্য রচনা করে—ভূপতির কাগজ নিয়ে মেতে থাকা এবং চারুর যৌবনে পদার্পণ দেখাতে হয়। এই সব নতুন দৃশ্য সম্পর্কে রুদ্রমশাই কী বলতেন জানি না, কিন্তু ছবির শুরু হিসাবে এ-পরিকল্পনা যে দুর্বল তা বোধহয় তিনিও স্বীকার করতেন। তাই চারুর নিঃসঙ্গতার অবস্থা দিয়েই ছবি শুরু করা স্থির করেছিলাম।

এখানে একটা জরুরি প্রশ্ন ওঠে। অমল কি ভূপতির বাড়িতেই মানুষ? গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে অমলের প্রথম উল্লেখ পাই, তার আগেই রবীন্দ্রনাথ চারুর নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। 'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ—অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।' এই উক্তির কিছু পরেই আমরা জানতে পারি যে চারুলতা 'তাহাকে (অমলকে) ধরিয়া পড়া করিয়া লইত', এবং 'সামান্য একটু পড়াইয়া অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করিত ; কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।'

অর্থাৎ—এ হল নিঃসঙ্গতার পরের অবস্থা, যেখানে চারু অমলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ভূপতি-সান্নিধ্যের অভাব কিছুটা মিটিয়ে নিচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছবি শুরু করতে গেলে অমলকে রাখা চলে না। অমল আসবে পরে এবং এই আসার মুহূর্তটির জন্য একটি নতুন দৃশ্যের প্রয়োজন হবে।

চারুর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সঙ্গে, তার লেখাপড়া ও হাতের কাজের দিকে

ঝোঁক, তার অন্তর্নিহিত ছেলেমানুষই (এদিকটা না দেখালে, পরে অমলের সঙ্গে মনের মিল দেখানো মুশকিল), কাগজ নিয়ে মেতে থাকার ফলে তার স্ত্রীর প্রতি ভূপতির ঔদাসীন্য এবং চারুর সেটাকে মেনে নেওয়া—এ সব কিছুই ব্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। এ ছাড়া উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ ও পিরিয়ডের একটা ইঙ্গিত দেওয়া।

কাহিনীতে এর পরের ঘটনা হল মন্দাকিনীর আগমন। মূল গল্পে এর প্রস্তুতি হচ্ছে এইভাবে—'যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি সচেতন হইয়া কহিল—তাই তো চারুর একজন সঙ্গিনী থাকা উচিত—ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।'

রবীন্দ্রনাথ যদি নষ্টনীড় গল্পটি চিত্রনাট্য হিসেবে রচনা করতেন, তাহলে এই 'কোনো আত্মীয়া' তাতে স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ। কারণ সিনেমায় এ-ধরনের অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই। অথচ কেবলমাত্র এই 'মনোযোগ আকর্ষণ' করার জন্য একটা নতুন চরিত্র রচনা করাও চলে না। তাহলে উপায় কি ? এক ধরনের নাটুকে চলচ্চিত্রে মুলাশ্রয়ী একটি দৃশ্য কী ভাবে রচিত হতে পারত তার একটা উদাহরণ দিই—

ভূপতি (মুখে ভাতের গ্রাস পুরে) : ওহো—আজ পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার কথা বললেন।

চারু : ও।

ভূপতি : কী বললেন জান ?

চারু : কী ?

ভূপতি : বললেন সেদিন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে উনি নাকি টের পেয়েছেন যে তুমি বড় একা বোধ কর।

চারু : হতেই পারে না। আমি অমন কথা ওকে বলিই নি।

ভূপতি : না-বলা সত্ত্বেও বুঝেছেন…

চারু : থাক ওসব কথা। আর দুখানা লুচি দেবে ?

ভূপতি : …অথচ আমি বুঝি নি! কী আশ্চর্য! কী অন্যায়! সত্যি, এ-অপরাধের ক্ষমা নেই।

চারু : তুমি থাবে, না আবোল তাবোল বকবে ?

ভূপতি : উমাকে বলব—মন্দাকে আনিয়ে নিতে।

আমার কাছে, কোনো এক অবসর মুহূর্তে ভূপতির পক্ষে চারুর এই নিঃসঙ্গতার

ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলা অসম্ভব বলে মনে হয় নি। চারু যতই তার অন্তরের ভাব গোপন করে রাখুক না কেন, ভাবেরও তো একটা সীমা আছে। আর ভূপতির মতো খেয়ালশূন্য ব্যক্তিও তো হাজার হোক মানুষ; এবং স্ত্রীর প্রতি বিরূপতার কোনো ইঙ্গিতও মূলের ভূপতির চরিত্রে নেই।

ছবির প্রথম দৃশ্যের দুপুর এবং দ্বিতীয় দৃশ্যের রাত মিলে চারু-ভূপতির জীবনের একটি টিপিক্যাল দিন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। মূল কাহিনীতে অনেক দিন এবং অনেক রাতের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর অজস্র বিবরণ আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী জড়িয়ে কোনো একটি গোটা দৃশ্য নেই। গল্পের পাঠক এ-অভাব সম্পর্কে সচেতন না হলেও, ছবিতে যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল—সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয়, এবং একটা সময়ের সূত্র ধরে কাহিনীর সূত্র এগোতে থাকে, সেখানে এ-ধরনের অন্তত একটি দৃশ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজের চাপে যে-ব্যক্তি দিনের বেলা তার স্ত্রীকে অবহেলা করে, কাজের অবসরে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার কিরকম, এটা জানবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দর্শকের হতে বাধ্য। বহু কারণেই ছবিতে এই প্রথম নৈশ দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল।

এই নৈশ দৃশ্যের প্রথম অংশে ভূপতিকে দেখি ভোজনরত অবস্থায়। চারু তার সামনে বসে, হাতে হাতপাখা। ভূপতি উমাপদকে তাব কাগজের ম্যানেজার হিসেবে বহাল করার সংকল্পের কথা চারুকে বলে। মূল গল্পে আমরা মাত্র তিনবার উমাপদর উল্লেখ পাই। প্রথম—'শ্যালক উমাপদ ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল—'ভূপতি তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির কর। তোমার যেরকম অসাধারণ—ইত্যাদি।'

দ্বিতীয়—'উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে, তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।'

প্রথম উল্লেখে বুঝি উমাপদ ওকালতিতে ব্যর্থ—কিন্তু এতে তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মনে জাগে না।

দ্বিতীয় উল্লেখে সামান্য ইঙ্গিত আছে যে উমাপদ-ভূপতির মধ্যে কাগজের পলিসি নিয়ে একটা মতভেদ চলছে, কিন্তু এও তেমন কিছু নয়।

অথচ তৃতীয় উল্লেখেই দেখি উমাপদ ভূপতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সিনেমায় অন্য চারটি চরিত্রের মতোই উমাপদও একটি কংক্রীট চেহারা

নিতে বাধ্য। সেখানে তার আচরণে, অথবা তার সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্রের আলোচনায় যদি কোনোরকম দুর্বলতার ইঙ্গিত না পাওয়া যায় তবে তার বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হবে কিভাবে ?

আর ভূপতি উমাপদর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে, এমন ইঙ্গিত ঘটনায় বা সংলাপে না থাকলে এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শকের মন স্পর্শ করবে কেন ?

এই সব বিবেচনা করেই স্থির করা হয়েছিল যে ভূপতি উমাপদর চারিত্রিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও, চারুর ভাই হিসেবে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, কতকটা যেন তার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তাকে নিজের কাগজটির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে বহাল করতে মনস্থ করে। চারুর দিক থেকেও একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ('দাদা পারবে ? ওর তো কোনো কাজেই মন বসে না!') যে উমাপদ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। মূল গল্পে চারু উমাপদর পরস্পরের মনোভাবের কোনো ইঙ্গিত নেই। মন্দা বা অমলের সংলাপেও উমাপদর কোনো উল্লেখ নেই। অথচ যে চরিত্র কাহিনীতে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, ছবিতে তাকে এতটা অস্পষ্ট, এতটা আড়ালে রাখা চলে না।

ভোজনের পরের দৃশ্যে রাত আরো গভীর। ভূপতি সম্পাদকীয় রচনায় ব্যস্ত। চারু এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়ায়। তার হাতে ভূপতিব জন্য নকশা-করা রুমাল। ভূপতি চারুকে দেখে।

ভূপতি : আর দু-মিনিট, চারু।

চারু : তাড়া দিতে আসি নি।

কাহিনীর এই ভূমিকা-পর্বে চারুর দিক থেকে অভিমান প্রকাশ করা চলে না। যদি তা সম্ভব হত তাহলে নষ্টনীড় গল্প অন্য চেহাবা নিত। চারু এগিয়ে এসে রুমালটা ভূপতিকে দেয়।

ভূপতি : এটা তুমি করেছ ?

চারু : এবার তোমার একটা চটিতে নকশা করে দেবো।

ভূপতি : এত সময় তুমি কখন পাও চারু ?

চারু : আমার কি সময়ের অভাব আছে ?

নিঃসঙ্গতার এই ইঙ্গিতটুকু দিয়ে চারু পাশের ঘরে চলে যায়। সে চায় না ভূপতির সঙ্গে এই নিয়ে একটা মান-অভিমানের পালা শুরু হোক। ইঙ্গিত ভূপতি লক্ষ করবে এমন আশাও হয়তো চারুর নেই।

কিন্তু ইঙ্গিত ভূপতির লক্ষ এড়ায় না। রুমাল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে—'তোমার বড় একা লাগে, না চারু?'

'এ আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'নিঃসঙ্গতার অভ্যাস তো কোনো কাজের অভ্যাস নয়, চারু।'

'তুমি স্বর্ণলতা পড়েছ?'

চারু ঠিক এই মুহূর্তে এই অবান্তর প্রশ্নটি করে তার স্বামী তার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে কিনা সেটা পরখ করে দেখছে। এই একটি অবান্তর প্রশ্নেই যদি প্রসঙ্গ চাপা পড়ে তাহলে চারুর কোনো আশাই নেই। এই ধরনের পরীক্ষা চারুর মতো চাপা অথচ sensitive চরিত্রের পক্ষে সংগত বলেই আমার মনে হয়েছিল।

ভূপতি চারুর কথা স্পষ্ট শুনতে পায় নি।

ভূপতি : কী?

চারু : স্বর্ণলতা।

ভূপতি অট্টহাস্য করে ওঠে।

চারু : হাসছ কেন?

ভূপতি চারুর কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে।

ভূপতি : আমার চারুলতা আছে। নাটক নভেল কাব্য—কিছু চাই না আমার। বুঝেছ?

ভূপতি চারুর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায়। এইখানে ভূপতির শেষ কথা শোনা যায়।

ভূপতি : এক কাজ করব—তোমার দাদাকে বলব তোমার বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। তাহলে আর তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না। কেমন?

এইখানেই ছবির প্রথম পর্বের শেষ।

ছবির দ্বিতীয় পর্বের শুরু আরেকটা দুপুর দিয়ে। মন্দা চারুর খাটে শুয়ে চারুর সঙ্গে গাধাপেটাপিটি খেলছে। অন্য ক'টি চরিত্রের মতোই মন্দার চরিত্র সম্পর্কেও কাহিনীতে ইতস্তত মন্তব্য ছড়ানো রয়েছে। মন্দা 'মূঢ়', 'মন্দার আর যা কিছু গুণ থাক, কল্পনা ছিল না'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, মন্দাকে প্রায় চারুর বিপরীত চরিত্র হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন। তাই

চারুর উপযুক্ত সঙ্গী হওয়া বা চারুর হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করা মন্দার সাধ্যাতীত। চারুকে দেখি সে খেলতে বসে হাই তোলে, মন্দার রসিকতা ও গুরুগম্ভীর মন্তব্যে সে ধমক দেয়, বা নিরুত্তর থাকে।'

মূল গল্পে মন্দার সঙ্গে চারুর যে-কটি ঘটনার বর্ণনা আছে সবই অমলকে জড়িয়ে। অথচ ভূপতির প্ল্যানের ব্যর্থতা ফুটিয়ে তুলতে হলে অমল আসার আগে চারু-মন্দার এই দৃশ্যটির একান্ত প্রয়োজন। ছবিতে অমলের আগমন এই তাস খেলার দৃশ্যের অব্যবহিত পরেই—এই একই দুপুরে। এই দৃশ্যের কোনো উপাদানই মূল গল্পে নেই, সুতরাং এখানে পরিচালকের নিজস্ব কল্পনার উপরেই নির্ভর করতে হয়।

ইকনমির খাতিরে অমল-চারুর সম্পর্কটি যত শীঘ্র যত কম কথায় ব্যক্ত করা যায় তার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। অমল ঝড়ের মধ্যে এসে হাতের ছাতাটি বগলে পুরে বৌদিকে প্রণাম করে। তার প্রথম কথা—'বৌঠান্, আনন্দমঠ পড়েছ, আনন্দমঠ?'

চারুর বঙ্কিম-প্রীতির ইঙ্গিত ছবির শুরুতেই আছে। সুতরাং অমলের এই উক্তিতে পরস্পরের মনের মিলের ইঙ্গিত আছে।

অমল প্রণাম সেরেই ছোটে দাদার সঙ্গে দেখা করতে। চারুর দিক থেকেও অমলের আগমনে অতিরিক্ত খুশির কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। পরস্পরের দেখা হওয়ায় যে খুশি ভাব, সেটা প্রকৃতির প্রগলভতার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে আর বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে নি।

ভূপতি-অমল সাক্ষাৎকারের কোনো দৃশ্য মূল গল্পে নেই—তাই এখানেও কল্পনার আশ্রয়। এবং এখানেও সেই ইকনমির প্রশ্ন। প্রণাম সেরেই অমল ভূপতির চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়, অর্থাৎ দাদার প্রপার্টিতে তার যেন স্বাভাবিক অধিকার।

ভূপতি: পিসিমা কেমন?

অমল: আর বোলো না—মার জন্যই তো দেরি। কিছুতেই আসতে দেবেন না।

অমল যে ভূপতির পিসতুতো ভাই—এটাও তো জানানো দরকার! সিনেমায় সংলাপের আশ্রয় ছাড়া রুদ্রমশাইর আর কোনো পন্থা জানা আছে কি?

ভূপতি শাসায়—অমলকে তার কাগজের প্রুফ দেখে দিতে হবে। (মূল

গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ-খবর আছে)। ভূপতি অমলকে তার প্রেস দেখায়। Sentinel কাগজ ছাপা হচ্ছে (কাগজের নাম একটা নিশ্চয়ই ছিল যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো নামের উল্লেখ করেন নি)। ভূপতি গভর্নমেণ্টের সীমান্ত-নীতি নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে। অমল ত্রাসের ভান করে—'তুমি সরকারের উপর কটাক্ষ করেছ ?' (সীমান্তনীতি নিয়ে সম্পাদকীয়র উল্লেখ মূলে প্রথম পরিচ্ছেদে আছে)। অমল রাজনীতি সম্পর্কে হালকা মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, কারণ এ-বিষয়ে তার উৎসাহ নেই।

অমলের প্রস্থানের পর ভূপতি-উমাপদ কাগজ নিয়ে আলোচনা করে। কাগজের পলিসি নিয়ে দুজনের মতবিরোধের ইঙ্গিত মূলে থাকলেও, সে নিয়ে সংলাপ সংবলিত কোনো পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য নেই। আমার মনে হয় এই ধরনের একটি দৃশ্য ছাড়া নষ্টনীড়ের চিত্রনাট্য হতে পারে না, কারণ আগেই বলেছি—উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বাসযোগ্য না করতে পারলে কাহিনীর মর্মান্তিক পরিস্থিতিও ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া উমাপদ যে 'ভূপতির কাগজখানির কার্যাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া সমস্তই উমাপদর উপর ছিল' (নবম পরিচ্ছেদ)—এ-খবরও দেওয়া দরকার। মূলে এ-খবর লেখক প্রকাশ করেছেন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটির সঙ্গে। সিনেমায় এ-রীতি অচল। অথচ খবরটি অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, জোরের সঙ্গে বলা দরকার। এজন্যই উমাপদর হাতে ভূপতির চাবি তুলে দেওয়ার দৃশ্যটি উদ্ভব করার প্রয়োজন হয়েছিল।

এই দুপুরের দৃশ্যের তৃতীয় অংশে অমলের ঘরে অমল চারু ও মন্দাকে দেখিয়ে পাঁচটি মূল চরিত্র যে পেণ্টাগন্যাল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গল্পকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অমলের ঘরের এই দৃশ্যে চারু-অমলের বৌঠান-দেবর সম্পর্কের মধুরতা ছাড়া আর কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। অমল বাক্স থেকে জিনিসপত্র বার করতে করতে কথা বলে, চারু বালিশে ওয়াড় পরায়। শ্রীরুদ্র যদি এ-দৃশ্যটি মনোযোগ দিয়ে দেখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে চারু 'আগাগোড়াই অমলের দিকে দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে যায়'—এমন ভুল মন্তব্য করতেন না।

এই দৃশ্যের শেষে চারু অমলের হাত থেকে ছেঁড়া সার্ট ছিনিয়ে নিয়ে যায়

রিপু করার জন্য। এটাকে চারুর একটা স্বাভাবিক অভিভাবকী মনোভাব ছাড়া আর কিছু মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

এই দৃশ্যের পরের নৈশ দৃশ্যটি দিয়ে ছবির apposition পর্বের শেষ। এ-দৃশ্যে অমলকে ভূপতির সঙ্গেই দেখি—চারুর সঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূপতির মুখ দিয়ে অমলকে যে-কথাটা বলিয়েছেন সেটা এখানে মনে করা দরকার।—'অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড় একলা পড়েছে।...তুমি অমল—ওকে একটু পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়।...চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।'

অর্থাৎ চারু-অমলের সখ্যের ব্যাপারে যে ভূপতি এজেন্টের কাজ করে এটা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। চিত্রনাট্যকার irony-র এই স্বর্ণ সুযোগটি অবশ্যই নেবে।

মূল গল্পে কিন্তু ভূপতির এই অনুরোধের আগেই চারু অমলকে 'ধরিয়ে পড়া করাইয়া' নেয় (প্রথম পরিচ্ছেদ)। অথচ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূপতির অনুরোধে অমল সে কথা প্রকাশ করে না। সে-বিষয় কোনো উল্লেখ না করেই অমল বলে, 'বৌঠান যদি পড়াশুনা করেন তাহলে আমার বিশ্বাস উনি বেশ ভালোই শিখতে পারবেন।' ছবিতে ভূপতির অনুরোধে অমল যে উল্লসিত এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি—যেমন মূল গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেও হয় নি; আগ্রহ ও আনন্দটা প্রধানত চারুরই—অমলের ততটা নয়। ছবিতে ভূপতির অনুরোধে অমলকে দিয়ে তাই বলানো হয়েছিল—'দাদা, আমি নিজে সাহিত্যচর্চা করব, না তোমার বৌকে করাব ?'

এর পরেই development পর্বের শুরু। এখানে বলা দরকার যে ছবির আঙ্গিক কেমন দাঁড়াবে তার আভাস আদি-পর্বেই দেওয়া হয়েছে। মূল কাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা ও সংলাপের পরিবর্তে চিত্রনাট্য রচনার চিরায়ত পদ্ধতিতে গোটা গোটা দৃশ্য মারফৎ এ-কাহিনী বিবৃত হবে। এর কারণ খামখেয়াল নয়; আদিপর্বে বাধ্য হয়েই যে এ-রীতি অবলম্বন করতে হয়েছে তা আগেই দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্রে নিজস্ব রীতি অনুসরণ করে যে-আদিপর্ব রচিত হয়েছে, ছবির অবশিষ্ট অংশে যদি সে-রীতি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে চারুলতা আর যাই হোক না কেন, শিল্প হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মূলের হুবহু অনুসরণ কেন অসম্ভব তার আরো কিছু কারণ এখানে দেখানো দরকার।

মূল গল্পে এমন অনেক কিছুরই বর্ণনা আছে যা 'প্রতিদিন' ঘটে, বা 'মাঝে মাঝে' 'সময় সময়' বা 'এক এক দিন' ঘটে। যেমন—'তাহা লইয়া চারুলতা মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ করিত', '(অমল) প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় ও আবদার করে', 'অমল মাঝে মাঝে সাহিত্যসভায় প্রবন্ধ পাঠ করে।' চলচ্চিত্র সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও বোঝা যায় এই 'মাঝে মাঝে'-র ঘটনাগুলি অনেক সময়ই ছবির 'মাঝে মাঝে' দেখানো চলে না।

এ ছাড়া এমন কিছু ঘটনাও মূল গল্পে আছে যার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে একটা দীর্ঘ সময়কাল ও বিস্তৃত development-এর ইঙ্গিত আছে। যেমন—চারু আশা করে যে অমলের রচনা তাদের দুজনের বাইরে আর কেউ পড়বে না। অমল কিন্তু তার রচনা ছাপানোর লোভ সংবরণ করতে পারে না। সরোরুহ পত্রিকায় সে লেখা পাঠায়, সে-লেখা ছাপা হয় এবং সে নিজেই গর্ব করে চারুকে সে কথা বলে। তারপর দেখি—'অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসা পাইল। মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বৌঠানকে দেখাইত।... অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নাম স্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না।...ভূপতি একদিন অবসরকালে চারুকে কহিল, তাইত, আমাদের অমল এমন ভালো লিখতে পারে তাতো জানতুম না!'

এই সমগ্র ঘটনাবলীকে যদি ছবিতে দৃশ্য ও সংলাপের সাহায্যে স্থান দিতে হয় তাহলে কাহিনীর ভারসাম্য রক্ষা হয় কী ভাবে সে কথা রুদ্রমশাই ভেবে দেখবেন কি? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে মূলের অনুসরণ করতে হলেও চিত্র-নাট্যকারকে নতুন সংলাপ ও দৃশ্যের উদ্ভব করতে হত, এবং তাতেও নিশ্চয়ই রুদ্রমশাই আপত্তি তুলতেন।

আসলে সিনেমার আঙ্গিকের খাতিরে—এইসব অবশ্য-পরিবর্তন ও পরিবর্জনের ফলে যা দাঁড়াল তার সঙ্গে মূলের মিল বা বেমিল কতখানি সেটাই বিবেচ্য। থীম, প্লট, চরিত্র সবই কি পালটে একেবারে একটি আস্ত নতুন কাহিনী রচিত হল যার সঙ্গে নষ্টনীড়ের মিল আর হাজারটা গল্পের মতোই?

এ প্রশ্নের জবাব আমার এই আলোচনার শেষে আপনিই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি।

Development পর্ব অথবা মধ্যপর্বের শুরু আরেকটি দুপুর দিয়ে। ছবির প্রথম দুপুরে চারু একা, দ্বিতীয়তে চারু ও মন্দা, তৃতীয়তে চারু, মন্দা ও অমল। একই ঘর, একই খাট, একই পরিবেশ, একই ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ। এই দৃশ্যের ঘটনার সারাংশ হল এই—চারু কাজ করছে, মন্দা অকাজ করছে, অমল দাদার আদেশ অনুযায়ী বইখাতা হাতে বৌঠানের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করতে এসেছে। অমলের অনুরোধে মন্দা পান সেজে আনে। অমল মন্দার গোলাম-চোর খেলার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের প্রসঙ্গ তোলে। চারু আলোচনায় তর্কবিতর্কে মেতে ওঠে, মন্দা ঘুমিয়ে পড়ে। মন্দার নাসিকাগর্জনে ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে চারু-অমল মাদুর নিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়। যাবার সময় চারু হাত থেকে যে-জিনিসটা নামিয়ে রেখে যায় সেটা হল ভূপতির জন্য অর্ধসমাপ্ত চটির নক্শা। এর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চারু তার কাজ থামায় নি। রুদ্রমশাই-এর 'চারুর দীপ্তচক্ষে অমলের দিকে চাওয়া' এ দৃশ্যেও নেই, কারণ ভূপতির প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করে অমলের সান্নিধ্যভোগের সময় এখনো আসে নি।

মূল কাহিনীতে এই তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনা হিসেবে কোনো একটি গোটা দৃশ্য নেই। এই বিশেষ দৃশ্যে ব্যবহার্য কোনো তৈরি সংলাপও নেই। ছবির এ-দৃশ্য ঠিক এই ভাবে তাই মূল গল্পে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাও জোর গলায় বলব যে এ দৃশ্যে এমন কিছুর অবতারণা করা হয়নি যা থেকে মনে হতে পারে যে মূলের এই বিশেষ ত্রিকোণ সম্পর্কটির কোনো বিকৃতি ঘটেছে। যা কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করা হয়েছে তা Compression-এর খাতিরে।

বাগানের দৃশ্য সম্পর্কে শ্রীরুদ্র বলেছেন, 'বাগান করা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্যে দিয়ে অমল ও চারুর যে সখ্য সম্পর্কের প্রকাশ পাইত তা চিত্রে পাই না, কারণ এই প্রাথমিক সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের থীমে আছে, সত্যজিৎ রায়ের থীমে নেই।' আশ্চর্য! নষ্টনীড় গল্পে বাগানের উল্লেখের আগেই আমরা চারু-অমলের সখ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই চারুর পড়া করিয়ে নেবার বর্ণনা থেকে, অমলের নানান আবদারের বিবরণ থেকে, অমলের জন্য পশমের চটিতে নকশা

করার ঘটনা থেকে। কিন্তু চারুলতা ছবিতে অমল ও চারুকে প্রথম একা দেখা যায় বাগানে, এবং এখানেই দেখি তারা প্রথম প্রাণ খুলে কথা বলে।

ছবিতে বাগানে তিনটি বিভিন্ন দিনের ঘটনা পর পর বলা হয়েছে। প্রথমটিতে চারু-অমলের বন্ধুত্বের সূত্রপাত, দ্বিতীয়টিতে চারু এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে অমলের কাছে আবদার পেশ করছে ('যা লিখবে, এই খাতাতেই থাকবে—ছাপাতে পারবে না কিন্তু!'), তৃতীয়টিতে চারুর মনে প্রথম অভিমানের ইঙ্গিত। ভূপতি এ-পর্বে অনুপস্থিত। মন্দা আছে—দর্শক হিসেবে—যেমন মূল কাহিনীতেও আছে ('আমার জন্য একটা পাকা আমড়া আনবি?')।

মূল গল্পে চারু-অমল-মন্দাকে জড়িয়ে যে-দ্বন্দ্ব তার সারাংশ হল এই—'একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্ন চক্ষে দেখে না' তাই মন্দা প্রথমে অমলকে বিশেষ আমল দেয় না। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে নাম কেনার পর 'মন্দা যখন দেখিল যে অমল চারিদিক হইতে শ্রদ্ধা পাইতেছে—তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে ভাবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল—সে যেন অমলকে নতুন করিয়া দেখিল!' (প্রসঙ্গত এ-বর্ণনায় পাঠক যদি মনে করেন যে মন্দাও স্বামীসান্নিধ্যে বঞ্চিত হয়ে চারুর মতোই অমলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না)। এর ফলে 'মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল।' কারণ, মন্দা সাহিত্যে উৎসাহের ভাণ করতে শুরু করে, এবং অমল চারুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা না করে মন্দাকে সঙ্গ দিতে শুরু করে। এতে চারু স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়। মন্দার তুলনায় সে যে কত বেশি বুদ্ধিমতী সেটা অমলকে প্রমাণ করার জন্য সে লিখতে শুরু করে। অনেক চেষ্টার পর অমলের প্রভাব কাটিয়ে সে যখন নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গিতে লিখতে সক্ষম হয় তখন তার লেখা সাহিত্যগুণে অমলের লেখাকে অতিক্রম করে। (অমলের রচনার শিরোনামা, বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু চারুর লেখা 'খানিকটা অগ্রসর হইতেই…সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা, ভঙ্গি ও আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।' অমলের মতে কিন্তু 'এ-লেখার গোড়ার দিকটা বেশ সরেস হইয়াছিল, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।') যাই হোক চারুর অভিমান ভাঙার উদ্দেশ্যে এ-লেখা জোর করে কাগজে ছাপায়। ছাপানোর পর কোনো এক সমালোচক

অমলের লেখার চেয়ে চারুর লেখার অনেক বেশি প্রশংসা করে। চারু প্রথমে এ-প্রশংসায় খুশি হয়—কিন্তু অমল আঘাত পাবে মনে করে তার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। চারুর হাতে সমালোচনা দেখে অমলের উল্টো ধারণা হয়—'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' অমল চুলে যায় মন্দার কাছে। এতে চারুর অভিমান দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে ভূপতির কাছে মন্দা সম্বন্ধে অভিযোগ জানায়—'কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার আর ভালো লাগছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।'

এই ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে অমলের চরিত্রের যে-রূপটি আমরা দেখতে পাই, তা একাধারে অপরিণত, অস্থির বা vacillating ও দুর্বল। মন্দাকে তাড়াবার অনুরোধে চারু-চরিত্রও বেশ খর্ব ও স্থূল হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। সাহিত্যের কাহিনীকারে স্বাভাবিক সুযোগগুলি গ্রহণ করে ভাষার প্রসাদগুণে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাবলীর মধ্যেও যে suspension of disbelief সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তা চলচ্চিত্রকারের সাধ্যের অতীত। চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষতাই এই ঘটনাবলীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত—ফলে অমল-চারুর মান-অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা ন্যাকামির সামিল হয়ে দাঁড়াত। কারণ, দর্শকের মনে সদাই প্রশ্ন জাগত—বোঝাপড়ার সুযোগের অভাব যেখানে নেই, সেখানে এমন করে রাগ পুষে রাখা কেন?

অথচ এটাও অস্বীকার করা চলে না যে কাহিনীর প্রথমাংশে এই ছেলেমানুষী মান-অভিমানের পালা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পরিসমাপ্তির অমোঘ ট্র্যাজেডি যেন এই ছেলেমানুষীর পটভূমিকায় খোলে ভালো। এই দিকটা মনে রেখে এবং তার সঙ্গে আধুনিক চিন্তামনোভাবসম্পন্ন দর্শকের প্রতিক্রিয়ার কথাও মনে রেখে, কাহিনীর এই অংশের ঘটনাবলীতে কিছু রদবদল করা হয়েছিল।

কতকটা দাদার প্ররোচনাতেই যে অমল চারুকে সঙ্গ দিচ্ছে, এটা যদি চারু জেনে ফেলে, তবে তার পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই আমার মনে হয়েছিল। চারুর অভিমানের শুরু ছবিতে এই ভাবেই। অমলও এই অভিমানের সুযোগ নিয়ে চারুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে তার কাছ থেকে কাগজে লেখা পাঠানোর অনুমতি আদায় করে নিচ্ছে। মূলে চারুর

অভিমানের মাত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অমলের insensitivity-র অনেক উদাহরণ আছে।

বাগান থেকে উপরে এসে চারুকে তার ঘরে না পেয়ে অমল মন্দার কাছে যায়। খেলাচ্ছলে তাকে জিগ্যেস্ করে 'বলতো কোন্ কাগজে লেখা পাঠাই ?' অমল জানে মন্দার সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক তাতে অস্বস্তিকর মান-অভিমানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অমল-মন্দার শেষ কথাগুলি চারু শুনতে পায়। অমল তখন উঠে চলে যাচ্ছে। চারু মন্দাকে সামান্য অজুহাতে ধমক দেয়।

নাটকের দিক থেকে এবার যেটার প্রয়োজন সেটা হল ভূপতিকে এই cross currents-এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা। মূলে দেখি চারু-অমলের সান্নিধ্যের এজেন্ট হয়েও তাদের মান-অভিমানের প্রকৃত রূপটি তাকে বার বার এড়িয়ে যাচ্ছে। এইটে ফুটিয়ে তোলাও যেমন দরকার, আবার চারুর মানভঞ্জনেরও দরকার। এই দুইটি একত্র করার পক্ষে অমলের বিয়ের সম্বন্ধের দৃশ্যটি সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছিল।

মূল গল্পে এ-ঘটনা ঘটছে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর। চারু-ভূপতির কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন—

> 'ভূপতি : আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না ?
>
> চারু : আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না—আমি তাকে বলতে পারব না।
>
> ভূপতি : তোমার কি মনে হয় সে করবে না ?
>
> চারু : আরো তো অনেকবার চেষ্টা করে দেখা গেছে, কোনো মতে তো রাজি হয় নি।
>
> ভূপতি : কিন্তু এবারের প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি সেভাবে আশ্রয় দিতে পারব না।
>
> ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।'

এখানে লক্ষণীয় এই যে ভূপতি কতকটা নিজের ভার হালকা করার জন্যই অমলের বিয়ে দিতে চাইছে। মূল গল্পে অমল ভূপতির বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এই রাজি হওয়ার কারণের ইঙ্গিত আগের পরিচ্ছেদে আছে।

বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার পরে অমল ভূপতির ক্লিষ্ট চেহারা দেখে তার কারণ চারুকে জিজ্ঞাসা করে। চারু বলে, 'কই, তা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধহয় গাল দিয়ে থাকবে।' এইখানে চারুর insensitivity হঠাৎ অমলের চোখ খুলে দিচ্ছে—'অমল একবার তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল কি ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল।' বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়া এবং বিয়ে করতে চলে যাওয়ার মধ্যে অমল 'সন্ধান দ্বারা তাহার (ভূপতির) দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল।...তাহার পর সে চারুর কথা ভাবিল —নিজের কথা ভাবিল—কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল—সবেগে বলিল, চুলোয় যাক আকাশের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো! আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ!' (যেসব সরল পাঠক অমল-চারুর সম্পর্কের মধ্যে বৌদি-দেবরের মধুর সম্পর্কের বেশি কিছু দেখেন না, তাদের এই 'কর্ণমূল লোহিত' হওয়ার ব্যাপারটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি)।

এখানে চিত্রনাট্যকারকে কতগুলি ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে—

(১) উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর মন্দা-উমাপদ ভূপতির আশ্রয় ছেড়ে ময়মনসিংহ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই যাওয়ার আসল কারণ সম্পর্কে কি চারু বা অমলের কোনোই অনুসন্ধিৎসা নেই? তারা কি এ-ব্যাপারে একেবারে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে যাবে? চলচ্চিত্রে দর্শকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা।

(২) উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর ভূপতির 'শুষ্ক, বিবর্ণ' মুখ দেখে অমলের দাদা সম্পর্কে উদ্বেগ হচ্ছে। এর কিছুক্ষণ আগেই ভূপতি চারুর কাছে গেছে। অথচ ভূপতির চেহারা দেখে চারুর মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। চারুর এই চরম insensitivity ও অন্যমনস্কতায় (যার নিদর্শন গল্পের প্রথমার্ধে পাওয়া যায় না) কেবল এ কথাই মনে হতে পারে যে অমলের প্রতি তার আকর্ষণ দেবরের প্রতি বৌঠানের স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আসলে তার involvement অত্যন্ত গভীর। এ যদি না হবে

তাহলে বলতে হয় চারুর আচরণ এ দৃশ্যে তার পূর্ববর্ণিত আচরণের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে নি। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিকে বেছে নেবার স্বাভাবিক অধিকার চিত্রনাট্যকারের আছে, এবং আমি তাই করেছিলাম।

(৩) বৌদির মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে এক কথায় বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়াতে এটাও পরিষ্কার হয় যে অমলের দিক থেকে তেমন involvement নেই—বা থাকলেও অমল সেটাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। ভূপতির দুর্দশার কথা জানতে পেরে ভূপতিকে সাহায্য করার বাসনার মধ্যেই অমলের maturity-র সূত্রপাত এবং কাহিনীর শেষাংশে এটাই অমল-চরিত্রের dominant note বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এটা লক্ষণীয় যে বিয়ের পরে অমল চারুর সঙ্গে আর কোনোই সম্পর্ক রাখছে না।

একক বিচারে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই ঘটনাবলী থেকে চারু-অমল চরিত্রের যে-সূত্রগুলি ধরা পড়ছে, তারই উপর ভিত্তি করে ছবির মধ্যপট রচিত হয়েছিল।

মন্দা-অমলের দুপুরের দৃশ্যের পর আমরা রাত্রে চারুর ঘরে যাই। চারু অমলের উপর অভিমান করে আছে। ভূপতি এসে অমলের বিয়ে সম্বন্ধে কথা তোলে। চারু বলে, 'ভালোই তো—ওকে বললেই রাজি হবে।' ভূপতি অমলকে ডেকে পাঠায়।

অমল : দাদা—প্রুফগুলো এখনো দেখা হয় নি।

ভূপতি (কোপের ভাণ করে) : কেন ?

অমল : আমার একটা লেখা নিয়ে একটু—

ভূপতি : কী লেখা ?

অমল : এমনি—কিছু না—

ভূপতি : যাও, নিয়ে এসো আমি দেখব।

মূল গল্পে ভূপতি অমলের লেখা পড়ে বলে—'বেশ লিখেছ। কিন্তু আমাকে কেন ? এসব কবিত্ব কি আমি বুঝি ?' এই উক্তিতে অমল-ভূপতির মধ্যে যে একটা amusing বৈপরীত্যের ইঙ্গিত আছে, সে-দিকটা এই বিবাহপ্রস্তাবের দৃশ্যে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

অমলের লেখা পড়ে তার মাথামুণ্ডু না বোঝার ভাণ করে ভূপতি বলে—

'না হে, তুমি একটা বিয়েই কর।' সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব না তুলে ভূপতি একটু ঘুরিয়ে করছে—এই আর কি! মশারির পিছন থেকে অভিমানী চারু অমলকে চেতিয়ে দেয়। বৌঠান-দেবরে ঝগড়া লেগে যায়। ভূপতি বলে—'আচ্ছা, ছেলেমানুষী করছ কেন? তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয় নি, অমল। বিয়ের পর শ্বশুর জামাইকে বিলেতে পাঠাবেন।'

বিলেত যাবার আশায় অমলের সাময়িক মনের দোলা, চারুর tension, ভূপতির অমলকে আরো বেশি করে প্রলুব্ধ করা, এবং অবশেষে বিলেত-সম্পর্কে অনীহার অজুহাতে অমলের প্রস্তাবে অসম্মতি জানানো (অমল 'না' বলছে না; বলছে 'সময় চেয়ে নাও—একমাস'—কারণ এই প্রস্তাবেই তাকে পরে সম্মতি দিতে হবে)। এই অসম্মতিতেই চারুর মানভঞ্জন। এ-দৃশ্যে মূলের চরিত্র বা থীমের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ, ভবিষ্যতে অমলের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়া এবং বিলেত যাওয়ার পূর্বাভাস এখানে দেওয়াতে, চলচ্চিত্রের সংকুচিত পরিসরে ঘটনাটা আকস্মিক বলে মনে হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

এর পরেই মন্দা-উমাপদকে নিয়ে একটি নতুন দৃশ্য। এর প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ও উমাপদর villaing একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

অমলের গানের দৃশ্য দিয়ে ছবির তৃতীয় পর্বের শুরু। হালকা মেজাজে আরম্ভ করে আচমকা চারু-অমলের দ্বিতীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত। অমলের লেখা সরোরুহ পত্রিকা ছাপিয়েছে এ-খবর অমল মন্দাকে প্রথম দেয়। চারু অভিমানে অমলের মুখের উপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। ভূপতিকে চারু-অমলের সংঘর্ষের জালে আগেই জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে চারু-অমল-মন্দার জালেও ভূপতি জড়িয়ে পড়ে একটি জটিল মিশ্ররসাশ্রিত চতুষ্কোণের সৃষ্টি করে। এ দৃশ্যে রুদ্রমশাই লক্ষ করবেন যে চারটি চরিত্রই তাদের রবীন্দ্রকল্পিত সত্তা বজায় রেখে আচরণ করছে। মন্দা দর্শক হিসেবে চারু-অমলের মান-অভিমানের পালা উপভোগ করছে—যদিও অমলের দিক থেকে চারুকে খুশি করার তাগিদে সে কিছুটা ক্ষুণ্ণ। অমল দুজনকে একসঙ্গে খুশি করতে ব্যস্ত। দাদার সামনে পড়ে সে উল্লসিতভাবে তার লেখা প্রকাশিত হবার খবর দেয়, ভূপতি বলে—'বলো কে election জিতবে—Tory না Liberal?' চারু অভিমানে টৈটম্বুর; দরজায় টোকা পড়াতে অমল মনে করে

সে চেঁচিয়ে ওঠে—'কাজ করছি!' কিন্তু ভূপতির গলা শুনে দরজা খুলে দিয়ে অভিমান সংবরণ করে দরজা বন্ধ করার মিথ্যা কারণ সৃষ্টি করে। ভূপতি চারুর কথা সরল মনে বিশ্বাস করে আরশুলা খুঁজতে শুরু করে এবং খুঁজে না পেয়ে চারুকে রাজনীতির খবর বলতে থাকে।

এ দৃশ্যে চারুর মানভঞ্জন হয় না—কারণ অমল তার স্বভাবসুলভ insensitivity হেতু চারুর অভিমানের মাত্রাই বুঝতে পারে না; সুতরাং মানভঞ্জনের কোনো চেষ্টাই সে করে না। বরং (মূলেরই মতো) সে মন্দার কাছে গিয়ে গলা উঁচিয়ে বলে—'যাই, বন্ধুমহলে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।'

এর পরেব ঘটনা মূলেরই অনুসরণে রচিত। 'সে লিখিবে—অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে। মন্দার সঙ্গে তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা সে প্রমাণ না করিয়া ছাড়িবে না।'

চারুর লেখার প্রথম প্রচেষ্টা যে অমলের লেখারই সামিল তার ইঙ্গিত শিরোনামাতেই ছবিতে দেওয়া আছে। অমলের লেখার নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ', 'শ্রাবণের মেঘ', 'অমাবস্যার আলো'—চারু লেখে—'কোকিলের ডাক'। কোকিলের ডাক শুনেই চারু তৎক্ষণাৎ তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু স্থির করে। অর্থাৎ এখানে অনুপ্রেরণার কোনো প্রশ্ন নেই। আর তাই চারুর কলম দিয়ে লেখা বেরোয়ও না—কারণ অমলের সাবলীল অগভীর ভাবোচ্ছ্বাস তার অনায়ত্ত।

অনেক চিন্তা, অনেক কাগজ ছেঁড়ার পর উৎসের সন্ধান মেলে। চারু তার গ্রামের স্মৃতিকথা লেখে। লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা হাতে নিয়ে অমলেব কাছে গিয়ে তাই দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর ভূপতির জন্য নকশা-করা চটি এবং মন্দার হাত থেকে পানেব বাটা ছিনিয়ে নিয়ে পান সেজে অমলকে দিয়ে, অমলের হাত থেকে পত্রিকা টেনে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তবে চারুর অভিমানের পালা শেষ।

এই একটি পাঁচ মিনিটের দৃশ্যে কতগুলি জিনিস বলা হয়েছে তার একটা তালিকা দিলে হয়তো রুদ্রমশাই সিনেমার compression-এর ব্যাপাবটা খানিকটা বুঝতে পারবেন।

(১) চারুর স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রতিভা অমলের চেয়ে বেশি।

(২) চারুর কাছে লেখা প্রকাশ করাটা বড় কথা নয়, আসল কথা অমলকে প্রমাণ করা যে সে মন্দার চেয়ে অনেক বেশি গুণী।

(৩) মন্দার হাত থেকে পানের বাটা ছিনিয়ে নিয়ে চারু প্রমাণ করে যে অমলের উপর তার একাধিপত্য; অমল-চারুর এ-রাজ্যে মন্দার প্রবেশাধিকার নেই।

(৪) ভূপতির জন্ত তৈরি নকশা-করা চটি অমলকে দেওয়ার ব্যাপারে ভূপতির প্রতি চারুর কর্তব্যের অবহেলার প্রথম ইঙ্গিত। অনুরূপ অবহেলার নিদর্শন মূলের অনেক জায়গাতেই আছে।

দৃশ্যের শেষে চারু অনুতাপে বিহ্বল হয়ে অমলের জামা আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বোধহয় চলে যায়। অমলকে দেখি জানলার ধারে—পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। মূলে অমলের উপলব্ধি—'গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'—এ দৃশ্য তারই চিত্রসংস্করণ। Context এখানে আলাদা—কিন্তু তারও কারণ আছে। মূল গল্পে অমল যে-অবস্থায় চারুর মনোভাব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে—সে রকম অবস্থায় তাকে তার আগে অনেকবার পড়তে হয়েছে। মনে রাখা দরকার—ভূপতির 'শুষ্ক বিবর্ণ' মুখের কারণ কিন্তু অমল তখনও জানে না—কাজেই crisis-এর কারণ বা গুরুত্ব না জেনেই কেবলমাত্র ভূপতি সম্পর্কে চারুর ঔদাসীন্য থেকেই যদি অমলের উপলব্ধি আসে, তবে ছবিতে অন্তত সেটাকে clairvoyance বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

অথচ অমলের এই উপলব্ধি চিত্রনাট্যের পক্ষেও অপরিহার্য। এর একমাত্র উপায় হল চারুর আচরণকে আরো স্পষ্ট কোনো রূপ দেওয়া। এই জন্যেই চারুর ক্রন্দনের দৃশ্য। রুদ্ধ অভিমানের দ্বার খুলে গেলে চারুর পক্ষে ক্রন্দন অসম্ভব নয়। ভূপতির সামনেই যদি তার পক্ষে অমলের জন্য শোকপ্রকাশ সম্ভব হয় (অষ্টম পরিচ্ছেদ) তাহলে অমলের সামনে হবে না কেন—বিশেষত আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই মেনে নিয়েছি যে চারু অমলের প্রতি আসক্ত ?

এই কারণেই এই কান্নার দৃশ্য মূলানুগ হয় নি—এ অভিযোগের কোনো মানে আমি বুঝি না। Action-এর সাহায্যে এ-দৃশ্যে যা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ভাষায় তার চেয়ে কম কিছু বলেন নি। যাদের হাতের কাছে নষ্টনীড় নেই, তাদের জন্য এই উদ্ধৃতি—'উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার বার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইতে যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান! চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনো দোষ করি নাই! তুমি যদি ভালো মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধহয় আমি এ-দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত, চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত—অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সার ভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।'

চারুর ভেঙে পড়ার দৃশ্যের পরের দৃশ্যে ভূপতির বন্ধুমহলের একটা ইঙ্গিত পাই। নিশিকান্ত চরিত্রের উল্লেখ মূলে একাধিকবার আছে—এই দৃশ্যে তাকে রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই দৃশ্যেই, আসর থেকে উঠে গিয়ে উমাপদকে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি করতে দেখা যায়। এখানে মূল গল্প থেকে যে-পরিবর্তন হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

মূল গল্পে উমাপদ ধরা পড়ছে। ধরা পড়াটা উমাপদর দিক থেকে অন্তত আকস্মিক বলে মনে হয় না। সে যেন ধরা পড়ার জন্য প্রস্তুতই ছিল। তবে কি উমাপদ মূর্খ? কিন্তু যেভাবে সে তলায় তলায় কাজ গুছিয়ে নিয়েছে তা থেকে তো তা মনে হয় না। শঠতার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতার এ-সমন্বয় ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য করা সম্ভব হত না। মূল কাহিনীতে এই সমন্বয়ের ফলে এই বিশেষ পর্যায়ে ভূপতি-উমাপদকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-দৃশ্য রচনা করেছেন, সেটা সজীব হতে পারে নি, উমাপদও একটি মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এইসব কারণেই উমাপদকে একটা পুরোদস্তুর calculating villain হিসেবেই কল্পনা করতে হয়েছিল। এই উমাপদর পক্ষে ভূপতির সর্বনাশ সাধন করে ধরা পড়ার আগেই মিথ্যা বলে পলায়ন করা স্বাভাবিক। এতে ভূপতির disillusionment-এর মাত্রা (ট্র্যাজেডির জন্য যেটার আসল প্রয়োজন) কিছুই কমে না। আর calculating বলেই উমাপদর আসল রূপটি একসঙ্গে কাজ করেও ভূপতি ধরতে পারে না।

আলোচ্য নৈশদৃশ্যের উপাদান হল ভূপতির আসরে রাজনীতি-আলোচনা, রামমোহনের গান (এই দুই-এরই উদ্দেশ্য period atmosphere রচনায় সাহায্য করা), উমাপদর টাকা চুরি, চারুর ঘরে চারু-অমলের কথোপকথন, উমা-মন্দার প্রস্থানের ইঙ্গিত ও সবশেষে নিশিকান্ত কর্তৃক চারুর বিশ্ববন্ধুর প্রবন্ধটি ভূপতির গোচরে আনা।

এর আগের দৃশ্যে আমরা দেখেছি চারু অমলকে মন্দার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। সুতরাং চারু-অমলের এ-দৃশ্যে মন্দা নেই। হাজার হোক, মন্দারও তো অভিমান বলে একটা জিনিস আছে! বৈঠকখানায় রামমোহনের গানের জের টেনে চারু-অমল বিলেত নিয়ে আলোচনা করে। চারু অমলের বিয়ের প্রস্তাবের প্রসঙ্গটা চেপে রাখতে পারে না, কারণ অমল তার মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে নি। অমল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। মূল গল্পেও যতদিন না তার পক্ষে দাদার আশ্রয় ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন অমল বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিচ্ছে না। কথোপকথন যাতে নিছক প্রেমালাপে পর্যবসিত না হয়, তার জন্য অমলকে দিয়ে 'ব'-এর অনুপ্রাসে কথাবার্তা বলার একটা সূত্রপাত করানো হয়েছিল। চারুর এতে আপত্তি নেই—সেও ব-এর খেলায় মেতে ওঠে—কারণ এখনও পর্যন্ত তাদের বিচ্ছেদের কোনো পূর্বাভাস চারু পায় নি।

এর পরের দৃশ্যেই ভূপতি কাগজওয়ালার কাছ থেকে উমাপদর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা জানতে পারে।

সেইদিন রাত্রে চারু-অমলকে দেখি বারান্দায় (শোবার ঘরের পরিবেশটি এ-দৃশ্যে অবশ্যপরিহার্য বলেই মনে হয়েছিল)। ভূপতির ফিরতে দেরি দেখে দুজনেই উদ্বিগ্ন।

ভূপতির বিপদের আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে কি চারুর মনে অমলকে হারাবার একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে না? বিশেষত অমলের দিক থেকে চারুর মনোভাবের পরিষ্কার reciprocation-এর কোনো ইঙ্গিত যখন অমল দেয় নি? যদি আমরা মেনে নিই যে চারুর মনোভাব কেবলমাত্র বৌদির মনোভাব নয়, প্রেমিকারও বটে—তবে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হবে।

তাই অমল দাদার খোঁজ করতে যাবার সময় তার হাত চেপে ধরে চারু বলে—'যাই ঘটুক না কেন—কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না!' অমল বলে, 'ছাড়ো বৌঠান। দেখি আমি দাদার কী হল।' মূলে কাহিনীর শেষে অমলের দাদার প্রতি loyalty-র যে-ইঙ্গিত আছে, এখানে তারই সূত্রপাত। দাদার প্রতি চারুর ঔদাসীন্যে অমলের বিস্ময়—এও মূলেরই অন্তর্গত।

ভূপতি তার ট্র্যাজেডির কথা অমলকে বলে। নষ্টনীড়ে এ-ঘটনা অনুপস্থিত।

গল্পে আছে 'খোঁজ নিয়ে অমল ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছে।' অমলের এই জানাটা জরুরি ঘটনা। তবে কি এই খোঁজ নেওয়ার জন্য নতুন চরিত্র ও নতুন দৃশ্যের সংস্থাপন করতে হবে? নতুন চরিত্র ও দৃশ্যেব উদ্ভব বেশি আপত্তিকর, না ভূপতির মুখ দিয়ে ঘটনাটা অমলকে বলানো বেশি আপত্তিকর? 'উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ভূপতি চারুলতাকে সব কথা বলিতে পারে নাই।'—এটা স্বাভাবিক—কারণ উমাপদ চারুর আপন ভাই। কিন্তু অমলকে কোনো কথা না বলার কোনো চরিত্রগত কারণ আছে কি বিশেষত অমল যখন কাগজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নয়? আমার তো মনে হয় না। তাছাড়া এটা নাটকীয়ও বটে—কারণ এখানে ভূপতির উমাপদর উপর বিশ্বাসস্থাপনের সঙ্গে অমলের উপর বিশ্বাসস্থাপনের একটা চমৎকার parallel টানার সুযোগ আছে। চিত্রনাট্যে তাই এই পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

অমলের সঙ্গে কথা বলে ভূপতি শোবার ঘরে আসে। চারু ভূপতিকে আলিঙ্গন করে, যদিও মুখে সহানুভূতিসূচক কিছু বলার ছলনাটুকু সে করতে পারে না। ভূপতি তার আলিঙ্গনের ভুল অর্থ করে। সে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলে, 'এবার থেকে তোমাকে আমি অনেক সময় দিতে পারব। তোমার সতীনকে দূর করে দিয়েছি।'

ভূপতির সঙ্গে কথোপকথনের ফলে অমল ভূপতির দুরবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে। অমলের যে maturity-র ইঙ্গিত মূল গল্পে তার চিন্তায় ব্যক্ত করা হয়েছে, এর পরের দৃশ্যে সিনেমার রীতি-অনুযায়ী অমলের action দ্বারা সেটা জানানো হয়। অমল ভূপতিকে চিঠি লিখে রেখে তার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হবার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

পরদিন সকালে ভূপতি চিঠি পেয়ে অমলের এই চলে যাওয়ার অলিখিত অন্তর্নিহিত কারণটি অবশ্যই টের পায় না। চারু তার প্রচণ্ড ক্ষোভ ভৃত্যের প্রতি অযথা আক্রোশে এবং অমলের প্রতি বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে রূপান্তরিত করে ('দেখ, খোঁজ নাও—ও ঠিক ওই বিমানেই গেছে!')।

শ্রীরুদ্র বলেছেন, অমল চলে যাবার পর আরো ছয়টি অধ্যায়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভূপতিকে দিয়ে তার আসল ট্র্যাজিডিটি উপলব্ধি করিয়েছেন, আর আমি তার সব কিছুই বর্জন করে সংক্ষেপে বাজিমাৎ করতে চেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে ভূপতি-চারু সম্পর্কের নানান

সূক্ষ্ম ও জটিল টানা-পোড়েনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই অংশটিকে প্রায় বলা যেতে পারে Variations on Theme of Incompatibility। এই অংশের দরদ, এর কাব্যময়তা, এর আবেগ অনস্বীকার্য। কিন্তু যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যেভাবে লেখক ভূপতিকে উপলব্ধির মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করলে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায় (এখানেও সেই 'প্লটের' ব্যাপার।)। আমার বিশ্বাস মূলের হুবহু অনুসরণ করলে এসব দুর্বলতা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠত।

মূল কাহিনীতে এই অংশের প্রথমে দেখি ভূপতি চারুর কাছে আসার চেষ্টা করছে। কাগজ গিয়ে ভূপতির এখন সময়ের অভাব নেই। সে অমলের মতোই সাহিত্য রচনা করে চারুর হৃদয়ে স্থান পেতে চায়। এ-প্রচেষ্টা ভারি poignant। চারুর অবশ্যই এতে বেদনার উপশম হয় না, কারণ, অমলের স্মৃতি সে ভুলতে পাবে না; অমলের অভাব ভূপতি মেটাবে কি করে?

বিলেত থেকে চিঠি না আসায় চারুর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে চিঠি যে আদৌ আসেনি তা নয়। অমল ভূপতিকে চিঠি লিখেছে, এবং তাতে চারুকে প্রণাম জানিয়েছে—একবার নয়, তিনবার। এই প্রণামটা অবশ্য চারুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো তাকে পীড়া দিয়েছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখি—'অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেলে তাহার পত্র না-আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলায় পাঁচকথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্ত স্বরে তাহার স্বামীকে কহিল—আচ্ছা দেখ, বিলেতে একটা টেলিগ্রাম করে জানলে হয় না অমল কেমন আছে? ভূপতি কহিল—দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।'

তাই যদি হয়, তাহলে চারু অমলকে প্রিপেড টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা করছে? অমলের ব্যস্ততাব কাবণ সে জানে। অমলের কুশলসংবাদ সে ভূপতিকে লেখা চিঠিতেই পেয়েছে। প্রিপেড টেলিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছু ইঙ্গিতের আশা করে যে তার প্রতি অমলেব আকর্ষণ অটুট রয়েছে? দাদার অনুরোধে বিয়ে করে এবং বিলেত গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানতে চাইছে।

তারপর টেলিগ্রাম পাঠানোর ঘটনাটিতে আসা যাক। ভূপতির সামনে এ-কাজ করা চলে না, পাছে ভূপতির সন্দেহ হয়। সুতরাং চারুকে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। দিন দু-এক পরে চারু ভূপতিকে বলিল—আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে. আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার ?

ভূপতি : কেন ? কোনো অসুখ করেছে নাকি ?

চারু : না—কোনো অসুখ না। জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

'ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাওড়া স্টেশন অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল। এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল।'

বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। রুদ্রমশাইও একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে এই ঘটনার একটি অংশও ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না।

চারুর টেলিগ্রামের কথা জানতে পেরে 'একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে (ভূপতিকে) বিদ্ধ করিতে লাগিল।'

এই সন্দেহ বদ্ধমূল হচ্ছে কি ভাবে ? 'চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে, লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ করিয়া নানাপ্রকার কানাকানি করিয়া থাকে, কিছুতেই তাহার চেতনামাত্র নাই। এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইত। অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।'

গল্পের এই অংশে, ভূপতির যেখানে কাজ নিয়ে মেতে থাকার কোনো প্রশ্ন ওঠে না—চারুকে সঙ্গ দেবার জন্যই যখন সে ব্যস্ত এবং চারুর মানোভাব যেখানে তার আচরণে এতই প্রকট যে 'লোকে' তার সম্বন্ধে কানাকানি করে, সেখানে ভূপতির দীর্ঘকালব্যাপী এই marathon incomprehension-এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কোথায় ? স্ত্রীকে তো সে জেনেশুনেই অবহেলা করেছে ; সে-সম্বন্ধে অপরাধবোধের ইঙ্গিতও গল্পে আছে ;

চারুর সঙ্গে তার basic incompatibility সম্বন্ধেও সে সচেতন। তার উপরে, অমলের প্রতি চারুর স্নেহমমতার ইঙ্গিতও সে অনেকবার পেয়েছে ; আর অকাট মূর্খ হিসেবেও ভূপতিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেন নি। আগেও বলেছি, আবার বলছি, ভাষার গুণে পড়ার সময় এসব খটকা মনে লাগে না ; কিন্তু চিত্রনাট্য রচনাকালে যখন মূল কাহিনীর নির্মম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় যখন চরিত্রগুলিকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে হয়, গল্পের পরিবেশ চোখের সামনে মূর্ত করে তুলতে হয়, সময়ের পরিষ্কার সূত্র ধরে ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিকতা রচনা করতে হয়—তখনই এ-জাতীয় ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। কাহিনীর রদবদল যে হয়, তা এই কারণেই—খামখেয়ালবশত নয়, বা পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরি করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়। রুদ্রমশাই প্রশ্ন করবেন—তবে নষ্টনীড় গল্প নেওয়া কেন ? উত্তরে বলব—চারুলতা ছবি করার জন্যই।

চারুলতার উপসংহার নষ্টনীড়ের উপসংহার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিনা সেইটে বিচার করে বর্তমান আলোচনা শেষ করব।

নষ্টনীড়ে অমল চলে যাবার পর ভূপতির আচরণের মূল কথা হল—চারুর কাছে আসার চেষ্টা করা। এতে যে সময়ের ব্যাপ্তির ইঙ্গিত আছে—ছবিতে সে ইঙ্গিত দেবার জন্যই কাহিনীর পটপরিবর্তন করা হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীকে তাই দেখা যায় সমুদ্রতটে—স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। চারু কি অমলকে ভুলতে পেরেছে ? এর কোনো ইঙ্গিত এ-দৃশ্যে দেওয়া হয় নি। ভূপতি থাকায় সে-ইঙ্গিত দেওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ভুলতে পেরেছে মনে হলে, ভবিষ্যতে ভুলতে না-পারার সত্যটা আরো মর্মান্তিক ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব। সমুদ্রতটে তাই অমলের কোনো উল্লেখ নেই।

চারু ভূপতির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বললেও, ভূপতির প্রেমালাপের প্রচেষ্টায় সে কোনো মন্তব্য করে না। বরং ভূপতির পাকা চুল তুলে স্বামীর প্রতি একটা unromantic মনোভাবই সে প্রকাশ করে। মূল কাহিনীতেও চারু ভূপতির সঙ্গে কথোপকথনে কখনও কোনো রূঢ় ভাব প্রকাশ করে নি ; ছবির এই দৃশ্যেও ভূপতির কাগজ বার করার প্রস্তাবে চারু উৎসাহই দিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই ভূপতি চারুর হাতে অমলের লেখা চিঠি তুলে দেয়। ভূপতি ঘর থেকে চলে যাবার পর চিঠি না খুলেই চারু

পুঞ্জীভূত রুদ্ধ বেদনার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে। এই সময়ে আচমকা ফিরে এসে দরজার গোড়া থেকে ভূপতি ক্রন্দনরত চারুকে দেখে এবং তার বিলাপ শোনে—'ঠাকুরপো, তুমি কেন চলে গেলে ঠাকুরপো! আমি কী অপরাধ করেছিলাম যে তুমি আমায় না বলে চলে গেলে' ইত্যাদি।

ছবির ভূপতি কোনোখানেই এমন নির্বোধ নয় যে এই বিলাপকে সে শুধুমাত্র প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ দেবরের জন্যে বৌঠানের বিলাপ বলে ভুল করতে পারে। তাও ভূপতির মনে সম্পূর্ণ উপলব্ধি আনবার জন্য তাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলন্ত ঘোড়াগাড়িতে একা অবস্থায় দেখানো হয়েছিল, এবং তার চোখে মুখে ক্রমান্বয়ে অবিশ্বাস, বেদনা, হতাশা এবং সবশেষে চারুর প্রতি অনুকম্পার ভাবের সঞ্চার করা হয়েছিল।

ভূপতি বাড়িতে ফিরে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গল্পে divorce-এর প্রশ্ন আসে না। তবে কি চারুকে ভূপতি একা ফেলে রেখে চলে যাবে—যেমন মূল কাহিনীতে সে করেছে? চারুর 'অপরাধ' কি ভূপতির দৃষ্টিতে একেবারেই অক্ষমনীয়, নাকি সে মনে করে যে চারুকে একা থাকতে দিলে সে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণা ভোগ করবে? চারুর সঙ্গে একটা বিশদ বোঝাপড়ার তাগিদও কি সে বোধ করবে না? বিশেষ করে এ-অবস্থার জন্য তার নিজের দায়িত্বও যখন কিছু কম নয়?

আমার মতে চারুকে পরিত্যাগ করে মহীশূর যাত্রা রবীন্দ্র-বর্ণিত ভূপতির চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।

কিন্তু তাই বলে এ-অবস্থায় নতুন করে সুখনীড় রচনা সম্ভব কি? মিলন সম্ভব কি? দুজনেই পরস্পরের দোষ ক্ষমা করে একসঙ্গে ঘর করা সম্ভব কি?

যেটাই সম্ভব হোক না কেন—সেটা সময়সাপেক্ষ। দুজনেই এখন দুজনের কাছে অত্যন্ত বেশি পরিচিত, তাই মনে হয় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য।

এ-দৃশ্যে তাই হাতে হাত মিলতে পারে না। ভবিষ্যতে মিলবে কি? জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথও জানার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজকের মতো ঘর ভেঙে গেছে, বিশ্বাস ভেঙে গেছে, ছেলেমানুষী কল্পনার জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবের জগতে নেমে এসেছে দুজনেই। এটাই বড় কথা। এটাই নষ্টনীড়ের থীম।

আমার মতে চারুলতায় এ-থীম অটুট রয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্য অকাদেমির বই

বঙ্গানুবাদে জ্ঞানেশ্বরী, আন্তিগোনে, তার্তুফ জীবনলীলা প্রভৃতি ; বাঙলায় চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি ; ইংরেজিতে History of Bengali Literature, History of Oriya Literature প্রভৃতি সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত বই দ্রষ্টব্য।

দশ বৎসর হল সাহিত্য অকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইং ১৯৫৪-এর ১২ই মার্চ তার জন্ম, জওহরলাল নেহরু প্রথমাবধিই ছিলেন তার সভাপতি ; পূর্বে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, আর এখন ডাঃ জাকির হোসেন প্রতি-সভাপতি। আরও দশ বৎসব পিছিয়ে গেলে বুঝতে পারি—স্বাধীনতা লাভের পর দেশের জীবনের পথ কতদিকে উন্মুক্ত। 'সংগীত কলা অকাদেমি' (১৯৫৩) পূর্বেই গঠিত হয়, আর 'ললিত কলা অকাদেমি'র প্রায় সেই সময়েই (১৯৫৪-এ) জন্ম। অনেক দিকে ন্যাশনাল লেবরেটরিসমূহও বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই আত্মসন্তুষ্টির কারণ নেই ; কিন্তু স্বভাবতই মনে পড়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও 'নাগরী প্রচারিণী সভা'র মতো জাতীয় প্রচেষ্টার কথা। কত বাধাই না ছিল তাদের সম্মুখে। সাংস্কৃতিক প্রকাশের অবকাশ আজ সে তুলনায় নিশ্চয়ই বাধামুক্ত।

অবশ্য সাহিত্য অকাদেমির প্রধান যা কাজ সেদিনে সেসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সাধ্যাতীত ছিল। হয়তো কল্পনাতীতও ছিল। বহুভাষার দেশে এক-একটি ভাষাব পরিষদ তখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন ভাবেই আপনার সীমাবদ্ধ এলেকায় আপনার কাজ করত। সে ক্ষেত্র এখনো তাদের পক্ষে উন্মুক্ত। সাহিত্য অকাদেমি দায়িত্ব নিয়েছে এই বহুভাষী সমাজের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সূত্রটিকে আরও দৃঢ় করে বাঁধতে, প্রত্যেককে প্রতিবেশীর ভাষার সঙ্গে আরও পবিচিত করে তুলতে ; ভারতের প্রত্যেক ভাষার পাঠক-সাহিত্যিককে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত করে সমগ্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সকলকে সম্মিলিত করতে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের এক পথ—বিবিধ ভারতীয় সাহিত্যের তথ্য সংগ্রহ ও তা প্রকাশ, যেমন, বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থপঞ্জী রচনা, লেখক-পঞ্জী রচনা, নানা

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, 'ভারতীয় সাহিত্য' (ইণ্ডিয়ান লিটরচর) নামক সাময়িক পত্র ও অন্য আরও সাময়িক প্রকাশনীর সম্পাদন ও প্রকাশন। দ্বিতীয় পথ—প্রত্যেক ভাষার প্রধান প্রধান রচনা (প্রাচীন ও আধুনিক) অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশন। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যকে পুষ্ট করতে হলে চাই এ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান বিশ্বের গোচর করা, আর বিশ্ব-সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ দানও আবার ভাষান্তরিত করে ভারতীয় সাহিত্যে আয়ত্ত করা। এই দায়িত্বও অকাদেমি নিয়েছে—'ইউনেস্কোর' সহযোগিতাও এজন্যও কতকাংশে পাওয়া যায়। এ ছাড়া অকাদেমির যা দায়িত্ব তা সকলেরই জানা—পুরস্কার দান,—প্রতি বৎসর পুরস্কারযোগ্য শ্রেষ্ঠ রচনা নির্বাচন ও তার লেখকদের পুরস্কৃত করা।

পুরস্কারের বিষয়ে যে পরিমাণ দৃষ্টি সে তুলনায় অকাদেমির প্রকাশিত গ্রন্থ বা পুস্তকের দিকে কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রের দৃষ্টি বেশি নয়। অথচ এদিকে অকাদেমিব প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিংশ শতাব্দীর অসমিয়া, বাঙলা, ইংরেজি, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের 'গ্রন্থপঞ্জী' (Bibliography) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে ১৯৬২ ইং। (১৯৬৩ পর্যন্ত বই-এর তালিকা তাতে আছে, ১৯৫৪ থেকে বার্ষিক গ্রন্থপঞ্জী জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে)। সিন্ধি শুদ্ধ ১৫টি ভাষার বই-এর ওরূপ পঞ্জী সম্পূর্ণ হয়ে আছে—এক-এক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ইংরেজিতে (ইংরেজি নিশ্চয়ই একমাত্র মাধ্যম) ভারতীয় লেখকদের 'হু'জ হু', বা (Who's Who) ৫,৫০০ লেখকের পরিচয়-সংবলিত প্রয়োজনীয় বইখানি, ১৯৬১-তেই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, সমসাময়িক ১৬টি ভারতীয় সাহিত্যের (ইংরেজি ও সিন্ধী সুদ্ধ) তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল ১৯৬১তে,—তামিল, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষায় তার অনুবাদও হয়েছে। বাঙলায় কিন্তু হয় নি—বাঙালি পাঠকের ঔৎসুক্য কম বলেই কি ?

ইংরেজি অনুবাদে সমসাময়িক ভারতীয় ছোটগল্প (১৯৫৯) একখণ্ড বেরিয়ে গিয়েছে, আরও দুখণ্ড বেরুবে। 'ভারতীয় কবিতার'ও (১৫০ করে কবিতা) দু-খণ্ড সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ চলছে। গুজরাঠী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি অনেক ভাষারই ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকের সংকলন মূল ভাষায়, ও পরে অন্যান্য ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হবে। আর অসমিয়া ও পাঞ্জাবীর লোকগীতি-সংগ্রহ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাস ইতিমধ্যেই কিছু কিছু রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে—

ডাঃ সুকুমার সেনের লেখা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (ইংরেজি) ও ডাঃ মায়াধর মানসিংহের লেখা ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস (ইংরেজি) তার মধ্যে অন্যতম। কন্নড়ে প্রকাশিত হয়েছে কন্নড় সাহিত্যের ও মালয়ালীতে মালায়ালাম সাহিত্যের ইতিহাসও। ইংরেজিতে লেখা ডাঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়ার অসমিয়া সাহিত্যের ও ডাঃ জি. ভি. সীতাপতির তেলেগু সাহিত্যের ইতিহাস এখন ছাপাখানায়। কিন্তু ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত ২৫০ শত, ৩০০ শত পুস্তকের. এবং আরও কিছু সাময়িকপত্রের নামের তালিকা এভাবে বাড়িয়ে লাভ নেই। অকাদেমির বার্ষিক বিবরণী ও পুস্তকতালিকা দেখলেই তা পাওয়া যাবে। অকাদেমিব আযোজিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের কথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আর ভারতীয় সর্বভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদের বিরাট প্রচেষ্টার আয়োজনও জানি। ইংরেজি ঠাকুর-শতবার্ষিকী গ্রন্থখণ্ডের পুনরালোচনাও নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ করে বাঙলা ভাষায় অকাদেমির বিশেষ দানের কথাই বরং আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। কারণ, যে-কারণেই হোক বাঙালি পাঠক-সাধারণ সে-বিষয়ে অবহিত নন। আর বাঙালি শিক্ষা সংস্থা (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ) ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহও মনে হয় সে-বিষয়ে উদাসীন। অথচ, সত্যই অকাদেমির নিজের প্রকাশিতও ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত সেসব বাঙলা বইও (অনূদিত) বাঙলা সাহিত্যের অভাব মিটাচ্ছে।

মূল বাঙলায় ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর কথাই প্রথম উল্লেখ করতে হয়। এ বই-এর তুলনা নেই। এরূপ সুমুদ্রিত সংস্করণে নিশ্চয়ই তা আরও আদরণীয়। সেই সঙ্গেই নাম করা যায়—হয়তো বা তারও আগে—'জ্ঞানেশ্বরী'র। কারণ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙলা অনুবাদ (৬৭২ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা দাম) না পেলে মরাঠী সাহিত্যের এই অমূল্য গ্রন্থ বাঙালির অনাস্বাদিত থাকত। লেখককে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়—অকাদেমিরও সাধুবাদ করি। জ্ঞানেশ্বরের আরেকখানা বইও মুদ্রিত হচ্ছে। কাকা সাহেব কালেলকারের গুজরাতী 'জীবনলীলা'র বঙ্গানুবাদ (প্রিয়রঞ্জন সেন কৃত) একটি বড় বই (৪২২ পৃষ্ঠার)। ইয়োরোপীয় ভাষাব প্রসিদ্ধ যেসব গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছে তার মধ্যে আছে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তর অনুবাদ মিলটনের 'অ্যারিওপেগিটিকা' (ভালো অনুবাদ); লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ মলিয়েরে-এর 'তার্ত্যুফ্' (অনুবাদ

দুষ্পাচ্য), আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সোফোক্লিসের 'আন্তিগোনে (সুপাঠ্য, তবে ঠিক অনুবাদ নয়)। আর শীঘ্রই প্রকাশিত হবে কনফুসিয়াসের 'ল্যুন-য়ু', ওয়াল্‌ডেন-এর 'থোরু', আর একখানা মারাঠী উপন্যাস; তারপর রাজেন্দ্র প্রসাদের 'আত্মকথা', একখানা মালায়ালাম উপন্যাস, মোট ৬খানা বই।

এ সব সাম্প্রতিককালের, প্রকাশিত ও প্রকাশ্য বই-এর হিসাব। এর পরেও বাঙলায় অনেক বই অকাদেমির উদ্যোগে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। একটা কথা তবু মনে 'হয়; অন্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে এমন অনেক বইএরই এখনো অনুবাদকেরা বাঙলা অনুবাদ করে উঠতে পারছেন না। এরূপ বই-এর মধ্যে ভারতীয় ভাষার বইও আছে, অন্য ভাষার বইও আছে। নিশ্চয়ই অনুবাদ সুখসাধ্য সাহিত্যকর্ম নয়, কিন্তু অনুবাদে কি আমাদের আগ্রহও কম?

সেইখানেই আমাদের আশঙ্কা। বাঙালি অনুবাদে উদাসীন হলে, বা অন্য ভাষার বই বাঙলা অনুবাদে পাঠ করতে নিরুৎসাহ হলে, বাঙলা সাহিত্য সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পাক খাবে। হয়তো ইংরেজিতে পড়ে কিছু শিক্ষিত লোক নিজেদের মনের এলেকা তবু বাড়িয়ে নেবেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালি ইংরেজি না জেনে সংকীর্ণ জগতের বাসিন্দা হয়ে থাকবে। সাধারণের মনের পরিসর না ঘটলে, আর দেশ-বিদেশের সাহিত্য-পাঠে পাঠকের মনের স্তর উন্নত না হলে, বাঙলা সাহিত্যের ও বাঙলা সংস্কৃতিরও দুর্দিন আসবে। অবশ্য অকাদেমি শুধু মনের আকাশকেই প্রসারিত করে দিতে চায় না—সে সঙ্গে চায় ভারতের বিচিত্র ভাষা ও সাহিত্যকে পরস্পরের পরিচিত করে, সকলের ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে। দু-দশ বৎসরে তা সাধ্য নয়।

গোপাল হালদার

ভারতের অর্থনীতি

ভারত কোন পথে? দেবেন দাস। বর্মন পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১-২৫।

পরিকল্পনার তের বছর পার হয়ে এসে পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে। পরিকল্পনার আকার ছোট করে ফেলা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা, ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কথাবার্তা যা তের বছর আগে শুরু হয়েছিল, আজ তা গুরুত্ব অর্জন করেছে।

পরিকল্পনা এখন দক্ষিণ ও বামেব আক্রমণের সম্মুখীন। চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা পিছনের দিকে ফিরে তাকালে নিশ্চয়ই মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি, আর সেই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। কাজটা কঠিন এবং এ-ব্যাপারে ভারতীয় মার্কসবাদীরা যে বেশিদূর অগ্রসর হন নি তা স্বীকার্য। শ্রীদেবেন দাস এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা তাঁর আলোচ্য বিষয়। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর বই তথ্যবহুল, এবং অনেক সময় তথ্যের প্রাচীর ভেদ করে মূল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করব।

শ্রীদাস দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ভূমি-সংস্কার ও কৃষি-সংস্কারের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে সারা ভারতে ভূমি-সংস্কার আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও "অবস্থা প্রায় যথাপূর্বই রয়েছে"। তিনি প্রধানত বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আলোচনা করেছেন। অকৃষকের হাতে জমির বড় অংশ থেকে গেছে। বে-আইনী হস্তান্তরের ফলে রাষ্ট্রের হাতে সামান্য উদ্বৃত্ত জমি এসেছে। গ্রামীণ সমাজে বড় বড় জমির মালিকদের প্রভাব বর্ধমান। মহাজনী কারবারে এদের ঢালাও ব্যবসা। হাটে বাজারে গঞ্জে এরাই ক্রয়-বিক্রয়ের আড়তদার। ধান, চাল, পাট, কলাই, গুড়, গম, সরিষা প্রভৃতির বাজারে এরা আড়তদার ক্রেতা। অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং মণ্ডল কংগ্রেসে এঁরা জাঁকিয়ে রাজত্ব করছেন। ভূমি-সংস্কার আইনেব ব্যর্থতার ফলে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনায় কৃষি-উৎপাদনে ভারত অনেক পিছনে। অপর দিকে কৃষকদের উপর করের বোঝা বেড়েছে এবং বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষকদেব অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়েছে।

জাতীয় আয় বেড়েছে, কিন্তু প্রধানত মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের আয় বহুগুণ বেড়েছে। লেখক মহলানবীশ-কমিটির রিপোর্ট থেকে দেখিয়েছেন যে, বেসরকারী মূলধন যা শিল্পে লগ্নী হয় তার শতকরা ৫০ ভাগের মালিক মাত্র ১৪ হাজার পরিবার। নতুন বিপদের সংকেত বহন করে বৈদেশিক লগ্নী এবং ঋণ। ভারতের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে "আঁতাতবদ্ধ হয়ে" বৈদেশিক পুঁজি আমাদের অর্থনীতির উপর কব্জা শক্ত করছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি

থেকে যে-পুঁজি আসছে তার লক্ষ সত্তমুক্ত স্বাধীন দেশগুলির অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা। ভারতীয় পুঁজির আড়ালে থেকে এই বিদেশী পুঁজি ঐ সব দেশের পুনর্গঠনের প্রয়াসকে ব্যহত করবে। ইতিমধ্যে এই চক্রান্তের বিরোধিতা বর্মা, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হয়েছে।

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার বিরোধ "নিঃশেষ হয় নি"। সাম্রাজ্যবাদের কাছে সে "পূর্ণ অবনতি স্বীকার করে নাই"। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি, সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ভিত্তিকে দৃঢ়তর করেছে"। অপর দিকে জনগণের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধ "ক্রমাগত বাড়ছে"।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেরও দ্বৈত ভূমিকা। লেখকের মতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আসলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং এর মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে ভাবতের একচেটিয়া পুঁজি। অপর দিকে (লেখক বই-এর শেষ অধ্যায়ে এই মন্তব্য করেছেন) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিকাশ "সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থকে বল্গাহীনভাবে রচনার গতিকে কিছুটা রুদ্ধ করেছে।" রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তুলতে এবং দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কবে চলেছে। ভিলাই, রাঁচি, বারাউনী, সুরথগড় দেশকে "উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।" প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্য মিগ বিমান কারখানা নির্মাণের সোভিয়েত সিদ্ধান্ত স্মরণীয়। সম্প্রতি বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণে আমেরিকা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার পরে সোভিয়েত এই কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব করেছে।

শ্রীদেবেন দাস স্বল্প পরিসরে বিগত সতের বৎসরের অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই তাঁর আলোচনায় অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আমার মনে হয়, এই কাঠামোর উপর ভিত্তি ক্বে লেখক বড় বই লিখুন এবং তাঁর বক্তব্যগুলিকে আরো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করুন। এই বই লিখতে তিনি যে-নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে আশা হয় যে অদূব ভবিষ্যতে আমরা বাংলা ভাষায় একটি ভালো বই পড়তে পাব।

সুনীল সেন

নতুন উপন্যাস

রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর। অচ্যুত গোস্বামী। মিত্রালয়। ৫.৫০ টাকা।

'কল্পনাশ্রয়ী' শব্দটির দ্বারা সাহিত্যকে বিশেষিত করা হয়ে আসছে আবহমানকাল। কিন্তু শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামীর এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রে উক্ত বিশেষণ অন্যতর অর্থে, অর্থাৎ, পুরোপুরি আভিধানিক অর্থে প্রযুক্ত। 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর'—অবিমিশ্র কাল্পনিক; বাস্তবের ছিটেফোঁটাও এতে কোথাও মিলবে না। অথচ, সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক চরিত্রলক্ষনের কথা আপাতত মুলতুবী রেখে, বলতেই হয় বইখানি সাহিত্য হয়েছে, বটতলা কি অবধৃত হয় নি। যন্ত্রনির্ভর তথা যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত এক ভবিষ্যতের ভূখণ্ড, সেখানে প্রক্ষিপ্ত জনৈক বিংশ শতাব্দীর মানুষের খাপ-না-খাওয়া মানসিক পরিস্থিতি শ্রীযুক্ত গোস্বামী নানা মজাদার ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কল্পনাই সেজন্যে তাঁর একতম অবলম্বন; এবং এই সঙ্গে এ কথাও লিখব, বইটি যেন কল্পনার যথেচ্ছ বিচরণক্ষেত্র। তাহলে 'আজগুবি' বললে অন্যায় কোথায়? উপন্যাসটির মধ্যেই এর জবাব আছে। কোনো পাঠকেরই বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়: কল্পনার যথেচ্ছবিহার ঘটলেও কোথাও তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ ঘটে নি। সুযোগ ঘটে নি, তার কারণ বইটি একটি মূল্যবান সত্যকে তুলে ধরতে পেরেছে। তা হচ্ছে মানুষ কোনোভাবেই যন্ত্র ও যান্ত্রিকতার ক্রীতদাস বনবে না; যদিও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে তার মনোযোগ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে ও বাড়বে। যদি এমনিতর দুর্যোগ সত্যিই কোনোদিন আসে, তবে শেষপর্যন্ত সেই পরাক্রান্ত যান্ত্রিক প্রতাপের কবল থেকে তাকে পালিয়ে আসতে হবে। আর-একটু খুলে বললে, সে নিজেই পালাবে, নয়তো, যন্ত্রই তাকে পালাতে বাধ্য করবে। হয়তো এরই মধ্যে উপন্যাসটির নামের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আর এই উক্তির সমর্থনে সেই মামুলী কথাটিই তো উচ্চারণ করতে হয়, মানুষই ভগবান। সুতরাং 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর' কাল্পনিকতায় আগাগোড়া আচ্ছন্ন থাকলেও তা অশিক্ষিতের স্বাক্ষর বহন করছে না, বরং পাঠকদের কিছু ভাবনার ইন্ধন জোগাচ্ছে।

জানি একটাই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু বইখানি সম্পর্কে বলার কথাই বা কতটুকু থাকতে পারে। আমি এস্থলে ঘটনাবিন্যাসের কথা বলতে পারি না। চরিত্র? না, তাও না। কেননা

ঘটনা কিংবা চরিত্র—তার যৌক্তিকতা বিচারের মাপকাঠি বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনাশ্রয়ী (এবং আধাদার্শনিক) এই উপন্যাসটির মূল্যায়নে ব্যবহার করা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে বলতে পারি শ্রীযুক্ত গোস্বামী যেরকম কল্পনার রাশকে আলগা দিয়ে বইখানি লিখেছেন, তাতে তার আয়তন অনির্দিষ্ট পরিমাণে বেড়ে যেতে পারত। কম-বেশি দুশো পাতার মধ্যে বইখানি শেষ হবার প্রধান কারণ সম্ভবত আর্থনীতিক, সম্ভবত কাগজের ডামাডোল !

সুতরাং গোড়াব কথার জের টেনে বলি, 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর' উপভোগ্য বই। প্রায় প্রতিটি পাতাই, বরং বলি, প্রতিটি বাক্যই, এবং চরিত্রগুলির কথাবার্তা উঁচু গলায় হাসবার মতো। কৃতিত্ব নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত গোস্বামীর। যখনই কোনো ঘটনার উদ্ভটত্বে আমি প্রশ্ন তুলব তুলব ভাবছি, তখনই তার সপক্ষে এমন এক-একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে, যে তাতে কিছু বলার থাকে না; সেগুলো এমনই উপভোগ্য। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বও লেখক প্রসঙ্গত বাদ দেন নি তাঁর রচনাব স্বার্থে। অবশ্য আপেক্ষিকতত্ত্ব যথাযথভাবে বলা হয়েছে কিনা জানি না, বিজ্ঞান আমার বিষয় নয়।

শ্রীঅচ্যুৎ গোস্বামীকে—যেহেতু তিনি একজন প্রাবন্ধিকও বটে—উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে কিছু বলতে চাওয়া হয়তো ধৃষ্টতা, কিন্তু তাঁর বইয়ের ভূমিকার ছলে 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশটুকু বাদ দিলে ভালো হোত। কেননা এই নিবেদন মূল বইয়ের ক্ষেত্রে কোনোই কাজ করে নি; বাড়তি অংশমাত্র। বস্তুত কতকগুলি অসংলগ্ন উল্টোপাল্টা কথা ছাড়া এখানে কিছুই পাই নি। আর সবশেষে বক্তব্য এই: মহিলাদেব রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বা তাদের প্রসঙ্গে লেখকের চটুল বাগ্‌ভঙ্গি প্রায়ই সুরুচির পরিপন্থী। 'প্রায়' শব্দটা বলার কারণ এই যে এই ধরনের হাল্কা রসের বইয়ে চটুলতা সব ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর হয় না, এখানেও হয় নি। কিন্তু এর অতিচারিতা, শ্রীযুক্ত গোস্বামী নিজেই হয়তো মানবেন, অন্যায়।

শিবশম্ভু পাল

দিল্লীতে বিশ্বশান্তি সম্মেলন

জওয়াহরলাল নেহরুর ৭৫তম জন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে নতুন দিল্লীতে যে শান্তি ও সহযোগিতার জন্য বিশ্ব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল (১৪ই থেকে ১৮ই নভেম্বর), তাতে ৪৩টি দেশ ও ১২টি সংগঠন থেকে শতাধিক বিদেশী প্রতিনিধি ও ভারত থেকে প্রায় এক সহস্র প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। শুধু প্রতিনিধি সংখ্যায় নয়, সমাজের নানা অংশের খ্যাতিমান প্রতিনিধিদের যোগদানে আলোচনার মান প্রায়ই আশ্চর্য উৎকর্ষে পৌঁছেছে। আক্রা জাতীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এফ. ই. বোটেন সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বেসরকারী সংগঠনসমূহের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে যখন আলোচনা করেন, বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রানিমির ইয়াস্কোভিচ্ যখন নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মৃজিভাস্তিলে পিলিসো যখন অ্যাপারথাইড-এর চরিত্র তুলে ধরেন, তখন যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার বহু বিচিত্র দিগন্ত ধরা পড়ে। সম্মেলনে প্রেরিত বাণীতে অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল লেখেন: "আপনাদের সম্মেলন যে-সব সমস্যার আলোচনায় যাবে, তাদের উৎস মানবসমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগমনের ফলে উদ্ভূত সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত; এই পরিস্থিতিতে জাতিসমূহ ও সরকারগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এই বিজ্ঞান-বিপ্লব মানবসমাজের সম্মুখে দুটি বিপুল চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। দুনিয়া থেকে যুদ্ধকে চিরতরে মুছে দেওয়ার দায় এবং জীবনধারণ ও কৃষ্টির মানের ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজকে স্বাধীন ও সমাধিকারসম্পন্ন জাতি-সমূহের জাতিসংঘে পরিণত করার দায়।"

এই চ্যালেঞ্জ মনে রেখেই সম্মেলনের চারটি কমিশন বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদের বিনাশ, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও

শান্তিকর্মীদের ঐক্য ও সহযোগিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনান্তে ঘোষিত এক আবেদনে প্রতিনিধিরা বলেন: "পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের উৎপাদন ও পরিবেশনের ক্রমবৃদ্ধি, পারমাণবিক পরীক্ষা চলতে থাকায়, পারমাণবিক শক্তিসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজের সম্মুখে গুরুতর বিপদ দেখা দিয়েছে। জাতিসমূহের সমবেত প্রয়াসেই এই বিপদ রোধ করা সম্ভব। আণবিক প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত নন এমনি সকল সরকার এবং অন্য যে-সব সরকার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে চান, তাঁদের কাছে এই মর্মে আবেদন জানাই, যেন তাঁরা অচিরেই মিলিত হয়ে দাবি তোলেন; ব্যাপক হত্যার যাবতীয় অস্ত্র ও সকল পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হোক, সর্বপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মাণ ও এইসব অস্ত্রের সর্বপ্রকার পরীক্ষা এই মুহূর্তেই বন্ধ হোক, ঐ সব অস্ত্রের বর্তমান সঞ্চয় ধ্বংস করা হোক। জনতার সঙ্গে একযোগে তাঁরা এই লক্ষ্যে পৌঁছবার পন্থা ও কর্মপ্রয়াস বিচার করে দেখুন।"

উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করে চলেছেন, তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতিনিধিদের ভাষণে বিভিন্ন দেশের মুক্তি-আন্দোলনের কথা শোনা যায়। ১৯৬৫ সালকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বছর হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্মেলন সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার আহ্বান জানায়। সম্মেলন চলাকালে প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদ্বেষী শাসক ভেরওয়র্ডের প্রকাশ্য বিচারে অংশ নেন। ভেরওয়ার্ড শমনে সাড়া দেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কামাল বাহানদ্দিন বলেন: "অনেক প্রমাণ জমেছে। অনেক সাক্ষ্য জমেছে। এবার কর্মের সময়।" সম্মেলনে সমবেত মহিলারা, লেখকেরা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা, আইনজীবীরা পৃথক পৃথক সভায় মিলিত হয়ে শান্তির প্রশ্নে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা সুভদ্রা যোশীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্মেলন উদ্বোধনকালে শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন ভারতের শান্তি-নীতি ব্যাখ্যা করে ঘোষণা করেন: "সাম্রাজ্যবাদকে শুধরে তোলা যায় না, পৃথিবীতে শান্তির স্বার্থে তার চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে হবে।" সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্মেলনে আলোচ্য "চিন্তা, আদর্শ ও নীতি-

সমূহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন" জ্ঞাপন করে ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বিদেশী প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। সম্মেলনের প্রতিদিনের ব্যস্ততায় শ্রীকেশবদেও মালব্য, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, গিয়ানী গুরুমুখ সিং মুসাফির, ডক্টর তারাচাঁদ, ডক্টর অনুপ সিং, শ্রী এম. সি. শীতলবাদ, দেওয়ান চমনলাল, অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রমুখকে উদ্যোগী দেখা যায়। সাংগঠনিক দিকে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের কর্মীগোষ্ঠীই বিপুল দায়িত্বের ভার বহন করেছেন। বিশ্বশান্তি সংসদের পুরনো বহুপরিচিত মুখগুলির মধ্যে জেম্‌স্‌ এণ্ডিকট্‌ ও মাদাম ফার্জকে চেনা যায়। তবে বাকী অধিকাংশই ছিলেন তরুণতর। ভারতীয় লেখকদের মধ্যেও অমৃত প্রীতম, নবতেজ, সজ্জাদ জহীর, তাবান, জাফ্‌রি প্রমুখের সঙ্গেই দেখেছি জুবেয়র রিজভি বা কমলেশ্বরের মত তরুণ উর্দু ও হিন্দী লেখকদের। বিদেশী লেখকদের মধ্যে যুগোস্লাভিয়ার চেদোমির মিণ্ডেরোভিচ্‌ এসেছিলেন, ইতালির কার্লো লেভি শেষ মুহূর্তে আটকে পড়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন।

সাপ্রু হাউসে, বিজ্ঞান ভবনে, গান্ধী ময়দানে অধিবেশনকালে সতীশ গুজরালের আঁকা লাল গোলাপ মঞ্চের শোভা বাড়ায়। সম্মেলনের উদ্দেশে নিবেদিত সত্যজিৎ রায়ের আঁকা লাল গোলাপ ও ইংরেজি অনুবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "লাল গোলাপের জন্য" কবিতা সম্বলিত একটি কার্ড সম্মেলনে বিতরিত হয়। জওয়াহরলাল নেহরুর প্রিয় লাল গোলাপের ছবি, প্রেম ধাবনের কবিতা "কৌন্‌ কহতা হ্যায় কি নেহরু মর্‌ গয়া", প্রতিনিধিদের ভাষণে নেহরুজীর স্মৃতি জেগে থাকে, তাঁর অনুপস্থিতির বেদনা বারবার মনে লাগে।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

চেদোমির মিন্দেরোভিচ

যুগোস্লাভ কবি। বেলগ্রেডে জাতীয় পুস্তকভবনের অধ্যক্ষ। ইউরোপীয় লেখক সংঘের ও যুগোস্লাভ PEN ক্লাব কমিটির সভ্য। ভারতবাসীর কাছে অপরিচিত নন। ১৯৫৪ সাল থেকে কিছুকাল দিল্লীর যুগোস্লাভ দূতাবাসে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার

দিল্লীতে এসেছিলেন উনেস্কোর নবম অধিবেশনে যুগোস্লাভ প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভ্যরূপে। বর্তমান বৎসরে সাহিত্য নাটক অকাদেমীর উদ্যোগে আবার ভারতপরিক্রমা করলেন। লিখতে শুরু করেছেন যখন ইস্কুলে পড়তেন তখন থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাঁর যা কিছু লেখা প্রকাশিত হতো, তার প্রায় প্রত্যেকটির উপরেই তৎক্ষণাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি হতো। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য জেল, পুলিশী নির্যাতন ইত্যাদি পুরস্কারের প্রাপ্য অংশ তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিসাধনের পর তিনি 'সাহিত্য' নামে একটি পত্রিকার পত্তন ও সম্পাদন করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি 'সাহিত্যিক গেজেট' নামক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক। বহু বৎসর ধরে তিনি যুগোস্লাভ লেখক সংঘের এবং যুগোস্লাভ জাতীয় শান্তি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। লিখেছেন অনেক। বেশির ভাগই কবিতা, দুই একটি উপন্যাস ও নাটক এবং কিছু ছোট গল্প। আর লিখেছেন 'টিটোর অনুগমনে' নামে একটি পার্টিজান দিনপঞ্জী। ইতালীয়, রুশ, জার্মান, পোলিশ, হাঙ্গেরীয়, ইংরাজি, চীনা, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ বেরিয়েছে। নভেম্বর মাসে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন তখন 'পরিচয়' বৈঠকেও তাঁকে একদিন আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সৈনিক কবি! হোমরা-চোমরা লোক। মনে একটু ভয় ছিল, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারা যাবে তো! দেখলুম, ধীর, স্থির, মৃদুভাষী, অমায়িক প্রকৃতির লোক। মনে উগ্র দেশাভিমানের লেশমাত্র নেই। দুই মিনিটেই ছোট বড় আমাদের সকলকেই আপন করে নিলেন। তাঁর কিছু লেখার ইংরাজি অনুবাদ আমাদের দিয়ে গেছেন। একটি কবিতার বাংলা পুনরনুবাদ 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হবে শুনছি। তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করি, আমাদের সকলের হয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

বিয়োগপঞ্জী

জে. বি. এস. হলডেন

জীবনকালে অধ্যাপক হলডেন বারে বারে নিজের শরীরটাকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র করে তুলেছিলেন। মৃত্যুর পরে একই উদ্দেশ্যে তিনি সেই শরীরটাকে দান করে গেলেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন ফুলের মালা নিয়ে। কিন্তু তার আগেই শবদেহটি ঠাণ্ডাঘরে সংরক্ষিত হয়েছিল। কোনো ফুলের মালা সেখানে পৌছয় নি। কোনো ফটোগ্রাফের আলোর ঝিলিকও নয়। এই শেষ গবেষণার জন্যে তিনি আগে থেকেই সমস্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই ফুলের চেয়েও শাদা বরফে আবৃত হয়ে তাঁর অন্তিম যাত্রাটি ছিল, শ্মশান নয়, সমাধিক্ষেত্র নয়, কাকিনাড়া মেডিকেল কলেজের গবেষণাগারের উদ্দেশে। একটি মহৎ জীবনের এই মহত্তর পরিণতিতে একালের এক দধীচির দৃষ্টান্ত চিহ্নিত হয়ে রইল।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল সেই আট বছর বয়স থেকে। নৃতত্ত্ববিদ পিতার গবেষণার জন্যে প্রথমে দিতে হয়েছিল রক্ত, পরে চল্লিশ ফুট জলের নিচে ডুব ও আরো অনেক কিছু। পরবর্তী জীবনে তাই অতি অনায়াসে নিজের শরীরটাকেই দুরূহ সব পরীক্ষাকার্যের ক্ষেত্র করে তুলতে পেরেছিলেন। এই জীবনই তাঁর কাছে স্বাভাবিক ছিল, এই জীবন যা তীব্র ও বিপজ্জনক, যা বারে বারে মৃত্যুকে জয় করে, আবার অন্যদিকে যা হাসির মতো উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যানসার অপারেশনের পরে লণ্ডনের হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে তিনি একটি লঘুছাঁদের কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার চারটি লাইন ছিল এই :

My final word, before I'm done
Is Cancer can be rather fun
A spot of laughter I am sure
Often accelarates one's cure

পরিহাসের সুরে লেখা হলেও এই শেষ বাণীর মধ্যে তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিটিও প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। রোগটি যদিও ক্যানসার কিন্তু ব্যাপারটি কৌতুকের। কাজেই হাসতে বাধা কী, আর একটুখানি হাসির দমকেই তো নিরাময়ের পথটি সুগম হতে পারে। এমনি একটি জীবনজয়ী হাসি তাঁর সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাসিক্‌স্‌-এ, কিন্তু শিক্ষানবিশী বিজ্ঞানে। ক্লাসিক সাহিত্যের জ্ঞান নিয়ে তিনি পরিপূর্ণ ও গভীর। বৈজ্ঞানিক সাধনার নিষ্ঠা নিয়ে তিনি যথার্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। থেটিস ডুবোজাহাজের নাবিকদের প্রাণহানির তদন্ত করতে গিয়ে আঠারো ঘণ্টা বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন একটি নিশ্ছিদ্র ইস্পাতের প্রকোষ্ঠে! একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজনীতিতে আগ্রহ বোধ করেন নি। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনির প্রতি চেম্বারলেন সরকারের তোষণনীতিতে বীতশ্রদ্ধায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন পুরোপুরি মার্কসবাদী, যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে ও দশ বছর ধরে ডেলি ওয়ার্কার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জীবনটাকে তিনি নেড়েচেড়ে দেখতে চেয়েছিলেন একদিক থেকে নয়, নানা দিক থেকে। বিশেষ রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্যে দিনের পর দিন খালি পেটে বিনা জলে পোয়াটাক লবণ খেয়ে যাওয়া, তিপ্পান্ন বছর বয়সে কুড়ি বছরের জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে দেশত্যাগ করা ও ভারতের নাগরিক হয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করা, এমনকি পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঁপড়ভাজা ও সিঙাড়া খাওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্যেও জীবনের প্রতি একটা অত্যুগ্র অনুসন্ধিৎসাই প্রকাশ পাচ্ছে, বাইরের লোকের কাছে যা অনেক সময়ে মনে হত বাতিক। এ-কারণে বাইরের লোকের সঙ্গে কখনো কখনো তিনি রূঢ় ব্যবহার করে ফেলতেন, পরক্ষণেই সেজন্যে অনুতাপও করতেন। তাই বলে কখনো আপোস করেন নি। তাঁর ভালোবাসার জগৎটিকে পরিপূর্ণ মমতায় আগলে রাখতেন ও তারুণ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর করে তুলতেন। এই ভালোবাসার জন্যে তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশভূমির সাতটি বছরেও কম মূল্য দিতে হয় নি।

বাহাত্তর বছরের এই জীবনটি অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল এক কর্মকাণ্ডের নায়কত্বে প্রদীপ্ত। অন্য সমস্ত দিক ছেড়ে দিলেও শুধু গবেষণা-নিবন্ধ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক লোকপাঠ্য গ্রন্থের শুধু সংখ্যার দিকটিও বিস্ময়কর। কয়েক-শো

গবেষণা-নিবন্ধ ছাড়াও তিনি বিজ্ঞানবিষয়ক লোকপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন ১৯১৪ সাল থেকে প্রতি বছরে অন্তত একটি করে। তাছাড়া আছে অজস্র পুস্তিকা। তার পরেও ছোটদের জন্যে লিখেছেন একটি অনবদ্য বই— তিনি যদি আর কিছু না হতেন তাহলে শুধু এই একটি বইয়ের জন্যেই স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

আর শুধু তো সংখ্যা নয়, অনন্যতাও। কারণ, তাঁর প্রত্যেকটি রচনা শুধু একজন আত্মভোলা বিজ্ঞানসাধকের নয়, একনিষ্ঠ মানবপ্রেমিকেরও। বিজ্ঞানীর হাতে সাহিত্যিকের কলমের দৃষ্টান্ত আরো আছে, কিন্তু বিজ্ঞানী-মানবপ্রেমিকের হাতে সাহিত্যিকের কলমের দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্ভবত আইনস্টাইনের পরেই স্মরণীয় নাম জে. বি. এস. হলডেন।

প্রজননতত্ত্ব ও জীবরসায়নতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধ্যাপক হলডেনের অবদান মৌলিক ও অসাধারণ। সেজন্যে অবশ্যই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মানিত আসনে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদেব কাছে তাঁর আরো বড়ো পরিচয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয় নিয়ে অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন এমন একজন লেখকের। তাঁর রচনা পড়ে আমরা বুঝতে শিখেছি, ভাবতেও শিখেছি।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে লণ্ডনে থাকার সময়ে বি-বি-সির অনুরোধে তিনি একটি শেষ বাণী রেকর্ড করেছিলেন, যা তাঁর মৃত্যুর পরে বি-বি-সি থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই শেষ বাণীটি থেকে জানা যায়—তাঁর ধারণা ছিল ১৯৭৫ সালের আগে, অর্থাৎ তাঁর বয়স বিরাশি হবার আগে, এই বাণীটি প্রচারের উপলক্ষ ঘটবে না। এই দশটি বছরের জন্যে আমরা নিশ্চয়ই আক্ষেপ করব। যে মানুষটি বাহাত্তর বছরের জীবনে কয়েকটি মানুষের জীবনকাল বেঁচে গিয়েছেন তাঁর পক্ষে এই দশটি বছর সামান্য হত না। অন্তত ভারতবাসী হিসেবে আমরা তাতে বিশেষ লাভবান হতাম। বয়স হলেই যারা বৃদ্ধ হয়ে মরে তাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক হলডেন বাহাত্তরে বৃদ্ধ হন নি, বিরাশিতেও হতেন না।

অমল দাশগুপ্ত

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা

বেশ কয়েকমাস আগে পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরের পক্ষ হতে আমন্ত্রণ জানান, দল-মত নির্বিশেষে সুস্থ, সবল ও রুচিশীল আলোচনার জন্য। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে প্রলুব্ধ হয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

রুশ-বিপ্লবের 'অফিসিয়াল' ইতিহাস নেতা-মুখাপেক্ষী; নেতৃত্বের বিবর্তন ইতিহাস-'রি-রাইটে' প্রেরণা দেয়। অপর পক্ষে E. H. Carr প্রমুখ অ-সোবিয়েত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অবিশ্বাস্য; এঁরা বুর্জোয়া ঐতিহাসিক, সমাজতান্ত্রিক শিবির তথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করেন। সে কারণ বিংশতি কংগ্রেসের পরও সঠিকভাবে জানা গেল না, ট্রট্স্কি প্রমুখ 'মাইনোরিটি' বলশেভিক নেতাদের ইতিহাসে স্থান কোথায়?

Togliatti, সম্প্রতি মৃত, এ ব্যাপারে আদর্শস্থানীয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের New Statesman (Vol. LXVII, No. 1736, Friday 19 June 1964) পত্রিকায় K. S. Karol, 'Togliatti Resurrects Trotsky' শীর্ষক প্রবন্ধে Togliatti নেতৃত্বের এক বিস্মৃত অধ্যায়ে আলোকপাত করেন। এ এক বিস্মৃত ঘটনা, অথচ ঐতিহাসিক দিকনির্দেশক। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন নেতা, Gramsci মস্কোতে ইতালির প্রতিনিধি Togliatti-কে পত্র লেখেন 'Protesting against Persecution of the Bolshevic minority'. এ ঘটনা নতুনদের নিকট ছিল অজ্ঞাত, আর পুরাতনদের নিকট তথ্যাভাবে ভাবস্বরূপ।

Togliatti নিজে ঐ নাটকের উপসংহার টানলেন। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র Rinascita-র কোনো-এক সংখ্যায় উভয়ের পত্রবিনিময়ের সারমর্ম প্রকাশিত হয়েছে এবং Togliatti নিজে "in a personal note, refers to Trotsky Zinoviev and Kamenev as 'Comrades'."

ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু ব্যাপ্ত বিস্তৃত। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ও রুশ-চীন বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনার মূল্য কম নয়। ট্রট্স্কি প্রমুখ নেতাদের ঐতিহাসিক পুনর্বাসন (সংকীর্ণ অর্থে) যতখানি না প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশি প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক তথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস হতে মুক্ত করা। নতুবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'মুক্ত

ডুনিয়ার' জিগির, সমাজতান্ত্রিক শক্তিগোষ্ঠীর বিরোধ তথা ভারতীয় বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর বিহ্বলতা ও 'পরমুখাপেক্ষিতা' (?) ভারতবর্ষকে আগামী দঃ ভিয়েৎনাম 'বানাতে' সাহায্য করবে।

সেকারণ আমার মনে হয়, ভারতীয় বুদ্ধিজীবি শ্রেণী রুশ-চীন বিরোধে পক্ষ অবলম্বনের পূর্বে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ ও ঐ 'সমগ্রের' অংশ হিসাবে রুশ ও চীন বিপ্লবের বিচার করলে আগামী দিনের বিহ্বলতা হতে মুক্ত হবেন। ঐ আলোকে ভারতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশক যন্ত্রের সূক্ষ্ম 'কাঁটা' আরও স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হবে।

পুনঃ—ঐ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ : "Recently the Gramsci Institute in Rome invited a score of Political thinkers from various countries including Russia to take Part in a discussion on the theme of morals and Society. One afternoon, an Italian delegate dropped a Startling Piece of news. He had just returned, he told them from the editorial offices of Rinascita, the Principal weekly of the Italian Communist Party which is directly controlled by Palmiro Togliatti. There he had seen photographs of Trotsky, Zinoviev, Blekharin, Rykov and other 'political criminals' of the Twenties. 'They will be published this week', he added with a mysterious smile 'to illustrate the famous letter which Gramsci wrote to the Soviet Comrades in 1926 and Togliatti's reply to it'."

তীর্থনাথ রায়চৌধুরী, বোলপুর

"শিল্পীর স্বাধীনতা"

প্রায় বছর দুয়েক আগে (১৩৭০, বৈশাখ) এই 'পরিচয়'-এই একটি পত্রে শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "ভবিষ্যতে শ্রীগুপ্ত আমার বা অন্য যে কোনো মনুষ্যের উক্তি তাঁর লেখাতে গ্রহণ করলে তাকে যেন অক্ষত অবস্থায় যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধার করে লেখক হিসেবে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।" দেখা যাচ্ছে, এ অনুরোধ রাখতে শ্রীধ্রুব গুপ্তের কোনো উৎসাহই নেই। শ্রীঅশোক রুদ্রের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনাকালে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার নাম টেনে এনে আমার স্কন্ধে তিনি যে অদ্ভুত মতটি আরোপ করেছেন, আমি তার দায়িত্ব অস্বীকার না করে পারি না।

পরের প্রবন্ধ ভালো করে না পড়েই আস্তিন গুটিয়ে লড়তে নামাটা বোধহয় বয়স্কজনের শোভা পায় না। প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে, "মানবিকতাবাদী" বলে যে-কথাটি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে শ্রীগুপ্ত ব্যবহার করেছেন, ঐ কথাটি আমি কোনোদিনই আমার কোনো লেখায় ব্যবহার করিনি, কথাটি সম্পর্কে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে; আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'মানবিকবাদী' কথাটিরই পক্ষপাতী। 'মানবিকবাদী' ও 'মানবিক' কথাদুটি যে অভিন্ন নয়, এটাও যদি নতুন করে বোঝাতে হয়, তবে লেখার পাট ছেড়ে অভিধান লিখতে হয়। একা ধ্রুববাবুর হিতার্থে আমি অভিধান লিখতে রাজী নই। ধ্রুববাবু আমার বন্ধুস্থানীয় ও প্রীতিভাজন। তিনি রাজী থাকলে মানবিকবাদের ব্যাখ্যাস্বরূপ বই বা প্রবন্ধ তাঁকে পড়তে দিতে পারি। পড়লে সহজেই বুঝতে পারবেন। শিল্পের ফর্মটাকে মানবিক বলা যায় কিনা, সে সম্পর্কেও বিবাদ আছে। ডিপার্সোনালাইজেশনের তত্ত্ব মানলে, শিল্পের 'অব্‌জেকৃটিভ' সত্তাকে মানলে, শিল্পের ফর্মকে অত সহজে এক কথায় 'মানবিক' বলা যায় কি? আমি অন্তত অতটা নিশ্চিত হতে পারি না। কোল্‌রিজ্‌ থেকে রিচার্ডস-এর নন্দনতত্ত্ব ঘেঁটে বরং এই প্রত্যয়ই জন্মায় যে, শিল্পের সংগঠন অমানবিক, মানবিক ভাব-চিন্তার সংগঠনের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্লাইভ বেল থেকে ক্রোচে অবধি যাঁরা ফর্মকে অধিকতর মূল্য দেন, তাঁরা তো ঐ বিষয়ে আরো স্পষ্টতই 'মানবিক' ও 'ইস্‌থেটিক্‌'-এর বিভেদ মানেন। 'ভৌতিক' কথাটি যদি 'চলন্তিকা'য় প্রদত্ত প্রথম বা দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে প্রযুক্ত হয়, শিল্পের ফর্মকে 'ভৌতিক' বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। ধ্রুববাবু ভেবে দেখলেই বুঝবেন, ওঁর 'টেরিকাল প্রশ্ন'টা বেশ চমকদার হলেও তেমন জুৎসই হল না।

টেক্‌নিক্‌ ও ফর্মের মধ্যে যে-পার্থক্য বর্তমান, ধ্রুববাবু সে সম্পর্কেও আশ্চর্যরকম নির্বিকার। চলচ্চিত্রালোচনায় টেক্‌নিক বা ফর্মের আলোচনার গুরুত্ব আমি স্বীকার করি, শারদীয় 'মহাদেশ' পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধেও করেছি। টেক্‌নিক্‌-সর্বস্বতায় আমার আপত্তি। এ আপত্তির প্রথম ন্যায়সংগত বিবৃতি আই. এ. রিচার্ডস্‌-এর বিখ্যাত 'প্রিন্‌সিপল্‌স্‌ অফ্‌ লিটেরারি ক্রিটিসিজম্‌'-এ আছে। পরে অনেকেই কথাটা তুলেছেন। এ অধমজনকে ছেড়ে ধ্রুববাবু সেই মহাজনদেব সঙ্গেই সমবে নামুন না—আমরা দাঁড়িয়ে দেখব। আমার উক্ত প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, "শিল্পবিচারে শিল্পরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই বৃহত্তর মানবিক প্রশ্নগুলিকেও বারবার তুলে ধরা—

এটা আধুনিক মননের সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পর্কিত।" আমার এই মতটিকেই বিকৃত করে শ্রীগুপ্ত আক্রমণে নেমেছেন। মানবিকবাদী মূল্যবিচার 'টেক্‌নিক্‌সর্বস্ব' আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হলে চলচ্চিত্রবিচার 'পরিপূর্ণতর' হবে, এ কথা আমি বলেছি। ফর্মের সামগ্রিক আলোচনা মূল্যবোধকে বাদ দিতে পারে না ('শো' পত্রিকায় প্রকাশিত ও ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কাল্‌চার পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত শ্রীসত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধে ফর্মের আলোচনা এই কারণেই স্বাভাবিক-ভাবেই মূল্যবোধের আলোচনায় পৌঁছে গেছে)। তাই ফর্মসর্বস্ব আলোচনায় আমার ততটা আপত্তি নেই। 'টেক্‌নিক্‌সর্বস্ব' আলোচনাকেও আমি বাতিল করতে যাইনি, তাকে 'অসম্পূর্ণ' বলিনি, একদিক থেকে 'পরিপূর্ণ' বলেই মেনেছি, কিন্তু বৃহত্তর ইস্‌থেটিক্‌ দাবীর তাগিদেই মূল্যবিচারের যোগে তাকে 'পরিপূর্ণতর' করার কথা বলেছি।

ধ্রুববাবু যদি একালের সেম্যাণ্টিক্‌স্‌ চর্চার খবর রাখতেন, তবে আরেকটু সতর্কভাবে পরের লেখা পড়বার চেষ্টা করতেন। সেম্যাণ্টিক্‌স্‌ চর্চার যুগে আমরা একটু সতর্কভাবে ভাষা ব্যবহার করতে শিখছি। মানবিক ও মানবিক-বাদী, পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণতর, টেক্‌নিক্‌ ও ফর্ম, টেক্‌নিকের আলোচনা ও টেক্‌নিক্‌সর্বস্বতা, এসব কথার মধ্যে যে-পার্থক্য বর্তমান, তার কথা ভাবতে হয়। মানবিক ও ভৌতিক কথাদুটিও অমন অকস্মাৎ ছুঁড়ে মারবার বস্তু নয়। পরম প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীধ্রুব গুপ্ত সতর্ক পাঠক হিসেবে আমাদের সহায় না হলে সমালোচনার ভাষাকে খানিকটা সংস্কৃত করার চেষ্টায় আমরা হার মেনে যাব। তাই তাঁর এহেন পলেমিক্‌স্‌-এ আমি ব্যথিতই হয়েছি। ধ্রুববাবু দয়া করে মনে রাখবেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধা কথাদুটিও সমার্থক নয়। ভক্তি কথাটায় ধর্ম বা কাল্ট্‌-এর গন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধে শ্রীরুদ্র ছাড়াও আরো তিনজন প্রাবন্ধিক সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছি। অন্যত্র অন্য অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক চিন্তাবিদ্‌ সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি। আমি যদি তাঁদের সকলেরই ভক্ত হই, তবে সেটা কি এক ভয়ঙ্কর পলিথীইজ্‌ম্‌ হয়ে পড়ে না? আসলে আমি নিতান্তই অসহায় এথেইস্ট্‌, দেবভক্তি একেবারেই সয় না। নানাবিধ ব্রহ্মচারী বাবাজীদের কৃপায় 'ভক্ত' কথাটা ইদানীং প্রায় অশ্রাব্য গালাগালের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওটাকে শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিত আলোচনায় এড়িয়ে চললেই ভালো হয় না কি? বস্তুত এহেন আলোচনায় ব্যক্তিগত উল্লেখে নিউট্রাল শব্দ ব্যবহারই বুদ্ধিজীবী সমাজে গ্রাহ্য রীতি।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

প রি চ য়

পৌষ :: ১৩৭০
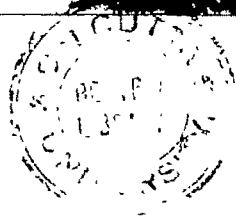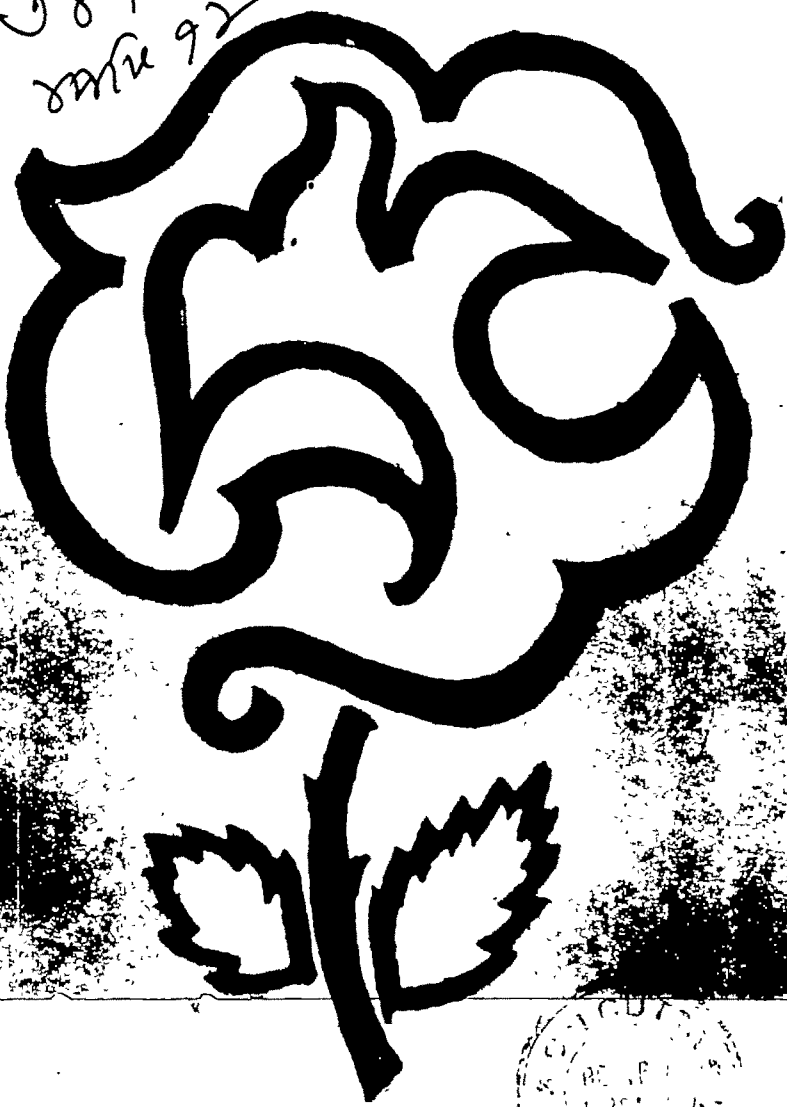
অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ সালে ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান
থেকে মোট ১২৫,০০০ জোড়া জুতো কিনেছেন
Bata

রমেশচন্দ্র দত্তের যুগান্তকারী অনুবাদ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা ॥ দাম চল্লিশ টাকা

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ॥ ১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত ঋগ্বেদ-প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। ৩। যামিনী রায় অঙ্কিত ছয়-বর্ণের প্রচ্ছদ। ৪। প্রবোধরাম চক্রবর্তী রচিত রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর পূর্ণ বিবরণ। ৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত বৈদিক সাহিত্যের সহজপাঠ্য পরিচিতি। ৬। চারবর্ণে মুদ্রিত বৈদিক ভারতের মানচিত্র।

একটি মূল্যবান অভিমত—

"………৬৩৩ পৃষ্ঠার এই অমূল্য গ্রন্থখানি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তীর উদ্যোগে পুনর্মুদ্রিত হইয়া উপন্যাস ও লঘুসাহিত্যের বন্যায় প্রপীড়িত বাংলা সাহিত্যের শিরে মুকুটমণির উজ্জ্বলতায় চিরদিন দীপ্যমান থাকিবে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা দাবি করিব—এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাঙালীর ঘরে ঘরে আদৃত, পূজিত ও পঠিত হইবে। যামিনী রায়ের পরিকল্পিত আলংকারিক প্রচ্ছদপটে ঐরাবতের পৃষ্ঠে ইন্দ্রদেবতার মূর্তি যথাযোগ্য ও আকর্ষণীয় হইয়াছে। 'জ্ঞানভারতী' বইখানি প্রকাশ করিয়া প্রশংসনীয় সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সকলের অভিনন্দন অর্জন করিয়াছে।"

—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞানভারতী প্রাইভেট লিঃ

১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

তখন সন্ধ্যে হব হব। মোহন স্ত্রীর সঙ্গে বসে চা পান করছিলেন। বাইরে তাঁদেরই ছেলে রাকেশ বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল।

হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষার তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। দৌড়তে দৌড়তে এসে একটি ছেলে বলল, "রাকেশ গাড়ী চাপা পড়েছে"। রাকেশের মায়ের হাত থেকে চায়ের পাত্র পড়ে গেল। 'কি হয়েছে, কোথায় সে,' — তিনি ব্যস্ত হলেন। রাকেশকে ততক্ষণে বাড়ীতে বয়ে আনা হচ্ছিল — চোখ দুটি তার বোজা, দুমড়ে যাওয়া দেহটা রক্তমাখামাখি।

নিঃস্তব্ধ হাসপাতাল। রাকেশ অচৈতন্য। ছেলের শয্যাপাশে সস্ত্রীক মোহনকে দুঃস্বপ্নে ভরা তিন দিন তিন রাত্রি কাটাতে হল। প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁরা আর কীই বা করতে পারতেন। রাকেশ সেরে উঠলে মোহন দুঃস্থদের কম্বল দান করবেন—এই মানত করলেন।

চারদিনের দিন সকালে রাকেশ চোখ খুলল। মোহনের প্রার্থনা দেবতা শুনেছেন। মানতের কথা মনে পড়ল তাঁর। অথচ কিছু এমন ধনী তিনি নন। তিনি খুবই অসুবিধা ও দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে এমন অবস্থায় কাটাতে হয়নি।

ঠিক যেন উপহারের মত তাঁর হাতে এসে গেল 'প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা'র পলিসির প্রথম কিস্তির ২০০০ হাজার টাকা। মানত রক্ষা হল।

পাঁচ বছর রাকেশ রইল পঙ্গু হয়ে। তারপর ডাক্তারেরা তার পায়ের ওপর অস্ত্রোপচার করতে মনস্থ করলেন। হাসপাতালের খরচ মেটাবার ভাবনা মোহনকে আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। ভাগ্যক্রমে সেই সময় তাঁর পলিসির দ্বিতীয় কিস্তির ২০০০ হাজার টাকা পাওয়া গেল। ভাবনা রইল না আর।

মোহনের সমস্যার যেন অন্ত নেই। অস্ত্রোপচারের পর রাকেশকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। সবচেয়ে কাছে যে কলেজ, সেটিও ৪ মাইল দূরে। সেখানে রোজ হেঁটে পড়তে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হল। তাহলে কি রাকেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার? না। মোহনের কাছে ছিল জীবন বীমার পলিসির শেষ কিস্তির আরোও ৬০০০ হাজার টাকা। এই টাকায় তিনি রাকেশের জন্য একটি আটা-কল খুললেন।

এখন রাকেশ এই আটা-কলটি চালায় এবং পিতামাতার দেখা শোনা করে।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

শুক্রবার ৮ই জানুয়ারী থেকে!

দু'টি ছিন্ন হৃদয়ের বেহাগ রাগিণী……

শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা : পার্বতী ॥ অলকা ॥ অশোকা (হাওড়া) (শিবপুর) (বেহালা)

নিউতরুণ ॥ শ্রীমা ॥ নিউলাইট ॥ বাটা সিনেমা ॥ নৈহাটী সিনেমা
(বরাহনগর) (খড়দহ) (ইছাপুর) (বাটানগর) (নৈহাটী)

॥ আর, ডি, বি এণ্ড কোং পরিবেশিত ॥

বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ

ম্যাকসিম গর্কি

মা	২·২৬
আমার ছেলেবেলা	২·০০
নানা লেখা	৪·৫০
গর্কির চোখে আমেরিকা	০·৫০
যাত্রী	১·৭৫

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি

ইস্পাত	৬·৫০

আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নি-পরীক্ষা	১৫·০০/৫·০০

হাওয়ার্ড ফাস্ট

শেষ সীমান্ত	৪·০০

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন	৯·০০
সাগরে মিলায় ডন	
১ম খণ্ড	৬·০০
২য় খণ্ড	৭·০০
কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো	৮·০০

আলেকজান্দার কুপরিন

রক্ত বলয়	৫·৫০/২·৫০

সদরুদ্দিন আইনী

সেকালের বুখারা	৪·০০

লিওনিদ সলোভিয়েভ

বুখারার বীরকাহিনী	৩·৫০/২·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪
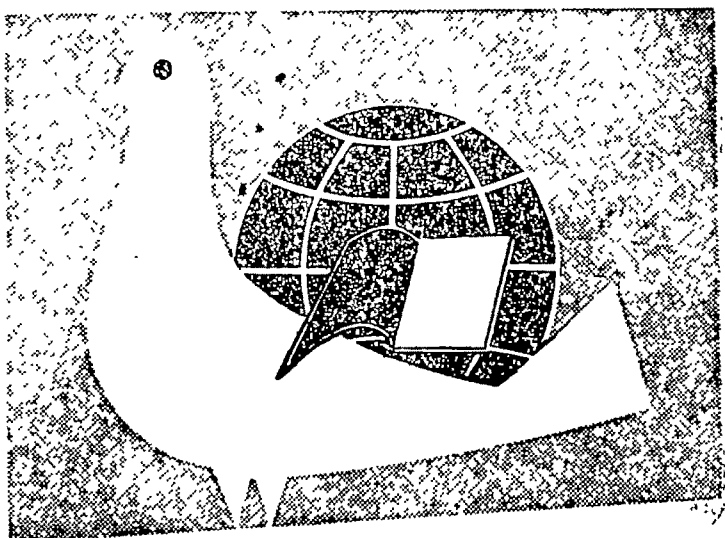
ভারত-সোভিয়েত
মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

সোভিয়েত দেশ

গ্রাহক হোন ও পড়ুন। গ্রাহকরা বিনামূল্যে পাবেন
বহুবর্ণে ছাপা সুদৃশ্য রঙিন ক্যালেণ্ডার ও ডায়েরী

● বিশেষ সুবিধাজনক চাঁদার হার ●
১৫-১১-৬৪ হইতে ৩০-৪-৬৫

ইংরাজী সংস্করণ			অন্যান্য ভাষার সংস্করণ		
	হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক		হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক
বাৎসরিক	৫·০০	৬·০০	বাৎসরিক	৪·০০	৫·০০
দ্বি-বাৎসরিক	৯·০০	১১·০০	দ্বি-বাৎসরিক	৭·০০	৯·০০
ত্রৈ-বাৎসরিক	১২·০০	১৬·০০	ত্রৈ-বাৎসরিক	৯·০০	১৩·০০

আপনার এজেন্টের নিকট চাঁদা জমা দিন অথবা নিম্নঠিকানায় পাঠান:
সোভিয়েত দেশ ১।১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

প্রকাশিত হয়: ইংরাজী, বারটি ভারতীয় ভাষা ও নেপালী ভাষায়

বৈকালিক পে-ক্লিনিক

আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৪

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল

২৪, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-১৪

ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং বিশেষজ্ঞ, শল্যচিকিৎসক ও স্ত্রী-রোগ চিকিৎসকের পরামর্শলাভের সুবিধা। ফি নামমাত্র। অল্প খরচে মলমূত্র থুথু প্রভৃতির পরীক্ষা এবং বায়োকেমিক ও রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাও করা হয়।

॥ রোগী দেখার সময় ॥

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর : বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ৯টা

অক্টোবর থেকে মার্চ : বেলা ২টা থেকে রাত্রি ৮টা

রবিবার বন্ধ

W. B. (P) Adv. D. 351/64

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র; সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, বিনয় ঘোষ, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মনীষার প্রথম বই

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির

দি জেণ্টল কলোসাস

এ স্টাডি অব জওয়াহরলাল নেহরু

পনেরো টাকা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

'Life and experiences of a Bengali Chemist' নামক আত্মজীবনীতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন :

"Take, for instance, metaphysics. The name of B. N. Seal stands first and foremost; his encyclopædic knowledge is at once the envy and despair of Indian students of philosophy. It is true he has not published any work which would make his name known abroad, but successive generations of pupils who have sat at his feet testify their obligations to his inspiration. He is like Socrates, who speaks only through his disciples."

("দর্শন শাস্ত্রের কথাই ধরুন। এই শাস্ত্রে বি. এন. শীলের বিশ্বকোষপ্রতিম জ্ঞান দর্শনের ভারতীয় ছাত্রদের একই সঙ্গে ঈর্ষা ও হতাশার উদ্রেক করে। এ কথা সত্য যে তিনি এমন কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি, যার রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর পদপ্রান্তে বসে পরম্পরায় যেসব ছাত্র শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণার নিকট তাঁরা সবাই ঋণী। তিনি সক্রেটিসের মতন। ছাত্র-শিষ্যের মাধ্যমেই শুধু তিনি কথা কয়েছেন।")

আচার্য রায় ঐ গ্রন্থের অন্যত্র ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট তাঁর নিজের ঋণও স্বীকার করেছেন।

"At this time I began to feel that I was under an obligation to the public to present to it the promised

second volume of my 'History of Hindu Chemistry'. Accordingly, I resumed my study of some new Mss. of Sanskrit alchemical Tantras which had come into my possession. I was also fortunate in securing the co-operation of Dr. Brajendranath Seal whose encyclopædic knowledge was equal to the task of contributing the section devoted to the atomic theory of the ancient Hindus."

("ঐ সময় আমার মনে হচ্ছিল যে 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' নামক আমার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করব বলে সাধারণ্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত। ফলে, সংস্কৃতে লেখা alchemy-সংক্রান্ত যে সব তান্ত্রিক পুস্তক আমার হাতে এসেছিল, সে সব পুস্তক আবার পাঠ করতে শুরু করলাম। এই ব্যাপারে সৌভাগ্যক্রমে আমি ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আনুকূল্য পেলাম। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের রাজ্য ছিল বিশ্ব-জোড়া। এই বিশ্বকোষিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় 'প্রাচীন হিন্দুদের পারমাণবিক মতবাদ' সম্পর্কিত অধ্যায়টি লেখা তাঁরই সাধ্যের মধ্যে ছিল।")

দুই

ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম আজ থেকে এক শ' বছর আগে। মৃত্যু ১৯৩৮ সালে। ইউরোপে অনেক মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রাচীন গ্রীসে অ্যারিস্টটল, আধুনিক যুগের ইউরোপে কান্ট, হেগেল, রাসেল 'সর্ববিদ্যাবিশারদ' হিসাবে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক পিছিয়ে-পড়া দেশে ব্রজেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কি ক'রে সম্ভব হল, তা সমাজতাত্ত্বিকদের হয়তো অনুশীলনের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ 'দার্শনিক' হিসাবে মুখ্যত পরিচিত হলেও জ্ঞানের সকল বিভাগেই তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান, উচ্চগণিত,—এ সব বিষয়ের চর্চাই তিনি করেছিলেন। স্বদেশের ধর্মসাধনা ও কর্মযোগের সঙ্গেও ব্রজেন্দ্রনাথের বরাবর যোগাযোগ ছিল। তাই অনেক ভাবুক ব্রজেন্দ্রনাথকে 'ভারতীয় অ্যারিস্টটল' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।

জাতির দুর্ভাগ্য যে এ হেন মনস্বী জাতির জন্য অতি সামান্য সঞ্চয়ই রেখে গেছেন। তিনি এমন কোনো গ্রন্থ রেখে যেতে পারেন নি যাতে তাঁর দিগ্বিজয়ী মনীষা ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রাখতে পারে।

তিন

ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে 'The positive sciences of the Ancient Hindus' সর্বাধিক পরিচিত। এর সঙ্গে নাম করা চলে 'Syllabus of Indian philosophy' নামক অন্য একটি গ্রন্থের। 'The Quest Eternal' গ্রন্থে সাহিত্যিক—দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্রজেন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'Comparative studies in Vaishnavism and Christianity', 'Foundation of a science of Mythology in Yaska and the Niruktas with Greek parallels', 'Origins of Law and Hindus as founders of Social science,' 'Rammohan Roy the Universal Man' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঐ সব পুস্তকে ও রচনায় ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের বিস্তার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও প্রজ্ঞা স্বপ্রকাশ। কিন্তু সদাই মনে হয় যে তাঁর মনীষার তুলনায় তাঁর সৃষ্টি যৎসামান্য। আচার্য রায় বলেছেন: 'He is like Socrates.' কথাটা একদিক থেকে সত্য। কিন্তু সক্রেটিস বেঁচে আছেন প্লেটোর দর্শনে, যে দর্শনের আলোকে ইউরোপীয় মানস অনেকখানি উদ্ভাসিত। ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতী ছাত্র অনেক। তাঁদের হৃদয়াসনে তাঁর স্থান শাশ্বত। কিন্তু সেই ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্লেটোর মতো ভক্ত শিষ্য কোথায়? গুরুর ভাবনা-চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করে, নতুন ভাবে জীবন ও সৃষ্টিকে বুঝবার ও বোঝাবার মতো যোগ্য শিষ্য কোথায়? জাতির দুর্ভাগ্য যে ব্রজেন্দ্রনাথ সক্রেটিসের মতো শিষ্যভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি।

আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও কোনো ত্রুটি আছে যার ফলে অধীত বিদ্যা ও পরিশীলিত জ্ঞানের লিখিত প্রকাশে আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। আত্মপ্রচারে কুণ্ঠা এর একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। অথচ সাধারণভাবে নীরব কবিত্ব যেমন অর্থহীন তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও লেখার মাধ্যমে সাধারণীকৃতি ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাও বহুলাংশে নিরর্থক। ফলে ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেছে। এই যে সর্ববিদ্যা-

পারঙ্গম অসামান্য পণ্ডিত, তিনি আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর যা দেয় তা দিলেন না কেন? কেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা কয়েকটি ভাষ্য ও নিবন্ধে সীমিত হোল? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মহাপ্রাজ্ঞ এ. এন. হোয়াইটহেড্। তিনি বলছেন,

> "Mankind is as individual in its mode of output as in the substance of its thoughts. For some of the most fertile minds composition in writing or in a form reducible to writing, seems to be an impossibility. In every faculty you will find that some of the more brilliant teachers are not among those who publish. Their originality requires for its expression direct intercourse with their pupils in the forms of lectures or of personal discussion. Such men exercise an immense influence; and yet, after the generation of their pupils has passed away, they sleep among the innumerable unthanked benefactors of humanity." ফলে হোয়াইটহেড বলছেন: "Thus it would be a great mistake to estimate the value of each member of a faculty by the printed work signed with his name."

ব্রজেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা স্বল্প পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। এবং ঐ সব গ্রন্থের মধ্যে চিন্তার উৎকর্ষ লক্ষিত হলেও মৌলিকতার লক্ষণে এরা হয়তো কালাতীত নয়। আসলে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন 'দর্শনের অধ্যাপক'। অধ্যাপক হিসাবে নতুনভাবে অনেক সমস্যার বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পুরাতন জ্ঞানকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখিয়েছেন যে জ্ঞানের রাজ্যে সর্ব মানবের মিলন, সে রাজ্যে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদ নেই। হোয়াইটহেড্ বলেছেন:

> "Knowledge does not keep any better than fish. You may be dealing with knowledge of the old species, with some old truth; but somehow or other it must come to the students, as it were, just drawn out of the sea and with the freshness of its immediate importance."

ব্রজেন্দ্রনাথের শিষ্যদের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে হোয়াইটহেড কথিত মাপকাঠিতে ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষক ও ভাবুক-শিরোমণি ছিলেন। নানা বিষয়ের ছাত্রদের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর সহায়তা সহজলভ্য ছিল। এবং এই সব ছাত্রেরাই বলেছেন যে গুরুর জ্ঞানের পরিধি একাধারে তাঁদের ঈর্ষা ও হতাশারই সৃষ্টি করত, সবারই মনে হোত একই ব্যক্তি সর্ববিদ্যায় কিভাবে সমান পারদর্শী হন!

চার

ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক অবদান কি? 'The positive sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদি ব্যবহার করে সাংখ্য-পাতঞ্জল ক্রমবিকাশবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনদের পরমাণুবাদ, বেদান্তমত ও প্রাচীন ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। আমাদের ছাত্রাবস্থায়ও দুটি বক্তব্য প্রায়ই শোনা যেত—১। ভারতীয় দর্শন স্বতন্ত্র যুক্তিধারার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, একান্তভাবে শ্রুতিনির্ভর। ২। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদেরই একচ্ছত্র রাজত্ব।

ভারতীয় দর্শন যে যুক্তিহীন মতবাদ নয়, স্বাধীন যুক্তিতর্ক তথা বৈজ্ঞানিক বিচারধারার উপরও যে ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনাথই সে কথা প্রথমে বলেন। "ভারতীয় দর্শন অবিচারিত ও যুক্তিহীন মতবাদ", "ভারতীয় দর্শন একান্তভাবেই শ্রুতিনির্ভর", "ভারতীয় দর্শন একান্তভাবে ভাববাদী", এই প্রকারের অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডনের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক বিচার। এ কাজে ব্রজেন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেন, কেন না তাঁর অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ-ই তৎকালে আর ছিলেন না। তুলনামূলক পঠনপাঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে কাজ করে অনেক দর্শন-জিজ্ঞাসু ছাত্র পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভও করেছেন।

"The positive sciences of the Ancient Hindus" ১৯১৫ সালে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন হিন্দুরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ প্রত্যয় ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, এই গ্রন্থে তারই বিশদ আলোচনা। প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোচনায় ও বৈজ্ঞানিক সূত্র ও

প্রত্যয়-গঠনে হিন্দুদের অবদান যে নগণ্য নয় এবং হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণা সমগ্র প্রাচ্যে, এমন কি পাশ্চাত্ত্যেও যে ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে তা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ জাত্যভিমানী ছিলেন না। কাজেই হিন্দু-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। গ্রন্থের উদ্দেশ্য তিনি বর্ণনা করছেন এ ভাবে :

> "The Hindus no less than the Greeks have shared in the work of constructing scientific concepts and methods in the investigation of physical phenomena, as well as building up a body of positive knowledge which has been applied to industrial technique; and Hindu scientific ideas and methodology (eg. inductive method or methods of algebraic analysis) have deeply influenced the course of natural philosophy in Asia—in the East as well as in the West—in China and Japan, as well as in the Saracen Empire. A comparative estimate of Greek and Hindu science may now be undertaken with some measure success—and finality."

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুদের মতবাদ, হিন্দু শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি, বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের পরমাণু মতবাদ এবং পরিশেষে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন যে দর্শন নিরালম্ব, স্বয়ম্ভু মানস-কুসুম নয়। দর্শনের লৌকিক সামাজিক দিক আছে, দর্শনের উত্থান-পতনের সঙ্গে সামাজিক জ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক আছে। দর্শন যে শুধুই আপ্তবাক্যানুসারী নয়, সূক্ষ্মদর্শী ও শুদ্ধচিত্ত আপ্ত পুরুষের অভিজ্ঞতার বুনিয়াদের উপর যে দর্শন স্বভাবত স্থিত নয়, দর্শনের লৌকিক বৈজ্ঞানিক রসদ যে প্রয়োজন এ সব কথা ব্রজেন্দ্রনাথই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন :

> "The studies in Hindu Positive Science are also intended to serve as a preliminary to my 'Studies in Comparative Philosophy.' Philosophy in its rise and development is necessarily governed by the body of positive knowledge

> preceding or accompanying it. Hindu philosophy *on its empirical side* (বাঁকা হরফ ব্রজেন্দ্রনাথের) was dominated by concepts derived from physiology and philology, just as Greek philosophy was similarly dominated by geometrical concepts and methods. Comparative philosophy, then, in its criticism and estimate of Hindu thought, must take note of the empirical basis on which the speculative superstructure was raised.

'Speculative superstructure,' 'empirical basis' এই শব্দচয়ন লক্ষণীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ ও বৈজ্ঞানিক অনুভূতি (experience) এবং প্রধান সাধন (instrument) হল বিচারবুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। লৌকিক বুনিয়াদের উপর সুদূরপ্রসারী দার্শনিক চিন্তার সৌধ গড়ে ওঠে, ফলে বুনিয়াদকে বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে দর্শনের আলোচনা চলে না।

পাঁচ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক অবদান সংক্ষেপে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ছোট্ট প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তাঁর বহুমুখী চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেওয়া দুরূহ। ফলে 'The positive sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সূত্রাকারে এখানে কয়েকটি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে বিশ্বজগত প্রবাহের মতো, সনাতন, স্থাণু পদার্থ নয়। এই প্রবাহের স্বরূপ কি, গতিপ্রকৃতি কি প্রকারের, এ প্রশ্ন নিয়ে সুদূর অতীত থেকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা ভাবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সাংখ্য-পাতঞ্জল সম্প্রদায় প্রকৃতিতত্ত্ব প্রতিপন্ন করে এই প্রশ্নের সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে দার্শনিকদেরও অসুবিধা ছিল। সাংখ্য-পাতঞ্জল শুধুই সাধনসম্প্রদায়, গুহ্যতত্ত্বের সাধনসামগ্রী প্রতিপাদন করাই এর উদ্দেশ্য অনেকেরই এরকম ধারণা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখালেন যে সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন বিশ্বজাগতিক ক্রমবিকাশ ধারাকে বুঝবার চেষ্টা করেছে, শক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ (conservation of energy etc)

রূপান্তর ও অপচয়ের সাহায্যে জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে।

সাংখ্যের মতে জগতের মূলকারণ অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি ব্যাপকতম আদি কারণ। যে অসীম, অনন্ত শক্তি থেকে (পুরুষ ব্যতীত) সকল পদার্থের উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে যাতে সকল পদার্থের লয় হয়, তার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি সকলের কারণ, কিন্তু প্রকৃতির আর কোনো কারণ নেই, ফলে প্রকৃতি মূল কারণ। জগতের কারণ রূপে যে সূক্ষ্ম, নিত্য, স্বতন্ত্র, পরিণামশীল জড়তত্ত্ব সাংখ্য স্বীকার করেছে সেই প্রকৃতিতত্ত্ব আধুনিককালের matter-in-motion-এর সগোত্র। প্রকৃতি সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সমষ্টি এবং এদের সাম্যাবস্থা ও স্থৈর্যের অবস্থা। সাংখ্যের মতে 'গুণ' বলতে দ্রব্যসমবেত ধর্ম বোঝায় না, প্রকৃতির উপাদানরূপ দ্রব্যই বোঝায়। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও প্রকৃতির উপাদান—সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এর আলোচনা করেছেন বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের সাহায্যে। সত্ত্বঃগুণ সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক (সুখপ্রকাশলাঘবত্ব)। রজঃগুণ দুঃখাত্মক, উপষ্টম্ভক ও প্রবর্তক (দুঃখোপষ্টম্ভকত্ব, প্রবর্তকত্ব)। তমঃগুণ মোহাত্মক, গুরু এবং আবরণাত্মক। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর ও প্রকৃতির উপাদান হিসাবে সাংখ্যাচার্যগণ যে গুণত্রয়ের কথা বলেছেন সেই গুণত্রয়ের তাৎপর্য কি ? ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে সত্ত্বঃগুণ হোল intelligence-stuff, "the essence which manifests itself in a phenomenon and which is characterised by this tendency to manifestation"। অর্থাৎ যে স্বরূপশক্তির প্রবণতা প্রকাশধর্মিতায় (manifestation) পরিস্ফুট হয়, প্রীতি, সুখ ও আনন্দের সৃষ্টি করে এবং লঘুতা যার লক্ষণ, সেই স্বরূপশক্তি (essence) সকল দ্রব্যে ও বস্তুতে ক্রিয়াশীল। রজোগুণ সকল প্রবৃত্তি ও ক্রিয়ার হেতু। ব্রজেন্দ্রনাথ এই গুণের বর্ণনায় বলছেন—"Rajas, Energy which is efficient in a phenomenon and is characterised by a tendency to do work or overcome resistance." তমোগুণের বর্ণনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন, তমঃ হোল "Mass or Inertia", which counteracts the tendency of Rajas to do work and of Sattva to conscious manifestetion". বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, Essence or Intelligence-stuff, সাংখ্যাচার্যগণ যার নাম দিয়েছেন সত্ত্বঃ। দ্বিতীয়ত, চলনাত্মক প্রবৃত্তির হেতুভূত শক্তি (energy) যার নাম রজঃ ।

তৃতীয়ত জড়বস্তু—গুরুত্ব ও ভর (mass) যার লক্ষণ। গুণত্রয়ের স্বরূপ এই যে এরা একদিকে 'একে অপরের উপর আশ্রিত' (interpenetration), অপরপক্ষে 'একে অন্যকে অভিভূত করতে সচেষ্ট' (struggle)। "The Gunas are always uniting, separating, uniting again. Everything in the world results from their peculiar arrangement and combination." আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষা ও প্রত্যয়াদি ব্যবহার করে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে সাংখ্যাচার্যগণ "Essence (সত্ত্বঃ) energy (রজঃ) and Mass (তমঃ), এই ত্রিবিধ প্রত্যয় ব্যবহার করে জগৎবিকাশের ধারাকে বুঝতে চেয়েছেন। "Varying quantities of Essence, Energy and Mass, in varied groupings act on one another, and through their mutual interaction and interdependence evolve from the indefinite or qualitatively indeterminate to the definite or qualitatively determinate".

প্রসঙ্গক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন যে শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তর তত্ত্ব থেকে সাংখ্যাচার্যদের কার্যকারণতত্ত্ব, দেশকালের ধারণা, সবই নৈয়ায়িকভাবে অনুস্যূত। হিন্দুদের ভেষজ বিজ্ঞানের রসায়ন, বৌদ্ধদের আণবিকতত্ত্ব; ন্যায়বৈশেষিকের রাসায়নিকতত্ত্ব, হিন্দুদের মেকানিকস প্রভৃতির দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা করে ব্রজেন্দ্রনাথ আরও দেখাচ্ছেন যে হিন্দুদর্শনে শুধু অলৌকিকতা ও ভাববাদের ছড়াছড়ি এমন কথা বলা চলে না। হিন্দুদের ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসার ও হেগেলের বিকাশবাদের আলোচনা করে ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন যে হিন্দুক্রমবিকাশবাদ তুলনায় মোটেই তুচ্ছমূল্য নয়। সাংখ্যাচার্যদের প্রকৃতির ক্রমবিকাশতত্ত্বের মূল্যায়ন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন :

> "The order of succession is not from the whole to parts, nor from parts to the whole, but ever from a relatively less differentiated, less determinate, less coherent whole to a relatively more differentiated, more determinate, more coherent whole. That the process of differentiation evolves out of separate or unrelated parts, which are then integrated into a whole, and this whole again breaks up by fresh differentiation into isolated factors for a

subsequent reintegration, and so an *ad infinitum*, is a fundamental misconception of the *course of material evolution.* That the antithesis stands over against the thesis and that the synthesis supervenes and imposes unity *ab extra* on these two independent and mutually hostile moments, is the same radical misconception as regards the *dialectical* form of cosmic development. On the Sankhya view, increasing differentiation proceeds *pari passu* with increasing integration within the evolving whole, so that by this two-fold process what was an incoherent indeterminate homogeneous whole evolves into a coherent determinate heterogeneous whole."

উৎসাহী পাঠক ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থটি পাঠ করলে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের পরিচয় পাবেন।

ছয়

আগেই বলেছি ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনের বুনিয়াদ হিসাবে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা মনগড়া নয়, প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন : "I have not written one line which is not supported by the clearest texts." হিন্দুদের অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আজ আর তর্কের বিষয় নয়। প্রশ্ন হবে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে হিন্দুরা যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে, সেই প্রতিভার বিকাশ কোন্ পদ্ধতিকে (method) অবলম্বন করে সম্ভব হয়েছিল? এই প্রশ্নের জবাবে ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে, 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' (Hindu doctrine of scientific method) সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি? এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার, জাগতিক বস্তুনিচয় অথবা অভিজ্ঞতাগম্য তথ্য বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত সার্বিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানের কারবার লৌকিক, প্রত্যক্ষগোচর জগৎকে নিয়ে। অপ্রাকৃত কিম্বা অলৌকিকের রহস্য-সন্ধান বিজ্ঞানের কাজ নয়।

বলাই বাহুল্য যে, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কিম্বা অপকর্ষ নির্ভর করে প্রধানত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। ফলে প্রাচীন ভারতীয়েরা যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বরূপ নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একদিকে আছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (experiment)। অন্যদিকে তথ্য থেকে যাত্রা শুরু করে নিয়মের রাজত্বে প্রবেশ।

ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দু-রসায়ন, শারীরবিত্যা, প্রাণিবিত্যা থেকে রাশিরাশি উদাহরণ আহরণ করে দেখাচ্ছেন যে হিন্দুদেব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শূন্যচারী কাল্পনিক পদ্ধতি ছিল না। ঐ পদ্ধতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন :

> "The entire apparatus of Scientific method proceeded on the basis of observed instances carefully analysed and sifted This was the source of the physico-chemical theories and classifications, but in Anatomy the Hindus went one step further ; they practised dissection on dead bodies for purposes of demonstration.…
>
> In Phonetics, in Descriptive and Analytical Grammar, and in some important respects in Comparative Grammar, the observation was precise, minute and thoroughly scientific. This was also the case in Materia Medica and in Therapeutics, especially the symptomology of diseases. In Meteorology the Hindus used the Raingauge in their weather forecasts for the year, made careful observations of the different kinds of clouds and other atmospheric phenomena. In Zoology the enumeration of the species of Vermes, Insecta, Reptilia, Batrachia, Aves, etc. makes a fair beginning but the classification proceeds on external characters and habits of life, and not on an anatomical basis."

রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনে হিন্দুরা পরীক্ষণও (experiment) করেছে।

"Experiments were of course conducted for purposes of chemical operations in relation to the arts and manufactures e. g., Metalurgy, Pharmacy, Dyeing, Perfumery Cosmetics, Horticulture, the making and polishing of glass."

সাত

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয়ার্ধ আরও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংখ্যক ঘটনা কিম্বা তথ্য পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক নিয়মে উপনীত হওয়া কি সম্ভব? পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই সমস্যাটি 'Problem of Induction' নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনেও এই সমস্যাটির আলোচনা মেলে। অনুমানের (Inference) সাধনসামগ্রী আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বিশ্লেষণে ভারতীয় দার্শনিক ব্রতী হন।

অনুমানের সাধন দুটি—প্রথম, পক্ষে (minor term) হেতুর দর্শন (middle term); দ্বিতীয় হেতুর সঙ্গে সাধ্যের (major term) ব্যাপ্তি-সম্বন্ধজ্ঞান। পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান করতে হলে প্রথমত ধূমরূপ হেতুর দর্শন এবং তারপর ধূমের সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের (invariable concomitance) স্মরণ হয় বলে আমরা পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি। ফলে প্রশ্ন ওঠে (ক) ব্যাপ্তির লক্ষণ কি? (খ) ব্যাপ্তি কি ভাবে জানা যায় অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহের (inductive generalisation) উপায় কি?

ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্পর্কে বলা যায় যে, 'যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে' এই সাহচর্য-নিয়মের নামই ব্যাপ্তি। দেখা গেল অগ্নি ধূমের সহগমন করে কিন্তু ধূম সর্বদা অগ্নির সহগমন করে না। ভারতীয় দর্শনে ব্যাপ্তির প্রকারভেদ প্রভৃতি নিয়ে নানা আলোচনা আছে। এবং শেষ পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিয়ত, অনৌপাধিক সম্বন্ধ। উপাধিযুক্ত সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নয়। ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিয়ত (invariable) ও উপাধিমুক্ত (unconditional) হওয়া আবশ্যক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ধূম হতে আমরা অগ্নির অনুমান করতে পারি কিন্তু অগ্নি হতে ধূমের অনুমান করা চলে না। এর কারণ এই যে অগ্নির সঙ্গে ধূমের সাহচর্য নিয়তদৃষ্ট হলেও, উপাধি বর্জিত নয়। অগ্নির সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ আর্দ্রেন্ধনরূপ উপাধিবিশিষ্ট

(wet fuel)। যখন অগ্নি আর্দ্রেন্ধনজন্য হয় তখনই তাতে ধূম দেখা যায়, নচেৎ নয়। এ প্রকারের উপাধিযুক্ত সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনায় যে-প্রশ্নটি আরও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল—ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানবার উপায় কি? আমরা কি ভাবে জানি যে 'সব মানুষই মরণশীল' অথবা 'সব ধূমই বহ্নিমান'? পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা 'কিছু সংখ্যকের' বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু, 'কিছু' হতে 'সকলে' না গেলে নিয়মের আবিষ্কার ঘটে না। ব্যাপ্তিগ্রহের অথবা Inductive generalisation-এর এটাই হল মূল সমস্যা।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা বলছেন যে তাদাত্ম্য এবং কার্যকারণভাব (causal relation) দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। যদি দুটি ভিন্ন বস্তু স্বরূপত এক হয় অর্থাৎ একটির সঙ্গে অন্যটির তাদাত্ম্য (essential identity) থাকে, তবে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্থাপন করা চলে। অশ্বত্থ ও বৃক্ষ স্বরূপত অভিন্ন হওয়ায় আমরা বলি 'সব অশ্বত্থই বৃক্ষ'। কেননা অশ্বত্থ ও বৃক্ষত্বে তাদাত্ম্য বর্তমান এবং বৃক্ষত্বহীন অশ্বত্থ আসলে অশ্বত্থই নয়। তা ছাড়া, যদি দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে তবে একটি থাকলে অন্যটি অবশ্যই থাকবে, তাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ হবে।

কেননা কারণ বিনা কার্য হয় না এবং কার্য বিনা কারণও হয় না। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা বলছেন, কার্যকারণ সম্বন্ধের পাঁচটি লক্ষণ আছে। এদের 'পঞ্চকারণী' বলে। সেই পাঁচটি লক্ষণ এরূপ (ক) উৎপত্তির আগে কার্যের প্রত্যক্ষ হয় না (খ) কারণের উপলব্ধি (গ) তৎক্ষণাৎ কার্যের উপলব্ধি (ঘ) কারণের বিনাশ (ঙ) বিনাশমাত্র কার্যের বিনাশ। এই 'পঞ্চকারণী'র দ্বারা ধূমের সঙ্গে অগ্নির তথা কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায় এবং এইভাবে তাদের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নির্ণীত হতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ 'পঞ্চকারণী'কে Mill-এর "Method of Difference"-এর সঙ্গে তুলনা করে বলছেন যে 'পঞ্চকারণী' Mill-এর পদ্ধতির চাইতে কোনো কোনো দিক থেকে শ্রেয়তর।

> "This Panchakarani, the Joint Method of Difference has some advantages over J. S. Mill's Method of Difference or what is identical therewith, the earlier Buddhist Method."

নৈয়ায়িকদের মতে ব্যাপ্তিগ্রহের প্রণালী অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রথম দুটি বস্তুর অন্বয়

প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ একটি থাকলে অপরটি উপস্থিত থাকে দেখা যায় (যথা ধূম-বহ্নি)। দ্বিতীয়ত, এদের ব্যতিরেক প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ একটি না থাকলে অপরটিও থাকে না দেখা যায়। যেমন বহ্নি না থাকলে ধূমও থাকে না। তৃতীয়ত, আমরা কোথাও এদের ব্যভিচার দর্শন করি না। অর্থাৎ একটি আছে অথচ অপরটি নাই এমনটি দেখি না। এই সব দেখে আমরা অনুমান করি যে দুটি বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ত সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে।

অবশ্য তখনও প্রশ্ন থাকে। নিয়তসম্পর্কটি যে অনৌপাধিক, উপাধিরহিত তা কি করে জানা যাবে ? ফলে নৈয়ায়িকেরা উপাধিনিরাস (elimination of conditions) প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। দুটি বস্তুর নিয়তসম্বন্ধ উপাধিমুক্ত কিনা জানতে হলে (ক) অন্বয়দর্শন (Agreement in presence) (খ) ব্যতিরেকদর্শন (Agreement in absence) প্রয়োজন। এরূপ ভূয়োদর্শন দ্বারা জানা সম্ভব যে কোন্ কোন্ স্থলে কোনো তৃতীয় বস্তু নেই যার দ্বারা বস্তু দুটির সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের জ্ঞান হলে তবেই বলা যায় যে বস্তু দুটির সম্বন্ধ নিয়ত এবং উপাধিবর্জিত অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপ্তিসম্বন্ধ।

ব্যাপ্তিসাধনের অন্য একটি অঙ্গ হিসাবে নৈয়ায়িকেরা তর্কের আশ্রয় নেন। তর্ক অনেকটা পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের 'reductio ad absurdum'-এর মতো। এই পদ্ধতি অনেক সময় প্রয়োগ করা চলে এবং সুপ্রযুক্ত হলে এর মাধ্যমে উপাধিনিরাশও ঘটে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম কাজ কার্যকারণসম্বন্ধ আবিষ্কার। ভারতীয় দার্শনিকেরা এই সম্বন্ধের আলোচনায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিদ্যায় যেমন কারণকে 'Invariable Unconditional Antecedent' আখ্যা দেওয়া হয়েছে তেমনি ভারতীয় দার্শনিকেরাও সম্পূর্ণ নিজস্ব মনীষাবলে আবিষ্কার করেছেন যে 'কারণ' হল, নিয়তপূর্ববর্তী এবং অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। বহিরঙ্গ অনেক ঘটনাবলী যে শুধুই আপতিক, কার্যকারণ-ভাবে যে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই, ভারতীয় নৈয়ায়িকেরা সে কথা বুঝেছিলেন। 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতা' প্রত্যয়ের বিচারে তাঁরা আপেক্ষিক, গৌণ শর্তাবলীকে কার্যকারণ বিচার থেকে বাদ দিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন :

"In the investigation of any subject, Hindu Methodology adopts the following procedure.

(1) The proposition (or enumeration) of the subject-matter (উদ্দেশ).

(2) The ascertainment of the essential characters or marks, by Perception, Inference, the Inductive methods etc.—resulting in definitions (by লক্ষণ) or descriptions (by উপলক্ষণ); and (3) examination and verification (পরীক্ষা ও নির্ণয়).

Ordinarily the first step, uddesa, is held to include not mere Enumeration of topics but classification or Division proper (বিভাগ); but a few recognise the latter as a separate procedure coming after Definition or Description. Any truth established by this three-fold (or four-fold) procedure is called a Siddhanta (an established theory). Now, the various pramanas, proofs, i. e., sources of valid knowledge, in Hindu Logic, viz. Perception, Inference, Testimony, Mathematical Reasoning (সম্ভব, including Probability in one view), are only operations subsidiary to the ascertainment of Truth (তত্ত্বনির্ণয়). And the Scientific Methods are merely ancillary to these pramanas themselves.

ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থের ও চিন্তাভাবনার যথার্থ পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। 'Positive Sciences of the Ancient Hindus' নামক অপূর্ব গ্রন্থের প্রতিও একটি প্রবন্ধে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনের বৈজ্ঞানিক-লৌকিক বুনিয়াদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পথিকৃৎ-এর কাজ করে গেছেন। সেই উত্তরাধিকারকে বহন করে নতুন যুগে তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন হলে তবেই, আচার্যের প্রতি স্থায়ী সম্মান দেখান হবে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হল। সম্পাদক, পরিচয়

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

কবিতার মানসিক মূল্য ও দুনিয়ার দামের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে বেগ পেতে হল না। অবিলম্বে বাড়িতে এসে গেল দাদার হাত দিয়ে ইংরেজি ও বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'। বাবা বসে গেলেন ইংরেজি দেখে মূল বাঙলা কবিতা 'খেয়া', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' থেকে বের করতে আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ইংরেজি পড়তে। আজও তাঁর কবিতা-সংখ্যা নোট করা সেই ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' আমার উত্তরাধিকার। আর চলল আলোচনা, পদাবলী না, বাইবেলের 'সাম্‌স্‌', না, 'মিস্টিক' কবিতা, কার সগোত্র এ কবিতা? 'গীতাঞ্জলি' আমাদের মতো তস্করের হাত এড়িয়ে বেশি দিন সুরক্ষিত আলমিরায়ও থাকতে পারল না। আজ তার যে সব কবিতা সুপরিচিত সেদিনও তা চোখে পড়েছিল এটাই আশ্চর্য। আর সেদিন অমন করে তা স্পর্শ করেছিল বলেই মধ্যাহ্নের কলকণ্ঠে তা সহজেই এমন আসন গ্রহণ করে, যে আজও সেদিনকার 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' প্রভৃতি কোনো কোনো কবিতা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারি নি। দাদা ছুটিতে এসেছিলেন, ক্রমেই বয়সের ব্যবধান পেরিয়ে আমাদের তিনি তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে, আড্ডায়, খেলায় আলোচনায় সঙ্গী করে নিচ্ছিলেন। তাই পাকামির প্রশ্রয় অবিরত জুটছিল—গীতাঞ্জলি ছেড়ে তাই আমাদেরও যাত্রাপথ এগিয়ে গেল—'সোনার তরী' 'চিত্রাঙ্গদা' কোনো আলোচনাই দাদার মুখে বাবার আসরেও বাদ যায় না।

'সম্মুখ সমর'

যেন মাইকেলের পরিমাপ করবার জন্যই নতুন করে মধুসূদন গ্রন্থাবলীও নিয়ে বসলাম। পূর্বেকার মতো সন্ধ্যায় তুলে না রেখে বাবার বই-এর তাককে এবার কৌশলে সাজিয়ে রাখলাম—যেন দেখে স্থান শূন্য বলে মনে না হয়, আর

মাইকেলকে একেবারে নিয়ে গেলাম আমাদের পড়ার ঘরের বইএর আলমিরায়। দিন তিনেকের মধ্যেই একদিন চমকিত হলাম—বাবার হাঁক ডাকে, কে ধরেছে এই বইএর তাক, আর কোথায় গেল মাইকেলের গ্রন্থাবলী। চুরি ধরা পড়ল—তখনকার মতো একটু নেপথ্যে রইলাম। কিন্তু পরে দাঁড়াতেই হল বাবার সামনে। একেবারে সম্মুখ, সমর—অবশ্য দাদার পক্ষছায়ায়। সকাল বেলা—বাড়ির ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। বাবা বৈঠকখানায় যাবেন, মক্কেলরা অপেক্ষা করছে। বাবা বললেন, ওরা কী করে বুঝবে মাইকেলের? আমি তা বুঝি না।

দাদা বললেন, বুঝবে, কি বুঝবে না, দেখবে না কেন পড়ে?

বাবা বলেন, বেশ বলুক অর্থ—ওই মেঘনাদবধের প্রথম স্তবকের অর্থ বলুক—এদের আমি বই দিয়ে দোব।

দাদা আমাকে বললেন, পড়েছিস তো? তবে বল কি বুঝেছিস।

ইতস্তত করছিলাম। কি জানি, 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে' থেকে শেষ পর্যন্ত স্তবকটা প্রায় মুখস্ত। সত্যই কি তার অর্থ বুঝিনি। বাবা ছাড়বেন না, বলুক ও কথা কাকে বলা হয়েছে।

দাদাও উৎসাহ দিতে ছাড়বেন না—বল্ না।

অগত্যা মরীয়া হয়ে বললাম: সরস্বতীকে—বীরবাহুর পরে কাকে রাবণ সেনাপতি করেছেন, তাই জানতে চাইছেন কবি।

উৎসাহে দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তবে! তবে বুঝবে না কেন, ভাবছেন? বাবাকে বলতে ছাড়লেন না।

বাবা কিন্তু নিরস্ত হলেন না।—এই হোল! শুধু এই বললেই হয়ে গেল?

এবার আমার বিস্ময় জাগল। দাদা বললেন: আবার কি?

বাবা বললেন: 'আবার কি'—কেন? ওখান থেকে কেন আরম্ভ হল, সরস্বতীকে ও ভাবে সম্বোধনই বা এল কেন? না জানলে বলে নাকি—মিলটন কোথা থেকে আরম্ভ করলেন 'প্যারাডাইস্ লস্ট'—অফ্ ম্যানস্ ফার্স্ট ডিসোবিডিয়ান্স্···সিং হেভন্‌লি মিউজ!' আর তারও মূল 'এপিক্'-এর মূল 'দি রাথ্ অব্ এমিলিস্' হোমারের, আর 'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান্' ভার্জিলের। আর 'এপিক্' আরম্ভ করতে হবে আখ্যানের মধ্যাংশ থেকে 'মিদিয়াস্ রেস্'···

উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে মিল্টনের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা, হোমার-

ভার্জিলের ইংরেজি অনুবাদ আবৃত্তি—ভারতীয় কৃপাপ্রার্থী বিভিন্নধর্মী কবিদের প্রার্থনা—এসব মিনিট দশেক কাল চলল। দাদাও তাতে সায় দিচ্ছেন, কিন্তু আমাকে সমর্থনও করছেন—এ সব তো ও স্তবকের অর্থ নয়, ব্যাখ্যার কথা। কত কবিই তো কত ভাবে কাব্য রচনা আরম্ভ করছেন, সরস্বতীর বন্দনা করছেন, তা না জানলে অর্থ বোঝা যায় না, এ কথা ঠিক নয়।

বাবা তা মানলেন না—তাঁদের আমলে সব না জানলে কোনো জিনিস বোঝা হয় না। কিন্তু আমি বুঝলাম—একেবারে শূন্য পাই নি। হয়তো ফেলও করি নি। 'মাইকেলের গ্রন্থাবলী' অবশ্য পুরস্কার পাব না,—তবে ওসব গ্রন্থাবলীতে আমাদের চৌর্যাধিকার বিস্তৃত হচ্ছে ও হবে, তা বাবার আর বুঝতে বাকী নেই। দেখতে হবে যাতে আলমিরায় একটুও স্থান শূন্য না থাকে, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ বাবার চোখে পড়বে। এমন কি, তাঁর সাজানোর ধারার যদি সামান্য ক্রমভঙ্গ হয় তা হলেও তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। তখন থেকে অবশ্য আমরাও সাবধানতা বরাবর অবলম্বন কবেছি—পরে আমিও বই কিনেছি, আলমিরার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেয়েছি, অযত্ন হয় নি—যতদিন বাবা ছিলেন জীবিত আর আমি ছিলাম সমর্থ। সে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেই তখন থেকে বাবা মুখে না বললেও প্রায় মেনেই নিলেন—তাঁর বই আমরা পড়ব, নষ্ট না করলেই হয়। আর দাদা আপনার স্বভাব গুণেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমরা সব বুঝি, সব বুঝব—সব বই পাঠেই আমাদের অধিকার আছে। হোক সে মাইকেলের কাব্য, কিম্বা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী।'

পাকামির পরীক্ষা

'পাকামিব' পথটা পাকা হয়ে গেল। সে পথ যিনি পাকা করেন তাঁর এরূপ আরও দু' একটা কাণ্ড এ প্রসঙ্গেই বলি তবে তা একটু পরেকার কথা। কিন্তু এখানেই বলি।

পুজোয় বিক্রমপুরের বাড়ি গিয়েছিলাম—কলকাতা থেকে দাদাও আসেন বাড়ি। কী একটা দুষ্টুমির জন্য জ্যেষ্ঠদের কাছে ভৎর্সনা লাভ করে আমি অভিমানে স্তব্ধ হয়ে যাই। দাদাও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। ঘণ্টা দুই কারও সঙ্গে আর কথা বলতে এগিয়ে যাই নি। দুরন্ত ছেলের এতটা শান্তভাব, পুজোর বাড়িতে না হলে, অন্যদেরও চোখে পড়ত। তখন চোখে পড়ল দাদার।

সস্নেহে একবার বললেন, 'শোন্, পূজোর সংখ্যা সংবাদপত্র এনেছি—রঙ্গব্যঙ্গ আছে, ছবি আছে। আর এনেছি—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য'। পুরনো বইএর দোকানে পেয়েছি।' লোভের মতো বড় রিপু আর নেই। বিশেষতঃ বইএর লোভ। খাবারের থেকেও বেশি সর্বনাশা কেতাব। লোভের কাছে অভিমান হার মানল। সেই রঙ্গব্যঙ্গ-এ হেসেছি; কিন্তু তা ভুলে গিয়েছি দুদিনেই। কিন্তু মহিলাকাব্য—'মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার'—যে দু-একজন মাইনর কবিকে আমি ভুলতে পারি না তাঁর মধ্যে সুরেন্দ্র মজুমদার প্রধান একজন।

আরও কিছু পরে—গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদা এসেছেন বাড়ি। আমার দেখা পান কম। কারণ, আমি তখন যজ্ঞেশ্বরের ঘরে অখণ্ড মনোযোগে পড়ছি দীনেন্দ্র রায়ের 'মায়াবিনী'। ও সব ডিটেকটিব উপন্যাস যে পাঠযোগ্য নয়, এরূপ একটা কথা আমরা বাড়িতে শুনতাম। সাধু তা পড়ে নি। ঠিক অত সুযোগ খুঁজে খুঁজে পড়বার মতো তার আগ্রহ ছিল না। দাদার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, তোকে দেখছি না যে! ছিলি কোথায়? সাধু লাগাল, 'ও বাড়িতে। দীনেন্দ্র রায় পড়ছিল।' আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলাম, 'মিথ্যা কথা! নিজে পড়ে আমার নামে লাগাচ্ছে।'

কথাটা প্রায় বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল। এমন সময় দাদা বললেন, 'কি পড়ছিলি—'নরহন্ত্রী জুমেলিয়া' ?'

আমি হেসে ফেললাম। এবং ধরা পড়ে গেলাম। হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দাদা দু'ঘা লাগিয়ে দিলেন। 'বাঙলা ডিটেকটিব উপন্যাস অপাঠ্য। পড়তে হয় তো ইংরেজিতে পড়বি।' এবং বিকালেই পেয়ে গেলাম 'মেময়ার্স অব্ শারলক হোম্‌স্।' পড়ি তো স্কুলের বোধহয় থার্ড ক্লাশে। দিন তিন পরে আমার দুই মেসোমশায় এলেন। তাঁরা চাইলেন পড়বার জন্য ডিটেকটিব বই। দাদা বললেন, গোপালের কাছে আছে মেময়ার্স।

—গোপাল! ও বুঝবে কি ও ইংরেজি বইএর।

আমার তখনো সবগুলি গল্প পড়া হয় নি। তবু বই তাঁদের দিতে হল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আপত্তি হল—ও কথাটায় 'ও বুঝবে কি।' দাদার কাছে স্পষ্টই বললাম—বুঝি, না, না বুঝি একবার পরীক্ষা করুন না। তিনি হাসলেন। বললেন—আমি তো বলি নি। আমি তো বুঝবি বলেই তোকে বই পড়তে দিয়েছি।

পাকামির পথটা অবশ্য তার আগেই তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। সম্পূর্ণ যা বুঝি নি, এমন অনেক জিনিসেরও মূল ধারণাটা ধরতে পারব, এ ভরসা পেয়েছিলাম তাঁর প্ররোচনায়। না হলে অনেক অসাধ্য কর্মে সাহস পেতাম কোথা থেকে। সে সময়কার কথাই বলছি—আমার থার্ড ক্লাসের কথা। কমলাকান্তের প্রসঙ্গে বাবা বলেছিলেন ডি-কুইন্সির Confessions of an Opium Eater-এর কথা। তাঁর আলমিরাতে সেই চটি বইখানাও ছিল। দুপুরে তা একদিন খুলে বসলাম—অবশ্য ইংরেজিতেও আমার তখন নেশা লেগেছে। আর সেই 'সীতার বনবাসের' পরের অবস্থা—অর্থাৎ ইংরেজি ক্রেজ, ভাষার চমক দেখলে চোখ চক্-চক্ করে ওঠে। ডি-কুইন্সিতে যে তার অভাব ছিল না, তা সহজেই বুঝলাম। অবশ্য সে বই সমস্তটা পড়া হয় নি। কিন্তু বহু বহু পরেও Ann of the Oxford street মনে জাগ্রত ছিল—Bridge of Sighs পড়তে গিয়েও তার কথাই মনে পড়েছে। 'পাকামি' ছাড়া একে বোকামিও বলা চলত। কারণ তখন কেন, তার অনেক পরেও, ও বয়সের ছেলেদের থেকে আমি দৈহিক মানসিক অনেক স্থূল বিষয় সম্বন্ধে ছিলাম অজ্ঞ। অথচ ওদিকে ল্যাম্বস টেলস ফ্রম শেকসপীয়রেও আমার নেশা মিটত না। দাদার পাঠ্য শেকসপীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' ও 'টুয়েলবথ্ নাইট' ছিল আলমিরায়—প্লুটার্কের টেল্স্ও কয়েকটি। আমি তো 'ভেরিটি'র সম্পাদিত শেক্সপীয়র টীকা দেখে ভূমিকা ও পরিশিষ্ট শুদ্ধ পড়ে ফেললাম। দাদা দেখছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা বল দেখি কদিনের ঘটনা আছে এ নাটকে।' ভেরিটির কৃপায় সেই ইউনিটিজ-এর তত্ত্ব আমার পঠিত, আর সে আলোচনাও আমার জানা। উত্তর দিতে কষ্ট হল না। দাদা বললেন, 'না, তা হলে পড়েছিস। অনার্সে ছাড়া এ প্রশ্ন পাসের ছাত্রদেরও পরীক্ষায় দেওয়া হয় না।' আসলে ফাঁকি,—বিশেষ কোনো পংক্তি ব্যাখ্যা করতে দিলে কষ্ট হত। কারণ, মোট অর্থটা ধরতে পারলেই না থেমে আমি এগিয়ে যেতাম। এগিয়ে যাওয়ার তাড়ায় অনেক কিছুই পিছনে ফেলেও যেতাম।

ইংরেজি বই-এর রস বুঝেছিলাম ও সময়ে—কিন্তু তার বহু আগেই বাঙলা বই-এর পেয়েছিলাম স্বাদ।

রবীন্দ্রযোগ

১৯১৩-১৯১৪-তে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' হাতে পাবার পরে রবীন্দ্রনাথই হলেন প্রধান জিজ্ঞাস্য। তখন নোবেল প্রাইজের পরেই আমাদের জীবনে লাগল

রবীন্দ্রযোগ। বাঁধানো প্রবাসীর দিকে এবার দৃষ্টি গেল বিশেষ করে—কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রধান বাহন 'প্রবাসী' বাড়িতেই তা সুরক্ষিত। 'গোরা'ই সর্বাগ্রে পড়লাম। ভয়ে-ভয়ে ধীরে-ধীরে। ঘটনা অপেক্ষা ভাবনা যেখানে প্রধান এমন উপন্যাসের সঙ্গে তো প্রথম পরিচয়। সাধনাসাপেক্ষ কাজ। কিন্তু প্রস্তুতি থাকলে এগুবার মতো উৎসাহ নিজের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই উৎসাহ নিয়ে 'গোরা' শেষ করলাম। একটা চমক চোখে লেগে রইল—আইরিশম্যান না হয়ে গোরা কি ভারতীয় হতে পারত না? আইরিশ মেয়ে নিবেদিতাকে মনের সামনে রেখে গোরা রচিত হয়েছিল বলে আজ মনে হয়। কিন্তু ভারতীয় বিবেকানন্দকে নিয়েও কি এমন ভারত-কথা লেখা চলত না? তখন এসব কথা মনে জাগে নি—গোরা-সুচরিতা-ললিতা-বিনয়-আনন্দময়ী-পরেশবাবু ছাড়াও যা বুঝলাম তা এই বর্জন-ধর্মী ভারত অপেক্ষা মিলন-ধর্মী ভারতই সত্যকার ভারতবর্ষ। এই বুঝাটা আমাদের দরকার ছিল—কারণ, স্বদেশীর যুগে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের থেকে অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণেরই ঝোঁক পড়ছিল। প্রস্তুতিটা তখনকার মতো মন্দ হল না। 'প্রবাসী' থেকেই পেলাম অজিতকুমার চক্রবর্তীর সেই সুবিখ্যাত আলোচনা 'রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে তা লেখা। রবীন্দ্রসাহিত্যের তা অতুলনীয় ভূমিকা। অন্তত তখন পর্যন্ত তা অতুলনীয়। অবশ্য তখন পর্যন্ত 'গীতাঞ্জলি' ও 'রাজার' পর্বেই এসে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছেন। তাঁর মহত্তর পরিণতি তখনো অজানা। পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কবি-প্রতিভার সেই বিকাশ ধারাকে অজিতকুমার সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন, দেখেছেন তাতে একটি মুখ্য প্রেরণার বিকাশ ও প্রকাশ। তাঁর মনে হয়েছে অধ্যাত্মমুখিতাই এ কবির কবিধর্ম। এ কথা এখন আর ও-অর্থে মানি না। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় পাবার পক্ষে সে আলোচনা চমৎকার পাথেয় জোগাল আমাদের। বেশ মন দিয়ে বার দুই পড়লাম। তারপর এগিয়ে চললাম। উপকরণের অভাব ছিল না। প্রবাসীতেও প্রচুর। জীবনস্মৃতি প্রথম পড়লাম—আর অপূর্ব তার প্রসন্ন সরসতা। তারপর অচলায়তন। পুরনো নতুন নানা লেখা। চয়নিকা ও কিছু বই হাতে ছিল। পেয়ে গেলাম অচিরে হিতবাদীর রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ড। যেখানে যা পাই কিছুই সংগ্রহ করতে দেরি হয় না। তবু যে কিছুই রবীন্দ্রনাথের জানি না এ কথা রোমাঞ্চিত আনন্দে উপলব্ধি করলাম কিছুকাল পরে যখন হাতে এসে পড়ল সেই রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর

গল্প খণ্ড। 'ডাক্তার! ডাক্তার!' থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি গল্পের মধ্যে অগ্রসর হয়ে যাই আর বিস্ময়ে যেন এই পৃথিবীকে আবার দেখি। এই পৃথিবীতে এত বিস্ময়, এত রহস্য আছে তা কি জানতাম? পরে যখন ফিরে চয়নিকার কবিতায় আবার অবগাহন করলাম তখন সমস্ত কিছুরই অর্থ আরও নিগূঢ় হয়ে উঠল। এ তো রূপের ঘোর নয়, ভাবের ঘোর, জীবনরসের আবেশ। তাতেই এত ভাব, এত রস, এত রহস্যময় এই পৃথিবী, এত জীবন্ত সত্য, এত রূপে রূপে অপরূপ। জীবনরসের আস্বাদনে বিভোর সেই পরমাশ্চর্য কৈশোরের দিনগুলির কথা মনে করে মানতে হয়—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ং।

রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে বয়সের মতো করে পৃথিবীর এই বিস্ময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই স্বদেশী রূপরসস্পর্শহীন কৃচ্ছ্রসাধনার দিকটা আমাকে গ্রাস করতে পারে নি। তাদের সংযম, শৃঙ্খলা, নীতিনিয়মে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগ ছাড়ি কি করে? রূপরস আনন্দে লোভও আমার অপরাজেয়। বিবেকানন্দের 'অভী' মন্ত্রের সঙ্গে এই আনন্দের আশীর্বাদই আমাদের কালে আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ দিলেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের কিছু গদ্যপ্রবন্ধ পড়লাম। 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়' নতুন বেরিয়েছিল। আর বোধহয় কালীর কাছে পেয়েছিলাম 'স্বদেশী সমাজ'। কারণ, 'আমার ধর্ম', 'আমার জগৎ' দিয়ে আমার অকালপক্ব স্বদেশী সুস্থ হতে পারত না। ভাগ্যক্রমে প্রায় সে সময়েই প্রবাসীর পৃষ্ঠা থেকে পেলাম 'ছোট ও বড়', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। তখন সেই সাহিত্যানুভূতি আরও সুদৃঢ় একটা আশ্রয়ও পেল—রাজবন্দীদের সম্বন্ধে বলবার যে-সাহস তখন কারও নেই দেশে, তা আছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের। নিশ্চয়ই দেশের মানুষকে নিয়েই দেশ। মুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চললে রাজনৈতিক মুক্তিই বা নিকটে আসবে কেন? কিন্তু রাজনৈতিক মুক্তিরও দাবী সামান্য নয়। মিসেস বেসান্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদও কবি তা জানিয়ে দেন, আবার কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের ভয়ার্ত প্রয়াসকে উপেক্ষা করে তিনি মিসেস বেসান্টের সভাপতিত্বের সমর্থনেও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'প্রবাসী'র পক্ষপুট

মুক্তির এই ব্যাপক আদর্শ গ্রাহ্য হত না—যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শকে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্য তাতে থাকত। রবীন্দ্রনাথের সুস্থ

দৃপ্ত আচরণ আমাদেরকে কতকটা সুস্থ করল। সেদিকে প্রবাসীর সাক্ষ্যও ছিল আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। 'প্রবাসী'র সর্বাঙ্গীন প্রয়াস যতই চোখে পড়ল ততই বুঝলাম 'প্রবাসী' মহামূল্যবান। অন্তত বিশ বৎসর আমরা বাড়িতে তার ছায়ায় পালিত, বর্ধিত। সেও এক নেশা। বাঙলা মাসের তেসরা তারিখে দু-ভাই বাদামতলায় ডাকপিয়নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। জানতাম—পয়লা তারিখে তা কলকাতায় ডাকে দেওয়া হয়েছে, তিন তারিখে তা এখানে আসবেই। এর ব্যতিক্রম হতে পাবে না। দিনরাত্রির মতোই নিয়মবাঁধা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা-পরিচালনা। অবশ্য বাবাই 'প্রবাসী'র মোড়ক খুলবেন, মলাটে গ্রাহক নম্বর প্রথম টুকে রাখবেন, আর স্বাক্ষর ও প্রাপ্তির তারিখ। তারপর পত্রিকাটি রাখবেন ডেস্কে—রাত্রিতে সময় হবে পডবার। প্রবাসী ছাড়াও তাঁর পাঠ্য ছিল 'মডার্ন রিভিয়্যু', আইনের পত্রিকা, আর পাবলিক লাইব্রেরির 'রিভিয়্যু অব রিভিয়্যুজ' জাতীয় বিলিতী পত্র। আমাদের দৌড় 'প্রবাসী' পর্যন্ত। তবে গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ আলোচনা শুধু নয়, 'প্রবাসী'র প্রথমদিককার সংকলন, পরেকার পঞ্চশস্য কষ্টিপাথর—আর বিশেষ করে বিবিধ প্রসঙ্গ সবই ছিল। 'প্রবাসী'তে সেদিনে কোনো জিনিস বেরিয়েছে আর আমি তা পড়ি নি এমন হয় নি—হোক তা মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তর্ক-বিচার, কিম্বা যোগেশচন্দ্র রায়ের আলোচনা, এমনকি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠের ভূমিকা', বা বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দার্শনিক গবেষণা। আর সেই বয়সে যা পড়েছি তা বুঝি না-বুঝি একেবাবে ভুলে যাব, স্মৃতিশক্তির এমন দুর্গতিও তখন ছিল না।

সেদিনে 'প্রবাসী' বৃহৎ জগতের সঙ্গে বাঙালির যেমন উদার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চেয়েছে তেমনি সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও ভাবনারও ক্ষেত্রে তাকে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের অন্তত সে ক্ষেত্রটা তখন থেকেই তাই গোচরে আসে।

আরেকটা ক্ষেত্রেও চোখ না পড়ে পারে নি। 'প্রবাসী'র প্রসাদেই চিত্রকলার সম্বন্ধেও পিপাসা জেগেছিল। দেখে-দেখে চোখের যে-শিক্ষা তাতে হয়, তার সঙ্গে এক্ষেত্রেও যোগ হত দাদার সাক্ষ্য। শিল্পকলায় তাঁর জন্মগত অধিকার, আমার অভ্যাস-গত। তবু মোলারাম থেকে অবনীন্দ্র-নন্দলালের শিষ্যগোষ্ঠী পর্যন্ত যে-মোহটা বিস্তার করেছিলেন মোহ কাটলেও

আমি এখনো অন্য কৃতীদের মতো ভারতীয় শৈলীর কৃতীদের কৃতীই মনে করি। এ শৈলীর মোহে তখন একবার রঙ নিয়েও আমি বসেছিলাম। কিন্তু হাত না দিতেই বুঝলাম—ও আমার কাজ নয়। যাঁর কাজ ছিল তিনি দেখেই গেলেন, হাত দিতে সময় পেলেন না—সময় জিনিসটা রঙীন হালদারের চিরদিনই কম।

প্রবাসীর উত্তর খুঁজেই পড়তে হত 'সাহিত্য'—কখনো কখনো যার পাতা থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা পড়ে শুনিয়েছিলেন বাঙলার বিনোদ পণ্ডিত মশায়। 'সাহিত্যে'ই কি আমাদের ঝোঁক কম ছিল? দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী'র মতো গল্প, নবকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়ারি' এখনো মনে পড়ে। রামেন্দ্র-সুন্দর অবশ্য আমার নিকটতব হয়ে উঠেছিলেন তৎপূর্বেই। নানা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, 'বাঙালির ব্রতকথার' সন্ধান পেয়েছিলাম। তারপর ফোর্থ কি থার্ড ক্লাশে, কী কারণে পেয়েছিলাম 'চরিতকথা' পুরস্কার। আর তার থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পাঠ করে আমার চক্ষে পলক পড়ে নি। এদিকে 'নারায়ণ' বেরুতেই কলকাতা থেকে দাদা তার প্রথম সংখ্যা পাঠিয়েছিলেন টীকা শুদ্ধ। তারপরেও 'নারায়ণ' পড়তে পেতাম—রবীন্দ্রবিরোধটা আঁচ করতে পারতাম। কিন্তু 'বঙ্কিম সংখ্যা' প্রভৃতি পড়ে উৎসাহিত হতাম। বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধে। তখন থেকে আমার এই বিশ্বাস বাঙলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক ওঁরা দুজনা—রামেন্দ্রসুন্দর ও হরপ্রসাদ। এখনো সে বিশ্বাস অটুট—শুধু আরও নাম যোগ হয়েছে। ভুলে গেছলাম বঙ্কিমের আলোচনার গন্ধ। সংগ্রহ করতে পারলে কখনো কখনো এরূপ পড়তাম 'ভারতী', কিম্বা 'ভাবতবর্ষ'।

এসব মাসিকপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে সহ্য করতে হয়েছে বড়োদের কাছে অবজ্ঞা আর অগ্রজদের কাছে অপমান। একদিনকার কথা এর মধ্যে মনে আছে। মা গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিবেশিনীর গৃহে। স্কুল থেকে ফিরে মাকে না পেয়ে আমি তাঁকে ডেকে আনতে সেই গৃহে যাই। মা উঠি-উঠি করতে আমি বসে গেলাম কয়েক সংখ্যা বোধহয় 'ভারতী' পেয়ে তা পাঠে। আর ভুলে গেলাম সব। মায়ের যখন খেয়াল হল তখন বললেন, 'ওঠ, ও-সব পড়তে হবে না তোর।' প্রতিবেশিনী কিন্তু মাকে বললেন, 'কেন? বাধা দিও না। পড়ুক। ও-সব পড়া ভালো।' বাড়ির

বাইরে সেই প্রথম বোধহয় আমি আমার 'পাকামির' বা ঐ সাহিত্যে নেশার জন্য উৎসাহের মন্তব্য শুনেছিলাম। শিক্ষা ও সৌভাগ্যবতী সেই মহিলা ছিলেন গর্বিতা। অন্যদের প্রতি ছিল তাঁর উপেক্ষা। থাকুক। তিনি আমার সকৃতজ্ঞ স্মৃতিতে তবু অভিষিক্ত হয়ে আছেন সেই থেকে।

'নারায়ণ' পেলেও 'সবুজপত্র' খুঁজে পাই নি। প্রবাসীর থেকেই তার তথ্য ও সার সংগ্রহ করতাম। কিম্বা, দাদা নিয়ে আসতেন ছুটিতে এক-আধ সংখ্যা। তাঁরই পরিচিত একজন লোককে তিনি পেলেন আমাদের নতুন প্রতিবেশী। অরুণ স্কুলের তিনি নবাগত শিক্ষক—চাঁদপুরের স্থরেশ চক্রবর্তী। গৌরবর্ণ এই দ্রুতগামী ভদ্র যুবককে বাদামতলা দিয়ে যেতে-আসতে দেখেছি। আপন মনে দৃপ্ত পদে দৃক্‌পাতহীন দৃষ্টিতে তিনি চলেন। একটু অসাধারণ গতিতে, গাম্ভীর্যে, রূপে। কিন্তু তখন অদূরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। তাঁর বিশেষ পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি। দাদা আসতেই দু'জনার পরিচয় হয়ে গেল—'সবুজপত্রে'র লোক, চমৎকার কালচার্‌ড্‌ মানুষ।' তিনি যে তার চেয়েও আরও বেশি, এবং কম, এ সত্য বুঝতে দেরী ছিল। এমন মানুষ দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি। কারণ স্থরেশ চক্রবর্তী প্রতিভাবান, মৌলিক চিন্তার অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে প্রতিভা বি-সম, আর তাই জীবনে তার প্রকাশ খণ্ডিত। কিন্তু সে পরের পর্বের আবিষ্কার। পর্বান্তের মুখে তাঁর আবির্ভাবে 'সবুজপত্রের' ছায়া দীর্ঘীকৃত হয়ে সত্যই পৌঁছল বাদামতলায়।

এই পর্বান্ত এল ১৯১৮ সালে—দাদার সঙ্গে যাত্রা করলাম নোয়াখালি থেকে কলকাতায়—কলেজে পড়ব। কৈশোর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি যৌবনে।

(ক্রমশ)

আগামী সংখ্যা থেকে

শ্রীদেবেশ রায়-এর উপন্যাস

যযাতি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

নীরেন সেন

কলকাতার বস্তিজীবনে অভিবাসী সঙ্করণের স্বরূপ

পূর্ব ভারতের অসংখ্য মানুষের জটিল ভৌগোলিক অভিবাসের (immigration) একটা প্রধান কেন্দ্র কলকাতার বস্তিতে। কলকাতায় মুগ্ধ পঙ্গপালের মতো এরা আসে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেন নি। অন্যদিকে বস্তিগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পৌরব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণও হয় নি। সবকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি এই সব সংকটাতুর বস্তি এলাকার তথা সমগ্র কলকাতার দ্রুত, সুবিন্যস্ত ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি বা সামাজিক প্রগতির জন্যে সতর্ক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে কে অস্বীকার করবে! অভিবাসীরা কলকাতাকে যেভাবে বিষাক্ত করে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব ভারতের সমস্ত অগ্রগতি বা উন্নয়নকে এই বিষের সংক্রমণ থেকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে—পূর্ব ভারতের অগ্রগতি আরও শ্লথ এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে।

অভিবাসের কারণ মূলত দুটি

(১) গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বৈষম্যমূলক শ্রমমজুরী—গ্রামের দুঃখ, দৈন্য, নিরাশার পাশেই শহরের স্বপ্নমায়ার আকর্ষণ প্রত্যেক দেশেই থাকে। কিন্তু বলিষ্ঠ নগর সভ্যতার পত্তন যেখানে হয়েছে সেখানে বরাবরই কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির আধিপত্য থাকে। কিন্তু কলকাতায় কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির আধিপত্য নয়, কেন্দ্রবিসর্পী (শরণার্থীদের মূল আবাস-অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি কেন্দ্র ধরে) শক্তির আধিপত্যই অভিবাসের মূল কারণ। গ্রাম থেকে যারা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল শহর তাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানায় নি। অনিমন্ত্রিত এই সব অতিথিদের আপ্যায়ন করার মতো শক্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদ কলকাতার শহরাঞ্চলে ছিল না।

(২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা, বা জনসংখ্যার চাপকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয় নি। ফলে ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে কম জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের মতোই বেশি থেকে যাচ্ছে। আমাদের নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি মোটেই কার্যকর হয়নি। জনসংখ্যার অসম বৃদ্ধি এবং ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রয়োজন কিছু নতুন কেন্দ্রবিসর্পী শক্তির আমদানী করা। কলকাতার শহরতলী অঞ্চলের উন্নয়ন হলে অভিবাস-সমস্যা কিছুটা হাতের মধ্যে আনা যাবে।

প্রলোভনের ফাঁদ

উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যে এই মহানগরীর বস্তিগুলো ক্রমান্বয়ভাবে শিল্পশ্রমিকদের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। অ-স্থিতিস্থাপক গ্রাম্য অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উপনিবেশবাদীদের শোষণে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে যাওয়ার ফলে গ্রামীন জীবনে চরম সংকট দেখা দেয়। আর সেই সংকট মুক্তির স্বর্গ (?) হুগলী নদীর দুই তীরে বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল। এরপর এল '৪৩-এর মন্বন্তরে পালিয়ে আসা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ আর পূর্ব পাকিস্থান থেকে স্বাধীনতার বলি সর্বহারা উদ্বাস্তু। বুকে এদের অনেক আশা, মনে অনেক রঙীন স্বপ্ন। কিন্তু শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার ন্যূনতম অর্থনৈতিক মান সম্বন্ধে এই সমস্ত অভিবাসীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা জানতো না যে 'ভাগাড়' সম বস্তিতে তাদের স্থান হবে, জানতো না যে ধনতন্ত্রের শকুনের নজরকে তারা এড়াতে পারবে না।

কলকাতায় ভালো বাসা বা বাসযোগ্য উন্নত অঞ্চল শুধু বিত্তবানদের জন্যেই নির্দিষ্ট। সুতরাং শহরের উন্নত আবাস-অঞ্চলে জায়গা না পেয়ে নিম্নবিত্তেরা অনেক অসুবিধে এবং অস্বস্তি সত্ত্বেও একান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাথা গোঁজার জায়গা করে নিল। এই পরিবেশ থেকে পালাবার পথ বড় কম; কারণ, কায়িক পরিবেশের (physical environment) চেয়েও বড় একটা শোষণযন্ত্রের নিষ্পেষণ এদের ক্রমান্বয়ে মুষ্টিবদ্ধ করেছে। সেই শোষণযন্ত্রটি শহুরে মহাজন ও মজুরদার (শ্রমিক সংগ্রহকারী পরশ্রমজীবি)-দের যুক্ত মালিকানায় পরিচালিত। মহাজন ও মজুরদারদের স্বার্থের আবর্তে একবার

বাঁধা পড়লে কলকাতা ছেড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করার কোনও পথ থাকে না।

অসমাজতান্ত্রিক নগরীকরণের ফলশ্রুতি

এই সব বস্তিবাসীদের ভবিষ্যৎ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি হৃদয়বিদারক। গ্রামবাসীদের তবু একটা সান্ত্বনা এই যে তাদের নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যেই যা কিছু উপবাস-অনাহার। একটা দীন ভিটে বা এক ফালি অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত একমাত্র অবলম্বন হলেও তাদের ভাগ্যের ভিত্তি হিসেবে সেই অবলম্বনের মূল্য অপরিমেয়। এই অবলম্বন ছেড়ে শহরে আসবার পরে তারা বুঝতে পারে সেই মূল্যের পরিমাণ, উপলব্ধি করে তাদের ক্ষতি। শহরে আকাশ পাতাল তফাৎ, গ্রামের মতো শহরটাকে নিজের বলে ভাবতে পারা যায় না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এরা শাসিতের মধ্যেও অপাংক্তেয়; এরা শুধু জন্মসূত্রে মাটির স্পর্শে এসেছিল। জমিতে যেটুকু অধিকার এদের ছিল সেটুকু শুধু অনধিকারের দায় বাড়িয়েছে। আর আমরা শহরের বিস্তৃত ও জটিল অর্থনৈতিক পটভূমিতে এদের শুধু "বিত্তহীন" পরিচয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছি। কলকাতার পুরবাসীদের কতটুকু অংশ এদের তিক্ত জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন? এরা কিন্তু জাত বেজাতে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠছে, মানসিক শূন্যতা এবং নৈতিক অধঃপতন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিচ্ছন্নতার সনাতন সংস্কার—কি ব্যক্তি-জীবনে, কি নৈতিক আচার আচরণে, কি সামাজিক দায়িত্ব পালনে—আজ একান্তই মূল্যহীন। কলকাতার ক্রমবর্ধমান অধিবাসীদের এই পঙ্গু মানসিকতা বস্তিজীবনকে দিন দিন দুর্নীতি ও নৈতিক অবনমনের পঙ্কিল আবর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বহিরাগত বস্তিবাসীদের নগরজীবনের সঙ্গে সমন্বয়নের সমস্যা

তুলনাগতভাবে অনেক ছোট ও সুসমসাম্বিক বাসভূমি থেকে উৎখাত এইসব হতভাগ্য শরণার্থীরা শহরে এসে সমন্বয়নের (Adjustment) যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে চরম হচ্ছে শহরে জীবনের জটিল অসমসাম্বিক বিকাশ। সুতরাং নতুন শহরাগতরা চেনা পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে পুরাতন শহরাগতদের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ ছাড়ে না। তারপর ধীরে ধীরে শহরের জটিল স্পন্দন-আলোড়ন-বিলোড়নের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। কিছুটা হালচাল

রপ্ত করে। কিন্তু যে প্রচণ্ড গতিশীল পরিবর্তন নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটায়, তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অপরিচিত জীবনযাত্রা, আন্তরিক যোগাযোগের পরিবর্তে নৈর্বক্তিক যোগাযোগ, আমোদ-প্রমোদের অদ্ভুত উপকরণ, পৌর ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা, ঘন লোকবসতি, বুদ্ধি এবং মনকে ধাঁধিয়ে দেবার মতো অবিশ্রান্ত আওয়াজ, যানবাহন এবং কর্মব্যস্ততা, সাম্প্রদায়িক সমবায়ের (communal aggregates) জটিল প্রাশস্ত্য, প্রাতিস্বিক (individual) জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক গুরুত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গেই তাদের মোকাবিলা করতে হয়। শহুরে জীবনের সঙ্গে সমন্বয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা (The greatest problem of adjustment seems to centre around the shift from a subsistence to a monetary economy and the necessity of having a job for subsistence.)। এর মধ্যে যারা স্বাধীনতার বলি, যারা উদ্বাস্তু, পরিচিতির ক্ষুদ্রতম সূত্রটিও যাঁদের জীবনে অনুপস্থিত—অনিশ্চিত শূন্যতা যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, জীবিকা যাদের অনিশ্চিতের অন্ধকারে ভবিতব্যের আশ্রয় নিয়েছে, তাদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোকে না মেটাতে পারলে বর্তিষ্ণু (stable) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে না। আর অবর্তিষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থায় একটা নতুন পরিবেশের সঙ্গে প্রকৃত সমন্বয়ন যে কোনও শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অসম্ভব।

অভিবাসীদের মধ্যে পুরুষদের বড়ই সংখ্যাধিক্য। এটা শহরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মজুরী ও বিস্তৃত রোজগারের ক্ষেত্র এবং গ্রামের শোচনীয় দারিদ্র্যই সূচিত করে। এরা তাই বেশির ভাগই মধ্যবয়সী চাকুরী-সন্ধানী বেকারের দল। গ্রামে সুষ্ঠু চিকিৎসা ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবতাড়িত হয়ে যারা কলকাতায় আসে তাদের সংখ্যা খুবই অল্প এবং তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র চার জন বস্তীতে এসে ওঠে। অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে গোষ্ঠী ও জ্ঞাতি বিবর্জিতভাবে এখানে বসবাস করছে। যারা করছে তারা গ্রামের সামাজিক পরিবেশের একান্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে কলকাতায় এসেছিল। ভারতীয় সমাজে নেহাত ঠেকায় না পড়লে কেউ প্রাতিস্বিক জীবনযাত্রার পথ বেছে নেয় না। সুতরাং অপরিচিত পরিবেশে কয়েকটি পরিচিত মুখ অনেক সান্ত্বনা।

প্রত্যেক ১০০ জন বস্তিবাসীর মধ্যে বয়সানুক্রমে অভিবাসীদের সংখ্যা

১৯৬৪ সালের শেষ দিনপর্যন্ত বয়স	পুরুষ ১৯৩৫ সাল থেকে বস্তিবাসী	স্ত্রী ১৯৩৫ সাল থেকে বস্তিবাসী
১৪ বছরের নিচে	৬৬'৮৫	৪৫'২৩
১৪—১৯	৫৭'৪৩	৪৯'২৭
২০—৩০	৪৭'১১	২৬'২৪
৩১—৪২	২৭'৯৬	৩৭'৬৪
৪২ বছরের উপরে	৩৩'৫৭	৩৪'৪৪

অভিবাসীদের পরিবাহক্ষেত্র (catchment area)

উৎকলের অভিবাসীরা সমরূপে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বিহার বা উত্তরপ্রদেশের হিন্দিভাষীরা শহরের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জায়গায়—বিশেষত মধ্য কলকাতা ও ডক এলাকায় জোটবদ্ধভাবে বসবাস করছে। সমস্ত অভিবাসীদের মধ্যে বাঙলাভাষীদের আনুপাতিক হার অনেকদিন ধরে ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছে। পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের আগমন না হলে বাঙলাভাষীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ (minority) হয়ে যেত।

সমুৎসৃষ্ট (abandoned) রাজ্য অনুযায়ী শরণার্থীদের শতকরা হিসাব

		সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৯'২৭%	২৬২৬৯৫
পূর্ববঙ্গ	২৭'২৬%	১৮২৩৪৭
বিহার	২১'৮২%	১৪৫৯৩৭
উত্তরপ্রদেশ	৮'২১%	৫৪৮৯৭
ওড়িষ্যা	১'৭৬%	১১৭৫৮
মধ্যপ্রদেশ	০'০৬%	৪০৯
পাঞ্জাব	০'২৯%	১৯১৯
অন্যান্য রাজ্য	১'৩৩%	৮৯৪১
সর্বমোট	১০০'০০	৬৬৯৯০৩

ভাষাগতভাবে বস্তিচরিত্র দেশ অনুযায়ী অভিবাসী আগমনের তারতম্যের উপরেই প্রধানত নির্ভরশীল—এ কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হঠাৎ উদ্বাস্তু

আগমনে পুরনো বস্তিগুলির চরিত্র খুব একটা বদলায় নি। তার কারণ অধিকাংশ উদ্বাস্তুই টালিগঞ্জের জবরদখল কলোনিগুলির মতো নতুন বস্তিতে এসে বসবাস শুরু করেছে। পুরাতন বস্তিতে এরা স্থান পায় নি বলেই শেয়ালদা স্টেশনে, ফুটপাথে, গণিকা পল্লীতে বা নর্দমার উপরে মাচা করে তার উপরে তিন হাত উঁচু একটা ছাউনির তলায় (যাদবপুর অঞ্চলে রেল লাইনের ধারে ধারে এগুলো দেখা যাবে) কোনোও রকমে মাথা গুঁজে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

অভীবাসীদের বয়স ও ভাষাগত সমীক্ষার বিশ্লেষণ এই কথাই বলে যে বাঙলাভাষীদের সংখ্যা শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অপরপক্ষে হিন্দী, উর্দু ও ওড়িয়াভাষীদের মধ্যে মধ্যবয়সীদের আনুপাতিক উচ্চ হার এইটাই বোঝায় যে প্রধানত জীবিকার্জনের সম্মোহই এদের কলকাতার দিকে টেনেছে—কিন্তু বাঙলা ভাষা-ভাষীরা সে তুলনায় কিছুটা স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা করছে।

বর্তনাভাব (absence of means of subsistence), বাস সমস্যা, সমাযোজন (communication) সংকট ইত্যাদি অনেক কারণে অভিবাসীদের অনেকেই একক জীবন যাপন করছে। এই একক জীবনযাপনকারীদের মধ্যে অবাঙালীদেরই সংখ্যাধিক্য। এদের শহরের উপর কোনোও নাড়ীর টান নেই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে যারা দূরে ফেলে রেখে কলকাতায় আসে তাদের নগরোন্নয়নের দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রকল্পগুলিতে কতটা আগ্রহ থাকতে পারে? এই একক জীবনযাপনকারীদের "মাফলি" (ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত) বলে। মাফলিরা সকলেই পুরুষ এবং এদের অসামাজিক আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনোও শক্তি বা বলিষ্ঠ চেতনা বস্তীতে দুষ্প্রাপ্য। তা ছাড়া অভিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম থাকায় সামাজিক অপরাধপ্রবণতার ও অন্যায় আচার-আচরণের (বিশেষত শিল্পাঞ্চলের বস্তিগুলিতে) ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে।

শিক্ষাগতভাবে অভিবাসীদের চরিত্রায়ণ

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, যে সমস্ত অঞ্চল থেকে অভিবাসন হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের চেয়ে দেশান্তরিত শরণার্থীদের শিক্ষাগত মান সাধারণত বেশি—কিন্তু কলকাতাবাসীদের সাধারণ শিক্ষাগত মানের

বিচারে তাদের শিক্ষা অনেক নিম্নমানের। অভিবাসন সমীক্ষায় এই কথাই সমর্থিত হয়েছে যে গ্রামে যারাই কিছু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তারাই এখানে অভিবাসী হয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এরা কলকাতায় এসে আর শিক্ষাগ্রহণ করে না। অভিবাসীদের শিক্ষাগত মান সম্বন্ধে প্রত্যেক এলাকার আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি। তবু নিচের তালিকায় কলকাতার চারটি অঞ্চলের বস্তীবাসীদের সাধারণ শিক্ষাগত মান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। অভিবাসীদের মধ্যে প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ অতি অল্প কয়েকজনই আছে। বাকি সকলেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। কিছু কিছু অভিবাসী (পূর্ববঙ্গের বা পশ্চিমবঙ্গের) স্বচেষ্টায় বস্তিতে স্কুল করেছেন বা নিজেরাই নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন।

বালিগঞ্জ— কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪,
পার্ক সার্কাস— „ „ „ ৫৫, ৫৯, ৬০
এণ্টালি— „ „ „ ৪৭, ৫৬, ৫৭, ৫৮
কলুটোলা-মির্জাপুর „ „ „ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪

শিক্ষাগত মান	পার্ক সার্কাস		বালিগঞ্জ	
	জনসংখ্যা	শতকরা হার	জনসংখ্যা	শতকরা হার
অশিক্ষিত	২৩,৪৩০	৬৪·৮৬	১৬,৪৯২	৬৭·৩৯
শিক্ষিত কিন্তু প্রবেশিকা মানের নিচে	১১,৯৮১	৩৩·১৭	৭,৫৭৪	৩০·৯৫
প্রবেশিকা উত্তীর্ণ	৩৪১	০·৯৪	২৮০	১·১৪
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	৪৪	০·১২	২৩	০·০৯
হিসাব নেওয়া যায় নি	৩৩০	০·৯১	১০৪	০·৪৩
সর্বমোট	৩৬,১২৬	১০০·০০	২৪,৪৭৩	১০০·০০

শিক্ষাগত মান	এণ্টালি		কলুটোলা-মির্জাপুর	
অশিক্ষিত	৩৩২,৩৩	৬৯·২৫	৭০০৩	৬৫·৩৫
শিক্ষিত কিন্তু প্রবেশিকা মানের নিচে	১৩১,৯২	২৭·৪৯	৩৫০২	৩২·৬৮
প্রবেশিকা উত্তীর্ণ	৮০১	১·৬৭	১৪২	১·৩৩
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	৯০	০·১৯	১৩	০·১২
হিসাব নেওয়া যায় নি	৬৭২	১·৪০	৫৬	০·৫২
সর্বমোট	৪৭,৯৮৮	১০০·০০	১০,৭১৬	১০০·০০

অভিবাসের দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় অভিবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরতাও তত কমে যায় এবং নৈকট্য বৃদ্ধি পেলে বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক অধিবাসীদের চেয়ে ঐ সব অঞ্চল থেকে আগত অভিবাসীরা অনেক বেশি শিক্ষিত। মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী অভিবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরতা নেই।

যখন দেখি যে সমস্ত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ গ্রামের উন্নতির জন্য এগিয়ে যেতে পারত, উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং প্রেরণা দিতে পারত সেই সব মানুষই অভিবাসী হচ্ছে, তখন মনে হয় অভিবাসের ফলশ্রুতি মাত্র অভিবাসীদের সংখ্যা দিয়েই বিচার করা চলে না। এ এক অতি করুণ ট্র্যাজেডি। অভিবাসের গতি যখন এমন তীব্র তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন অর্থাৎ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বেকার সমস্যার সমাধান, উপযুক্ত ভূমি-পরিকল্পনা (land-planning) শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির দ্বারা গ্রামে প্রাণসঞ্চার করার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত মন্থর গতি-সম্পন্ন বলেই মনে হয়।

কলকাতার নাগরিক হিসাবে এই সব নিম্নমানের শিক্ষিত অভিবাসীরা স্থানীয় সংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না—সামাজিক মর্যাদায় তারা নিচের তলার মানুষ বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে—কি লৌকিক মর্যাদায়, কি আর্থিক আয়ের মাপকাঠিতে স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে তারা অনেক নিচের তলার মানুষ। যে সমস্ত শিল্পে নৈপুণ্য, মান-মর্যাদা, বা উচ্চ-আয় ইত্যাদির প্রশ্নগুলি জড়িত থাকে সেখানে পরদেশী অপেক্ষা স্থানীয় বাঙালীদের অগ্রাধিকারের ঝোঁকটি লক্ষণীয়।

নৈতিক মান এবং কায়িক যোগ্যতা

একটি সাম্প্রতিক নমুনা-সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে প্রতি ১০টি পদস্খলিত শিশু, অপরাধপ্রবণ যুবক, ভিক্ষুক, পণ্যাঙ্গনা, দুর্নীতিপরায়ণ কারবারি বা অন্যান্য অভব্য সমাজবিরোধীদের মধ্যে ৯ জনই পরদেশী। এই সব নীতি-জ্ঞানহীন পঙক্তিদূষক (social outcaste) সমাজবিরোধীদের বস্তিতে অভিবাসনের কারণ (১) শহরের বস্তিহীন অঞ্চলের পুরবাসী এবং উপপুর (suburb) ও গ্রামবাসীরা এদের ন্যায়বিরুদ্ধ কার্যকলাপের প্রতি অতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে; (২) বস্তির অন্যান্য পড়শীদের এদের সম্বন্ধে এমন

একটা পরহিতৈষী অবহেলা (Benevolent neglect) থাকে যে বস্তিতে অনায়াসে লুকিয়ে থেকে দুর্নীতিমূলক কাজ এরা করতে পারে।

পরিসংখ্যান না থাকলেও অভিজ্ঞতায় বলে যে বেশির ভাগ অভিবাসাই শক্ত সমর্থ—অন্তত আদি পুরবাসীদের চেয়ে এরা অনেক বেশি কষ্টসহিষ্ণু। এদের তাই দিন-মজুর, মালবাহী কুলী, রিক্সা ও ঠেলা চালক প্রভৃতির কষ্টসাধ্য কাজগুলি করতে দেখা যায়। যদি ক্রমবর্ধমান যন্ত্র-নির্ভরতার সঙ্গে (যথার্থ পরিকল্পনানুযায়ী) গ্রাম ও শহরের আর্থিক বিকাশে ভারসাম্য আনা যায় তাহলে হয়তো গ্রামের শক্তসামর্থ প্রগতিশীল মানুষেরা শহরাভিমুখী হবে না।

অভিবাসীদের নৈপুণ্য

নিপুণ শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে অভিবাসীদের বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এই সব নিপুণ শ্রমিকেরা অন্যান্য অভিবাসীদের চেয়ে উন্নত জীবনযাপনে সমর্থ। এদের বেশির ভাগই বস্ত্রশিল্পে (মাসিক গড় বেতন/আয় ৭২ টাকা) বা চর্মশিল্পে (মাসিক গড় বেতন/আয় ৬১ টাকা) নিযুক্ত আছে। আবার যারা ধাতুযন্ত্র বা ঐ জাতীয় অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের মাসিক গড় আয় হল ৮৪ টাকা। এদের সঙ্গে অনিপুণ শ্রমিক অভিবাসীদের আয়ের তফাত কতটা? যাদের নৈপুণ্য নেই তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ৬০ টাকার বেশি আয় করে।

সুদক্ষ শ্রমিকেরাই সাধারণত 'সর্দার' আখ্যা পায়। আনকোরা শরণার্থীদের জীবনে ক্ষমতালোভী বা দুর্নীতিপরায়ণ সর্দারদের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুনরা প্রভাবশালী পুরনোদের পদাশ্রিত (dependent) হতে বাধ্য। সর্দাররাই লোকজন দিয়ে এদের দেশ থেকে নিয়ে আসে। সর্দারদের মর্জির উপরই নির্ভর করে আহার বাসস্থান ও চাকরি পাওয়া। শ্রমিক সংস্থাগুলিতে এই সর্দারদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। কারখানা কর্তৃপক্ষের হয়ে এরা দালালি করে। অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে সর্দাররা অভিবাসীদের জীবনে গ্রামাঞ্চলের মহাজনের ভূমিকাও গ্রহণ করে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

পূর্ব ভারতের (১) সুবিন্যস্ত আঞ্চলিক উন্নয়ন; (২) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের মধ্যে প্রকৃত ভারসাম্য; (৩) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নগরোন্নয়ন ও

(৪) উন্নয়নের স্ট্রাটেজী বিজ্ঞানভিত্তিক না হলে কলকাতার বস্তিগুলোতে অভিবাসের এই দুর্বার আক্রমণ কমবে না। অভিবাসের এই অব্যাহত গতি—কলকাতার উপর এই অন্ধ মোহের কারণ (১) অনগ্রসর এলাকাগুলির অবহেলা (neglect) এবং (২) অঞ্চলগতভাবে পরিকল্পনাগুলির অসংলগ্নতা ও পরিক্ষিপ্ততা।

আজকের নববিধানে (new order of things) অভিবাসের এই এক-কেন্দ্রিক (এবং অদ্বিতীয়) সীমান্তে স্বাধীনতার ফলান্বেষণ নয়, সুখৈশ্বর্যের সম্মোহ বা লোভ নয়, উন্নত সমাজজীবনের বা স্বর্গসুখসম্পন্ন আবাসস্থলের হাতছানি নয়,—শুধু দু মুঠো অন্ন আর মাথার উপর একটুখানি ছাউনি—এই করুণ আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি এই অভিবাসন।

সমরেশ রায়

একটি আঙ্কিক সমস্যা ও চাঁদ

দোতলা বাসের উপরে যদি হেলিকপ্টারের মতো পাখা লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কেমন হয়? গড়ের মাঠ থেকে পাখা ঘুরিয়ে বাসগুলো আকাশে উড়ে যাবে। আকাশেও তাহলে ট্র্যাফিক পুলিশ রাখতে হবে, নইলে এতগুলো বাস নিশ্চয়ই ধাক্কাধাক্কি করবে। বোম্বাই-এর বাতিল-করা দোতলা ট্রামগুলোকে কলকাতায় চালালে কেমন হয়? রঞ্জন ভাবতে চেষ্টা করল দোতলা ট্রামের উচ্চতা ও রাস্তায় ঝুলে-থাকা ট্রামের তারের উচ্চতা কত? এবং কতখানি উঁচু করে এখনকার তারগুলোকে বাঁধতে হবে।

রঞ্জন তালু দিয়ে জোরে জোরে মুখ ঘসল। হাই তুলল। চারপাশে আধো-অন্ধকারে গাছের ছায়ায় অনেক মানুষ। এবং মানুষী। কান পাতলে হয়তো কথার গুনগুন গুঞ্জন শোনা যাবে। রঞ্জনের আবার হাই তুলতে ইচ্ছে হল। কারো জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করাটা অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ। হাই-এর কথা মনে হলেই হাই তুলতে ইচ্ছে করে। নিজের ক্ষেত্রের এই সত্য অন্যের ক্ষেত্রেও সত্য কিনা, এ কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করে নি। তার সামনে কেউ হাই তুললেই রঞ্জনেরও হাই ওঠে।

বাঁ হাত চোখের সামনে এনে রঞ্জন সময় দেখতে চাইল। যে-সময় অবধি অপেক্ষা করার কথা, সেটা পার হয়ে গিয়েছে কি না, এবং সে কতক্ষণ অপেক্ষা করছে, সেই হিসেব করার জন্য সে ঘড়ি দেখতে চাইল। কিন্তু অন্ধকারে বুঝতে পারল না। আর অন্ধকারে সময় বুঝতে না পারা মুহূর্তের জন্য ঘড়ি দেখার ইচ্ছেকে প্রবল করল। অপেক্ষা করে করে রঞ্জন ক্লান্ত। এই ক্লান্তি থেকে বাঁচবার জন্যই রঞ্জন এই নির্দিষ্ট স্থান থেকে বের হতে চায়। হঠাৎই রঞ্জন চমকে গেল। আমি কি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি? অপেক্ষার শ্রান্তি, না ভালোবাসার শ্রান্তি? রঞ্জন চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। এবং দেশলাই জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখার জন্য

পকেটে হাত দিল। দেশলাই-এর কথা মনে হতেই তার সিগারেট খাবার ইচ্ছে হল। এখানে আসবার পর রঞ্জন একটাও সিগারেট খায় নি, এই সত্য মুহূর্তের মধ্যে তার অপেক্ষার সময়কে দীর্ঘতর করে তুলল। রঞ্জনের মনে হল এখন তার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অপেক্ষান্তে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল। এবং ঘড়ি থেকে নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থন চাইল। পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বের করতে করতে রঞ্জন আবিষ্কার করল যখন সে ঘড়ির কথা ভেবেছে তখন সিগারেটের কথা ভাবে নি; আর যখন সিগারেটের কথা ভেবেছে তখন ঘড়ির কথা ভাবে নি।

দেশলাই জ্বালিয়েই প্রথমে ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর সিগারেট ধরাল। দেশলাই-এর কাঠিতে আগুন লাগার মুহূর্ত থেকে রঞ্জন কিছু ভাবে নি। আলগোছে ঘড়িতে চোখ রেখেছে, সিগারেট ধরিয়েছে এবং কাঠিটা নিবিয়ে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র দেখা সময়ের কথা মনে পড়েছে। অপেক্ষার নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও অপেক্ষান্তে ক্লান্ত হয়ে চলে যাবার সময় এখনও আসে নি। অথচ সে এত অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে রঞ্জন আকাশে তাকাল। এবং প্রথমেই চাঁদের দিকে চোখ পড়ল। প্রায় গোলাকার—পূর্ণিমা আসছে অথবা পার হয়ে গিয়েছে—পৃথিবীর এই উপগ্রহের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় নিষ্প্রভ অন্যান্য তারাগুলোকে দেখে বিস্মিত হল। তারাগুলোকে কেমন সর্বহারা সর্বহারা দেখাচ্ছে। অথচ এই চাঁদ থেকে অন্যান্য তারাগুলো বহুশত গুণ বড়। কিন্তু যেহেতু সেগুলো পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে, সেইহেতু তাদের আলো সূর্যের আলোয় আলোকিত এই উপগ্রহের আলোর কাছে নিষ্প্রভ। রঞ্জন বিজ্ঞানের বই-এর ভাষায় কথাগুলো ভাবল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকল। চাঁদ একটি বুড়ি। বসে বসে চরকা কাটছে।

চাঁদ একটি বুড়ি, সে বসে বসে চরকা কাটে। ছোটবেলায় হাওয়ায় উড়ে আসা কাশফুলকে চাঁদের চরকায় কাটা সুতো বলে রঞ্জনরা ধরত। আর প্রতিদিন চাঁদের কালো দাগের দিকে তাকিয়ে মাকে ব্যস্ত করত। মা বলতেন, ওটাই চাঁদবুড়ি। আর মাঝে মাঝে মা চাঁদের টিপ পরিয়ে দিতেন একটা বিশেষ ছড়া বলে। রঞ্জন লজ্জা পেত। মা যখন ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেতেন নিজের অজান্তেই রঞ্জন চোখ বুজে ফেলত। রঞ্জন মনে মনে

হাসল। সত্যিই দিনরাত্রির চরকায়, চাঁদ দিনরাত স্থতো কাটছে। সময়ের স্থতো। আর অদৃশ্য সেই স্থতোর জাল আমাদের আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। কথন, কেমন করে আমরা জানি না।

প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে জেগে এই যুবক চিৎ হয়ে শুয়ে, মশারীর চালের দিকে তাকিয়ে থাকে। মশারীর চালটা অস্বাভাবিক উঁচু। বানাবার সময় দর্জি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, রঞ্জন মশারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে কিনা। সেই মুহূর্তে রঞ্জন স্ব-প্রস্তাবিত পরিকল্পনার উপরে চোখ বোলায়। অথচ প্রাত্যহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, সমস্ত দিন একটি বদ্ধ জলার মতো বদ্ধ ঘরের মধ্যে, দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার আবহাওয়ায় বাঁচার, বাঁচাবার ও ভবিষ্যতের সেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের আশায় অতিবাহিত করে প্রত্যেক দিন পূর্বদিনের চেয়ে আরো বেশি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে। এবং প্রত্যহ ক্লান্তি, অপমান ও ঈর্ষার শেষে, শেষ বিকেলের অগভীর আলো থেকে প্রথম রাত্রির গভীরতর অন্ধকারে ভালোবাসার স্বাদ নিয়ে বাঁচতে চায়। দিনের শেষে যে-হতাশা—যার কারণ রঞ্জনের কাছে স্পষ্ট নয়—সে অর্জন করে, তা থেকে ভালোবাসার সমুদ্রে অবগাহন করে বাঁচতে চায়। ফলত যে-যুবতী তাকে ভালোবাসার পুষ্পক রথে এই গ্লানি থেকে উদ্ধার করতে আসে, যাকে প্রথম সন্ধ্যার বিলম্বিত অন্ধকারে কাছে পেতে রঞ্জন ব্যাকুল হয়, তার দেরিতে অধীর হয়। রঞ্জনের এই মানসিক চঞ্চলতা—অপেক্ষা, অপেক্ষায় ক্লান্তি বোধ, ঘড়ি দেখা, সিগারেট খাবার ইচ্ছা এবং চাঁদ একটি বুড়ি, সে বসে বসে চরকা কাটে ইত্যাদি ভাবনার সিঁড়িগুলোয় ওঠানামা করছিল। রঞ্জন অস্থির হচ্ছিল।

দূরে আলোকিত রাস্তায় মোটরের শব্দ। রঞ্জন সেই দ্রুত চলমান জীবনের শব্দকে কানে নিয়ে আকাশ ও মাটি একসঙ্গে দেখতে চাইল। বৃক্ষবিরল এই শহরের, দুর্লভ এই বৃক্ষ উদ্যানে সে গাছ দেখল। এবং পাতার সবুজ রঙ। সবুজ রঙটা সে কল্পনা করে নিল। কারণ শেষ বিকেলের অগভীর ছায়ার পথ বেয়ে, আলোকিত দিনের একটি উজ্জ্বল স্মৃতি এঁকে রেখে, অস্থির পথ পরিক্রমায় পৃথিবী অগ্রসর হয়েছে। এবং প্রাত্যহিক নিয়মে একটি-দুটি তারা, গোলাকৃতি চাঁদের উজ্জ্বলতায় একটি রাত্রির সম্ভাবনা নেমে এসেছে। সেই অন্ধকার ইত্যাদির স্রোতে এই গাছের অবয়ব, সবুজ রঙ, রঞ্জনের অন্যমনস্কতার স্থযোগেই যেন নিমজ্জিত।

রঞ্জনের হঠাৎ মনে হল যে অনেক দিন জোনাকী দেখে নি। এক সময় মাঠভরা জোনাকী আমাকে পথ দেখাত। এই মুহূর্তে সমস্ত আলোর চিহ্ন মুছে নিয়ে যদি আদিম অন্ধকারের বন্যা নামে, সেই অন্ধকারের মধ্যে যদি আমার আত্মার মতো কোটি কোটি জোনাকীর জ্বলা-নেবা দেখতে পেতাম!

এই নির্জনতা, আকাশ, জোনাকী ও ভালোবাসার সন্ধানে রঞ্জন একনিষ্ঠ। বারংবারের ব্যর্থতাজনিত আঘাতও রঞ্জনকে নিরস্ত্র করতে পারে নি। কারণ এগুলো তার অন্যতম আশ্রয়। এই নির্জনতা, আকাশ, জোনাকী, ভালোবাসা এগুলো একই সঙ্গে রঞ্জনকে কেন্দ্রে রেখে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। রঞ্জন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কোলাহলের তীব্রতায় দিশাহারা। প্রতি মুহূর্তে সহস্র মানুষের কণ্ঠস্বর, মোটর বাস ট্রামের শব্দতরঙ্গ নির্জনতার সমুদ্র থেকে রঞ্জনকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। বিপরীত স্রোতে অবিরাম সাঁতার কাটতে কাটতে রঞ্জনের সারা দেহ ব্যথিত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সকালে উঁচু করে বাঁধা মশারীর চালের দিকে তাকিয়ে, রঞ্জনের প্রায়ই আকাশ দেখবার ইচ্ছা হয়। অথচ সমস্ত দিনের কর্মপ্রবাহের আবর্তে আবর্তিত রঞ্জন কোনো সময়ই সচেতনভাবে আকাশের দিকে তাকায় না। রঞ্জন যেন ক্রমশ আকাশের কথা ভুলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে রঞ্জন স্বাতীকে ভালোবাসে। প্রায় নিয়মিত, বিকেল ও সন্ধ্যা তারা একসঙ্গে কাটায়। মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখে। সুযোগ ও সাহস সঞ্চয় করতে পারলে দেহ স্পর্শ করে। এবং প্রায়ই রাত্রে ঘুমোবার আগে, এই ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে যায়। আর আশ্চর্য, প্রায়ই স্বাতীর কথা ভেবে রাত্রি এবং নিজের মানসিক কামনার তাড়নায়, রঞ্জন ভাবে এবার স্বাতীকে সে বিয়ে করবেই। অথচ সকালে ঘুম ভেঙেই, অত্যন্ত ছোট বাড়িতে অনেক মানুষের কোলাহলে সে নির্বাক হয়ে যায়। সাংসারিক প্রয়োজনের বিরাট খাদের পাশ দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁটতে থাকে। রঞ্জন এই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারে না। সে সাহস তার নেই। অথচ এই খাদটাকে অস্বীকারও করতে পারে না। প্রতিক্ষণের উপস্থিতিতেই এই খাদটা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। যে মধ্যরাত্রির নির্জনতা তাকে বিয়ে করবার সাহস ও মানসিক অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল তা তখন পলাতক। প্রত্যেক দিন সকালে, মধ্যরাত্রের সাহস ও নির্জনতা দিনের উজ্জ্বলতায় হারিয়ে ফেলে রঞ্জন ইদানিং নিজের মধ্যে এক নতুন ভাবনার অবস্থিতি লক্ষ করছে। এবং প্রতিদিন এই

নতুন ভাবনার সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে, যখন অফিসের বদ্ধ জলাতে ডুব দেয় তখন নিঃশ্বাস নিতে পারে না। মনে হয় কেউ যেন তার গলায় পাথর বেঁধে এই ডোবার মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আর এই অবগাহনের শেষে ঘৃণা করে, ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করে হঠাৎ কোনো বিকেলে এই সুন্দর ও নগণ্য সন্ধ্যাকে পায়, ভালোবাসাকে পায়।

এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে স্বাতী শুধু আশা করেছে। রঞ্জন পাশ করল। স্বাতী আশা করেছে। রঞ্জন চাকরি নিল। স্বাতী আশা করেছে। রঞ্জন চাকরিতে স্থায়ী হল। স্বাতী আশা করেছে। অথচ এত দিনের মধ্যে একবারও স্বাতী রঞ্জনকে বিয়ের কথা বলে নি। কিন্তু এই কিছু না বলা, এবং মাঝে মাঝে দু-একটা বাক্য বা বাক্যাংশ শুনে রঞ্জন বুঝতে পারে এই দীর্ঘ ভালোবাসার পথটা দৌড়ে দৌড়ে স্বাতী এখন একটু বিশ্রাম চায়। দীর্ঘ দৌড়ের পর পথ শেষের সংকেত সেই সুতোটাকে স্বাতী ছুঁতে চাইছে। স্বাতী এখন ক্লান্ত। স্বাতী এখনও দৌড়চ্ছে। জোরে জোরে বাতাস নিচ্ছে বুকে। হাঁফাচ্ছে। মুখটা অস্বাভাবিক লাল। স্বাতী ক্লান্ত হচ্ছে। সেই সুতোটাকে ছুঁতে স্বাতী এখন ব্যাকুল যেটা ছিঁড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আলো সানাই আর পথ শেষ করতে পারার আনন্দ। অথচ রঞ্জন সেই সুতোটাকে কিছুতেই এগিয়ে আনতে পারছে না। রঞ্জন বীর নয়। কিন্তু বীর হতে চায়। রঞ্জন জানে স্বাতী দেবী হতে চায়। কিন্তু দেবী নয়।

স্বাতী যেন কেমন হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সেদিন সিনেমা থেকে বেরিয়ে ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিল। নির্জন কেবিনে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের চুমু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। মুখের দিকে তাকানো, চুমু খাবার ইচ্ছে হওয়া এবং চুমু খেয়ে মুখ সরিয়ে আনা, এর মধ্যে রঞ্জন আর কিছু চিন্তা করে নি। রঞ্জনের সমস্ত উত্তেজনা এই একটি মাত্র দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুমুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। অধিকতর উত্তেজিত রঞ্জন হঠাৎই স্বাতীকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়েছিল। টেবিলে উপুড় হয়ে স্বাতী কাঁদছিল।

: কি হয়েছে? স্বাতী? এই?

: কিছু না।

: কাঁদছ কেন?

: এমনি। স্বাতী উঠে বসেছিল। সোজা হয়ে। আঁচলে মুখ মুছে,

চুল ঠিক করে, ভেজা চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য ভাবে হেসেছিল। আর বোকার মতো রঞ্জন আবারো জিজ্ঞেস করেছিল।

: কি হয়েছে?

: এ ভাবে আর ভালো লাগে না।—স্বাতীর চোখে তখনও সেই আশ্চর্য হাসি। স্বাতী আর একটি কথাও বলে নি। রঞ্জন বুঝতে পারে স্বাতী এমনি করেই মাঝে মাঝে কাঁদবে; অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; আর রঞ্জন, প্রতিদিন রাত্রিতে বিয়ের প্রতিজ্ঞা করে, সকাল বেলার রোদ্দুরে, অনেক মানুষের কণ্ঠস্বরে এই প্রতিজ্ঞার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাবে না।

স্বাতীর সেই অনেক প্রস্তুতির পর উচ্চারিত বাক্য, ক্লান্তির প্রকাশ, রঞ্জনকে তাড়া করে ফিরছে। দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের মধ্যে সেই বাক্যটি নানা ভাবে গীত সংগীতের সুরে সুরে রঞ্জনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রঞ্জন নিজেকে এই সংগীতের সুরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চায়। নিজেকে চিড়িয়াখানায় দেখা সেই অবিরত পায়চারি করতে থাকা বিরাট হিমালয় ভাল্লুকের মতো মনে হয়। আমার সামনে হিমালয়ের স্বপ্ন আছে, পথ খোঁজা আছে, কিন্তু সেই পথে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো সাহস নেই। কারণ রঞ্জন বীর নয়।

অথচ রঞ্জন ভালোবাসাকে বুকে নিয়েই তার কর্মজীবন শুরু করেছিল। মনে ভেবে রেখেছিল চাকরি পাওয়া মানেই তার ভালোবাসাকে অর্থনৈতিক আশ্রয় দেওয়া। এই ভালোবাসার জন্যই রঞ্জন বদ্ধতা ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে পারে। অথচ স্বাতীকে বিয়ে করবার মতো সাহস সে দিনের ঔজ্জ্বল্যে সংগ্রহ করতে পারছে না। অথচ স্বাতীকে কাছে পাবার ইচ্ছা দিন দিন দুর্বার কামনায় পরিণত হচ্ছে। রঞ্জন বোঝে একটি মেয়ের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে গড়ে-ওঠা ভালোবাসা দৈহিক কামনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং ইদানিং স্বাতীকে চুমু খেতেও রঞ্জনের ভয় হয়। অথচ প্রায়শই স্বাতীকে বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছা তাকে ব্যাকুল করে। সেই নিশ্চিত নির্জনতার সন্ধানে রঞ্জন আকুল। তাই মাঝে মাঝে এই শহরকে আদিম অন্ধকারের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চায়। তার মধ্যে কোটি কোটি জোনাকী। আর নির্জনতা। (আহ্ ভালোবাসায় এত পরিশ্রম।)

যে-পরিমাণ সাবধানতা ও ভীরুতা থেকে রঞ্জন পারিবারিক প্রয়োজনের খাদটাকে এড়িয়ে চলে, সেই একই প্রকারের মানসিকতা রঞ্জনকে

ভালোবাসার সমস্যা ও চিন্তা থেকে এই মুহূর্তে সরিয়ে আনল। রঞ্জন আকাশ দেখল। আ—কা—শ। চাঁদের আলোয় নিষ্প্রভ তারা দেখল। তা—রা। চাঁদ দেখল। চাঁ—দ। স্বাতী আসে নি। চাঁদটা প্রায় গোল। এত জ্যোৎস্না। আমি মানসিক ও দৈহিক কামনার দ্বারা তাড়িত। দৈহিক ও মানসিক। চাঁদ একটি উপগ্রহ। পৃথিবী একটি গ্রহ। সূর্যের আলোয় আলোকিত। পৃথিবীর গা বেয়ে পিঁপড়ের মতো চলতে চলতে, প্রতি মুহূর্তে পতনকে এড়িয়ে আমি বেঁচে আছি। ভালোবাসছি। স্বাতী আমার ভালোবাসা। স্বপ্নের আকস্মিক বিচ্ছিন্নতায় আমি চমকে উঠি। ভয় পাই। রঞ্জন অকারণে ভয় পেল। নিজেকে শান্ত করতে চাইল। আমি অপেক্ষা করছি। স্বাতী। বিবাহ। নির্জনতা। এই আকাশ। এবং আবার চাঁদ।

রঞ্জন স্বাতীর আসাব সম্ভাবনা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হল, এবং অপেক্ষার যুক্তিযুক্ততায়। কিন্তু নির্জনতাহীন শহরের, এই নির্জনতা ও বৃক্ষশোভিত অপেক্ষার স্থান থেকে উঠতে পারল না। এটা আমার সংকেত স্থান। আমি অভিসারে বেরিয়েছি। স্বাতী এখনও এই সংকেত স্থানে এসে পৌঁছুচ্ছে না কেন? আমরা সবাই অভিসারে বের হয়েছি। সবাই। স্বাতী আজ আসবে না। আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে। এখুনি উঠতে ইচ্ছে করছে না। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে। কেমন একটা শ্রান্তি। কমলসম পদতল। স্বাতী আসবে না; আসবে না। না।

রঞ্জনের মনে স্বাতীর জন্য অপেক্ষার ক্লান্তি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, একটি যুবতীর পাশে কর্মকোলাহলমুখর এই শহরের এক প্রান্তে, অথবা মধ্যস্থলে, দুর্লভ বৃক্ষ-উদ্যানের নির্জনতা—বহু আকাঙ্খিত নির্জনতা—স্বাতীকে কাছে পাবার কামনা ও ইচ্ছার জ্বালা তাকে উত্তেজিত করল। একই সঙ্গে ক্লান্ত। রঞ্জন বসে রইল। উত্তেজনা ও ক্লান্তি তাকে অবশ করল। পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে। এই নিঃসঙ্গ ও একক রঞ্জন সঙ্গী খুঁজল। আকাশ চাঁদ ও রঞ্জন নামক যুবককে সঙ্গী করে সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। কপালে হাত রাখল। এ হাতটা স্বাতীর হলে আরো ভালো লাগত। আর হাতটা তৎক্ষণাৎ করতল হয়ে যেত।

রঞ্জন ভেবে রেখেছিল চাকরি পাওয়ামাত্র বিবাহ করবে। রঞ্জন যা আয় করবে তা তাদের উভয়ের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত হবে। ফলে স্বাতীর

আগমনের ফলে পারিবারিক অর্থনীতিতে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না। এবং সেও বিবাহ করবার আর্থিক ও পারিবারিক যোগ্যতা পাবে। অথচ রঞ্জনের চাকরি নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। এবং সেই ঘটনাগুলো পরিবারে গভীর আলোড়ন তুলল। যার ফলে সবাই-ই 'ভাগ্যিস রঞ্জু চাকরি পেয়েছিল।' এমনতর অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। রঞ্জনও সেই মুহূর্তে, নিজেকে পরিবারের ত্রাণকর্তা ভেবে আত্মসুখ লাভ করেছিল। অতএব রঞ্জন একদিন আকস্মিক লক্ষ করল তার সরবরাহিত অর্থ অনেক আগেই বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। এবং পরিবারের প্রয়োজনের গর্ত ভরিয়ে স্বাতীর জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকছে না। আগে সম্মিলিত অর্থসেচনে পারিবারিক চৌবাচ্চার জল যে বিশেষ দাগ অবধি উঠত, রঞ্জনের চাকরি নেবার পরও সে দাগ ছাড়িয়ে যাচ্ছে না। ফলে স্বাতীকে ঘরে আনবার আর্থিক যোগ্যতা রঞ্জন পাচ্ছে না।

অথচ রঞ্জন নিজে মুখ ফুটে বাড়িতে বিবাহের ইচ্ছা জানিয়েছে। বৌদিকে—মাকে, নানা ভাবে নিজের ইচ্ছার কথা বলেছে। আর আশ্চর্য রঞ্জন যাঁদের এ ব্যাপারে সবচেয়ে সহায়ক ভেবে রেখেছিল তাঁরাই এই মুহূর্তে বিবাহের বিরোধিতা করেছে। আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে বলেছে। বৌদি দাদার নানান্ অসুবিধার কথা, মা বাবার ও বড় ছেলের নানান্ সমস্যার কথা রঞ্জনের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং 'একটু বুঝে দেখ্ বাবা' 'একটু চিন্তা করে দেখ ঠাকুরপো' ইত্যাদি অনুরোধের সামনে এ পরিবারের বর্তমানের ত্রাণকর্তা রঞ্জন অসহায় হয়ে পড়েছে।

এই আর্থিক অযোগ্যতা প্রতি মুহূর্তে রঞ্জনকে অসহায় করে তুলছে। এ ভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও প্রয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকলে কোনো এক সময় হঠাৎ আবিষ্কৃত হবে যে-ভালোবাসা তাকে এতদিনের যুদ্ধ করবার সাহস জুগিয়েছে সেই ভালোবাসাও রঞ্জনের কোনো অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগে এই প্রয়োজন ও পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নিজেকে চারিদিক থেকে আক্রান্ত দেখে রঞ্জন পালাতে চাইল। চাঁদ। আকাশ। তারা। পাতার রঙ এখন বোঝা যাচ্ছে না। সবুজ রঙটা কেমন। এই অন্ধকার। অন্ধকারের বন্যা। তার মধ্যে আমার আত্মার মতো জোনাকী। আর আদিম নির্জনতা। রঞ্জন নির্জনতা শব্দটি অত্যন্ত সাবধানে মনে মনে আবৃত্তি করল। যেন এই চারটি অক্ষর জোরে, একটু জোরে

উচ্চারিত হলেই, এই শব্দটি তার অর্থ হারিয়ে ফেলবে। আর তখন মনে হবে, আমি কি যেন জানতাম, এখন জানি না, ভুলে গিয়েছি, কি যেন একটা কথা ; আহারে নির্জনতা।

গত রাত্রে রঞ্জন একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখে রঞ্জনের ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মুহূর্ত থেকে, স্বাতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই রঞ্জন বুঝতে পারছিল যে সে স্বপ্নই দেখছে। রঞ্জন সুনীলদের বাড়িতে গিয়েছে। (সুনীল রঞ্জনের বাল্যবন্ধু)। মমতার সঙ্গে কথা বলছে। (মমতা সুনীলের ছোট বোন। রঞ্জন তাকে খুব কম বয়স থেকে দেখছে)। হঠাৎ রঞ্জন, কথার মাঝখানেই মমতাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে চাইল। মমতা হেসে হেসে মুখটা সরিয়ে নিচ্ছে। রঞ্জন মমতার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে তীব্র আবেগে চুমু দিচ্ছে। এবং স্বপ্নের মধ্যেই, ঘুমের মধ্যেই মমতার মুখটাকে স্বাতীর মুখ করতে চাইছে। রঞ্জন প্রাণপণে ভাবতে চাইছে, এটা মমতার মুখ নয়, স্বাতীর মুখ। স্বপ্নেও মমতাকে চুমু খাওয়া উচিত নয়। এর পরেই, এই প্রচণ্ড চেষ্টার পরিশ্রমে রঞ্জনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এবং সেই মুহূর্ত থেকেই রঞ্জন নিজেকে পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছে। আমি স্বাতীকে ভালোবাসি বলেই, স্বপ্নে মমতার মুখকে স্বাতীর মুখচ্ছবিতে পরিণত করতে চেয়েছি। অথচ পারি নি। আমার পরাজয়। আমার ও স্বাতীর সম্পর্ককে আমি বিয়ের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি নি। আমার ভীরুতা, পরিবারের ও পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণের ঝোঁকই আমাকে বাধা দিচ্ছে। রঞ্জন স্বাতীকে ভাবতে চেষ্টা করল। অপেক্ষা—ক্লান্তি—ঘড়ি—স্বাতীর না আসা—সিগারেট—দেশলাই এগুলো সিগ্রেট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো একবার রঞ্জনকে ঘিরে নেচে গিয়েছে। স্বাতীর না আসার কথা রঞ্জন ভাবতে চেষ্টা করল। 'আমি স্বাতীকে ভালোবাসি' আর একবার মনে মনে উচ্চারণ করল। অনেক অনেক বার উচ্চারিত এই বাক্যটি তার তীক্ষ্ণতা ও অর্থ হারিয়ে ফেলেছে কি না রঞ্জন যেন সেটা আবিষ্কার করতে চাইছে। এহেন অবস্থায় রঞ্জন দেখল সে একটা পাথরের মূর্তি হয়ে একটা বিরাট চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে রঞ্জন বৈজ্ঞানিক একনিষ্ঠতায় মূর্তিটার জলে ডোবা লক্ষ করল। এবং পাথরের মূর্তিটা জলে নামবার আগে চৌবাচ্চার জলসীমা যে অবধি ছিল সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এই পাথরের মূর্তির

জলে ডোবার পর জলরেখা কতখানি বাড়ে অথবা উপছে পড়ে কৌতূহলী হয়ে সেদিকে লক্ষ রাখল। এই উপছে পড়া জলকে ওজন করলেই পাথরের মূর্তির ওজন বের করা যাবে। ফলে রঞ্জন নামক যুবকের, যে এই মুহূর্তে পাথরের মূর্তি, তার আর্থিক ওজনও বের করা যাবে। রঞ্জনের ঠোঁটে আবিষ্কারের পূর্ব মুহূর্তে ইপ্সিত ফল লাভের বিশ্বাসে বৈজ্ঞানিকের ঠোঁটের স্বর্গীয় হাসি। রঞ্জন আনন্দে চিৎকার করে এই আবিষ্কারকে স্বাগত জানাবার জন্য তৈরি হয়ে থাকল। সেই পাথরের মূর্তিটা ধীরে ধীরে, ডুবতে ডুবতে, চৌবাচ্চার তলদেশে শায়িত হবার পরও, রঞ্জন জলরেখার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও না দেখে হতাশ হল। নিজের আর্থিক ওজন সে বের করতে পারল না। পাথরের সেই মূর্তিটার ঠোঁটে তখনও আশ্চর্য হাসি লেগে আছে।

রঞ্জন কপালের ঘাম মুছল। পরিশ্রমে শ্রান্ত রঞ্জন নিজের উপযুক্ত অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ভীত হল। অথচ মুকুটের সোনায় খাদের পরিমাণ এই ভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। রঞ্জন নিজেকে প্রশ্ন করল। তাহলে কি এই পাথরের মূর্তিটার কোনো ওজনই নেই! জলের থেকেও হাল্কা। তাহলে ডুবে গেল কেন? রঞ্জন আবিষ্কার করল চৌবাচ্চাটা তাদের পারিবারিক সম্মিলিত অর্থকেবেলের। রঞ্জন ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাল। এবং এই পাথরেব মূর্তিকে বিশ্লেষণ করতে লাগল।

এই পাথরের মূর্তি একটি যুবকের। এর নাম রঞ্জন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মৈত্র। আদি বাড়ি পাবনা; গ্রাম সোনাপদ্মা। গোত্র কাশ্যপ। বয়স সাতাশ আঠাশ অথবা উনত্রিশ। (রঞ্জন দু-হাতে কপাল টিপে ধরল)। এই যুবকটি বর্তমানে একটি আধা সরকারী অফিসের মধ্যম স্তরের কর্মচারী। আয়কর দিতে বাধ্য থাকে। এবং প্রতি মুহূর্তে বাধ্য হয়ে অত্যন্ত হিসেব করে চলে। সিনেমা থিয়েটার বা অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ভাবে হিসেবী। তার একমাত্র নেশা সিগারেট। সবচেয়ে কম দামের ভদ্রলোকের সিগ্রেট সে খায়। কারণ তার সমস্ত মাসের শ্রম বিক্রয়ের পরিবর্তে সে যে-পারিশ্রমিক পায়, তার সাহায্যে পারিবারিক প্রয়োজন ও মোট আনীত অর্থের বাস্তব অবস্থিতির মধ্যবর্তী বিরাট ফাঁক ভরাট করা যায় না। অথচ এই রঞ্জন, প্রতিদিন আধা সরকারী অফিসের অত্যন্ত বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে হাঁসফাঁস করে। অনেক মানুষের নিঃশ্বাসে ভারী বাতাস বুকে টানে। এবং বাঁচতে ও বাঁচাতে চায়। অথচ এই যুবক পাঁচ

বৎসর ধরে একটি মেয়েকে ভালোবেসে একমাত্র আর্থিক যোগ্যতা অর্জনের অভাবেই বিয়ে করতে পারছে না। এবং তার মূল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, তার পারিশ্রমিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে।

রঞ্জন সোজা হয়ে বসল। অত্যন্ত জটিল একটি অঙ্কের সঠিক সমাধান বের করতে পারলে যে-তৃপ্তি লাভ করা যায়, পাথরের মূর্তির ওজনহীনতা আবিষ্কার করতে পেরে সেই রকম আত্মতৃপ্ত রঞ্জন একটা গ্রাফ কাগজে খুব মোটা করে কয়েকটা রেখা টানল। কালো কালিতে ভরাট করে। রঞ্জন তার মাইনে —পারিবারিক প্রয়োজন—বর্তমান মূল্যমান—রঞ্জনের দেয় আয়কর—ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সেই রেখাগুলোকে চিহ্নিত করা হল। এই কাগজটিকে রঞ্জন সামনে ঝুলিয়ে দিল। রঞ্জনের মনে এই মুহূর্তে ইডেন গার্ডেনের বিরাট ক্রিকেট স্কোর বোর্ডের ছবি। রঞ্জনের হাতে সুতো, যেগুলোর সাহায্যে কাগজের গায়ের রেখাগুলোকে বাড়ানো-কমানো যাবে। রঞ্জন সুতোর সাহায্যে মাইনের রেখাটাকে একটু বাড়াতেই দেখল অন্যান্য রেখাগুলোও সমতালে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য রেখাগুলোকে বাড়ালেও মাইনের রেখাটা বাড়ছে না। আর স্বাতী নামের যে-রেখাটি সমস্ত ছকটাকে ঘিরে আছে সেটা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই মূল্যমান—পারিবারিক প্রয়োজন—এবং রঞ্জনের মাসিক আয়, এগুলোকে মেলানো যাচ্ছে না বলেই, পারিবারিক চৌবাচ্চার জলের বাস্তব ও আকাঙ্খিত অবস্থিতির মধ্যে যে ফাঁক তা পূর্ণ হচ্ছে না। এবং এরই ফলে রঞ্জনকে প্রতিদিন রাত্রিতে নির্জনতা থেকে সাহস সঞ্চয় করে স্বাতীকে বিয়ে করবার কথা চিন্তা করতে হয়। এই সাহস আলোকিত ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দিতে পারে না। এরই ফলে রঞ্জনের দিন ও রাত্রির, সাহস-প্রতিজ্ঞা ও ভীরুতা-অসহায়তার মধ্যে যে ফাঁক তাকেও ভরাট করা যাচ্ছে না। যে-সাহস দিনের আলোর দেওয়া উচিত তা তাকে রাত্রির পলায়নী অন্ধকার থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ফলে রঞ্জন-স্বাতীর ভালোবাসার লক্ষ্য ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এই পশ্চাদপসারণকে থামাবার জন্য রঞ্জনেরা প্রতি মুহূর্তে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অথচ তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে অসহায় করে সেই স্বপ্নে রঙিন রক্তিম দিন দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

কাগজে আঁকা রেখাগুলোর মধ্যে সমতা আনতে না পেরে রঞ্জন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। এবং তার চাকরি-পরিশ্রম-মজুরী ইত্যাদির উপর বিশ্বাস হারাতে লাগল। প্রতিটি বিন্দুতে একজন অংশীদার হয়ে রঞ্জন দেখল তাদের

ভালোবাসার পশ্চাদ্‌পট বিরাট ও ব্যাপক। এই ব্যাপকতা কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে বিহ্বল করে দিল। সারাদিন মনে মনে স্বাতীর জন্য কাতর রঞ্জন আবিষ্কার করল, এতক্ষণ এই বৃক্ষ উদ্যানের নির্জনতায় যে-মেয়েটির জন্য সে অপেক্ষা করেছে সে যেন একটা বন্ধুর সমতলক্ষেত্রের উপর একটি বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সেখানে পৌঁছুতে হবে। রঞ্জন মনে মনে দূরত্বটা মেপে নিতে চাইল।

পলাতক নির্জনতাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে ফাঁদে পড়া বেড়ালের মতো সে উঠে দাঁড়াল। গাছের আবেষ্টনী থেকে সরু রাস্তায় এলো। তার সামনে পাড় বাঁধানো এবং কলাবতী ফুলের গাছে ঘেরা একটি পুকুর। চাঁদের আলোয় পুকুরটা, পাড়ের কলাবতীর ঝাড় ইত্যাদি সব কিছুকেই রূপকথা রূপকথা বলে মনে হচ্ছে। রঞ্জনের পাশে ঘোড়ায় চড়া এক সেনাপতির কালো রঙের মূর্তি। এই মূর্তির সঙ্গে সমকোণে অনেকটা দূরে একটি স্মৃতি-মন্দির। আমি ঐ স্মৃতি সৌধের ভিতরে কোনোদিন যাই নি: ঐ মূর্তিটা কার? স্বাতী আজ এলো না? আমি চৌবাচ্চার আঁক মেলাতে পারি নি। রাত্রি চাঁদ নির্জনতা জোনাকী এবং নির্জনতা জোনাকী স্বাতীর কান্না আমার মেয়ের নাম কি রাখব বিয়ে কাল রাতের মমতার ঠোঁট স্বাতীর স্বাতী এলো না ট্রাম সিগারেট ওগো স্বাতী গো—। এই কথাগুলো চিন্তা হয়ে অথবা না হয়ে, চিন্তার আকার নিতে নিতে হঠাৎ হারিয়ে গিয়ে, বুদ্‌বুদের উপর বৃষ্টিধারার পরে, রঞ্জনের মনকে বৃষ্টি পড়া পুকুরের মতো আপাত শান্ত ও ক্ষুব্ধ করে তুলল। প্রত্যেক বিন্দু বৃষ্টি একটি করে আবর্ত সৃষ্টি করল। অথচ কোনো আবর্তই সম্পূর্ণ নয়। এই অনেক আবর্তের মধ্যে তার মন নিজের কাছেই এলোমেলো ও দুরূহ মনে হল। এবং স্পষ্টত এই চিন্তার ঘূর্ণি থেকে সে পালাতে চাইল। রঞ্জনের সমস্ত পরিকল্পনা ক্রমশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ দিতে না পারায় নিজের কাছে রঞ্জন প্রতি মুহূর্তে কাপুরুষ প্রমাণিত হচ্ছিল। রঞ্জন নিজের জন্য একটি অজ্ঞাত আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এই অজ্ঞাত আশ্রয়স্থল প্রতি মুহূর্তে ফণিমনসার কাঁটায় আবৃত হচ্ছে। রঞ্জন জানে এই চরম মুহূর্তে ঐ আশ্রয়স্থলে না দাঁড়াতে পারলে অনিবার্যভাবে এটাও একটা ফণিমনসার ঝাড় হয়ে যাবে।

রঞ্জন চাঁদের দিকে তাকাল। অকস্মাৎ পৃথিবীর এই উপগ্রহটি তার অভ্যন্তরস্থ মৃত আগ্নেয়গিরি পাহাড় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠিন শিলাস্তর সহ

নির্মম ভাবে গলে গেল। এবং তরল ইস্পাতের মতো পড়তে লাগল। অথবা গলিত মোমের মতো। যেহেতু রঞ্জনের মনে সিনেমায় দেখা তরল ইস্পাতের—ঝর্ণার অথবা জলপ্রপাতের মতো—পড়ার ছবি ছিল সেই কারণেই চাঁদের গলিত প্রস্রবণ দেখে তার মনে তরল ইস্পাতের কথাই আগে এলো। চাঁদকে গলে যেতে দেখে অকস্মাৎ নরম জ্যোৎস্নার মণ্ডকে দুই হাতের মধ্যে নিয়ে দলিত মথিত করতে ইচ্ছে হল। নরম কোনো পদার্থের মণ্ড হাতে নিলেই নির্বিচারে, সেই মণ্ডকে দুই হাতে ডলবার যে-ইচ্ছা অকস্মাৎ মানুষের হয় এ তাই। বয়স্কা কুমারী বা সন্তানহীনা নারীদের গোলগাল তুলতুলে নরম নরম শিশুদের বুকের মধ্যে দলামলা করে আদর করবার মতো রঞ্জনেরও চাঁদের এই নরম মণ্ডটিকে দলামলা করবার এবং নিজের ইচ্ছামত কোনো আকৃতি দেবার ইচ্ছা হল। চাঁদের অথবা নরম মোমের মণ্ডকে এক্ষুণি দলিত মথিত করবার আকাঙ্ক্ষা না মেটাতে পেরে রঞ্জন উত্তেজিত হল। এই উত্তেজনা তাকে আলিঙ্গনের উষ্ণতা স্মরণ করাল। একটি যুবতীকে আলিঙ্গনের স্মৃতি তাকে এই ক্লান্তিকর অপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

রঞ্জন প্যাকেটের শেষ সিগারেট ধরাল। এতক্ষণের চিন্তাপ্রবাহের দোলায় সে মোহগ্রস্ত ও প্রায় অবশ। রঞ্জন কালো সেনাপতির মূর্তিতে হেলান দিয়ে অসহায় ভাবে চাঁদের কাছে আশ্রয় চাইল। পৃথিবীর এই একটিমাত্র উপগ্রহ নির্মমভাবে একটি চৌবাচ্চা হয়ে গেল। (আবার চৌবাচ্চা !) এই চৌবাচ্চার দুটো পথ : একটি জল প্রবেশের, একটি নিষ্কাশনের। চৌবাচ্চাটায় এক ফোঁটা জল নেই। উপর থেকে তলদেশ পর্যন্ত একেবারে শুকনো খটখটে। রঞ্জন লক্ষ করল জল সরবরাহ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও জল প্রবেশের পথ দিয়ে একফোঁটা জলও চৌবাচ্চায় আসছে না। চৌবাচ্চায় প্রবেশের ঠিক মুখেই, আরও কতগুলো ছোট ছোট নল এই প্রবেশের নল ও নিষ্কাশনের নলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। ফলে জল চৌবাচ্চায় প্রবেশের আগেই এই ছোট ছোট নল দ্বারা বাহিত হয়ে জল বের হবার নলের মধ্যে পড়ছে এবং সেই পথে সমস্ত জল বের হয়ে যাচ্ছে। ফলত জল প্রবেশের পথে কোনো কিছুই চৌবাচ্চায় প্রবেশ করছে না। এই প্রকাণ্ড, শুকনো চৌবাচ্চার মধ্যে স্বাতী ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে রঞ্জন গোল হয়ে ঘুরছে। চাঁদটা ঘুরছে। রঞ্জন এই অত্যন্ত দ্রুতগতিশীল ঘূর্ণায়মান চৌবাচ্চা থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। কালো সেনাপতির মূর্তিতে হেলান দেওয়া এবং চাঁদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী

রঞ্জন, চাঁদের শুকনো চৌবাচ্চায় নিজেকে ঘুরতে দেখছে। কালো সেনাপতির কোমরের ঝুলন্ত তলোয়ার প্রায় তার মাথা স্পর্শ করেছে।

এই ঘূর্ণায়মান চন্দ্র-নির্মিত চৌবাচ্চায় স-পরিবারে স্বাতীসহ তার আবর্তন ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে। কেউ-ই শুধুমাত্র নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। অন্যকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। রঞ্জন ও স্বাতী দুজনেই একে অন্যের কাছে যাবার ও পরস্পরকে আশ্রয় করে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হঠাৎ এই গতির তাড়নায় দুজনেই এই চৌবাচ্চার কেন্দ্রবিন্দুতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরতে পারল। তাদের দুজনকে ঘিরে অন্যান্য সবাই দ্রুত আবর্তন করছে। প্রতি মুহূর্তে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রঞ্জন ও স্বাতীর চারপাশে ঘুরতে থাকা পরিবারের অন্যান্য সবাই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ প্রায় অদৃশ্য হয়ে একটা সুতোর মতো হয়ে তারা ঘুরতে লাগল। স্বাতীকে বুকে আঁকড়ে ধরে এই বৃত্তের পরিধি রক্ষা করে ঘুরতে থাকা মানুষগুলোকে রঞ্জন চিনতে চাইল; পারল না। এবং স্বাতীকে প্রবল আকর্ষণে কাছে টেনে নিল।

রঞ্জনের দুই করতলের মধ্যে স্বাতীর মুখটা পদ্মফুল হয়ে গেল। এই ফুলের নমনীয়তা পরীক্ষার্থেই রঞ্জন সতর্ক যত্নে একটু চাপ দিল। রঞ্জন অনুভব করল স্বাতীর মুখ, তার করতলের পদ্মফুলটা খু-ব নরম। আমি স্বাতীকে কতদিন চুমু খাই না। রঞ্জন পদ্মফুলের পাপড়ি ঠোঁট দিয়ে ছুঁতে গেল। হঠাৎ পদ্মফুলটা গলে গেল। রঞ্জন অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। স্বাতীর পদ্মফুল দেহ তরল হয়ে তার বাহু, বক্ষ এবং দেহের নানান অংশ ভিজিয়ে দিয়ে চৌবাচ্চার মেঝেতে পড়তে লাগল। রঞ্জন এই তরল স্বাতীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। চৌবাচ্চাটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘুরছে। পদ্মফুলটা গলে গেল! রঞ্জন স্বাতীকে, পদ্মফুলকে বুকের ভিতর পেতে চাইল। চৌবাচ্চাটা শুকনো। খটখটে, শুকনো। আমার স্বাতী জল হয়ে গেছে। জল। স্বাতী। আমার ভালোবাসা। জল হয়ে গিয়ে স্বাতী এই শুকনো চৌবাচ্চাটাকে ভিজিয়ে দিতে চাইছে। প্রয়োজন ও বাস্তব জলরেখার মধ্যবর্তী ফাঁকটা এ ছাড়া বোধহয় ভরবে না। স্বাতী জল হয়ে গেলো গো—। রঞ্জন আর্তনাদ করে, চিৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং জল হয়ে গেল। ঘূর্ণায়মান চাঁদের চৌবাচ্চার শুকনো অভ্যন্তরের সমস্ত অংশ রঞ্জন ও স্বাতী জল হয়ে ভিজিয়ে দিতে চাইছে। চৌবাচ্চাটা প্রচণ্ড গতিতে ঘুরছে। তরল রঞ্জন ও স্বাতী জল নিষ্কাশনের নলটার বিরাট হাঁ-এর দিকে এগোচ্ছে।

এই খালি চৌবাচ্চার মধ্যে অবগাহন করে স্বাতীর অপেক্ষা কাতর রঞ্জন অত্যন্ত ক্লান্ত হল। কালো সেনাপতির মূর্তি থেকে সরে এলো। সিগারেট টানতে টানতে মানুষ ও যানবাহনের স্পষ্ট অবয়বে, আলোকোজ্জ্বল ও কোলাহল-মুখর রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো চাঁদের দিকে তাকাল। চৌবাচ্চাটা ঘুরছে। জল বের হবার নলের ভিতর দিয়ে তারা কে কখন টুপ টুপ করে পড়ে গেছে বুঝতে পারল না।

রঞ্জন সেই আলোকিত রাজপথে মানুষ মোটর ও বাস-ট্রামের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে পথ করে এগিয়ে যেতে যেতে জলবাহী নল দিয়ে পড়ে যাওয়া প্রত্যেকটি টুকরোকে খুঁজে বের করবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি খুলে রাখল। কারণ তার ভালোবাসাই অসংখ্য পাতপাত হয়ে এখানে ওখানে ছিটিয়ে আছে।

সেভোমির মিনডারোভিচ

অসমাপ্ত তাসখেলা

তোমাদের বারান্দায়—খাটো ফণীমনসার বাগান
তোমাদের হৃদপিণ্ডে,—শর্তাধীন গিঁঠজড়ানো পরগাছা লতায়
কেন না সকল সর্ত সাপেক্ষতা জট পাকানো
কিছু তিক্ত হুইস্কিতে
কণ্ঠ বহে নামে
যায় চেতনায়
আগামী বছরগুলি
বিগত বছরগুলি ধরে

তবু খুলে ধরা ভালো হাট করে
কিন্তু ঐ হৃদপিণ্ডে নয়
ঐ সর্তাধীনতায় নয়
তবু খুলে ধরা ভালো সব তাস
সুন্দরী নারীরও জন্যে
এবং যেখানে নেই আমুদে জোকার
না যেখানে আমুদে জোকার নেই
খাটো ফণীমনসা পার হয়ে
গিঁঠ ওঠা হাজার পরগাছা লতা পার হয়ে যেতে
বারান্দায়, যেতে
টেবি... ক, যেতে
এই আমার হাতের অঙ্গুলিতে।

...া ভালো

কালহীন বারান্দার দৃষ্টির সম্মুখে
ঢের আগে যেসব গোটানো পাল।
বৃষ্টি পড়ে।
মৌসুমী বাতাস
কাল স্তব্ধ হয়ে আছে
কোনখানে আমার শিরায়
কোনখানে শাদা তপ্ত হিমালয়ে পন্থহীনতায়
কোনখানে লাজুক সপ্তাহ শেষে—কারো সঙ্গে ছিল
এ সব কবিতা।

আবার হুইস্কি দাও এক

আবার হুইস্কি দাও একবার, কেন না আমুদে সেই
জোকার আসে না কোনোখানে
হুইস্কি
অশেষ বৃষ্টির
তপ্ততার জন্য
হুইস্কি
হারানো বন্দরে সব গোটানো পালের জন্য
হুইস্কি
সর্তময় পরগাছা লতার জন্য
হুইস্কি
সলাজ সপ্তাহ শেষটুকুর জন্য চাই
হুইস্কি
কবিতাগুলির জন্য
হুইস্কি
সুন্দরী নারীর জন্যে

ওহ্,
কার যেন ছিল কিন্তু ছিল না রবে না

ঐ তাস খেলা
ও হৃদয়
থাটো ফণীমনসার বাগানে
শক্ত জরদগব ঐ পরগাছা লতায়, লিয়ানায়,
ওহ্,
যেন কার ছিল কিন্তু ছিল না রবে না
ঐ তাসখেলা
আমার আগামী সব বছরগুলির
আমার বিগত সব বছবগুলির
বৃষ্টি
বৃষ্টিধাবা।

কোথাও জোকার নেই
হিমালয়ে শাদা তপ্ত পন্থহীনতায় কোথা আছে সে জোকার
আমার বাল্যের ফুটে ওঠা আকাশিয়া বৃক্ষতলে
কোথা আছে সে জোকার
ঠোঁটে তার মাউথ অর্গান
অথবা মন্‌স ক্রাঙ্কোরাম পাহাড়ের খাঁজে আছে
ঠিক যেন আমি কতদিন আগে
বিপুল রহস্তময় মারগুয়েটা ফুল তুলছি, ফুল
জোকার কোথাও দূর বুলেভারে
চৌঘুড়ি গাড়িতে
রং বেরং আঙরাথায় পাউডার ছড়িয়ে
চলে যায় দোকানের জানলা পার হয়ে
জিপসী নাচা দেবশিশুদের সঙ্গে, যায়
সর্তাধীন কফিনগুলির সঙ্গে
সে জানে যা জানে।

ওহ্,
কেউ যেন না খুলে দেখায়

না খুলে দেখায় যেন তাসগুলি
হৃদয়ের উপরে, বা
সর্তসাপেক্ষতার উপরে, কিংবা
ফুটে ওঠা আকাশিয়া ফুলের ভিতরে, কিংবা
পাউডার ছড়ানো আঙরাখায়
আরো এক হুইস্কি, বন্ধু হে
আরো এক হুইস্কি লাগাও

তোমরা সবাই
চমৎকার বজ্রাহত উষ্ণীষ চৌদিকে ঘিরে যারা
আমুদে জোকার শুয়ে আছে ঠিক আমাদের এক ধাপ দূরে
বন্দরে
বৃষ্টিতে
নগ্ন পায়ে
জলে তার মাথা
ভগ্ন করোটিতে রয়
যে ছিল এবং আর নেই।

একক আমার শুধু জানতে হবে ঐ
আমুদে জোকারটিকে
পাউডারে আবৃত সর্তাধীন আঙ্‌রাখা
তোমাদের হৃদপিণ্ড
আমাকে প্লাবিত করে বেড়ে ওঠা পাগড়িগুলি
বারান্দার ঊর্ধ্বে
বন্দরের ঊর্ধ্বে বৃষ্টিধারে
মৌসুমী বায়ুর ঊর্ধ্বে
হিমালয়ে তপ্ত শুভ্রতায় পত্রহীনতার ঊর্ধ্বে
জীবনের তাসখেলা—তারও ঊর্ধ্বে
একক আমারই শুধু জানতে হবে
সে যে ছিল আর আজ নেই

কালহীন বারান্দায় তিক্ত মদ জেনে যেতে হবে
কতদিন আগে সেই লাজুক সপ্তাহ শেষটুকু হয়তো বা ছিল না
এবং আমিও শীঘ্র ছেড়ে চলে যাবো এ টেবিল
বৃষ্টিধারে
একা
বৃষ্টিপাতে।

কোথাও জোকার নেই
জোকারের আমুদে মস্তিষ্ক রয় দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
কোথায় হুইস্কি সেই—উষ্ণীষ আবৃত শির, কই
কালো ক্রেপে ঢেকে দাও এ টেবিল
ঢেকে দাও কালো ক্রেপে হিমালয়ে তপ্ত শ্বেত পথহীনতাকে
ঢেকে দাও কতদিন আগে সেই লাজুক সপ্তাহ শেষটুকু—সমস্তাবিধুর

আমার বাল্যের ফুটে ওঠা আকাশিয়া ঢাকো
আর ঢাকো মন্‌স ক্রাক্কোরামে পাহাড়ের খাঁজে
রহস্য সুন্দর মারগুয়েটা
আর হারানো বন্দর
আর এ বারান্দা
আর সুন্দরী রমণীটির বক্ষপুটে তাসগুলি, ঢাকো
ইস্কাপন
রুহিতন
হরতন
আর চিড়িতন।

ঢাকো এই তাসখেলা কালো ক্রেপে সুনিপুণ হাতে
যার জন্যে ছিল কিন্তু ছিল না, রবে না
এই তাস খেলা তার যেন ফুরাবে না
এই ধ্বংসাবশেষ তাসখেলা, ঠিক যেন লাল পাথরের
　　　　কোন ধ্বংসাবশের এক মোগল সমাধি,

বন্দরের পথে যেতে
এবং উষ্ণীষ শিরগুলি
এবং পাগড়ি মাথাগুলি
আর দাও আরেক হুইস্কি, এনে দাও।

এই মৌসুমীর অপরাহ্নে আমি পান করতে চাই
বিধ্বস্ত করোটি সেই আমার বন্ধুর জন্য
ছিটগ্রস্ত মৃত সেই জোকারের জন্য
পাউডার মাখানো তার আঙ্‌রাখা ভেসে গেল জলে
সে ছিল এবং সে তো নেই
আমি পান করতে চাই
আমি পান করতে চাই ভাবালু মন্‌স ক্রাঙ্কোরাম পর্বতের
চূড়ার মেঘের নামে
বিস্ফারিত শুভ্রতায় হিমালয়ে—মেঘপুঞ্জদের নামে
তোমাদের ঝুরি নামা হৃদয়ের নামে
হলুদ বারান্দা, তোমাদের খাটো ফণিমনসাযূথ নিয়ে
উবে যায় মৌসুমী বাতাসে
তাসগুলি ঢের আগে নিয়ে গেছে কোচিনের কাক
আর ইস্কাপন
আর রুইতন
আর হরতন
আর চিড়িতন।

আমাদের অঞ্জলিও বড় শূন্য
নিস্পৃহ অঞ্জলি
আমার তোমার
আর শুধু শোনা যায়
কাছে আসে, ঐ কাছে আসে
সোনালী চৌঘুড়ি গাড়ি
দূর সৌরকরোজ্জ্বল বুলেভার থেকে।

কেউ যেন আমাদের দিকে আসে
যেন মৃত সে জোকার
হাস্যমুখ
যেন আসছে
যার কাছে
সে তো ছিল এখন সে নেই।

পাগড়িমাথা, হুইস্কি লাগাও
কেন ঐ জমাদেহ পরগাছা লতারা নড়ে
পাগড়িমাথা—থামাও ওদের
জোকার আমারই দিকে আসছে ঐ
খাটো মনসাগাছগুলি ছিঁড়ে নাও আমার হাতেব
দূর করো ওগুলিকে
হুইস্কি

আরেক পাত্র হুইস্কি আমাকে
আরেক পাত্র হুইস্কি চড়াও
কণ্ঠনালী চেয়ে
যায় চেতনায়
আগামী বৎসরগুলি
বিগত বৎসরগুলি ধরে
বজ্রাহত চমৎকার পাগড়িমাথাগুলি
হুইস্কি চড়াও।

ওহ্
তুলে নাও শিরওঠা পরগাছা লিয়ানাগুলি
আমার দু-হাত থেকে
আমার গলার থেকে
আমার হৃদয় থেকে
জোকার আসছে ঐ আমার দিকেই

হাস্তমুখ
সে কারো ছিল না আর সে কারো হবে না
সে আমার শুধু।

কোচিনের কালো কাক—বৃষ্টিধারা থেকে ঐ তাসগুলি আনো
এই কালহীন বারান্দায় এসো
আমি তাস মুক্ত করে ধরি
সুন্দরী নারীর দিকে।

আমার সম্মুখে ঐ পোতাশ্রয় পালগুলি মুড়ে আছে ঢের দিন ধরে
বৃষ্টি পড়ে
শূন্য এ টেবিল, তাসহীন, উলটে যায়
বারান্দার পর্দা জাফরিগুলি
শুভ্র তপ্ত পত্রহীনতার উর্ধ্বে
ইফেল টাওয়ার ছেড়ে
ফুটে ওঠা আকাশিয়া উদ্যানের পথের উপরে
কোথাও জোকার নেই
কোথাও সে তাস খেলা নেই
জড়দগব গিঁঠ ওঠা পরগাছা লিয়ানা লতাগুলি
কিছু ক্রুদ্ধ সাপের কুণ্ডলী
আমার চৌদিক ঘিরে বেঁধে ফেলে
আর ক্রমে চেপে ধরে ক্রমে শক্ত করে।

পাগড়িগুলি—আরো এক হুইস্কি লাগাও
আরো
এক··· ।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

কবিতাটির ইংরাজি নাম : An Unfinished Canasta.

Canasta : এক ধরনের তাসখেলা, উরুগুয়েতে প্রথম চলে ; এতে দুই প্যাক তাস ও চারটি জোকার প্রয়োজন।

লিয়ানা (Liana) : দক্ষিণ আমেরিকা ও নিবক্ষীয় অরণ্যের পরগাছা লতা আশ্রয়দাতা বৃক্ষটিকে জড়িয়ে ওঠে, পরে তাকে রসশূন্য করে।

জে. বি. এস. হলডেন

উপসংহার

Amor mortes conturebat me

(প্রেম, মৃত্যু আমায় অস্থির করে)

তোমার বন্ধুরা চেনে আমাকে ও জানে সঙ্গে আছি,
যখন যন্ত্রণা, ত্রাসে দুর্বিষহ তাদের জীবন
হয়েছে—দু'বাহু দিয়ে তাদের করেছি আকর্ষণ
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এই বুকের একান্ত কাছাকাছি।

রঙীন কামনা, আশা কিম্বা কোনো নিষ্ফল উদ্যমে
কখনো পড়েনি বাঁধা—মুক্ত-আত্মা তারা জ্যোতিষ্মান,
কোমল বক্ষের এই আলিঙ্গন থেকে কোনোক্রমে
তাদের ছিনিয়ে নিতে মহাকাল হবে হতমান।

গোলা ও তুষারপাতে অন্তহীন তাদের দুর্ভোগ
বিগত, মিলিয়ে গেছে বুদ্বুদের মতন নিঃসাড়ে,
তাদের সমস্ত শ্রম, যন্ত্রণা—যা হয়েছে সার্থক,
দেখো, আমি পুরস্কৃত করি তারে দ্বিগুণিত হারে।

অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন আত্মা লভে চিরবিশ্রাম, আমার
দরোজাও যে-রহস্য প্রকাশ্যেই উন্মোচিত করে
ঈশ্বর, রমণী কিম্বা গোলাপের চেয়ে চমৎকার ;
এসো, আর ফিরবেনা, এ-হৃদয়ে এসো চিরতরে।

অনুবাদ : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে হলডেনের ভগিনী শ্রীযুক্তা নাওমি মিচিসন্ ব্রিটেনে রোমান-অভিযানের পটভূমিকায় 'দি কংকার্ড' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। গ্রন্থটি তিনি হলডেনকে উৎসর্গ করেন ; উত্তরে হলডেন, উপন্যাসের এপিলোগস্বরূপ, এই কবিতাটি লিখে দেন।—সম্পাদক, পরিচয়

জে. বি. এস. হলডেন

স্বচিত্র

আমার জন্ম অক্সফোর্ডে (৫ই নভেম্বর, ১৮৯২)। প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জন স্কট হলডেন আমার বাবা। (রাষ্ট্রনেতা ও দার্শনিক ভাইকাউণ্ট হলডেন ছিলেন তাঁর কাকা; ঔপন্যাসিকা নাওমি মিচিসন তাঁর বোন।—অনু.) আমার লেখাপড়া ইটনে ও অক্সফোর্ডেব নিউ কলেজে। আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেশির ভাগটাই শিক্ষানবিশীর ফলে—আট বছর বয়স থেকে আমি আমার বাবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহকাবী। আমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি বিজ্ঞানে নয়, ক্লাসিক্‌স্‌-এ। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত আমি ছিলাম ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীতে। দু-বার আহত হয়েছিলাম। ১৯১০ সাল থেকে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু। ১৯১৯ সালে অক্সফোর্ড নিউ কলেজের ফেলো। ১৯২২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত কেম্ব্রিজে জীবরসায়নবিদ্যার রীডার। ১৯৩৩ থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে জীবতত্ত্বের ও পরে বায়োমেট্রির অধ্যাপক। ১৯৩২ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপক। সেই একই বছরে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির ফেলো।

আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নানা ধরনের। মানব শরীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে-গবেষণাটির জন্যে আমি সবচেয়ে পরিচিত তা হচ্ছে মনুষ্যশরীরে প্রচুর পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ইথার সল্ট গ্রহণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। লেড ও রেডিয়াম পয়জনিং-এর চিকিৎসায় এই গবেষণা থেকে কিছুটা সাহায্য হয়েছে। প্রজননবিদ্যার ক্ষেত্রে আমিই প্রথম স্তন্যপায়ীদের লিংকেজ বা সম্পর্কগত সূত্রটি আবিষ্কার করি, মনুষ্যশরীরের ক্রোমোসোমের রূপটি চিহ্নিত করি, এবং (পেনরোজের সহযোগিতায়) মনুষ্যশরীরের জীবকোষের (জীন) বিকৃতির হার পরিমাপ করি। গণিতশাস্ত্রেও আমি সামান্য ধরনের কয়েকটি আবিষ্কার করেছি।

এদিক থেকে যদিও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌবব বিবেচিত হতে পারি কিন্তু অন্যদিক থেকে আমি হয়ে উঠেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটা পরীক্ষা। একটি

বিবাহবিচ্ছেদের মামলা উপলক্ষে ১৯২৬ সালে আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদচ্যুত হই। পরে উচ্চতর ট্রাইবুনালের কাছে আপীল করার ফলে আমার পদটি ফিরে পাই। ট্রাইবুনালের রায়ে বলা হয় যে আমার বক্তব্য না শুনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে বরখাস্ত করেছিলেন। বর্তমানে (১৯৪০) আমি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ ভবন পরিত্যাগ করে যেতে অস্বীকৃত হয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমার দুজন সহকারী। বাসিন্দা বলতে এখন শুধু আমরাই। খুবই অসুবিধের মধ্যে আমাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

নিছক বৈজ্ঞানিক রচনা ছাড়া আমি কয়েকটি সাধারণবোধ্য বইও লিখেছি। তার মধ্যে ছোটদের জন্যে একটি গল্পের বই। আমি মনে করি, সাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্যে প্রত্যেক বিজ্ঞানীর সম্ভবমতো সচেষ্ট হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করেছি।

১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আমি চেষ্টা করেছিলাম রাজনীতি থেকে বাইরে থাকতে। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনির প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমর্থন আমাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশে বাধ্য করেছে। ১৯৩৬ সালে আমি তিন মাস কাটিয়েছিলাম রিপাব্লিকান স্পেনে—প্রথমে গ্যাস আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থার উপদেষ্টা হিসেবে, পরে বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পরিদর্শক হিসেবে। যুদ্ধ চলার সময়ে ছিলাম ফ্রন্টলাইনে, বিমান-আক্রমণের সময়ে কয়েকবার ফ্রন্টলাইনের পিছনে। তখন থেকেই আমি চেষ্টা করছি—যদিও বিন্দুমাত্র সফল হতে পারিনি—যে স্পেনে অবলম্বিত এবং কার্যক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি ব্রিটিশ সরকারও গ্রহণ করুন।

মিঃ চেম্বারলেনের নীতি এবং পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার সাম্প্রতিক বিকাশ—এ-দুটি ঘটনার যোগাযোগ আমাকে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী করেছে। যদিও আমি কোনো রাজনৈতিক পার্টির সদস্য নই কিন্তু হালের কয়েক বছর আমি বিভিন্ন ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে আসছি। বর্তমানে আমি ব্যাপৃত আছি প্রজননতত্ত্বের গবেষণায়, ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের জীবন-রক্ষার উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গবেষণায় ও বর্তমান যুদ্ধ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং সম্ভব হলে যাতে শান্তি স্থাপিত হয় সেই উদ্দেশ্যে লেখায় ও জনসভায় বক্তৃতা করায়।

চোদ্দ বছর হল শার্লোট ফ্রাঙ্কেন-এর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার উচ্চতা ছ-ফুট এক ইঞ্চি, ওজন ২৪৫ পাউণ্ড, সাঁতার কাটতে ও পাহাড়ে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসি। আমার মাথায় টাক, চোখ নীল, গোঁফ ছাঁটা। আমি অল্পবিস্তর মদ খেয়ে থাকি, অত্যধিক ধূমপান করি, এগারোটি ভাষায় পড়তে ও তিনটি ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারি। তবে সুরেলা নই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমি ডাইভিং-এর শারীরতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করেছি। মুক্ত বন্দরগুলোকে পরিষ্কার করার জন্যে যেসব পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে তাতে আমারও কিছু অবদান আছে। এ-কাজটি করার সময়ে আমি একটি কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার করি। তা এই যে ছয় বায়ুমণ্ডলীর চাপে অক্সিজেন স্বাদবিশিষ্ট হয়। এই তথ্যটি খ্রীষ্টাব্দ ২০০০ নাগাদ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বা নাও হতে পারে। তার পর থেকে আমি প্রজননতত্ত্ব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত। এই গবেষণার জন্যে ১৯৫২ সালে আমি রয়াল সোসাইটি কর্তৃক ডারউইন পদকে পুরস্কৃত। হেলেন স্পারওয়ে যিনি ছিলেন জলের নিচের গবেষণা-কার্যে আমার সহকর্মিণী, তাঁকে আমি বিয়ে করেছি ১৯৪৫ সালে। ষাট বছর বয়সে পৌঁছে এখন আমি রাজনীতি থেকে মোটামুটি দূরে। তাহলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি অবশ্যই রেড বলে চিহ্নিত হয়ে থাকব, যদিও বিশ্ব-রাজনীতির ব্যাপারে আমার মতামত অন্য কোনো সুপরিচিত রাজনীতিকের চেয়ে সম্ভবত নেহরুর মতামতেরই কাছাকাছি। [১]

১। এই আত্মজীবনীটি Twentieth Century Authors থেকে সংগৃহীত। পরে অধ্যাপক হলডেন এই লেখার দুটি সংশোধন পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি কখনো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন না এবং তাঁর গবেষণা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ইথার সল্ট নিয়ে নয়, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও আদার বা অন্যান্য সল্ট নিয়ে।

অধ্যাপক হলডেনের প্রথমা স্ত্রী, লেখিকা শার্লোট ফ্রাঙ্কেন হলডেনের আত্মজীবনী Truth Will Out প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সালে (অধ্যাপক হলডেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ১৯৪৫ সালে)। এই আত্মজীবনীতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তাঁর বিবাহিত জীবনের বিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছেন।

জন বার্ডন স্তাণ্ডার্সন হলডেন : কয়েকটি সাল তারিখ

জন্ম : ৫ই নভেম্বর ১৮৯২

মৃত্যু : ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৪

শিক্ষা : অক্সফোর্ড প্রিপেরেটরি স্কুল, ইটন
নিউ কলেজ, অক্সফোর্ড

অধ্যাপনা ও গবেষণা : ফেলো, নিউ কলেজ (১৯১৯—১৯২২), বিষয়, ফিজিওলজি ; রীডার, কেম্বিজ (১৯২২—৩২), বিষয়, বায়োকেমিষ্ট্রি ; প্রফেসর, রয়াল ইনষ্টিটিউশন (১৯৩০—১৯৩২), বিষয়, ফিজিওলজি ; প্রফেসর, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৩—১৯৫৭), বিষয়, জেনেটিক্স (১৯৩৩—১৯৩৭), বায়োমেট্রি (১৯৩৭—৫৭) ; রিসার্চ প্রফেসর, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনষ্টিটিউট (১৯৫৭—১৯৬১) ; অধ্যক্ষ, জেনেটিক্স্ ও বায়োমেট্রি বিভাগ, পশ্চিম বাংলা (১৯৬২) ; অধ্যক্ষ, জেনেটিক্স্ ও বায়োমেট্রি রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ভুবনেশ্বর (১৯৬২—১৯৬৪)

সম্মান ও পদক : ফেলো, রয়াল সোসাইটি, ১৯৩২ ;
ডারউইন পদক, রয়াল সোসাইটি, ১৯৩৩ ;
ডারউইন-ওয়ালেস স্মৃতি-পদক, লিনিয়ান সোসাইটি, ১৯৫৮ ;
কিম্বার পদক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী, ১৯৬১
কয়েকটি ব্রিটিশ ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি

মুখ্য রচনা : Dædalus : or, Science and the Future, 1924 ;
Callinicus : A Defense of Chemical Warfare, 1925 ;
The Last Judgment, 1927 ;
Animal Biology (with J. S. Huxley), 1927
Possible words and other Essays, 1927 ;
Science and Ethics, 1928 ;
Enzymes, 1930 ;
The Inequality of Man and other Essays, 1932 ;
Science and Human Life. 1933 ;
The Causes of Evolution, 1933 ;
Fact and Faith, 1934 ;

Science and the Supernatural (with A. Lunn), 1935 ;
Scientific Progress (with others), 1936 ;
My Friend Mr. Leakey (Juvenile), 1937 ;
Heredity and Politics, 1938 ;
The Marxist Philosophy and the Sciences, 1938 ;
A. R. P. [Air Raid Protection], 1938 ;
Science and You, 1939 ;
Science in Peace and War, 1940 ;
New Paths in Genetics, 1941 ;
Adventures of a Biologist (in England :
Keeping Cool and other Essays), 1940 ;
A Banned Broadcast and other Essays, 1946 ;
Biology in Everyday Life, 1946 ;
Science Advances, 1947 ;
What is Life ? 1947
Everything Has a History, 1951 ;
The Biochemistry of Genetics, 1954 ;
The Unity and Diversity of Life, 1958 ;
Physiological Variation and Evolution, 1960.

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বাহিরে যার হাসির ছটা

গ্যয়টে সম্পর্কে একটি জর্মন নাটকে দেখান হয়েছিল যে তিনি যেন কলেজের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিতে বসেছেন। প্রশ্ন এসেছে গ্যয়টে সম্পর্কেই। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে উত্তর দিতে বসেই তিনি পড়লেন বিষম বিপাকে। হয়, পরীক্ষকেরা যে-সমস্ত ঘটনাকে তাঁর জীবনের পক্ষে স্মরণীয় বলে মনে করেন সেগুলোর একটাও তিনি মনে করতে পারছেন না অথবা গ্যয়টে সম্পর্কে প্রচলিত সমালোচনার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ব্যবধান প্রচণ্ড। কাহিনীটি উদ্ধৃত করে অভিনেত্রী মার্গারেট ওয়েবস্টার বলেছেন শেক্‌স্‌পীয়র সম্পর্কে তাঁর নিজেরও প্রায় ওই ধারণা। শেক্‌স্‌পীয়রের রচনার এত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই যে স্বয়ং রচয়িতার কাছেও তা অবান্তর বলে মনে হত।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যসমালোচনা প্রসঙ্গে মনে হয় ঐ কাহিনী আর একবার স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। অন্তত বেশ কয়েকজন সমালোচক উনিশ শতকের বাংলা নাটকে ভাঁড়-বিদূষক অথবা আধা মূর্খ—আধা পণ্ডিত ধরনের চরিত্র খুঁজে পেলেই অবলীলাক্রমে শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির সঙ্গে তাদের নাম জুড়ে দিয়েছেন। অথচ, সংস্কৃত নাটকের পৃষ্ঠা থেকে যথেচ্ছভাবে উনিশ শতকের বাংলা নাটকের বিদূষকদের ধরে নিয়ে আসা হয়। এদের অধিকাংশকেই কেবল লোক-হাসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, অপ্রকৃতিস্থ আচরণ বা অসংলগ্ন সংলাপ এদের একমাত্র উপাদান। তবে এ কথাও ঠিক, সমসাময়িক বাংলাদেশে একটা শেক্‌স্‌পীয়রিয় আবহাওয়া তৈরি হয়। হিন্দু কলেজের দুজন মুক্তমনা অধ্যাপক রিচার্ডসন আর ডিরোজিও আর কিছু না হোক বাঙালি ছাত্রদের শেক্‌স্‌পীয়র শিখিয়েছিলেন ঠিকই। ফলে, নাটক মোটামুটি ভালো হলেই অথবা চরিত্র আকর্ষক হয়ে উঠলেই শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনা করা হত। গিরিশচন্দ্রকে তো একদল 'শেক্‌স্‌পীয়রের সমতুল্য', অপর দল তাঁর থেকেও বড় বানিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো, সে যুগেও

কেউ কেউ বুঝতেন যে এই তুলনা শেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষে অসম্মানের এবং গিরিশচন্দ্রের পক্ষে উপহাসের। তথাপি, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে পারলে কৃতার্থই বোধ করতেন। সামাজিক চরিত্রগুলিতে তারা শেক্‌স্‌পীয়রের সাহায্য নেবেন না, রাজ-রাজড়ার চরিত্রগুলো প্রচণ্ডভাবে ভারতীয় হয়ে উঠল। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রিয় মুর্খদের বার বার বাংলা নাটকে উঁকি মারতে দেখা গেল। হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বাঙালি নাট্যকারেরা এই সাদা-কালো মানুষগুলোকে বাঙালি করে নিতে চেয়েছিল। সবচেয়ে কঠিন কাজটাকেই তারা সবচেয়ে সহজ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

দুই

শেক্‌স্‌পীয়রের ভাঁড় দুজাতীয়। প্রথম দল, অর্ধ-নির্বোধ, আধা-স্বাভাবিক। দ্বিতীয় দল আংশিক মূর্খ, আংশিক জোচ্চোর। কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারা প্রত্যেকেই মানুষ। এমনকি টেম্পেস্টের দৈত্যাকৃতি ক্যালিবানও যখন Freedom, high-day, high-day, freedom বলে চীৎকার করে ওঠে তখন সে আর মূর্খ অথবা ঘৃণ্য থাকে না, সে হয়ে ওঠে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ। বাঙালি নাট্যকার বিদূষক আঁকতে গিয়ে তাকে মূর্খ ভাঁড় করে তুলেছেন কিন্তু তাকে একবারের মতোও মানুষ করে তুলতে পারেন নি। পার্থক্যের কারণটা জন পামার ঠিকই ধরেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, সহানুভূতিই এ জাতীয় চরিত্রসৃষ্টিতে শেক্‌স্‌পীয়রের একমাত্র মূলধন। এই সহানুভূতির সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণ মার্চেন্ট অব্‌ ভেনিসের শাইলক। এই অর্থপিশাচ কুসীদজীবি তার নির্বুদ্ধিতা এবং লোভের জন্য আমাদের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র। অ্যান্টনিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনা শোধ করতে অপারগ হওয়ায় সে তার গা থেকে মাংস খুবলে নিতেও রাজী। বিচার দৃশ্যে ছদ্মবেশিনী পোর্শিয়ার হাতে তার নাস্তানাবুদ হওয়া আমাদের কাছে রীতিমতো উপভোগ্য। কিন্তু এই ঘৃণ্য ইহুদীই যখন দর্শকদের লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে বলে—Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? তখন তার ভেতরের অশ্রুসিক্ত মুখটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ এই অবমানিত ইহুদী প্রশ্ন করে বলে—If you prick us, do we not bleed? এই রক্তাক্ত

হৃদয়ক্ষতটির সন্ধান বাঙালি নাট্যকারেরা কোনোদিনই পেলেন না। অ্যাজ্ য়ু লাইক ইট-এর টাচ্স্টোন তার পরিহাসনৈপুণ্যের জন্য বিশ্বখ্যাত। লে ব্যু-কে সে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করে বলেছে—Thus men may grow wiser every day. It is the first time that ever I heard breaking of ribs was sport for ladies. কিন্তু সভাসদ টাচ্স্টোন মুক্ত সরল জীবনের জন্য বার বার আকর্ষণ বোধ করে। বিদূষকের খোলসটা সে ছাড়াতে চায়, কিন্তু তা তার গায়ে এমন লেপটে গেছে যেন তার পক্ষে ছাড়ানো আর সম্ভবপর নয়। কোরিনের প্রশ্নের জবাবে টাচ্স্টোন এই বৃহৎ জীবন সত্যটি উদ্ঘাটিত করেছে : Truly, shepherd, in respect of itself, it is a good life, but in respect that it is a shepherd's life, it is naught··· Now in respect it is in the fields, it pleaseth me well, but in respect it is not in the court, it is tedious. As it is a spare life, look you, it sits my humour well; but as there is no more plenty in it, it goes much against my stomach. ভাঁড়ের জীবন সে ত্যাগ করতে চায়। কিন্তু সে বুঝেছে—এরে পড়তে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

তিন

উদাহরণগুলো কিঞ্চিৎ এলোমেলো হল। কিন্তু, বাংলা নাট্যকারদের শেক্স্পীয়রের ভাঁড় অঙ্কনে ব্যর্থতা এই যথেচ্ছ উদাহরণেই আশা করি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অলীক কু-নাট্য রঙ্গে রাঢ় ও বঙ্গদেশের লোককে মজতে দেখে মধুসূদন শর্মিষ্ঠা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর এই নাটকের রাজা যযাতির বয়স্য মাধব্য সংস্কৃত আদর্শে রচিত বিদূষক। তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস চেষ্টাকৃত। সংস্কৃতগন্ধী সংলাপ আর পৌরাণিক ঘটনা হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র মধুসূদনকে কতখানি কাবু করেছিল তার প্রমাণ মাধব্যের ভাঁড়ামি [দেবযানীর প্রতি যযাতির দুর্বলতা আঁচ করে]—'হরিবোল হরি। সব প্রতুল হয়েছে। সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্ছি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে। কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? অথবা (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্মই হল, তার কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা

তো কোনো শাস্ত্রেই নাই। এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারি বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল, আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি, উঃ আমার কি বুদ্ধি।" এ রসিকতা বালখিল্য। অথচ রিচার্ডসন-ডিরোজিওর শেক্‌স্‌পীয়র-শিক্ষা যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' মত্তপ ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংলাপে একটি অধঃপতিত সমাজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

"শিবু (প্রমত্তভাবে)—দ্যাটস্ এ লাই।

নবকুমার (ক্রুদ্ধভাবে)—হোয়াট, তুমি আমাকে লায়র বল ? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করব ?

চৈতন্ (নবকে ধরিয়া বসাইয়া)—হাঃ যেতে দাও, যেতে দাও—একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন ?

নব—ট্রাইফ্লীং—ও আমাকে লাইয়র বললে—আবার ট্রাইফ্লাং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন ? তাতে কোন শালা রাগত ? কিন্তু লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয় ?"

এই ইয়ং বেঙ্গল মর্কটগুলো শেক্‌স্‌পীয়রের ক্লাউনের অপর পিঠ। শেক্‌স্‌পীয়রের ক্লাউন নিজেরা বোকা সেজে আমাদের বোকা বানায় আর এরা বোকা হয়েও নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবে।

আপাতদৃষ্টিতে অসংগত বলে মনে হলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে বাংলা নাটকে যে-চরিত্রটি শেক্‌স্‌পীয়রের ভাঁড়জাতীয় চরিত্রের সমগোত্রীয় সে হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর নিমচাঁদ। এ কথা ঠিক, নিমচাঁদের কাঠামো ক্লাউনের কাঠামো নয় কিন্তু এ কথাও ঠিক সমগ্র বাংলা নাটকে কেবল এই মত্তপ চরিত্রটিই জোর গলায় বলে উঠতে পারে—'আমারে পাছে সহজে বোঝ তাই কি এত লীলার ছল। বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।' 'সধবার একাদশী' রচনার সময় দীনবন্ধুর যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাম স্মরণে ছিল তার প্রমাণ মুখবন্ধের উদ্ধৃতি—O thou invisible spirit of wine ; if thou hast no name to be know by, let us call thee—Devil. শেক্‌স্‌পীয়রের এই উদ্ধৃতি নিমচাঁদ সম্পর্কে মর্মান্তিকভাবে সত্য। নেশার জন্যই স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত নিমচাঁদ অপদার্থ বড়লোকের মোসাহেব। সে জানে—"এক ব্যাটা বড় মানসের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।" নিজের জীবনদর্শনকে মহাকবির ভাষায় ব্যক্ত করছে—Man being

reasonable must get drunk/the best of life is but intoxication. অটলকে সে ক্রমশ সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তার যুক্তি হচ্ছে এই—'ওর বাপ অনেকের সর্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় হক—' দারোয়ানের কাছে মত্তপ অবস্থায় গলাধাক্কা খেয়ে সে হাস্যকর পরিবেশে ওথেলোর বিখ্যাত সংলাপ উচ্চারণ করেছে—So sweet was never so futal. I must weep. But they are cruel. tears. যে-অটল তার মদের খরচ যোগায় সেই অটল মেঘনাদবধ পড়বে শুনে সে তীব্র ব্যঙ্গে বলে উঠেছে—'ওর ভালোমন্দ তুমি বুঝবে কি, তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমাব ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ কাটুবের হাতে মানিক'। এই নির্লজ্জ মাতাল সবটুকু মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারে নি। এমনকি, নিজেকেও সে আক্রমণ করতে ছাড়ে নি—'রে নিমচাঁদ, তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।' এই 'দেবতা' এবং 'ভূতের' সমন্বয় না ঘটলে সাবালক ভাঁড়-চরিত্র হয় না। বাংলা নাটকে নিমচাঁদই একমাত্র এই ঈর্ষিত আসনটির দাবীদার। কারণ, দোষেগুণে সে মানুষ। তার প্রতিজ্ঞাও মানবিক 'I can do all that may become a man.'

চার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ Father of the Native stage. অমরেশচন্দ্রের ভাষায় ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনোদিন ছিল না। শেক্‌স্‌পীয়র গিরিশচন্দ্রের সম্মানিত আদর্শ ('মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি')। অথচ এই স্মরণীয় প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁর প্রায় কোনো চরিত্রই শেক্‌সপীয়রেব পথ অনুসরণ করে নি। জনার বিদূষকও নয়। এর কারণও ছিল। 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে', এই অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী তার বিদূষককে ডুবিয়েছে। গিরিশচন্দ্রেব অন্যান্য নাটকের তুলনায় জনা অনেক পরিণত। নাটকের প্রথম অঙ্কেব প্রথম দৃশ্যেই বিদূষকের সাক্ষাৎও পাওয়া গেছে। আপাত কৃষ্ণ-বিরোধিতার আড়ালে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচারই তার একমাত্র উদ্দেশ্য, 'আজ দেখছি, তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি, তাই হচ্ছে ভয়,

কৃষ্ণ দয়াময়, নাম করলেই হন উদয়—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।' অন্ত্যমিলযুক্ত এই উদ্ভট সংলাপ প্রচ্ছন্ন ভক্তিবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একদা নিশ্চয় বাঙালি দর্শকের কাছে প্রচুর হাততালি কুড়িয়েছিল। কিন্তু তাতে চরিত্রটির বিশেষ কিছু যায় আসে না। তা জড, প্রাণহীন এবং যথোপযুক্ত নিস্তেজ। পঞ্চমাঙ্কে এসে এই বিদূষক শেষ পর্যন্ত না-না করতে করতেও কৃষ্ণের দেখা পেয়ে গিয়েছে—'ঐ যে বুড়ো থুথ্‌ড়ে বৃষকেতুথেগোরূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তো হও নইলে, সোজা পথ আছে—চলে যাও', শেষ পর্যন্ত বিদূষকেরই জিত। 'মহাকবি সেক্ষপীব' যার একমাত্র আদর্শ তিনি যে কি করে নাটক লিখতে বসে মর্মাশ্রয় না করে ধর্মাশ্রয় করে বসেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে এ কথা না বলে দিলেও স্পষ্ট বোঝা যায় এ জাতীয় চরিত্র পাঠকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও আশা করতে পারে না—কারণ এরা যে মানুষ এ কথা নাটক শেষ করবার পরও মনে করাব কোনো সম্ভাবনা নেই।

বরং এ ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক অগ্রসর। বিশেষ করে সাজাহানের দিলদার চবিত্রের সঙ্গে কিং লীয়রের 'ফুল' চরিত্রের সাধর্ম্য প্রায় সমস্ত সমালোচকই লক্ষ করেছেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছিলেন—'লীয়রের যেমন Fool, মোরাদেব তেমনি দিলদার।' দিলদার Fool-এর মতোই নিরাসক্ত দ্রষ্টা বিদূষক ও দার্শনিক। Fool লীয়রকে তার কন্যা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছে—He's mad that trusts in the tameness of a wolf, a horse's health, a boy's love or a whore's oath'. আর দিলদার স্থূলদেহী মোরাদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—'হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাকত, ত সে কি বুদ্ধিমান জানোয়ারই হোত। তাহলে হাতীব উপর মাহুত না বসে মাহুতের উপর হাতী বসতো।' লীয়রের ফুল কতটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে পারে তার প্রমাণ শেষের দিকে লীয়রের প্রতি তার তীব্র ধিক্কার—It thou wert my fool nuncle, I'd have thee beaten for being old before thy time. আর দিলদার মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠেছে 'অন্ধ—জা-গো'। দুর্যোগময় রাত্রিতে লীয়রের ফুল অনাসক্ত জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছে—Here's a night pities neither wise men nor fools. এই দুর্যোগের হাত থেকে লীয়র এবং তাব মূর্খ সহচর কারোর নিষ্কৃতি নেই। fool এখানে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা।

দ্বিজেন্দ্রলালের দিলদার ঔরঙ্গজীবের কাছে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকেই নিজে আক্রমণ করেছে—'আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোব। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট'—কিন্তু এই আত্মধিক্কারও দিলদার চরিত্রকে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তুলতে পারে নি। সে যে 'এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নেয়ামৎ খাঁ'—এ চিন্তা যেন বারবার তাকে খোঁচা মেরেছে। তাছাড়া মূল সাজাহান নাটকের সঙ্গে দিলদারের সম্পর্কও ক্ষীণ। অপর দিকে, fool লীয়রের ট্র্যাজেডির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। Imagine the tragedy without him, and you hardly know it (Bradley).

বাঙালি নাট্যকার শেক্‌সপীয়র নন। একজন নিছক ভাঁড় নাটকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করুক বাঙালি দর্শকেরাও বোধ হয় এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করত না। তাই সংলাপের মধ্যে বাক্‌চাতুর্য শ্লেষবাক্য আর বিদ্রূপের অনবদ্য মিশ্রণ ঘটলেও দিলদার শেক্‌সপীয়রের বিখ্যাত 'ফুলের' ছায়া হয়ে রইল। তার পূর্বসূরীদের মতো সেও নাটকের ভিতরে প্রবেশ করতে পারল না।

।

পু স্ত ক - প রি চ য়

বিষ্ণু দে-র কবিতা

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত—বিষ্ণু দে। সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। পাঁচ টাকা।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় দেড় বছর কি তারও কিছু বেশিকাল আগে। বিষ্ণু দে-র এই কাব্য গ্রন্থের সমালোচনা যে এতদিন হয়ে ওঠে নি সেজন্য লজ্জাবোধই সম্বল। আর কিছু করণীয় নেই। কেন না যা হয় নি তার অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা আরো বেশি লজ্জাকর।

কবিতা বিষয়ে গদ্য রচনা এমনিতে মুশকিল বাধায়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় মুশকিল আরো বেশি। দেবদূতেরা যেখানে পা ফেলতে ভয় পান, বেকুফরা সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—পুরোনো প্রবাদবাক্য এখানে পুরোপুরি খাটে। কেন না বিষ্ণু দে-র কবিতা জ্ঞান বুদ্ধি আবেগের মিলিত সংসার। তাঁর অন্বেষণ বহুধা। এত সব বিষয় তিনি জানেন এবং কবিতায় মেলান যে প্রচণ্ড পড়াশোনা না থাকলে তাঁর কবিতা থেকে সব কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতার বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন।' আসলে জ্ঞান-বিস্তার বিভিন্ন প্রান্তে বিষ্ণু দে-র মানস-ভ্রমণ সহজ। অক্লেশেই নানা জায়গা থেকে মাল-মসলা যোগাড় করে তিনি কবিতায় লাগান। তাতে মনস্তত্ত্ব থাকে, নৃতত্ত্বও বাদ পড়ে না। ফলে তাঁর কবিতা অনেক রকম এবং জটিল হয়। তাতে নানা যোজনা, নানা অপ্রচলিত ব্যাপার এসে যায়। এবং কবিতা-পাঠককে বেশিরকম বিনয়ী হতে হয়। তবে মহৎ কবিতা মানে বোঝার আগেই মন মজায়। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়ার পুরোনো স্মৃতি মনে জাগে। যেসব ব্যাখ্যার কথা পরবর্তীকালে জানা গেছে সেই সব বা অন্য কোনো ব্যাখ্যার ধার না ধরেও আমরা অনেকেই আমাদের সেই অনেক কিছু না বোঝার বয়সে 'ঘোড়সওয়ার' বা 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া'-পাগল হয়েছিলাম। তথাপি জিজ্ঞাসা থাকে। জিজ্ঞাসা এই যে খুব বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি কবিতা থেকে জীবনের দূরত্ব বাড়ায়

কিনা। এ জিজ্ঞাসা বিতর্ক বাধাবে। তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু জীবন থেকে বেশি দূরে সরে গেলে কবিতা কেন, যে-কোনো শিল্পই নীরক্ত হতে বাধ্য। কোনো শিল্পেই সেটা কাম্য নয়। কবিতায়ও নয়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র বেলা এ অভিযোগ অচল। কারণ রীতি নীতির জটিলতা এবং জ্ঞান বুদ্ধির অসাধারণত্ব নিয়েও তিনি জীবনের কাছে, জীবনের জন্যই তাঁর সব কিছু, কবিতাও। আসলে কবিতায় উদার বিস্তৃত হওয়া, বিশ্বময় হওয়া বিষ্ণু দে-র প্রকৃতিগত। তিনি জানেন যে নানা দেশের শিল্প ও সাহিত্যের, ইতিহাস ও দর্শনের উপাদান কবিতায় ব্যবহারের ফলে যে-দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় তা একালের মানুষের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারে না। শিল্পের, জ্ঞানের নানারূপ আদান প্রদানে মানুষ পরস্পরের আরো কাছাকাছি হবে কেন না কালে দিনে আমাদের আরো বেশি করে বিশ্ববাসী না হয়ে উপায় নেই।

শুধু বিষয় বা জ্ঞান বুদ্ধির বিচারেই নয়, লিখতে পারার অর্থেই বিষ্ণু দে একালের সবচেয়ে সম্পন্ন কৃষক।

> অঙ্কুরে অঙ্কুরে তাই আজ
> আমারও কবিতা দোলে প্রসন্ন হাওয়ায়
> আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী॥

(আমিও তো, পৃষ্ঠা-২০)

বারো মাসই তাঁর মানবজমিনে চাষের কাজ চলে। সমকালে বাংলা কবিতার সবচেয়ে বেশি জমি চাষ করতে পারার গৌরব সম্ভবত তাঁরই প্রাপ্য। এত সম্ভার আর কারো কবিতায় নেই। এবং যা আমাদের বিস্মিত করে তা এই যে এত করেও তাঁর ক্লান্তি নেই। এখনও তিনি অবিরাম বীজবপনে রত। অথচ ইতিমধ্যে তাঁর সমবয়সীরা, তাঁদের সকলে না হলেও অনেকেই মানসিক অর্থে মৃত। এমন কি তাঁর নিকট অনুজকুল পর্যন্ত কবিতায় কেমন ক্লান্ত, নিরুৎসাহ!

অবশ্য ক্লান্তির কি দোষ! আমাদের চারদিকে অক্লান্ত থাকতে পারার মতো কি-ই বা আছে? সব ব্যাপারই যেন নিষ্ফলতার সমারোহ। আমাদের চোখে সংশয়ের বিন্দুগুলো এখন বড়। পুরোনো বিশ্বাসের বাসার অনেকখানি ভাঙা। প্রিয় মূল্যবোধগুলো ধুলায় পড়ে। ভবিষ্যত দূরের জিনিস আছে কি নেই। এবং এ সবই বিষ্ণু দে-র জানা কথা।

এ নরকে
মনে হয় আশা নেই, জীবনের ভাষা নেই
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয় শহরও তো নয়
প্রান্তর পাহাড় নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, পৃষ্ঠা ৩-৪)

উপরোক্ত স্তবক পরাজিত নায়কের কাতর স্বগতোক্তি হতে পারত, কিন্তু হয় নি। প্রাণযাত্রী বিষ্ণু দে-র পথ অন্য। দুঃস্বপ্নের পতিত জমির শূন্যতা ছাড়িয়ে তিনি সেই চূড়ায় যেতে পাবেন যেখানে চৈতন্যের এক পরিচ্ছন্ন স্থিরতা আছে।

ক্ষোভ শুধু অপলাপ ; আর নয়,
পাশে নয়, আকাশে তাকাও, স্নান কর ;
ডুব দাও বজ্রে ও বিদ্যুতে,
আষাঢ়ের আমন বৃষ্টিতে
বীজকম্প্র শ্রাবণ ধারায়, কার্তিকের কুয়াশায়, নবান্ন ভূষায়
মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে, জেলায় জেলায়, দেহমনে
সারা দেশে, যেখানে হারায় শিশিরের অশ্রুজল
কপিল গঙ্গায় আলোনা নয়নে
মুমূর্ষুর রূপনারায়ণে
প্রাথমিক সত্তার উষায় ॥

(আকাশে তাকাও, পৃষ্ঠা ১৩)

বুকে হাত রেখে ক'জন এখানে আসতে পারেন? শেকড় কতখানি শক্ত হলে এ উচ্চারণ আজও সম্ভব! আর এই মন্ত্রের জন্য আমরা বিষ্ণু দে-রই মুখাপেক্ষী।

যার জোরে বিষ্ণু দে পারলেন তা সম্ভবত এক আশ্চর্য মানবিকবোধ, ভালবাসা। এ ভালবাসা বাংলাদেশের মাটি জল গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ। মানুষের জীবনযাত্রায় উৎসুক, সঙ্গী আশাবাদী। একালে অনেক কিছু, অনেক কিছুই যখন অন্য খাতে প্রায় বলা যায় এক অপ্রেমের খাতে বইছে তখন বিষ্ণু দে-র কবিতার বিরল জলধারা যে এখনও গভীর, বহমান তার কারণ তাঁর ভালবাসা-বোধ। ভাবাবেগ নয়, তা হৃদয় ও বিবেকবুদ্ধি মেলানো উপলব্ধিরই ফল। জীবন সম্পর্কে তাঁর স্পৃহা যে এত বেশি তার কারণ জীবনের কাছে তাঁর পাওনাও সামান্য নয়।

তাই শিল্পে পাই যদি নৈর্বক্তিক হৃদয়বত্তায়
চোখে কাণে নাট্যে দৃশ্যে উদ্‌ভাসিত সুরের লহরা,
তখন হঠাৎ শুদ্ধ, চিত্তে জাগে অতনু অধরা
জীবনের কূলপ্লাবী তরঙ্গিত যন্ত্রণা গৌরবে।
আকাশবিহারী সুর অনির্বচনীয় পরম্পরা ॥

(তাই শিল্পে পাই, পৃষ্ঠা ১১৫)

কবিকে ভালবাসতে হয়। এবং বিষ্ণু দে ভালবাসাবাদী। সেজন্য তাঁর এতখানি সজীবতা এবং যখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকেন তখন তাঁর হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফূর্তি যে মুক্তি পায় তাই নয়, ববং বলা যায় তাঁর দেহে মনে এক রূপান্তরই ঘটে।

আমার স্নায়ুর লোহা রঙ পায় মাঠের সোনায়,
মন পায় অসীম নীলিমা, (আবার এসেছি, পৃষ্ঠা ১২৯)

অথবা

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে। (অশ্বত্থ, পৃষ্ঠা ৬১)

এতখানি নির্ভরশীল ও হৃদয়বান হতে পেরেছেন বলে সৃষ্টিতে তাঁর ক্লান্তি নেই। অবশ্য বিষ্ণু দে পাল্টেছেন। নির্মমভাবেই অতীতকে ছেড়ে এসেছেন। তাঁর কাব্যে যে-নির্লিপ্তি, যে-নাটকীয়তা, কল্পনার ঐশ্বর্যের যে-চমক, আবেগ ও ধ্বনিময়তার যে-ইন্দ্রজাল ছিল তার অনেকখানি এখন ইতিহাস। কিন্তু তার বদলে অন্য কিছু আছে যা নতুন। বিষ্ণু দে এখন অনেক অন্তরঙ্গ, ঘরোয়া 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র অনেক কবিতাই এ পরিবর্তনের সাক্ষী। অবশ্য পরিবর্তনেব সূচনা অনেকদিন আগে থেকেই হয়েছিল। এখন তা পরিণতির মুখে।

রবীন্দ্র-আলোকে আমাদের জন্ম, তাই জানি গান
সৃষ্টির চরম শিল্প, (নৈঃশব্দ মধুর এত, পৃষ্ঠা ১১৯)

উৎসব ইত্যাদিতে আনন্দের নামে পাড়ায় যা হয়, আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় যা আছে, সারা রাত ধরে মাইকবাজি, কবিতাটিতে তারই বিরক্তি বর্ণনা। কিন্তু কবিতার এই সহজতা কি সহজ? কেন না এখানে এক বিচ্ছিন্নতার বেদনাবোধ আছে। আবার সৌভাগ্যবান হওয়ার কথাও কি নেই? উত্তরাধিকারের কথা? ঐতিহ্যেব কথা? অথচ সব কিছু এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সরল, আন্তরিক! এই নতুন সহজ অন্তরঙ্গ সুরে লেখা কবিতার নমুনা আরো দেওয়া যায়।

তবু এই বৃষ্টি ভালো। দগ্ধ দেশে কয়েক ঘণ্টার
অপিস কামাই যাক, ট্রাম-বাস থামুক খানিক,
না হয় ভিজুক কাদা জলে কিছু মায়ের মানিক,
অন্তত বারেক মুক্তি পাক তারা দেহটা মনটার।

(এই ভালো, পৃষ্ঠা ১২৮)

কলকাতায় বৃষ্টির প্রার্থনার মতো এই স্তবকের শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। বিশেষত 'মায়েব মানিক' ব্যবহারটি। এই ব্যবহারের ফলে যে চেনা চেহারা সহজেই মনে এসে যায় তা খুব কাছের, প্রতিদিনেব ঘনিষ্ঠ।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' সম্ভবত বিষ্ণু দে-র একাদশ কাব্যগ্রন্থ। নানা স্বাদের কবিতাই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এবং যদিও একই শব্দ বার বার ব্যবহাবের বা ফেনিয়ে বলার মুদ্রাদোষ থেকে বিষ্ণু দে মুক্ত নন তবু তার ক্রটির খুটিনাটি উল্লেখ নিরর্থক। আমরা তাঁর কবিত্বের, হৃদয়ের, মনীষার সার্থক পরিচয় পেয়েছি। উদ্ধৃতির বহর বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটি কবিতার একটি স্তবক নানা কারণে উদ্ধার করতে চাই। কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে রচিত।

বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহর, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল।
মনে মনে বয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশ বছর;
কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উচ্চ মতান্তরে
সানুকম্প অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—

(বন্ধুস্মৃতি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১৩০)

কবিতা রচনায় বিষ্ণু দে-র যেমন কোনো ক্লান্তি নেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশারও কোনো ক্লান্তি নেই। কিন্তু আমাদের চারপাশে এই ক্লান্ত পরিবেশ কেন? এই নিঃস্বতাবোধ কেন? এই বন্ধ্যা মাটি কেন? এই ভগ্নস্তূপ কেন? কথনো কখনো সব যুক্তি তর্ক, বিচার বিবেচনা অর্থহীন ঠেকে। এক অদম্য স্পৃহা বা জীবনশক্তির প্রতীক্ষা জাগে। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করি।

থেকে থেকে মনে হয় কোথায় সে দরাজ গলার,
হিম্মতওয়ালাব গান, কৃষাণের গান! (আবার এসেছি, পৃষ্ঠা ১২৯)

চিত্ত ঘোষ

নাট্য প্রসঙ্গ

চায়ের ধোঁয়া। উৎপল দত্ত॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ৬·০০

বাংলাদেশের সমসাময়িক নাট্যচর্চা সম্পর্কে যাঁরা অল্পবিস্তর আগ্রহশীল—উৎপল দত্তের নাম তাঁদের কাছে অপরিচিত নয়। "চায়ের ধোঁয়া" বই-এ নাট্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা তাই আমাদের কৌতূহল জাগায়। বইটির আলোচনা মোট দশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। নাটকের সাহিত্যগত দিক এবং প্রয়োগগত দিক সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা এবং কিছু তথ্যের সমাবেশ এই বই-এ দেখা যায়।

বইটির রচনাশৈলীতে লেখক কিছু অভিনবত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অভিনবত্বের প্রয়াস আলোচনার মূল বক্তব্যগুলিকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে দেয়নি। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে এক একটি বিষয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এগুলিকে লেখকের মতামত বলে ধরে নিতে হয়। এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বক্তব্যের স্ব-বিরোধ এবং সামঞ্জস্যহীনতাকে এড়ানো যায় না। (অবশ্য বইটির আরম্ভেই একটি বিজ্ঞপ্তিপত্রে একে রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে এ ধরনের তুলনা নিতান্ত অবিমৃষ্যকারিতা বলে মনে হয়।)

বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উত্থাপিত না হলেও এই বইয়ে অন্তত কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এবং এই সমস্ত প্রসঙ্গে লেখকের মতামতও কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। যেমন "খুন-জখম" আলোচনায় আছে: "আগের নাটকে যেটা ছিল ব্যক্তিবিশেষের খুন হওয়া, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপক খুন।···· সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নয়া যোদ্ধবৃন্দকে তুলে ধরুন; আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।" (পৃঃ ৯) কিংবা, "জনপ্রিয়তা ও আলমগীর" ও "হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা".এই দুটি আলোচনায় বর্তমান কালে শিল্পস্রষ্টা এবং শিল্প-গ্রাহকদের মধ্যবর্তী ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা যেভাবে করা হয়েছে—তা হয়ত সকলে গ্রহণযোগ্য বলে মানবেন না—কিন্তু এই বক্তব্যকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বলে মেনে নেবেন। এ ছাড়াও নাট্যপ্রযোজনার প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং তৎসম্পর্কীয় কিছু বক্তব্য এই বইয়ের কয়েকটি আলোচনায় করা

হয়েছে। অভিজ্ঞ প্রযোজক উৎপল দত্তের নাট্য-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার উপর আস্থাবান হলে এগুলিকে মূল্যবান বলে মনে করা যায়।

কিন্তু যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা এই বইয়ে করা হয়েছে—আলোচনার সময়ে লেখক সেগুলিব প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। বিভিন্ন বিষয়েব আলোচনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে যখন লেখকের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়—সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও আলোচনাকে ইচ্ছাকৃত জটিলতার দোষে দুষ্ট করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা স্ব-বিরোধী হয়ে পড়েছে। বিশেষত সব মিলিয়ে শেষ দুটি আলোচনায় আমাদের প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হয়। এর আগে পর্যন্ত আলোচনা যদিও কণ্টকিত শৈলীকে আশ্রয় কবে এগিয়েছে—তবুও মাঝে মাঝে তার মধ্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুই অনুচ্ছেদে এসে লেখককে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত বলে মনে হয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রেই তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে কোনোরকম সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টাও করেননি। অপ্রাসঙ্গিক পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রচেষ্টায় তিনি দিশেহারা। বিশেষত শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব ও বাস্তবোত্তর-এর সমস্যা প্রসঙ্গে যখন তিনি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আইনস্টাইন বা রাসেলের উক্তি উদ্ধৃত করেন তখন স্পষ্টতই মনে হয়—আইনস্টাইন বা রাসেলের দার্শনিক চিন্তার সম্বন্ধে এবং যে-উক্তিগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন—সেগুলির নিহিতার্থ সম্পর্কে তিনি কিছুই বোঝেন না অথবা যে-পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই বই—তাঁরা নিতান্তই গণ্ডমূর্খ।

গৌতম সান্যাল

শরৎ-প্রসঙ্গ

Sarat Chandra Chatterjee. Humayun Kabir.—Silpee Sangstha Prakasani. Rs. 3·00

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। শিল্পী-সংস্থা প্রকাশনী। ৬·৫০

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। শিল্পী-সংস্থা প্রকাশনী। ২·২৫ টাকা

শরৎচন্দ্র একদা বাঙালি পাঠকের হৃদয় ও মন হরণ করেছিলেন, অধুনা সে-ধারা প্রচণ্ড না হলেও অব্যাহত। জনপ্রিয়তা প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির আত্মীয়, না, শত্রু—এ-বিষয়ে তুমুল তর্কের অবকাশ আছে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদেরও কৌতূহলও

স্বাভাবিক, বিশেষত তাঁর জীবনী যখন নানা রহস্যে আবৃত, অবশ্য তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানে অবশেষে বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র ওতপ্রোত ছিলেন বলেই তিনি আমাদের প্রিয় লেখক, ফলে তাঁর রচনায় বাঙালি চরিত্রের উদারতা সংকীর্ণতা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এমনকি স্ববিরোধিতা স্পষ্টই লক্ষণীয় এবং সামাজিক চেতনার সূত্রেই হুমায়ুন কবির পুস্তকটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের সামাজিক বিপ্লব সাধনার অন্তঃস্থলে রক্ষণশীল মনোভাবের সক্রিয়তা অতি নিপুণরূপে বিশ্লেষণ করেন। কয়েকটি নারী চরিত্রের মাধ্যমে কবির সাহেব শরৎচন্দ্রের স্ব-বিরোধিতা স্পষ্ট করে তোলেন, ও সেই সূত্রে বাঙালির আপাতবৈপ্লবিক চিন্তার দ্বিধাও তাঁর অগোচরে থাকে না। মনে হয় শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূল কারণ বাঙালির দ্বৈত সত্তায় নিহিত, এ-সম্পর্কে লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবকাশ পান নি হয়ত গ্রন্থটি অতি ত্বরায় লিখিত হয়েছে বলে। তবু শীর্ণকায় পুস্তকে হুমায়ুন কবির শরৎচন্দ্রের সামাজিক পরিবেশ (বিশেষ করে ভাগলপুর ও বর্মা অবস্থান), বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা, ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের সফলতা ও ব্যর্থতা সংক্ষেপে, কোনো কোনো সময় সূত্রাকারে প্রায় নিরপেক্ষ ভাবে উপস্থিত করেছেন এবং উপন্যাস-বিচারে দেশ-কালের পটভূমিকা যে অনিবার্য তা তিনি স্মরণে রেখেছেন বলে প্রত্যেক সৎ সমালোচক-ই তাতে আনন্দিত ও তৃপ্ত হবেন। অবশ্য কবির সাহেবের কয়েকটি মন্তব্য, বিশেষত "Purpose is a necessary condition of great art but no partisanship. Propaganda destroys its essence by tying it down to a narrow and definite end."—একান্ত বিতর্কমূলক, কারণ পার্টিজান সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা নিশ্চয়ই সমার্থক নয়। চার্লস্ ডিকেন্সের সঙ্গে তাই শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য কল্পনা যান্ত্রিক সরলীকরণ ও ধরতাই বুলি বলে মনে হয়। সামান্য দু-একটি ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকটি সুলিখিত এবং চিন্তা উদ্রেককারী। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিচারে এমন পুস্তকের আরও প্রয়োজন আছে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ তাই অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থসজ্জা সম্বন্ধে একটি কথা বোধহয় বাহুল্য হবে না। হুমায়ুন কবিরের জীবনী-অংশ অন্যান্য বিদেশী বইয়ের মতো জ্যাকেটে বা ব্যাক কভারে মুদ্রিত হলে শোভন হত। কবির সাহেব স্বল্পখ্যাত নন, তাই তাঁর পরিচয় প্রদান কি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল ?

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল "শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী"তে প্রচুর পরিশ্রমে

সম্ভাব্য যাবতীয় উৎস তন্ন তন্ন করে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যাবতীয় বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছেন। চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, জীবনী, নানা পত্র-পত্রিকা মন্থন করে আপন মন্তব্যসহ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল পুস্তকটি রচনা করেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থ সাহিত্য-গবেষকদের ভবিষ্যৎ পথ মসৃণ ও প্রশস্ত করে, সাধারণ পাঠকও তাঁদের প্রিয় কথাসাহিত্যিকের সমগ্র শিল্পকর্মের পরিচয় পেয়ে অধিক আগ্রহী ও কৌতুহলী হন। লেখক শুধু গ্রন্থের বিবরণ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, ভারতীয় বা বিদেশী ভাষায় অনূদিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থতালিকা, শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীর পরিচয় দিয়েছেন—যে-পরিচয় প্রায় সম্পূর্ণ বললেই চলে। এ-ছাড়া শরৎচন্দ্রের খণ্ড খণ্ড ভাবে কথিত আপন কথা এবং "শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" আলোচনাটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে পুস্তকটি আরও মূল্যবান করে তুলেছেন।

"শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা" পুস্তকটি তথ্যের খনি। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এ পুস্তকে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ জীবনের চিত্র স্পষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে শরৎচন্দ্রের কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা অবিনাশবাবু অতি সুন্দররূপে আলোচনা করেছেন।

—কুশল লাহিড়ী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পূর্বপক্ষ। জৈমিনি। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস। ৪'০০

জৈমিনির 'পূর্বপক্ষ' জাতীয় গ্রন্থের রচনায় সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। এতে যেমন অল্পকথায় সমাজের একটা দিকের চেহারা চকিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি এই ধরনের রচনায় বিষয় নির্বাচনেও সবিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শক্ত হাতে রাস টেনে না রাখলে রম্য রচনার মান কিছুটা অকারণ হাল্কামিতে আক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তদুপরি সাময়িকতায় পুরোপুরি মজে যাওয়া অসম্ভব তো নয়ই, বরঞ্চ খুবই সম্ভব।

বাস্তবিক পূর্বপক্ষ গ্রন্থটি পাঠের সময় উপরিউক্ত প্রতিটি কথাই মনে পড়লো। ভাল লাগার কথাটাই আগে বলি। পূর্বপক্ষের জৈমিনি সহৃদয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক—তাই তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ কখনও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি, অনেক

সময় আভাসেই শেষ হয়েছে ; তাঁর তীব্র বিরাগও আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় পরিবেশিত। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রতি মমতায় তাঁর প্রায় অধ্যায়ই উজ্জ্বল। আসলে, জৈমিনির পূর্বপক্ষ বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তাভাবনার একটি দলিল ; কর্পোরেশন, স্কুল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, তাঁর বিরাগ তাই-ই বলে।

এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোভাবই প্রকাশিত বিমূর্ত শিল্প ও তরুণ গল্পকারদের গল্প-প্রসঙ্গে। আগেই বলেছি, এই ধরনের রচনায় বিষয় নির্বাচন অন্যতম ব্যাপার। শ্রীযুক্ত জৈমিনি তাঁর এই টিপ্পনী-প্রধান রচনায় এই দুই প্রসঙ্গ না তুললেই পারতেন। কারণ তাঁর মন্তব্যাদি বিষয়ে অর্ধসত্য প্রকাশেই ক্ষান্ত থেকেছে। তরুণ কবি ও গল্পকারদের প্রসঙ্গে মন্তব্যে সাবধান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঠিক একই ধরনের মনোভাব চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে।

অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, জৈমিনির এই রচনা সাপ্তাহিকের পাঠকদের উদ্দেশে। তাদেরই মনোরঞ্জনের জন্য।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ : গবেষণা ও পাঠভেদ

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : রবীন্দ্র-সংখ্যা (বর্ষ ৬৬। সংখ্যা ৩-৪)

পনেরটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ ও ৩+৮ খানা মূল্যবান্ চিত্র সহ 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিলম্বিত প্রকাশের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরা কিন্তু মনে করি— বিলম্ব হলেও লগ্ন এখনো অতিবাহিত নয়। এবং উপকরণ-গৌরব থাকলে বিলম্বে যায়-আসে না। তাই আনন্দচিত্তে আমরা এই সংখ্যাটিকে স্বাগত করি। প্রবন্ধে, চিত্রে, প্রসাধনে পরিষৎ পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা বহু বহু রবীন্দ্র চর্চার মধ্যেও বিশিষ্ট। পরিষৎ আপনার কর্তব্য পালন করতে পেরেছেন— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদের যোগাযোগ-বিষয়ক প্রতিশ্রুত সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে তাঁদের কর্মসূচী সম্পূর্ণ উদ্‌যাপিত হবে।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার একটা ঐতিহ্য আছে। গবেষণামূলক আলোচনা তার বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গবেষণার একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেকাল বলতে আমরা মোহেন-জো-দড়োও বুঝি আবার উনবিংশ শতাব্দীও বুঝি— আমাদের মতো বিস্মৃতিধর্মী জাতির পক্ষে দুই-ই সমকালীন—অর্থাৎ বিস্মৃত। ভাগ্যবশে রবীন্দ্রনাথ এখনো সেই পর্যায়ে গিয়ে পড়েননি। তাই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যে গবেষণার বহু বিষয় আছে, তা আমাদের সুধীদের নিকটেও স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির পটভূমিকায় আছে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস আর তার প্রাগভূমিকায় আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত জীবনযাত্রা। সাহিত্য-পরিষৎ-এর এই সংখ্যাটি সৌভাগ্যক্রমে এই সত্য আরও পরিষ্কার করে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ' থেকে 'কালের যাত্রা এবং রবীন্দ্র-নাটক' পর্যন্ত প্রবন্ধ পনেরটির মধ্যে এই চেতনার আভাস পাওয়া যায়, এবং পাওয়া যায় যথার্থ গম্ভীর গবেষণার চিহ্ন। বিশেষ উল্লেখের স্থান নেই ; কিন্তু লেখকগণ অভিনন্দনযোগ্য।

প্রাচীন ভারতের বিবিধ ভাবধারার বিচিত্র সঙ্গম রবীন্দ্রচিন্তায় দেখা যায় ; আর রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে দেখা যায় শিল্প-সাহিত্যের নানাদিকের বিশিষ্ট উৎকর্ষ— স্বভাবতই এই দুই দিক অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের অভিনব দানও কি কম? একাধারে আধুনিক মানবতার ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার তিনি উজ্জীবন করেছেন। এই বিশেষ সত্যটিও গবেষকদের পক্ষে জিজ্ঞাসার বস্তু হতে পারে। হয়তো এক সময়ে হবেও সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সাহিত্য গবেষকদেরই বা হতে বাধা কি—যদি সময় ও গ্রন্থের পরিধিতে বাধা না হয়! এই পরিসরে আমরা যা পেয়েছি তার জন্য অকুণ্ঠিত ধন্যবাদ লেখকদের প্রত্যেককে। অবশ্য চিত্রাবলী ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রভৃতির জন্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয় আমাদের বিশেষ পরিতৃপ্ত করেছে—তা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের সংকলিত 'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ' শীর্ষক লেখায় 'সন্ধ্যা'-সংগীতে'র আলোচনা। বিদেশীয় লেখকদের 'ভেরিওরাম' বা সর্ব-পাঠ-সম্বলিত প্রামাণিক সংস্করণ তাদের সাহিত্যচর্চায় এক অত্যাবশ্যক অবলম্বন। রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনায়ও এরূপ সংস্করণের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন। এবং 'সন্ধ্যা-সংগীতের' এই আলোচনা দেখলে সকলেই তার মূল্য অনুভব করতে পারবেন। কী জিনিস কী হয়ে উঠল, কী হতে-হতে আবার কী হল না, ইত্যাদি কৌতূহলজনক প্রশ্নই শুধু নয়, যথার্থই রবীন্দ্র-সৃষ্টি রহস্যেরও বহু দিক ক্ষণে ক্ষণে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে রসজ্ঞের চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণিত করবার মতো স্থান এখানে নেই; থাকলে কথাটা স্পষ্ট হত। এই শ্রমসাধ্য কঠিন ব্রত পুলিনবাবু ও শুভেন্দুবাবু সত্যকারের সাধকের মতো উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁদের কাছে আগামী দিনের রবীন্দ্র-পাঠকেরাও ঋণী থাকবেন। কিন্তু একালের আমরা বলব—নাম্নে সুখমস্তি। যতটা সম্ভব তাঁর এই রবীন্দ্র-গবেষণার বিশেষ পথ আরও প্রশস্ত করুন—'সন্ধ্যা-সংগীতে'র এই পাঠ ভেদ দেখে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়েছে।

পরিষৎ ও তাঁর সেবকদের আর একবার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সার্থকতায় বাঙালিমাত্রই সার্থক বোধ করে।

গোপাল হালদার

নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক

সমর সেনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র 'নাউ' (Now) শহরের বুদ্ধিজীবী মহলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সাড়া জাগাতে পেরেছে। গত কয়েক মাসে চিন্তার খোরাক যোগাবার মতো বেশ কয়েকটি লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে—আমরা আগ্রহের সঙ্গে তা পড়েছি। সব সময়ে যে সেই সব লেখার সঙ্গে একমত হয়েছি তা নয়—নাইপলের (An Area of Darkness) বইয়ের সমালোচনা অনেকের কাছেই একদেশদর্শী বলে মনে হয়েছে, 'ইয়াগো'র রচনাগুলির নির্বোধ আত্মম্ভরিতা অনেকের বিরক্তি উদ্রেক করেছে, চ্যাপলিনের আত্মজীবনী-প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্যের সঙ্গে অনেকে একমত হতে পারেন নি। কোনো পত্রিকার সব লেখার সঙ্গে সকলে একমত হবেন, এমনটা আশাও করা যায় না। সুতরাং তা নিয়ে দোষ ধরব না। বরং পত্রিকাটির সম্পাদনায়, এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে এমন একটা সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিত্তের পরিচয় পেয়েছি, কথাটা লজ্জার হলেও বলতে দ্বিধা নেই, যা ১৯৬৫ সালের এই স্বাধীন ভারতবর্ষে মোটেই সুলভ নয়।

পত্রিকাটির একটি সাম্প্রতিক সংখ্যার (ডিসেম্বর ২৫, ১৯৬৪) কথাই ধরা যাক। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'প্রতিরক্ষা-চিন্তার' (Thinking on Defence—Nirad C. Chaudhuri) মতো প্রবন্ধ আজকের এই ভারতরক্ষা বিধানের যুগে অন্তত কলকাতার আর কোনো পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহসী হত, এবং নীরদ চৌধুরী ছাড়া এমন প্রবন্ধ সাহস করে আর কে লিখতে পারতেন, এক নিঃশ্বাসে তা মনে করতে পারছি না। অবশ্য চৌধুরী মশাইয়ের সব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা নয়—১৯৬৩ সালে চীন সত্যিই যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল সে সত্যকে তিনি যেন ততটা গুরুত্ব দেন নি এবং ১৯৬৪ সালে পারমাণবিক পরীক্ষাবন্ধ চুক্তির পরও চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ যে গর্হিত কাজ, তর্কের ঝোঁকে তাও যেন তিনি মানতে চান নি। চৌধুরী মশায় লিখেছেন 'The *rationale* of the Chinese atomic explosion is easy to see'. আমাদের কাছে কিন্তু তা অত সহজ মনে হয় নি, চৌধুরী মশায় অতঃপর যে-যুক্তি দিয়েছেন তা সত্ত্বেও নয়। আমেরিকা চীনের উপর পারমাণবিক হামলা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুপ করে থাকবে, বা তার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির একেবারে শিক্ষানবীশ

ছাত্রের কাছেও তা কল্পনাতীত। তাছাড়া কোনো দেশ অপর দেশের দ্বারা বিপদাপন্ন বলে মনে করলেই যদি তার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার অধিকার জন্মে তবে পরীক্ষা বন্ধের কথাবার্তা সবই অর্থহীন জিহ্বা সঞ্চালনে পর্যবসিত হয়। আর সে যুক্তিতে ভারতবর্ষও নিশ্চয়ই পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে, কেন না সেও তো চীনের দ্বারা নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করে! কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির নামে (এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি যে নিতান্ত শিশুসুলভ এবং ভুল সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত চৌধুরী মশায় তা জলের মতো পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন) যে এক ধরনের অপদার্থ জঙ্গীবাদী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলছে নীরদবাবু যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তখন তার সঙ্গে আমরা কণ্ঠ না মিলিয়ে পারি না। তিনি যখন বলেন, What our military follies can accomplish is only to lead us towards becoming an American or Anglo-American protectorate. It is to the interest both of Great Britain and to the United States to foster our fear of China and our absurd fear of Chinese military aggression as distinct from military pinpricks to secure political concessions. That will keep us effectually in their orbit. But I do not see why we should play their game. তখনও তার সঙ্গে আমরা নির্দ্বিধায় একমত হই।

এই সংখ্যায় আর-একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—'Indian Plan, U. S. Model?' মার্কিন একচেটিয়াপতিরা কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে, কিভাবে তাকে বিপথগামী করে তার উদ্দেশ্যকেই ভণ্ডুল করবার চেষ্টা করছে—এই প্রবন্ধে অকাট্য তথ্যের সাহায্যে তা দেখান হয়েছে। যারা সত্যিই ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ চান—এই প্রবন্ধ তাদের চিন্তার, বরং বলা উচিত দুশ্চিন্তার, খোরাক যোগাবে।

আমরা সহযোগীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শচীন বসু

বি জ্ঞা ন - প্র স ঙ্গ

পরমাণু ও অতি-পরমাণু

পরমাণুর জনক বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করে যেতে পারেননি যে মানুষ একদিন পরমাণু-শক্তিকেও আয়ত্ত করবে। অথচ তাঁর মৃত্যুর (১৯৩৭ সালে) মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটির সূচনা হয়ে গিয়েছিল। হিরোশিমার পরমাণু-বোমার জন্যে তারপরে সময় লেগেছিল আর মাত্র তিন বছর। অতঃপর হাইড্রোজেন বোমা ও নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টরে পৌঁছতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। সম্ভবত আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পরমাণু-শক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হবার মতো অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। তখন পরমাণু হয়ে উঠবে সঠিক অর্থেই মানুষের দাস।

শুনলে অবাক লাগবে, এতসব কাণ্ড ঘটে যাবার পরেও পরমাণুর অভ্যন্তরের পুরো হদিশটি এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা! আর যতই দিন যাচ্ছে ততই এই পরমাণুর অভ্যন্তরের হদিশ জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যেন দিশেহারা বোধ করছেন। অথচ বিষয়টি জরুরী। পরমাণু রয়েছে এই বিশ্বজগতের মূলে—পরমাণুকে না জানলে বিশ্বজগৎও অজানা থেকে যাবে। দেড়শো বছর আগে ডাল্টন যখন পরমাণু-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তখন পরমাণুকে মনে করা হয়েছিল বস্তুর শেষতম উপাদান, যা কঠিন ও অবিভাজ্য, যা ক্ষুদ্রতম। আর ধারণা হয়েছিল যে পরমাণু সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু জানার নেই। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। শতাব্দী পার হতেই শুরু হয়েছিল নতুন ভাবনা, মাক্স প্লাঙ্ক, রাদারফোর্ড ও নীল্স বোর ছিলেন যে-ভাবনার মশালচি। এই নতুন ভাবনার আলোকে পরমাণুর কাঠিন্য ও অবিভাজ্যতা লোপ পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে শেষতমের মর্যাদার আসনটিও। কেননা পরমাণুর অভ্যন্তরেও আবিষ্কৃত হয়েছিল তিনটি কণিকা—ইলেকট্রন, প্রোটোন ও নিউট্রন। বিশৃঙ্খলভাবে নয়, অনেকটা আকাশের সৌরমণ্ডলের মতো সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে। তার চেহারাটি এই রকম: পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটোন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়স আর এই নিউক্লিয়সকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক (পৃথক পৃথক কক্ষে) ইলেকট্রন। বিদ্যুদ্ধর্মের দিক থেকে ইলেকট্রন নেগেটিভ, প্রোটোন পজিটিভ ও

নিউট্রন নিরপেক্ষ। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা যত, প্রোটোনের সংখ্যাও তত। ফলে একটির নেগেটিভ অপরটির পজিটিভের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে পরমাণুটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। অতঃপর এই তিনটি কণিকা সম্পর্কে আরো প্রচুর তথ্য আবিষ্কৃত হবার পরে আবারও ধারণা হবার কারণ ঘটল যে পরমাণু সম্পর্কে যা-কিছু জানার তা জানা হয়ে গিয়েছে।

এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হতে তারপরে ত্রিশ বছরও সময় লাগে নি। পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আবারও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এবারের ভাবনা খুবই জটিল, প্রায় দিশেহারা হবার মতো অবস্থা। পরমাণুর অভ্যন্তরে কণিকার সংখ্যা এখন আর মাত্র তিনটি নয়—ত্রিশটিরও অধিক। অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেকগুলো আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কণিকাগুলো সবই স্বাভাবিক কণিকা নয়, কতকগুলো আছে যা স্বাভাবিকের হুবহু বিপরীত—আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়ার মতো যাদের নাম দেওয়া হয়েছে বিপরীত-কণিকা। এই স্বাভাবিকে ও বিপরীতে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই বিপর্যয় ঘটে যায়; সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোটখাটো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ধরনের ব্যাপার, যার ফলে দুটি কণিকারই অস্তিত্ব লোপ ও খানিকটা তেজের সৃষ্টি। আবার এদেরই মধ্যে কিছু কিছু কণিকা আছে যাদের স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের একশো-কোটি ভাগেরও ভগ্নাংশ মাত্র। এই অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র জীবনকাল পার হলেই তারা অন্য কণিকায় রূপান্তরিত হয়। এখানেই শেষ নয়। আরো কতকগুলো কণিকা আছে যাদের চালচলন এমনই অদ্ভুত যে, 'অদ্ভুত কণিকা' নামকরণ করেই আপাতত তাদের সম্পর্কে দায় সারা হয়েছে।

আরো মুশকিল এই যে কণিকার তালিকায় নতুন নতুন নাম যোগ হয়েই চলেছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো বিভ্রান্তিকর অবস্থা, অনেকটা আমাদের দেশের উদ্বাস্তু-সমস্যার মতো যারা আগে থেকেই আছে তাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার আগেই নতুনরা এসে উপস্থিত! কার যে কী পরিচয় আর কার যে কোথায় ঠাঁই কিছুই নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যাচ্ছে না। কিংবা আরো একটি উপমা দিয়ে বলা চলে,—সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো একটি বাক্স থেকে শুল্ক বিভাগের লোকেরা অজস্র জিনিস টেনে টেনে বার করার পরে এখন পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। সব জিনিসের নাম জানা নেই, কোন্‌টা কী কাজে লাগতে পারে তাও ঠাহর করা যাচ্ছে না, আর এমন একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থা যে

কী করলে পরে বাক্সটাকে আবার ঠিকমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা চলে তাও কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

ফলে, যদিও চারিদিকে পরমাণু শক্তির জয় জয়কার শুরু হয়েছে আর তাই দেখে আমরা সাধারণ মানুষরা ভাবতে শুরু করেছি যে পরমাণুর অন্ধিসন্ধি বিজ্ঞানীরা খুব ভালো করেই জেনে বসে আছেন—আসল কথাটা কিন্তু এই যে পরমাণু-বিজ্ঞানীরা এখনো একটি সহজ সরল পরমাণুতত্ত্ব খাড়া করে উঠতে পারেন নি। তবে তাঁরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখলেন যে পরমাণুলোকটি আপাত-বিচারে যতই জটিল মনে হোক না কেন, তাকে একটি সহজ সরল তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরতে না পারার কোনো কারণ নেই।

পরমাণু-বিজ্ঞানীরা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকছেন তা বুঝতে হলে পরমাণু সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা আগে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

ইলেকট্রন, প্রোটোন ও নিউট্রনের কথা বলেছি। হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন আছে একটি (অতএব প্রোটোনও একটি)। হিলিয়াম দুটি। এমনিভাবে এক এক করে বাড়তে বাড়তে ইউরেনিয়াম বিরানব্বইটি। এই বিরানব্বইটিই স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ। ইলেকট্রনের (বা প্রোটোনের) সংখ্যাকে বলা হয় পরমাণু-সংখ্যা। হাইড্রোজেনের পরমাণু-সংখ্যা এক, হিলিয়ামের দুই, ইউরেনিয়ামের বিরানব্বই। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম এই পরমাণু-সংখ্যার দ্বারা নির্ধারিত।

নিউট্রনের সঙ্গে পরমাণু-সংখ্যার (অর্থাৎ ইলেকট্রন সংখ্যার) কোনো সম্পর্ক নেই। নিউট্রন কম-বেশি হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এই কম-বেশি হওয়ার দরুণ পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতিতে পরমাণুটির কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু তার ভর অবশ্যই কমে-বাড়ে। একটি প্রোটোনের ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে ১৮৪০ গুণ অধিক আর প্রোটোন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। এই কারণে পরমাণুর ভর হিসেব করার সময়ে ইলেকট্রনের ভর হিসেবে ধরা হয় না। প্রোটোনের ও নিউট্রনের ভরেই পরমাণুর ভর।

হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি ইলেকট্রন (অতএব একটি প্রোটোন)। কিন্তু নিউট্রন পাওয়া যায় কখনো এক, কখনো দুই, কখনো তিন। যে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়স নিউট্রনের সংখ্যা দুই, তাকে বলা হয় হেভি বা ভারী হাইড্রোজেন। নিউট্রনের সংখ্যা তিন হলে ডবল হেভি বা দ্বিগুণ ভারী হাইড্রোজেন। অর্থাৎ, একই মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনকে

পাওয়া যাচ্ছে তিনটি রকমফেরে। এই তিনটিকে বলা হয় হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। তেমনি ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়সে প্রোটোনের সংখ্যা ৯২, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা কখনো ১৪১, কখনো ১৪২, কখনো ১৪৩, কখনো ১৪৬, কখনো ১৪৭। তাহলে প্রোটোন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮ ও ২৩৯। এই হচ্ছে ইউরেনিয়ামের পাঁচটি আইসোটোপ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ (U 235) আইসোটোপটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের জন্যে একমাত্র এই আইসোটোপটিই কাজে লাগে। এখনো পর্যন্ত একমাত্র এই আইসোটোপটিতেই চেইন রিঅ্যাক্‌শন ঘটানো গিয়েছে।

ইলেকট্রন, প্রোটোন ও নিউট্রনের সংখ্যার যেসব হিসেব দেওয়া হল তা শুনে মনে হতে পারে যে পরমাণুর ভিতরটা বোধ হয় কলকাতা শহরের ট্রাম বাসের মতো ঠাসাঠাসি অবস্থা। আসলে কিন্তু তা নয়। বরং বলা যেতে পারে গড়ের মাঠের চেয়েও ফাঁকা। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুকে দৃষ্টান্ত ধরা যাক। এই পরমাণুটির পরিসর হচ্ছে এক ইঞ্চির কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। তার মানে, এক-ইঞ্চি জায়গার মধ্যে কুড়ি কোটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে পাশাপাশি রাখা যেতে পারে। ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, কারণ যে-মাপের কথা বলা হচ্ছে তা কল্পনাতীত রকমের সামান্য। তবে অন্যভাবে খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। পৃথিবীর সমগ্র উপরিতল যদি একফুট পুরু বালুতে ঢাকা পড়ত তাহলে বালুকণার মোট সংখ্যা যত হত তত সংখ্যক পরমাণু রয়েছে একসের পরিমাণ জলে। সময় ও গতিবেগ সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনটি এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে নিউক্লিয়সকে প্রদক্ষিণ করে দশ কোটি বার। এরোপ্লেনের ঘুরন্ত প্রপেলারকে যেমন মনে হয় একটি চাকতি, তেমনি এই ঘুরন্ত ইলেকট্রনের জন্যে পরমাণুকে মনে হতে পারে একটি কঠিন গোলক। বলা বাহুল্য, এক ইঞ্চির কুড়ি-কোটি ভাগের এক ভাগ মাপের এই গোলকটিকে কোনো কালে চোখে দেখা যাবে, এমন আশা করা বৃথা। এই কল্পনাতীত রকমের সামান্য মাপের গোলকটির মধ্যে যে-নিউক্লিয়সটি রয়েছে তার মাপ আরো সামান্য—গোলকের পরিসরের চেয়েও লক্ষ ভাগ ছোট! এক ইঞ্চির কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ—তার লক্ষ ভাগ! এই সামান্যের চেয়েও

সামান্ত মাপের মধ্যে নিউক্লিয়সের অবস্থান। আকাশের গ্রহতারার অবস্থান বোঝাতে গিয়ে যেসব মাপের সংখ্যা বলা হয়ে থাকে—পরমাণু-লোকের সংখ্যাগুলোকে বলা যেতে পারে তারই উল্টো দিক। একটি কল্পনাতীত রকমের বিপুল, অপরটি কল্পনাতীত রকমের সামান্ত। এজন্তে এই সব মাপ সম্পর্কে ধারণা করতে হলে কোটি-কোটি ভাগ ছোট বা কোটি-কোটি গুণ বড়ো করে দেখতে হয়। মনে করা যাক, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়সটি এমনি একটি বড়ো আকারে উপস্থিত হয়েছে আর নিউক্লিয়সটিকে এখন দেখা যাচ্ছে বিন্দুর মতো। এক্ষেত্রে একটি মাত্র প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনের কক্ষপথটি স্থাপিত হবে শতাধিক গজ দূরে। বাদবাকি সমস্তটাই শূন্য। "পরমাণুর মধ্যে শূন্যতাই বেশি। একটা মানুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া হয় তা হলে তার থেকে একটি অদৃশ্যপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।" (বিশ্বপরিচয়-রবীন্দ্রনাথ)।

শূন্যতা মানে কিন্তু কণিকার অস্তিত্বহীনতা নয়। বরং পরমাণু-বিজ্ঞানীরা পরমাণুর অভ্যন্তরকে তুলনা করেছেন একটি মঞ্চের সঙ্গে, যে-মঞ্চে অভিনেতৃর সংখ্যা বর্তমানে ত্রিশটিরও অধিক, যে-অভিনেতৃরা নানা ছাঁদে নানা বেশে আর অনবরত বেশ পালটাতে পালটতে বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এই অভিনেতৃদের গতি এত দ্রুত আর আগমন-নির্গমন এত চকিত যে নিমেষপাতের মধ্যে নাটকের বড়ো বড়ো অঙ্কের উপরে যবনিকা পড়ে যায়। এই কারণে অবিচ্ছিন্ন নাটকটি সম্পর্কে ধারণা করতে হলে অনেকে মিলে বহু বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে তাই করছেন। রাদারফোর্ড থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই নাটকের যতটুকু জানা গিয়েছে তা চমকপ্রদ ও রোমহর্ষক।

কুশীলবদের একে একে উপস্থিত করা যাক। প্রথমেই নাম করা দরকার ইলেকট্রন-এর। এই কণিকাটির ভরকে একক ধরা হয় (সত্যিকারের ভর—একের পরে সাতাশটি শূন্য বসালে যে-সংখ্যাটি পাওয়া যায়, এক গ্রামের তত ভগ্নাংশ)। আগেই বলেছি, ইলেকট্রন নিউক্লিয়সকে প্রদক্ষিণ করে চলে, যেমন গ্রহ প্রদক্ষিণ করে সূর্যকে। তবে এই তুলনাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বরাবর একই নির্দিষ্ট কক্ষে। পৃথিবীর কক্ষ পৃথিবীরই কক্ষ। মঙ্গলের কক্ষ মঙ্গলেরই। কোনো গ্রহই এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ঝাঁপ দেয় না। কিন্তু ইলেকট্রনের বেলায় ব্যাপারটি ঠিক তাই

ঘটে। ইলেকট্রন এই মুহূর্তে এক কক্ষে, পরের মুহূর্তেই হয়তো অন্য কক্ষে। কেন এই কক্ষ থেকে কক্ষে বিচরণ আর তার ফলে কী ঘটে তা প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন বিজ্ঞানী নীল্স বোর। বিষয়টিকে আমরাও খুব সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

পরমাণু থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে বা পরমাণু আলো শুষে নেয়। কিন্তু ব্যাপারটি ঘটে যেমন-তেমনভাবে নয়, নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারে।

প্রত্যেক পরমাণুর নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দনের একটি মাত্রা আছে। প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন পৃথক, তেমনি পৃথক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর স্পন্দন-মাত্রা। একটি বিশেষ সুরে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের তার যেমন একটি বিশেষ মাত্রাতেই স্পন্দিত হয়—এও অনেকটা তাই। উপমাটিকে আরো একটু টানা চলে। বাদ্যযন্ত্রের তারে যেমন বিশেষ মাত্রার স্পন্দনে বিশেষ একটি সুর—পরমাণুর বিশেষ মাত্রার স্পন্দনে তেমনি বিশেষ একটি রঙ। আমাদের চারিদিকে যে এত রঙ, তার মূলে রয়েছে পরমাণুর এই বিশেষ বিশেষ মাত্রার স্পন্দন।

এবারে একটি বিশেষ ইলেকট্রনের দিকে তাকানো যাক। ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়সের চারদিকে ঘুরছে। নিউক্লিয়স থেকে ইলেকট্রনের বিশেষ একটি দূরত্বও বজায় আছে। একটি বিশেষ গ্রহ সূর্য থেকে কতটা দূরে থাকবে তা যেমন নির্ভর করে গ্রহের নিজস্ব ভর ও গতিবেগের উপরে, তেমনি নিউক্লিয়স থেকে ইলেকট্রন কতটা দূরে থাকবে তা নির্ভর করে ইলেকট্রনের শক্তির উপরে. (ইলেকট্রনের বেলায় মনে রাখা দরকার যে সব ইলেকট্রনেরই সমান ভর ; গ্রহে গ্রহে যেমন ভরের তফাৎ. ইলেকট্রনের বেলায় তা নয়)।

এবারে কল্পনা করা যাক, সঠিক স্পন্দনের একটি আলোক-কণিকা (ফোটোন) ইলেকট্রনটির গায়ে এসে লেগেছে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন আলোক-কণিকাটিকে গ্রাস করবে। আর এ ব্যাপারটি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রনটি উচ্চতর শক্তির কক্ষে লম্ফ দেবে ও সেই নতুন কক্ষে চলতে শুরু করবে। উল্টো ব্যাপারটিও ঘটে থাকে। ইলেকট্রন সেক্ষেত্রে একটি আলোক-কণিকাকে ছেড়ে দেয় ও তার ফলে ইলেকট্রন লম্ফ দিয়ে থাকে নিম্নতর শক্তির কক্ষে।

ব্যাপারটি বড়োই অদ্ভুত বলতে হবে। ইলেকট্রন কখনো ফোটোনকে গ্রাস

করছে, কখনো ফোটোনকে ছেড়ে দিচ্ছে। আর যতবার এ-ব্যাপারটি ঘটছে ততবারই ইলেকট্রনের কক্ষ যাচ্ছে বদলে। ইলেকট্রনকে যদি মাছির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে ইলেকট্রনের এসব কাণ্ডকারখানাকে এক ঝাঁক মাছির প্রচণ্ড একটা ছুটোপাটি বলে মনে হতে পারে। পরমাণু থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে বা পরমাণু যে আলো শুষে নেয় তা ইলেকট্রনের এই ছুটোপাটির জন্যেই।

ব্যাপারটি সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। আলো বা শক্তিকে এতদিন কল্পনা করা হত অবিচ্ছিন্ন ও মসৃণ একটি তরঙ্গপ্রবাহ হিসেবে। কিন্তু ইলেকট্রন ও ফোটোনের ঘাতপ্রতিঘাতের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হবার পরে স্বীকার করতে হচ্ছে, আলোর প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও মসৃণ ধারায় নয়, ছোট ছোট বাণ্ডিল বা প্যাকেটের আকারে। এই বাণ্ডিল বা প্যাকেটগুলোকে বলা হয় 'কোয়ান্টা'। সরল বাংলায় বলা যেতে পারে, এক-এক ঝাঁক ফোটোন। এই ফোটোন-কণিকারাই শক্তি বা তেজের বাহন।

কুশীলবদের তালিকায় দ্বিতীয়টির নাম পাওয়া যাচ্ছে: ফোটোন। এই ফোটোনের মধ্যে আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা বিদ্যুদচৌম্বক শক্তি। ইলেকট্রন যখন ফোটোন ছেড়ে দেয় তখন কতখানি জোরের সঙ্গে ছাড়ছে তারই উপরে নির্ভর করে ফোটোনের বিদ্যুদচৌম্বক শক্তি কী রূপ নেবে: আলো, না গামা-রশ্মি, না একস্-রে।

তৃতীয় ও চতুর্থ নাম অবশ্যই প্রোটোন ও নিউট্রন। এ-দুটির একটি যৌথ নামও আছে: নিউক্লিয়স। ইলেকট্রনের ও ফোটোনের মধ্যে যেমন একটা ঠোকাঠুকির সম্পর্ক—এই দুটি কণিকার মধ্যে, পুরোপুরি তাই না হলেও, অনেকটা তাই। মনে করা যাক, দুটি লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে একটা বল লোফালুফি করছে। দূর থেকে তাকিয়ে মনে হবে দুই প্রাণের বন্ধু। কিন্তু বলটা দেখা যাচ্ছে না বলে বোঝা যাবে না বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য একটি আকর্ষণও আছে। কারণ বল লোফালুফি করতে হলে দুজনকে পাশাপাশি থাকতে হবে।

এবারে প্রোটোন ও নিউট্রনকেও এমনি দুই বন্ধু হিসেবে কল্পনা করা যাক। দুজনের মধ্যে দূরত্ব—একের পর তেরটি শূন্য বসালে যে-সংখ্যাটি পাওয়া যায়, এক সেন্টিমিটারের তত ভগ্নাংশ বা তারও কম। এই দুই বন্ধুর পাশাপাশি থাকাটাও কিন্তু একটি অতি-পারমাণবিক (সাব-অ্যাটমিক) আকারের বল

নিয়ে লোফালুফি খেলায় মত্ত হয়ে থাকার জন্তে। এই অতি-পারমাণবিক কণিকাটির নাম 'মেসোন'।

এই মেসোনটি কিন্তু নিরীহ প্রকৃতির নয়। কণিকাটি তড়িতাবিষ্ট—কখনো পজিটিভ, কখনো নেগেটিভ। এবারে এই লোফালুফি খেলার পরিণতিটা ভাবা যেতে পারে। মনে করা যাক মেসোনটি পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট। যে মুহূর্তে প্রোটোন এই পজিটিভ-তড়িতাবিষ্ট মেসোনকে সঙ্গীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে তার নিজের আর কোনো বৈদ্যুতিক পুঁজি অবশিষ্ট থাকছে না। আর তাই যদি না থাকে তাহলে আর প্রোটোনের প্রোটোনত্ব থাকে কি করে! ফলে প্রোটোনটি হয়ে ওঠে নিউট্রন। অন্তদিকে নিউট্রন যে মুহূর্তে পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট মেসোনকে লুফে নেয় অমনি সেটি আর নিউট্রন থাকে না, হয়ে ওঠে প্রোটোন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রোটোন ও নিউট্রনের এলাকাতেও অন্ত ধরনের একটি হুটোপাটি চলেছে। ফলে যে-কণিকাটি এই মুহূর্তে প্রোটোন, পরের মুহূর্তেই তা নিউট্রন। যে-কণিকাটি এই মুহূর্তে নিউট্রন, পরের মুহূর্তেই তা প্রোটোন। মেসোনের ঝাঁকের মধ্যে প্রোটোনের ও নিউট্রনের এই মূর্তি বদলের খেলায় কোনো বিরাম নেই। দুই বন্ধুর এই কাণ্ডকারখানা থেকে এই সিদ্ধান্তও করা চলে যে প্রোটোন ও নিউট্রন আসলে একই কণিকার দুটি পৃথক মূর্তি।

কুশীলবের তালিকায় মাত্র পাঁচটির নাম পাওয়া গেল। আরো অন্তত পঁচিশটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সবাই কণিকা নয়, কতকগুলো আবার বিপরীত-কণিকা। যেমন ইলেকট্রনের বিপরীত-কণিকা হচ্ছে পজিট্রন। একটি ইলেকট্রনকে আরশির সামনে ধরলে তার প্রতিচ্ছায়ার যে-রূপটি পাওয়া যায়—অর্থাৎ হুবহু বিপরীত একটি রূপ—তাই হচ্ছে পজিট্রন। তেমনি বিপরীত-প্রোটোন, বিপরীত-নিউট্রন ইত্যাদি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন, আমাদের এই জগতের বিপরীত একটি জগতও থাকা সম্ভব। যে-জগতে বস্তু নেই, আছে বিপরীত বস্তু। যে-জগতের পরমাণুতে পাওয়া যাবে বিপরীত-ইলেকট্রন, বিপরীত-প্রোটোন ও বিপরীত-নিউট্রন। রুশ বিজ্ঞানীরা যে ফোটোন রকেটের কথা বলেন, যে রকেটের বেগ আলোর বেগের প্রায় সমান, তার মূলেও রয়েছে এই বিপরীত-বস্তুর ধারণা। এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা তোলার ইচ্ছে রইল।

অমল দাশগুপ্ত

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন

আট বছর পর আবার কলকাতায় গত ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের ৫১তম ও ৫২তম যুক্ত অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। এবং ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই অধিবেশন চলেছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে ভারতীয়-বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশন কলকাতায় হয়েছিল। আর এবারকার এই যুক্ত অধিবেশন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে এখানে আরম্ভ হয়েছে। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগেই সুরু হয়েছিল এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-ই ছিলেন তার জনক। তাছাড়া স্যর আশুতোষের সভাপতিত্বেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসন ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি কলকাতাতেই জন্ম নিয়েছিল। তাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্যর আশুতোষের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের যোগসূত্র খুব নিবিড়। এবারের অধিবেশন ছাড়াও কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আরও সাতটি বার্ষিক অধিবেশন ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকবর্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাব্যবস্থার সুরু থেকে যথেষ্ট বাধা দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ইতিহাসেরই পরিহাস,—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসন অধ্যাপক জে, এল, সাইমনসেন, অধ্যাপক পি, এস, ম্যাক্‌মেহন প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছিল। অধ্যাপক সাইমনসেন ও অধ্যাপক ম্যাকমেহন ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন :

> "Scientific Research in India might be stimulated if an annual meeting of workers somewhat on the lines of the British Association for the Advancement of Science could be arranged".

এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা তখনকার দিনের ভারতের সতের জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাছে চিঠি লেখেন। সবাই তাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি জানান। তারপর ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর কলকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল"-এ বিজ্ঞানীরা এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন :

"the Asiatic Society of Bengal be asked to undertake the management of a Science Congress to be held annually."

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল"-ই কার্যত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের পালক-পিতার (foster-father) ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং অ্যাসোসিয়েসনের হেড-কোয়ার্টার্সও ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির ভবনেই ছিল। ১৯৫৭ সালে কলকাতার দিলখুসা স্ট্রীটে অ্যাসোসিয়েসনের নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ায় হেড-কোয়ার্টার্স নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্তর আশুতোষের সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের যে-অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল, তার-ই Plenary Session-এ (১৭ই জানুয়ারি, ১৯১৪) বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কারণ এইভাবে বলা হয়েছিল যে, (১) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় প্রবলতর বেগের সঞ্চার ও তাকে সুসংহত পথে পরিচালনা করা, (২) দেশের বিভিন্ন অংশের বিজ্ঞান-রসিক সংস্থা, সমাজ ও ব্যক্তি-সাধারণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, এবং (৩) বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান-বিষয়সমূহের প্রতি সাধারণ-ভাবে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এমন কোনো বাধা যা জনগণ থেকে উদ্ভূত ও যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দেখা দিতে পারে তা অপসৃত করা।

আজও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক-ই আছে। তবে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে, তা ইতিহাসবেত্তাদের বিচার্য বিষয়।

ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ছাড়াও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ডও ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত

হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি মারা যান। তাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে আরেকজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জীনস্ সভাপতিত্ব করেছিলেন। তবে রাদারফোর্ডের অভিভাষণ অধিবেশনে পাঠ করা হয়েছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিটি অধিবেশনেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। এবারকার অধিবেশনেও ৩৭ জন বিদেশী বিজ্ঞানী প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন। ইংলণ্ড থেকে ডঃ সি, জে, স্টাবল্ফিল্ড, অধ্যাপক সি, উইট্‌ওয়ার্থ, অধ্যাপক কে, সি, ডানহাম্, অধ্যাপক জি, হিগম্যান্ ও ডঃ এইচ্, জি, মোলে ; মার্কিন মুল্লুক থেকে ডঃ চার্লস এফ, পার্ক (জুনিয়র), অধ্যাপক এইচ্, সি, ব্রাউন, অধ্যাপক ডব্লিউ, হোফডিং, অধ্যাপক জে, এল, কেলী, মিঃ আলবার্ট নাউইকি ও অধ্যাপক কে, এস্, সিংউই ; সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অ্যাকাডেমিসিয়ান এ, ডি, আলেকজান্দ্রাফ, অ্যাকাডেমিসিয়ান ইউ, ভি, লেনিক, অ্যাকাডেমিসিয়ান ক্রাসিলিনিকভ, অধ্যাপক কাজারনভ, অধ্যাপিকা কুচেগা, অধ্যাপক মোসিওলেভ, অধ্যাপক সিরকভ, অধ্যাপক বেলাভ ও অধ্যাপক সিলভ ; যুগোশ্লাভিয়া থেকে ডঃ ভ্লাট্‌কো বারসিক্ ও ডঃ অ্যান্টন মোলজাক্ ; সুইডেন থেকে অধ্যাপক স্টেফান্ দোদিয়ার ও অধ্যাপক আই, ওয়ালার ; হাঙ্গেরী থেকে অ্যাকাডেমিসিয়ান গেজা বোগনার ; পাকিস্থান থেকে অধ্যাপক এম, আফজল হোসেন ; পোলাণ্ড থেকে অধ্যাপক কে, স্মুলিকোস্কি, রুমানিয়া থেকে অধ্যাপক এ, বালাবান্ ও অধ্যাপক ভি, গ্রিগোর ; গ্রীস থেকে অধ্যাপক জি, এস্, সিয়ামপস্ ; সিংহল থেকে ডঃ এস্, জ্ঞানলিঙ্গম্ ও মিঃ ডি, বি, পট্টিয়ারাট্চি ; ফ্রান্স থেকে মাদাম্ বাসে দ্য ম্যানরভাল্ ; পশ্চিম জার্মানী থেকে অধ্যাপক জে, স্টাব্ ; জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক থেকে অধ্যাপক ক্লাউস কুনে, অধ্যাপক ডব্লিউ সিমার ও অধ্যাপক জি, গ্রুমের এবারকার অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসন বর্তমানে যে এক বিরাট সংস্থায় পরিণত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার অনুমোদন ও প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমেই তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

. . .

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৯১৪) মাত্র ১০৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন ও মাত্র ৩৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ কংগ্রেসে পাঠানো হয়েছিল। রজত জয়ন্তী অধিবেশনে (১৯৩৮) যোগ দিয়েছিলেন ২,৫০০ জন প্রতিনিধি ও ১০০০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞান কংগ্রেসের হাতে এসেছিল। আর এবারকার অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা হচ্ছে আট হাজারেরও বেশি এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি মৌলিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুমোদন করেছে।

এ বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই যুক্ত অধিবেশনে যাঁদের অভাব অনুভব করা গেছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, পরলোকগত জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক জে, বি, এস্, হলডেনকে। ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং তারপর থেকে প্রতিটি অধিবেশনে-ই তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে আসছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন এই অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন পণ্ডিত নেহরুর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করা গেছে। পণ্ডিত নেহরুর স্মরণে 'Jawharlal Nehru at Indian Science Congress Session' নামকরণ করে একটি বিশেষ পুস্তিকাও এবার বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসন প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের আগামী ৫৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে চণ্ডীগড়-এ এবং সভাপতিত্ব করবেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি, এন, প্রসাদ। তার পরের বছরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত হয়েছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্ অধ্যাপক টি, আর, শেষাদ্রী, এফ, আর, এস।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

বিয়োগপঞ্জী : টি. এস. এলিয়ট

কবি টি. এস. এলিয়টের প্রয়াণে বাঙালি কাব্যরসিক আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করবে। এলিয়ট নিজে জানতেন কি না জানি না, এমন কি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই, বাংলা কাব্যকে তিনি যতটা প্রভাবিত করেছেন, আর কোনো সাম্প্রতিক ইওরোপীয় কবি ততটা প্রভাবিত করেছেন কি না সন্দেহ! সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে তরুণতর কবিসমাজের অনেকেরই তাঁর কাছে ঋণের পরিমাণ কম নয়।

আজ আমাদের মনে পড়ছে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে এলিয়টের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই। আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে এই পরিচয় পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এলিয়টের Journey of the Magi-র অনুবাদ করেছিলেন। প্রায় দুই দশক আগে এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'এলিয়টের মহাপ্রস্থান'। আর এলিয়টের কবিতার অনুবাদও এই চৌত্রিশ বছরে এই পত্রিকায় কম প্রকাশিত হয় নি।

ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়তো পরিণত বয়সই আর কবির লেখনীও হয়তো দীর্ঘকালই ছিল নীরব—তবু মৃত্যু মৃত্যুই, আর তা চিরকালই শোকাবহ। এবং আত্মীয়-বিয়োগব্যথা দুর্বিষহ।

শোক প্রস্তাব মূল্যায়ন নয়, সে-প্রয়াস পরিচয়-এর পৃষ্ঠাতেই যোগ্যতর ব্যক্তিরা করবেন ভবিষ্যতে—আজ আমরা কবির অমর স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

অশোক রায়

পাঠকগোষ্ঠী

চিত্র-বিচারে স্যর্ হার্বার্ট রীডের মতামত

আধুনিককালের সর্বাপেক্ষা যশস্বী কলা-সমালোচক স্যর হার্বার্ট রীড য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন—"আধুনিককালে যেসব চিত্র-সৃষ্টিকে আধুনিক বলিয়া দাবী করা হয়, এবং স্বীকার করিয়া লইতে বলা হয়—তাহার মধ্যে দশখানির মধ্যে নয়খানিকে নূতন ধুয়া (ফ্যাসান্) হিসাবে আধুনিক বলা যাইতে পারে,—কিন্তু, সেগুলি চূড়ান্তরূপে তুচ্ছ রচনা, এবং সম্পূর্ণরূপে অক্ষমতার দোষে দুষ্ট। আর্ট এখন দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত এবং যে-বিভাগে গত কয়েক বৎসর খুব চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে তাহার নাম হইল—'নৈরূপ্য-বাদী', বা 'বিমূর্ত-বাদী' চিত্রকলা। ইহার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আশা করা অসম্ভব যে ইহাতে কোনোরূপ সার্বজনীন আবেদন থাকিতে পারে, যাহার মধ্যে মনুষ্যসমাজের কোনো সমস্যার কোনো ইঙ্গিত-মাত্রও থাকিতে পারে। যে-ইঙ্গিত আছে—তাহা সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক, অর্থাৎ এই রীতির আর্টে, জীবনের সহিত সম্পর্কিত কোনো ইঙ্গিতই থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নৈরূপ্যবাদী শিল্প-কলা (Abstract Art) জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য হইয়া উঠিতেছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পূর্বযুগে যেসব কলা-সাধকরা মানুষের জীবনের সচেতন সাক্ষী এবং ব্যাখ্যাতার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, এখন তাঁহারা নিছক চাক্ষুষ রূপের অর্থশূন্য নিরর্থক ব্যায়ামের ধারক ও বাহক শিল্পী; এখন রূপের চয়ন ও পরিবেশন ব্যতীত তাঁহাদের নিজের কোনো বক্তব্য বা বাণী তাঁহারা প্রকাশ করিতে পারেন না।"

এই কথা বলিয়া সমালোচক মহাশয়, পাঁচ শতকের চীন দেশের বিখ্যাত কলা-সমালোচক শীয়ে হো (Hsieh Ho) মহাশয় কর্তৃক প্রবর্তিত চিত্র-বিচারের যে ছয়টি 'লক্ষণ' ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহারই আদর্শে আমাদের আধুনিককালের চিত্র-সৃষ্টির বিচার করিতে হইবে—এই দাবী করিতেছেন, এবং এই আদর্শে যদি আধুনিককালের চিত্র-সৃষ্টি 'রসোত্তীর্ণ' হইতে পারে তবেই তাহাকে সার্থক সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, নতুবা নহে। চীনের সমালোচকের অনুরূপ আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এগার

শতকের যশোধর পণ্ডিত মহাশয় চিত্র-বিচারের ছয়টি 'লক্ষণ' উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধৃত এই 'কারিকাটি' এখন বাংলার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট সু-পরিচিত :

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি, ভাব-লাবণ্য-যোজনম্।
সাদৃশ্যম্ বর্ণিকা-ভঙ্গম্ ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্॥"

অর্থাৎ চিত্রের ছয়টি 'লক্ষণ' হইল এই : (১) রূপ-ভেদ অর্থাৎ এক রূপ হইতে অন্য রূপের পার্থক্য দেখান, যেমন মানুষের রূপ মানুষের মতো হবে এবং পশুর রূপ পশুর মতো হইবে। (২) প্রমাণানি,—অর্থাৎ দীর্ঘতা, প্রস্থ, ঘন-মান (depth) প্রভৃতির সামঞ্জস্য থাকিবে। (৩) এবং (৪) ভাব-লাবণ্য যোজন অর্থাৎ 'ভাবের' প্রকাশের সহিত 'লাবণ্য' বা সু-স্বাদুতা সংযুক্ত হইবে। (৫) সাদৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতির রূপের সহিত অন্তত কতকটা মিল থাকিবে। (৬) বর্ণিকা-ভঙ্গ অর্থাৎ রঙের বিচিত্রতা থাকিবে—একঘেয়ে বা 'এক-রঙা' হইবে না। এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সম্ভবত ভারতের এই ষড়ঙ্গের লক্ষণ চীন সমালোচক ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন—এই ষড়ঙ্গ লক্ষণের সার্বজনীন আদর্শ লইয়া আমরা যে-কোনো যুগের চিত্র-সৃষ্টিকে বিচার করিয়া তাহার মূল্যায়ন করিতে পারি।

আমি আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পী মহাশয়দের তাঁহাদের নব্য সৃষ্টিকে এই আদর্শে বিচার করিতে সসম্মানে আহ্বান করিতেছি। স্যর হার্বার্ট রীড এই ষড়ঙ্গের মাপকাঠিতে আধুনিক চিত্রকলার বিচার করিতে চাহিতেছেন।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-পরিচয়

গত নভেম্বর মাসে নয়া দিল্লীতে যে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল—সত্যজিৎ রায়ের এই ডিজাইনটি তার উদ্দেশে নিবেদিত। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ একটি স্মারক কার্ডে এটিকে মুদ্রিত করে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করেন। কার্ডে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "লাল গোলাপের জন্য" কবিতাটির ইংরেজি তরজমা মুদ্রিত হয়েছিল।

সম্পাদক পরিচয়